মেদিনীপুর জেলা সংখ্যা

১৪১০

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

যোগাযোগের ঠিকানা

বিতরণ শাখা

সফ্‌দর আলি খান

৬ কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট ● কলকাতা-৭০০ ০০১

দূরভাষ : ২২৪৩-৬২৯৫

পোস্টাল রেজিঃ নং ডব্লু বি / আর এন পি-১৪৭

ঝাড়গ্রাম লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীদের আদিবাসী নৃত্য

সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থানে অনন্য মেদিনীপুর

পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা অবিভক্ত মেদিনীপুর। সুদূর অতীতে এই জেলার দুই-তৃতীয়াংশে ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এমনকী বিহার ও ওড়িশার কয়েকটি পরগনাও মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছিল। বিচিত্র ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিন্যাসের ফলে এই জেলার ঐতিহ্যে রয়েছে অখণ্ড জাতীয় ঐক্য। স্মরণাতীত কাল থেকেই সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ, লোধা, শবর অধিবাসীদের সঙ্গে একত্র বসবাস করছেন বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত তেলুগু, তামিল, ওড়িয়া, হিন্দি ও উর্দুভাষী মানুষ। কালপ্রবাহে বঙ্গসংস্কৃতির মূল স্রোতে তাঁরা একাত্ম হয়ে গেছেন।

মেদিনীপুরবাসীদের শিরা ও ধমনিতে প্রবাহিত সংগ্রামী ঐতিহ্য। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসনের সূচনা থেকেই একের পর এক সংগঠিত চুয়াড়, নায়েক, মলঙ্গি ও জমিদার বিদ্রোহ ভারতবর্ষের গণ-আন্দোলনের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তেমনি স্বাধীনতাপর্বে আইন অমান্য ও লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন সারা মেদিনীপুরে যে প্রবল আকার ধারণ করেছিল তার ছবি কোনওদিন ম্লান হবে না। শহিদ ক্ষুদিরাম বসু, মাতঙ্গিনী হাজরা, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, অনাথবন্ধু পাঁজা প্রমুখের ত্যাগ ও আত্মবলিদান কাহিনিও বিস্মৃত হবার নয়।

মেদিনীপুরের আইনশৃঙ্খলা-জটিলতা, উন্নয়ন ও বিভাজন নিয়ে বিস্তর আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। অবশেষে ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি, প্রশাসনিক সুবিধার জন্য মেদিনীপুর পূর্ব ও পশ্চিম দুটি জেলায় বিভক্ত হল। বস্তুত, এই বিভাজন জেলার অধিবাসীদের দীর্ঘদিনের [illegible] বাস্তবায়িত করেছে। আশা করা যায়, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা রূপায়ণে দুই জেলার প্রশাসনিক তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। উপকৃত হবেন দুই জেলার মানুষ। বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় উভয় জেলার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি আসবে। [illegible] ও পঞ্চায়েত স্তরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পৃথক থানা-পুলিশ-আদালতের ভূমিকাও হবে সহজতর।

সাধারণত জেলা বিভাজন করতে গেলে দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। [illegible] মেদিনীপুর দুটি স্বতন্ত্র জেলায় বিভক্ত হলেও প্রস্তুতি যেহেতু আগেই [illegible]

[illegible]

পূর্ব মেদিনীপুর

◻ জ্ঞাতব্য ◻

ভৌগোলিক আয়তন (স্কো কিমি)	—	৪০৯৩.১৪
মৌজা	—	৩০২৮
জনসংখ্যা (২০০১)	—	৪৪২০০৭৩
পুরুষ	—	২২৬৯০৯৬
মহিলা	—	২১৫০৯৭৭
জনসংখ্যা (১৯৯১)	—	৩৮৪৫৬৩৩
তফসিলি	—	১৪.৩৩%
আদিবাসী	—	০.৫৬%
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি স্কো কিমি)	—	৯৩৯.৫৩
নারী পুরুষের হার (প্রতি ১০০০ জন পুরুষের মধ্যে নারীর সংখ্যা)	—	৯৩৯
প্রশাসনিক		
মহকুমা	—	৪
থানা	—	২১
ব্লক	—	২৫
পঞ্চায়েত সমিতি	—	২৫
গ্রাম পঞ্চায়েত	—	২২৪
গ্রাম সংসদ	—	৩০১৪
পৌরসভা	—	৫
ওয়ার্ড	—	৭৫
জেলা পরিষদ সদস্য	—	৫০
বিধানসভা কেন্দ্র	—	১৬
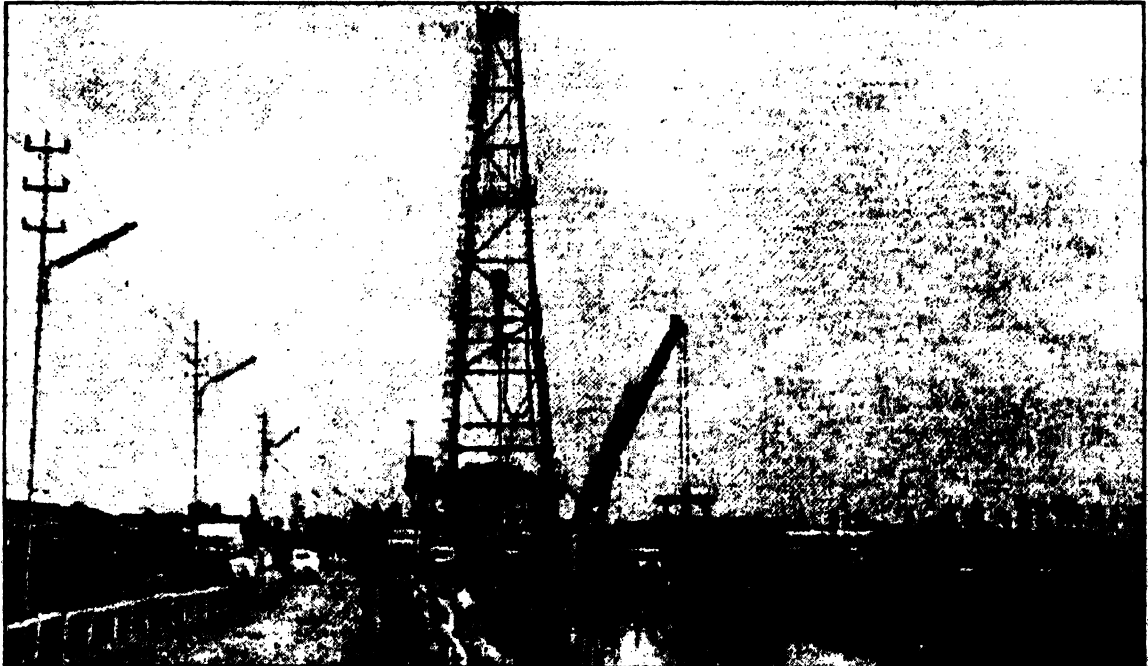
পূর্ব মেদিনীপুর মুগবেড়িয়ার গোবিন্দপুরে তেলের সন্ধানে ও এন জি সি-র খনন কাজ সম্প্রতি শুরু হয়েছে ছবি : ফিরোজ চৌধুরী

ভৌগোলিক আয়তন (স্কো কিমি)	—	৯২৯৫.২৮
মৌজা	—	৮৭৩৫
জনসংখ্যা (২০০১)	—	৫২১৮৩৯৯
পুরুষ	—	২৬৫৯৯০৪
মহিলা	—	২৫৫৮৪৯৫
জনসংখ্যা (১৯৯১)	—	৪৪৮৬২৭৯
তফসিলি	—	১৮.০৭%
আদিবাসী	—	১৪.৮৯%
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি স্কো কিমি)	—	৫৬১.৪০
নারী পুরুষের হার (প্রতি ১০০০ জন পুরুষের মধ্যে নারীর সংখ্যা)	—	৯৬২
মোট চাষের জমি (হেক্টরে)	—	৫৯৪১৮৩
মোট সেচ এলাকা (হেক্টরে)	—	২৭৫২৪৮

প্রশাসনিক		
মহকুমা	—	৪
থানা	—	২৭
ব্লক	—	২৯
পঞ্চায়েত সমিতি	—	২৯
গ্রাম পঞ্চায়েত	—	২৯০
গ্রাম সংসদ	—	৩৪৪৯
পৌরসভা	—	৮
ওয়ার্ড	—	১৩১
জেলা পরিষদ সদস্য	—	৫৮
বিধানসভা কেন্দ্র	—	২১

প্রশাসনিক ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের পটভূমিতে মেদিনীপুর জেলা বিভাজন

অনিকেত চক্রবর্তী

১ জানুয়ারি, ২০০২, তমলুকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বনবিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহেশ্বর মুর্মু। জনশিক্ষা সম্প্রসারণ মন্ত্রী নন্দরানী ডল, স্বাধীনতা সংগ্রামী সুশীলচন্দ্র ধাড়া ও মুখ্যসচিব। ছবি—অরিজিৎ ভট্টাচার্য

যাত্রা শুরুর সেই দিনটিতে তমলুকের রাখাল মেমোরিয়াল ফুটবল ময়দানের রঙিন ঝলমলে অনুষ্ঠানে অগণিত মানুষের বিপুল সমাগম আর উচ্ছাসই বুঝিয়ে দিয়েছিল, মেদিনীপুর জেলাকে বিভাজিত করে মানুষের দীর্ঘদিনের এক আকাঙ্ক্ষাকে রাজ্য সরকার রূপায়ণ করল। ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি।

হাওড়া পেরিয়ে রূপনারায়ণের ওপর শরৎ সেতু দিয়ে কোলাঘাট ঢোকার মুখেই ছিল সাইনবোর্ড। তাতে লেখা, 'পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সুস্বাগতম'। তারপর মেচেদা থেকে তমলুক যাওয়ার রাস্তায় প্রতিটি জনবহুল জায়গায় সামান্য দূরত্বের ব্যবধানেই পরপর তোরণ অনেকগুলি। বিভিন্ন সংস্থার। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের। মেচেদা-তমলুকের রাস্তার দুধারে সর্বত্র মানুষের ভিড়। যেন উৎসব। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। তাতে শামিল আবালবৃদ্ধবনিতা। ভিড়ের ঠিকানা রাখাল মেমোরিয়াল ফুটবল ময়দান। সেটা তখন জনসমুদ্র। প্রথমে ফলক উন্মোচন। তারপর মঞ্চজুড়ে টাঙানো চাররঙা বিশাল মানচিত্রটির আবরণ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরিয়ে দিতেই চারদিকে অগণিত মানুষের করতালিতে পরিবেশ মুখর। আতসবাজির শব্দ। ব্যান্ড-বাঁশির

সুরে দেশাত্মবোধক গানের কলি। পূর্ব মেদিনীপুর নামে রাজ্যের ১৯তম জেলার জন্ম এভাবেই সেদিন।

শুরুর আগে সলতে পাকানোর পর্ব ভুললে চলবে না।

মেদিনীপুর জেলাকে বিভাজনের দাবি ছিল অনেকদিনের। ৯০ বছর আগে ব্রিটিশরাও চেয়েছিল এই জেলা ভাগ করতে। তবে, সেটা ছিল ওদের নিজেদের স্বার্থে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের শীর্ষস্থানাধিকারী জেলার অন্যতম ছিল মেদিনীপুর সেই সময়। তাই জেলা ভাগ করে ব্রিটিশরা চেয়েছিল নিজেদের শাসন-শোষণের পথে বাধা অপসারণ করতে। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র শাসমলের মত ব্যক্তিত্বরা তাই আপত্তি করেছিলেন।

কিন্তু এবার মেদিনীপুর জেলাকে ভাগ করার যে দাবিকে মর্যাদা দিল রাজ্য সরকার, সেই দাবি ছিল জনগণের। এখানকার মানুষের। এখনকার পরিপ্রেক্ষিত আলাদা। উন্নয়নের প্রশ্ন। প্রশাসনকে আরও জনমুখী করার প্রশ্ন। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে সিদ্ধান্ত হয়েছিল ১৮৭২ সালের মেদিনীপুরকে ভাগ করার। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি। ১৯৮৩ সালে তিন সদস্যবিশিষ্ট প্রশাসনিক সংস্কার কমিটিও স্পষ্ট রায় দেয়, মেদিনীপুর জেলাকে ভাগ করার। তারপর দাবি, আলোচনা, মতামত প্রকাশ ইত্যাদি চলছিলই।

১৯৯৭ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মেদিনীপুর বিভাজনের পক্ষে সরকারি অভিমত জানিয়েছিলেন। ২০০১ সালের ৫ জুলাই বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, মেদিনীপুর জেলা ভাগ করা হবে এবার। এরপর প্রক্রিয়া শুরু। জনপ্রতিনিধিদের অভিমত, প্রশাসনিক সুবিধা-অসুবিধা খতিয়ে দেখা, ২০০১ সাল জুড়ে হয়েছে অগণিত বৈঠক সরকারি স্তরে। অতঃপর ২০০১ সালের ১৮ আগস্ট মেদিনীপুরে গিয়ে জেলাশাসকের কার্যালয়ে সর্বদলীয় সভায় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পেশ করেছিলেন মেদিনীপুর জেলা বিভাজনের চূড়ান্ত রূপরেখা।

সেই রূপরেখায় ছিল, মেদিনীপুর জেলাকে আপাতত দুভাগে ভাগ করে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর নামে দুটো জেলা হবে। পশ্চিম মেদিনীপুরে থাকবে চারটে মহকুমা। এগুলি হলে মেদিনীপুর (সদর), খড়্গপুর, ঝাড়গ্রাম ও ঘাটাল। এই জেলার সদর কেন্দ্র হবে মেদিনীপুর। পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতেও থাকবে চারটি মহকুমা। এগুলির মধ্যে তমলুক, হলদিয়া, কাঁথি ছাড়াও চতুর্থ মহকুমা হবে এগরা। তখন এগরা নামে কোনও মহকুমা ছিল না অবিভক্ত মেদিনীপুরে। জেলা বিভাজনের রূপরেখায় কাঁথি মহকুমাকে ভেঙে এগরা নামে নতুন মহকুমার কথা বলা হয়েছিল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সদর করার প্রস্তাব ছিল তমলুককে। একটি মাত্র রাজনৈতিক দল ছাড়া সব রাজনৈতিক দলেরই সায় মিলেছিল জেলা বিভাজনের এই রূপরেখায়।

সর্বদলীয় সেই বৈঠকের সময়কালে রাজ্য প্রশাসনের হাতে ছিল ১৯৯১ সালের জনগণনার রিপোর্ট। সেই অনুযায়ী প্রস্তাবিত রূপরেখায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ৪৪ লক্ষ ৮৬ হাজার ২৭৯ জন ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ৩৯ লক্ষ ৫ হাজার ৬৩৩ জন বাসিন্দার হিসাব ছিল। পশ্চিম মেদিনীপুরে ২৯টি ব্লক, ২১টি থানা, ২১টি বিধানসভা কেন্দ্র। পূর্ব মেদিনীপুরে ২৫টি ব্লক, ১৬টি থানা, ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্র।

১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী তখন অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় ৯৭ লক্ষ জনসংখ্যা হলেও, ধরাই যায় তখন প্রায় ১ কোটি জনসংখ্যা হয়ে গিয়েছিল। ১ কোটি জনসংখ্যার অর্থ দেশের মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ তখন মেদিনীপুর জেলায়। বিশাল আয়তনের ওই জেলায় এত বিপুল মানুষকে প্রশাসনিক পরিষেবা দেওয়ার যে সমস্যা, সেটা উপলব্ধি করেই জেলা বিভাজন। সর্বদলীয় সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছিলেন, জনমুখী প্রশাসনকে মানুষের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই মেদিনীপুর জেলাকে আপাতত দুই ভাগ করার প্রস্তাব।

দুটো দাবি অবশ্য উঠেছিল। প্রথমত, গড়বেতাকে মহকুমা করার দাবি। রাজ্য সরকার জানিয়ে দিয়েছিল, জনসংখ্যা ও আয়তন উভয় দিক থেকেই কাঁথি মহকুমাকে ভেঙে কাঁথি এ এগরা নামে দুটো মহকুমা করা হয়েছে। সেই সময় কাঁথির জনসংখ্যা হয়েছিল ১৯৯১ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০ লক্ষ ৩২ হাজার ৭৩৫ জন। দ্বিতীয় যে দাবি উঠেছিল, তা হল কাঁথিকে আলাদা জেলা হিসাবে ঘোষণা করা। মুখ্যমন্ত্রী সেদিনই বলেছিলেন, কাঁথির মানুষের যে আবেগ ও যুক্তি আছে, সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু কাঁথির মানুষের কাছে আমার আবেদন, আপনারাও বাস্তবতা বুঝতে চেষ্টা করুন। আর্থিক সমস্যা আছে। পরিকাঠামো গড়ার প্রশ্ন আছে। আরও অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। আশাকরি কাঁথির মানুষ সীমাবদ্ধতা বুঝবেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাবও সেদিন দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাম্রলিপ্ত বা অন্য কোনও নাম না রেখে প্রস্তাবিত জেলার নাম পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব মেদিনীপুর রাখা হবে কেন? শ্রীভট্টাচার্য বলেছিলেন, উভয় এলাকার মানুষই মেদিনীপুর নামটির সঙ্গে যে ঐতিহ্য ও গৌরব জড়িয়ে আছে, তা বহন করতে চান। তাই মেদিনীপুর নামটি রেখেই পূর্ব ও পশ্চিম দুটো জেলা। জেলা বিভাজিত হলেই আর্থ সামাজিক উন্নতি হবে কিনা, এই প্রশ্নও সেদিন মুখ্যমন্ত্রীকে করেছিলেন সাংবাদিকরা। তিনি বলেছিলেন, প্রশাসন বা জেলা ভাগ করলেই আর্থসামাজিক উন্নতি হয় না। কিন্তু পরিস্থিতির বাস্তবতা বিচার করে জেলা বিভাজিত হলে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের যে প্রক্রিয়ায় চলছে এখন, তা ত্বরান্বিত হবে, সহজতর হবে।

অতঃপর ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি মেদিনীপুর বিভাজিত হয়ে জন্ম হয় রাজ্যের ১৯তম জেলা পূর্ব মেদিনীপুরের।

লেখক : বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রবন্ধকার

সুবর্ণরেখা নদীর আশপাশে প্রাপ্ত মধ্যাশ্মীয় আয়ুধ

মেদিনীপুর জেলায় প্রস্তর যুগের নিদর্শন ঃ একটি আলোচনা

প্রকাশচন্দ্র মাইতি

অবিভক্ত মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা। আয়তনে এই জেলা প্রায় ১৩৬১৯.১৫ বর্গকিলোমিটার। এই জেলা ২১°৩৬′ থেকে ৩৫°৩৭′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৩৩′ থেকে ৮৮°১১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। এই জেলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশ বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্বে প্রসারিত অংশবিশেষ, যা প্রাগেতিহাসিক সংস্কৃতির সমৃদ্ধশালী ক্ষেত্ররূপে বিবেচিত। এই জেলার পূর্বে ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) ও হাওড়া জেলা, ভাগীরথীর নিম্নাংশ বা হুগলি নদী এবং রূপনারায়ণের পূর্ব বা উত্তর-পূর্বের সীমান্তরেখা, পশ্চিমে বিহার এবং ওড়িশা, উত্তরে বাঁকুড়া, উত্তর-পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

নদনদী ও ভূপ্রকৃতি : এই জেলার পূর্বাংশে অর্থাৎ ঘাটাল, তমলুক, হলদিয়া ও সন্নিহিত অঞ্চল—রূপনারায়ণ, হলদি এবং হুগলি নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে গঠিত। সমুদ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় ১০-১২ মিটার। জেলার পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শক্তমাটি বা পাথুরে বোল্ডারের প্রাচুর্য লক্ষ করার মতো। এই অঞ্চলে ছোট ছোট পাহাড় বা টিলা (Archan Rock) যা উচ্চতায় প্রায় ৩০০ মিটার। জেলার সর্বদক্ষিণে অর্থাৎ কাঁথি, দীঘা প্রভৃতি অঞ্চল সমুদ্র তীরবর্তী হওয়ায় মাটি লবণাক্ত। কাঁথি মহকুমা অঞ্চলে বালিয়াড়ি আছে। জেলার মধ্যবর্তী অঞ্চল আঠালো মাটি বা এঁটেল মাটিতে বালির ভাগ কম। এই জেলার প্রধান প্রধান নদনদীগুলি হল
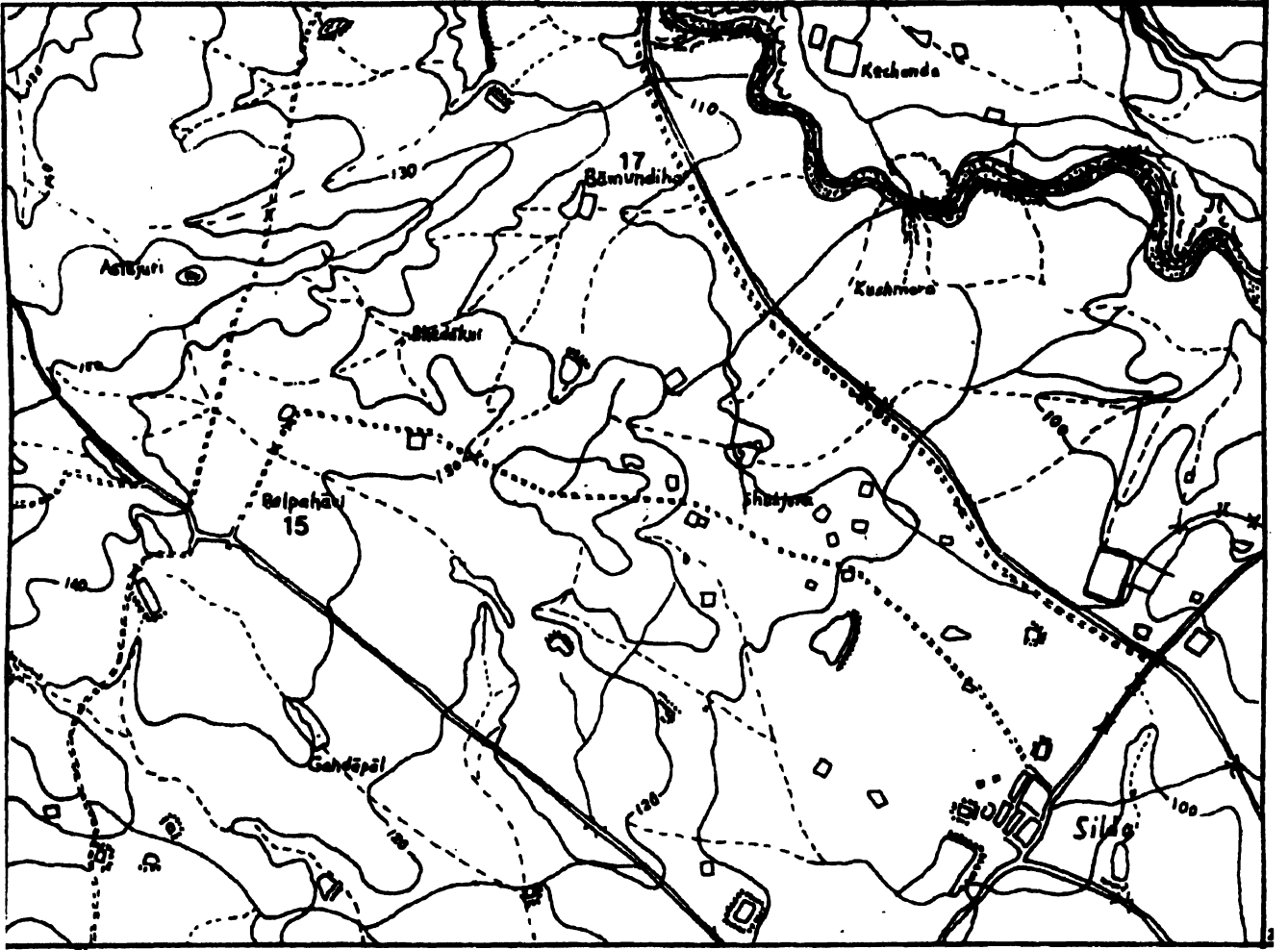
তারাফেনী নদী উপত্যকা ও সংলগ্ন ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চল যেখানে প্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া যায়

হুগলি, রূপনারায়ণ, হলদি, কেলেঘাই, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, তারাফেনী, শীলাবতী, ডুলুং, শিলাই, পাবাং, রসুলপুরের নদী ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে (বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর) গ্রানাইট শিলা বিরাজমান এবং এর সঙ্গে সঙ্গে ফিলাইট মাইকাসিস্টের আধিক্য উল্লেখযোগ্য। মাইকাসিস্ট ও ফিলাইটের মধ্যে আছে কোয়ার্জ ও কোয়ার্জাইট। প্রস্তর যুগের হাতিয়ারগুলি মূলত কোয়ার্জাইট (Quartize) পাথরের তৈরি।

জলবায়ু, উদ্ভিজ : এই জেলার পূর্বাংশ পলিমাটি দিয়ে তৈরি, তাই মাটিতে ধান, গম, ডাল বিভিন্ন রকমের রবিশস্য শাকসবজি, নারকেল, পান, সরষে প্রভৃতি ফলনের প্রাচুর্য আছে। তেমনি পশ্চিমাঞ্চলে শক্ত পাথুরে মাটিতে শাল, পলাশ, কুসুম, মহুয়া, পিয়াশোলের সমারোহ লক্ষ করা যায়।

জেলার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১৫০—১৬০ সেমি, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর ফলে বৃষ্টি হয়ে থাকে। এই বায়ুর প্রভাবে ৭৫—৮৫ শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়। আর্দ্রতা প্রায় ৭০—৯০ শতাংশ। শীতকালে গড় উষ্ণতার পরিমাণ ১২° সেন্টিগ্রেড থেকে ২৫° সেন্টিগ্রেড। গ্রীষ্মকালে উষ্ণতার পরিমাণ ৩০° থেকে ৪০° সেন্টিগ্রেড।

প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যকলাপ : এই জেলা প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে খুবই সমৃদ্ধ। জেলার অধিকাংশ অঞ্চল থেকে কমবেশি নানা ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। বিভিন্ন সময়ে বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং ক্ষেত্রানুসন্ধানী গবেষক নানা ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। তাঁদের মধ্যে অশোককুমার ঘোষ, পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম ভট্টাচার্য, অশোক দত্ত, ডি রায়, বিশ্বনাথ সামন্ত, সুধীন দে, বিষ্ণুপ্রিয়া বসাক, জি এল বাদাম, এস এন রাজগুরু, ডি কে চক্রবর্তী, রূপেন চট্টোপাধ্যায়, ডি কে রায়, তারাপদ সাঁতরা, গৌতম সেনগুপ্ত, প্রণব রায়, প্রশান্তকুমার মণ্ডল, অরবিন্দ মাইতি প্রমুখ।

মেদিনীপুর জেলার প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি পর্বের রূপরেখা টানতে গেলে মূলত এই জেলার আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু, বিভিন্ন সময়ে অনুসন্ধান ও উৎখননের তথ্যাবলী এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলির উপর নির্ভর করতে হয়। সংগৃহীত প্রত্নবস্তু ও তথ্যগুলির থেকে মেদিনীপুর জেলার সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একটি পরিষ্কার চিত্র বেরিয়ে আসে। প্রস্তর যুগের প্রথম ভাগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এই জেলার

সাংস্কৃতিক পর্বের গতি কোনদিন থমকে দাঁড়ায়নি। আনুমানিক ১৫০০০০ বছর আগে থেকে এই জেলার সাংস্কৃতিক বিবর্তনের যাত্রা শুরু হয়। জেলার সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, তারাফেনী নদী অববাহিকায় আবিষ্কৃত প্রস্তর যুগের নিদর্শনেই প্রমাণ করে এর প্রাচীনত্ব। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয়ে মজুত প্রস্তর নিদর্শনগুলির উপর ভিত্তি করে ও বিভিন্ন গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যবলী নিয়ে এই রচনা।

নদীর বাঁকে উন্মুক্ত আদি শিলা বিন্যাস ও টেরাস যা ছিল আদিম মানুষের বিচরণ ক্ষেত্র

আবিষ্কৃত প্রস্তর নিদর্শন ও প্রত্নস্থল : মেদিনীপুর জেলার প্রস্তরযুগের নিদর্শনগুলি মূলত নদী উপত্যকাগুলি থেকে পাওয়া গেছে। সুবর্ণরেখা নদী উপত্যকা অঞ্চলে প্রায় শতাধিক প্রত্নস্থল থেকে নিদর্শনগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সকল প্রত্নস্থলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

বনকাটি : ২২°৩৬′ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৮৬°৫৯′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত এই প্রত্নস্থলটি ঝাড়গ্রাম মহকুমার সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত। এখান থেকে শতাধিক প্রস্তর যুগের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। কোয়ার্জাইট পাথরের তৈরি নিম্ন প্রস্তর যুগ, মধ্য প্রস্তর যুগ ও মধ্যাশ্মীয় ক্ষুদ্রাকৃতি আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত হাতিয়ারগুলি হল—হাতকুঠার, চাঁচনী, ছেদনী প্রভৃতি।

চুয়াগড়া : (২২°১১′ উঃ অঃ ও ৮৬°৪৫′ পূঃ দ্রাঃ) ঝাড়গ্রাম থানার গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত। এখান থেকে প্রায় শতাধিকের বেশি প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। অধিকাংশ হাতকুঠারগুলি কোয়ার্জাইট পাথরের তৈরি। মধ্যাশ্মীয় ফলা, (Blade) চাঁচনী তীরের ফলাগুলি চার্ট পাথরের তৈরি। নবাশ্মীয় বেলেপাথরের তৈরি হাতকুঠারও এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে।

ছোটতুর্কি : (২২°১৩′ উঃ অঃ—৮৬°৫৫′ পূঃ দ্রাঃ) ঝাড়গ্রাম মহকুমার গোপীবল্লবভপুর থানার এই গ্রামে নিম্নপ্রস্তর যুগ ও মধ্যাশ্মীয় যুগের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। মধ্যাশ্মীয় চার্ট পাথরের আয়ুধগুলি হল তীরের ফলা, ব্লেড এবং চাঁচনীই মুখ্য।

ধানশোল : (২২°৮′ উঃ অঃ এবং ৮৬°৫৪′ পূঃ দ্রাঃ) এটি ঝাড়গ্রাম মহকুমার গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত। এখান থেকে নিম্ন, মধ্য এবং উচ্চ পুরাপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। কোয়ার্জাইট পাথরের তৈরি অস্ত্রগুলি হল হাতকুঠার, চাঁচনী, ছেদনী প্রভৃতি। মধ্যাশ্মীয় চার্ট পাথরের আয়ুধগুলি হল চাঁচনী, ছেদক, ফলা প্রভৃতি।

ডোকি : (২২°৪′ উঃ অঃ এবং ৮৭°৩০′ পূঃ দ্রাঃ) এই গ্রামটি ঝাড়গ্রাম মহকুমার নয়াগ্রাম থানার অন্তর্গত। এখান থেকে বহু প্রস্তরযুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। এগুলি নিম্নপুরাপ্রস্তর থেকে নবাশ্মীয় যুগের। নিম্নপুরাপ্রস্তর যুগের কোয়ার্জাইট পাথরের তৈরি হাতিয়ারগুলি হল হাতকুঠার, তীরের ফলা, চাঁচনী প্রভৃতি। উচ্চপুরাপ্রস্তরযুগের চার্ট পাথরের তৈরি হাতিয়ারগুলি হল চাঁচনী, ফলা। মধ্যাশ্মীয় যুগের একই পাথরের তৈরি হাতিয়ারগুলি হল ছেদক, ফলা, তীরের ফলা প্রভৃতি। নবাশ্মীয় যুগের বেলে পাথরের তৈরি একটি হাতকুঠার এখান থেকে পাওয়া গেছে।

ঘোড়াপিঞ্চা : (২২°১০′ উঃ অঃ—৮৬°৫০′ পূঃ দ্রাঃ) প্রত্নস্থলটি ঝাড়গ্রাম মহকুমার গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত এখান থেকে নিম্নপুরাপ্রস্তর যুগ থেকে নবাশ্মীয় যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রস্তর নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। নিম্নপ্রস্তর যুগের কোয়ার্জাইট পাথরের তৈরি হাতকুঠার, ক্লিভার এবং পেবল্ টুল পাওয়া গেছে। মধ্য পুরাপ্রস্তর যুগের কোয়ার্জাইট পাথরের তৈরি হাতকুঠার, তীরের ফলা প্রভৃতিও মধ্যাশ্মীয় যুগের ফলা তীরের ফলা প্রভৃতি অস্ত্র চার্ট পাথরের তৈরি। তাছাড়া Agate ও Jasper পাথরের তৈরি চাঁচনী পাওয়া গেছে। নবাশ্মীয় যুগের হাতকুঠারের নিদর্শনও সংখ্যায় কম নয়।

হাতিবাড়ি : ঝাড়গ্রাম মহকুমার গোপীবল্লভপুর থানার এই গ্রামটি ২২°১৩′ উঃ অঃ থেকে ৮৬°৪৪′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। এখান থেকে নিম্ন পুরাপ্রস্তর যুগের হাতকুঠার কর্তকী প্রভৃতি হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। হাতিয়ারগুলি কোয়ার্জ পাথরের তৈরি। এখান থেকে নবাশ্মীয় হাতকুঠারও পাওয়া গেছে। পুরাপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারগুলি ইংরাজি ‘U’ এবং ‘V’

অঙ্করের মতো। এখান থেকে অ্যাভাবেলিয়ান ও অ্যাসুলিয়ান দুই প্রকারের হাতিয়ারই পাওয়া গেছে।

হাতিমারা : (২২°১৩′ উঃ অঃ থেকে ৮৬°৩০′ পূঃ দ্রাঃ) এটি ঝাড়গ্রাম মহকুমার গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত। এখান থেকে নিম্নপুরাপ্রস্তর যুগের কোয়ার্জ পাথরের হাতকুঠার ও ছেদনী, মধ্যাশ্মীয় যুগের চার্ট পাথরের ব্লেড ও চাঁচনী পাওয়া গেছে। নবাশ্মীয় যুগের বেলেপাথরের গোলাকার প্রত্নবস্তু, ছেনি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

জামাগড়া : (২২°১১′ উঃ অঃ থেকে ৮৬°৪৭′ পূঃ দ্রাঃ) ঝাড়গ্রাম থানার গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত এই প্রত্নস্থল থেকে নিম্নপুরাপ্রস্তর ও মধ্যপুরাপ্রস্তর যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। হাতিয়ারগুলি কোয়ার্জ ও কোয়ার্জাইট পাথরের তৈরি।

করকাটা : (২২°৪২′ উঃ অঃ এবং ৮৭°৫′ পূঃ দ্রাঃ) ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্গত বিনপুর থানায় অবস্থিত এই প্রত্নস্থলটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের উল্লেখযোগ্য স্থান। এখান থেকে বহু প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। পুরাপ্রস্তর ও মধ্যাশ্মীয় আয়ুধের পরিমাণই সবচেয়ে বেশি। এখান থেকে নবাশ্মীয় কোনও প্রস্তর নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি। নিম্নপুরাপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারগুলির মধ্যে হাতকুঠার, কর্তনী, ছেদনী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
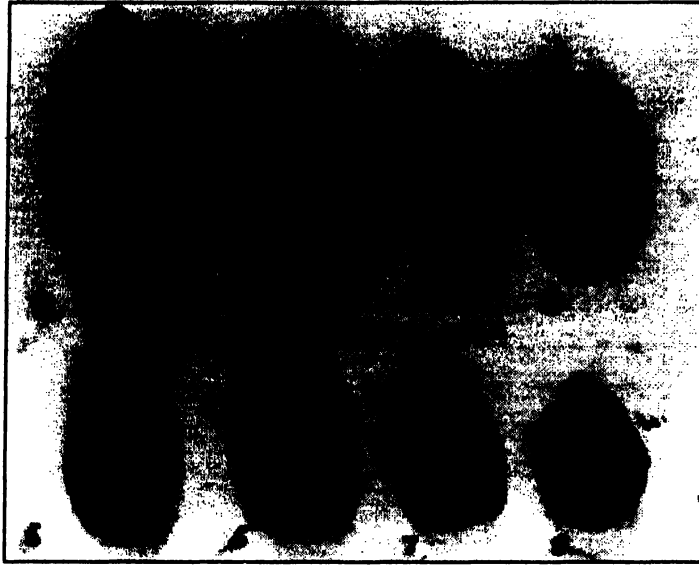
পুরা প্রস্তর যুগের বিভিন্ন হাতিয়ার

কয়াশোল : (২২°৭′ উঃ অঃ থেকে ৮৬°৫৩′ পূঃ দ্রাঃ) ঝাড়গ্রাম মহকুমার গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত এই গ্রাম থেকে বেশ ভাল পরিমাণে প্রস্তরায়ুধ পাওয়া গেছে। এখানে নিম্নপুরাপ্রস্তর, মধ্যপুরাপ্রস্তর ও মধ্যাশ্মীয় যুগের হাতিয়ারের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই আয়ুধগুলি কোয়ার্জ, চার্ট ও বেলেপাথরের তৈরি। হাতকুঠার, কর্তনী, চাঁচনীই হল প্রধান প্রধান হাতিয়ার। মধ্যাশ্মীয় যুগের চাঁচনী, ব্লেড ও তীরের ফলা উল্লেখযোগ্য।

কেন্দে ঝরিয়া : ২২°১৮′ উঃ অক্ষ ও ৮৬°৫৭′ পূঃ দ্রাঃ মধ্যে অবস্থিত এই প্রত্নস্থলটি ঝাড়গ্রাম থানার অন্তর্গত। এখান থেকে নিম্নপুরাপ্রস্তর, মধ্যপুরাপ্রস্তর ও মধ্যাশ্মীয় প্রস্তরায়ুধ পাওয়া গেছে। হাতকুঠার, চাঁচনী, ছেদনী প্রভৃতি আয়ুধ কোয়ার্জাইট পাথরের তৈরি। মধ্যাশ্মীয় যুগের চাঁচনী, তীরের ফলা, ব্লেড, ত্রিকোণাকৃতি প্রস্তরায়ুধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলি চার্ট পাথরের তৈরি।

কুরচীবনী : ২২°১০′ উঃ অঃ থেকে ৮৭°৫২′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত এই প্রত্নস্থলটি ঝাড়গ্রাম মহকুমার নয়াগ্রাম থানার অন্তর্গত। এখান থেকে নিম্ন পুরাপ্রস্তর ও মধ্যাশ্মীয় আয়ুধ পাওয়া গেছে। এগুলি কোয়ার্জ পাথরের ও মধ্যাশ্মীয় আয়ুধগুলি চার্ট পাথরের তৈরি। আয়ুধগুলির মধ্যে হাতকুঠার, তীরের ফলা, Burin, ফলা, চাঁচনী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কুকুমবেরিয়া : এই প্রত্নস্থলটি ২২°১১′ উঃ অঃ থেকে ৮৬°৫′ পূঃ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। এটি ঝাড়গ্রাম মহকুমার গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত। এই প্রত্নস্থল থেকে নিম্নপুরাপ্রস্তর এবং মধ্যাশ্মীয় সংস্কৃতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। মধ্যাশ্মীয় সংস্কৃতির চাঁচনী Blade, তীরের ফলা প্রভৃতি হাতিয়ার পাওয়া গেছে, যেগুলি চার্ট পাথরের তৈরি।

মাচাবন্ধ : ২২°৯′ উঃ অক্ষাংশ থেকে ৮৭°৩০′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত এই প্রত্নস্থল থেকে পুরাপ্রস্তর, মধ্যপ্রস্তর এবং নব্যপ্রস্তর যুগের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। কোয়ার্জাইট পাথরের তৈরি নিম্নপুরাপ্রস্তর যুগের হাতকুঠার (pebble tool) প্রভৃতি হাতিয়ার পাওয়া গেছে। মধ্যাশ্মীয় চার্ট পাথরের আয়ুধও পাওয়া গেছে। নবাশ্মীয় যুগের হাতিয়ার বলতে বেলে-পাথরের তৈরি গোলাকৃতি পাথরের বস্তু (Ring Stone) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থল :

১। মন্টাবেনি	ঝাড়গ্রাম মহকুমা	থানা জামবনি
২। পায়রাকুলি	ঐ	থানা গোপীবল্লভপুর
৩। পানবরজ	ঐ	ঐ
৪। পানিশোল	ঐ	ঐ
৫। ফুলডিহা	ঐ	নয়াগ্রাম
৬। পড়াপেটা	ঐ	গোপীবল্লভপুর
৭। পূর্ণপানি	ঐ	ঐ
৮। রায়বনি	ঐ	ঐ
৯। শালগেড়িয়া	ঐ	ঐ

সিলদার নিকট তারাফেনির ক্ষয়িষ্ণু উপত্যকায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো রয়েছে প্রস্তর যুগের হাতিয়ার

প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সীমান্ত করা হয়েছিল সভ্যতা রচনার বহুকাল পরে। বর্তমানে আবার প্রশাসনিক সুবিধার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর নামে দুটো পৃথক জেলার নাম নিয়েছে। যাই হোক এক সময়ে পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলা ও বীরভূম এবং বর্ধমানের পশ্চিম অংশ একই ভৌগোলিক সীমায় একরকম সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু ও গবেষণাগুলি তারই প্রমাণ করে। আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক আয়ুধগুলি প্রায় একই পাথরের তৈরি যা বৃহত্তর ভৌগোলিক সীমায় বিভিন্ন সময়ে পাওয়া গেছে। সভ্যতার বিকাশ বা মানুষের বসবাসের জন্য ন্যূনতম যা প্রয়োজন প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের কাছে এই জেলার ভূখণ্ড অনুকূল ছিল। পর্যাপ্ত নদীবাহিত মিষ্টি জল নদী অববাহিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথর প্রভৃতি সবই আদি মানবের হাতের কাছে ছিল, থাকার জন্য পাহাড়ের গুহা বা নিজেদের বন্য হিংস্র জন্তুজানোয়ারের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাসস্থান সবই এই জেলার ভূখণ্ডে ছিল।

আদি পুরাপ্রস্তর যুগের পরবর্তী সমস্ত সাংস্কৃতিক ধাপে সভ্যতার চাকা থমকে দাঁড়ায়নি। আদি-মধ্য-উচ্চ-মধ্যাশ্মীয়-নবাশ্মীয়, তাম্রাশ্মীয় ও তার পরবর্তী আদি ঐতিহাসিক সমস্ত ধাপেই এই জেলা সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর ছিল। জেলার অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থলগুলি হল তমলুক, পান্না, নাটশাল, তিলদাগঞ্জ, বাহিরী, এগরা প্রভৃতি। এই প্রত্নস্থলগুলি থেকে প্রস্তরযুগের সভ্যতার বিশেষ নিদর্শন না পাওয়া গেলেও পরবর্তী আদি ঐতিহাসিক—ঐতিহাসিক সভ্যতার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার রচিত হয়েছিল।

তমলুক হল মেদিনীপুর জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে সমৃদ্ধতম স্থান। সুদূর নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে এই প্রত্নস্থল ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। এক সময়ে সারা বিশ্বে এখান থেকে বিভিন্ন রকমের পণ্য আসতো যেতো সে তো ঐতিহাসিক দলিল দেখলে জানা যায়। আজও এর গুরুত্ব হারায়নি। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে এখান থেকে এক স্বাধীন সরকার পরিচালিত হয়েছিল। বর্তমানে তমলুক পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলা সদর। যাই হোক তাম্রলিপ্ত থেকে তমলুক। আগামীদিনেও এর গুরুত্ব বাড়তে থাকবে বুঝি গুরুত্ব কমবে না। এই প্রত্নস্থলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ,

সুবর্ণরেখা নদী অববাহিকার প্রত্নস্থল ছাড়া সসরা, তালডাঙ্গরা, তেনলাত, টিকায়েতপুর, উরুভঙ্গ, অষ্টাজুরী, অমর্ষি, বরাভূম, বালুড়ি, বাহারাশোল, চম্পাখাল, চম্পাহাটি, গড়বেতা, গিধনি, গোপাগৃহ, কালগাঁও, কুঁকড়াখুপি, কর্ণগড়, লালগড়, শালবনি, সাপকোটা পাহাড়, ভেলিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রাগৈতিহাসিক মেদিনীপুর বাংলার অন্যান্য জেলা থেকে সমৃদ্ধ ছিল। জেলার ইতিহাস আজ থেকে প্রায় ১৪০০০০ বছর আগে শুরু হয়েছিল। গঙ্গার পূর্ব পাড়ের জেলাগুলি যখন তৈরি হয়নি তার বহু আগে থেকে এই জেলার ভূখণ্ড তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যদিও বা আজকের ভৌগোলিক মেদিনীপুর

●

তমলুক হল মেদিনীপুর জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে সমৃদ্ধতম স্থান। সুদূর নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে এই প্রত্নস্থল ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। এক সময়ে সারা বিশ্বে এখান থেকে বিভিন্ন রকমের পণ্য আসতো যেতো সে তো ঐতিহাসিক দলিল দেখলে জানা যায়। আজও এর গুরুত্ব হারায়নি। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে এখান থেকে এক স্বাধীন সরকার পরিচালিত হয়েছিল।

●

মধ্যপ্রস্তর যুগের ক্ষুদে হাতিয়ার

অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক উৎখনন করেন।

তিলদাগঞ্জ এবং বাহিরীতে বিভিন্ন সময়ে অনুসন্ধানমূলক কাজ হয়েছে বটে, ব্যাপকভাবে উৎখনন বা কাজ হয়নি। ১৯৯৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পরীক্ষামূলক উৎখনন চালিয়েছিল। তার আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের তদানীন্তন কিউরেটর কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীও উৎখনন চালিয়েছিলেন। এই প্রত্নস্থল থেকে আদি ঐতিহাসিক ও তৎপরবর্তীকালের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রস্তর যুগের কোনও নিদর্শন না পাওয়ার জন্য আলোচনা সংক্ষিপ্ত করা মনে হয় প্রয়োজন।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রত্নতত্ত্বে অনুরাগী পণ্ডিত গবেষক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পর্যায়ের গবেষণা করেছেন ও করছেন। আগামীদিনে প্রত্নতত্ত্বের আলোয় আরো উজ্জ্বল হবে আশা রাখি।

অপর উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থল হল নাটশাল। তমলুক থেকে খুব বেশি দূর নয়। এখানে এককালে গ্রাম্য তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল বোঝা যায়। আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু ও পণ্ডিতদের গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পরীক্ষামূলক উৎখনন চালায়। অমল রায়, এস বি ওটা, গৌতম সেনগুপ্ত প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিক বিভিন্ন সময়ে

অবিভক্ত মেদিনীপুর ভূখণ্ড অতীত থেকে বর্তমান—একটি চলন্ত গতিশীল জীবন। এই জেলায় শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রতিবাদী আন্দোলন, কৃষি উৎপাদন, শিল্পায়ন কোনদিন স্তব্ধ হয়নি, হবে না। এই জেলার অগ্রগতির এক নাম কোলাঘাট, অগ্রগতির একনাম হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল, অগ্রগতির আর এক নাম শিক্ষা-সংস্কৃতি-ভাষা, অন্য যেকোনও জেলার থেকে এক কদম এগিয়ে আছে এবং থাকবে। এক লক্ষ চল্লিশ হাজার বছর আগে যে সাংস্কৃতিক বিবর্তন শুরু হয়েছিল আজও এগিয়ে চলেছে চলবে। মেদিনীপুরের আরো উন্নয়ন অব্যাহত থাকুক, আরো শিক্ষা, আরো শিল্প, আরো সংস্কৃতি গতিশীল হোক, নিদর্শন হয়ে থাকুক ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

●

অবিভক্ত মেদিনীপুর ভূখণ্ড অতীত থেকে বর্তমান—একটি চলন্ত গতিশীল জীবন। এই জেলায় শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রতিবাদী আন্দোলন, কৃষি উৎপাদন, শিল্পায়ন কোনদিন স্তব্ধ হয়নি, হবে না। এই জেলার অগ্রগতির এক নাম কোলাঘাট, অগ্রগতির একনাম হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল, অগ্রগতির আর এক নাম শিক্ষা-সংস্কৃতি-ভাষা, অন্য যেকোনও জেলার থেকে এক কদম এগিয়ে আছে এবং থাকবে।

●

সূত্র :

১। প্রত্নসমীক্ষা—১—৮—প্রত্নতত্ত্ব অধিকার পঃ বঃ সরকার
২। পুরাবৃত্ত-১ ঐ
৩। Stone Age tools—H. D. Sankalia
৪। Encyclopedia Indian Archaeology—A. Ghosh
৫। IAR 1980-81—86—ASI

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

প্রদীপকুমার মিত্র, সুব্রত নন্দী, মিন্টু চক্রবর্তী, বাদলচন্দ্র দাস, অমল রায়, শিউলি মাইতি, বিশ্বনাথ বেরা, প্রত্নতত্ত্ব অধিকর্তা গৌতম সেনগুপ্ত, অজিতকুমার মণ্ডল, সাগর চট্টোপাধ্যায়, স্বর্গীয় অনিলচন্দ্র পাল প্রমুখ এই লেখাটি লিখতে সাহায্য করেছেন।

লেখক : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গবেষক

দন্তেশ্বর শিব মন্দির, কর্ণগড় ছবি : তারাপদ সাঁতরা

মেদিনীপুর জেলার প্রাচীনত্ব

প্রণব রায়

মেদিনীপুর শুধুমাত্র একটি জেলা নয়, অখণ্ড ভারতের বিভিন্ন যুগপর্বের সংস্কৃতিধারার এক অন্যতম কেন্দ্র যার উদ্ভব সুপ্রাচীন কালের কোনও এক দিগন্তে নিহিত। এক নির্দিষ্ট ভৌগোলিক গণ্ডীতে আবদ্ধ বর্তমান মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের দুটি পৃথক ভূবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতো। পশ্চিমের বিশাল অংশ পার্বত্য ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্বপ্রান্তের ছোঁয়ায় ঢেউ খেলানো, রুক্ষ এবং অরণ্যসমাকুল যার বেশ কিছু অংশের ওপর পড়েছে প্রাচীন পাললিক আস্তরণ, অন্যদিকে এই জেলার পূর্বাংশ হুগলি নদী ও তার শাখা রূপনারায়ণ নদের পলিসঞ্চয়ে গঠিত হয়েছে। এই অঞ্চল একসময় নিম্নবঙ্গের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই একে 'নবভূমি' (নিউ অ্যালুভিয়ম) বলা যায়—দক্ষিণ বা নিম্নবঙ্গের হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, নদিয়া প্রভৃতি জেলা এই 'নবভূমি'র অন্তর্ভুক্ত। মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চল সীমান্ত পশ্চিমবাংলার তথা পূর্বভারতের সুপ্রাচীন 'পুরাভূমি'র (ওলড্ অ্যালুভিয়ম) অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই অংশ অতি প্রাচীন। পূর্বভারতে এই পুরাভূমির বিস্তার রাজমহলের দক্ষিণ থেকে আরম্ভ করে সর্বদক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত। এই পুরাভূমির মধ্যে রাজমহল, সাঁওতালভূম, মানভূম, সিংভূম, সীমান্ত পশ্চিমবাংলার মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, ধলভূমের পূর্বাংশ, ময়ূরভঞ্জ, কেয়ঞ্ঝড় ও বালেশ্বর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পড়ে। মাকড়া পাথরের স্তরযুক্ত

উঁচুনীচু গেরুয়া রঙের কঠিন কাঁকরে মাটির এইসব এলাকা। স্থানে স্থানে নীচু পাহাড়িয়া অঞ্চল ও গভীর জঙ্গল। মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠে ও মাটির নীচে রয়েছে নানান্ শ্রেণীর পাথর। এদের মধ্যে মাকড়া পাথর (ল্যাটারাইট) সকলের থেকে বেশি হলেও কোনও কোনও স্থানে ভূ-স্তরে 'চাটানী' পাথর নামে এক ধরনের অভ্রময় শিলা, আবার ধূসরশুভ্র শক্ত কোয়ার্টজ পাথরও দেখা যায়। ভূ-তাত্ত্বিকদের মতে নব্যজীবকযুগের অন্তর্ভুক্ত প্লিস্টোসিন বা অত্যাধুনিক যুগের পুরাভূমির অন্তর্ভুক্ত এই অঞ্চল। এখানেই সুপ্রাচীন মানববসতি গড়ে উঠেছিল দূর অতীতের কোনও এক সময়ে।

মেদিনীপুর জেলার এই পশ্চিমাংশে রয়েছে সমগ্র ঝাড়গ্রাম মহকুমা এবং উত্তরপশ্চিমে গড়বেতা অঞ্চল। এদিকের নদীগুলি হল শিলাই, কাঁসাই, তারাফেনি, ডুলং ও সুবর্ণরেখা। মেদিনীপুরের প্রাচীনত্ব এইসব অঞ্চলকে ঘিরে যেখান থেকে পাওয়া গেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরের নানান্ শ্রেণীর অস্ত্রশস্ত্র। মসৃণ অমসৃণ নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র এবং তামার কুঠার ও তামার অন্যান্য সামগ্রী এই দিক থেকেই সর্বাপেক্ষা বেশি পাওয়া গেছে। প্রত্নপ্রস্তর, নব্যপ্রস্তর এবং তাম্রপ্রস্তর যুগের নানান ধরনের অস্ত্র—যেমন কুঠার, মুষল, গদাফলক, দীর্ঘাকৃতি কুঠার, বাটালি, খনিত্র প্রভৃতি এই অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে[১]। ছোট ছোট পাথরের অস্ত্র, যেমন, ছুরিকা, শরাগ্র, অসম্পূর্ণ সপৃষ্ঠ ফলা, চাঁছবার সরঞ্জাম, ছিদ্র করার ক্ষুদ্র অস্ত্র শল্ক—এসবও পাওয়া গেছে মেদিনীপুরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত কাঁসাই ও তারাফেনি নদী উপত্যকা সন্নিহিত গোপগিরি, শালবনী, গিধনি, চিলকিগড়, শিলদা, ওড়গোন্দা, কুকড়াখোপি, নুনিয়া প্রভৃতি স্থান থেকে। সুবর্ণরেখা উপত্যকার নিকটবর্তী পিতানৌ ও রাঙামাটিয়া থেকেও পাথরের অনেক অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষুদ্রপ্রস্তর অস্ত্র (মাইক্রোলিথ্‌স্) পাওয়া গেছে তারাফেনির তটচত্বর, ওড়গোন্দা ও শিলদা থেকে। এ থেকে অনুমান করা যায়, এইসব অঞ্চলে একসময় ছোটখাটো পাথরের অস্ত্র তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া, মেদিনীপুরের এই অঞ্চল থেকে তামার অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী পাওয়া যায় এখানে ঐসব জিনিসও তৈরি হত। বহু তাম্রচুল্লী ও তাম্রধাতুমলও এদিকে লক্ষ্য করা গেছে।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, মেদিনীপুর জেলার প্রাচীনত্ব অতীতকালের কোনও এক পর্বে নিহিত যে সময় ভারতের পূর্বাঞ্চলে আদিম মানবজাতি জীবনযাপনের তাগিদে নতুন অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করতে শুরু করেছিল। শিলাই, কাঁসাই, তারাফেনি এবং সুবর্ণরেখা উপত্যকার নিকটবর্তী অরণ্য-সমাকীর্ণ পার্বত্যমালভূমিতে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গল প্রাগার্য বিভিন্ন জাতি সুপ্রাচীনকাল থেকে বসতি স্থাপন করে। অস্ট্রো-এসিয়াটিক জাতিগোষ্ঠীর বংশধর সাঁওতাল, শবর, খাড়িয়া উপজাতিরা আজও মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী যাদের পূর্বপুরুষেরা সুপ্রাচীনকালে ওইসব অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবন করেছিল। এই জেলার বিনপুর থানার অন্তর্গত কাঁসাই-তারাফেনি নদীর সঙ্গমস্থলের কাছাকাছি সিজুয়ায় মনুষ্য-জীবাশ্মের যে নিদর্শনটি আবিষ্কৃত হয়েছিল, তা এই অঞ্চলে প্রাচীন মানববসতির ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মনুষ্য-জীবাশ্মের ঐ অংশটি একটি চোয়ালের নিম্নাংশ। এটিকে 'হোমো-সেপিয়েনস সেপিয়েনস' নামে উল্লেখ করা হয়েছে ভারতীয় ভূতত্ত্ব সর্বেক্ষণের মুখপত্র 'নিউজ'-এর এক প্রতিবেদনে (৯ম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ৭, মার্চ ১৯৭৮।) এই প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কাঁসাই নদীর প্রাচীন চত্বরের যে স্তরে এটি পাওয়া গেছে সেটি 'প্লিস্টোসিন' যুগের শেষ দিকে সঞ্চিত লাল বালুকারাশির ওপরে এবং তাম্রাশ্মীয় স্তরের চল্লিশ ফুট নীচে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই জীবাশ্ম আদি 'হোলোসিন' পর্বের অর্থাৎ আজ থেকে দশ হাজার বছর আগের হতে পারে। এটি ভারতে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম মানুষের জীবাশ্ম। ('দিস্ অল্‌সো ফরমস্ দ্য রেকর্ড অফ আরলিয়েস্ট হিউম্যান ফসিল ইন ইণ্ডিয়া'—নিউজ) একথা 'জিওলজিক্যাল সারভে'র বিজ্ঞানীরা মনে করেন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে আদি হোলোসিন পর্বে ভারতের অন্যান্য স্থানে এবং পূর্ব ভারতে শেষ প্রত্নপ্রস্তর (আপার প্যালিওলিথিক) সংস্কৃতির যে পরিচয় পাওয়া যায়, সিজুয়ার প্রাপ্ত এই মনুষ্য- জীবাশ্মটি সেই সংস্কৃতির বাহকেরই এক ক্ষীণ পরিচয় দান করে। নব্যপ্রস্তর যুগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে নিষাদ বা অষ্ট্রীক ভাষীদের দ্বারা যে সভ্যতার সূত্রপাত হয়—যার ভিত্তি ছিল কৃষিভিত্তিক গ্রাম্যজীবন—বাংলার ভূখণ্ডেও তা ক্রমে প্রসার লাভ করে। আদিম প্রণালীর কৃষিকার্য, তামা ও লোহার প্রচলন সর্বপ্রথম তাদের দ্বারাই হয়। মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চলে পাথরের ওইসব অস্ত্র এবং তামার অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় এই অনুমানের যথার্থতা প্রমাণিত হয়।[২]

নদী উপনদী উপত্যকায় আদিম মানুবের বিচরণ ভূমি
যেখানে হাতিয়ার পাওয়া গেছে

কিন্তু সেই সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগে বর্তমান মেদিনীপুরের এই পশ্চিমাংশে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সূচনা হলেও পূর্বাংশের বেশির ভাগই ছিল সমুদ্রগর্ভে। কালক্রমে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চল সমুদ্রগর্ভ থেকে মাথা উঁচু করে ওঠে। গঙ্গা এবং বিভিন্ন নদ-নদীর পলিমাটির দ্বারা গঠিত হয় নতুন ভূ-খণ্ড। প্রাকৃতিকভাবে হুগলি ও রূপনারায়ণ এই জেলার পূর্ব সীমানা নির্দিষ্ট করে দেয়। এই পূর্বাংশেরই পলিভূমিতে জন্ম নেয় সুপ্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্ত।

শিলদা বেলপাহাড়ীর উষর আদিম প্রান্তর : আদিম মানুষের বিচরণ ক্ষেত্র

সেই সুপ্রাচীনকালে যখন মেদিনীপুর 'মেদিনীপুর' নামে পরিচিত ছিল না তখন বর্তমান মেদিনীপুর জেলারই অন্তর্ভুক্ত তমলুক 'তাম্রলিপ্ত' বা 'তাম্রলিপ্তি' নামে পরিচিত ছিল। তাম্রলিপ্ত প্রাগৈতিহাসিককালের গণ্ডী পেরিয়ে ঐতিহাসিককালে এক বিখ্যাত বাণিজ্যবন্দররূপে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে।* কিন্তু বন্দরনগরীরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করার বহু আগে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বেশ কিছু সামগ্রী ও অস্ত্রশস্ত্র তমলুক ও তার আশপাশ থেকে পাওয়া গেছে। ১৯৫৫ সালে তমলুকের মাটিতে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের উৎখননের ফলে নব্যপ্রস্তরযুগের এক অধিবসতিস্তর আবিষ্কৃত হয়েছে যার ফলে এই স্থানের ইতিহাস অন্ততপক্ষে খ্রিষ্টপূর্ব এক হাজার বছরেরও অনেক আগে পর্যন্ত অনুমান করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের উদ্যোগে তাম্রপ্রস্তরযুগের যেসব নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির মধ্যে কয়েকটি পাথরের কুঠার উল্লেখযোগ্য। এই যুগের বহু নিদর্শনের মধ্যে উঁচু কাণাযুক্ত এক শ্রেণীর পাত্র কতকটা ফোটা টিউলিপ ফুলের মতো, পিলসুজ আকারের থালি, চিত্রিত ও নক্শা কাটা মৃৎপাত্র বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এগুলির কোনও কোনওটিতে অঙ্কিত রয়েছে সমুদ্রযান, মাছ, তারকা ইত্যাদি চিত্র। কিন্তু তমলুক থেকে সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য একটি পুরানিদর্শন হল, হাড়ের তৈরি 'হারপুন' (কাঁটাযুক্ত সূক্ষ্মাগ্র ফলা) এবং একটি বড়ো আকারের বঁড়শি। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে 'হারপুন'টি খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ বছরের প্রাচীন। এছাড়া লালকালো মৃৎপাত্র ও লোহিতোজ্জ্বল মৃৎপাত্রের বহু ভগ্ন অংশ তমলুক ও আশপাশের মাটি থেকে পাওয়া গেছে। ওইসব পুরা সামগ্রী সংগৃহীত হয়েছে তমলুক ও তার কাছাকাছি বিভিন্ন স্থান থেকে, যেমন, ইছাপুর, অমৃতবেড়িয়া, বাঁকা ও নাটশাল প্রভৃতি স্থানে। কৃষ্ণলোহিত ও উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের মাটির পাত্রের বহু নিদর্শন এখান থেকে পাওয়া গেছে। এগুলি তাম্রাশ্মীয় যুগের বলে পুরাতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন।

ঐতিহাসিক যুগে বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের পরিধি ছিল বিশাল। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে চীনা পরিব্রাজক সুয়ান সাঙের (হিউয়েন সাঙ) মতে তখন এর পরিধি ছিল ১৪০০ লি. বা ২৮০ মাইল এবং রাজধানী তাম্রলিপ্তের পরিধি ছিল ১০ লি. বা ২-৩ মাইল। পূর্বে রূপনারায়ণ ছাড়িয়ে ওপারের হাওড়া ও চব্বিশ পরগনার কিছুটা তাম্রলিপ্ত রাজ্য বিস্তৃত ছিল এবং বর্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণে কাঁথির বাহিরি এবং উত্তরে সমগ্র ঘাটাল মহকুমা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে অনুমান করা যায়। এই বিস্তীর্ণ পরিধির অন্তর্ভুক্ত যেসব প্রত্নস্থল লক্ষ্য করা গেছে, বাহিরি ছাড়া সেগুলি হল, রঘুনাথবাড়ি (পাঁশকুড়া থানা), জলচক বা তিলদাগঞ্জ (পিংলা) এবং পান্না (ঘাটাল)। তমলুকের মাটির ভিতর থেকে ঐতিহাসিককালের বহু পুরানিদর্শন পাওয়া গেছে যেগুলির সময়কাল মৌর্যযুগ থেকে মধ্যযুগ। এর মধ্যে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে তৈরি পোড়ামাটির ফলকে 'অপ্সরা পঞ্চচূড়' মূর্তি উল্লেখযোগ্য। এটি বর্তমানে অক্সফোর্ডের 'আসমোলিয়ান মিউজিয়ামে' রক্ষিত বলে জানা যায়। মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ ও গুপ্তযুগের পোড়ামাটির অসংখ্য মূর্তিফলক, পাথরের কিছু কিছু মূর্তি, পোড়ামাটির ফলকে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপি ও সীল, পাথরের ছোটবড়ো মূর্তি, মৌর্য ও গুপ্তযুগের বেশ কিছু মুদ্রা তমলুক থেকে পাওয়া গেছে। বাহিরি, তিলদা, রঘুনাথবাড়ি, পান্না প্রভৃতি স্থানেও কুষাণ, গুপ্ত, পাল ও মধ্যযুগের পোড়ামাটির মূর্তিফলক, পাথরের মূর্তি, প্রাচীন মৃৎপাত্র ও মৃৎপাত্রের ভগ্ন অংশ, মুদ্রা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। পান্না থেকে আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে নির্মিত পোড়ামাটির একটি সুন্দর মস্তক পাওয়া গিয়েছিল। মূর্তিটির মুখমণ্ডলের স্মিতহাস্য কোনও সুরসুন্দরীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই অপূর্ব পুরানিদর্শনটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আশুতোষ চিত্রশালা'য় সংরক্ষিত। পান্না গ্রামটি শিলাই নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই গ্রামের পাশ দিয়ে একটি প্রাচীন সড়ক ('জাঙ্গাল') উত্তরে আঁকাবাঁকা

১৯৫৫ সালে তমলুকের মাটিতে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের উৎখননের ফলে নব্যপ্রস্তরযুগের এক অধিবসতিস্তর আবিষ্কৃত হয়েছে যার ফলে এই স্থানের ইতিহাস অন্ততপক্ষে খ্রিষ্টপূর্ব এক হাজার বছরেরও অনেক আগে পর্যন্ত অনুমান করা যায়।
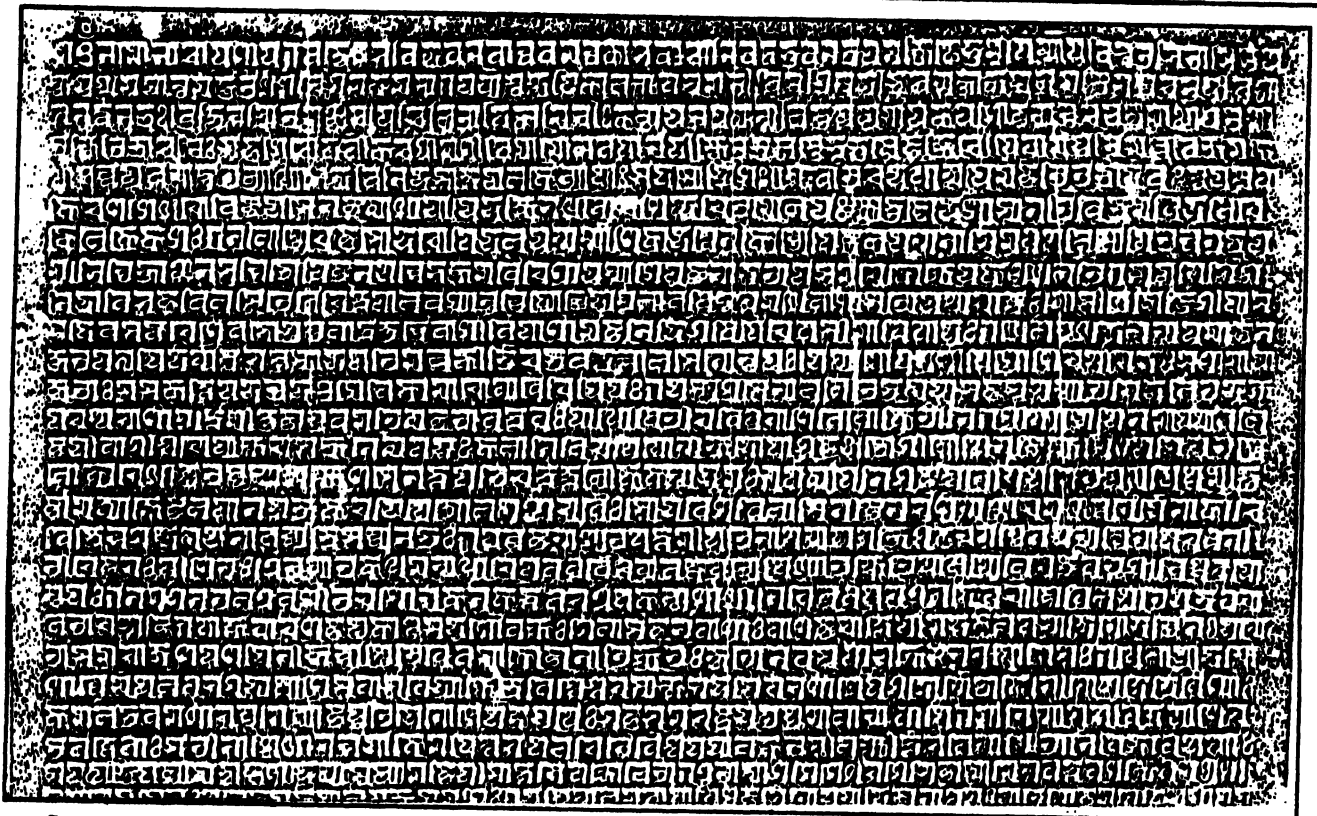
তাম্রলিপ্ত বন্দরে প্রাপ্ত প্রাচীন লিপি

সৌজন্যে : শেখর ভৌমিক

পথে বর্ধমান হয়ে আরও উত্তরে মুর্শিদাবাদের প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ পর্যন্ত গিয়েছিল এবং দক্ষিণে তাম্রলিপ্তের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। তার চিহ্ন এখনও বহু স্থানে লক্ষ্য করা যায়। মুঘলযুগে এটি 'বাদশাহী সড়ক'রূপে ব্যবহৃত হত এবং পাঠান-মুঘল সংঘর্ষের সময় এই সড়কে সৈন্যরা যাতায়াত করত। তমলুক থেকে পাওয়া অসংখ্য পুরাবস্তু লক্ষ্য করে আমরা তমলুকের প্রাচীন সমৃদ্ধির কথা যেমন অনুমান করতে পারি, তেমনি উত্তর মেদিনীপুরের পান্না এবং তিলদা ও বাহিরির প্রাপ্ত পুরা নিদর্শন থেকে ওইসব

•

তাম্রলিপ্ত নামে স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় জৈনগ্রন্থ 'জৈনকল্প সূত্রে' 'মহানিদ্দেশ' ও 'উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনা', কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর', বরাহমিহিরের 'বৃহৎ সংহিতা' প্রভৃতি গ্রন্থে। তাছাড়া বহু পুরাণে বিশেষভাবে বিষ্ণু ও মৎস্য পুরাণে তাম্রলিপ্তের নাম বারবার পাওয়া যায়। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে প্লিনি ও দ্বিতীয় শতকে টলেমি যথাক্রমে একে 'তালূক্তি' ও 'তমালিতেস' বলে উল্লেখ করেছেন।

•

স্থানের সমৃদ্ধিও জানতে পারি। মেদিনীপুরের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্যরূপে এগুলি বিভিন্ন সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত আছে।

মেদিনীপুর জেলার প্রাচীনত্ব সুদূর অতীতের অসংখ্য পুরানিদর্শনের সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয়। কিন্তু 'মেদিনীপুর' নামটি যে তেমন প্রাচীন নয় তা অনুমান করা যায়। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডটির প্রায় সমস্ত অংশ খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক পর্যন্ত গঙ্গারিডি ও কলিঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। প্লিনির সময়ে (খ্রি. ১ম শতক) এই স্থান 'মোডো কলিঙ্গ' বা 'মধ্যকলিঙ্গ' নামে পরিগণিত হত।[৫] এই জেলার অনেকটাই এক-সময় তাম্রলিপ্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কিছু অংশ উৎকল ও ওড্র দেশের অন্তর্গত ছিল এবং কিছু অংশ উৎকল ও ওড্র দেশের অন্তর্গত ছিল। আবার এই ভূখণ্ড সুহ্ম ও দক্ষিণ রাঢ়ের অংশবিশেষও ছিল। তাম্রলিপ্তের রাজা যে সমগ্র সুহ্ম দেশের রাজা ছিলেন তা জানা যায় দণ্ডীর (খ্রি. ষষ্ঠ শতক) 'দশকুমারচরিত' থেকে। প্রাচীন সাহিত্য ও শিলালেখে তাম্রলিপ্তের বহুবার উল্লেখ পাওয়া যায়। যজুর্বেদের 'রাজসনেয়ী সংহিতায়' 'কেবর্ত্ত' নামক দেশটি তাম্রলিপ্তের নামান্তর। তাম্রলিপ্ত নামে স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় জৈনগ্রন্থ 'জৈনকল্প সূত্রে' 'মহানিদ্দেশ' ও 'উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনা', কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর', বরাহমিহিরের 'বৃহৎ সংহিতা' প্রভৃতি গ্রন্থে। তাছাড়া বহু পুরাণে বিশেষভাবে বিষ্ণু ও মৎস্য পুরাণে তাম্রলিপ্তের নাম বারবার পাওয়া যায়। খ্রিষ্টীয় প্রথম

শতকে প্লিনি ও দ্বিতীয় শতকে টলেমি যথাক্রমে একে 'তালুক্তি' ও 'তমালিতেস' বলে উল্লেখ করেছেন। হাজারিবাগ জেলায় প্রাপ্ত 'দুধপানি শিলালেখে'ও (আঃ খ্রি. ৮ম শতক) তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। মহাভারতে পূর্ব ভারতের অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র ও মগধ রাজ্যসমূহের সঙ্গে তাম্রলিপ্ত রাজ্যেরও নাম আছে। ('অঙ্গবঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চমগধস্তাম্রলিপ্তকা, কর্ণপর্ব')। কালিদাসের সময়ে (আঃ খ্রি. ৪র্থ-৫ম শতক) সম্ভবত এই স্থান সুহ্মরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'রঘুবংশে' রঘুর দিগ্বিজয় অংশে (৪র্থ সর্গ) রঘু সুহ্মদেশ জয় করে কপিলা বা কংসাবতীর পরপারে উৎকল রাজ্যে উপস্থিত হন। এই কপিলা বা কংসাবতী (কাঁসাই নামে পরিচিত) নদী বর্তমান মেদিনীপুর শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত। পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের (৩৯৯ খ্রি.—৪১১ খ্রি.) সময়ে তাম্রলিপ্ত এক প্রসিদ্ধ নগর ছিল। সুয়ান সাঙের সময়ে বাংলাদেশ যে চারভাগে বিভক্ত ছিল সেগুলি হল পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্ত। এসব থেকে মনে হয়, খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে তাম্রলিপ্ত একটি স্বতন্ত্র রাজ্য এবং কোনও কোনও সময় সুহ্মের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবংশ' থেকে জানা যায়, প্রিয়দর্শী অশোক সিংহলরাজ 'দেবানাং পিয়তিষ্যো'র কাছে মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রাকে পবিত্র বোধিদ্রুমের একটি শাখাসহ সিংহলে পাঠিয়েছিলেন তাম্রলিপ্ত থেকেই। সে সময় তিনি স্বয়ং তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হন। অশোক এখানে দু'শ ফুট উঁচু একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেন। সুয়ান সাঙ ওই স্তম্ভটি দেখেছিলেন। ফা-হিয়েনের বিবরণী থেকে জানা যায় এখানে তখন চব্বিশটি বৌদ্ধ বিহার ও অসংখ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল। সুয়ান সাঙ যখন সমতট থেকে এখানে আসেন তখন তিনি দশটি বৌদ্ধ মঠ ও এক হাজার শ্রমণ দেখেছিলেন। পঞ্চাশটি হিন্দু মন্দিরও তাঁর চোখে পড়ে।

বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অনেকটাই প্রাচীনকালে উৎকলদেশের (অর্থাৎ কলিঙ্গদেশের উত্তরাংশ) অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানের ঘাটাল, চন্দ্রকোণা ও গড়বেতা অঞ্চল বাদ দিয়ে মেদিনীপুরের বাকি সমস্ত অংশই উৎকলের অংশ ছিল।

প্রাচীনকালে সমগ্র ভারতবর্ষে তাম্রলিপ্তের এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। চীনা ভাষায় রচিত 'শুই-চিঙ-চু' গ্রন্থে উল্লেখ আছে 'তান-মাই'-এর (তাম্রলিপ্ত) রাজার কাছ থেকে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকে এক দূত চীনের রাজসভায় যান। তাম্রলিপ্ত ছিল এক বিখ্যাত বন্দর। উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে বহু ব্যবসায়ী এখানে বাণিজ্য করতে আসতো এবং এখান থেকে বহু বণিক দূরপ্রাচ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যও করতে যেত। একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও ধর্মকেন্দ্ররূপে তাম্রলিপ্ত প্রাচীনকালে এই অঞ্চলে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে।

প্রাচীন তাম্রলিপ্তের ইতিহাস তাই মেদিনীপুরেরই ইতিহাস। মেদিনীপুর নাম ঠিক কখন চালিত হয়, তা বলা কঠিন। সে আলোচনায় আমরা পরে আসছি। তবে বর্তমান মেদিনীপুর জেলা যে মূলত প্রাচীন সুহ্ম, দক্ষিণ রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত নিয়ে গঠিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাচীন 'দণ্ডভুক্তি'র কিছু অংশও বর্তমান মেদিনীপুরের মধ্যে ছিল। লক্ষ্য করার বিষয়, গত পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে মেদিনীপুর জেলা থেকে যে তিনটি মূল্যবান 'তাম্রশাসন' পাওয়া গেছে, সেগুলি সবই শশাঙ্কের আমলের (আঃ ৬০০ খ্রিঃ—৬২৫ খ্রিঃ)। 'শাসন'গুলিতে শশাঙ্কের নাম এবং তাঁর 'মহাপ্রতীহার' শুভকীর্তি, 'সামন্ত' সোমদত্তের নাম এবং বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি ও তাঁদের কার্যালয়ের ('অধিকরণ') নামও পাওয়া যায়। এঁরা সকলেই 'দণ্ডভুক্তি' ও 'উৎকলের' শাসক ছিলেন।[৫] দণ্ডভুক্তির আয়তন সে সময় রূপনারায়ণের দক্ষিণ এবং সুবর্ণরেখার উত্তরের ভূমিভাগ এবং বর্তমান ওড়িশার বালেশ্বর ও ময়ূরভঞ্জ এবং ছোটনাগপুরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। কিন্তু এই তাম্রশাসনগুলিতে তাম্রলিপ্তের কোনও উল্লেখ নেই। বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা যে শাসনের কথা এগুলি থেকে জানা যায়, তা এখনকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সমতুল। এটা খুবই চিত্তাকর্ষক যে, মেদিনীপুর অঞ্চলে সে সময় এরূপ শাসন ব্যবস্থা ছিল। শশাঙ্কের শাসনাধিকার মেদিনীপুর জেলা ছাড়িয়ে দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বলা বাহুল্য, বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অনেকটাই প্রাচীনকালে উৎকলদেশের (অর্থাৎ কলিঙ্গদেশের উত্তরাংশ) অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানের ঘাটাল, চন্দ্রকোণা ও গড়বেতা অঞ্চল বাদ দিয়ে মেদিনীপুরের বাকি সমস্ত অংশই উৎকলের অংশ ছিল। চন্দ্রকোণা শহরের প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে প্রসিদ্ধ 'নেড়া-দেউল' পর্যন্ত যে বাংলার সীমা ছিল সেকথা 'অন্নদামঙ্গলে' (১৭৫২ খ্রি.) মহাকবি ভারতচন্দ্র উল্লেখ করেছেন।[৬] ফান ডেন ব্রুকও তাঁর মানচিত্রে (১৬৬০ খ্রি.) এই দেউলটিকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন। রেনেলের মানচিত্রে (১৭৬৭—১৭৭৪ খ্রি.) এখান থেকে মেদিনীপুরের সীমা আরম্ভ, এটা বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ, সে সময় মেদিনীপুর একটি পৃথক 'চাকলা' (এখনকার জেলা) ছিল। নেড়াদেউলের উত্তর সীমায় বর্ধমান 'চাকলা'র আরম্ভ, রেনেল তা দেখিয়েছেন।

জেলার 'মেদিনীপুর' নামটি ঠিক কখন থেকে চলিত হয় তা আজও নিরূপিত হয়নি। খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকের আগে 'পুর' শব্দযুক্ত স্থান নাম তেমন পাওয়া যায় না। ষোল শতকের আগে থেকে 'পুর' শব্দ বেশ চলিত হতে থাকে। তবে সাধারণভাবে ব্যক্তিগতভাবে নাম অথবা পদবিতে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যেতে থাকে।[৭] এই যুক্তিতে 'মেদিনীকোষ' রচয়িতা মেদিনীকরের নাম অনুসারে এই জেলার নামকরণ বলে কেউ

হিজলীর মসনদ-ই আলার সমাধি বা মাজার, কাঁথি — ছবি : প্রশান্ত প্রামাণিক

কেউ মনে করেন। কিন্তু এই অঞ্চলের নাম অন্তত এগারো-বারো শতকে যে 'মিধুনপুর' ছিল তা জানা যায় ওড়িশার রাজা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ নরসিংহের লিপি থেকে। চোড়গঙ্গদেবের লিপি থেকে জানা যায়, তাঁর রাজ্যের পূর্বদিকে ছিল সমুদ্র, পশ্চিমদিকে পর্বতমালা, দক্ষিণে গোদাবরী নদী উত্তর প্রান্তে মিধুনপুর।[৮] এই স্থান মন্দার ও আরম্যের দক্ষিণে ছিল। 'মন্দার' ছিল বর্তমান হুগলি জেলার গড়মান্দারণ ও 'আরম্য' এখনকার হুগলি জেলার আরামবাগ। এর দক্ষিণে 'মিধুনপুর' অর্থাৎ বর্তমান মেদিনীপুর জেলা। অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ গঙ্গাতীরে মন্দাররাজকে পরাজিত করে দুর্গনগর 'আরম্য' ধ্বংস করেন। এর পর আমরা 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে (১৫৯৬ খ্রি.) ওড়িশার সরকার জলেশ্বরের আঠাশটি মহালের মধ্যে মেদিনীপুরের নামও পাই। এতে উল্লেখ আছে, মেদিনাপুর একটি বড়ো শহর—এর দুটি দুর্গ, একটি প্রাচীন অপরটি আধুনিক। ফান ডেন ব্রুকের মানচিত্রে এর নাম পাওয়া যায় 'মেদিনাপুর' (Medinapoer) রেনেলে (Rennell) মানচিত্রে এর উল্লেখ 'মিদনাপুর' (Midnapour) ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে অংকিত দ্য আঁভিলের মানচিত্রে এর উল্লেখ ছিল 'মেদিনাপুর' (Medinapour) এই নামে। প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে গোপীজনবল্লভ দাসরচিত 'রসিকমঙ্গল' কাব্যে (১৬৫৯—১৬৬০ খ্রি.) 'মেদিনীপুর' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৯] এসব কারণে মনে হয় 'মেদিনীপুর' নামটি অন্তত ষোল শতকের আগে থেকে চলিত হয়েছিল এবং এগারো-বারো শতকে এই স্থানের নাম যে 'মিধুনপুর' ছিল, তা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের বারো শতকের প্রথম দিকের 'তাম্রশাসন' থেকে জানা যায়।

বর্তমান মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন সময়ে সীমারেখার পরিবর্তন ঘটলেও এই ভূখণ্ডের প্রাচীনত্ব ওপরের আলোচনায় কিছুটা অনুমান করা যায়। সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ঐতিহাসিক যুগের বিভিন্ন অধ্যায়ের অসংখ্য পুরানিদর্শন যেমন এই জেলার মাটি থেকে পাওয়া গেছে, তেমনি প্রাচীন সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে এই স্থানের উল্লেখ আছে। প্রস্তর যুগের বিভিন্ন পর্বের নানা হাতিয়ার ও অন্যান্য সামগ্রী, মৃৎপাত্র, তামার অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জামসমূহ এটাই প্রমাণ করে প্রায় বিস্মৃত অতীতে এখানে উন্নততর মানব-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। এরপর ঐতিহাসিক কালের বিভিন্ন পর্বে সেই সংস্কৃতির বিবর্তন-ধারায় সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটেছিল, তার সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন যুগের শিল্প-ভাস্কর্য-সুষমায় এবং অপরূপ মন্দির স্থাপত্যের মধ্যে। মেদিনীপুরের মাটিতে যে এক সময় সুন্দর সুন্দর মন্দির তৈরি হয়েছিল আজও তার বেশ কিছু অবশিষ্ট আছে। অনেক মন্দির পোড়ামাটির মূর্তি-অলংকরণে শোভিত। প্রায় সবই মধ্যযুগের বিভিন্ন সময়ে তৈরি হলেও হিন্দু রাজাদের আমলে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের চিহ্নও লক্ষ্য করা গেছে। কোনও কোনও প্রাচীন শিলালেখে উচ্চ 'শিখর' দেউল প্রতিষ্ঠার কথাও জানা যায়। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর মেদিনীপুরে চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত মাধবপুরে প্রাপ্ত শিলালেখের কথা বলা যায়। প্রায় তের বছর আগে এই 'লেখ'টির সন্ধান বর্তমান লেখক মাধবপুরে 'দোলু রায়' ধর্মের মন্দিরে পান।[১০] লেখটি আংশিক খণ্ডিত এবং বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের সময়কার অক্ষর-লিপিতে খোদিত। সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই লিপিতে শিবের একটি উচ্চ 'শিখর' দেউল মন্দির নির্মাণের কথা জানা যায়। 'রাঢ়াশ্রী' ('রাঢ়া' দেশের লক্ষ্মী) বিশেষণে ভূষিতা এক সম্ভ্রান্ত মহিলা (তাঁর নামটি মুছে গেছে) 'সুবর্ণ' নামে একজন স্থপতিকে দিয়ে 'সহাস্যমাসে' (অগ্রহায়ণ মাসে) একটি উচ্চ 'শিখর' মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন এবং এটি একটি 'বৃষসৌধ' বা বিশাল সৌধ ছিল। মন্দিরে যে

রঘুনাথগড় ঠাকুরবাড়ি, চন্দ্রকোণা　　　　ছবি : প্রশান্ত প্রামাণিক

শিবলিঙ্গ বা শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেটি বঙ্গদেশ থেকে আনা হয়। তখন 'বঙ্গদেশ' বলতে বর্তমান 'বাংলাদেশে'র ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলকে বোঝাত। শিলালেখটিতে যে তারিখ দেওয়া আছে, তা ৩৬৮ বৎসর। এটি ওড়িশার 'ভৌমকর' অব্দ বলে অনুমান অর্থাৎ ১১০৪ খ্রিষ্টাব্দ।[১১] তুর্কী বিজয়ের প্রায় একশো বছর আগের ঘটনা। মেদিনীপুরে আবিষ্কৃত এটিই প্রথম শিলালেখ। এছাড়া তিনটি 'তাম্রশাসনের' কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মাধবপুর বা তার আশপাশ সে সময় সমৃদ্ধিশালী ছিল। তার সাক্ষ্য, এই গ্রামের পাশ দিয়ে একটি প্রাচীন সড়ক যেটি আজও লক্ষ্য করা যায় (সড়কটি 'অহল্যাবাঈ রোড়' নামে পরিচিত)। এটি ক্ষীরপাই-এর ওপর দিয়ে আরও দক্ষিণে প্রাচীন 'জগন্নাথ রাস্তা'র সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে সেকালে তীর্থযাত্রীরা যাওয়া-আসা করতো। উল্লেখ্য, পূর্বোক্ত 'দারির জাঙ্গাল' রাস্তা এরই কাছাকাছি। এইসব কারণে উত্তর মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার এই স্থান ও তার আশপাশ বেশ প্রাচীন। প্রসিদ্ধ পুরাকীর্তিস্থল পান্না (ঘাটাল থানা) এই স্থান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। এই পান্নার 'হেদুয়া পুকুরের' মধ্যবর্তী একটি দ্বীপাকৃতি স্থান খনন করে গুপ্ত, পাল ও মধ্যযুগের বহু পুরাবস্তু উদ্ধার করা হয়েছে।

উত্তর মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা, গড়বেতা, বগড়ি প্রভৃতি স্থান একসময় সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। এই স্থানগুলিতে প্রাচীন সমৃদ্ধির চিহ্ন আজও কিছু কিছু বর্তমান। গড়বেতা ও বগড়ি মধ্যযুগে (আঃ খ্রি. ১৬ শতক থেকে) কোনও সময় স্থানীয় সামন্ত রাজা, আবার কোনও সময় মল্লভূম রাজাদের অধীন ছিল। গড়বেতায় 'রায়কোটা' নামে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। বহু মন্দির দেবালয়, দিঘি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়, এখনও বহু নিদর্শন বর্তমান। এখানে ওড়িশী 'দেউল' রীতির সর্বমঙ্গলার মন্দির স্থাপত্যশিল্পের এক বিশিষ্ট নিদর্শন। নিকটবর্তী রাধাবল্লভের 'আটচালা' রীতির মন্দিরটি ৯৯২ মল্লাব্দ বা ১৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মল্লভূম-বিষ্ণুপুরের রাজা দুর্জনসিংহদেব প্রতিষ্ঠা করেন। শহর চন্দ্রকোণা 'ভান'-রাজ্যের রাজধানীরূপে ষোল শতক থেকে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে এবং সমৃদ্ধিশালী নগররূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জগমোহন পণ্ডিত রচিত 'দেশাবলীবিবৃতি' গ্রন্থে ভান রাজ্যের বর্ণনা আছে। সেখানে বলা হয়েছে কংসাবতী (কাঁসাই) ও শিলাবতী (শিলাই) নদীর মধ্যবর্তী দেশটি 'ভান' দেশ। এই দেশ বগড়ির পূর্বে এবং মণ্ডলঘাট পরগনার পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে উৎকৃষ্টমানের ক্ষৌমবস্ত্র প্রস্তুত হত এবং ভমি উর্বর থাকায় প্রচুর কৃষিপণ্য উৎপন্ন হত। বহু মন্দির দেবালয়, প্রচুর রাস্তাঘাট, বিশাল বিশাল দিঘি, গড়দুর্গ ছিল। এখনও প্রাচীন নিদর্শন বর্তমান। এখানে সে সময় বহু বৈষ্ণব সন্ত ও মুসলমান সুফী, পীর-ফকির তাঁদের মঠ-মন্দির ও মাজার আস্তানা প্রতিষ্ঠা করেন। ভান বংশের ইতিহাসের একটি পাথুরে দলিল এক দীর্ঘ শিলালিপি শহর চন্দ্রকোণায় অযোধ্যাপল্লীর রঘুনাথবাড়ির লালজীউ-এর মন্দির থেকে পাওয়া গেছে। এটি একটি রাধাকৃষ্ণের লুপ্ত 'নবরত্ন' মন্দিরের উৎসর্গলিপি। লিপিটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সারার্থ হল, ১৫৭৭ শকাব্দে (১৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দে) রাজা বীরভানির

পুত্রবধূ এবং হরিনারায়ণের পত্নী শ্রীলক্ষ্মণাবতী এই 'নবরত্ন' মন্দির উৎসর্গ করলেন। লক্ষ্মণাবতী ছিলেন নারায়ণমল্লের ভগিনী, হোলরায়ের কন্যা এবং রাজা মিত্রসেনের মাতা।[১২] মন্দিরটি সম্ভবত চন্দ্রকোণার প্রসিদ্ধ দুর্গ লালগড়ে অবস্থিত ছিল। চন্দ্রকোণায় আরও দুটি বিশাল দুর্গ ছিল—রঘুনাথগড় ও রামগড়। গড়গুলির চিহ্ন এখনও লক্ষ্য করা যায়। 'বারদুয়ারী' গড় এলাকায় ভান রাজাদের প্রাসাদ ছিল এবং চন্দ্রকোণা এক-সময় 'বাহান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলির' শহর ছিল। এছাড়া, ঘাটাল শহরের পার্শ্ববর্তী চেতুয়া-বরদার জমিদার শোভা সিংহের বিশাল গড়ে ধ্বংসাবশেষ আজও লক্ষ্য করা যায়।[১৩] শোভা সিংহ সতেরো শতকের শেষ দিকে (১৬৯৬ খ্রি.) বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম ও সম্রাট ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করে আছেন।

উত্তর মেদিনীপুর ছাড়া এই জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বহু প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, গড়দুর্গের চিহ্ন আমাদের চোখে পড়েছে। এর মধ্যে কেশিয়াড়ির নিকটবর্তী 'দিপা কিয়ার চাঁদ' প্রান্তর ও গগনেশ্বর গ্রামের 'কুরুমবেড়া দুর্গ' এবং নয়াগ্রাম থানার অন্তর্গত 'চন্দ্ররেখাগড়' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওড়িশার রাজাদের প্রভাবমণ্ডলে এইসব স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, অন্যদিকে মুঘল-পাঠান আমলে এই দিকের দুর্গগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করতো। কেশিয়াড়ি গ্রামটিও ওইসময় সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে এবং অনেক দেবদেউল এখানে তৈরি হয়। সতেরো শতকের বিভিন্ন সময়ে তৈরি ওড়িশী 'ভদ্র' রীতির বহু মন্দির ও 'শিখর' দেউল রীতির জগন্নাথ মন্দির এখানে আছে। মেদিনীপুর জেলায় উড়িশী 'রেখ' ও 'ভদ্র' রীতির মন্দিরের উৎকৃষ্ট নিদর্শন আছে ধলহরা ও নেড়াদেউলে (কেশপুর), চন্দ্রকোণা (চন্দ্রকোণা) ও কর্ণগড়ে (শালবনী), তমলুক, বাহিরি (কাঁথি), দেউলবাড় (গোপীবল্লভপুর) ও সহস্রলিঙ্গ বা সস্তনি গ্রামে (নয়াগ্রাম)—যেগুলি এই অঞ্চলে ওড়িশী মন্দির স্থাপত্যশৈলীর প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শহর মেদিনীপুরে বহু মসজিদ, মাজার, দরগা প্রাচীন মসজিদ স্থাপত্য শিল্পের বিস্ময়কর নিদর্শন হয়ে আছে। খড়গপুর-ইন্দা, অমরসি ও হিজলির 'মসনদ-ই-আলা'র বিখ্যাত মসজিদগুলিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। অবশ্য মেদিনীপুর শহরকে বাদ দিলে গির্জা বা খ্রিষ্টীয় উপাসনা গৃহের সংখ্যা খুবই কম। সে তুলনায় মসজিদ, মাজার ও পীরস্থান জেলার বিভিন্ন স্থানে আমাদের চোখে পড়েছে।

মেদিনীপুর জেলার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য রয়েছে পূর্ব উল্লিখিত পুরাবস্তু, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, প্রাচীন গড়দুর্গ, দিঘি-পুকুর, রাস্তাঘাট, প্রাচীন সৌধ, শিলালিপি, তাম্রশাসন, মূর্তি, প্রাচীন পুঁথিপত্র, দলিলদস্তাবেজ প্রভৃতির মধ্যে। এর অজস্র নিদর্শন জেলার প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। এই জেলার পশ্চিমাঞ্চলের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি যা ছিল আদি মানবজাতির জীবনধারার প্রকাশ, তা পুবের পলিমাটির কোমল স্পর্শে যেন নবরূপে বিকশিত হয়েছিল।

তথ্যসূত্র :

১। *ইণ্ডিয়ান আরকিওলজি—আ রিভিউ*, ১৯৬৩-৬৪, পৃ. ৫৯ ও ৬২

২। রায়, প্রণব, *মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ*, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬, পৃ. ২১

৩। দাসগুপ্ত, পরেশচন্দ্র, *দ্য আরকিওলজিক্যাল ট্রেজার্স অফ তাম্রলিপ্ত*, তাম্রলিপ্ত মিউজিয়াম অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, তমলুক, পৃ.৩

৪। গাঙ্গুলী, মনোমোহন, *ওড়িশা অ্যান্ড হার রিমেন্স, অ্যানসেন্ট অ্যান্ড মিডিভ্যাল*, ১৯২২, পৃ.১৪

৫। সরকার, দীনেশচন্দ্র, *শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ*, সাহিত্যলোক, কলকাতা ১৯৮২, পৃ. ৪৯-৫৮

৬। রায়গুণাকর, ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী* (মানসিংহ), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, তারিখ নেই পৃ.১৩৯

৭। সেন, সুকুমার, *বাংলা স্থাননাম*, কলকাতা, ১৩৮৯, পৃ.৩৭

৮। রাও, আর সুব্বা, দ্য হিস্টরি অফ দ্য ইস্টার্ন গঙ্গস্ অফ কলিঙ্গ, *জার্নাল অফ দ্য অন্ধ্র হিস্টরিক্যাল রিসার্চ সোস্যাইটি*, ভলিয়ুম ৬, পার্টস্ ৩-৪, জানুয়ারি-এপ্রিল ১৯৩২

৯। দাস গোপীজনবল্লভ, *রসিকমঙ্গল*, পূর্ববিভাগ, ১০ম লহরী, শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর, ১৯৪১

১০। * মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ ও রায়, প্রণব, ৩৬৮ অব্দের নব আবিষ্কৃত খণ্ডিত মাধবপুর শিলালেখ, *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ১৩৯৫, ১ম-২য় সংখ্যা, পৃ.৯১-৯৫

* মুখার্জি, বি এন অ্যান্ড পি রায়, মাধবপুর ফ্র্যাগমেন্টারি ইনসক্রিপসন অফ দ্য ইয়ার থ্রি. হান্ড্রেড সিকস্‌টি এইট, *ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম বুলেটিন*, ১৯৯১, পৃ. ৪২-৪৫

১১। তদেব তদেব, পৃ.৪৩-৪৪

১২। রায়, প্রণব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯-৭০

১৩। রায়, পঞ্চানন কাব্যতীর্থ ও রায়, প্রণব, *ঘাটালের কথা*, ঘাটাল, ১৯৭৭, শোভা সিংহের গড়ের নক্সা, পৃ. ৩২-এর পর।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ

২। বসু, যোগেশচন্দ্র, *মেদিনীপুরের ইতিহাস*, ১ম সং, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ

৩। দাস, বিনোদশঙ্কর এবং রায়, প্রণব (সম্পাদিত) : *মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন*, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৯ এবং ২য় খণ্ড, ১৯৯৮

লেখক : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গ্রন্থকার

শিল্পীর দৃষ্টিতে তাম্রলিপ্ত বন্দরের সমদ্রগামী জাহাজ

অতীতের আলোয় বন্দরনগরী তাম্রলিপ্ত

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

দাঁড়িয়ে আছি খোজার বাঁধে। মনে পড়ছে তমলুকের ইতিহাস। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে পরাজয় হল সিরাজদ্দৌলার। তাঁকে হত্যার পর নবাবি পেলেন মীরজাফর। কয়েকদিনের মধ্যেই প্রয়াত হলেন তমলুকের ভূস্বামী রাজা কমলনারায়ণ। হাতে গোনা কয়েকটা দিনও কাটল না। জমিদারির দখল নিলেন মির্জা দেদার আলি বেগ খোজা। গায়ের জোরে বেগের দখলে এল তমলুক রাজগড়েরও অধিকার।

তমলুকের জন্য অবশ্য কম করেননি মির্জা বেগ। তাঁর নানা কীর্তির মধ্যে ছিল তমলুক পরগনার পশ্চিম সীমান্তে এক বাঁধ নির্মাণ। তখন একদিকে বিশাল সমুদ্র, অন্যপ্রান্তে উত্তরের কাশীজোড়া পরগনা। এই কাশীজোড়া পরগনার অতিবৃষ্টির জল যাতে গড়িয়ে এসে তমলুকের ক্ষতি করতে না পারে সেজন্যই এই বাঁধ। পরে গ্রামবাসীদের কাছে এ বাঁধটির নামই হয়ে যায় খোজার বাঁধ। মির্জা আলির মৃত্যু হয় ১৭৬৭ সালে। তাঁকে কবর দেওয়া হয় তমলুক রাজবাড়ির সদর দেউড়ির পশ্চিমে লাগোয়া এক বাগানে। এখনও আছে সে মাজারের চিহ্ন।

এমনই নানা ইতিহাসে সমৃদ্ধ একসময়ের সুবর্ণ বন্দর তাম্রলিপ্ত। বিদেশি পর্যটকদের বর্ণনায় ছড়িয়ে আছে তার নানা কাহিনি। আছে বিদেশি শিল্পীদের তুলিতে ধরা কিছু অপূর্ব নিদর্শন। আজকের তমলুকের প্রাচীন গৌরবচিহ্ন সবই প্রায় কালের গর্ভে বিলীন। হারিয়ে যাওয়া সোনার সময়ের অস্তিত্বের কিছু খোঁজ মিলেছে

রাজবাড়ির ভগ্নাবশেষ, তমলুক

প্রত্নতাত্ত্বিক খননে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে প্রত্নতাত্ত্বিকরা তমলুকে এবং তার আশপাশে পেয়েছেন বহু মূল্যবান পুরাবস্তু। প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দরই যে আজকের মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহর এ বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনও প্রত্নতাত্ত্বিকের।

এই মুহূর্তে তমলুক রূপনারায়ণ নদের পাশে এক মফস্বল শহর বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলা শহর। ঝকঝকে রাস্তা শহরের ধার ঘেঁষে ছুটে চলেছে হলদিয়া বন্দরের দিকে। অন্য একটি রাস্তা নন্দকুমার চারমাথার মোড় ছুঁয়ে সোজা দীঘার সাগরতীরে। যে-কোনও পর্যটক এ শহরে দাঁড়িয়ে হতাশ হতেই পারেন। কিন্তু একসময়ে এ শহরেই ছিল দেশের নানা ঐতিহ্য। ছিল বিশাল হর্ম্যরাজি, বৌদ্ধস্তূপ, মন্দির, রাজপথ। শুধু দেশের ইতিহাসের পাতায় নয়, সেসব ইতিহাসের কথা আছে প্রাচীন গ্রিক ও চিনা পরিব্রাজকের বর্ণনায়।

প্রাচীন কালের সে তাম্রলিপ্তের কোনও অস্তিত্ব হয়তো সেভাবে চোখে পড়ে না শহরে। কিন্তু আজও সে গৌরবের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বর্গভীমা, জিষ্ণুহরি, জগন্নাথ, রামজি, মহাপ্রভু, রাধাবিনোদ, রাধারমনের মতো অজস্র প্রাচীন মন্দির। যে-কোনও পর্যটক হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে যান স্থানীয় সংগ্রহশালা 'তাম্রলিপ্ত মিউজিয়াম অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার'-এর প্রদর্শকক্ষে। সেখানেও খোঁজ মিলবে সেকালের বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নদ্রব্যের নিদর্শনের। এছাড়া আছে নানা রীতির কয়েকটি পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ। কিছু বিশেষজ্ঞর ধারণা, প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগরীর বিপুল ধ্বংসাবশেষ এখানে মাটির তলায় কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে। সেই সুবর্ণ নগরীর খোঁজ যে-কোনও দিন মিলতে পারে প্রত্নতাত্ত্বিকদের শাবলের ঘায়ে।

এসব ঐতিহ্য ছাড়াও তাম্রলিপ্তের খ্যাতি ছিল বাণিজ্যের জন্য। ইংরেজ আমলে দেশিয় প্রথায় লবণ শিল্পের এক উল্লেখযোগ্য নাম ছিল তাম্রলিপ্ত। এলাকার ভূস্বামীদের উদ্যোগে চলতে থাকা লবণ শিল্পটি তাদের হাত থেকে ব্রিটিশরা কেড়ে নেয় কোম্পানির কালেই। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি এই তমলুকে তৈরি করে সল্ট এজেন্টের কুঠি। তাম্রলিপ্তের এই কুঠি ছিল লবণ শিল্পের প্রধান কার্যালয়।

কোম্পানির আমলে তমলুকে লবণ শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল বহু মানুষের ভাগ্য। অথচ একশ্রেণীর শ্রমিক-কর্মচারীকে কম শোষিত হতে হয়নি। সে সময় লবণ উৎপাদন ও বেচাকেনার হিসেবপত্রের সঙ্গে জড়িত কর্মচারীদের বলা হত মলঙ্গি। এইসব

মলঙ্গিদের কাজ করতে হত স্থানীয় সল্ট এজেন্টদের অধীনে। বহু গবেষকের লেখাতেই পাওয়া যায় মলঙ্গিদের প্রতি শোষণ আর অত্যাচারের কাহিনি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত লবণ শিল্পের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা সাবেকি আমলের কুঠিবাড়ি, কাছারি আর আড়ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল তমলুকে। দু-একটি ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কোনও খোঁজ নেই সেসবের। সাধারণত খুব নিষ্ঠুর হত এইসব লবণ এজেন্টরা। কিন্তু তাদের মধ্যে দয়ালুও ছিলেন দু-একজন। এইসব সল্ট এজেন্টের কেউ কেউ গড়েছেন স্কুল, মন্দির, দাতব্য চিকিৎসালয়। তারই স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে তমলুক হ্যামিল্টন স্কুল, রেমিংটন চিকিৎসালয় কিংবা পদুমবসান পাঠাগার।

মোগল সম্রাট আকবরের আমলে দেশিয় রাজ্যগুলোর মধ্যে নজর কেড়েছিল তমলুক। তাম্রলিপ্ত বন্দর শহরের উল্লেখ আছে আবুল ফজলের লেখা 'আইন-ই-আকবরী'তে। আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল জানাচ্ছেন, সে সময় মেদিনীপুর জেলায় যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদ রাজারা রাজত্ব করতেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিল তাম্রলিপ্ত। আবুল ফজল তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে জানাচ্ছেন, এই মহলের অধিকারভুক্ত রাজার একটি শক্তিশালী দুর্গ ছিল। রাজস্ব আদায় হত ২৫,৭১,৪৩০ দাম। টাকার মূল্যে সেকালে এর পরিমাণ ৬৪,২৮৫ টাকা ১২ আনা। তমলুক মহলের সৈন্যসংখ্যা সে সময় ছিল পঞ্চাশ অশ্বারোহী ও একহাজার পদাতিক। আইন-ই-আকবরীতে ওই দুর্গের বর্ণনা আছে অসাধারণ। অথচ কোনও চিহ্নই আজ আর সেই দুর্গের নেই। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আকবরের আমলে তমলুকের সেসব সম্পদ মিলিয়ে গেছে সমুদ্রগর্ভে।

●

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত লবণ শিল্পের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা সাবেকি আমলের কুঠিবাড়ি, কাছারি আর আড়ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল তমলুকে। দু-একটি ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কোনও খোঁজ নেই সেসবের। সাধারণত খুব নিষ্ঠুর হত এইসব লবণ এজেন্টরা। কিন্তু তাদের মধ্যে দয়ালুও ছিলেন দু-একজন। এইসব সল্ট এজেন্টের কেউ কেউ গড়েছেন স্কুল, মন্দির, দাতব্য চিকিৎসালয়। তারই স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে তমলুক হ্যামিল্টন স্কুল, রেমিংটন চিকিৎসালয় কিংবা পদুমবসান পাঠাগার।

●

মির্জা দেদার আলি বেগ নামে খোজার কথা আছে মৌলভি আব্দুল ওয়ালি খাঁর লেখায়। ওয়ালি খাঁ তমলুক পরিদর্শনে আসেন ১৯১৫ সালে। এই বন্দর শহরটি পরিদর্শন করে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করেন। মৌলভি লিখেছেন আওরঙ্গজেবের আমলে তৈরি 'বারদুয়ারি' সৌধের কথা। সে সৌধও এখন নদীগর্ভে। মৌলভি ওয়ালি সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রদত্ত একটি রাজকীয় সনদ পরীক্ষা করার সময় জানতে পারেন বারদুয়ারি ছাড়াও বেশ কয়েকটি সৌধের কথা। পরের দিকে একটি দর্শনীয় মসজিদ ও ইদগা তৈরি হয় নরপোতায়। এই সময়ই খাজনা অনাদায়ের অভিযোগ তুলে তমলুকের দখল নেন হিজলির মসনদ-ই-আলার নিযুক্ত মির্জা দেদার আলি খোজা।

১৭৬৭ সালের গোড়াতেই মারা গেলেন মির্জা দেদার আলি। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মাথাচাড়া দিলেন তমলুক জমিদারের দাবিদাররা। দাবিদারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মৃত রাজা কমলনারায়ণের মা রানী সন্তোষপ্রিয়া এবং তাঁরই সতীনের ছেলে প্রয়াত কৃপানাথের স্ত্রী রানী কৃষ্ণপ্রিয়া। সম্পর্কে দুজনে ছিলেন শাশুড়ি ও পুত্রবধূ। কিন্তু সম্পত্তির দাবি নিয়ে দু-পক্ষের সম্পর্কের দেওয়ালে ফাটল ধরল।

কোম্পানির আমল তখন। সম্পত্তির দখল নিতে পরস্পর দাবি নিষ্পত্তির জন্য রানী সন্তোষপ্রিয়ার পক্ষে সালিসি করার দায়িত্ব দেওয়া হল সে সময়কার নবাবের দেওয়ান নন্দকুমার রায়কে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ দায়িত্ব পেলেন রানী কৃষ্ণপ্রিয়ার পক্ষে। দুই দেওয়ান সুপারিশ করলেন, উভয় রানীকে সমান অংশে জমিদারি ভাগ করে দেওয়া হোক। নন্দকুমার এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সুপারিশ গেল গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল-এর কাছে। কাউন্সিল দুই রানীকেই তমলুকের জমিদারি ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন।

দুই দেওয়ানের সিদ্ধান্তে দারুণ খুশি হলেন দুই রানীই। তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে পুরস্কারস্বরূপ নন্দকুমারকে ছ-খানি গ্রামসহ তালুক বাসুদেবপুর এবং গঙ্গাগোবিন্দকে আটটি গ্রাম নিয়ে গঠিত তালুক গোপালপুর উপহার দিলেন। সে সময় বাসুদেবপুর তালুকে একটি বিশাল হাট বসান দেওয়ান নন্দকুমার। সে হাটটি এখন এলাকায় প্রসিদ্ধ নন্দকুমার হাট নামে। এমনকি এই অঞ্চলটির নামও নন্দকুমার। নন্দকুমার বর্তমানে বর্ধিষ্ণু বাণিজ্য অঞ্চল। নন্দকুমারে এসেই জাতীয় পথ ধরে যেতে হয় হলদিয়া, দীঘা, তমলুক, মহিষাদল সহ বিভিন্ন জায়গায়। নন্দকুমার নামে এখানে একটি থানাও গড়া হয়েছে। পরে ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ বাধে নন্দকুমারের। ফাঁসি হয় নন্দকুমারের। মেদিনীপুর জেলার মানুষের স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল নন্দকুমারের নাম।

রানী সন্তোষপ্রিয়া এখনও বেঁচে আছেন। হঠাৎই এক কঠিন অসুখে মারা গেলেন তাঁর একমাত্র পুত্র। তখন তিনি দত্তকপুত্র নেন আনন্দনারায়ণকে। ১৭৭১ সালে আনন্দনারায়ণ অর্ধেক অংশের মালিক হন তমলুকের জমিদারির। এই বছরই রানী কৃষ্ণপ্রিয়া একটি দেওয়ানি মামলা ঠুকে আরও একআনা বের

করে নিলেন সন্তোষপ্রিয়ার অংশ থেকে। ফলে কৃষ্ণপ্রিয়ার সম্পত্তির অংশ দাঁড়াল ন-আনা। অন্যদিকে সাত আনাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল রাজা আনন্দনারায়ণকে।

তখন আনন্দনারায়ণের আমল চলছে। ১৭৮৩ সালের গোড়ার দিক। তমলুকের সল্ট এজেন্ট হয়ে এলেন বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের মিঃ উইলিয়াম ডেন্ট। এই বছরই দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে তমলুক জমিদারির দুই শরিকে গণ্ডগোল লাগল। তমলুকের জমিদারদের আরাধ্য দেবী ছিলেন বর্গভীমা। তাঁর পুজো হত শাক্ত মতে। বর্গভীমা দেবীর পুজোর একটি বিশেষ নিয়ম চালু ছিল আগাগোড়া। বর্গভীমার অধিষ্ঠানের ফলে পীঠস্থানের নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে দুর্গা, কালী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবীর পুজো চলত না। সেজন্য তাম্রলিপ্ত রাজবাড়ির চিরকালের প্রথা অনুসারে দুর্গোৎসব হয় সাবেকি রাজবাড়ি অঞ্চলে। এই রাজপ্রাসাদকে বলা হত বৈঁচবেড়ে। এই গড়েই বাস করতেন রানী কৃষ্ণপ্রিয়া।

কৃষ্ণপ্রিয়া আনন্দনারায়ণকে সাফ জানিয়ে দিলেন বর্গভীমার নিয়ম মতো বৈঁচবেড়ে গড়ে দুর্গোপুজো করতে দেওয়া হবে না। আনন্দনারায়ণ বেঁকে বসলেন। তিনি নালিশ জানালেন ইংরেজ দরবারে। ইতিমধ্যে মিঃ উইলিয়ম ডেন্ট-এর সঙ্গে আনন্দ নারায়ণের বেশ দহরম-মহরম গড়ে উঠেছিল। আনন্দনারায়ণের আবেদনের জেরে গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল হেস্টিংসের পরওয়ানাসহ কোম্পানির সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তিনি হাজির হলেন বৈঁচবেড় গড়ে। জোর লড়াই বাধল রানী কৃষ্ণপ্রিয়ার দেশিয় রক্ষীদের সঙ্গে। প্রথম দফায় দেশিয় রক্ষীরা হটিয়ে দিলেন কোম্পানির ফৌজকে। এবার পালটা আঘাত এল কোম্পানির তরফে। গভর্নরের আদেশে বাজেয়াপ্ত করা হল কৃষ্ণপ্রিয়ার সব সম্পত্তি, এমনকি গড়ের রক্ষিত কামানও। তাম্রলিপ্তের ইতিহাসে এই সঙ্গে শুরু হয়ে গেল আর এক অধ্যায়। কোম্পানি তমলুকের জমিদারির সম্পূর্ণ মালিক করে দিলেন আনন্দনারায়ণকে। তার সঙ্গে হয়ে গেল দশশালা বন্দোবস্তের কাজ। এই জয়ে ভীষণ খুশি হলেন আনন্দনারায়ণ। কৃতজ্ঞতা জানাতে স্থানীয় সল্ট এজেন্ট ডেন্টকে সতেরো একর জমির নির্দিষ্ট খাজনা আদায়ের শর্তে পাট্টা দিয়ে দিলেন।

মিলড্রেড আর্চারের লেখা 'ব্রিটিশ পোর্ট্রেট পেন্টার্স ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থেও আমরা পাই আনন্দনারায়ণ ও ডেন্ট-এর কথা। ডেন্ট সম্পর্কে আর্চার জানাচ্ছেন, তমলুকের সল্ট এজেন্ট ডেন্ট থাকতেন বিশাল এক নিমবাগানে ঘেরা বাংলোয়। তাঁর সঙ্গে থাকতেন ভাই মিঃ জন। মিঃ উইলিয়ম বেন্ট-এর বাড়ি ছিল বিশাল প্যালাডিয়ান স্থাপত্যের। চারদিকে ছিল প্রসারিত রাস্তা। সামনে কাছারি বাড়ি আর ডানদিকে বিশাল রূপনারায়ণ নদ। এই রূপনারায়ণ নদ দিয়ে তাম্রলিপ্ত বন্দরে নোঙর করত বিশাল বিশাল জাহাজ।

প্রখ্যাত শিল্পী আর্থার উইলিয়াম ডেভিসের তুলিতে ফুটে উঠেছে বিলেতের চালু ফিওফমেন্ট আইনানুসারে দুজন সাক্ষীর সামনে মাটি কেটে দখল গ্রহণের অনুষ্ঠান।

ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে তমলুকের অতীত ইতিহাস। তাদের প্রকাশিত নথিতেও বলা হয়েছে, উইলিয়ম ডেন্ট এবং আনন্দনারায়ণের ঘনিষ্ঠতার কথা। ১৭৮৬ সালের ২৮মে ডেন্ট কলকাতা রেভেনিউ বোর্ডের কাছে অনুমোদনের জন্য একটি দলিল পাঠান। পরে সেটি রেজেস্ট্রি হয়ে ফেরতও আসে। এই দলিলটিই ছিল তমলুকের জমিদার আনন্দ নারায়ণের ডেন্টকে দেওয়া আনুমানিক ১৭ একর ভূসম্পত্তি বার্ষিক খাজনার ভিত্তিতে বন্দোবস্তের এক পাট্টা। এই স্থাবর সম্পত্তিটি রূপনারায়ণ নদের ধার ঘেঁষেই। বোলপুকুর বা বউল পুকুর নামে একটি বিরাট দীঘির চারপাশ জুড়ে পাঁচটি প্লটে ছিল এই সম্পত্তি। এই জলাশয়ের দক্ষিণ পাড়ে ডেন্ট তৈরি করেছিলেন বসতবাড়ি, কাছারি বাড়ি আর মূল্যবান গাছে ভরা বাগান।

সে সময় কলকাতায় বেশ কয়েক বছর ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী আর্থার উইলিয়ম ডেভিস। তখন ফটো তোলার প্রচলন হয়নি। উইলিয়ম ডেন্ট চেয়েছিলেন আনন্দনারায়ণের হাত থেকে জমি দখলের অনুষ্ঠান পর্বটি চিত্রবদ্ধ করতে। তিনি আমন্ত্রণ জানিয়ে তমলুকে এনেছিলেন সেই বিখ্যাত ব্রিটিশ চিত্রকর আর্থারকে। আর্থারের তুলিতে ফুটে উঠেছিল সে দৃশ্য। ছবিতে ধরা হয়, আঠার শতকে চালু থাকা বিলেতের 'ফিওফমেন্ট' নামে আইনানুগ প্রথামত দুজন সাক্ষীর সামনে মাটি কেটে দখল গ্রহণের অনুষ্ঠান।

সেকালের তমলুকের জমিদারদের চেহারা এবং তমলুক অঞ্চলের রূপনারায়ণ নদ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এইসব ছবি থেকে। চিত্রকর টমাস ও উইলিয়ম ড্যানিয়েল পরে আঁকেন একগুচ্ছ ছবি। এই সিরিজের নাম ছিল 'Near Gangwaugh Colly on the River Hooghly.' এ ছাড়া টমাসের আঁকা একটি ছবি ও লেখা থেকে জানা যায়, ১৮৮৮ সালে নদীপথে হাওড়া থেকে তমলুকে এসেছিলেন হাওড়া ব্যাপটিস্ট মিশনারির পক্ষে প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক উইলিয়াম কেরি। তিনি ধর্মপ্রচারক

ছাড়াও ছিলেন ভাল চিত্রকর। কেরির আঁকা নদীবক্ষ থেকে বর্গভীমা মন্দিরের ছবি আছে ব্রিটিশ পেন্টার্স ইন ইন্ডিয়া-তে। উইলিয়ম কেরির লেখাতেও আছে তমলুকের জমিদার আর রূপনারায়ণ নদের কথা। কেরি জানাচ্ছেন, সে সময় হাওড়া থেকে তমলুক নদীপথে যাতায়াত বেশ সুবিধের ছিল। তমলুকে বেশ কিছু বর্ধিষ্ণু পরিবার ছিল। এইসব পরিবার সেকালেই শিক্ষা-দীক্ষায় বেশ আগ্রহী ছিলেন।

তমলুকের গা ঘেঁষেই ছিল মহিষাদল। রূপনারায়ণের নদের তীরজুড়ে এর পাশে গেঁওখালি। মহিষাদলে তখন আনন্দ নারায়ণের সমসাময়িক ভূস্বামী রানী জানকি। তমলুকের পাশাপাশি মহিষাদলের জমিদারের কাছ থেকেও বেশ কয়েক হাজার একর জঙ্গল ও পতিত জমি কোম্পানি লবণ উৎপাদনের জন্য দখল নেয়। তারা একটি পাকাপোক্ত চুক্তিও করে।

শর্তে বলা হয়, দশশালা বন্দোবস্তের দরুন জমিদারদের দেয় খাজনা মকুব করা হবে। এছাড়া জমিদাররা পাবেন কোম্পানির বরাদ্দ বার্ষিক নিমক মাসোহারা। তমলুক ছিল তখন বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সল্ট এজেন্সির মূল কেন্দ্র। সে সময় রূপনারায়ণ বন্দর থেকে লবণ আমদানি-রপ্তানির কাজে ব্যবহার করা হত আটশো মণ থেকে হাজার মণ পর্যন্ত লবণের নৌকা। এইসব নৌকার নামকরণ করা হয় 'তমলুক সল্ট বোট'। বিভিন্ন ওজনের মালপত্রের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন নৌকার নামকরণ পাওয়া যায় জি এ প্রিন্সেপ-এর 'দা টমলুকস বোট' বই থেকে। আবার এ ধরনের নৌকায় রানীগঞ্জ থেকে নদীপথে কয়লা আসত তমলুক বন্দরে। কয়লা বোট থেকে এইসব নৌকার নামকরণ হয়েছিল 'কোলা বোট'।

আঠারো শতকেও গভীর জঙ্গলে ঢাকা ছিল তমলুক ও মহিষাদলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। বিশেষ করে ভাগীরথী তীরের মহিষাদল থেকে তমলুক পর্যন্ত উত্তর-পূর্বে ছিল বিশাল জঙ্গল। সে সময় এই অঞ্চলকে বলা হত নাটশাল জঙ্গল। জঙ্গলজুড়ে ছিল হিংস্র ও ভয়ঙ্কর জন্তু-জানোয়ার। চিতা বাঘ, বুনো শূকর, বুনো মোষ আর বিষধর সাপেদের ছিল অবাধ চলাফেরা। আর ছিল প্রচুর হরিণ। এইসব হরিণের দল সকাল-বিকেলে ঢুকে পড়ত গাঁয়ে। তারা নিশ্চিন্তে চরে বেড়াত গরু-ছাগলের মতোই। তবে জঙ্গলের পাশের গ্রামগুলোতে সন্ধের পর ভয় কম ছিল না। বুনো মোষ দল বেঁধে খেয়ে যেত খেতের ফসল। কখনও বেরিয়ে আসত চিতা। ইংরেজ শাসকের আমলারা অনেক সময় বুনো মোষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিবিধান চেয়ে প্রায়ই সদরে রিপোর্ট করত।

জঙ্গুলে এলাকায় বুনো মোষের অত্যাচার একসময় এতই বেড়ে গেল যে, এলাকার আমলারা বাধ্য হলেন গভর্নরের কাছে আবেদন জানাতে। ১৭৮৫ সালে কোম্পানির সল্ট এজেন্টের ভারপ্রাপ্ত আমলারা পরিকল্পনা নিলেন জঙ্গল উচ্ছেদের।
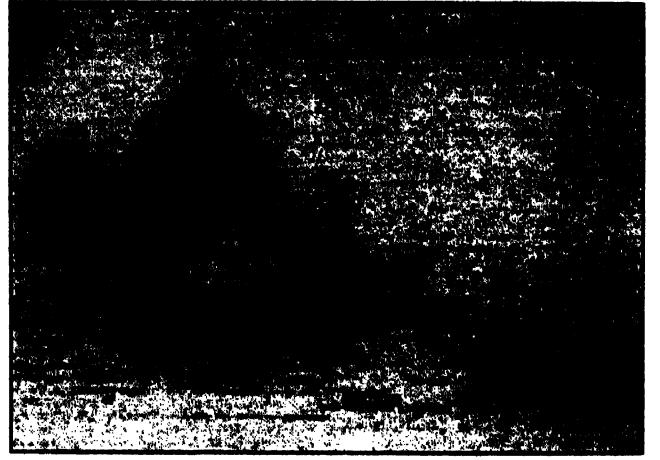
গেঁওখালির পঞ্চরত্ন শিবমন্দির (১৮৮৮), উইলিয়াম কেরী অঙ্কিত স্কেচচিত্র

১৭৮৫ সালের মার্চ মাসে মহিষাদলের নাটশাল জঙ্গল ইজারা নিলেন মিঃ ম্যারিয়ট। তিনি গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিলের কাছে আবেদন জানালেন জঙ্গল সাফাইয়ের জন্য। মিঃ ম্যারিয়ট ওই জঙ্গলে চাষবাসের জন্য একটি পরিকল্পনাও জমা দিলেন। কিন্তু গভর্নর ওই প্রস্তাবে সায় দিলেন না।

১৭৮৮ সালে আগস্ট মাসে জঙ্গল কাটাইয়ের ফের আবেদন জানালেন তমলুকের সল্ট এজেন্ট উইলিয়ম ডেন্ট। এবার মঞ্জুর হল আবেদন। জঙ্গল সাফাই বাবদ কোম্পানি মঞ্জুর করল ১৫,২৯১ টাকা। কিন্তু এ কাজে খরচ হয়ে গেল মোট ২৯,৫৭০ টাকা ২ আনা ১১ পাই। জঙ্গল কাটাইয়ের ফলে যে কাঠ মজুত হল তা দেশিয় প্রথায় লবণ তৈরিতে জ্বালানির প্রয়োজনে লেগে গেল। উদ্বৃত্ত আশি হাজার মণ কাঠ চালান হয়ে গেল হিজলির সল্ট এজেন্ট মিঃ হিউয়েটের কাছে। নাটশাল জঙ্গল মুক্ত করার কাজ শুরু হল ১৭৮৫ সালে। দীর্ঘ আটবছর টানা কাজের পর জঙ্গল সাফাই শেষ হল ১৭৯১ সালের শেষে। তমলুকের পাশে নাটশালে গড়ে উঠল বেশ বড় একটি গঞ্জ।

ভাগীরথী নদীবক্ষ থেকে কুঁকড়াহাটির দৃশ্য (১৭৮৬)   শিল্পী : টমাস ও উইলিয়াম ড্যানিয়েল

হাওড়া ব্যাপটিস্ট মিশনারির প্রচারক উইলিয়ম কেরির স্কেচ এবং কয়েকজন পর্যটকের তথ্য থেকে এটা পরিষ্কার, তমলুক এবং তার পাশাপাশি গেঁওখালি, মহিষাদল, কুঁকড়াহাটি প্রভৃতি অঞ্চলে ছিল প্রচুর মন্দির। পুরাকীর্তির প্রাচুর্যে সম্পদশালী ছিল এই এলাকা। এ শহরে পাওয়া গেছে বিষ্ণু লোকেশ্বর মূর্তি। ভাস্কর্যের নিরিখে সেটি খ্রিস্টীয় নবম শতকের পুরাবস্তু। সপ্তনাগের ছাতার তলায় মহাপদ্মের ওপর দাঁড়িয়ে এই মূর্তি। ব্রাহ্মণ্য দেবতা বিষ্ণুরই মতো চতুর্ভুজ বনমালা গলায়। সপ্তনাগ ছত্রের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে পঞ্চবুদ্ধের অন্যতম অমিতাভ বুদ্ধ। মহাযানী বৌদ্ধ দেবতা লোকেশ্বর এবং ব্রাহ্মণ্য দেবতা বিষ্ণু—এই দুয়ের সংমিশ্রণে নির্মিত মূর্তিকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রত্নতাত্ত্বিকেরা লোকেশ্বর বিষ্ণু নাম দেন। এখানে যে পাথরের মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল তারই স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে দেখা যায় নদীর পাশে এক বিরাট আমলক শিলা।

শুধু তমলুক নয়, রূপনারায়ণ, ভাগীরথী এবং কংসাবতীর ধারে বেশ কয়েকটি গঞ্জে সেসময় ছিল জৈন ধারার চৌখুপী মন্দির। তমলুকের পাশেই পাওয়া গেছে একটি গর্ভগৃহ। এটি ঝামাপাথরের তৈরি। গর্ভগৃহের চতুর্দিকে আছে ঘেরা এক প্রদক্ষিণ পথ। এ ধরনের গঠন পরিকল্পনার মন্দির পূর্ব ভারতে কমই আছে। এমনকি এখান থেকে কিছু দূরে কয়েকটি গ্রামে পাওয়া যায় বেশ কিছু জৈন মূর্তির ও মন্দিরের মাথায় ব্যবহৃত পাথরের আমলক শিলার ভগ্নাংশ। রূপনারায়ণ থেকে অদূরে কংসাবতী নদীর উভয় পারে মুসলিম পর্ব যুগে ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মীয় মঠ-মন্দির তৈরি হয়। এইসব অঞ্চলের সঙ্গে সড়ক ও নদীপথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দরের।

ব্রিটিশ রাজত্বে কলকাতা থেকে মেদিনীপুরে ডাক চলাচলের একটি অন্যতম পথ ছিল কুঁকড়াহাটি, গেঁওখালি ও তমলুক হয়ে। সরকারি অফিস আর হাটবাজার নিয়ে জমজমাট হয়ে ওঠে এইসব অঞ্চল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে উইলিয়ম ব্রুক ও'শনেসি যে টেলিগ্রাফ লাইন বসিয়েছিলেন তার একটি শাখা তমলুক হয়ে চলে গিয়েছিল হিজলি পর্যন্ত। সে-সময় তমলুক বা মহিষাদল হয়ে কুঁকড়াহাটিতে ভাগীরথী পেরিয়ে ডায়মন্ডহারবার দিয়ে এটাই ছিল কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগের সহজ পথ। রেনেল সাহেবের মানচিত্রেও উল্লেখ আছে Tamlook, Cookerhatty প্রভৃতির নাম।

এইসব অঞ্চল যে বর্ধিষ্ণু ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন এক মানচিত্রে কয়েকটি দূর-বিস্তৃত পথের সংযোগস্থল। একটি পথ দিয়ে ছিল মেদিনীপুর এবং হাওড়া জেলার প্রধান প্রধান গঞ্জগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা। জলপথ দিয়ে সর্বত্র যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত ছিল। ১৭৭৯ সালে কোম্পানির আমলের সার্ভেয়ার জেনারেল জেমস রেনেলের তৈরি মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে, তিনটি প্রধান পথ চলে গেছে তমলুক থেকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। তিনটি পথের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত পথটি মহিষাদল (রঙ্গি বসান) থেকে নন্দীগ্রাম থানার ট্যাংরাখালি ও ময়না থানার শ্যামপুর হয়ে উত্তর-পশ্চিমে কেদার-ভূরভূরির ওপর দিয়ে কাঁসাই পেরিয়ে পাথরার হয়ে মেদিনীপুর শহর। মধ্যবর্তী আর একটি পথ তমলুক থেকে টুলা, প্রতাপপুর, পাঁশকুড়া হয়ে ডেবরা এবং আর একটি পথ পাঁশকুড়া হয়ে ঘাটাল, চন্দ্রকোণা রোড, বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়ায় মিশেছে।

ইংরেজ শাসনে এইসব রাস্তার অধিকাংশই পরিত্যক্ত হওয়ায় বর্তমানে অনেক রাস্তারই অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া মুশকিল। রেনেলের মানচিত্রটি ২১৭ বছর পূর্বে কোম্পানির আমলে তৈরি হলেও পথগুলো আরও পুরনো। ইংরেজ কর্তারা পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৮১ সালের আগে পর্যন্ত কোনও পথঘাট তৈরির পরিকল্পনা করেনি। অনেকগুলো পথ আবার তৈরি হয় পাঠান-মোগল আমলে বা তারও আগে হিন্দু রাজাদের সময়ে। শুধু জলপথেই নয়, অন্যান্য ভাবেও অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে তমলুক ছিল এক বর্ধিষ্ণু নগর। শুধু তমলুক নয়, বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে তখন গড়ে ওঠে নানা গঞ্জ। সে-সময় তাম্রলিপ্ত-তমলুক থেকে কর্ণসুবর্ণ হয়ে একটি পথ সোজা দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। হিউয়েন সাঙ এই পথ দিয়েই কর্ণসুবর্ণ থেকে ওড্র, কঙ্গোদ, কলিঙ্গ, দক্ষিণ কোশল, অন্ধ্র হয়ে দ্রাবিড়, চোল, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন।

এছাড়া কলকাতা থেকে তমলুক হয়ে দেশ-দেশান্তরে যাওয়ার নানা রাস্তা ছিল। বাংলা থেকে পশ্চিমদিকে বিস্তৃত তিনটি পথে উত্তর ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রাখা হত। দক্ষিণ-পূর্ব মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্ত থেকে উত্তরমুখী হয়ে কর্ণসুবর্ণের (মুর্শিদাবাদ জেলার কানাসোনা) ভেতর দিয়ে রাজমহল, চম্পা ছুঁয়ে চলে গেছে পাটলিপুত্রের দিকে। তৃতীয় পথটি তাম্রলিপ্ত থেকে সোজা উত্তর-পশ্চিমমুখী হয়ে বিস্তৃত ছিল বুদ্ধগয়ার ভেতর দিয়ে অযোধ্যা পর্যন্ত।

তাম্রলিপ্ত নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে নদ-নদীর গন্ধ। এইসব নদ-নদী-খাল-বিলই ছিল এলাকার প্রাণ। তারাই এইসব

●

ব্রিটিশ রাজত্বে কলকাতা থেকে মেদিনীপুরে ডাক চলাচলের একটি অন্যতম পথ ছিল কুঁকড়াহাটি, গেঁওখালি ও তমলুক হয়ে। সরকারি অফিস আর হাটবাজার নিয়ে জমজমাট হয়ে ওঠে এইসব অঞ্চল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে উইলিয়ম ব্রুক ও'শনেসি যে টেলিগ্রাফ লাইন বসিয়েছিলেন তার একটি শাখা তমলুক হয়ে চলে গিয়েছিল হিজলি পর্যন্ত।

●
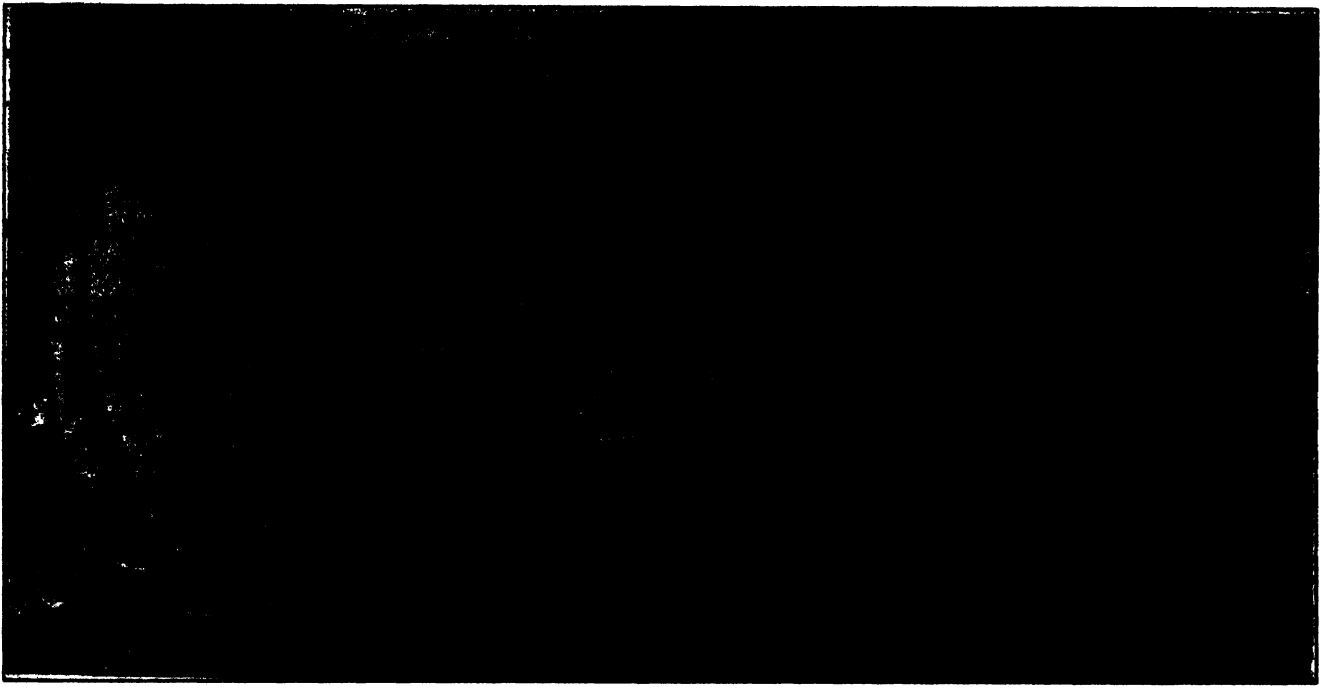
শিল্পীর তুলিতে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর

অঞ্চলকে গড়েছে, ভেঙেছেও। উঁচু জায়গা থেকে নদীর স্রোতে যে অজস্র পলি অবিরাম ভেসে এসেছে, তাই দিয়ে গড়ে বাংলার এইসব অঞ্চলের নিম্নভূমি। এসব অঞ্চলের তাই অনেকটাই নতুন পলি পড়া মাটি। এই নতুন-পুরাতন জমি-জল-জঙ্গলের ওপর দিয়ে বিভিন্ন নদ-নদী যে কতবার তাদের গতি বদলেছে তার ইয়ত্তা নেই। শুধু প্রকৃতির খামখেয়ালে নয়, লোভের ঠুলি পরা মানুষের হাতেও রুদ্ধ হয়েছে স্বাভাবিক বেড়ে চলা। রূপনারায়ণ, ভাগীরথী, কেলেঘাই, কংসাবতী, লীলাবতী প্রভৃতি নদ-নদী সুজলা-সুফলা করেছে তাম্রলিপ্ত সুবর্ণ বন্দরকে। এদের দুই তীরে বিকাশ হয়েছে মানুষের বসতি, কৃষির পত্তন, গ্রাম, নগর, বাজার, বন্দর, সম্পদ, সমৃদ্ধি, শিল্প, সাহিত্য, ধর্মকর্ম। তাম্রলিপ্তের মানুষ তাই যেমন এইসব নদ-নদীকে ভয়ভক্তি করেছে, আবার আদর করে বসত গড়েছে তাদেরই তীরে।

গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রবাহপথ বহুবার বদলেছে। খুব প্রাচীন যুগে পূর্ণিয়ার দক্ষিণে রাজমহল পার হয়ে রাজমহল, সাঁওতালভূমি, ছোটনাগপুর, মানভূম, ধলভূমের কোল ঘেঁষে গঙ্গা সোজা দক্ষিণবাহিনী হয়ে সাগরে পড়ত। এই প্রবাহেই ছিল অজয়, দামোদর এবং রূপনারায়ণের সঙ্গম। এই প্রবাহের দক্ষিণ কোণেই ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর। তারপর অষ্টম শতকের আগেই গঙ্গা পূর্ববর্তী খাতের থেকে সরে এসে রাজমহল থেকে মহানন্দা ও কালিন্দির খাতে গৌড়কে ডানদিকে রেখে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে এসে পড়েছে সমুদ্রে। তখনও দামোদর ও রূপনারায়ণ-পত্রঘাটার জল এসে পড়ত ভাগীরথীতে। তখনও বেশ জমজমাট ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর। কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ে কমতে লাগল রূপনারায়ণের প্রবাহ। ক্রমে ক্রমে সোনালি দিনগুলো ফিকে হয়ে এল তাম্রলিপ্ত বন্দরের।

বহু প্রাচীনকালেও তাম্রলিপ্ত থেকে দেশের মধ্যে এবং সমুদ্রপথে দেশের বাইরেও যাতায়াত ছিল। জাতকের গল্প থেকে জানা যায়, মধ্যপ্রদেশের বণিকরা বারাণসী বা চম্পা থেকে জাহাজে করে গঙ্গা-ভাগীরথীর জলপথে তাম্রলিপ্তে আসত। সেখান থেকে বঙ্গোপসাগরের কূল ধরে তারা সিংহলে যেত। কিংবা উত্তাল সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে তারা যেত সুবর্ণভূমি। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে রেলপথের সূত্রপাত হওয়ার আগে পর্যন্ত গঙ্গা-ভাগীরথী ছিল বাংলাদেশের সঙ্গে উত্তর ভারতের প্রধান যোগসূত্র। আর প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হত তাম্রলিপ্ত বন্দরকে। উত্তর অসমের রেশম জাতীয় জিনিসপত্র, পান, সুপারি, চন্দন কাঠ, বাঁশ, কাঠ, তেজপাতা ইত্যাদির যাতায়াত ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর ছুঁয়ে।

প্রাচীন বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য ও বাণিজ্যপথের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর। প্রথম শতকের একটি পুঁথি থেকে জানা যায়, দক্ষিণ ভারত ও সিংহলের সঙ্গে তাম্রলিপ্তের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। সপ্তম শতকে অসংখ্য চিন দেশিয় বৌদ্ধ শ্রমণ সিংহল থেকে বাংলায় এবং বাংলা থেকে সিংহলে যাতায়াত করেন। সিংহল থেকে সমুদ্রপথ ছিল মালয়, নিম্ন ব্রহ্ম, সুবর্ণদ্বীপ, চম্পা, কম্বোজ অবধি। তাম্রলিপ্ত থেকে চট্টগ্রাম, আরাকানের কূল বরাবর সুবর্ণদ্বীপ বা নিম্ন ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত দ্বিতীয় একটি সমুদ্রপথ বিস্তৃত ছিল। বাণিজ্য হত আরও একটি পথে। তাম্রলিপ্ত থেকে যাত্রা করে জাহাজগুলো সোজা এসে ভিড়ত ওড়িশা দেশের পলৌরা বন্দরে। সেখান

থেকে কোণাকুণি বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে যেত মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ-উপদ্বীপে।

তাম্রলিপ্ত থেকে আজকের তমলুক কিংবা কয়েক কদম এগিয়ে হলদিয়ার অগ্রগতি গ্রামকে কেন্দ্র করেই। প্রাচীন বাংলার কৃষিনির্ভর সমাজেই গড়ে উঠেছে তাম্রলিপ্তের সভ্যতা। যে সমাজ মূলত চাষবাস ও ছোটখাটো গৃহশিল্পের ওপর নির্ভরশীল, সে সমাজের গাঁ-গঞ্জ খুব বড় মাপের ছিল না। বেশি ছিল না গঞ্জের সংখ্যা। চাষের খেত ও চাষের কাজ চালানোর জন্য এবং ঘরবাড়ি তৈরি ও পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য যতটুকু শিল্প দরকার তার চেয়ে খুব বেশি গড়ার চেষ্টা ছিল না। গ্রামগঞ্জের বাইরে পুরনো তাম্রলিপ্তের বাইরে ছড়িয়ে থাকত জনপদ, চাষের খেত। যাঁরা চাষ করতেন তাঁরা বসবাস করতেন খেতের ধার ঘেঁষে, তাঁদের বসতিগুলো দিয়েই গড়ে উঠেছে একের পর এক গ্রাম।

চারদিকে গ্রাম দিয়ে ঘেরা হলেও তাম্রলিপ্ত ছিল বাংলার প্রাচীন নগরগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাম্রলিপ্তের নাগরিক সভ্যতাও খুব নিচু স্তরের ছিল না। এই নগরের জন্ম ছিল নানা তাগিদের প্রয়োজনে। একই কারণে গড়ে ওঠে পুণ্ড্র-পুণ্ড্রবর্ধনের মতো নগর। বছরের পর বছর ধরে তাম্রলিপ্ত ছিল অন্যতম আধুনিক জনপদ। এই নগরটি ছিল সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র। তাম্রলিপ্ত ছিল ভারতের একটি সুপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর। তাম্রলিপ্তের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ, এই নগর বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনন্য কেন্দ্র ছিল। কয়েক শত বছর ধরে অন্তর্দেশিয় রাজ্যের একটি ছিল বড় ধারার শাসনকেন্দ্রও।

●

চারদিকে গ্রাম দিয়ে ঘেরা হলেও তাম্রলিপ্ত ছিল বাংলার প্রাচীন নগরগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাম্রলিপ্তের নাগরিক সভ্যতাও খুব নিচু স্তরের ছিল না। এই নগরের জন্ম ছিল নানা তাগিদের প্রয়োজনে। একই কারণে গড়ে ওঠে পুণ্ড্র-পুণ্ড্রবর্ধনের মতো নগর। বছরের পর বছর ধরে তাম্রলিপ্ত ছিল অন্যতম আধুনিক জনপদ। এই নগরটি ছিল সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র। তাম্রলিপ্ত ছিল ভারতের একটি সুপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর।

●

আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে প্রবাসী বাঙালি ছাত্রের বর্ণনা দিচ্ছেন সমসাময়িক কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র। ক্ষেমেন্দ্র তাঁর 'দশোপদেশ' গ্রন্থে লিখছেন, '...রোগা লিকলিকে চেহারা, হাড় ক'খানা গোনা যায়। তিরিক্ষি মেজাজ, চোয়াড়ে স্বভাব। একটু ধাক্কা লাগলে পাছে মট করে ভেঙে যায়, সেই ভয়ে সবাই দূরে থাকে। ...'ওঙ্কার' আর 'স্বস্তি' উচ্চারণ করতে যদিও তাদের দাঁত ভেঙে যায়, তবু তাদের পাতঞ্জলভাষ্য, তর্ক, মীমাংসা সবই পড়া চাই।... তাদের সরু কোমরে ঝোলে লাল কটিবন্ধ। তাদের দু-কানে তিন তিনটে করে সোনার মাকড়ি, হাতে ছড়ি।...

এখন এসব ইতিহাসই। বাঙালির মুখের দিকে তাকালে কত বিস্মৃত মুখ মনে পড়ে দূর অতীতের। জঙ্গল হাসিল করে এদেশে যারা প্রথম ঘর বাঁধে, মাটির বুক চিরে যারা প্রথম ফসল ফলায় তাদের মুখ। সেসব মুখ নিয়েই গড়ে উঠেছিল তাম্রলিপ্ত। এই নদীমেখলা রূপনারায়ণের পাশে গড়ে উঠেছিল জনপদ। একেকটি অঞ্চলজুড়ে ছোট ছোট যে জনপদ, শশাঙ্কের সময় থেকে শুরু হয়েছিল তাকে বৃহত্তর দেশখণ্ডে গাঁথার চেষ্টা। রাঢ়, পুণ্ড্র, সুহ্ম বরেন্দ্র, বঙ্গ, হরিকেল, সমতট—আলাদা আলাদা জনপদের গণ্ডি দিয়ে নিজেদের সত্তা আর চেতনাকে আড়াল করে রাখতে পেরেছিল যেসব অঞ্চল, তাদের মধ্যে অন্যতম সুবর্ণবন্দর তাম্রলিপ্ত।

প্রাচীন বাংলার অচল অনড় মাটির টানে যে জনপদের জন্ম, সেই তমলুকের মানুষকে আমরা অনন্ত রূপে দেখেছি স্বাধীনতা আন্দোলনে। এই তমলুকই পেরেছে ১৯৪২ সালের ১৭ ডিসেম্বর তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে। ১৯৪৩ সালের ২৬ জানুয়ারি ওই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি করে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল এবং তমলুকে। একটি 'বিদ্যুৎ বাহিনী'ও গঠিত হয় এই সরকারের পরিচালনায়। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত। বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে ছিলেন অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, সুশীলচন্দ্র ধাড়া প্রমুখ। এছাড়া ১৯৪৭ সালের ১ মার্চ কৃষকরা জলপাইগুড়িতে যে তেভাগা আন্দোলন শুরু করেন তাতেও সমান তালে অংশ নেয় তমলুক, সুতাহাটা, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম।

ইতিহাসের সে এক যুগ ছিল। আজ রাজা নেই, উজির নেই—কালের গর্ভে বিলীন সাবেক কালের স্মৃতিচিহ্ন। প্রাচীন সুবর্ণবন্দর তাম্রলিপ্তের প্রাচীন গৌরবচিহ্ন এখন শুধু ইতিহাসের পাতায়, প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষণে। আজ সবই দূর অতীত।

তবুও সেই দূর অতীতের সোনালি আলোয় আজও উজ্জ্বল বন্দরনগরী তাম্রলিপ্ত।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও গবেষক
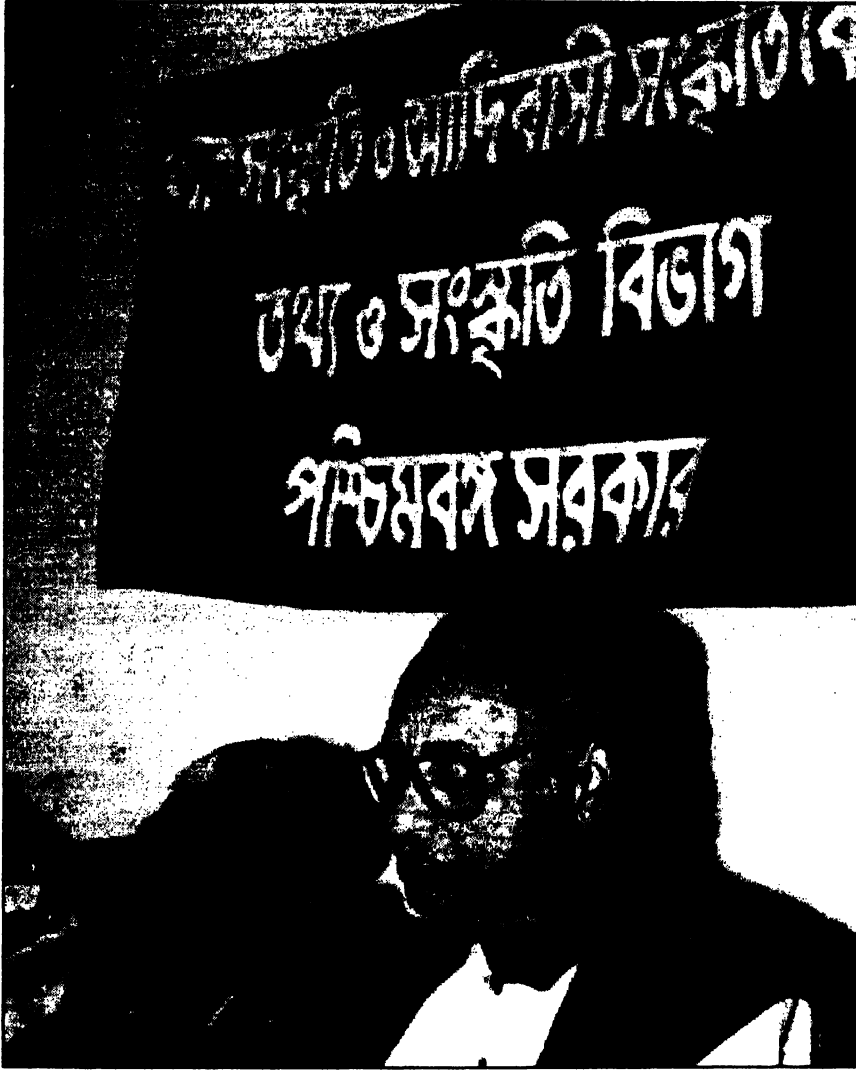
প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ব গবেষক, একাধিক গ্রন্থপ্রণেতা তারাপদ সাঁতরা সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধটি তাঁর সর্বশেষ রচনা—স.প.

মেদিনীপুর জেলার ধর্মীয় স্থাপত্য : মন্দির, মসজিদ ও গির্জা

তারাপদ সাঁতরা

মেদিনীপুর জেলা আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা। এই বিশাল জেলাটির নানা স্থানে বিভিন্ন সময়ে নির্মিত নানা ধর্মীয় স্থাপত্য কীর্তির সংখ্যাও অগণিত। ফা-হিয়ান (খ্রিঃ ৫ম শতক), হিউয়েন সাঙ্‌ ও ইৎসিঙ (খ্রিঃ ৭ম শতক) প্রভৃতি চীনা পর্যটকদের বিবরণে এ জেলায় কিছু কিছু স্থাপত্যের কথা উল্লিখিত হলেও, সেগুলির আকৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও বিবরণ নেই। তবে প্রাচীন বাংলায় মোটামুটি যে চার শ্রেণীর দেবালয়-স্থাপত্যের উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি হল পীঢ়া, শিখর, স্তূপশীর্ষ পীঢ়া ও শিখরশীর্ষ পীঢ়া দেউল। আলোচ্য এই চার প্রকরণের মন্দিরের মধ্যে শেষোক্ত দুটি রীতির কোনও মন্দিরের নিদর্শন এ জেলায় দেখা না গেলেও, প্রাচীন বাংলার দণ্ডভুক্তিতে যে স্তূপশীর্ষ পীঢ়া রীতির মন্দির প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কে অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী খ্রিস্টীয় ১১ শতকের 'অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতা' পুঁথিতে চিত্রিত এক দেবালয়ের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' প্রণেতা ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন যে, বর্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম অংশ, বর্তমান দাঁতন প্রাচীন সেই দণ্ডভুক্তির স্মৃতিবহ।

উল্লিখিত এই চার প্রকরণ ছাড়াও এ জেলায় আর এক অভিনব রীতির মন্দির একদা নির্মিত হয়েছিল। সে শৈলীর একমাত্র বিদ্যমান নিদর্শনটি খড়্গপুর থানার এলাকাধীন বালিহাটি গ্রামে অবস্থিত। পাথরে তৈরি, পরিত্যক্ত ও ধ্বংসপ্রায় সে
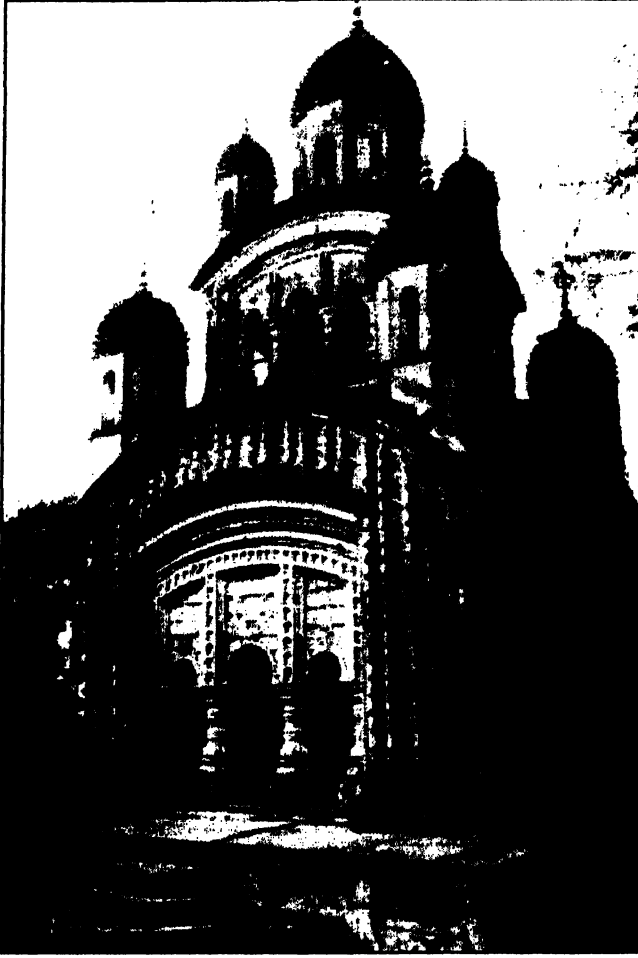
মুকসুদপুর গ্রামের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির ছবি : লেখক

দেবালয়ের শিখরদেশ ভগ্ন ও জঙ্গলাবৃত হওয়ায় তার সঠিক গঠন নির্ণয় করা শক্ত হলেও গর্ভগৃহের চতুর্দিকে এক ঘেরা প্রবেশপথসহ মূল প্রবেশপথের দুধারে দুটি প্রকোষ্ঠ দেখা যায়। অনুরূপ গঠন-পরিকল্পনার আর কোনও মন্দির পূর্ব ভারতে নেই। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এটির নির্মাণকাল খ্রিস্টীয় দশ শতক বলে অনুমান করেছেন।

উল্লিখিত মন্দিরটি ছাড়া প্রাক্-মুসলিম যুগের আরও যে একটি মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায় সেটি বীনপুর থানার ডাইনটিকরিতে অবস্থিত। কাঁসাই নদী তীরবর্তী সে মন্দিরটি ঝামা পাথরের পরিত্যক্ত এক পীঢ়া দেউল। গঠন স্থাপত্য অনুযায়ী মন্দিরটি খ্রিস্টীয় বারো-তেরো শতকের বলেই অনুমান।

তবে পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জেলার মতো, বিশেষ করে বাঁকুড়া জেলার বাহুলাড়া ও সোনাতপল, পুরুলিয়ার বড়াম-দেউলঘাটা ও পাড়া। বর্ধমানের সাত-দেউলিয়া এবং দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলার পশ্চিম জটা গ্রামের মতো, ইটের উচ্চশিখর যুক্ত মন্দির এ জেলায় নির্মিত হয়েছিল কিনা, তার কোনও হদিশ পাওয়া যায় না। তবে এ জেলায় অতীতে নির্মিত ছোট বড় অনেক ইট ও পাথরের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও সেখানে উপাসিত বিগ্রহাদির নিদর্শন জেলার নানা স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। মধ্যযুগে এ জেলার উপর দিয়ে যেভাবে ক্রমাগত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় হাঙ্গামার স্রোত বয়ে গেছে, তার ফলে এইসব সৌধগুলির অস্তিত্ব বজায় থাকার কথা নয়।

প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষগুলি এ জেলার যেসব স্থানে কেন্দ্রীভূত সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হল কেলেঘাই নদী তীরবর্তী পাথরঘাটা। এখানে প্রাপ্ত ঘণ্টা ও পদ্মকোরক উৎকীর্ণ পাথরের স্তম্ভগুলি যে কোনও এক প্রাচীন দেবালয়ে ব্যবহৃত হয়েছিল তেমন অনুমান মোটেই অসঙ্গত নয়। সেখানকার নিদর্শনগুলি দেখে অনুমান করা যায় সেগুলি সম্ভবত খ্রিস্টীয় দশ-এগারো শতকের কোনও পুরাকীর্তি।

এ জেলায় এককালে প্রতিষ্ঠিত আরও অনেক শিখর বা পীঢ়া রীতির মন্দির এখন লুপ্ত হলেও, সেসব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও সেগুলিতে ব্যবহৃত বিশাল আমলকশিলাগুলি তাদের অস্তিত্বের নিদর্শন স্বরূপ হয়ে আছে। জিনশহর, কিয়ার চন্দ্র, আষাড়িয়া গ্রাম, ঝাকরা, বাড়বাঁশি, চাঙ্গুয়াল, বাড়ুয়া, ভৈরবপুর, রসকুণ্ড, রাউতমনি, রোহিনী, হিরাপাড়ী, পাকুড়সেনী, বাড়মহিষদা, মৎনগর, রণবনিয়া, বেহারাসাই এবং ওড়গোঁদা প্রভৃতি স্থানে যেসব বৃহদাকার মন্দিরে ব্যবহৃত আমলকশিলা দেখা যায়, সেগুলি যে এক সময়ে স্থানীয় শিখর বা পীঢ়া মন্দিরে ব্যবহৃত হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

মুসলমান শাসনের প্রথম ভাগে, বিশেষ করে খ্রিস্টীয় পনেরো-ষোল শতকে এ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের বেশ কিছু

দণ্ডেশ্বর মন্দিরের পশ্চিমে প্রবেশপথের তোরণদ্বার, কর্ণগড় ছবি : লেখক

এলাকা ওড়িশার প্রভাবাধীন থাকায় সে অঞ্চলে বহু শিখর ও পীঢ়া-দেউলের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তার মধ্যে দেউল বাড় (থানা : নয়াগ্রাম), গগনেশ্বর (থানা : কেশিয়াড়ী), এগরা (থানা : এগরা), বাহিরী-দেউলবাড় (থানা : কাঁথি) ও গড়বেতা প্রভৃতি স্থানের শিখর-দেউল এবং দাঁতন, সেকুঁয়া (থানা : খড়্গপুর), বেলদা (থানা : বেলদা) ও গড়বেতায় অবস্থিত পীঢ়া-দেউলগুলি উল্লেখযোগ্য। সেগুলির মধ্যে এগরা ও বাহিরীর মন্দির দুটি ইঁটের ও বাকিগুলি ঝামাপাথরে নির্মিত। এসব পুরাতন মন্দির ছাড়া, পনেরো শতকের শেষে (১৪৯০ খ্রিঃ) স্থাপিত এ জেলার প্রাচীনতম ইঁটের চারচালা দেবালয়ের নিদর্শন হল, ঘাটালের সিংহবাহিনীর মন্দির।

এ জেলায় সতেরো শতকে নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে মাত্র চারটি প্রতিষ্ঠালিপিযুক্ত, যথা—কেশিয়াড়ীর সর্বমঙ্গলা, গড়বেতার রাধাবল্লভ, উড়িয়াশাহী এবং চন্দ্রকোণার মন্দির। শেষোক্তটির অবশ্য কোনও অস্তিত্বই আজ নেই। লিপি প্রমাণ-যুক্ত এ চারটি মন্দির ছাড়া আনুমানিক সতেরো শতকে নির্মিত অন্যান্য দেবালয়ের অধিকাংশই পাথরের এবং বহুক্ষেত্রে সেগুলির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্থানীয় ভূস্বামীগণ।

আঠারো শতকে এ জেলায় দীর্ঘদিন ধরে মারাঠা-বর্গীর অত্যাচার চলতে থাকায় এবং সর্বোপরি দুর্ভিক্ষ, সন্ন্যাসী ও চুয়াড় বিদ্রোহের দরুন, গোটা জেলা জুড়ে একটা অস্থির অবস্থা দেখা দেয়। সুতরাং এই শতকে এ জেলায় মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ বেশ হ্রাস পায়। অবশ্য এই শতকের শেষদিকে রেশম ও অন্যান্য আরও কতকগুলি শিল্পে উন্নতি ঘটায় ব্যাপকভাবে বেশ কিছু মন্দির নির্মিত হয়। সে কারণে আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের শেষ অবধি এ জেলায় ব্যাপক হারে যে মন্দির নির্মাণ হয়েছে তার একটি সামাজিক ভিত্তিও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কারণ এ সময়ের মন্দির-প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন ছোটখাটো জমির উপস্বত্বভোগী, রেশম ও সূতীবস্ত্র, লবণ, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, গুড় ও পিতল-কাঁসা প্রভৃতির উৎপাদক ও

●

এ জেলার দেবালয়গুলিকে প্রধানত শিখর, চালা, রত্ন ও দালান—এই চারটি শৈলীতে ভাগ করা যায়। ভারতীয় দেবালয়-স্থপাত্যের 'নাগর' রীতির অনুসরণে ওড়িশায় বিবর্তিত শিখর-প্রকরণের বেশ প্রভাব পড়েছে স্থানীয় শিখর-মন্দিরগুলিতে। ওড়িশার সঙ্গে দীর্ঘকালীন যোগাযোগের সূত্রেই তা ঘটেছে। খাঁটি ওড়িশি শৈলী অনুসারী জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপযুক্ত শিখর মন্দির এ জেলায় দেখা না গেলেও দেউলবাড়ের (থানা : নয়াগ্রাম) রামেশ্বরনাথের মন্দিরটি অন্যতম ব্যতিক্রম।

●

ব্যবসায়ী এবং যাজনক্রিয়ারত পূজারী বা কুলপুরোহিত। বিত্তের অনুপাতে তাঁরা মন্দির স্থাপত্যের সঙ্গে ভাস্কর্যের, বিশেষ করে পোড়া মাটির ভাস্কর্যের যে যোগসাধন করেছিলেন তা লক্ষণীয়।

এ জেলার দেবালয়গুলিকে প্রধানত শিখর, চালা, রত্ন ও দালান—এই চারটি শৈলীতে ভাগ করা যায়। ভারতীয় দেবালয়-স্থপাত্যের 'নাগর' রীতির অনুসরণে ওড়িশায় বিবর্তিত শিখর-প্রকরণের বেশ প্রভাব পড়েছে স্থানীয় শিখর-মন্দিরগুলিতে। ওড়িশার সঙ্গে দীর্ঘকালীন যোগাযোগের সূত্রেই তা ঘটেছে। খাঁটি ওড়িশি শৈলী অনুসারী জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপযুক্ত শিখর মন্দির এ জেলায় দেখা না গেলেও দেউলবাড়ের (থানা : নয়াগ্রাম) রামেশ্বরনাথের মন্দিরটি
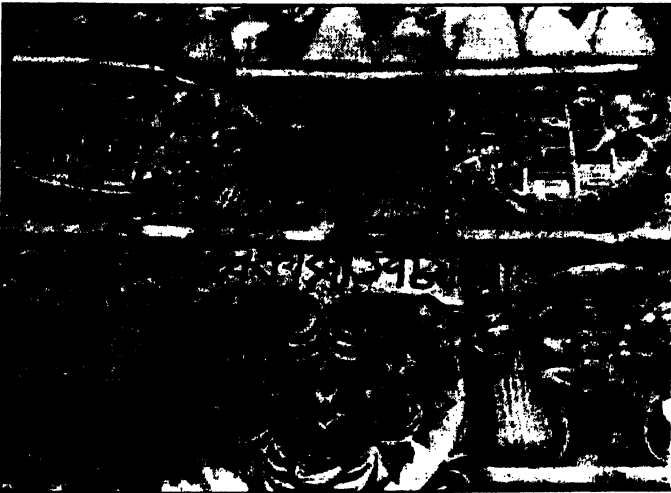
শ্রীধর জিউ মন্দিরে প্রতিষ্ঠালিপি ও ভাস্কর্য

লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরে উৎকীর্ণ টেরাকোটা ভাস্কর্য

ছবি : লেখক

ত্রৈলক্যনাথ শিবের পীঢ়া দেউল তলকুই ছবি : লেখক

অন্যতম ব্যতিক্রম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ষোল-সতেরো শতকে নির্মিত ওড়িশা-রীতির দেবালয়ে পৃথক নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ দেখা যায় না। কোথাও বা মূল মন্দির ও সংলগ্ন জগমোহন যথাক্রমে শিখর ও পীঢ়া-রীতির না হয়ে উভয়েই পীঢ়া গঠনের হয়েছে, যার দৃষ্টান্ত কেশিয়াড়ীর সর্বমঙ্গলা ও সেঁকোয়ার (থানা : খড়্গপুর) চন্দনেশ্বর মন্দির। আবার, বিশেষভাবে কাঁথি মহকুমায়, কিছু শিখর-মন্দিরের জগমোহনও প্রায় সমান উচ্চতর হওয়ায় প্রথম দর্শনে সেগুলিকে জোড়া শিখর-দেউল বলে ভ্রম হয়। এ জাতীয় দৃষ্টান্ত, বাহিরী-দেউলবাড় (থানা : কাঁথি), খারড় (থানা : খেজুরি), ভৈরবদাঁড়ি (থানা : পটাশপুর) এবং বাসুদেবপুরের (থানা : এগরা) শিখর-দেউলগুলি।

এ জেলায় খ্রিস্টীয় সতেরো শতকের পর থেকে ওড়িশা-মন্দির শৈলী প্রভাবিত শিখর মন্দিরগুলি জগমোহনবিহীন এক সরলীকৃত রূপে এসে পৌঁছেছে, যার বহু নিদর্শন জেলার নানা স্থানে অবস্থিত। ওড়িশার শিখর-রীতির 'বাঢ়' ও 'গণ্ডী'র অংশ সেগুলিতে নামেমাত্রই পৃথকীকৃত এবং কোথাও কোথাও সেগুলির আমলক একান্তই ক্ষুদ্রাকার। অন্যদিকে প্রথাগত পীঢ়া-রীতির জগমোহনের বদলে অকিঞ্চিৎকর মুখমণ্ডপের দেখা মেলে, যা আবার স্থান বিশেষে দোচালা, তিনচালা বা চারচালার এবং একরত্নেও রূপ নিয়েছে। এক্ষেত্রে পরিবির্তিত ও সরলীকৃত এই শিখর-মন্দিরগুলিও যে বাংলার নিজস্ব চালা ও রত্নরীতির মতোই স্বতন্ত্র এক আঞ্চলিক শৈলীর নিদর্শন তাতে সন্দেহ নেই।

গ্রামবাংলায় বাঁশ, কাঠকুটো ও খড় দিয়ে তৈরি দোচালা কুঁড়েঘরের আদলটিই আদি বাঙালি মন্দির-স্থপতিরা অনুসরণ করেছিলেন দোচালা বা এক বাংলা মন্দির নির্মাণে। পশ্চিমবাংলার অন্যত্র এই ধরনের বহু মন্দিরের অস্তিত্ব থাকলেও এ জেলায় অনুরূপ দেবালয়ের দৃষ্টান্ত খুবই কম। তবে শিখর অথবা একরত্ন মন্দিরের মুখমণ্ডপ অথবা চারচালা মন্দিরের সামনে জগমোহন হিসাবে নির্মিত দোচালা কিছু কিছু দেখা যায়। প্রথমটির দৃষ্টান্ত এরাপুর (থানা : পাঁশকুড়া) ও মোহনপুর এবং দ্বিতীয়টির আমোদপুরে (থানা : ডেবরা) অবস্থিত।

অন্যদিকে দুটি দোচালাকে পাশাপাশি স্থাপন করে এবং শীর্ষে কখনও চূড়া সংযোগ করে যে দেবালয়টি নির্মাণ করা হত, সেগুলিকেই বলা হত জোড়বাংলা। এ জেলায় অনুরূপ নিদর্শন অল্প হলেও, আনুমানিক সতেরো শতকে নির্মিত চন্দ্রকোণার দক্ষিণ বাজারে অবস্থিত ঝামাপাথরের বৃহদায়তন জীর্ণ জোড়বাংলা মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। ঝামাপাথরের তৈরি আর দুটি জোড়বাংলার দৃষ্টান্ত—বসনছোড়া গ্রামের (থানা : চন্দ্রকোণা) রাধাগোবিন্দের ও লালগড়ের (থানা : বীনপুর) রাধামোহন জীউর মন্দির। ইটের উল্লেখ্য জোড়বাংলা মন্দিরগুলি বড়বাজার ও মির্জাবাজার (থানা : মেদিনীপুর), রানীচক (থানা : দাসপুর) এবং পাইকপাড়িতে (থানা : ডেবরা) অবস্থিত।

দক্ষিণাকালী মন্দিরে টেরাকোটা ভাস্কর্য ছবি : লেখক
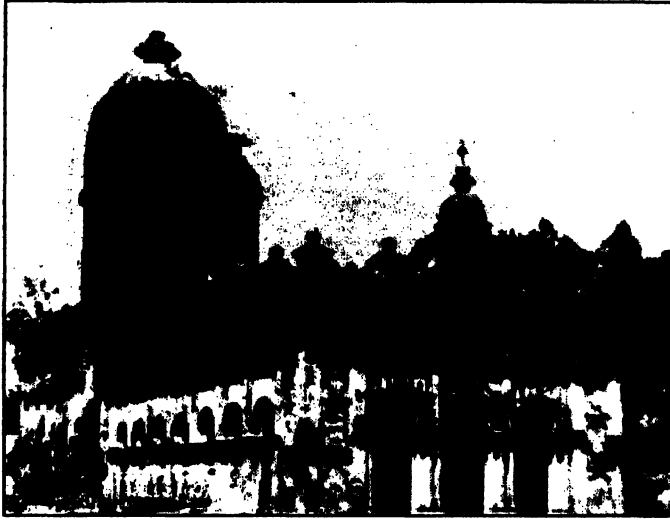
রাধামাধব মন্দির, পাঁচরোল   ছবি : লেখক   পাথরের জোড়বাংলা মন্দির, চন্দ্রকোণা

চারচালা কুঁড়ে ঘরের আদলে গঠিত চারচালা মন্দির এ জেলায় তেমন আদৃত না হলেও, এ শৈলীর লিপিযুক্ত সর্বপ্রাচীন নিদর্শন, ঘাটালের কোন্নগর পল্লীর সিংহবাহিনীর চারচালা জগমোহনযুক্ত চারচালা ইটের মন্দিরটি। এক সংস্কারলিপি থেকে জানা যায়, সেটি ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। আনুমানিক সতেরো শতকের পাথরের একটি চারচালা মন্দিরের দৃষ্টান্ত হল, গোয়ালতোড়ের সনকা মায়ের মন্দির। পাথরের আরও যে কটি চারচালা মন্দির দেখা যায়, সেগুলির অবস্থান হল, জয়ন্তীপুর ও রঘুনাথপুর (থানা : চন্দ্রকোণা), বাড় মহিষদা ও আমনপুর (থানা : কেশপুর)। এছাড়া আমনপুর (থানা : কেশপুর), দেউলি (থানা : পাঁশকুড়া), গোগৃহ (থানা : মেদিনীপুর), আমোদপুর (থানা : ডেবরা), শিলদা (থানা : বীনপুর) প্রভৃতি স্থানেও ইটের চারচালা মন্দির দেখা যায়। এ জেলায় নাটমণ্ডপ ও দোলমঞ্চ হিসাবে ব্যবহৃত চারচালা গড়নের ইমারতও কিছু আছে বনপাটনা (থানা : খড়্গপুর), খণ্ডরুই (থানা : দাঁতন) এবং পাইকপাড়ি (থানা : ডেবরা) প্রভৃতি স্থানে। শিখর দেউলের সঙ্গে সংযুক্ত চারচালা জগমোহন দেখা যায় বেঙ্দা (থানা : নারায়ণগড়), সারতা (থানা : সবং), মির্জাপুর ও বিশ্বনাথপুর (থানা : পটাশপুর), পাইকভেড়ি (থানা : ভগবানপুর) এবং দামোদরপুরের (থানা : দাঁতন) মন্দিরগুলিতে। দাসপুর থানার আজুড়িয়া গ্রামের চারচালা মনসা মন্দিরটি আবার শিখর-দেউলের মতো রথপগ করা, যা একান্ত অভিনব।

গ্রামের আটচালা কুঁড়েঘরের অনুকরণে নির্মিত আটচালা মন্দিরের সংখ্যাও এ জেলায় কম নয়। অসংখ্য এই জাতীয় শৈলীর মন্দিরের মধ্যে বৃহদায়তন ইটের মন্দিরের মধ্যে চাঁইপাট ও খুকুড়দহ (থানা : দাসপুর), তমলুক, মহিষাদল ও দেউলপোতা (থানা : সুতাহাটা), রামবাগ (থানা : মহিষাদল), ভবানীপুর ও ক্ষীরপাই (থানা : চন্দ্রকোণা), মালঞ্চ (থানা : খড়্গপুর) এবং মনোহরপুর (থানা : ঘাটাল) প্রভৃতি স্থানের মন্দিরগুলি উলেখ্য। ঝামাপাথরের আটচালা মন্দির দেখা যায়, চন্দ্রকোণা, গড়বেতা, পাথরবেড় ও ব্রাহ্মণগ্রাম (থানা : গড়বেতা) প্রভৃতি গ্রামে। এ জেলায় আটচালা মন্দিরের আর এক আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, শিখর-দেউলের মতো চালা মন্দিরেও রথপগের বিন্যাস। দৃষ্টান্ত রয়েছে, তেঁতুলিয়া ভূমযান (থানা : নারায়ণগড়), আমোদপুর, সত্যপুর (থানা : ডেবরা), কেরুড় (থানা : সবং), মামুদপুর (থানা : দাসপুর), বাড়-পারিট,
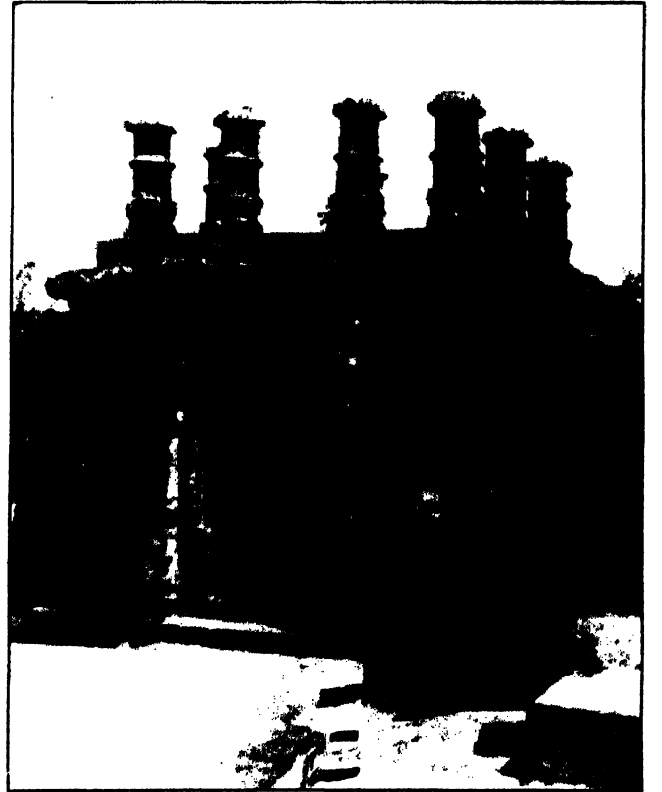
দণ্ডেশ্বর মন্দিরের পুব দিকের তোরণ, কর্ণগড়   ছবি : লেখক
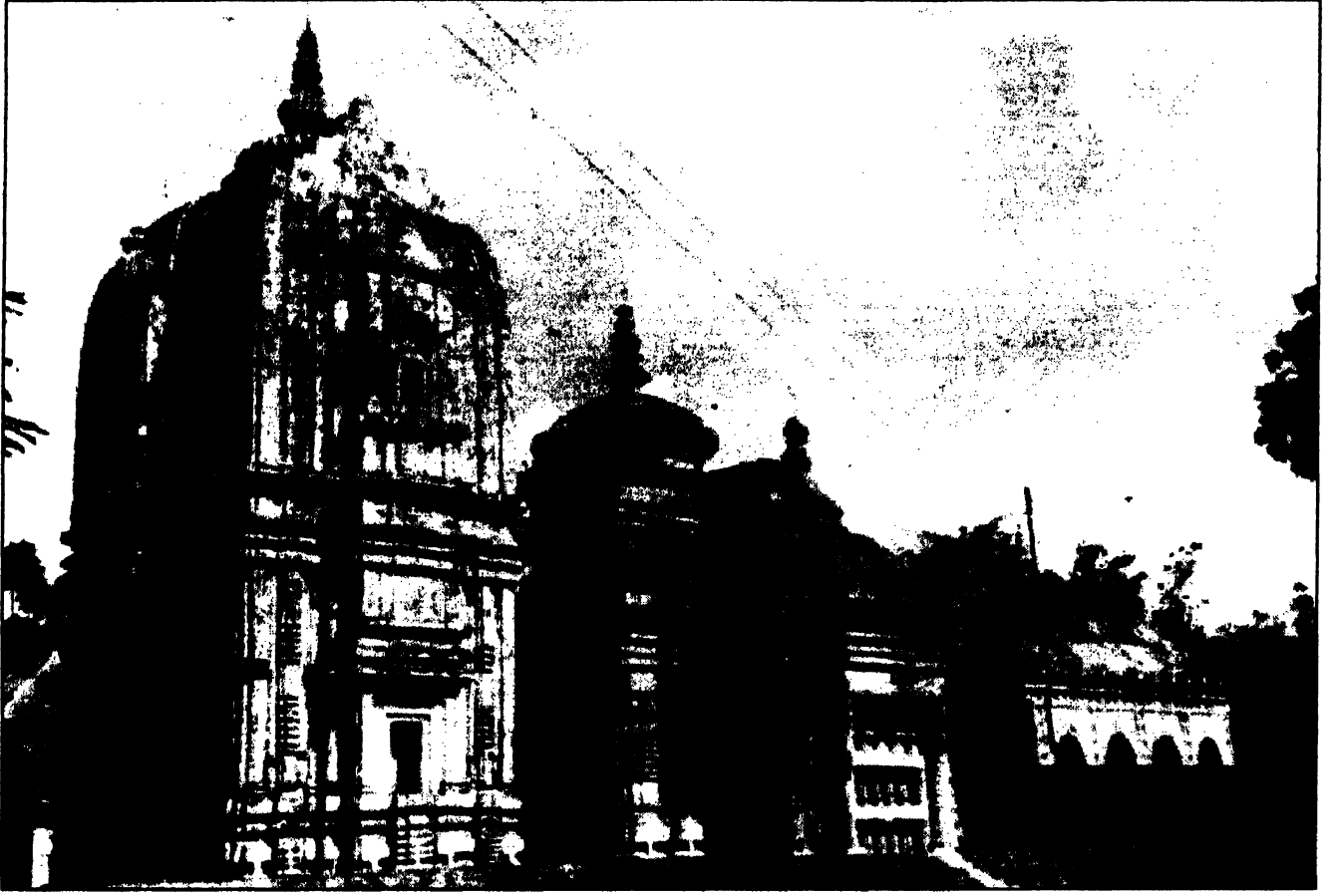
সর্বমঙ্গলার মন্দির, গড়বেতা — ছবি : লেখক

গোপালনগর ও খাদিনান (থানা : পাঁশকুড়া) এবং কুশমন (থানা : ঘাটাল) প্রভৃতি স্থানের মন্দিরে।

মেদিনীপুর জেলার বহুস্থানে বারোচালা ধরনের ঘর দেখা যায় এবং এই বারোচালার অনুকরণে এ জেলায় বারোচালা মন্দিরগুলিও নির্মিত। এই রীতির অন্যতম দৃষ্টান্ত, নতুক জয়কৃষ্ণপুর ও জলসরা (থানা : ঘাটাল) এবং চিরুলিয়া (থানা : এগরা) গ্রামের দেবালয়গুলি।

চালা মন্দিরের মতো 'রত্ন' মন্দিরের কার্নিসও বাঁকানো আকারের এবং ছাদও সেইমতো চালু। এক্ষেত্রে চূড়া হল 'রত্ন' কথাটির সমার্থক। সুতরাং ছাদের কেন্দ্রে একটি চূড়া নির্মাণ করলে হয় একরত্ন এবং সেটিকে ঘিরে ছাদের চারকোণে ক্ষুদ্রতর আর চারটি চূড়া স্থাপন করলে সেটি হয় পঞ্চরত্ন মন্দির। এইভাবে মন্দিরতলের সংখ্যা বাড়িয়ে বা প্রতি তলের কোণে কোণে চূড়ার সংখ্যা বর্ধিত করে, নয়, তেরো বা সতেরো থেকে পঁচিশ চূড়া মন্দিরও নির্মিত হতে পারে।

তবে একরত্ন মন্দিরের সংখ্যা এ জেলায় ঠিক কত তা জানা সম্ভব নয়। কারণ প্রাচীন একরত্নগুলির অধিকাংশই বিধ্বস্ত, নয়তো বা সেগুলি ভগ্নদশায় পতিত। উল্লেখ্য, একরত্ন মন্দিরগুলি হল, গড়বেতা, কর্ণগড় (থানা : শালবনী), আনন্দপুর (থানা : কেশপুর) ও ক্ষীরপাই (থানা : চন্দ্রকোণা) যা ঝামাপাথরে নির্মিত এবং মলিঘাটি, পুঁএ্যাপাট (থানা : ডেবরা), মাংরুল (থানা : চন্দ্রকোণা), শ্যামপুর (থানা : ঘাটাল), রাধাকান্তপুর, দাসপুর, বলিহারপুর, সাগরপুর (থানা : দাসপুর), যা ইটে নির্মিত। জেলার দক্ষিণাংশে কয়েকটি ক্ষেত্রে রত্নের আকার অস্বাভাবিক রকম বড়। দৃষ্টান্ত, গড় হরিপুর (থানা : দাঁতন), আদাসিমলা (থানা : সবং), গোপালপুর (থানা : পটাশপুর), আলংগিরি (থানা : এগরা) ও মোহনপুরের (থানা : মোহনপুর) শিব এবং জগন্নাথের মন্দিরগুলি।

এ জেলায় একরত্ন অপেক্ষা পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন রীতির মন্দির সংখ্যায় অনেক বেশি। লিপিযুক্ত প্রাচীন দুটি পঞ্চরত্ন মন্দির ঘাটাল থানায় অবস্থিত। আঠারো শতকের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত এবং উৎকৃষ্ট পোড়ামাটির সজ্জাযুক্ত নবগ্রামের (থানা : ঘাটাল) মন্দিরটি ইট দিয়ে এবং প্রায় দশ বছর পরে নির্মিত সন্নিহিত রাধানগর গ্রামের গোপীনাথের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি ঝামাপাথরে নির্মিত। হীরাধরপুরের (থানা : চন্দ্রকোণা) পঞ্চরত্নটির স্থাপত্যে চাকাসহ রথের আদল আনার চেষ্টায় এবং রত্নগুলির গঠন-রীতিতে বেশ অভিনবত্ব লক্ষ করা যায়।

নবরত্ন মন্দিরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সতেরো শতকে প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রকোণার পাথরের নবরত্ন মন্দিরটি বর্তমানে বিধ্বস্ত হলেও, সেটির প্রতিষ্ঠালিপি থেকে নির্মাতার পরিচয় ও

দামোদর মন্দির পোড়ামাটির ফলকে কৃষ্ণলীলা, আনন্দপুর ছবি : লেখক

রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পোড়ামাটির চৌচুয়া, গোবিন্দনগর

প্রতিষ্ঠা-তারিখ জানা যায়। সমসাময়িককালে রঘুনাথবাড়িতে (থানা : গোয়ালতোড়) প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন মন্দিরের রত্নগুলি সবই একই চালার উপর স্থাপিত হওয়ায় সেটি এক অভিনব নবরত্ন মন্দিরের নিদর্শন। জেলার অধিকাংশ নবরত্ন মন্দিরই পোড়ামাটির উৎকৃষ্ট অলংকরণে সজ্জিত। সম্প্রতি পাথরা গ্রামের (থানা : মেদিনীপুর) পরিত্যক্ত বিশাল নবরত্ন মন্দিরটির সংস্কারের দাবিতে পাথরা পুরাতাত্ত্বিক সংরক্ষণ কমিটির আন্দোলনের ফলে ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ এটির সংরক্ষণের কাজ শুরু করেছেন।

অল্প সংখ্যক তেরো রত্ন মন্দিরের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য মন্দিরের নিদর্শন হল, রামগড় (থানা : বীনপুর) ও উদয়গঞ্জের (থানা : ঘাটাল) মন্দির। রঘুনাথপুরের (থানা : চন্দ্রকোণা) পার্বতীনাথ শিবমন্দিরটি সতেরো রত্নরীতির একমাত্র দৃষ্টান্ত।

বাংলা মন্দিরশৈলীর আর এক রূপ হল দালান-রীতির মন্দির। পশ্চিমবাংলা তথা মেদিনীপুরে এ জাতীয় অসংখ্য দেবালয় আছে। পোড়ামাটির অলংকরণে সজ্জিত কয়েকটি ইটের দালান-মন্দির রামকৃষ্ণপুর, খাঞ্জাপুর ও সামাট (থানা : দাসপুর), অযোধ্যা-রাধাকৃষ্ণপুর, গোবিন্দপুর ও ক্ষীরপাই (থানা : চন্দ্রকোণা) এবং পলাশী (থানা : ডেবরা) গ্রামে অবস্থিত। জেলায় পাথরের যে কটি দালান-মন্দির দেখা যায়, সেগুলিতে তেমন কোনও অলংকরণ নেই। তবে আমনপুরের (থানা : কেশপুর) একটি পাথরের দালান মন্দিরে প্রচুর 'টেরাকোটা' ফলকের ব্যবহার দেখা যায়।

শুধুমাত্র একতলা দালান-রীতির মন্দিরই যে এ জেলায় নির্মিত হয়েছে এমন নয়, দোতলা দালান মন্দিরও যে এ জেলার উত্তর-পূর্বাংশে সমাদৃত হয়েছিল তার প্রমাণ, লালগড় (থানা : বীনপুর), নতুক জয়কৃষ্ণপুর, মনোহরপুর ও কাটানের (থানা : ঘাটাল) কয়েকটি দেবালয়। শেষোক্তটিতে পোড়ামাটির সজ্জা উচ্চশ্রেণীর।

বাংলার প্রথাগত মন্দির-স্থাপত্যের এসব দৃষ্টান্ত ছাড়াও এ জেলায় বেশ কিছু প্রথা-বহির্ভূত মিশ্ররীতির স্থাপত্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে, যা একান্তই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নীচে দালান ও উপরে ভিন্নরীতির ইমারতের সমাবেশযুক্ত মন্দিরের যেসব দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তার মধ্যে নিশ্চিন্দিপুরের (থানা : ঘাটাল) দালান-মন্দির শীর্ষে চারচালা, গড় ময়নার (থানা : ময়না) মন্দিরে দালানের উপর আটচালা এবং পিংলা (থানা : পিংলা), পাইকভেড়ি (থানা : ভগবানপুর), ঈশ্বরপুর (থানা : ঘাটাল), বসন্তপুর (থানা : দাসপুর), মীরবাজার ও কর্নেলগোলা
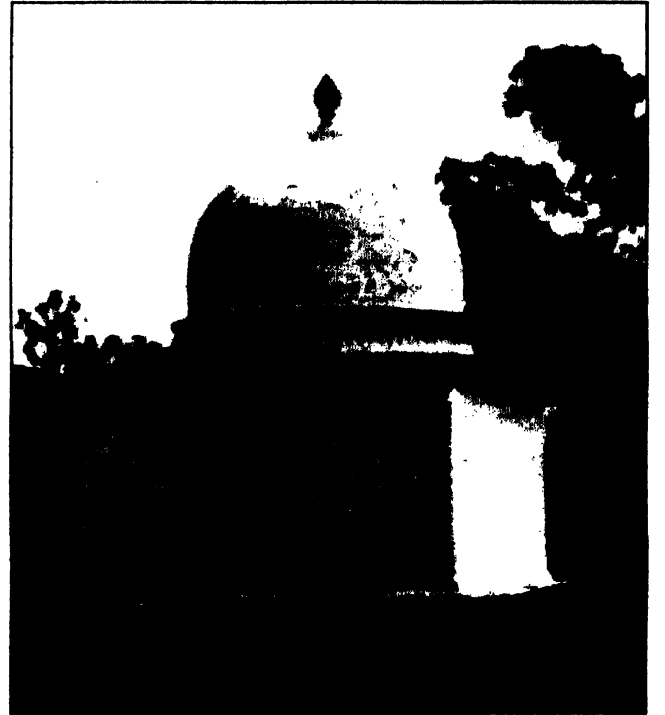
কারবালা মসজিদ, মেদিনীপুর ছবি : লেখক

চন্দনেশ্বর শিবের পীঢ়া দেউল, সেঁকুয়া *ছবি : লেখক*

সম্প্রদায়, ফিরিঙ্গি সমাজ ও ধনী ভূস্বামীদের বিলাসবহুল জীবনের ভাস্কর্য, মিথুন দৃশ্য, ফুলকারি ও জ্যামিতিক নকশা স্থান পেয়েছে এইসব পোড়ামাটির ফলকে। তবে রামায়ণভিত্তিক কাহিনীর তুলনায় মহাভারত-কাহিনীর রূপায়ণ অনেক কম।

এ জেলার মন্দির গাত্রে 'টেরাকোটা' সজ্জার পরিবর্তে অথবা সহযোগে পঙ্খ-পলস্তারার অলংকরণও ব্যবহৃত হয়েছে বহুল পরিমাণে। অন্যদিকে উভয় মাধ্যমের যুগপৎ ব্যবহারের অনেক নিদর্শনের মধ্যে তিলন্তপাড়া (থানা : সবং) এবং আনন্দপুরে (থানা : কেশপুর) অবস্থিত দুটি ইটের মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখ্য। দু' একটি পাথরের মন্দিরে খোদাই করা ঝামাপাথরের উপর পঙ্খের প্রলেপযুক্ত ভাস্কর্য নিদর্শনও দেখা যায়। এই ধরনের এই মন্দিরের দৃষ্টান্ত হল রঘুনাথবাড়ির (থানা : গোয়ালতোড়) নবরত্নমন্দির। এছাড়া বহু মন্দিরের কপাট ও চৌকাঠে উৎকীর্ণ কাঠ খোদাইয়ের কাজেও সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন এ জেলার শিল্পীরা।

(থানা : মেদিনীপুর) প্রভৃতি স্থানের দেবালয়ে দালানের সঙ্গে পঞ্চরত্নের সহাবস্থান। এছাড়া পাঁচরোলের (থানা : এগরা) রাধাগোবিন্দ মন্দিরে দালানের উপর শিখর-দেউলের সংযোগ এই প্রথা-বর্হিভূত রীতির বিবিধ উদাহরণ। এছাড়া ঘন্টা আকৃতির অভিনব শিখর-মন্দিরের দৃষ্টান্তও আছে হরিণাগেড়ে (থানা : ঘাটাল) এবং লঙ্কাগড় (থানা : দাসপুর) প্রভৃতি স্থানে।

অন্যান্য জেলার মতোই মেদিনীপুরে আটকোণা ন'চূড়া বা সতেরো চূড়া রাসমঞ্চ যথেষ্ট নির্মিত হয়েছে। পঁচিশ চূড়ার একমাত্র উদাহরণ হল, নাড়াজোলের (থানা : দাসপুর) রাসমঞ্চ। পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত শ্রেষ্ঠ তিনটি রাসমঞ্চ মাংলোই (থানা : পাঁশকুড়া), চাউলি (থানা : ঘাটাল) এবং ক্ষীরাটিতে (থানা : চন্দ্রকোণা) অবস্থিত। কিছু ক্ষেত্রে 'টেরাকোটা' সজ্জাযুক্ত তুলসীমঞ্চও নির্মিত হয়েছে পঞ্চরত্ন গঠনে। দৃষ্টান্ত, গম্ভীরনগর (থানা : ঘাটাল) এবং হুসেনীবাজার (থানা : দাসপুর) প্রভৃতি স্থানের নিদর্শনগুলি। দুঃখের কথা, সম্প্রতি হুসেনী বাজারের এই রাসমঞ্চটিকে অবাঞ্ছিত বলে ভেঙে ফেলা হয়েছে।

এ জেলার বহু মন্দিরে পোড়ামাটির অলংকরণ ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু সামনের দেওয়ালেই নয়, মন্দিরের দুপাশে ও গর্ভগৃহে প্রবেশ পথের দেওয়ালেও। দামোদরপুরের (থানা : দাঁতন) বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দিরের ভিত্তিবেদী বরাবর বিভিন্ন খোপে নিবদ্ধ পোড়ামাটির বৃহদায়তন পশু ও দেবমূর্তিগুলি, পালযুগের পাহাড়পুর বিহারের ভিত্তিগাত্রে অনুরূপ পোড়ামাটির অলংকরণ বিন্যাসের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

সামগ্রিকভাবে, মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন মন্দিরে পোড়ামাটি সজ্জার প্রধান বিষয়বস্তু, কৃষ্ণলীলা, বিষ্ণুর দশাবতার, রামায়ণ-মহাভারতের বহু খণ্ড দৃশ্য ও নানাবিধ পৌরাণিক কাহিনী। সেকালের সাধারণ মানুষ, শৈব মহন্ত

মন্দির স্থপতি ও কারিগরদের সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গেছে সংশ্লিষ্ট মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠালিপি থেকে, যেখানে তাঁদের নাম ও নিবাস উল্লিখিত হওয়ায় তাঁদের কেন্দ্রীভূত বাসস্থান সম্পর্কেও মোটামুটি একটা স্পষ্ট ধারণা করা যায়। এসব শিল্পীগোষ্ঠি নিজেদের 'সূত্রধর', মিস্ত্রী' অথবা 'কারিকর' বলে পরিচয় দিয়েছেন এবং বহু ক্ষেত্রে তাদের পদবি চন্দ্র, দে, শীল, দাস, সাঁই, কুণ্ডু, দলাই প্রভৃতি বলে উল্লিখিত হয়েছে। এইসব স্থপতি গোষ্ঠি প্রধানত দাসপুর, রাজহাটি, তোড়াপাড়া, নির্মলবাজার-বরদা, জাড়া, গৌরা কলমীজোড়, আজুড়িয়া, হবিবপুর, লাহিরগঞ্জ, ক্ষীরপাই ও চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থানে বসবাস করতেন। দাসপুরের বিখ্যাত মন্দির স্থপতিদের মধ্যে ঠাকুরদাস শীল এ জেলায় মোট আটটি, আনন্দ মিস্ত্রী চারটি এবং হরহরি চন্দ্র, বৃন্দাবন চন্দ্র, সাফল্যরাম মিস্ত্রী ও লোচন চন্দ্র প্রত্যেকে তিনটি করে এবং গোপালচন্দ্র দুটি মন্দির নির্মাণ করেছেন বলে প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়।

এ জেলায় মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত বহু মসজিদ, ইদগা, দরগা ও মাজার আছে এবং পুরাকীর্তি হিসাবে সেগুলি বেশ উল্লেখযোগ্য। তবে এ জেলার মসজিদে তেমন কোনও পোড়ামাটির ফলকসজ্জা নেই। ইট ও পাথর দিয়ে তৈরি খ্রিস্টীয় সতেরো শতকের যেসব মসজিদ এ জেলায় স্থাপিত সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, অমর্ষি-কসবা (থানা : পটাশপুর), সিপাইবাজার, মীর্জামহল্লা, মিঞাবাজার, আলিগঞ্জ (থানা :

মেদিনীপুর), কসবা-নারায়ণগড় (থানা : নারায়ণগড়), হিজলী (থানা : খেজুরি), গগনেশ্বর ও তলকেশিয়াড়ি (থানা : কেশিয়াড়ি), কাঞ্চনপুর (থানা : কাঁথি) প্রভৃতি। পরবর্তী আঠারো-উনিশ শতকে এ জেলায় আরও বেশ কিছু মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই, খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মেদিনীপুর শহরের কেরানীটোলায় যে রোমান ক্যাথলিকদের গির্জাটি নির্মিত হয় সেটিই সর্বপ্রাচীন। মেদিনীপুর রেল স্টেশনের অদূরে শেখপুরায় চার্চ অব ইংলন্ডের উদ্যোগে স্থাপিত গির্জাটির নির্মাণকাল ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ। আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট্ মিশন আবাসগড়ের গির্জাটি স্থাপন করেন উনিশ শতকের শেষ দিকে।

১৮৫৪-৫৫ খ্রিস্টাব্দে ঋষি রাজনারায়ণ বসুর উদ্যোগে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। তবে দীর্ঘদিন ধরে সে গৃহটি অব্যবহৃত থাকার ফলে বর্তমানে জীর্ণ।

পরিশেষে, এ রাজ্যের পুরাকীর্তি সংরক্ষণের দায়িত্বে আছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীন পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকার। যদিও এই অধিকারের পক্ষে এ জেলার অনেকগুলি জীর্ণ ও পরিত্যক্ত মন্দির সংস্কার করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে, তবে তুলনায় তা যে খুবই অল্প, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিমধ্যেই বহু মন্দির বিনষ্ট হয়েছে,
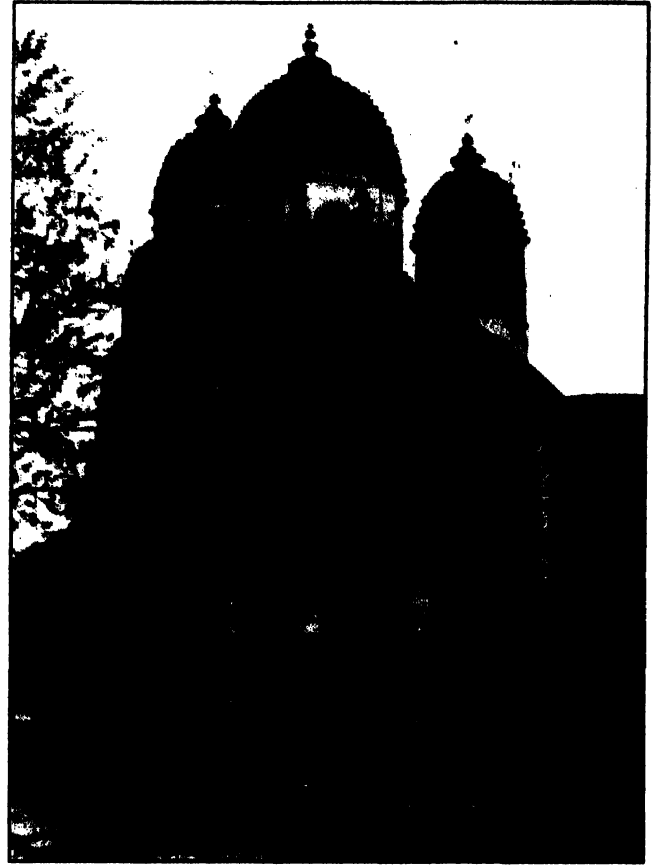
পাল পরিবারের সীতারাম জীউর মন্দির, আমোদপুর — ছবি : লেখক

কমরেশ্বর শিবমন্দির, সুলতানপুর — ছবি : লেখক

তাহলেও প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও এখনও এ জেলায় যে বহু সংখ্যক মন্দির টিকে আছে সেগুলিকে সংরক্ষণের জন্য সরকারি সাহায্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে যদি গ্রামীণ জনসাধারণ তথা জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় পঞ্চায়েতগুলি অগ্রসর হয়, তাহলে বঙ্গ সংস্কৃতির এইসব মহামূল্য নিদর্শনগুলি যথাযথ সংরক্ষিত হতে পারে। অবশ্য ইতিপূর্বেই গ্রামীণ জনগণ যে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় কেশপুর থানার কানাশোল গ্রামের ঝাড়েশ্বরনাথের পোড়ামাটির সজ্জা সমন্বিত পঞ্চরত্ন মন্দিরটির পতনোন্মুখ অবস্থা থেকে সংরক্ষণের জন্য স্থানীয় জনসাধারণের একান্তই উদ্যোগ গ্রহণ। এছাড়া এ জেলার পাথরা গ্রামের মন্দির সংরক্ষণের দাবিতে জনসাধারণের আন্দোলনের ফলে সেখানকার মন্দিরগুলি সংরক্ষণে ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের অংশগ্রহণ, যা এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। মেদিনীপুর জেলার মন্দির, মসজিদ ও গির্জা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দ্রষ্টব্য, পশ্চিমবঙ্গ পুরাতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত 'পুরাকীর্তি সমীক্ষা : মেদিনীপুর' ও 'মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ' এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত 'পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য : মন্দির ও মসজিদ' গ্রন্থসমূহ।

লেখক : বিশিষ্ট লোকসাহিত্য গবেষক, গ্রন্থকার ও প্রাবন্ধিক
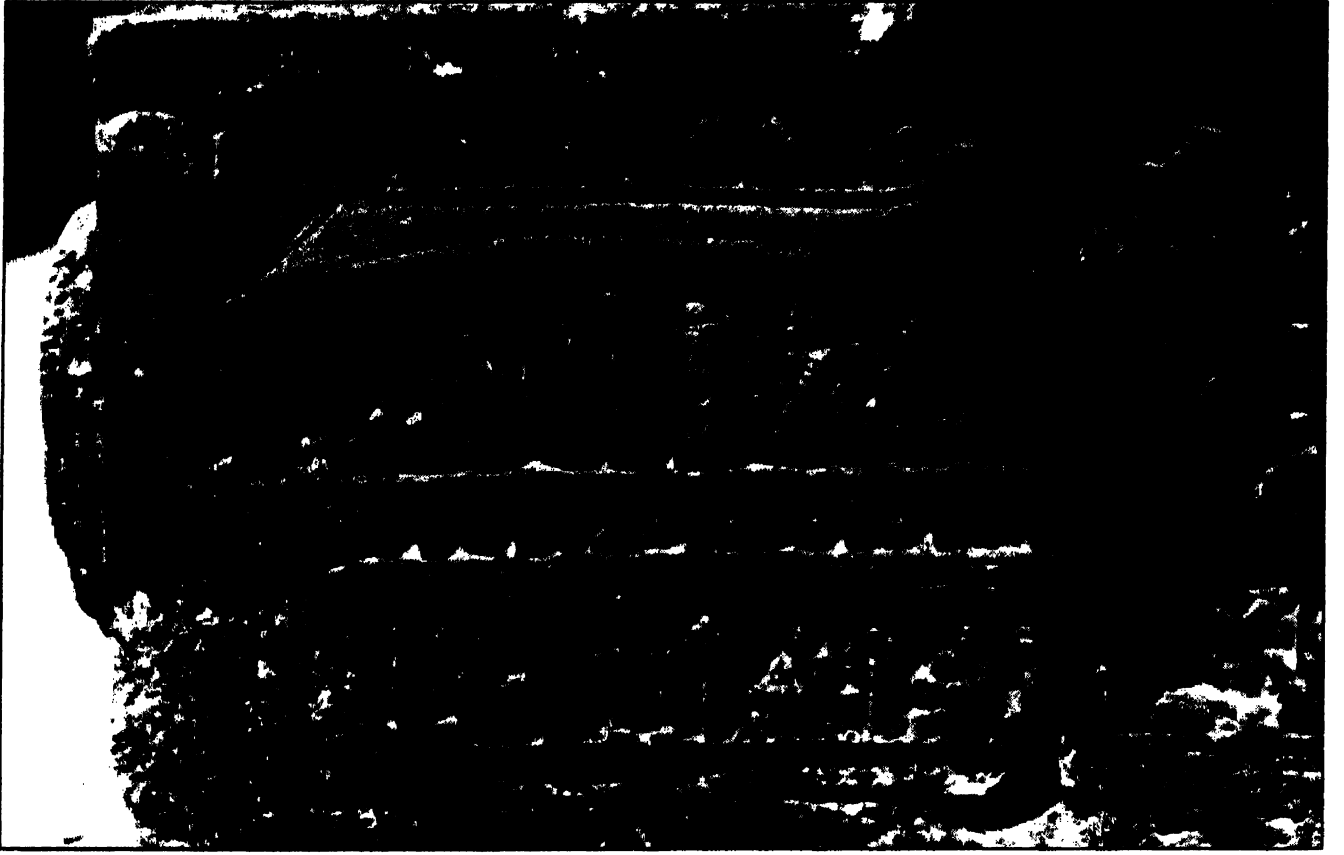
১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত গোপীনাথের একরত্ন মন্দিরের টেরাকোটা ভাস্কর্যে ইউরোপীয় সাহেব ও বন্দুকধারী সৈনিক (দাসপুর) ছবি : ত্রিপুরা বসু

১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সিংহপরিবারের গোপীনাথের একরত্ন মন্দিরের পোড়ামাটি অলঙ্করণে তাঞ্জাম আরোহী ধূমপানরত ইউরোপীয় কুঠিয়াল সাহেব (দাসপুর, থানা সদর) ছবি : ত্রিপুরা বসু

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে রণনৃত্য উৎসব, পশ্চিম মেদিনীপুর

ছবি : অনাথবন্ধু মান্না

মেদিনীপুর জেলায় মেলা ও পার্বণ

হরিসাধন দাস

মেদিনীপুর জেলার ভৌগোলিক পরিবেশ

মেদিনীপুর জেলা আয়তনে প্রায় ১৪,১৮৫ বর্গ কিলোমিটার। এই আয়তনের মধ্যে অবশ্য মায়াচর, নয়াচর ইত্যাদি ছোট-বড় বালুচরগুলিকেও ধরা হয়েছে। এটি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ভূখণ্ডের ১৫.৮৬ শতাংশের অধিক। জেলাটির জনসংখ্যা ভারতের জনসংখ্যার প্রায় এক শতাংশ বা বর্তমানে জেলার লোকসংখ্যা ১ কোটির কাছাকাছি। জেলায় জনসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ১২.২৮ শতাংশের অধিক। বিহার ও ওড়িশার এক বা একাধিক জেলা মেদিনীপুরকে পশ্চিমদিকে পরিবেষ্টিত করেছে। ফলে জেলার পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিবেশী সংস্কৃতির প্রভাব ও অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। জেলার খড়্গপুর, হলদিয়া ও শালবনি ট্যাঁকশাল অঞ্চলে অধিক পরিমাণে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী ও কৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের আবাসকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই জেলায় ১২টি পৌরশহরসহ ২৪টি শহর, গ্রাম ১০,৪৬৮টি এবং মৌজা ১২,১৫২টি।

এই জেলায় দ্রুত শিল্পায়ন হলেও গ্রামীণ অর্থনীতির পৃষ্ঠপোষকতা করছে ৭৯ শতাংশ কৃষিনির্ভর বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশার লোক। জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখনও বনভূমি। এইরূপ ভৌগোলিক পরিবেশে ১৭৬টির অধিক জাতি ও সম্প্রদায় সাধু-সন্ত, ফকির, খ্রিস্টান, মুসলিম, ব্রাহ্ম প্রভৃতির বসবাস। মেদিনীপুর জেলার

বিভিন্ন প্রান্তে আছে ২৮৮-র বেশি বিভিন্ন দেবদেবী, মুসলিমদের মহরম, ঈদ, উরস ইত্যাদি খ্রিস্টানদের বড়দিন, বৈষ্ণব ও অন্যান্য সাধু-সম্প্রদায়ের উৎসব। মহাপুরুষের আবির্ভাব ও

তিরোভাব দিবস বহু ধর্মাবলম্বীদের পূজা-পালা পরব, উৎসর্গ, উৎসবানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বারো মাসে তেরো পার্বণে ৭৩০টির বেশি ছোট-বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

মেলার গুরুত্ব

আদিতে উৎসব পূজানুষ্ঠান উপলক্ষে মেলার সূচনা হয়। এছাড়া পার্বণ উপলক্ষে মেলাগুলি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্প ও শহরাঞ্চলের ভাবের আবেশে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাক্ষর-নিরক্ষর, কর্মরত ও কর্মসন্ধানী মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা দূর করবার চেষ্টা করবে। মেলাগুলি অতিলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত দৈবশক্তির কাছে মানুষকে আত্মসমর্পণে বাধা দিয়ে কিছু নিয়ন্ত্রণে তাকে আনবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেলাগুলি প্রদর্শনীতে কৃষি-শিল্প ইত্যাদি সংযোজিত করে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বীজ নষ্ট করবে। ভারতীয় যুক্তরাজ্যে ৪৫৪টি জেলার মধ্যে মেদিনীপুর আয়তনে ৮/৯টি জেলার থেকে ক্ষুদ্রতর হলেও জনসংখ্যায় কয়েকটি রাজ্য থেকে বেশি। মেদিনীপুর জেলা বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত মেলার মধ্যে সামাজিক ঐক্য রক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার মনোভাব গড়ে তুলে দেশকে কুটিরশিল্পে, বাণিজ্যে ও কৃষি উন্নয়নে সাহায্য করছে। বর্তমানে মেলাগুলি সাংস্কৃতিক ভাবনা বিনিময় করে এবং ব্যক্তিসত্তার পরিচয় তুলে ধরার ব্যবস্থা করে মানুষের মনকে উন্নত ও বিকশিত করছে।

পার্বণ ও মেলাবিবর্তন

চিরাচরিত প্রাচীন উৎসবকেন্দ্রিক মেলা আজ প্রায় অবলুপ্ত। পার্বণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলাগুলিও আজ যুগধর্মের প্রভাব হতে মুক্ত নয়। মেলায় ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য আমদানীকৃত উপকরণ শিল্পসামগ্রীর মধ্যে বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। মেলায় পুতুলনাচ, তরজা, কবিগান, যাত্রা-থিয়েটার আজ আর সাড়া জাগায় না।। আধুনিক জলসা তার স্থান নিয়েছে। মেলা বিবর্তনে এখন দেখা যায়, যেমন লিটলম্যাগাজিনমেলা, শিল্পমেলা, বুলবুলিনাচমেলা, বিজ্ঞানমেলা, উরসউৎসবমেলা, পৌষমেলা, স্বদেশিমেলা, গান্ধীমেলা ইত্যাদি।

স্বাধীনতা আন্দোলনে মেলার অবদান

এই জেলার মুগবেড়িয়ায় (ভূপতিনগর থানা) ১৯৩০ খ্রিঃ দেশপ্রেমিক-সমাজসেবী গঙ্গাধর নন্দর স্মৃতিতে স্বদেশি শিল্পদ্রব্য প্রদর্শনী ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ দিন ব্যাপী মেলায় চরকায় সুতাকাটা, মাদুর, তাঁত ও কাঠের কাজ, স্বদেশি শিল্পজাত দ্রব্য, কৃষি ফসলের প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনী, স্বদেশি যাত্রাগান ও কথকতা ইত্যাদি মেলায় আগত জনগণকে স্বদেশি চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করে। ভারতবিখ্যাত বিদ্রোহী চারণকবি মুকুন্দ দাসের আগমন ও তার গানের আকর্ষণে আগত অগণিত মানুষ মেলাকে জাঁকজমকপূর্ণ ও সাফল্যমণ্ডিত করেছিল। মেলায় দেশাত্মবোধক গান, স্বদেশি প্রচার ও প্রসার শাসকগোষ্ঠীকে বিচলিত করেছিল।

এ প্রসঙ্গে ১৯০৬ সালে মেদিনীপুর শহরে পুরাতন জেলখানা মাঠে 'কৃষি-শিল্প' প্রদর্শনী ও মেলায় সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ পুস্তক ('সোনার বাংলা' ইস্তাহার) বিলির সময় পুলিশ ক্ষুদিরামকে ধরলে তিনি পুলিশকে সঙ্গে রক্তারক্তি করেন।

১৯০৮ সালের ১ মার্চ মেদিনীপুরের অগ্নিশিশু ক্ষুদিরামের নেতৃত্বে এগরায় বহু মানুষ শিবরাত্রির মেলায় বিদেশি দ্রব্য বর্জনের জন্য পিকেটিং করতে যান। মেলায় পুলিশের অশোভন আচরণের প্রতিবাদে দুঃসাহসী ক্ষুদিরাম একজন সিপাহিকে লাঠি দিয়ে আঘাত করেন।

১৯০৮-এর মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে খেজুরি ঠাকুরনগর গ্রামের দোলপূর্ণিমার মেলায় স্বদেশিরা বয়কট এবং পিকেটিংকে কেন্দ্র করে কারাবরণ করেন।

১৭ জানুয়ারি, ১৯৩২ পৌষ সংক্রান্তিতে ভীমেশ্বরীর মেলায় স্বদেশি আন্দোলনে কয়েকজন নেতা নির্যাতিত হন।

মেদিনীপুর গান্ধীমেলা

ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, মেদিনীপুর জেলায় চারবার পদার্পণ করেন। প্রথমবার ১৯২১ খ্রিঃ ২০ সেপ্টেম্বর কলেজ ও কলেজিয়েট ময়দানে অসহযোগ আন্দোলনে জেলাবাসীকে উদ্দীপিত করেন। দ্বিতীয়বার ১৯২৫ খ্রিঃ ৪ জুলাই গোপ প্রাসাদে, পরদিন নাড়াজোলে চরকা ও খদ্দর প্রদর্শনী এবং ৫ জুলাই বিকেলে কাঁথি দারুয়া ময়দানে সভা করেন। তৃতীয়বার—২৪ নভেম্বর ১৯৩৪ সালে খড়্গপুরে এবং চতুর্থবারে ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ মহিষাদলে ও সুতাহাটায়, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ কাকরা, ইরিঞ্চি, কৃষ্ণনগর ও কাঁথিতে ৩১ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি, ১৯৪৬ পর্যন্ত অবস্থান করেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যেখানেই মহাত্মা গান্ধী পদার্পণ করেন সেখানেই স্বদেশিমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এখনও মহিষাদলে এক্তারপুরে .২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে পাঁচদিন মহাত্মা গান্ধীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে মেলা হয় এবং পাশাপাশি গ্রামগুলি থেকে হিন্দু-মুসলমান প্রায় কয়েক হাজার নর-নারী মেলায় আসেন।

মেলা

মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পাল-পরব-পার্বণ, পূজা, উৎসর্গ, উপাসনা, উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি উপলক্ষে যে বাৎসরিক নির্দিষ্ট দিনে ও স্থানে অস্থায়ীভাবে জনসমাবেশ হয়, বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হয় তাকেই সাধারণভাবে মেলা বলে। যেমন ঝাড়গ্রাম উৎসব উপলক্ষে ২৩ জানুয়ারি থেকে সাতদিন মেলা হয়।

পার্বণ

সাধারণত সমাজে বহুল প্রচলিত সমস্তরকম উৎসবগুলিকেই পার্বণ বলে। পার্বণকে কেন্দ্র করে যে মেলা অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে— **শক্তি পূজার** দেবী দুর্গা, কালী, গঙ্গা ইত্যাদি পূজানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মেলা।

শৈবদেবতা : শিবরাত্রি, শিবঠাকুরের পূজা উপলক্ষে চড়কগাজন ও নীল পূজার মেলা।

খ্রিস্টান ব্রাহ্ম, হিন্দু, জৈন, মুসলমান উৎসব, সাধুসন্ত পীর বা মহাপুরুষের আবির্ভাব বা তিরোভাব দিবস অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেলা।

বিষ্ণুআদি বা বৈষ্ণবদেবতা : যেমন—রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, রাস, ঝুলন, দোল, রথ, স্নানযাত্রা ও বৈষ্ণবীয় মহোৎসব, ২৪-পরগনা ইত্যাদি উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলা।

লৌকিক ও গ্রাম্য দেব-দেবী : যেমন—ধর্মরাজ পূজা, গাজন, মনসা, শীতলা ও দরখোলা গ্রামের লৌকিক জাগ্রতা দেবী মা দমদমা (চামুণ্ডার) ও ওলাবিবি ইত্যাদি পূজা অনুষ্ঠান মেলা।

পুণ্য স্নানাদি পর্ব ও তিথিঘটিত উৎসব : যেমন—বারুণি, পৌষ সংক্রান্তি, বাংলা নববর্ষ—এরূপ অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেলা।

আদিবাসী উৎসব : বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মেলা হয়। যেমন—করমপূজা, বাঁধনা উৎসব, মারাংবুরু, নাগরদোলা উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলা।

অন্যান্য দেবতা যথা—বিশ্বকর্মা, শনি, ব্রহ্মা ইত্যাদি পূজানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মেলা।

মেলার বৈশিষ্ট্য ও উৎসব-বৈচিত্র্য

এই জেলায় প্রতিটি মেলার উৎপত্তির ইতিহাস ও চরিত্র স্বতন্ত্র। মেলার বিবরণ-ধারা ও পরিচয়ের মধ্যে বাঙালি সমাজের বহুমুখী সামাজিক জীবনের বিচিত্র পরিচয় পাওয়া যায়। যে স্থানে শ্রেণীগত লোকের প্রাধান্য বেশি সেইশ্রেণীর জীবিকানুযায়ী সেখানে উৎসব ও পার্বণ গড়ে উঠেছে। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ঐক্য বর্তমান থাকলেও জেলা ভূস্তর সর্বত্র সমান নয়। জেলা ভূস্তরের বৈচিত্র্য অনুযায়ী লোকচরিত্রের মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে, সেই অনুসারে মেলা, উৎসব-পার্বণেও বৈচিত্র্যময়তা দেখা যায়।

মেদিনীপুর জেলায় প্রধানত দুটি উৎসব

(ক) পৌষ পার্বণোৎসব (খ) চড়ক-গাজোনোৎসব। এই দুটি উৎসবই জেলায় লোকোৎসব হিসাবে পালিত হয়। গাজোনোৎসব প্রকৃতপক্ষে গ্রীষ্মে সুবৃষ্টির জন্য পালিত হয়।

ভাদু মূর্তি

শিবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকায় শিবের গাজন বলে। এই উৎসব উপলক্ষে মেলাগুলি গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নতির কারণ।

পার্বণকে কেন্দ্র করে পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া, মনসাচালিঘট, তুসুখোলা, ভাদু ও টুসু মূর্তি, লক্ষ্মী ভাঁড়, সোনারূপার বেলপাতা, ছাতা, জুতা, কাগজফুল, চৌদল, মিষ্টি, চাঁদমালা, মুকুট, ঢোকরা শিল্পের মনসা, শীতলা, লক্ষ্মীঘট ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য তৈরি করে বহুলোকের জীবিকা নির্বাহ হয়।

দোকানপাট আসে। ঝড়েশ্বর শিব, গড়বেতা থানার কাগোড়ে বুড়াবাবা ও রসকুণ্ডুর বসন্ত রায় বিশেষ জাগ্রত শিব এবং এর মেলাগুলি উল্লেখ্য। নয়াগ্রাম থানার হাজারলিঙ্গ শিব এবং দ্বাদশলিঙ্গ শিবমন্দির ও মেলা বিখ্যাত। ডেবরা কেদার কুণ্ড চপলেশ্বর শিবের পূজা ও মেলা পৌষ সংক্রান্তিতে সমধিক প্রসিদ্ধ। কেদার মন্দিরের পশ্চাতে চতুষ্কোণ চৌবাচ্চা আছে। চৌবাচ্চা মণ্ডপদ্বারা আচ্ছাদিত এবং ভুড়ভুড় শব্দে পরিশ্রুত জল বেরোয়। পৌষ সংক্রান্তি তিথিতে ৫/৬ হাজার নর-নারী সেই পরিশ্রুত জলে স্নান করে। মেলাগুলিতে বিভিন্ন ধরনের আনন্দোৎসবের মধ্যে ঝুমুর নাচ, কাঠিনাচ ও মোহড়া নাচ দেখায়।

আদিবাসী উৎসবে কাঠিনাচ

রাসমেলা

মেদিনীপুর জেলায় শীতকালের প্রধান উৎসব রাস। লোকসংস্কৃতি বিকাশে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ এই রাস উৎসব ও রাসমেলা। 'রস' শব্দ থেকে রাস কথাটি এসেছে। 'রাস' যা রসকে আকর্ষণ করে। রাসে রাধাকৃষ্ণ কেন ? কৃষ্ণ, যিনি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থান করে ভক্তদের আনন্দ দেন। আবার আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপিণী রাধা। এখানে উভয়ের রাসলীলা মূর্ত হয়েছে 'রাসলীলায়'। গোপীগণ বলতে বোঝায় যারা সংসারের সব বন্ধন থেকে মুক্ত, দুঃখের নিবৃত্তি করে রাসলীলায় মিলিত হন।

মকরস্নান উপলক্ষে পৌষ সংক্রান্তির মেলাগুলির মধ্যে জেলায় অনেকগুলি মেলাই উল্লেখযোগ্য। শালবনি থানার কর্ণগড়ে মহামায়া দেবীর পূজা উপলক্ষে, জগন্নাথ মন্দিরচকে একদিন, তমলুক ঘাটপুকুরে একদিন, সবং-এর কোলঙ্গার মেলা, কাঁথি ও দীঘার মকরস্নান মেলা উল্লেখযোগ্য।

ঝড়েশ্বর শিবের চড়কগাজন নীলপূজার মেলা

মেদিনীপুর জেলায় অনুষ্ঠিত চড়কগাজন মেলাগুলির ১৭/১৮টি উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে কেশপুর থানার ঝড়েশ্বর শিবপূজা উপলক্ষে চড়কগাজন মেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেলাটি ৩০০ বছরের বেশি প্রাচীন। চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে ৭ দিনব্যাপী মেলা চলে। মেলা উপলক্ষে তিনশোর বেশি

ময়নায় শ্যামসুন্দরের রাস

ময়নাগড়ের পশ্চিমে কালীদহ তীরে রাজাদের কুলদেবতা পুরুষোত্তম শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউর মন্দির। আবার ওই কালিদহের তীরে সহজিয়া সাধক তুরজলাল পীরবাবার মাজার আছে। কাঁসাই নদীতে গোপ ঘাটে শ্যামসুন্দরের 'দহ'। এই দহ থেকেই স্বপ্নাদেশে শ্যামসুন্দরকে পাওয়া যায়। শ্যামসুন্দরকে একা না রেখে তাই রাধিকাকে 'রাই' তৈরি করে দেওয়া হয় সঙ্গী। পরে স্বপ্নাদেশে আবার দ্বিতীয় রাইকে শ্যামসুন্দর দহের একই জায়গা থেকে তুলে এনে দিলে শ্যামসুন্দরের দুটি রাই হয়।

ময়নার রাসমেলা জেলার বৃহত্তম ও দীর্ঘস্থায়ী মেলা। মেলার সূচনা হয় ১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দে, এখন থেকে প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্বে। ১৮২২-১৮৮৩ খ্রিঃ পর্যন্ত মেলাটি প্রসিদ্ধি লাভ

করে। ১৯৬৯ খ্রিঃ পর্যন্ত রাসমেলাটি রাজপরিবারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ১৯৭০ খ্রিঃ থেকে মেলা "মেলা কমিটি"র হাতে যায়। মেলা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই থাকে। ১৮ নভেম্বর ১৯৯৪, মেলার ২৫ বৎসর পূর্তিতে রজতজয়ন্তী পালন হয়েছে।

রাসযাত্রা ও মেলা বর্ণনা

গ্রামীণ সংস্কৃতির মিলনতীর্থ ময়নার রাসোৎসব, "রাসলীলা ও রাসমেলা"। গ্রামীণ মেলার সৌরভ আলাদা। নৈশ নৌ-রাসযাত্রার দৃশ্য কার্তিক পূর্ণিমার (নভেম্বর) মধ্যরাত্রিতে হাজার হাজার লোককে আকর্ষিত করে। নৌ-রাসযাত্রার সমারোহে আতসবাজীর ঢালাও ব্যবস্থা। ফানুস ওড়ানো, ঢাকঢোল, মৃদঙ্গ, সানাই, কাঁসর ঘণ্টায় চারিদিকে মুখরিত থাকে। ঢাক ও খোলবাদ্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। হিন্দু, মুসলমান, শিখ ইত্যাদি সবসম্প্রদায়ের লোক সানন্দে এই মেলায় যোগ দেয়। এটাই এই মেলার বৈশিষ্ট্য। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চূড়ান্ত নিদর্শন।

উত্থান একাদশীর ভোর থেকে রাস উৎসব আরম্ভ হয়। একমাস যাবৎ মেলা চলে। দুটি নৌকা জোড়া দিয়ে "ভড়" তৈরি হয়। "ভড়"-এর উপর মন্দির আলোকসজ্জায় সজ্জিত থাকে। ভাসমান নির্মিত মন্দিরে শ্যামসুন্দর জীউ ও তার দুই রাই, মদনমোহন ঠাকুর ও তার রাই এবং কানাই ও বলাই মিলে রাসযাত্রা আরম্ভ করেন। শ্যামসুন্দর তাঁর সখী ও সখাদের নিয়েই রাসলীলায় যাত্রা করেন। সঙ্গে থাকে কীর্তন দল। দুটি নৌকায় লাল শাড়িপরা কিশোরী শঙ্খবাদিকার দল, সংঘবদ্ধভাবে শোভাযাত্রা জলে ভেসে চলতে থাকে। আধ কিলোমিটার জলপথ এইভাবে "কালিদহ ও মাকড়দহের" জলে ভেসে চলমান থাকে। রাজবাড়ির কিনারা পর্যন্ত নৌকা ও ঝিলে থাকে পুণ্যার্থী আর ডাঙায় মেলা। মেলায় বসে সারি সারি দোকান, চা, তেলেভাজা, মিষ্টি, হোটেল, হাঁড়ি, মাটির কলসি, গামলা, সবং-এর মাদুর, গোকুলনগরের মশারি, ময়নার কদমা, খাজা ও বাতাসা, ছুতোর মহিলাদের "হুড়ুম চিড়া", মুড়ি, মুড়কি, ময়নার ভাপা দই। স্টেশনারী ও মনোহারী দ্রব্য, আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক, চিড়িয়াখানা, ভিডিও ও যাত্রার আসর, যাত্রীদের অস্থায়ী ছাউনি, গান-বাজনা, নহবৎ খানা, সব মিলিয়ে মিলনতীর্থ হয়ে ওঠে ময়না মেলা।

রথের মেলা

রথের মেলায় যোগদানের মূল উদ্দেশ্য দুটো। রথদেখা ও কলাবেচা। বহু মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তিতে অচলরথ সচল হয়। ধর্মীয় উৎসব ছাড়াও রথমেলা সামাজিক বন্ধন ও সংগঠিত শক্তির উদাহরণ। এই জেলায় বিভিন্ন স্থানে বহু রথযাত্রা-মেলা অনুষ্ঠিত হয়। জেলায় রথযাত্রা-উৎসবের বৈচিত্র্য ও তথাসময়ের বৈচিত্র্যও লক্ষ করা যায়। পাঁশকুড়া থানার রঘুনাথবাড়ি গ্রামে আশ্বিনের বিজয়া তিথিতে রঘুনাথ জীউর রথাযাত্রার উভয়পাশে

মহিষাদলের রথ

একটি বড় মেলা বসে। মেলা আড়াইশত বছরের পুরাতন। তিনশ দোকান-পাট আসে। তমলুকের শিউরি গ্রামে ফাল্গুনে রাধাকৃষ্ণের রথযাত্রা ও এক মাস যাবৎ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ডেবরার লোয়াদায় মাঘে রাধাবল্লভ জীউর রথ উপলক্ষে দুদিন মেলা ও কেশিয়াড়ীর "শুদ্ধভক্তি নিকেতনের" বৈষ্ণবমঠের গৌরাঙ্গদেবের মূর্তি ও রাধাকৃষ্ণের চৈত্র পূর্ণিমা তিথিতে রথ টানা হয়। আশ্রম প্রাঙ্গণে শতাধিক দোকানপাটসহ মেলা বসে। এই রথমেলাগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

মহিষাদলের রথ :

এই জেলার মহিষাদলে একটি সুসজ্জিত প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত গোপাল জীউর সুউচ্চ নবরত্ন মন্দির। ১৭০০ খ্রিঃ রানী জানকীদেবী গোপাল জীউকে প্রতিষ্ঠা করেন। গোপাল জীউ সম্বন্ধে সুন্দর জনশ্রুতি আছে। ধর্মপ্রাণা রানী জানকীর সময় একজন জেলে মাছ ধরবার জন্য মহিষাদলের নিকটবর্তী নদীতে যান। মাছ ধরার সময় তাঁর জালে একটি কাঠের টুকরো আটকে যায়। নিজের কাজে লাগাবার জন্য সেই জেলে ওই কাঠের টুকরো বাড়িতে এনে ঘরের এককোণে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখেন। সেই দিন রাতেই রানী জানকী দেবী স্বপ্নাদেশে জানতে পারেন যেন গোপাল জীউ বলছেন, "আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, আমাকে প্রতিষ্ঠা কর।" রানী জানকী অনুসন্ধান করে মহা ধূমধামের সঙ্গে

দারু মূর্তিটি এনে মন্দিরে পূজার ব্যবস্থা করেন। গোপাল জীউ জেলের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল বলে প্রতি পঞ্চমীতে গোপালের পিতৃশুদ্ধি জেলেবাপের শ্রাদ্ধ ওই মন্দিরে অনুষ্ঠিত হত—বর্তমানে কোনও অনুষ্ঠান নেই। মহিষাদলের রথযাত্রা রাজবাড়ির যথাসাধ্য ব্যয়সাপেক্ষে মহা জাঁকজমকপূর্ণ হয়। মেদিনীপুর জেলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উৎসব। মহাধূমধামে এখনও তেরোচূড়া সুউচ্চ রথ টানা হয়ে উৎসব পালিত হয়। রাজপরিবারের সকলে নগ্নপদে রথের সঙ্গে অনুগমন করেন। যতদূর জানা যায় রানী জানকী দেবীর মৃত্যুর পর ১৮০০ খ্রিঃ স্বল্পকালের জন্য মতিলাল পাঁড়ে মহিষাদলের রাজত্ব পান। সেই সময়েই তিনি একটি ১৭ চূড়া সুসজ্জিত রথ তৈরি করেন। ১৮৫২ খ্রিঃ লছমন প্রসাদ গর্গ কলকাতা থেকে সুদক্ষ কারিগর এনে রথ সংস্কার করেন। ১৯১২ খ্রিঃ সম্ভবত রথের সামনে কাঠের ঘোড়া দুটি নির্মাণ করার সময় রথের চূড়া ১৭ থেকে কমিয়ে ১৩ চূড়া করা হয়। রথে মহিষাদলে পক্ষকালব্যাপী মেলা বসে। লক্ষাধিক লোক সমাগম হয়। স্থানীয় রাজপরিবারের জমিতে বিবিধ জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। মেলাতে বিভিন্ন জেলা ও রাজ্য থেকে প্রতিদিন বহু লরি কাঁঠাল আসে। বৃহদাকার কাঁঠালগুলি পাহাড়ের আকারে সাজানো থাকে। বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে ব্যবসায়ীরা আসেন। দোকান পসারের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, হোটেল জাতীয় খাবার দোকানের সংখ্যাই বেশি। তাছাড়া মণিহারী, কাঁচ, তামা, পিতল ও লোহার বাসনপত্র, কাপড়-চোপড়, তৈরি পোশাক-পরিচ্ছদ, লাঙল-জোয়ালসহ কৃষিযন্ত্রপাতি, বাঁশ-বেতের তৈরি জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়ি-কলসি ও খেলনা পুতুল, বই, ছবি, ঔষধপত্র, নানাপ্রকার ফল ও চারাগাছ ইত্যাদি মেলায় আমদানি হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদ : মহিষাদলের মেলায় পুতুলনাচ, সার্কাস, নাগরদোলা ইত্যাদির দল আসে এবং চলচ্চিত্র, মৃৎশিল্প প্রদর্শনী, পালাগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা থাকে। মেলা উপলক্ষে কলকাতা থেকে পেশাদারি যাত্রাদল আসে। বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণেও রথের মেলায় আনন্দ যথেষ্ট থাকে। আধ মাইল পিচ্ছিল পথ ধরে বিরাট রথটিকে টেনে নিয়ে যায় বৃদ্ধ-যুবক-নির্বিশেষে সহস্র নর-নারী। উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত রানী জানকীর দ্বারা নির্মিত মন্দিরগুলির স্থাপত্যরীতি বৃত্তিদান তাঁকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নাড়াজোল রাজবাটির অতীত ঐতিহ্যের চিহ্ন। চৈত্রে রামনবমীতে রামলক্ষ্ণ সীতার রথ ও লালগড় রাজবাটির রাধামোহন জীউর রথযাত্রায় নেত্রোৎসব অনুষ্ঠানটিও উল্লেখযোগ্য।

আদিবাসী উৎসব ও প্রধান মেলা

আদিবাসী উৎসবগুলির মধ্যে করমপূজা, বাঁধনাপরব, (ভীমরাজ, ধনদেবী ও ঘাঘরা) বাসিনী, বিরিঞ্চি ঠাকুর, রঙ্কিনী, ভৈরব, বড়াম, জাহের, শালুই, কালোরায়, সহরায়, কালামদন, বঙ্গা ইত্যাদি বহু ধরনের দেব-দেবী আছে। এগুলির কয়েকটি পূজাউৎসব উপলক্ষে খুবই উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গক্রমে মেলাগুলির মধ্যে চন্দ্রকোণা রোড সন্নিকটে সারেঙ্গাগড়ে 'সারগারজাত' নামে একটি মেলা হয়। 'বঙ্গা' দেবতার পূজা উপলক্ষে সাঁওতাল নর-নারীরা ৩রা মাঘ থেকে সপ্তাহব্যাপী নৃত্য-গীত বাদ্য আনন্দোৎসবে মেতে ওঠে। এই সারগারজাত মেলাটিও দু-শত বছরের অধিক প্রাচীন। **'গড়বেতা-গোয়ালতোড়'** বেতঝরিয়া আদিবাসী গ্রামটিতে কার্তিক-অমাবস্যার পরের দিন **'সহরায় পূজা'** অর্থাৎ গৃহপূজা উপলক্ষে মেলাটি উল্লেখযোগ্য। সহরায় পূজার দিন প্রায় প্রতিগৃহে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে পশুবলি/ছাগবলি দেওয়া হয় এবং রান্না মাংস নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে বসে খাওয়া হয়, সভা হয়, ধর্মনীতি-রাজনীতি নিয়ে এবং কেউ বিরোধী কাজ করলে তার মীমাংসাও সভায় করা হয়। এছাড়া পৌষ সংক্রান্তিতে **সাকরাৎ** উৎসব, ফাল্গুনে শালুই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শালুই পূজা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যে মহান ঈশ্বর (সৃষ্টিকর্তা) সৃষ্টি রক্ষার জন্য নিজদেহ থেকে নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন তারই উদ্দেশে শালুই পূজার দিন একটি **'শালবৃক্ষকে'** পূজা করা হয়।

বালিয়াৎ উৎসবের মেলা : বালিয়াৎ উৎসবের জন্য প্রতি চৈত্রে বাংলা বিহার ও ওড়িশা রাজ্যের সংযোগ স্থলে সুবর্ণরেখা নদীর উভয়তীরে প্রায় এক মাইলব্যাপী একদিনের মেলা বসে। স্বর্গত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণাদি করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার ইত্যাদি রাজ্যের আদিবাসী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নর-নারীর সমাবেশ হয়। কিংবদন্তী যে পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসে থাকাকালীন এই স্থানে চৈত্র-সংক্রান্তি তিথিতে উত্তর-বাহিনী সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান ও পিতৃতর্পণাদি করেছিলেন। বালিয়াৎ উৎসব প্রাচীন। এই উৎসব উপলক্ষে মেলাও বহুকালের প্রাচীন। যাত্রীরা ট্রেন, বাস, গরুর গাড়ি, হেঁটে ও লরিতে করে আসে। মেলায় খাবার দোকান ছাড়া কৃষি যন্ত্রপাতি, ধামা, কুলো, ঝুড়ি ইত্যাদির দোকান বসে। সাঁওতালী নৃত্য, নাগরদোলা, সার্কাস ও যাত্রাগান হয়।

ওড়গোদা ভৈরবস্থান ও আদিবাসী মেলা

ঝাড়গ্রাম-শিলদা থেকে দেড় মাইল ওড়গোদার ভৈরবস্থান—ভৈরবডাঙ্গায়। ঝাটিবনি পরগনা বা জঙ্গলমহল চুয়াড় বিদ্রোহের অন্যতম ঘাঁটি ছিল। এই অঞ্চল আদিবাসীদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে ছিল। এই অঞ্চলে ভৈরব ঠাকুরের প্রাধান্য থাকায়, অনুমান শিলদার রাজারা শাক্তধর্মী ছিলেন। ওড়গোদা গ্রামের অভ্যন্তরে বড় বড় ব্যাসাল্ট পাথরের খণ্ডমূর্তিগুলির একটি শিবের অনুচর-বাহনরূপে গ্রামে বিদ্যমান। এই খণ্ডমূর্তি দেবালয়ের সামনে বিরাজ করত। এখন দেবালয় নিশ্চিহ্ন। খণ্ডমূর্তিগুলিও প্রভুহীন অনাথ হয়ে গ্রাম্যরাখালের বাহনরূপে

কালাতিপাত করছে। রুদ্ররূপদেবতা ভৈরবের ভৈরবীও আছেন। ভৈরবী থাকেন বহুদূরে ধলভূম গড়ে। ভৈরবীর নাম রঙ্কিণী। রঙ্কিণীর বেদিতে যে বেঁদাপর্ব হয়, সেই পর্ব সাঙ্গ হয় ওড়গঙ্গা গ্রামে ভৈরবের 'পাতা বেঁদা' পরব নামে। দুর্গাপূজার দশমীর দিন ওড়গঙ্গায় উৎসব হয়। জিতাষ্টমী জাগরণের নবমী তিথিতে সকালে কল্পারম্ভ হয়ে এক পক্ষকাল ধরে দশভূজা দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে বিজয়া দশমীর দিন পূজা শেষ হয়। এইদিন ভৈরবী-রঙ্কিণী দেবী তাঁর স্থান ধলভূম-ঘাটশিলা ছেড়ে ভৈরবভূমি শিলদায় গমন করেন। শ্রুত যে সেখানে ভৈরব-ভৈরবীর মিলন হয়। ধলভূমগড় ও শিলদা পরগনা একই 'সাতভূমি'র (একই প্রজাতির লোক) অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং একই জনসংস্কৃতি আঞ্চলিক অভিন্নতার মধ্যে ছিল, সেজন্য আজও ভৈরব-রঙ্কিণী দেবী এবং তাদের পূজা-উৎসব-মেলা তার সাক্ষ্য বহন করছে। দুই দেব-দেবীই মূলত অধিকাংশ জঙ্গলবাসীদের দেবতা। ভৈরব-ভৈরবীদের বিস্তার সারা ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। শিলদা-ওড়গোদার ভৈরব প্রাচীন বৃক্ষশোভিত প্রস্তর স্তূপীকৃত উঁচু মঞ্চোপরি 'কলস মূর্তি'রূপে প্রতিষ্ঠিত। প্রস্তরখণ্ডের ধ্বংসাবশেষের ন্যায় পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়াগুলিও চারিদিকে ছড়ানো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। ধর্মঠাকুরের কামিন্যা মূর্তির অনুরূপ ভৈরবের পোড়ামাটির কলস প্রেতিনী মূর্তিও ভৈরবস্থানে বসানো আছে।

মেলা : কথিত আছে যে কলস মূর্তির নিচে "সুপ্ত আগ্নেয়গিরি" আছে, যা "সোনার ভৈরব" বলে পাথর চাপা আছে। বছরে ২/৩ বার এই অঞ্চলের ভূমি কাঁপে—বিষাক্ত সাপ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। বিজয়া দশমীর সময় স্থানটি মৃদু কাঁপে। সাঁওতাল আদিবাসীর বাসভূমি—সাতভূম। এই পুণ্য ভূমিতে বিজয়া দশমীর দিন থেকে তিনদিন মেলা হয়। এই মেলায় ছোটনাগপুর অঞ্চলের তথা বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীরা মেলায় যোগদান করেন। মেলার প্রথম দিন সকল বর্ণের লোক এবং দশমীর রাত্রি থেকে দুদিন কেবল আদিবাসীরা যোগ দেন। মেলায় অন্য সম্প্রদায়ের লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। বিশাল বিস্তীর্ণ মাঠে ৩০/৪০ হাজার সাঁওতাল মিলিত হন। এদের নাচগান হয়। ছেলেমেয়ে দেখাশোনা হয় এবং পরে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এরূপ কানাইশর পাহাড় ও বারাঘাটি পাহাড়ের কোলে পূজা ও মেলা হয়। (মেদিনীপুর দর্পণ পুস্তকে বিস্তারিত আছে।)

মুসলিম-উৎসব উপলক্ষে মেলা

মুসলিম-উৎসবগুলিকে কেন্দ্র করে মেদিনীপুর জেলায় বহু মেলা সংগঠিত হয়। এই মেলাগুলির মধ্যে মিএগ্রাবাজারে (২-৪) ফাল্গুন উরস উৎসব উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মেলা এবং খেজুরী বোগা—হিজলী মসনদি আলার উরস উৎসব উপলক্ষে গুরুত্বপূর্ণ মেলা।

হিজলী মেলা : হেঁড়িয়া মোড় থেকে বাসে বোগা। বোগা থেকে ভ্যানে করে গ্রামে। সমুদ্রের ঢেউ মসজিদের আঙ্গিনায় আছড়ে পড়লেও হজরত তাজ খাঁ প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি এখনও অক্ষত আছে। প্রতি বৃহস্পতি ও শুক্রবারে খাসি ও মুরগির মাংস, পায়েস এবং সিন্নি ভোগ হয়। ফাল্গুন মাসে উরস উৎসবের ভক্তরা প্রত্যেকেই হয় একটি করে মুরগি নতুবা খাসি ছাগল আনে। সমুদ্রের ধারে মাংস রান্না হয়। লক্ষ লক্ষ যাত্রী সমাগম হয়। মসজিদটি ১০ ফুট চওড়া দেওয়াল যুক্ত, তিনটি খিলানের অপূর্ব ৩টি গম্বুজের একই তলে একটি বিরাট হলে প্রার্থনাস্থান। সামনে চাতাল, বাবার মাজার ও তার স্ত্রীর মাজার। মসজিদের পাদদেশে উন্মুক্ত জায়গায় ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রী-পুরুষ জাতিধর্ম-নির্বিশেষে মাসের পর মাস রোগমুক্তি কামনায় ধরণা দিয়ে পড়ে থাকে। জনশ্রুতি বাবার ব্যবহৃত রক্ষিত লৌহ-নির্মিত দীর্ঘ ছড়িটির স্পর্শে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে ও ফাল্গুনে উরস উৎসবে বাসে করে বহু যাত্রী মেলায় অংশগ্রহণ করেন।

বৈষ্ণব-উৎসব উপলক্ষে মেলা

ঝাড়গ্রাম-গোপীবল্লভপুর-গুপ্তবৃন্দাবনে মহোৎসব বিবরণী : গোপীবল্লভপুরে জ্যৈষ্ঠ মাসে রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দিরে দণ্ডমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব তিনশত বছরের প্রাচীন। (বিস্তারিত বিবরণ "মেদিনীপুর উৎসব-মেলা ও অর্থনীতি" পুস্তক দেখুন) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিষ্য হৃদয়ানন্দকে দণ্ডস্বরূপ দ্বাদশদিনব্যাপী মহোৎসব পালন করতে আদেশ দেন। এইভাবে 'দণ্ডমহোৎসব'-এর উৎপত্তি। পরে শ্যামানন্দপ্রভু গুরুর নিকট থেকে এই মহোৎসব প্রতি বছর পালন করবার ও ভার বহন করবার জন্য ভিক্ষা চেয়ে নেন। এই দণ্ডমহোৎসব প্রথম বছরে শ্রীধাম বৃন্দাবনে, দ্বিতীয় বছরে শ্রীপাট শ্যামসুন্দরপুরে এবং তৃতীয় বছরে কুশরদা মঠে অনুষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিনশো বছর ধরে ওই মহোৎসব শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে পালিত হয়ে আসছে। গুরুশিষ্য দুজনে মিলে বাংলা, বিহার, ওড়িশার মিলনস্থলের নিকট সুবর্ণরেখা নদীর তীরে গোপীবল্লভ-জীউর মন্দির নির্মাণ করেন। শ্রীরসিকানন্দ এই রসিকানন্দপুরে কুলদেবতা রাধাগোবিন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের পূজিত বিগ্রহের নামানুসারে এই গ্রামের নাম হয় "শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর"। কথিত আছে গোপীবল্লভ জীউর মন্দিরে দণ্ডমহোৎসব উপলক্ষে দ্বাদশদিনব্যাপী অহোরাত্র সুউচ্চস্বরে হরিনাম সংকীর্তন হবার ফলে এই স্থানে কোন কাক-পক্ষীর সমাগম দেখা যেত না। সে কারণে দয়াল রসিকানন্দ মহোৎসবের পরের দিন রাজ্যের যত কাক (কাকের খাদ্য দিয়ে) জড়ো করে **"কাক মহোৎসবে"র** প্রচলন করেন। অদ্যাবধি এই অনুষ্ঠানটি এই স্থানে পালন করা হচ্ছে। নামসংকীর্তন মহোৎসব উপলক্ষে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, সিংভূম প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে প্রায় দুশো প্রখ্যাত কীর্তনীয়া গুপ্তবৃন্দাবনের এই মহোৎসবে যোগদান করেন।
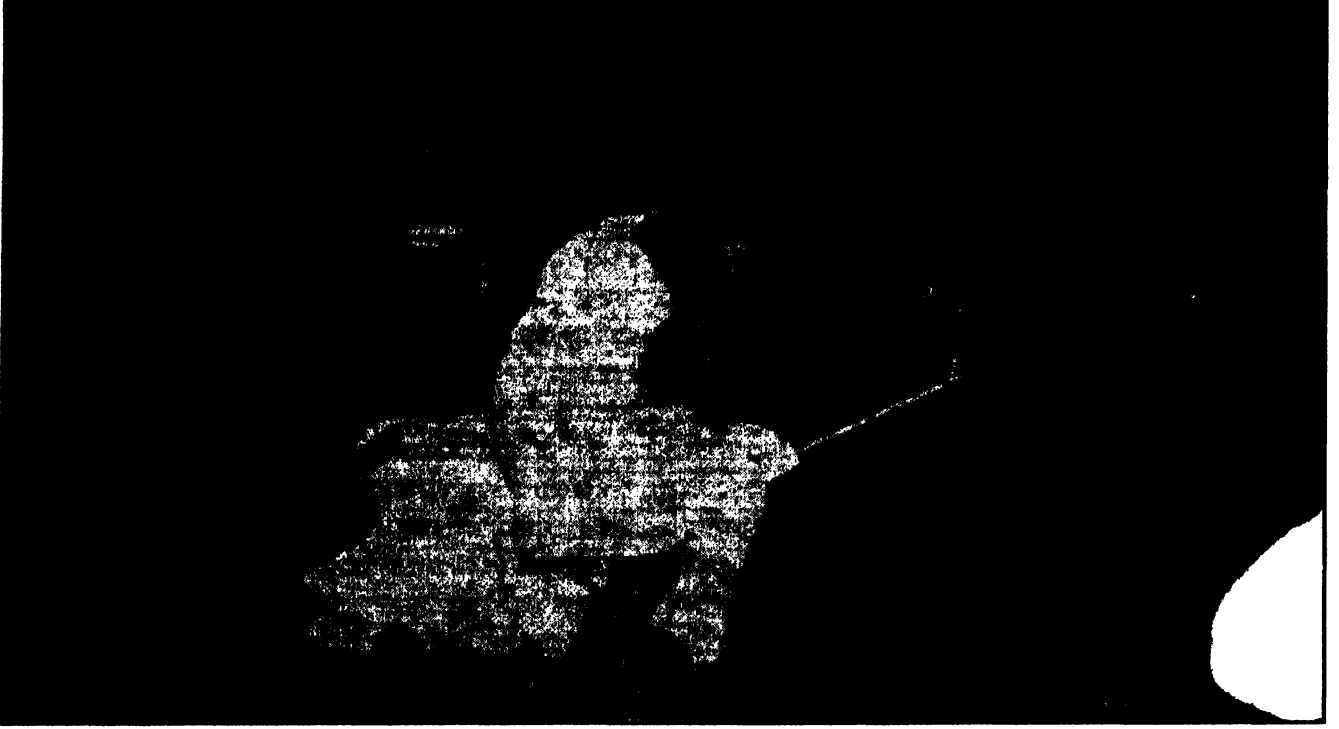
সহরায় অনুষ্ঠানে গরুমহিষের সঙ্গে ক্রীড়ানুষ্ঠান ছবি : কার্তিক মুর্মু

মহোৎসবের মেলা

গোপীবল্লভপুরে প্রতি জ্যৈষ্ঠে দণ্ডমহোৎসব উপলক্ষে রাধাগোবিন্দ জীউ সংলগ্ন প্রায় ১৮-২০ বিঘা জমির উপর ১২ দিনব্যাপী মেলা বসে। এই মেলা তিনশো বছরের প্রাচীন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান—মেদিনীপুর, হাওড়া, পুরুলিয়া ও হুগলি, ওড়িশার বিভিন্ন প্রান্ত, ময়ূরভঞ্জ ও বালেশ্বর জেলা, বিহারের সিংভূম ও মানভূম জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রধানত **বৈষ্ণব** সম্প্রদায়ের প্রায় ছয়-সাত হাজার নরনারী যোগ দেন। মেলার বিশেষ আকর্ষণ বুলবুলি পাখির নাচ। মেলায় ৩৫০টি দোকানের মধ্যে কৃষি-যন্ত্রপাতি ও বাঁশ-বেতের কাজ থাকে। কীর্তন, সিনেমা, সার্কাস ও যাত্রাও থাকে।

লৌকিক গ্রাম্য উৎসব বা দমদমা পূজা ও মেলা

চন্দ্রকোণা রোড-নয়াবসত থেকে ৩ কিমি দূরে কুবাই নদীর দক্ষিণ তীরে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষমূলে অধিষ্ঠিতা আছেন জাগ্রত এক বনদেবী যিনি মা "চামুণ্ডা" বা "মা দমদমা" নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। ভৈরবী মা চামুণ্ডার দক্ষিণে তাঁর মহাকাল ভৈরবও আছেন। বন্যপ্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিত্যপূজা বিশেষ পূজা ছাড়াও দুর্গানবমীতে ছাগরক্ত সহকারে পূজা হয়। এছাড়া এখানে মৃন্ময়ী চতুর্ভুজা দুর্গা মেড়ে পূজা হয়। এই চতুর্ভুজা (মেড়ে) দুর্গাপূজা মেদিনীপুর জেলার অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না। **মেলা** : ১৯৯৫ সালের মাঘমাসে রটন্তী চতুর্দশী থেকে পূজা ও কুমারী পূজা উপলক্ষে মণ্ডপে মেলা বসে তিনদিন যাবৎ কীর্তন, পালাগান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। ('মা দমদমা' পুস্তক)

রাজবাড়ির ছাতা পরব উৎসব ও মেলা

ঝাড়গ্রামে রাজবাড়ির আনুকূল্যে ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশীর দিন একটি নিটোল সরল শালগাছকে রীতি অনুযায়ী পূজা করে তাকে মাটিতে পুঁতে তার মাথায় একটি ছাতা দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে পারিষদসহ রাজা জঙ্গলে গিয়ে শালগাছ পূজা করে একটি নির্দিষ্ট দিনে গাছটি কাটিয়ে আনেন।৫০/৬০ হাত লম্বা গাছটি ব্রাহ্মণরা পূজার পর তার মাথায় 'ছাতা' দেন—একেই বলে 'ইন্দ্রধ্বজা'। ঝাড়গ্রামে রাজবাড়ির অনুষ্ঠান ছাড়াও মেদিনীপুর, আবাসগড়ে ইত্যাদি স্থানে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বহুলোকের সমাগম হয় ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

মন্তব্য : উপরে বিশেষ ধরনের কয়েকটি মেলা ও পূজানুষ্ঠানের বিবরণ দিলাম। মেদিনীপুর জেলায় লৌকিক ও অলৌকিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, মেলা ছাড়াও শিক্ষা-সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জাতীয়মেলা, বইমেলা, পোশাকমেলা, শিল্প ও রাজনৈতিক মেলাগুলি সামাজিক ও পারিবারিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মেলানুষ্ঠানে যোগদান করেন। বর্তমানে মেলা কমিটিতে সর্বসম্প্রদায়ের লোক জড়িত থাকায় অনুষ্ঠানগুলিতে সর্বধর্মের লোকের সমাগম হয়। ফলে জাতীয় জীবনে সংহতি গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

লেখক : রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত জাতীয় শিক্ষক
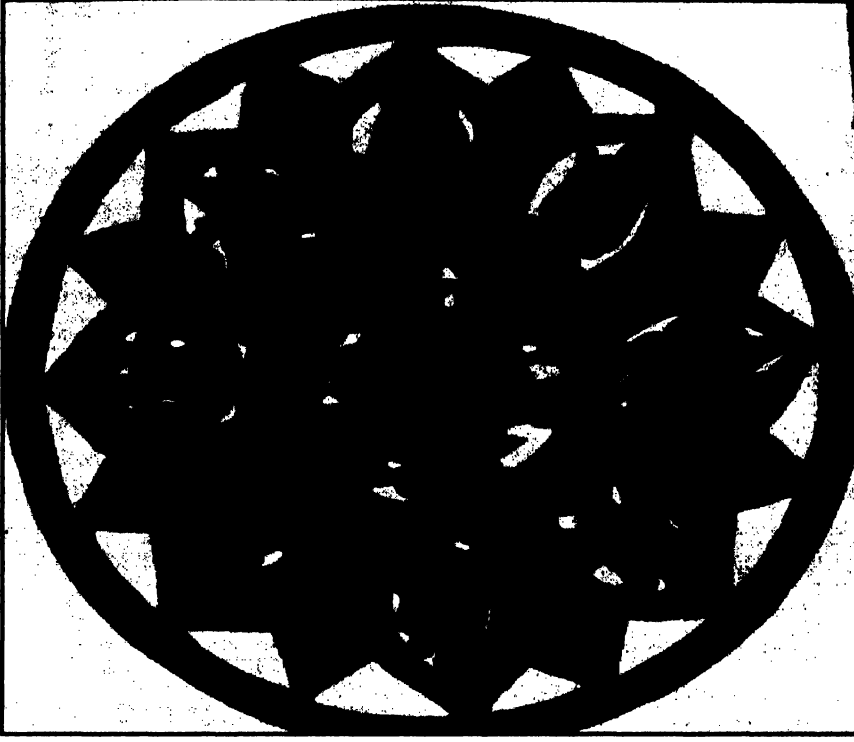
পাথরের শিল্প, বেলপাহাড়ী

মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্প

লায়েক আলি খান

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার বর্তমান যে ভূগোল সকলের পরিচিত তার ভূ-তাত্ত্বিক এবং জনজীবনের বৈচিত্র্য বিস্ময়জনক। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার জেলা মেদিনীপুরের পূর্ব অংশ পলিমাটি দিয়ে ও পশ্চিম অংশ ল্যাটারাইট মাটি দিয়ে গঠিত। এর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। পশ্চিমে ওড়িশা। পূর্বে হাওড়া ও হুগলি এবং উত্তরে বাঁকুড়া আর পুরুলিয়া। পশ্চিমে শালবন, বন্ধুর মালভূমি এলাকা। লাল কাঁকুরে মাটির বিস্তীর্ণ ভূভাগ। আর পূর্ব অংশে খাল-বিল-পানবোরোজ নদী-নালা-সমুদ্র তটবর্তী বালিয়াড়ি ঝাউবন। এই জেলার নামকরণ নিয়ে নানান মত মতান্তরের সংবাদ দিয়েছেন তারাপদ সাঁতরা তাঁর 'মেদিনীপুর সংস্কৃতি ও মানবসমাজ' গ্রন্থে। উৎসাহীরা সেখানে আরও পেয়ে যাবেন এই জেলার সীমানা বদলের নানান ঐতিহাসিক তথ্য।

বিচিত্র ভূগোলের এই জেলায় বসবাসকারী মানুষের জনজীবনের মধ্যেও আছে বিপুল বৈচিত্র্য। কৌম গোত্র গোষ্ঠীগত নয় শুধু, ভাষা আচার-আচরণ জীবনচর্যা ও জীবনবৃত্তে তাদের এই বৈচিত্র্য যেকোনও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল উদ্রেক করবে। এতিহাসিক ও নৃ-তাত্ত্বিক সংবাদ নিলে দেখা যায় এই জেলায় সুপ্রাচীনকাল থেকে জনবসতি গড়ে উঠেছে। প্রত্নপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর এবং ব্রোঞ্জ নির্মিত বহু আয়ুধ এই জেলার নানা জায়গায় পাওয়া গেছে। হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে মেদিনীপুরের উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে বহির্বাণিজ্যের যে যোগসূত্র ছিল

তার 'গেট ওয়ে' হিসেবে মেদিনীপুরের পূর্বাঞ্চলের তাম্রলিপ্ত বন্দরের নাম বহু বিখ্যাত। দশকুমার চরিতে সূক্ষ্ম প্রদেশের অন্তর্গত ছিল এই বন্দর দামলিপ্ত বা তাম্রলিপ্ত।

উত্তর ভারত থেকে আর্যরা দক্ষিণবঙ্গের দিকে খুব বেশি সংখ্যায় আসেননি। অনার্যগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশ্রণের ফলে যে মিশ্র আর্যপ্রজাতি গড়ে উঠেছিল তাদের ক্রমাগত এইদিকে বসতি প্রসারিত হয়। সিন্ধুপ্রদেশ জুড়ে যে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর বসতি ছিল সম্ভবত সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংসের পর তাঁরা দক্ষিণ ভারতের দিকে (তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে) সরে যেতে থাকেন। অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষের একটা বড় অংশ হিমালয়ের পাদদেশ থেকে আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হতে হতে নিম্নবঙ্গের দিকে নেমে এসে অরণ্যচারী সমাজ হিসেবে বসবাস করতে থাকেন।

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে আদিম অস্ট্রিক গোষ্ঠীর কোনও কোনও সম্প্রদায় এখনও রয়ে গেছেন। এঁদের মধ্যে মুণ্ডা, খেড়িয়া, লোধা, ভূমিজরা প্রধান। এঁরা মূলত মেদিনীপুরের পশ্চিম অঞ্চলের মালভূমি এলাকা ও পাহাড়টিলা শালশোভিত অরণ্য ভূ-ভাগকে নিজেদের বাসযোগ্য জায়গা বলে বেছে নিয়েছেন। তাঁরা আর্যদের সংস্কৃতি ও জীবনচর্যা থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে গেছেন চিরকাল এবং এই নিম্নবঙ্গে আর্যরা অনার্যদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করতে পারেননি।

অনুমান করা যায়, একসময় পরাস্ত ও বশংবদ আদিম জনগোষ্ঠীর একটি দল আর্যসমাজের সেবক হিসেবে শূদ্র নামে পরিচিত হয়। কিন্তু যারা আর্যদের বশ্যতা স্বীকার না করে প্রতিবাদ করে ও বারে বারে বিজয়ী আর্যদের আক্রমণ ও আঘাত করতে থাকে আর্য পুরাণে তারাই অনার্য বা অসুর বলে অভিহিত হয়। (এই সূত্রে মনে রাখা দরকার, 'অনার্য' শব্দটা আমরা বর্তমানে খুবই নঞর্থক ভঙ্গিতে ব্যবহার করে থাকি। এর পেছনে আর্য সংস্কৃতির সুপিরিয়রিটি কমপ্লেকস-এর প্রভাবই বর্তমান। 'অন আর্য' শব্দটিকে 'যারা আর্য নয়'—এই শব্দার্থে বোঝা দরকার)। অন-আর্যদের প্রতি বিজয়ী আর্যদের প্রবল ঘৃণা ও আক্রোশ ছিল সীমাহীন। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করে, তাদের ইতিহাসকে বিকৃত করে এই বিজয়ী আর্যসমাজ প্রশাসনের যে রোলার চালিয়েছিল, তার কিঞ্চিৎ আভাস আছে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে।' নাটকের উদ্ভব প্রসঙ্গে। আর্যদের লেখা নতুন নাটক 'অসুর বিজয়' বা 'অসুর পরাজয়ে' অসুরদের ইতিহাসকে বিকৃত করা হচ্ছে বলে প্রতিবাদী অসুরদের আক্রমণের সংবাদে।

যাই হোক, এই আদিম জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ মেদিনীপুরের পশ্চিম অংশে সুপ্রাচীনকাল থেকে বসবাস করছেন। তাঁদের দু'-একটি সম্প্রদায় (কুর্মি, ভূমিজ, লোধা) হিন্দু সমাজের আওতায় অবশ্য চলে এসেছিল অনেককাল। বলা বাহুল্য, হিন্দুধর্ম বা হিন্দু সংস্কার বলতে আমরা আর্য-অনার্যের মিলিত সেই সংস্কার আচারকেই বুঝি। মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি এই আর্য-অনার্যের মিলিত সংস্কৃতি। পরবর্তীতে যার সঙ্গে বহিরাগত ধর্ম-সংস্কৃতিও (মুসলমান, খ্রিস্টান) সম্মিলিত হয়েছে।

সংস্কৃতির দুটো Yard বা অঙ্গন। একটি তার Front Yard বা সামনের আঙিনা। দ্বিতীয়টি তার Back Yard বা পেছনের আঙিনা। সুপার স্ট্রাকচারের মর্জি ও শক্তি অনুযায়ী কখনও কোনও Yard-এর ওপর আলো পড়ে। চর্চা হয়।

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যে একশো ভাগ আর্য-সংস্কৃতিকে অনুসরণ করেছে তা কিন্তু নয়। আর্য ও অন্ আর্যদের সংস্কৃতির মিলিত রূপই ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি নামে পরিচিত। বলা বাহুল্য একেই এতদিন আমরা Front Yard Culture বলে বুঝে এসেছি। Back Yard Culture হিসেবে অনুন্নত জনসমাজের সংস্কৃতিকে ধরে নেবার একটা সংস্কার আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে। সেই সংস্কারের কারণে লোকসংস্কৃতি কথাটাই আমাদের এই Back Yard Culture-এর দিকে চালিত করে। কিন্তু উন্নত অনুন্নত সমস্ত জনমণ্ডলীর সংস্কৃতিই ব্যাপক ও যথার্থ অর্থে লোকসংস্কৃতি। দুটো ধারায় এই সংস্কৃতির চর্চা হয়ে থাকে—

এক—নাগরিক সংস্কৃতি।
দুই—প্রান্তিক বা আঞ্চলিক সংস্কৃতি।

নগর-মনস্ক বর্ণশ্রেষ্ঠরা মূলত প্রান্তিক এই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে তেমন গুরুত্ব না দিলেও আবহমানকাল ধরে এই লোকসম্প্রদায় তাঁদের নিজেদের গণ্ডিতে সামাজিক সংস্কার ও ধর্মাচার পালন করে এসেছেন। সাম্প্রতিক লোকসংস্কৃতির গবেষকরা এই সংস্কৃতির নানান দিকে সন্ধানী আলো ফেলে এইসব বিষয়কে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন।

মেদিনীপুর জেলার লোকসাধারণের মধ্যে আছেন বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ সম্প্রদায়, তফসিলী সম্প্রদায়, তফসিলী উপজাতি এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দিক থেকে প্রধান হলেন হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান। মেদিনীপুরের মুসলমান জনগোষ্ঠীর মানুষদের ভাষার ভিত্তিতে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়—

এক—বাংলা ভাষাভাষী।
দুই—মিশ্র উর্দু ভাষাভাষী।

বাংলা ভাষাভাষীরা মূলত এই জেলারই মানুষ। বিভিন্ন নিম্ন-সম্প্রদায় থেকে অ-দূর অতীতে ধর্মান্তরিত। মিশ্র উর্দু ভাষীরা কয়েক পুরুষ আগে প্রধানত ওড়িশা ও বিহার থেকে এ জেলায় এসেছেন। মূলত মুসলমান আমলে রাজভাষার ঐশ্বর্যের দিনে তাঁরা ওই ভাষা বলার চেষ্টায় ছিলেন এবং এজন্য এক ধরনের গর্বও তাঁদের ছিল। ইংরেজ আমলের পর থেকে এই ভাষার গৌরব অপসৃত হলে সামাজিক আভিজাত্যে বাংলা ভাষার উন্নতি ঘটে। তাই সেইসব পরিবার বাংলা ভাষায় লেখাপড়া শিখেছেন। বাইরে বেরিয়ে পোশাকি ভাষা হিসেবে

বাংলাই ব্যবহার করেন। কিন্তু নিজেদের গোষ্ঠীর পূর্বী হিন্দি ও উর্দু-বাংলা—ইংরাজি মেশা একটি বিচিত্র ভাষা ব্যবহার করেন। খোট্টা ভাষার সঙ্গে তার মিল। এ ভাষার কোনও ব্যাকরণ নেই। অদূর ভবিষ্যতে ভাষাতত্ত্বের থিয়োরি অনুযায়ী এ ভাষা স্রোত মন্দীভূত হতে হতে মরে যাবে। এই ভাষাভাষীদের জীবন ও ভাষা নিয়ে আলাদা গবেষণার সুযোগ এখনও রয়েছে।

জৈন ও বৌদ্ধরা একদা এ জেলায় থাকলেও বর্তমানে তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। শিখরাও মূলত ভিন্ প্রদেশাগত হিসেবে এ জেলায় বসবাস করেন—এই বিপুল বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর জেলা মেদিনীপুরে একটি মিশ্র সংস্কৃতির স্রোত আবহমানকাল প্রবাহিত হয়ে আসছে। ব্যাপক অর্থে একেই মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি বলে বুঝতে চাই।

এই সংস্কৃতির দুটো উপাদান—

এক—মানসিক উপাদান।

দুই—বস্তুগত উপাদান।

মানসিক উপাদানগুলির মধ্যে আছে :

লোকসাহিত্য (ছড়া, ধাঁধা, গাজন, টুসু, ভাদু, ঝুমুর, কীর্তন, পটের গান)

নৃত্যগীত, পার্বণ, মেলা (পৌষ পার্বণ, শিবরাত্রির মেলা, জাওয়া, ইদু, টুসু, মোহররম ইত্যাদি)

এইসব উৎসবের সঙ্গেই লোকসাহিত্যের গানগুলি ওতপ্রোত।

নাচ (ছৌ, কাঠি, পাতা, পাইক, রণপা, ঝুমুর প্রভৃতি)।

মেদিনীপুর জেলার লোকসাহিত্য প্রান্তিক প্রদেশের অ-সংস্কৃত জনগোষ্ঠীর মৌখিক তথা বাচিক সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে বিকশিত। বলাবাহুল্য, সম্প্রতি এই ধারা প্রবল মার খাচ্ছে মাইক ক্যাসেট এবং ভি ডি ও কালচারের আক্রমণে। আগামী প্রজন্ম হয়তো এগুলির উত্তরাধিকার হারাবে একদিন। এই বিপুল পরিমাণ লোক-সাহিত্যের মধ্যে পূর্বোল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও আছে কিছু কৃষ্ণযাত্রা, চিড়িয়া-চিড়িয়ানি ও ললিতা পালার মতো যাত্রাগান। এগুলি যাত্রার ধরনের সৃষ্টি। এসব সৃষ্টি মূলত আঞ্চলিক বাংলায় রূপায়িত। কাঁথি-পশ্চিম, রামনগর প্রভৃতি থানায় ওড়িয়া-মেশা এক বাংলা প্রচলিত আছে-লোকমুখে। সেই ভাষায় কথিত ছড়া ও গাজন গানের দু'-একটি নমুনা এখানে রাখা যেতে পারে।

শিশুর ঘুমপাড়ানি ছড়া :

১. কচিয়া কেনি কাঁদুরে / শুস্‌রা দরকে যাইতে।
আম দুবঅ কাঁঠাল দুবঅ / কনে বুস্যা খাইতে।

২. আয়রে আয় বায়া বায়ানি
গাই চরিতে যিবা
মা বাপ গালি দিনে
যুগী ভেস হবা।

জীবনযাপনের বোধ সম্পর্কে :

পড়িবু শুনিবু রইবু দুখে,
মা-ছ ধরিবু খাইবু সুখে।

নারী-বিষয়ক :

১. আঁক কুলি ঝাঁক-অ ঝাঁক-অ
বৈচি কুলের বেড়ি
রত্না যিব শাশু দো কু
মা কু মাগন ডুলি।

২. গরম ভাতে তর তরানি
পাখাল ভাতে মৌ
দাদা আইসু কয়্যা দুব
ঝুমরি লাচা বৌ।

গাজন গান : এই জেলায় চৈত্র-সংক্রান্তিতে গাজন উদ্‌যাপিত হয়। এই গাজন ভক্তরা হলেন শিব অনুচর ভক্ত দল।

পুরাণে সতীর দেহত্যাগের পর শিব অনুচরকে নিয়ে দক্ষের যজ্ঞ নষ্টের যে ঘটনা আছে যতদূর মনে হয় গাজন উৎসবের সূচনা সেই উপলক্ষে। ক্রম-বিবর্তনের ফলে বর্তমান রূপ গ্রহণ করেছে এই উৎসব রীতি। গাজন গানে যে তির্যক আক্রোশ, ক্রোধ ও অবৈধ বাসনার প্রকাশ আছে তার মূলে হয়তো সেই পৌরাণিক লোককাহিনির মেজাজ লুকিয়ে আছে।

মেদিনীপুরের রামনগর, এগরা, দাঁতন, গোপীবল্লভপুর এলাকায় এই গাজন গানের প্রচলন আছে। এ নিয়ে উৎসাহী গবেষকদের গবেষণা করার প্রভূত সুযোগ আছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা দু'-একটি গাজন গানের কলি উল্লেখ করতে চাই :

১. ভক্‌তা ভাই ভক্‌তা ভাই
কাঁইকু যিবু তুই ?
বাটর গর্টে কেঁদুয়া বাঘ
দেখি আইলি মুই।

২. আইলা পূর্ণিমা জন
পাতলি লানির দেখি যৌবন
মন করে ছল ছল পাতলি রে।

টুসু গান : টুসু গানের প্রচলন আছে মেদিনীপুরের কুর্মি-ভূমিজ, বাগাল সম্প্রদায়ের মধ্যে। ভাদু পরবের মতো এই পরবও এক মাস ধরে চলে। ভাদু চলে সারা ভাদ্র মাস। আর টুসু পৌষ মাস জুড়ে। টুসু ঝাড়গ্রাম মহকুমার জন-পার্বণ। প্রতি বছর টুসু পরবে নতুন নতুন গান রচিত হয়। মুখে মুখে টুসুর মূর্তিকে ঘিরে দু' ধরনের গান গাওয়া হয়। আবাহন ও বিসর্জন। পৌষ-সংক্রান্তির আগের দিন সারারাত জাগতে গিয়ে ও তারপরের দিন পৌষ সংক্রান্তিতে টুসুকে বিসর্জন দিতে গিয়ে জাগরণ ও বিসর্জনের গান গাওয়া হয়। অবশিষ্ট দিনগুলিতে বিচিত্র বিষয়ে গান হয়। সাময়িক ঘটনা থেকে অবৈধ প্রেম

প্রসঙ্গও বাদ থাকে না। এসব গানের রচয়িতা ও শিল্পী মূলত মহিলা। কখনও কখনও পুরুষেরা অংশ নেন। এতে দুটি তাল—দ্রুত ও ঢিমে—ব্যবহৃত হয়।

একমাস পূজার শেষে টুসুকে জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। তখন গান ওঠে :

১. ঝিকমিক পাথরের আড়ে
বল টুসু তোর কে আছে
মায়ো আছে বাপ আছে গ
জলে শ্বশুর ঘর আছে।

২. জলে হেল জলে খেল
জলে তোমার কে আছে ?
ভালো করে ভেবে দেখ লো
জলে শ্বশুর ঘর আছে।

পরব-পার্বণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

বাঁধনা : সাঁওতাল মুণ্ডা কোড়া ভূমিজ মাহাতো জনগোষ্ঠীর গো-সংক্রান্ত একটি জন-পরব বাঁধনা। কালীপূজার পরের দিন থেকে সেই উৎসব প্রায় এক পক্ষকাল ধরে চলে। সেখানে গরুকে নিবেদিত গুড় পিঠেকে বলে 'সুহুরা'। বর্ণ হিন্দুদের গোপ অষ্টমীও এই অনুষ্ঠানের রকমফের বলে মনে হয়। বাঁধনা পরবে কৃষিজীবী সমাজের সংস্কারযুক্ত। অনেকে মনে করেন আদিবাসী সমাজের বাঁধনা পরবের গোঠ পূজার স্ত্রী আচার হিন্দু সমাজে গৃহীত হয়েছে। সংস্কৃতির স্বীকরণ বা আত্মীকরণ রীতিতেই এই ব্যাপার ঘটেছে।

সোহরায় : ঝাড়গ্রাম মহকুমায় আদিবাসীদের শস্য উৎসব। এর সঙ্গে বাঁধনা, করম পূজা ও টুসু পূজারও যোগাযোগ আছে। 'সোহরাই' মানে কার্তিক মাস। হিম ঋতু। সুধীরকুমার করণ লিখেছেন : "সাঁওতাল পরগনা এবং সীমান্ত বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের সাঁওতালদের মধ্যে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় কার্তিক মাসে নয় পৌষ মাসে। কোনও এক অজ্ঞাত অবলুপ্ত ইতিহাসের পাতা যদি খুঁজে পাওয়া যেত, তাহলে দেখা যেত যে, এই উৎসব সোহরাই বা কার্তিক মাসেই অনুষ্ঠিত সাঁওতালদের মধ্যে।" (সীমান্ত বাংলার লোকগান / ১৩৭১ সং / পৃঃ ১৭২)। সাঁওতালদের গো মোষ জাগানোর পুজো সোহরাই পরব।

এইসব পূজা-পরবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ছড়া ও গান প্রচলিত আছে লোকসমাজে। এই এলাকায় ধ্বজপূজার সঙ্গে নাগরিক ও প্রান্তিক লোকসমাজের সংস্কৃতির ধারা যুগপৎ মিলিত হয়েছে। চন্দ্রকোণায় চন্দ্রকেতু রাজার গীতগাথা আজও গানের আকারে লোকসমাজে প্রচলিত। ভীম পূজাকে কেন্দ্র করে নানা উৎসব ও সংগীত ঘাটাল থানার প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। শীতলামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গলের গানে সংযোজিত 'এ্যাকেনা গান'গুলি লোককবিরাই রচনা করেছেন। দাসপুর সংলগ্ন সাগরপুর অঞ্চলে রয়েছেন বাউল সম্প্রদায় ও নাড়াজোল অঞ্চলে ফকির সম্প্রদায়, যাঁরা আজও গানের মধ্য দিয়ে মানবধর্মকে জয়যুক্ত করতে চান।

মোহররম : মোহররম-এর অনুষ্ঠান মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথা। মূলত এটি বেদনার স্মারক অনুষ্ঠান। হজরত মহম্মদ-এর দৌহিত্র হোসেনকে মোহররম মাসে কারবালা মরুভূমিতে সপরিবারে হত্যা করেছিল দামাস্কাসের রাজকুমার এজিদের সেনাবাহিনী। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও জলের অভাবে একে একে হোসেনের পক্ষের বীরেরা আত্মাহুতি দেন। কেননা পাশের নদী ফোরাত-এর জল এজিদ পক্ষেরা পান করতে দেয়নি হোসেনদের। এই করুণ কাহিনীর স্মারক গান গেয়ে, মুসলমান সম্প্রদায় মোহররম মাসে এই অনুষ্ঠান পালন করেন। এতে বাংলায় ও উর্দুতে গান রচনা করে গাওয়া হয়। এই গানগুলিকে বলে মর্সিয়া বা শোকগাথা। সঙ্গে বহন করেন বাঁশ ও রঙিন কাগজ দিয়ে বানানো হোসেন-হাসান-এর কবরের আদল। তাকে বলে তাজিয়া।

দক্ষিণ মেদিনীপুরের কাঁথি ও খেজুরি থানার দিকে মুসলমানেরা আর একটি অনুষ্ঠান করেন—তা হল মাদার পীরের দরগায় গান, সিন্নি দেওয়া ইত্যাদি। একে অবলম্বন করে মেলাও হয়। পীর মাদার মূলত নৌকার মাঝি সম্প্রদায়ে মান্য। অনেক হিন্দুরাও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সমুদ্রে নদীতে যাঁরা মাছ ধরতে যান, দীর্ঘদিন জলে নৌকো নিয়ে থাকেন তাঁরা এই পীরের দরগায় সিন্নি দেন। তাঁকে প্রসন্ন রাখলে ঝড় ঝঞ্ঝায়, নৌকারোহীর কোনও ক্ষতি হবে না, এই বিশ্বাস। সত্যেন দত্তের কবিতায় এই পীরের কথাই আছে :

'পীর মাদারের কুদ্‌রতিতে
নৌকা বাঁধা হিজলগাছে।'

এই পর্যায়ে নৃত্য প্রসঙ্গ আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। দু'-রকমের নৃত্য মেদিনীপুরের লোকজীবনে প্রচলিত। একটি গীতযুক্ত নৃত্য। অন্যটি গীত ছাড়া নৃত্য। গীতযুক্ত নৃত্যের মধ্যে কাঠি-নাচ, রুমাল নাচ, ঝুমুর নাচ প্রভৃতি আছে। কাঠি ও রুমাল নাচ ঝাড়গ্রাম এলাকায় মূলত প্রচলিত। আর কেবল নৃত্যের মধ্যে গাজনের নাচ (কখনও গান যুক্ত) ছৌ নাচ, রণপা নাচ ইত্যাদি। এর মধ্যে ছো নাচের বিষয় বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

ভূম রাজ্যের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ছো বা ছৌ নামে এই নৃত্যকলার উদ্ভব হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি এরকম কথা বললেও আমাদের মনে হয় মুখোশ পরা এই নৃত্যকলা অনেক আদিম। মূলত এগুলি সবই যৌথনৃত্য।

মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম বেলপাহাড়ী গোপীবল্লভপুর এলাকায় এই নাচের দল এখনও আছে। অবশ্য পুরুলিয়ার নাচের দলই বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। বেলপাহাড়ীর ছো-র সঙ্গে পুরুলিয়ার ছো-র কিছু পার্থক্য বর্তমান। অপরদিকে বারিপাদার ছো নাচের সঙ্গে গোপীবল্লভপুরের ছো-র মিল

আছে। সম্ভবত এর কারণ, পূর্বকালে গোপীবল্লভপুরের অনেকটাই ময়ূরভঞ্জের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাই ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদার সঙ্গে গোপীবল্লভপুরের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। এছাড়া চিলকিগড় রাজবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায়ও একটা ছো নাচের দল তৈরি হয়েছিল। পুরুলিয়ার ছো নাচ থেকে তা কিছুটা স্বতন্ত্র।

চাঙ্গু : চিলকি গড়ে আর এক ধরনের নাচ আছে—চাঙ্গু। চাঙ্গু হল একটি তাল রক্ষক চামড়ায় ছাওয়া বাদ্যযন্ত্র। এক হাতে ধরে আর এক হাতে চাপড়ে তাল রাখা হয়। চাঙ্গু হাতে নর্তক দল অর্ধচন্দ্রাকারে বা বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে নাচেন।

মেদিনীপুরের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লৌকিক দেবদেবীর নাম এই সূত্রে স্মরণীয়। বলা বাহুল্য সবগুলিই প্রায় আঞ্চলিক মহিমামণ্ডিত নারী দেবতা। যেমন : বর্গভীমা (তমলুক), সাবিত্রী (ঝাড়গ্রাম), কনকদুর্গা (চিলকিগড়), রঙ্কিনী (শিলদা), সর্বমঙ্গলা (গড়বেতা), বিশালাক্ষী (বরদা), ব্রাহ্মণী (নারায়ণগড়), কপালকুণ্ডলা (কাঁথি), জয়চণ্ডী (সাঁকরাইল)। এছাড়া পুরুষ দেবতা হিসেবে ভীম উল্লেখযোগ্য।

এই ভীম পূজা মেদিনীপুর জেলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে মাত্র হয়। অর্থাৎ ঘাটাল থেকে দাঁতন অবধি এই দেবতার পূজা প্রচলিত আছে। অন্য কোথাও নেই। মাঘমাসের একাদশী তিথিতে এই পূজা হয়। পথের পাশে খড় ও মাটি দিয়ে তৈরি বিপুলাকার মূর্তিতে রং ফলিয়ে গড়া হয় ভীম মূর্তি এবং এক রাত্রির মধ্যে পূজা সাঙ্গ হয়।

সম্ভবত মহাভারতের বনপর্বের কাহিনীসূত্রকে স্মরণে রেখে, শক্তিদেবতা হিসেবে ভীমকে পূজা করে থাকেন এই এলাকার এক শ্রেণীর মানুষ। বনচারিণী অনার্য নারী হিড়িম্বাকে যে ভীম স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সেই জনগোষ্ঠীর লোকদের ভীমপ্রীতির স্মারক হয়তো এই এক রাত্রির ভীম আরতি। আজ তার প্রামাণিক ইতিহাস অনুসন্ধান অসম্ভব। ইন্দোনেশিয়ায়ও নাকি এই ভীম পূজার প্রচলন আছে বলে কোনও কোনও লোকসংস্কৃতি গবেষক প্রমাণ পেয়েছেন। এর কারণ সম্ভবত এই যে এই জনগোষ্ঠীর কোনও দল বাণিজ্যিক সূত্রে ওই দেশে যাবার বেলায় এই পূজা রীতি নিয়ে গিয়ে থাকতে পারেন।

এইসব বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে এই জেলায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেলা বা পরব অনুষ্ঠিত হয়। সেসব মেলায় মিলিত হন সব ধর্ম, গোত্র ও গোষ্ঠীর মানুষ। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। সাঁওতালদের কোনও কোনও অনুষ্ঠানে অন্য সম্প্রদায়ের উপস্থিতি একান্তভাবে নিষিদ্ধ।

লোকসংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানগুলির মধ্যেই মিশে আছে লোকশিল্পের প্রেক্ষাপট। একদা আদিম মানুষ নিতান্তই জৈবিক প্রয়োজনে শুরু করেছিল বিভিন্ন আয়ুধের নির্মাণ। প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদানকে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনের টুকিটাকি গড়তে গড়তে মানুষ তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল তাদের ভালোলাগা ও ভালোবাসা। মৃৎপাত্র তৈরি করে তার গায়ে ছবি, লোহার অস্ত্রের গায়ে ইচ্ছে মতন আঁকিবুকি। এভাবেই তৈরি হয়েছে লোকশিল্পের নিজস্ব জগৎ।

মেদিনীপুর জেলায় হস্তশিল্প কুটিরশিল্প লোকশিল্পের প্রচুর উপাদান ছড়িয়ে আছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি :

১. পটুয়াদের পট। ২. বাঁশের তৈরি নানা বস্তু। ৩. বেতের আসবাব। ৪. পাথরের আসবাব। ৫. শালপাতার থালা বাসন। ৬. সোনা রূপোর গয়না। ৭. ফুলের গয়না, রাখি, ব্যাজ। ৮. মৃৎপাত্র ও মূর্তি। ৯. মাদুর শিল্প। ১০. বস্ত্র শিল্প। ১১. তালপাতার পাখিয়া। ১২. কাঁথা শিল্প। ১৩. দড়ি শিল্প। ১৪. লোহার তৈজসপত্র। ১৫. ঢোকরা শিল্প। ১৬. গালা শিল্প। ১৭. গয়নাবড়ি। ১৮. লবণ।
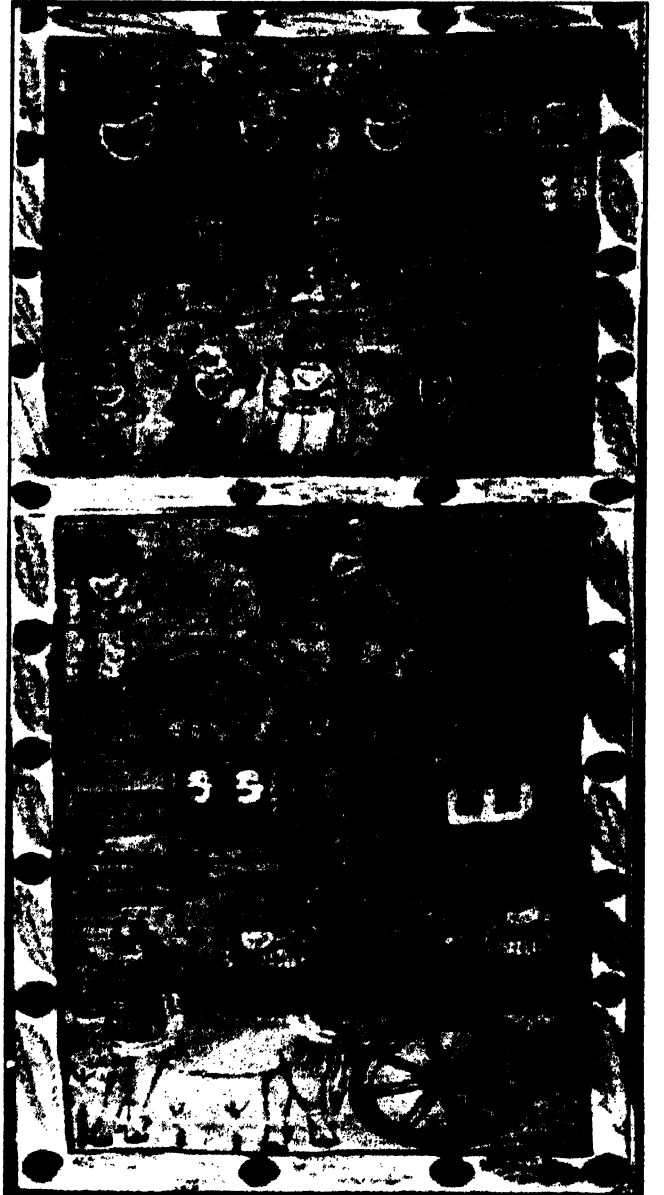
সিনেমার কুফল, শ্যামসুন্দর চিত্রকরের পট

১. পটশিল্প মূলত পূর্ব মেদিনীপুর অঞ্চলেই প্রচলিত ছিল। লম্বা কাপড়ের ফালিতে গোটানো থাকে আঁকা ছবি। ছবিগুলি সাধারণত কাহিনি অবলম্বী। শিল্পী একটু একটু করে পট খুলে গুটিয়ে নিতে নিতে কাহিনীর নির্দিষ্ট গান গেয়ে যেতে থাকেন। ছবির সঙ্গে গানের সম্মিলন ঘটে। এই দৃশ্য ও শ্রাব্য চলচ্ছবি দর্শক শ্রোতার মনে যথেষ্ট রস সঞ্চার করে।

পটশিল্পের গান অংশকে লোকসংস্কৃতির মানসিক উপাদান হিসেবে কেউ কেউ দেখতে চান, আর ছবিগুলোকে বস্তুগত উপাদান হিসেবে। বর্তমানে এই লোকশিল্পটি প্রায় অবলুপ্তির পথে। দু' একজন শিল্পী সরকারের আনুকূল্যে দেশে বিদেশে খ্যাতি অর্জন করলেও দেশের বৃহৎ জনতা এই শিল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন টি ভি ও ভি ডি ও-র দিকে। ফলে এ শিল্পের মৃত্যু আসন্ন।

২. বাঁশের তৈরি নানান ব্যবহারিক বস্তু মূলত তৈরি করেন তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষ। এ কাজে এই সম্প্রদায়ের নারী পুরুষ সকলেই প্রায় সমান দক্ষ। জেলার প্রায় সব অঞ্চলেই এঁরা বসবাস করেন। একদা পেশাভিত্তিক জনপদের চিহ্ন হিসেবে সমাজের একপ্রান্তে এরা এখনও রয়ে গেছেন। বাঁশ থেকে নির্মিত কুলো, ছাঁকনি বা চালুনি, মাটি তোলার বড় ঝুড়ি বা ছোটো ছোটো চুপড়ি, মাছ রাখার খাঁচা—ইত্যাদি তাঁরা তৈরি করেন।

বেত ও বাঁশের শিল্পকর্ম

অধুনা এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাঁশের দরমা বেড়ার কাজ। বলাবাহুল্য এজন্য প্রয়োজনীয় বাঁশ মেদিনীপুরে উৎপন্ন হয় না। বাঁশ আসে মূলত উত্তরবঙ্গ থেকে। পাতলা এক ধরনের বাঁশকে ফাটিয়ে তার আস্তরণকে হাতের কৌশলে বুনে ফেলে বড় বড় প্লট তৈরি করে মাপমত পার্টিশান দেয়ালের বা বেড়ার কাজ হয়।
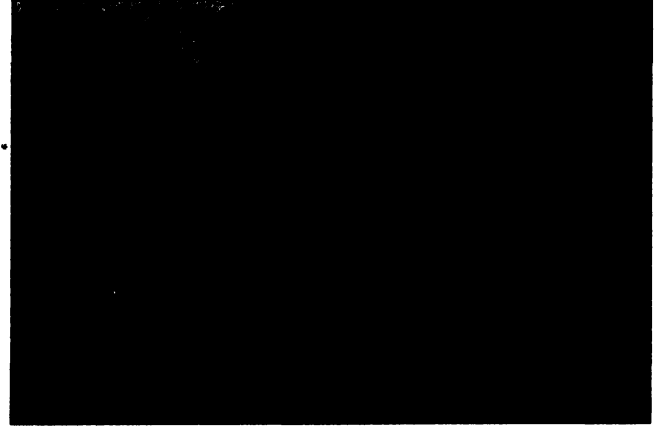
বেত ও বাঁশের শিল্পকর্ম

সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের ব্যবহার কমেছে। তার জায়গা দখল করেছে পলিথিন, প্লাস্টিক। ফলে এইসব পেশার মানুষেরা পেশা বদল করেছেন। অথবা বদল করছেন বাঁশের নির্মিত বস্তুর ধরনও। এখন পাখির খাঁচা বা মাছের খাঁচা আর দেখা যায় না। ঐসবের বদলে রুচিকর শিল্পকর্ম বাঁশ কেটে নানান মূর্তি ইত্যাদি তৈরির কথাও কোনও কোনও লোকশিল্পী ভাবছেন, করছেন, নজরে পড়ে।

৩. একদা এ জেলায় বেতের বিভিন্ন আসবাবও নির্মিত হয়েছে এবং বাজার পেয়েছে। বাঁশের মত বেতও অরণ্যজাত। তবে বাঁশের থেকে বেত অনেক বেশি শক্ত। সূক্ষ্ম ও নমনীয় বলে বেত নির্মিত বস্তুর শিল্পতা ছিল আরও দামী। বেতের কাজও করে এসেছেন এই অন্ত্যজ শ্রেণীর মানব মানবী। বর্ণশ্রেষ্ঠদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বেতের ডালি, বড় ধামা, ছোটো ধামা, বেতের ঝাঁপি ইত্যাদি বিক্রি করে বিনিময়ে চাল খুদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন তাঁরা। অধুনা ঐসব বস্তুর নির্মাণ প্রায় নেই। তার জায়গায় বেতের মোড়া চেয়ার দোলনা টি-টেবিলের কাঠামো ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। বাড়িতে নয়, কারখানায়। ছোটো ছোটো ঘরোয়া কারখানা আছে শহর ঘেঁসা বস্তি অঞ্চলে। সংখ্যায় কম। প্রশিক্ষিত শিল্পীর সংখ্যাও বেশি নেই। সে বাজারও পলিথিন ও প্লাস্টিকের আসবাবের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পশ্চাৎপর। কোনও কোনও শৌখিন মানুষের ইচ্ছা-শখ এই লোকশিল্পের একমাত্র প্রেরণা। তাছাড়া মেদিনীপুরে সমুদ্র তীরবর্তী জঙ্গল ও অন্যত্র যে বেতের শ্রেণী আছে তা দিয়ে এইসব আধুনিক আসবাব
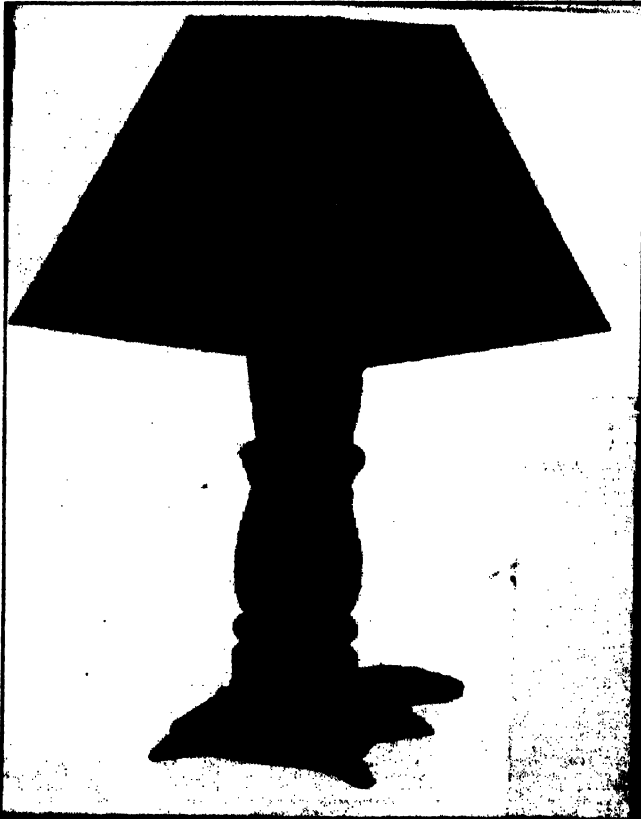
হয় না। সেজন্য বেত আনতে হয় উত্তরবঙ্গ, অসম অঞ্চল থেকে। ফলত তা ব্যয়বহুল। তাই মেদিনীপুরের হস্তশিল্প হিসেবে বেতের কাজ দাঁড়াতে পারবে না বলেই বিশ্বাস।

বেত ও বাঁশের শিল্পকর্ম

৪. বিনপুর বেলপাহাড়ি শিলদা জামবনি অঞ্চলে নরম পাথর খোদাই করে থালা, বাটি, গেলাস, প্রদীপ বা দীপাধার প্রভৃতি বানানো হয়। চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরা যে মাটি বা পাথরের থালা ব্যবহার করত সেটাই ছিল তার হা-ঘরের সংসারে একমাত্র শৌখিন আসবাব। দুর্দিনে যা বাঁধা দেবার পরিকল্পনাও ছিল তার। ধাতু নির্মিত তৈজসের পূর্ব থেকে এই প্রস্তরশিল্প ছিল আমাদের জীবনে। মেদিনীপুরের
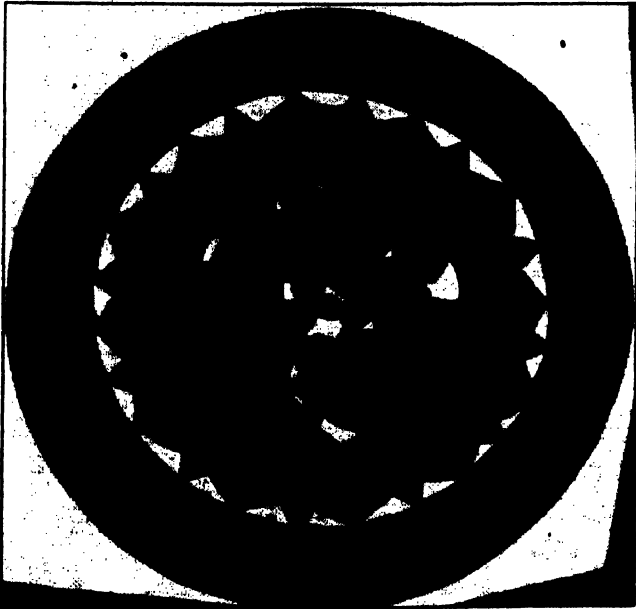
পাথরের শিল্পসামগ্রী, বেলপাহাড়ি

প্রান্তিক শিল্পীরা সভ্যতা সংস্কৃতির বিপুল পরিবর্তনের ধারাস্রোতে আজও যে এই হস্তশিল্পটিকে ধরে রেখেছেন সেটা কৃতিত্বের ব্যাপার। কিন্তু 'অ্যান্টিক' বস্তু সংগ্রাহক ছাড়া এইসব পণ্যের আর ক্রেতা না থাকার কারণে অচিরেই হয়তো এই শিল্পটিও মুছে যাবে।

৫. এই সূত্রে শালপাতার থালা বাটির কথা উল্লেখ করা দরকার। ঝাড়গ্রাম, গড়বেতা, গোয়ালতোড়, রামগড় অঞ্চলে শালগাছ থেকে সংগ্রহ করা পাতা থেকে তৈরি হয় থালা বাটি। সম্পন্ন গৃহস্থেরাও কিছুদিন আগে পর্যন্ত উৎসবে অনুষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণে ঐ পাতায় নির্মিত থালা বাসন ব্যবহার করতেন। অধুনা এই শিল্প মার খাচ্ছে প্লাস্টিক ও থার্মোকলের থালা বাটি গ্লাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদায়।

৬. বিভিন্ন ধাতুর মূলত রূপো এবং সোনার গয়নার কাজ করেন মেদিনীপুরের কিছু হস্তশিল্পী। মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চলে কাঁথি, রামনগর, দাঁতনে রূপোর গয়না তৈরির দু ধরনের বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। একটা সরল, অন্যটা জটিল তথা সূক্ষ্ম। প্রথম রীতিতে আছে মোটা বা ভারি ধরনের বালা, হাঁসুলি, কানের ঝুমকো, বাজু পৈঁচি প্রভৃতি। আর সূক্ষ্ম কাজের মধ্যে আছে—সূক্ষ্ম রূপোর তারের সাহায্যে নানান জটিল আকৃতির কারুকার্য করা গয়না। বলা বাহুল্য, এই রূপোর কাজ এখন প্রায় অস্তাচলগামী। মানুষের রুচির বদলের ফলে মোটা দাগের গয়নাও এখন যাদুঘরের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। অবশ্য ওই অঞ্চলের এসব গয়নায় ওড়িশা অঞ্চলের প্রভাবই কার্যকরী ছিল। সোনার গয়না মূলত উচ্চবিত্ত মানুষের রুচির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, জেলার সব অঞ্চলের স্বর্ণশিল্পীরা নিজেদের দক্ষতা অনুযায়ী সোনার অলংকার গড়েন।

৭. পক্ষান্তরে আছে পাঁশকুড়া কোলাঘাট অঞ্চলের ফুলের গয়না গড়ার শিল্প। শিল্পীরাও মূলত আঞ্চলিক। কোলকাতার নাগরিক ফুলের বাজারও অনেকটা এঁদেরই দখলে। বিশেষ করে বিবাহবাসরে ও তার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানে। শুধু তাই নয়, ফুলের রাখি ও ব্যাজ এখন বেশ খ্যাতি ও চাহিদা অর্জন করেছে এই জেলায়। তাই বর্তমানে এই শিল্পের বাজার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবু শিল্পীরা কেবল আনুষ্ঠানিক দিনগুলিতে চাহিদার যোগান দিয়ে সম্বৎসরের রুটি-রোজগারে অসমর্থ বলে তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি তেমন হচ্ছে না। আর অন্যদিকে অনুষ্ঠানের দিনের ওইসব স্বল্পকালীন গয়নার মূল্যও উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। ফলে সব আর্থিক মাপের ক্রেতারা ওই বাজারে পৌঁছতে অক্ষম হচ্ছেন।

৮. মৃৎপাত্র ও মূর্তি জেলার প্রায় সব অঞ্চলেই নির্মিত হয়। সভ্যতার প্রাথমিক স্তর থেকেই মাটির পাত্র ও মূর্তি তৈরি হয়ে থাকে। তবে রান্নার পাত্র হিসেবে মাটির হাঁড়ি প্রায়

বিদায় নেবার পথে। কেবল পূজাআর্চা ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ডে রান্নার জন্য মাটির হাঁড়ি গৃহীত হয়ে থাকে। তবে জলের কলসি কুঁজো ইত্যাদি এখনও ধাতু নির্মিত ও প্লাস্টিক নির্মিত পাত্র থেকে স্বাচ্ছন্দ্যকর বলে এগুলির বাজার আছে। মাটির কারুকার্যযুক্ত কুঁজো বেশ দামেই গরমকালের আগে বিভিন্ন মেলায় গঞ্জে বিক্রি হয়। এর থেকে কর্মী শিল্পীরা কতই বা রোজগার করেন আমরা তার হিসাব রাখি না খুব একটা।

তবে পুজোর মরশুমে মূর্তি গড়ার কারিগররা মৃৎপ্রতিমা নির্মাণ করে ভালোই উপার্জন করেন। এই কাজে সাধারণত কুমোর সম্প্রদায়ের লোকেরাই আছেন। পেশাভিত্তিক সমাজব্যবস্থার স্মারক হিসেবে এখনও প্রায় প্রত্যেক বর্ধিষ্ণু গ্রামের একপ্রান্তে কুমোরপাড়া আছে।

যতদূর মনে হয় এককালে এই সম্প্রদায়ের মানুষই পোড়া ইট ও টালি তৈরির কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সুদীর্ঘকাল এই শিল্প ইটভাঁটা নিয়ন্ত্রিত কারখানা-ধর্ম অর্জন করায় এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের নর-নারীদের কম পয়সায় ইঁটের মিলে কর্মী হিসেবে ব্যবহার করার ফলে এই পেশা দীর্ঘকাল থেকেই হাতছাড়া হয়েছে কুমোরদের।

তবে তাঁরা নিযুক্ত আছেন মাটি দিয়ে তৈরি নানান খেলনা ও হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি শিল্পকর্মে। পিরের দরগায়, গ্রামের মনসা থানে এই ঘোড়ার মূর্তিগুলি রাখার সংস্কার আছে গ্রামের মানুষদের। এই উৎসর্গ করা মূর্তিকে বলে ছলন। এ প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের তমলুক অঞ্চলের পোড়া মাটির হরিমন্দিরের কাজ উল্লেখ করতে হয়। এটি চতুষ্কোণ একটি ফাঁপা বেদীর মত। উপরের দিকটা কলসির মত গোল গলাযুক্ত। চারপাশে বাইরের দিকে থাকে রিলিফ বা ভাস্কর্য। এতে মাটি বোঝাই করে তুলসী গাছ রোপণ করা যায়।

মেদিনীপুর শহরে পাওয়া যায় দেয়ালির সময় নানা মাপের পোড়া মাটির বিচিত্র দেয়ালি পুতুল, ঘাঘ্‌রা পরা নারী মূর্তি, দুই কিংবা চার হাত মাথার ওপর এবং হাতের ওপর থাকে একাধিক প্রদীপ। দেয়ালির রাতে এগুলিতে তেল সল্‌তে দিয়ে প্রদীপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৯. মাদুর শিল্প—মেদিনীপুরের সবং এলাকার বিশিষ্ট হস্তশিল্প। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে যেমন শীতলপাটি।

মাদুর তৈরি হয় এক প্রকারের খড় বা ঘাস জাতীয় প্রাকৃতিক উদ্ভিদে। গ্রামাঞ্চলে একে মসিনা বলে। সেই খড় পাতলা সরের মতন। সবুজ বা চকচকে পিছল শরীরের। সরলবর্গীয় দৈর্ঘ্যে ৩।৪ ফুটের বেশি হয় না। মাথায় থাকে একটা খয়েরি রঙের ছাতার মত ফুল। কার্তিক মাসের দিকে ওই মসিনাগুলো পেকে ওঠে—মানে শক্ত হয়। তখন গোড়া থেকে কেটে নেওয়া হয়। এর চাষের জন্য আলাদা ক্ষেত কৃষকেরা খুব কম ব্যবহার করেন। ধানের জমির আলে, পুকুরের পাড়ে এই গাছের মূল লাগিয়ে দেওয়া হয়—জ্যৈষ্ঠের দিকে।

বর্ষায় অঙ্কুরিত এই মসিনা সংগ্রহ করা হয় কার্তিকের দিকে। সংগ্রহ করা মসিনাগুলোকে গোটা অথবা ফালি করে রোদে শুকিয়ে সোনালি করে তোলা হয়। কখনও কখনও রং করাও হয় এই মসিনাগুলোকে। এরপর কাপড় বোনার পুরাতন পদ্ধতিতে টানায় দড়ি অথবা সুতো দিয়ে একটা একটা কাঠি বুনে একটা কাঠের ঠেস দণ্ড দিয়ে (যেটার ফুটোর মধ্যে টানার দড়ি পরানো থাকে) চাপ দেওয়া হয়। সৌখিন মাদুরের জন্য রঙিন সুতো ও রাঙানো মসিনা কাঠি ব্যবহার করা হয়।

বর্তমানে গোটা জেলায়, জেলার বাইরেও এই মাদুরের ভালো চাহিদা আছে। ডেবরা ও পাঁশকুড়া এবং এগরা মাদুরের ভালো বাজার। গ্রীষ্মপ্রধান এই জেলায় আরামদায়ক শয্যা বা শরীর এলাবার বিছানা এই মাদুর। প্রধানত সবং এলাকার এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। হিন্দু মুসলমান উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মানুষ এই পেশায় আছেন। তবে কর্মী শিল্পীদের চাইতে এই শিল্প থেকে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরাই বেশি লাভবান হন।

১০. পাশাপাশি আছে এই জেলার উল্লেখযোগ্য তাঁতশিল্প। অমর্ষি এলাকার তাঁতশিল্প জেলা জুড়ে যথেষ্ট চাহিদা তৈরি করেছে। সম্প্রতি সরকারি অনুদানে শিল্পীরা কিছুটা আর্থিক সংগতির মুখও দেখেছেন। এছাড়া প্রত্যেক গ্রামে যে একদা হস্তচালিত তাঁতের কাজ হত তা প্রায় লুপ্ত। শিল্পীরা পেশা বদল করেছেন। অবশ্য গোপীবল্লভপুর এলাকার কটকি ধাঁচের কাজ করা তসর এবং গরদের শাড়ি ও চাদরের ভাল সৌখিন বাজার আছে।

১১. এই জেলার বয়নশিল্পের সঙ্গে আর একটি বিশেষ শিল্পের নাম করা জরুরি। তা হল খেজুরি রামনগর কাঁথি থানা এলাকার তালপাতায় 'পাখিরা' বা 'পেখ্যে' শিল্প। কৃষিকাজের সময় প্রধানত বর্ষাকালে এই বস্তুটির প্রয়োজনবোধ করতেন প্রত্যেক চাষী পরিবার।

তালের পাতা থেকে নির্মিত হয় এই বস্তু। মানুষের মাথা থেকে হাঁটুর নিচ অবধি মাপের এই বর্ষাতি এক অদ্ভুত রীতিতে তৈরি হয়।

প্রথমে বৈশাখ মাস থেকেই তালগাছের সবুজপাতা সংগ্রহ করা হয়। সেগুলিকে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। পাতার ভাঁজ অনুযায়ী মাপে চিরে ফেলতে হয়। ভাল করে শুকিয়ে গেলে ওগুলো অল্প বদ্ধ জলে কাদার ভেতর বাণ্ডিল করে ১০/১৫ দিন পুঁতে রাখা হয়। ভালভাবে পচে গেলে ধুয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এতে পাতাগুলো মুচমুচে হয়ে ভাঙে না। বরং নমনীয় ও ছাই ছাই রং ধারণ করে। এবার বেতের পাতলা আস্তরণ বা তাল পাতার ডাঁটা থেকে প্রস্তুত পাতলা বাতি দিয়ে আড়াআড়ি গেঁথে বুনে ফেলা হয় একটা চওড়া পাতার চাটাই। তাকে মুড়ে

মাথার দিকটা উল্টো-সোজা বুনে ওই তালের ডাঁটার পাতলা বাতি দিয়ে সেলাই করে ফেলা হয়।

একটি একজন লোক ব্যবহার করতে পারে। পিঠের দিকে মাথা থেকে ঝুলে থাকে এই বর্ষাতি। হাত দিয়ে ধরে থাকতে হয় না। ফলে চাষের কাজে সুবিধে হয়। রোদের সময় এর তেমন ব্যবহার নেই। বৃষ্টির দিনেই মূলত এর ব্যবহার। বর্তমানে পলিথিন দিয়ে ঢাকা শরীর নিয়ে মাঠে নামছেন কৃষকেরা। শিল্পটি এখন উঠে গেছে প্রায়।

ঐ শিল্পীরাই বানাতেন একই সঙ্গে তালপাতার পাখা। ডাঁটাওয়ালা তালের নরম পাতা থেকে তৈরি এই পাখার যুগ প্রায় শেষ হয়ে এল। অধিকাংশ গ্রামেই ইলেকট্রিক পৌঁছে গেছে। ফলে তালের পাখার রেওয়াজ লুপ্তপ্রায়।

১২. কাঁথাশিল্পে কেবল পূর্ববঙ্গ নয় কিংবা পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম নয়, মেদিনীপুর জেলারও নাম ছিল এককালে। যখন পরিবার ছিল যৌথ, পারিবারিক কাজ ছিল সীমিত। কৃষিনির্ভর এই দেশে বয়স্ক নারীরা হাতে পেতেন অবসর, তখন পুরনো বা নতুন কাপড়ে, পুরনো কাপড়ের পাড় থেকে বের করা সুতো দিয়ে কাজ হত কাঁথার ওপরে নকশা করার। নবীনারাও যোগ দিতেন এই শিল্পকর্মে। বিয়ের বাজারে নকশিকাঁথা জানা যুবতীদেরও কদর ছিল। সম্প্রতি জামবনী থানার আস্তাপাড়া গ্রামে এই রুগ্ন ও বিস্মৃতপ্রায় লোকশিল্পের অবশেষ রয়ে গেছে।

পেতলের তৈরি নৌকা

১৩. মেদিনীপুরের দড়িশিল্প একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। শিশল গাছের ছাল থেকে তন্তু বের করে নিয়ে মেদিনীপুরেই কেবল দড়ি তৈরি হয়। শক্ত কাজে মূলত কুয়োর জল টানার দড়ি হিসেবে ওই দড়ির বাজার ভালই। তাছাড়া পাটের দড়ি দিয়ে দোলনা ইত্যাদি শৌখিন কাজও কোনও কোনও শিল্পী করে থাকেন। অবশ্য প্রাচীন সভ্যতায় কেবল দড়ি তৈরিকে পেশা করে পারস্যের মানুষেরা 'খৈয়াম' নামে পরিচিত ছিলেন। আমাদের দেশে এটা একটা 'সাইড বিজনেস' হিসেবে প্রচলিত দীর্ঘকাল।

ছনের দড়ি বর্তমানে আর তৈরি হয় না। ছনের চাষও প্রায় নেই। কিন্তু নারিকেলের দড়ি থেকে পাপোষ বা নারকেল ছোবড়া থেকে সোফা বা বিছানার গদি কিছু কিছু তৈরি হয় এ জেলায়। জেলার দক্ষিণ অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা নারকেল ছোবড়া দিয়ে এইসব কাজ শহরগঞ্জের ধুনকর সম্প্রদায়ের লোকেরাই করে থাকেন।

এছাড়া বাবুই ঘাস থেকে তৈরি দড়ি দিয়েও ঝাড়গ্রামের একটি প্রতিষ্ঠান পাপোষ ইত্যাদি তৈরি করে থাকে। চন্দ্রকোণা রোড এলাকায় বাবুই জাতীয় ঘাসের চাষ হয়। খড়ের চাল তৈরিতে পাটের দড়ির চাইতে বাবুই অনেকটা কম খরচের বলে বেশ বাজার করেছিল একদা।

বর্তমানে খড়ের চালের সংখ্যা কমছে। মানুষেরা টালি অ্যাজবেস্টস (asbestos) টিন বা পাকা বাড়ির দিকে ঝুঁকেছেন। ফলে কেবল দড়িই নয়, খড়ের চাল তৈরির মাধ্যমে একটা শিল্প ছিল তারও অবসান হচ্ছে। বর্তমানে রাসায়নিক সারের প্রয়োগে জাত ধানের গাছের খড় একটা বা দুটো বর্ষার বেশি টিকছে না। ফলে দড়ি মজুরি দিয়ে ঘর ছাওয়ার পরে অন্ততপক্ষে ৩।৪ বছর নিশ্চিন্ত থাকা যাচ্ছে না বলে মানুষজন এই খড়ের চালের প্রক্রিয়া থেকে সরে আসছেন। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত খড়ের চাল ছাওয়া শিল্পীকর্মীরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। যেমন প্রায় গিয়েছেন মাটির দেওয়াল বানাবার শিল্পীরা।

১৪. লোহার তৈজসপত্রের নির্মাণে জেলাজুড়ে নাম আছে দাঁতন এলাকার লোকশিল্পীদের। ছুরি, কাঁচি, যাঁতি, বঁটি, কাস্তে প্রভৃতি নির্মাণে এই এলাকার মানুষের পরিশ্রম ও শিল্পবোধ সুনাম সৃষ্টির পেছনে আছে। এইসব নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলির বাজার অদূর ভবিষ্যতে নষ্ট হয়ে যাবে না বলে মনে হয়।

১৫. বাঁকুড়ার মতো এ জেলায়ও চন্দ্রকোণা রোডের নিকটবর্তী গুইয়াদহ ও রামগড় গ্রামের ঢোকরাশিল্প বেশ নাম করেছে। যাযাবর এই শিল্পী সম্প্রদায়ের একটি শাখা সম্প্রতি গোয়ালতোড়ের কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছে। 'সিরে পার্দু' বা 'লস্ট ওয়াকস' পদ্ধতিতে শিল্পীরা যেসব দেবদেবী বা জীবজন্তুর মূর্তি ঢালাই করে তৈরি করেন সেই মূর্তিকে ঢোকরা শিল্প বলে। ঘর সাজাবার ক্ষেত্রে এইসব মূর্তি সংগ্রহ করেন আধুনিক ক্রেতারা। মেদিনীপুরের ঢোকরার কাজ অন্য জায়গার থেকে আকৃতিতে বড় হয়। এই সূত্রে পেতলের একটি শিল্পকর্মের উল্লেখ দরকারি।

শীতলা ঘট। পেতলের কলসির ওপর বসানো থাকে দেবীমূর্তির মুখ। তার মাথায় থাকে মুকুট, মিনা করা কাজের মতো চিত্রিত চোখ চুল সিঁদুর টিপ ইত্যাদি প্রতিমাকে জীবন্ত করে তোলে। মেদিনীপুরের দক্ষিণ অঞ্চলের মৃগদা চন্দপুর ও আরও দু-একটি গ্রামে এগুলি নির্মিত হয়।

১৬. গালাশিল্প বিহারলগ্ন মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুরে একদা বিখ্যাত ছিল। তারাশংকরের 'রাধা' উপন্যাসে বৃহৎবঙ্গের গালাশিল্পের কদর যে দিল্লিতে ও বহির্ভারতে ছিল তার সংবাদ আছে। অধুনা দক্ষিণ মেদিনীপুরের এগরা থানার পাঁচরোল গ্রামে রঙিন গালা পুতুল নির্মিত হয়।
প্রথমে মাটি পুড়িয়ে মূল মূর্তিটা প্রস্তুত করা হয়, তারপর সেগুলিকে গরম করে তার গায়ে গালা ঢেলে দেওয়া হয়। প্রাকৃতিক লাক্ষা বা লাহা থেকে যে গালা তৈরি হত রাসায়নিক গালা আবিষ্কৃত হওয়ায় এই শিল্পও এখন কোণঠাসা। লুপ্তপ্রায় এই লোকশিল্পও হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বিনষ্টির কবলে পড়বে।

পেতলের তৈরি ঘট

১৭. এছাড়া এই জেলার শিল্প নমুনা হিসেবে গয়নাবড়ি, কাঠের কাজও এককালে বহু খ্যাত ছিল। এখন বিনষ্টপ্রায়।

১৮. সবশেষে লোকশিল্প হিসেবে চিহ্নিত না হলেও একটি বিষয়ের উল্লেখ না করলে মেদিনীপুরের লোকশিল্পের আলোচনা অসমাপ্ত থাকবে। তা হল দক্ষিণবঙ্গের মূলত পূর্বতন নিমকপরগনার (তমলুক, মহিষাদল, গুমগড়, কসবা-হিজলি, কালিন্দী, ভাঁইটগড় প্রভৃতি অঞ্চল) লবণ প্রস্তুতির বিষয়। এর মধ্যে Fine Art-এর ব্যাপার নেই বলে একে শিল্পপদবাচ্য করতে চাইবেন না অনেকেই। কিন্তু কুটিরশিল্প হিসেবে লবণ তৈরি যে শিল্পই তা কে অস্বীকার করবে ?

বিগত শতাব্দীর '৭০-এর সময় পর্যন্ত এইসব অঞ্চলের লোকসাধারণের এক অংশ লবণ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে লবণ সত্যাগ্রহে উৎসাহের সঙ্গে এই অঞ্চল অংশগ্রহণ করেছে। লবণ দামে কম হলেও অত্যাবশ্যক পণ্যের অন্তর্গত। মেদিনীপুরের কালিন্দী অঞ্চলে ২/১টি লবণ কারখানা গড়েও উঠেছিল। সম্প্রতি তা বন্ধ। বর্তমানে দক্ষিণ ভারত থেকে যে লবণ আসে তাই বাজার ধরে রেখেছে এবং বিভিন্ন কোম্পানির বিজ্ঞাপনের জোরে প্যাকেটজাত পণ্য হয়ে লবণও আক্ষরিক অর্থে দামী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই মেদিনীপুর জেলার এইসব অঞ্চলের লোকেরা উৎপাদন করতেন লবণ। উৎপাদন প্রক্রিয়াও ছিল বড় সহজ।

সমুদ্রের লবণ জলের জোয়ারভাঁটা চলাচলের এঁটেলযুক্ত পলিমাটিতে রোদের তাপে লবণ জমে ওঠে। হাল্কা চাঁচনি দিয়ে ওই লবণাক্ত মাটি ওপর থেকে চেঁচে সংগহ্ করা হয়। একটা উঁচু জায়গায় সেই মাটিকে অল্প জলে ভিজিয়ে গোল করে বাঁধ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। একে বলে 'দ' (দহ)। এর নিচে একটা গর্ত থাকে। কখনও সেই গর্তে বসানো থাকে মাটির ভাঁড়। উঁচু 'দ'-এর মাটি ধোয়া জল যাতে নিচের গর্তের ভাঁড়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়তে পারে তার জন্য একটা ছোট্ট ফুটোতে খড় দিয়ে পথ করা থাকে। ওই মাটি ধুয়ে যে জল জমে তা যথেষ্ট মাত্রায় নোনা। এইরকম একাধিক 'দ' থেকে সংগ্রহ করা প্রবল নোনা জল বড় কড়াইতে এলাকার বনাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা কাঠের অল্প আঁচে ফুটতে দেওয়া হয়। জল কমলে জমে ওঠে সাদা লবণ। তবে এখনও তা খাদ্য হিসেবে ব্যবহারযোগ্য নয়। সেই সদ্য জমে ওঠা লবণ শুকনো কাপড়ে বেঁধে ছাইয়ের গাদায় পাথর চাপা দিয়ে ২৪ ঘণ্টা রেখে দেবার পর যথেষ্ট সাদা ও ঝুরঝুরে লবণ প্রস্তুত হত।

বর্তমানে মানুষ এই পরিশ্রম করতে অনিচ্ছুক। হাতে সময়ও নেই। ফলে শিল্পটি মার খাচ্ছে। আর তাই মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি দখল করছে লবণ বাজার। আর একটা- দুটো প্রজন্মের পর এলাকার মানুষও হয়তো ভুলে যাবে এই লোকপ্রক্রিয়ায় লবণ উৎপাদন শিল্পটির প্রসঙ্গ।

বৈচিত্র্যময় এই জেলার লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্পের ভিন্ন ভিন্ন কিছু চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে এই আলোচনায়। সাধারণভাবে চেষ্টা করা হয়েছে জেলার লোকসংস্কৃতির অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত দিকগুলিকে পরিচয়ের আলোকে আনার। লোকশিল্পের দিকটিতে বিশেষ জোর দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কেননা, এই লোকশিল্পের পরিচয় নেবার সূত্রেই জেলার কর্মমুখর জনজীবনের-লোকজীবনযাত্রার ধারাটির সম্যক্ পরিচয় লাভ সম্ভব হবে।

ঋণ স্বীকার :
১। বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি / দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি।
২। অনিমেষ কান্তি পাল / লোকসংস্কৃতি।
৩। প্রদ্যোৎকুমার মাইতি / বাংলার লোকধর্ম ও উৎসব পরিচিতি।
৪। বিনোদশঙ্কর দাস / মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন।
৫। তারাপদ সাঁতরা / মেদিনীপুর সংস্কৃতি ও মানবসমাজ।
৬। শব্দের মিছিল / বাংলা সাহিত্য সম্মেলন মেদিনীপুর জেলা ৯-১২ জুন ১৯৯৫ সংখ্যা।
৭। জীবেশ নায়ক / প্রসঙ্গ : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।
৮। সম্পাঃ বিশ্বনাথ রায় / পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা।
৯। ডঃ গোপীকান্ত কোঙার / বর্ধমান জেলার মেলা : সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা।

লেখক: অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান

ইয়াকুব চিত্রকরের রামায়ণ পট

মেদিনীপুরের পট ও পটুয়া : ফিরে দেখা

প্রভাতকুমার দাস

আমাদের ছেলেবেলায় গ্রীষ্মের দুপুরগুলো দুরন্ত হয়ে উঠত, ঘর-পালানো সঙ্গীসাথীদের নিত্যনতুন ফন্দিতে। বাবুদের বৃহৎ বাগানে গড়খাই পেরিয়ে সোনাপাখি ধরার দুষ্টু আয়োজন, খা-খা মাঠের ফাঁকা প্রান্তরে বারণ না-মানা হু-হু রোদ আর বাবলাগাছের পাড়ায়-পাড়ায় আঠা সংগ্রহ। পাটকাঠির আগায় চিটফল জাতীয় চিঁচি পোক ধরে বেড়ানো। মরে যাওয়া মধ্যাহ্নের নদীর চড়ায় গামছা দিয়ে মাছ ধরা খেলা, আর বিশাল বটের আভূমিনত ঝুরি ধরে দোল খেতে খেতে ঝুপ করে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়া—তারই মধ্যে কাছে-দূরে পাড়াপড়শীর খিড়কিঘাটে গান বেজে উঠত। গান বেজে উঠত চড়াগলায়, অমনি সব প্রিয় খেলা ফেলে ছুটতাম, যেখানেই থাকি না কেন, গান কানে বাজলেই। সেই বয়সে পটির গান শুনতে পাওয়া একটা আশ্চর্য আনন্দের ব্যাপার ছিল। মা-দিদিমা, বউড়ি-ঝিউড়িদের দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্ক গায়করা 'কাই গো মা পটি দেখব অ যে—' বলে ডাকলেই, পূর্বের ইঙ্গিতমতো আমরা এসে ডেকে নিয়ে যেতাম পটিদারদের। সদরে নয় খিড়কিতে। খিড়কিতে কেন না, সদরে বৈঠকখানায় বাড়ির কর্তাবাবু তখন নিয়মিত দিবানিদ্রায়। সুতরাং খিড়কিতে ঘাটের ধারে, তেঁতুল গাছের ছায়ায় মধ্যাহ্নের পটিগানের আসর বসত ; দর্শক আর শ্রোতা আমরা কয়েকজন নেহাত হাফপ্যান্ট পরা আর উলঙ্গ শিশু ছাড়া, সবাই মহিলা। সবারই সমান আকর্ষণ। এই

সম্মিলিত আসরে, মনমতো পছন্দসই গান একটার পর একটা গেয়ে যেত পটিদার, কখনও শ্রোতৃবর্গের অনুরোধ আসত বিশেষ বিশেষ গান দেখার।' প্রায় পঞ্চাশ বছরের অধিককাল আগের অভিজ্ঞতার এই মুদ্রিত পাঠ অধুনালুপ্ত বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'অন্বিষ্ট' পত্রিকার বিশেষ পট সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল অন্তত পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে। বর্তমান যাঁদের বয়স চল্লিশ থেকে আশির কোঠায়, তাঁরা যদি মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল, সুতাহাটা, নন্দিগ্রাম, তমলুক বা কাঁথির বাসিন্দা হন—তাঁদের শৈশবের এই স্মৃতি নিশ্চয় সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। ঘাটাল, পাঁশকুড়া, খড়গাপুর, ঝাড়গ্রাম, বেলদা বা নাড়ারোল অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছেও এই চিত্র অনুরূপ প্রতিক্রিয়াই তৈরি করবে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, আজকের প্রজন্মের কাছে এই অভিজ্ঞতা একেবারেই অবান্তর এবং অবাস্তব—তাঁদের শতকরা দশজনও ওই উল্লিখিত এলাকায় জন্মেও এই ভিক্ষাজীবী সম্প্রদায় সম্পর্কে সামান্য হলেও পরিচিত এমন দাবি করা যায় না। বিগত পঞ্চাশ-ষাট বছরে এই গোষ্ঠী ক্রমশ মুমূর্ষু অবস্থা থেকে প্রায় বিলুপ্তির অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। যেটুকু অস্তিত্ব এখনও সামান্য মাত্র কোনওরকমে টিকে আছে তা একেবারেই নিঃশেষ হতে হয়তো বেশি দিন লাগবে না।

উপরের স্মৃতিচিত্রের হারানো পাতার দুটি উল্লেখ প্রথমেই পরিষ্কার করে নিতে হবে। 'পটি', 'পটির গান', 'পটিদার' আর 'গান দেখা' এই তিনটি বিষয়ে সামান্য বিশ্লেষণ দরকার। 'পটি' বা 'পট' শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থের অনুসন্ধানে ভোলানাথ ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন : 'পট শব্দটির জন্ম নিয়ে প্রায় অনেকদিন ধরে আলোচনা হয়েছে। সংখ্যা গরিষ্ঠের মন্তব্য : (১) সম্ভবত কাপড়ের উপর ছবি আঁকার পদ্ধতি গোড়ায় খুব বেশি ছিল, পট শব্দ দ্বারাই তা অনুমিত হয়, (২) পট কথাটি এসেছে সংস্কৃত পট্ট বা পট থেকে এবং এর অর্থ হল কাপড় বা বস্ত্রখণ্ড, (৩) প্রথমত এই চিত্র-কাহিনী যে কাপড়ের ওপর আঁকা হত তার প্রমাণ পট্ট থেকে পট কথাটির অপভ্রংশের মধ্যে, (৪) বাংলাদেশে পট বলতে সেই চিত্রকে বোঝায় যেটি কাপড়ে কিংবা কাগজে আঁকা। অর্থাৎ পট্ট তা থেকে কাপড়ে আঁকা—এই হল পট। অবশ্য পট্ট থেকে পট শব্দটির উৎপত্তি কিনা সে বিষয়ে বিতর্কও কম নেই। বর্তমান নিবন্ধে সে প্রসঙ্গের বিস্তার না করে অবশ্যই বলা যায়, 'পট' বা 'পটি' বাংলার চিরন্তন লোকচিত্রকলার একটি জনপ্রিয় নিদর্শন হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

এখন সমস্ত রকমের পটই কাগজের ওপরে আঁকা হয়। গুরুসদয় দত্ত তাঁর 'পটুয়া-সংগীত' গ্রন্থে জানিয়েছিলেন : 'বাংলাদেশের পটগুলিকে সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) একচিত্র সম্বলিত ছোট ছোট 'চৌকা' পট ; (২) পরপর অঙ্কিত বহুচিত্র সম্বলিত 'দীঘলপট' বা 'জড়ানো পট'। এই বহুচিত্র দীর্ঘপটগুলি অবলম্বন করিয়াই পটুয়াগণ গীতিকাব্য রচনা করে এবং সুরসহযোগে তা আবৃত্তি করে।' প্রসঙ্গত এও উল্লেখ করা দরকার, আড়াআড়িভাবে জড়ানো পট যা আড় লাটাই পট হিসেবেও আখ্যাত হয়ে থাকে। এক-দেড় ফুট চওড়া পরিসরে লম্বায় বারো থেকে পঁচিশ ফুট—একটি বিশেষ কোনও কাহিনীকে খোপে খোপে চিত্রের মাধ্যমে বিন্যস্ত করা হয়। প্রত্যেকটি খোপে লতাপাতা এঁকে বর্ডার দেওয়া হয়। যাতে জোড়া দেওয়া কাগজগুলি মজবুত হয় সেজন্য পেছনে কাপড় সেঁটে দেওয়া হয়। সহজে পটটি খুলে দেখানোর জন্য হাতে ধরবার সুবিধা হয়, গোটানো যায় সচ্ছন্দে—সে জন্য দুই প্রান্তে কঞ্চি বা সরু বাঁশের খণ্ড জুড় দেওয়া হয়। সাধারণ্যে এই চিত্রসহযোগে যে গান পটির গান বা পটের গান হিসাবে পরিচিত। গুরুসদয় দত্ত তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে লিখেছিলেন : 'প্রাচীন ভারতে কাপড়ের উপর চিত্র লিখিবার রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। যে কাপড়ের উপর চিত্র লিখিত হইত, পট বলিতে বিশেষ করিয়া সেই কাপড়টিকেই বুঝাইত। কালক্রমে পটের শেষোক্ত অর্থ অধিকতর প্রচলিত হইল। এই জন্য 'পটকার' বা 'পট্টীকার' বলিতে চিত্রকর সমাজকে বুঝাইতে লাগিল। ('পটকার' বা 'পট্টীকার' বলিতে তন্তুবায়ও বুঝাইত ; কিন্তু ওই অর্থ এখন অপ্রচলিত)। পট শব্দের উত্তর সম্বন্ধবাচক 'উয়া' প্রত্যয়যোগে পটুয়া শব্দের উৎপত্তি। সাধুভাষা ও পুরাতন বাংলার শব্দ 'পটুয়া'র আধুনিক প্রাদেশিক রূপভেদ পউট্যা, পউটা, প'টো (পোটো)। পটুয়ারা নিজেদের চিত্রকর জাতি বলিয়া উল্লেখ করে।'

১৩৮৫ সালের ১৪ই ভাদ্রের প্রবল বর্ষণ, দুর্যোগ ও বিপর্যয়ে মেদিনীপুর

চিত্রকর পদবির পাশাপাশি এঁরা পটিদার পদবিও ব্যবহার করেন। মেদিনীপুর জেলায় আদিবাসী সমাজের কাছে এই চিত্রকরদের নাম 'পাটকিরি' বা 'পাটকার'—তারাপদ সাঁতরা এও জানিয়েছেন : 'আবার চিত্রকরদের মধ্যে যাঁরা 'যাদুপট' অঙ্কন করে থাকেন তাঁদের পরিচয় হয় 'যাদু পটুয়া' বা 'যদু পটুয়া', কিন্তু আদিবাসীদের কাছে তাঁরা কখনও কখনও 'যাদব পাটকিরি' বা 'যাদব পাটকার' নামে অভিহিত হয়ে থাকেন।'

সামাজিকভাবে পটুয়ারা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে ব্রাত্য বলে পরিচিত, অথচ তাঁরা এই উভয় সম্প্রদায়েরই ধর্মীয় বিধি আচরণ পালন করে থাকেন। অধিকাংশ পটুয়াই দুটো নামের অধিকারী, একটি হিন্দু নাম, অন্যটি মুসলমান নাম। তাঁরা জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু ঘটনায় মুসলমান রীতিনীতি অনুসরণ করে থাকেন। জামাইষষ্ঠী বা ভাইফোঁটা ব্রত অনুষ্ঠান পালন

করেন। বিবাহের অনুষ্ঠানে ইসলাম মতে কলমা পড়ানো হলেও, হিন্দু রীতিমতো বিয়ের সময় গায়ে হলুদ, বিয়ের পর সিঁথিতে সিঁদুর, শাঁখা পরানো হয়। মুসলিমদের অনুসরণে বিয়ে দিনেরবেলা হয় না, সাধারণত হিন্দুদের মতো রাত্রেই অনুষ্ঠিত হয়। তারাপদ সাঁতরা জানিয়েছেন : বিয়ের পর গ্রাম্য দেব-দেবীর থানে নব-বিবাহিত বর-বধূ প্রণাম জানায়। আবার ছেলের অন্নপ্রাশনে মুসলিম রীতিতে 'সুন্নত' করার প্রথাও প্রচলিত। হিন্দু ঠাকুর-দেবতার পট আঁকা নিয়ে কাজ-কারবার, তাই এঁদের অনেকের কাছে গো-মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। কোথাও কোথাও এঁরা নিজেরাই মসজিদ বানিয়ে সেখানে নামাজ পড়েন। অথচ আশ্চর্য ঘটনা, এঁরা সাধারণত মুসলমানবাড়িতে পট দেখান না, দেখালেও মসলন্দ গাজীর পট দেখান। এঁদের প্রধান আশ্রয়স্থল হিন্দুদের বাড়ি। বিশ্বকর্মা পূজা পটুয়াদের একটি অবশ্য আরাধনা কৃত্য। স্বরস্বতী পূজার মূর্তি প্রণাম করতে তাঁরা দ্বিধা করেন না। মহরম, ঈদ প্রভৃতি মুসলমান উৎসবেও তাঁরা অত্যন্ত পবিত্রতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।

স্মরণ করা যেতে পারে মেদিনীপুরের নানকাচক গ্রামের জ্ঞান পটিদার ধর্মের কথা বলতে আমাকে প্রসঙ্গত শুনিয়েছিলেন : 'পূর্বে তাঁরা হিন্দু ছিল। তারপর নবাবের আমলে মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে জোর করে যবন করে। সেই থেকে ইসলেম, নামাজ, রোজা। মুসলমানদের সঙ্গে এক সমাজে বসা-খাওয়া, এক হুঁকোয় তামাক, শুধু ঝিউড়ি লেনদেন নেই। হিন্দুদের সঙ্গেও না। কবর দিই। জন্মালে মুসলিম নিয়ম পালন করি।' ওই নানকাচক গ্রামের গুণধর পটিদারের ছেলে পিয়ার পটিদার জানিয়েছেন : 'অনেকে হিন্দু ধর্ম নিয়েছিল আমি তা মানি না ; জন্ম থেকে এক ধর্ম পেয়েছি, তার পরিবর্তন সম্ভব নয়। আমি আমার এই ধর্মকে ভালোবাসি।' প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়, মেদিনীপুরের সূতাহাটা থানার আকুবপুর গ্রামে রজনী চিত্রকর-সহ একদল পটুয়া হিন্দু ধর্মে রূপান্তরে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। রজনী চিত্রকরের পুত্র শ্রীশচন্দ্র চিত্রকর আমাকে প্রায় তেত্রিশ বছর আগে তথ্য হিসাবে নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিয়ে জানিয়েছিলেন : 'বাংলা ১৩৫৪ সাল থেকে তাঁরা তৎকালীন হিন্দু মহাসভার কর্মীদের উদ্যোগে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, শ্রীহিন্দুভূষণ দাস, প্রমথনাথ মাইতি প্রমুখের প্রচেষ্টায় হিন্দু সমাজে উঠেছিলেন ধর্মীয় সংস্কার অনুষ্ঠানের পর। তৎকালীন সমাজপতিদের সঙ্গে একদল ধর্মান্তরিত পটুয়াদের একটি গ্রুপ ফটোগ্রাফ দেখিয়েছিলেন, যেটি পরবর্তীকালে 'ফোকলোর' (অক্টোবর ১৯৭২) পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। অবশ্য এমন অনেক উদাহরণ আছে যাঁরা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করার পর পুনরায় পুরনো পটুয়া ধর্মে ফিরে গেছেন। তারাপদ সাঁতরা মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থানায় কেশবগড়ের প্রবীণ সতীশ চিত্রকরের, উদাহরণ দিয়েছেন, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় কলকাতার বালিগঞ্জ থেকে ভারত সেবাশ্রম সংঘের পরমানন্দ গোস্বামী মহারাজ কয়েকজন চিত্রকরের শুদ্ধি করিয়ে হিন্দুতে রূপান্তর করান। কিন্তু সে অনুষ্ঠানে সতীশ হিন্দু হলেও বাকিরা পটুয়া থেকে যান। শুদ্ধি হয়ে যাওয়া পটুয়ারা পরবর্তীকালে পুরনো পরিচয়ে ফিরে যান বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক কর্মে হিন্দুদের সহযোগিতা ও সম্মতি পাননি বলে।

শ্যামসুন্দর চিত্রকরের
চণ্ডীমঙ্গল পট

পটুয়াদের মধ্যে সকলেই পট আঁকেন তা নয়, আবার যাঁরা পট আঁকেন তাঁরা যে গানও করেন তা নয়। রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্যের নানা জনপ্রিয় কাহিনীকে তাঁরা যেমন তাঁদের অঙ্কিত চিত্রে পরিবেশন করেন, তেমন তাঁরা গাজীর পট, ধর্মনিরপেক্ষ অনেক সামাজিক পটও তৈরি করেন। তাঁদের আঁকা সাহেব পট বা স্বদেশি ভাবনার পটগুলিও সমাজে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। সমসাময়িক কোনও দুর্ঘটনা একেবারে তাৎক্ষণিক প্রেরণায় পটের বিষয় হয়ে উঠেছে। পণ প্রথা, বধূ নির্যাতন, অশিক্ষার কুফল—সামাজিক নানা ফ্যাশন তাঁদের পটের গানে তীব্র কটাক্ষে ও উপভোগ্য ব্যঙ্গে পটের গানে ও ভাষায় প্রতিফলিত হয়েছে। আবার একই পট দুই সম্প্রদায়ের কাছে দুরকমভাবে প্রদর্শিত হয়, সত্যনারায়ণ পট ও সত্যপীরের পট এই ধরনের পটের সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ।

২

গুরুসদয় দত্ত তিরিশের দশকে যে তিনটি জেলায় তথ্যানুসন্ধানে পট ও পটুয়াদের বিষয়ে 'পটুয়া-সংগীত' নামে গ্রন্থটি লিখেছিলেন, সে তিনটি জেলা হল বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ। গুরুসদয় দত্ত তাঁর পর্যালোচনায় যে চিত্রটি তুলে ধরেছিলেন, তাতে সাধারণভাবে পটুয়াদের পরিস্থিতি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তিনি লিখেছিলেন : 'সম্প্রতি আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার ও শহরে শিক্ষার প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার চাহিদা এবং গুণগ্রাহিতা বাংলার গ্রাম হইতে বিলুপ্ত হইয়া

যাইতেছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনুপম শিল্পকলা-নিপুণ এই গ্রাম্য পটুয়াদের অন্নসংস্থান হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছে। চাহিদার অভাবে বাধ্য হইয়া ইহাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোককেই পট আঁকা ও পট দেখানো ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া জন-মজুরের বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া, হিন্দু ধর্মের মূল নীতিগুলিতে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন এই সুনিপুণ চিত্রকরগণ এখনও হিন্দুদের পূজার জন্য দেব-দেবীর ছবি আঁকা ও মাটির প্রতিমা গড়িবার কাজে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও ভারত-ইতিহাসের ও বাংলার ইতিহাসের প্রহেলিকাময় আবর্তনে হিন্দু সমাজের গণ্ডী হইতে বিতাড়িত হইয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে ; এবং এই দুই ধর্ম সম্প্রদায়ের গণ্ডীর বাহিরে অনশনে ও অর্ধাশনে অতি দুর্ভাগা দিন যাপন করিতেছে।' মেদিনীপুরের পটুয়াদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে এই বর্ণনার কোনও অমিল নেই।

ভোলানাথ ভট্টাচার্য তাঁর একটি নিবন্ধে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনা দপ্তরের গ্রন্থে সুধাংশুকুমার রায় পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া বসতির যে অমূল্য তালিকা নথিবদ্ধ করেছিলেন, তাতে মেদিনীপুরের তেরোটি গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি : আকুবপুর, চৈতন্যপুর, সিরুই, কেশবপুর, দেউলপোতা, ঠেকুয়াচক, সনকাচক, হবিচক, বাসুদেবপুর, কেশববাড়, কুমিরমারা, নাড়াজোল, মাগুরিয়া। ১৯৮৯-এর ২১-২৪ ফেব্রুয়ারি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্যনাটক সংগীত ও দৃশ্যকলা আকাদেমির উদ্যোগে যে লোককারু শিল্প মেলা হয়, পরবর্তীকালে সেই অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'আর্ট অ্যান্ড আর্টিস্টস' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয় শোভন সোমের সম্পাদনায়। ওই পুস্তিকাটির সহযোগী সম্পাদক হিসাবে বর্তমান প্রতিবেদক যে বিবরণটি প্রস্তুত করেন, তাতে জানানো হয় : 'পশ্চিমবাংলার পটুয়া বসতির একটি জেলাভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, পট ও পটুয়া বিষয়ক বিভিন্ন মুদ্রিত রচনার উল্লেখের উপর ভিত্তি করে, কিছু কিছু গ্রামের নাম সংগৃহীত হয়েছে পটুয়াদের সঙ্গে আলোচনার সূত্রে। এই তালিকা অনুসরণ করে হয়তো পটুয়াদের বর্তমান অবস্থানের সঠিক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হতে পারে। এই তালিকার বাইরে এমন কিছু গ্রামের নাম থাকা স্বাভাবিক, যেখানে পটুয়াদের পাড়া খুঁজে পাওয়া সম্ভব ; তেমন এই তালিকা অনুসরণ করলে এরকম অভিজ্ঞতাও অর্জিত হতে

১৯৯৮ সালের ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়ে মেদিনীপুর জেলার দাঁতন

পারে যেখানে বর্তমানে পটুয়াদের অস্তিত্বমাত্রও নেই। অভাব ও দারিদ্র্যের তাড়নায় বৃত্তিচ্যুত এই সম্প্রদায় উল্লিখিত অঞ্চলে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিচয় বহন করছে জীবিকা ও জীবন যাপনের রূপান্তরে।' আলোচ্য পুস্তিকায় যে গ্রাম-তালিকা তৈরি করা হয়, তাতে পূর্বোক্ত তালিকা থেকে সাতটি গ্রামের সঙ্গে নতুন নাম যুক্ত হয় : মানিকচক, কুতুবপুর, মুরাদপুর, টাকাপুরা, নির্ভয়পুর, ভীমেশ্বরী, কাশীজোড়া, কেশিয়াড়ি, খানুকুল, পাঁচুড়িয়া, নয়াগ্রাম, কুলিয়াচন্দনপুর, বড়কুমারদা, মেদিনপুর। কিন্তু চৈতন্যপুর, সিরুই, কেশবপুর, দেউলপোতা, কেশবাড়, কুমিরমারা, মাগুরিয়া নামগুলি অনুল্লিখিত। আবার তারাপদ সাঁতরা তাঁর একটি রচনায় (অশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্র' (জুন, ২০০১) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'পটুয়া ও পটচিত্র : মেদিনীপুর, হাওড়া ও চব্বিশ পরগনা' শীর্ষক নিবন্ধে) পটুয়াদের গ্রামের থানাভিত্তিক পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে : নাড়াজোল (থানা : দাসপুর), শিউরি (থানা : তমলুক), গোগ্রাম-কেশববাড় (থানা : পাঁশকুড়া), ঠেকুয়াচক (থানা : নন্দকুমার), নির্ভয়পুর বাসুদেবপুর (থানা : দাসপুর), নয়া ও মালিগ্রাম (থানা : পিংলা), মাদপুর-পাপরআড়া (থানা : খড়্গপুর), আকুবপুর ও চৈতন্যপুর (থানা : সুতাহাটা), কুমীরআড়া, নানকাচক, হাঁসচড়া, আমদাবাদ, হবিচক ও মুরাদপুর (থানা : নন্দীগ্রাম), কুতুবপুর ও গোলগ্রাম (থানা : ডেবরা), বীনপুর ও ঝাড়পুর (থানা : বীনপুর) প্রভৃতি।

'লোকশ্রুতি' পত্রিকার দশম সংখ্যায় (জানুয়ারি, ১৯৯৩) 'পশ্চিমবঙ্গের পটুয়াদের জীবন ও জীবিকা' শিরোনামে একটি মূল্যবান সমীক্ষা-প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে রাজ্য লোক সংস্কৃতি পর্ষদের উদ্যোগে ৭-৮ জুলাই, ১৯৮৭ মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাগৃহে পশ্চিমবঙ্গের পটুয়াদের উপস্থিতিতে একটি কর্মশালা আয়োজিত হয়। কর্মশালা থেকে সংগৃহীত তথ্যগুলি সংকলন করেন বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদ সুহাস চট্টোপাধ্যায়। তাতে তাঁরা জানান : 'পটশিল্প পশ্চিমবঙ্গে লোকশিল্পের একটি বিশিষ্ট ধারা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোক সংস্কৃতি পর্ষদ পটুয়াদের জীবন ও জীবিকা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী পটুয়াদের কাছ থেকে তাঁদের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তথ্যগুলির ভিত্তিতে এই প্রতিবেদনে পটুয়াদের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।'

তাঁরা এও জানান, মেদিনীপুর জেলা থেকে সব চেয়ে বেশি সংখ্যক পটুয়া কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। ১১টি গ্রাম থেকে তাঁরা ২৭ জন এসেছিলেন। সেই ১১টি গ্রাম হল : নির্ভয়পুর, বাঘাগেড়িয়া, মরুমিয়া, হবিচক, নয়া, নাড়াজোল, কাঁখশা, হাউর, ঠেকুয়াচক, বাঘাগেড়ে, জয়কৃষ্ণপুর। উপরের দুটি তালিকা থেকে বোঝা যায়, এতে বেশ কয়েকটি নতুন গ্রামের সংযোজন ঘটেছে। গ্রাম নামের আর একটি তালিকা পাওয়া যায় সম্প্রতি ডঃ চিত্তরঞ্জন মাইতির লেখা 'প্রসঙ্গ : পট, পটুয়া ও পটুয়া সংগীত' শীর্ষক গ্রন্থে। বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, পটুয়াদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও নিজস্ব ক্ষেত্র অনুসন্ধান থেকে লেখক জেলাভিত্তিক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন। একুশটি গ্রাম নামের মধ্যে উপরের উল্লিখিত তালিকায় নেই এমন নতুন গ্রামের নাম পাঁচটি যেমন : সালিগ্রাম, বাঘাগেড়ে, মরুমিয়া, ক্যাঁকটা, চেতুয়া। নতুন নতুন গ্রাম নামের সংযুক্তির কারণ প্রায় যাযাবর সম্প্রদায়ের মতো, জমিজমাহীন পটুয়ারা জীবিকার প্রয়োজনে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বসতি নির্মাণ করেছে। বিশেষ করে আত্মীয়দের উৎসাহে এবং সহযোগিতায় এরকম নতুন নতুন পাড়া তৈরি হয়েছে যেমন, তেমনই কোনও কোনও পূর্বোল্লিখিত গ্রামে পটুয়াদের বাস সম্পূর্ণ উঠেও গেছে। অনিমেষকান্তি পাল মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার নয়াগ্রামের নামকরণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : 'সম্ভবত আগে এখানে কোনও গ্রামই ছিল না। কয়েক ঘর পটুয়া এসে ওখানে ঘর তুলে বসবাস শুরু করে দেন। তা থেকেই ধীরে ধীরে গ্রামটি গড়ে উঠতে থাকে। এখন তো রীতিমতো গ্রাম এবং বড় রাস্তার ধারেই।' এই পটুয়াপাড়ার খ্যাতি এখন জগৎজোড়া। অনিমেষকান্তি এও জানিয়েছেন : 'এ গ্রাম এখন পটুয়াদের জন্য বিখ্যাত। জাপান থেকে এলেন নাওকি নিশিওকা। তাঁর সঙ্গে নয়ার পটুয়াদের কত আলাপ-পরিচয় হল। আগেকার চেকোস্লোভাকিয়া থেকে এলেন হাবা ক্রিশ কোভা। নয়াতে পটুয়াদের ঘরে ঘরে গিয়ে পট কিনলেন বেছে বেছে। আরও কত দেশের কত শিল্পপ্রেমী যান সেই গরিব, শ্রীহীন, অবহেলিত গ্রামটিতে, অমূল্য শিল্পসম্পদের সন্ধানে।'

বৃত্তি বদলের কারণে পটুয়ারা তাদের ভিক্ষানির্ভর জীবনযাপন ত্যাগ করে নতুন পরিচয় ধারণ করেছে। পটুয়া সম্প্রদায় বিভিন্ন মেলায় ও জনপদে পট বিক্রয় করার যে সুযোগ পায়, পূর্বোক্ত 'লোকশ্রুতি' পত্রিকায় তার একটি তালিকা দেওয়া হয়েছিল, সেটিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মেদিনীপুর জেলায় যেসব স্থানে পট বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়ে থাকে সেগুলি হল : মোহনসুখার মেলা, তিত্তরবেড়া, বরুণা, শ্যামমাঝি, গেরিয়া, দুধের বাঁধের মেলা, ঘাটালের পৌষ সংক্রান্তি, চন্দ্রকোণার মেলা, মনসুখার মেলা, সোনাখালির মেলা, পাঁশকুড়ার মেলা, কেন্দুয়ার শিবমেলা, ক্ষাপুর, নন্দীগ্রাম, হবিচক, হাঁসচড়া, দুর্গাচক, শ্যামপুর, তিলেশ্বরী, বৃন্দাচক। অবশ্য আজকাল বেশ কয়েক বছর ধরে কলকাতার রাস্তায় মেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এবং ব্যক্তিগতভাবে বাড়িতে গিয়ে পটুয়ারা পট বিক্রি করে থাকেন ঘুরে ঘুরে। অনেকে পট সস্তায় কিনে সেগুলি চড়া দরে বিদেশে রপ্তানী করে থাকেন—তাতে অবহেলিত পটুয়া সম্প্রদায় অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায্যমূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতারিত হয়ে থাকেন। 'লোকশ্রুতি' পত্রিকায় কর্মশালা ভিত্তিক যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় তার ১৩ নং সারণিতে যে তথ্য পরিবেশন করা হয় সেটি বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। তাঁরা বলেছেন : 'পটুয়াদের মাসিক আয় এবং কৃষিজমির পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, শুধুমাত্র পটশিল্পের উপর নির্ভর করে তাঁদের পক্ষে জীবিকানির্বাহ করা সম্ভব হয় না। তাঁদের অনেকেই আয়ের জন্য উৎস খুঁজবেন এটাই স্বাভাবিক। ১৩ নং সারণিতে পটুয়ারা পট ছাড়া অন্য কী কী কাজ করে থাকেন তার তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, ১১ জন পটুয়া (৩৩.৩ শতাংশ) পট ছাড়া অন্য কোনও কাজ করেন না। বাকিদের মধ্যে ৬ জন (১৮.২ শতাংশ) ন্যাকড়ার পুতুল তৈরি করেন, ৭ জন (২১.২ শতাংশ) প্রতিমা গড়েন, মাটির খেলনা করেন ৬ জন (১৮.২ শতাংশ) এবং ৩ জন (৯.১ শতাংশ) পুতুল এবং মাটির খেলনা দুই-ই গড়েন। তাঁরা উল্লেখ করেননি এই শেষোক্ত কাজগুলিতে পটুয়া পরিবারের মেয়েদের দক্ষতা ও আগ্রহ বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

মূলত কৃষিপ্রধান অঞ্চলেই, বিশেষত ফসল তোলার মরশুমে পটুয়ারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধান চাল সংগ্রহ করত পট দেখিয়ে গান শোনানোর পরিবর্তে। নানকাচকের বৃদ্ধ জ্ঞান পটিদার, পঁয়ত্রিশ বছর আগে নিজেদের দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে বলেছিল : 'আমি তো ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ তিন মাস পশ্চিমে থাকি। আর গিয়েও বা কী করি বলুন, আগে পশ্চিমে রোজগার ভালো ছিল। ৫/৬ সের ধান দিত, এখন সে জায়গায় ১ পোয়া আধ সের দেয়। তবে আদর পাই। পূর্বে এক একদিন এক মন/ দেড় মন করে ধান পেতাম, এখন সে জায়গায় ৫/৬ সের করে পাই। ওখানে বাসা করে থাকতে হয়। এক এক জায়গায় দু-তিনজন করে থাকি।' এই অবধারিত দারিদ্র্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, পটুয়াদের অধিকাংশই বৃত্তিচ্যুত হয়ে শুধু প্রাণ ধারণের জন্য নিত্যনতুন জীবিকার উপায় উদ্ভাবন করেছে। চালচিত্র অঙ্কন, পঞ্চকল্যাণী পট অঙ্কন, ঘটচিত্র অঙ্কন, সরাচিত্র অঙ্কন, কুলাচিত্র অঙ্কন, পিড়িচিত্র অঙ্কন, চক্ষুদান পট অঙ্কন ছাড়াও আর যেসব বৃত্তির কথা ডঃ চিত্তরঞ্জন মাইতি জানিয়েছেন সেগুলি হল : সাপুড়ে বৃত্তি, ওঝা বৃত্তি, অবৈধ গর্ভপাত বৃত্তি, ফেরিওয়ালা ও তুকতাক বৃত্তি, মেলায় পুতুল বিক্রি, মালাকার বৃত্তি, কর্মকার বৃত্তি, মালাবাঁধা বৃত্তি, বানর নাচানো বৃত্তি, ভালুক নাচানো বৃত্তি, শোলার কাজ, পঞ্চপল্লব সংগ্রহ, জাল বোনা, ঠোঙা তৈরি, রাজমিস্ত্রি, রেডিও, টিভি মেকানিক, সাইকেল মেরামত, চা, পান, বিড়ির দোকান, যাত্রাশিল্প, কুটাশিল্প, জ্বালানি সংগ্রহ, কৃষি, জনমজুর, রিকশা, ভ্যান, ট্রলি চালানো, মাদুর শিল্প, গ্রিটিংস কার্ড ও ক্যালেন্ডার

তৈরি, পটের দালালি। ডঃ মাইতি জানিয়েছেন : 'এত বিচিত্র বৃত্তি গ্রহণ করেও পটুয়াগণ এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে রয়েছেন। যদিও এই বৃত্তিগুলি পটুয়াদের নিজস্ব বৃত্তি নয়—সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এই বৃত্তিগুলি গ্রহণ করেন। যুগের সঙ্গে দ্রুত চলতে গিয়ে বহু বৃত্তিকে এঁরা গ্রহণ করেছেন এবং বর্জনও করেছেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান বিশেষ হয়নি। ক্ষুধা ও চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। পটুয়াদের চিত্রকর বৃত্তিকে টিকিয়ে রাখতে যথার্থই খুব কষ্টকর হয়ে উঠেছে।'

৩

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসের ৭-৮ তারিখে মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাগৃহে রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদের উদ্যোগে যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, 'লোকশ্রুতি' পত্রিকার প্রতিবেদনে তার বিবরণ ও সমীক্ষাটি অনুধাবনযোগ্য : 'কর্মশালায় পটুয়ারা যেসব বিষয়বস্তুর পট উপস্থাপিত করেন পটের বিষয়বস্তুগুলি চারটি ভাগে বিভক্ত : (ক) পৌরাণিক, (খ) রাজনৈতিক, (গ) সামাজিক এবং (ঘ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনা। পৌরাণিক বিষয়বস্তুগুলি আবার দু ভাগে দেখানো হয়েছে : হিন্দু এবং মুসলিম। হিন্দু পৌরাণিক বিষয়বস্তুর সংখ্যা ৫১টি এবং মুসলিম ৩টি। কর্মশালায় যেসব পটুয়া অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই মুসলমান ধর্মাবলম্বী। কিন্তু পটের বিষয়বস্তু নির্বাচনে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর ওপরেই তাঁরা বেশি নির্ভরশীল। এর কারণ সম্ভবত হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর বিশেষত রামায়ণ এবং মহাভারতের জনপ্রিয়তা। ৫১টি হিন্দু পৌরাণিক বিষয়বস্তুর মধ্যে ১০টিই হল রামায়ণ থেকে নেওয়া ; মহাভারত থেকে নেওয়া কাহিনীর সংখ্যা ৮টি। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর সংখ্যা ৬টি। তা ছাড়া আছে চৈতন্যদেবের কাহিনী, জগন্নাথদেবের কাহিনী। রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি কাহিনীরও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা আছে। পটের রাজনৈতিক বিষয়বস্তুগুলির সংখ্যা ১০। বামফ্রন্ট শাসন, বর্তমান সরকারের কার্যাবলী, পরমাণু যুদ্ধের প্রস্তুতি, যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির প্রচার, বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রভৃতি রাজনৈতিক বিষয়বস্তু পটুয়াদের রাজনৈতিক চেতনার পরিচায়ক। সামাজিক বিষয়বস্তুর সংখ্যা ১৭টি। এগুলির মধ্যে আছে—শাশুড়ি-বৌ ঝগড়া, বধূ নির্যাতন, পণপ্রথা প্রভৃতি বিষয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত বিষয়বস্তুর সংখ্যা ৫টি। এই বিষয়বস্তুগুলি ছাড়াও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত পটের ৩ জন পটুয়া সাঁওতালি উপাখ্যানভিত্তিক তিনটি পর্ব পরিবেশন করেন। এর মধ্যে 'চক্ষুদান' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আদিবাসী সমাজে যাদু পট নামে আর এক ধরনের পট প্রচলিত, এই বিশেষ ধরনের চৌকশ পটের উদ্দেশ্য আদিবাসী সমাজের কেউ মৃত হলে, পটুয়ারা সেই মৃত ব্যক্তির চোখহীন এক কাল্পনিক পট নিয়ে গিয়ে সেই মৃতের বাড়িতে গিয়ে চক্ষুহীন ওই মৃত ব্যক্তি এখনও কষ্ট পাচ্ছে বলে, নির্দিষ্ট দক্ষিণার বিনিময়ে তার চক্ষুদান করে তাকে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করে দেয়। তারাপদ সাঁতরার পূর্বোক্ত নিবন্ধে জানানো হয়েছে : 'এ ছাড়া যে পাত্রটিতে তুলি ডুবিয়ে পাটিকিরি বা পটুয়া ছবি আঁকেন, আঁকার কাজ শেষ হলে সেটি (সাধারণত প্রথানুযায়ী এটি কাঁসা বা পিতলের পাত্র হয়ে থাকে) তিনি গৃহস্বামীর কাছে দাবি করেন। সুতরাং এক্ষেত্রে নগদ বিদায় ছাড়া কাঁসা বা পিতলের পাত্রটি হয় তাঁর উপরি লাভ।'

এই ধরনের লোক বিশ্বাসের উদাহরণ আরও দেওয়া যায়। বর্তমান নিবন্ধকারের অভিজ্ঞতায় মেদিনীপুর জেলায় এক আশ্চর্য প্রথার কথা শোনানো যায়। পটুয়ারা যে দীঘল পট দেখান তার কোনো কোনোটিতে একসময় নানা ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা দেখে অবাক হয়ে সংশ্লিষ্ট পটুয়ার কাছে জানতে পেরেছিলেন : যদি কোনো ব্যক্তি বিড়াল মারেন বা বিড়ালের মৃত্যুর কারণ হন তাহলে তাঁকে দেবী ষষ্ঠীর অভিশাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য কোনো পটুয়াকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে নতুন বস্ত্র বা ধাতুপাত্র দান করতে হয়। এরকম নাম ঠিকানা লেখা পট সেই পটুয়া বিভিন্ন স্থান সংগীত সহ প্রদর্শন করলে বিড়াল হত্যাকারী ব্যক্তির পাপস্খলন তথা প্রায়শ্চিত্ত ঘটে। তাছাড়া হিন্দুসমাজে এমন বিশ্বাস প্রচলিত আছে পটের মাধ্যমে ধর্মকথা প্রচারিত হয় বলেও ষষ্ঠী ঠাকুরাণি অকল্যাণ থেকে বিরত থাকেন বলে গৃহস্থের মঙ্গল সাধিত হয়।

জড়ানো পটের যেসব পটের জনপ্রিয়তা দীর্ঘস্থায়ী সেগুলি হল 'রামায়ণ' অনুসরণে সিন্ধুবধ তাড়কাবধ, রামের বনবাস, সীতাহরণ, সেতুবন্ধন, রাবণবধ, তরণীসেনবধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল। 'ভাগবত' থেকে সংগৃহীত কৃষ্ণলীলার কাহিনীর মধ্যে কৃষ্ণজন্ম, কালীয়দমন, নৌকাবিহার, বস্ত্রহরণ, ননীচুরি, কৃষ্ণকালী প্রভৃতি। তুলনামূলক ভাবে 'মহাভারত' কাহিনী কম অনুসৃত হতে দেখা যায়। তবে নরমেধ যজ্ঞ, হরিশ্চন্দ্র, দাতাকর্ণ, সাবিত্রী সত্যবান ইত্যাদি বহু প্রচলিত। শিবপার্বতী, সতীর দেহত্যাগ, গঙ্গা-দুর্গার ঝগড়া, দুর্গার শাঁখা পরা, দুর্গা কর্তৃক অসুরনিধন। মঙ্গলকাব্য বিশেষ চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গলের কাহিনী থেকে কমলেকামিনী, শ্রীমন্তমশান, চণ্ডীর লীলা এবং মনসাপট বা বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে ভক্তিরস পরিবেশন করে এসেছেন পটুয়ারা। তবে এসব অলৌকিক কাহিনী নিছক ভক্তিরস পরিবেশনের জন্য ব্যবহৃত হয় না, গুরুসদয় দত্ত যথার্থ বলেছেন : 'ধর্ম, দর্শন ও পুরাণের মূল তত্ত্বগুলি যে বাঙালি হিন্দু সমাজের গণজীবনে অতি সহজ ভাবে অনুসঞ্চারিত হইয়া দৈনন্দিন ভাব ও চিন্তা-ধারার অঙ্গীভূত হইয়াছিল, তাহার একটি বিশেষ পরিচয় আমরা এই পটুয়া সংগীতের মধ্যে পাই। তথাকথিত অশিক্ষিত পটুয়া-রচিত সংগীতগুলিতে দার্শনিক ও পৌরাণিক তত্ত্বগুলি অবলীলাক্রমে মিশিয়া গিয়াছে।' পটশিল্পের বিষয়-মাহাত্ম্য বাঙালিয়ানায় চিরদিন মথিত হয়েছে, গুরুসদয় আরও বলেছেন : পটুয়া শিল্পীর বৃন্দাবন বাংলাদেশে, অযোধ্যা বাংলাদেশে, শিবের কৈলাশ বাংলাদেশে, তাহার কৃষ্ণ, রাধা, গোপ-গোপীগণ সম্পূর্ণ বাঙালী,

রাম লক্ষ্মণ ও সীতা বাঙালী, শিব ও পার্বতী পুরা বাঙালী। বড়াই বুড়ির ছটি বাঙালী ঠাকুমা ও দিদিমার নিখুঁত রসময় প্রতিমূর্তি। রামের বিবাহ হইয়াছে ছাতিমতলায়। পার্বতীর কাছে সব অলঙ্কার হইতে শাঁখার মর্যাদা ও আদর বেশি।' বাঙালীর জনজীবনে পটশিল্পের বৈচিত্র্য চিরকালীন মানবিকতার সমহিমায় উদ্ভাসিত, গুরুসদয় তাঁর পর্যবেক্ষণে বহু বর্ষ আগে সে কথাও ব্যক্ত করে বলেছিলেন : 'এই জাতীয় শিল্পীগণের ধ্যানে দেবতাগণও বাঙালী রূপ ছাড়া অন্যরূপ ধরিয়া থাকিতে সমর্থ হয় নাই। বাঙালীর সাধারণ জীবনকে দেবভাবে পরিকল্পিত করিয়া ইহারা জাতির আত্মাকে পরম গৌরব দান করিয়াছে। তাই বাংলার ঘরে ঘরে ও দ্বারে দ্বারে সাধারণ নরনারী ও বালক-বালিকাদের কাছে বৎসরের পর বৎসর প্রদর্শিত এই চিত্রসম্পদ ও বৎসরের পর বৎসর গীত এই গীতিকাসম্পদ বাংলার গণশিক্ষার গণসংস্কৃতির এক অমূল্য ও অতুলনীয় প্রণালীস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল এবং বাংলার আবালবৃদ্ধবণিতার জীবনকে এক অদ্ভুত আনন্দ রসময় জগতের সন্ধান দিতে সমর্থ হইয়াছিল।'

পৌরাণিক পটগুলির কথা বাদ দিলে, অন্য যে তিনটি শ্রেণীতে পটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন : রাজনৈতিক, সামাজিক এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা। এই শ্রেণীর পটগুলি ধর্মনিরপেক্ষ পট হিসেবেও আখ্যাত হয়ে থাকে। এর সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিকে নিয়েও জীবনীমূলক পট রচিত হয়েছে, অনেকগুলি। বিশেষ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে যেসব ব্যক্তির ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, মাতঙ্গিনী হাজরা, ক্ষুদিরাম বসু প্রভৃতি শহিদদের নিয়ে পট তৈরি হয়েছে। শ্রীচৈতন্য, লালন ফকির, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজীর জীবনও পটের বিষয় হয়েছে নানা সময়ে। বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের জীবন নিয়েও মুজিব পট সমসাময়িক কালে বিখ্যাত হয়েছিল। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় সুশীলকুমার ধাড়া ও গোপীনন্দন গোস্বামীর 'পটচিত্র গীতি' গ্রন্থে সংকলিত 'ক্ষুদিরাম ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০০-০৬)', 'বিপ্লবের সূচনা ও অসহযোগ আন্দোলন (১৯০৯-২০), 'ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন', 'তমলুকে জাতীয় সরকার (১৯৪২-৪৪)', 'মহিষাদলে গান্ধীজী (১৯৪৫)' প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে পট চিত্র ও সংগীত পটুয়ারা পরিবেশন করেছেন। রূপকথাশ্রয়ী মনোহর ফাঁসুড়ের বা মনোহর ফাসিয়ার পট একসময় মেদিনীপুরে বিশেষ ভাবে প্রচলিত হতে দেখা গিয়েছিল। কলকাতা তিনশো বছর কিংবা ফরাসি বিপ্লবের কাহিনীও পটচিত্রে অঙ্কিত হয়েছে। বন্যা, খরা বা বাস দুর্ঘটনার কাহিনী একেবারে প্রায় সদ্য সদ্য পটুয়ারা তাঁদের চিত্র ও সংগীতে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমন নানা সামাজিক অবক্ষয়, অব্যবস্থা ও অপ্রিয় অনেক ঘটনাকে সকলের সামনে পরিবেশন করে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রমাণ রেখেছেন। ড. চিত্তরঞ্জন মাইতি তাঁর গ্রন্থে যেসব মেদিনীপুর জেলার পট গীতির সংকলন করেছেন, সেগুলির বর্ণনাকারীদের নাম ও বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে :

পুলিন চিত্রকর নয়া, পিংলা :
শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র
কৃষ্ণের গোপন কথা
চণ্ডীমঙ্গল
সাবিত্রী সত্যবান

❑

ননীগোপাল চিত্রকর নয়া, পিংলা :
শিশুকল্যাণ
পরিবেশ দুষণ ও মুক্তি
খেলা ও নেশা বর্জন

❑

নরেন্দ্র চিত্রকর নয়, পিংলা :
কৃষ্ণলীলা
সত্যপীর
১৯৪৭ সাল
বন্যা
কালের হাওয়া
নিতার বাপ
বাসরে স্ত্রী হত্যা

❑

হরেন্দ্র চিত্রকর মালিগ্রাম :
সাহেবপট
সাহেব কেলেন পিয়ার্সের পট
মাতঙ্গিনী
ক্ষুদিরাম
কল্পনা
বন্যা
বিশ দফা কর্মসূচি
অস্পৃশ্যতা
পরিবার পরিকল্পনা

❑

আজিজুল চিত্রকর বা অজয় চিত্রকর নয়া পিংলা :
মনসার ভাসান
সীতাহরণ
যুগের পরিস্থিতি

❑

আনন্দ চিত্রকর মালিগ্রাম :
পণপ্রথা

❑

বলাই চিত্রকর নাড়াজল :
দেশের নাচন

আলোচ্য গ্রন্থে আরও যেসব পটুয়াদের নাম / দ্বিতীয় নাম পাওয়া যায় তাঁদের বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হচ্ছে :

নাম	দ্বিতীয় নাম	বয়স	বাসস্থান	পিতা
গুরুপদ চিত্রকর	(জুম্মন)	২৮	নয়া	গফুর
দুঃখুশ্যাম চিত্রকর		৫০	নয়া	অমূল্য
শ্যামসুন্দর চিত্রকর	(শ্যামরুদ্দিন)	৫০	নয়া	অমূল্য
বিষ্ণু চিত্রকর	(জবেদ)	৩৫	নয়া	অমূল্য
রঞ্জিত চিত্রকর	(বাহার)	৩৫	নয়া	খাঁদু
অমর চিত্রকর	(ফুলকাটা পটুয়া)	৬৫	নয়া	কার্তিক
ইয়াকুব চিত্রকর		৩১	নয়া	খাঁদু
রূপবান চিত্রকর		—	নয়া	অমর
নিরঞ্জন চিত্রকর		৫০	হবিচক	মদন
ঝর্ণা চিত্রকর		৪০	হবিচক	আকবর
তপন চিত্রকর		২৩	হবিচক	নিরঞ্জন
বিজয় চিত্রকর		৪০	হবিচক	আব্বাস
ফজলু চিত্রকর		১৯	হবিচক	বিজয়
পিয়ারী চিত্রকর		৫৫	হবিচক	গুণধর
মনোরঞ্জন চিত্রকর		৬০	হবিচক	ত্রৈলক্য
বাপী পটিদার		৩০	হবিচক	প্রভাত
ধীরেন পটিদার		৩৪	হবিচক	নরেন
দিলবাহার চিত্রকর		৪০	মুরাদপুর	গুণধর
মোমেন চিত্রকর		৪৫	নানকাচক	গুণধর
জামাল চিত্রকর		৩৮	খড়িগেড়িয়া	সুধীর
গোপাল চিত্রকর		৩৬	নানকাচক	গোবর্ধন
বাশের চিত্রকর		৩৫	নানকাচক	হোমেন
ধনঞ্জয় চিত্রকর		৫৫	নানকাচক	অবিনাশ
জয়নাল চিত্রকর		৪৫	নানকাচক	আব্বাস
সতীশ চিত্রকর		৭২	নাড়াজোল	হোমেন
কোকিল চিত্রকর		৭৫	নাড়াজোল	রবি
সাধন চিত্রকর		৭০	নাড়াজোল	রহিম

প্রায় তিন দশকের অধিক সময় বর্তমান আলোচক হবিচক-নানকাচক-আকুবপুর এই তিনটি গ্রাম ঘুরে যেসব পটুয়াদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিল, আজ তাঁদের অনেকেই প্রয়াত। কেউ কেউ বৃত্তিচ্যুত আবার অনেকেই স্থানান্তরিত। নানকাচক-হবিচক গ্রামের পটুয়াপাড়া কীভাবে গড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে অসগরের বাবা নিবারণ পটিদার জানিয়েছিলেন। নাড়াজোলের রাজবাড়ির কাছে ছিল তাদের পূর্বপুরুষের বাস, নিবারণের বাবা যুবা বয়সে নানকাচকে এসে স্থায়ী বাস পত্তন করেন। নিবারণের সমবয়সী ক্ষীণকায় পক্ককেশ গোবর্ধন, যে কানে খাটো, পাড়ায় কালাবুড়ো হিসেবেই তার পরিচয়। পটিদার পাড়ার মধ্যমণি নগেন্দ্র চিত্রকর সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন। খাঁদু চিত্রকর তার ছেলে বাহার, খাঁদুর বাবা বনমালীও পট দেখাতেন, তখন তিনি প্রয়াত। বনমালীর দু-ভাই কেনারাম, অবিনাশ—তারা পট দেখালেও ঠাকুর গড়ত বেশি। পনেরো বছর বয়স থেকে পট দেখিয়ে রোজকার করছে খাঁদু—বলেছিল : পটই আমার একমাত্র জীবিকা। জীবনে অন্য কোনো কাজ করার চেষ্টা করিনি। পটই আমার মা-বাপ। দু-পাঁচ কাঠা জমি, ধান তো হয় না বললেই চলে। সংসারে একাই রোজগার করতাম—আটজন পেট।' তার দু ছেলে এলদিন (২৪) আর বাহার (১৬) পট দেখিয়ে রোজকার তখন বাপকে সাহায্য করত। খাঁদুর স্ত্রী আয়মন (৩৬) পুতুল গড়তেন।

পঞ্চাশ বছর বয়সের কোকিল পটিদারের বাবা সতীশ পটিদার। বারো বছর বয়স থেকেই বাবার সঙ্গে পটি নিয়ে ভিক্ষে করতে যেতে হত। নিজে পটি লিখতে পারতো না, মাঝে মাঝে ভাড়া করতে হত কিংবা অন্যের কাছে কিনতে হত। মাঝে মাঝে গুমগড় অঞ্চলে লাউতুম্বা নিয়ে বেরিয়ে পড়ত, পটের সে গান আলাদা—দেহতত্ত্বের। হাটে বাজারে যেসব বই পাওয়া যায়, তার থেকে গান বেছে নিয়ে সুর দিত নিজেই। দেহতত্ত্ব ছাড়া তর্জার সুরে গান করত। সম্প্রতি চিত্তরঞ্জন মাইতি জানিয়েছেন : বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার নয়া গ্রামের কয়েকজন চিত্রকর নানান বাদ্যযন্ত্র সহযোগে পটুয়া সংগীত পরিবেশন করেন। তাদের গানের সুরও মিশ্র। কখনো বাউল সুর, কখনও ভাটিয়ালি, কখনও কীর্তনের সুর। একদল বসে বসে এই মিশ্ররীতির সংগীত পরিবেশন করেন—একজন পটটির একটু একটু অংশ দেখান। পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন স্থানে এই মিশ্ররীতির সংগীত পরিবেশন লক্ষ করা যায় না। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য পটুয়া সংগীতের বিশেষ ধারার বৈশিষ্ট্য নিয়ে সুধীন মিত্র গবেষণা করেছিলেন—যে নিবন্ধটি 'অন্বিষ্ট' পট সংখ্যায় মুদ্রিত হয়ে বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল।

কোকিল নিজের সম্পর্কে বলেছেন : 'আত্মাকে শান্ত রাখার জন্য যখন তখন বেরিয়ে পড়ি, শুধু শুধু ঘরে বসে থাকতে পারি না।' এই নানকাচকেই অরুণ চিত্রকরের ছেলে পরিতোষ খ্যাতিমান চিত্রকর ধীরেনের ছাত্র—বাবা অরুণ মাত্র ৩৫ বছর বয়সে মারা যায়। জীবিকা সম্পর্কে তার অভিমত জানতে চাইলে, সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিল : 'অন্যেরা যে যাই বলে বলুন, এই জীবিকাই আমার পছন্দ। মাঝে মধ্যে ইচ্ছে করে, এমন একটি পটি লিখে ফেলি, যা এখনও কারও পক্ষে লেখা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া জীবনে পড়াশুনা করার সুযোগ হয়নি বলে, এই একটি মাত্র পথ আজ নিজেকে ভবিষ্যতে দাঁড় করানোর। অন্য যে কোন কাজ, যা আমার শিক্ষা, তাতে আমার কাছে সম্মানজনক মনে হয় না। হবে না।' স্বাধীনতার পট, কলিযুগ পট তার লেখা, খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। নানকাচকে গুণধরের ছেলে পিয়ার, ১৭/১৮ বছর

নরক ভোগ : শ্যামসুন্দর চিত্রকরের যমপট

বয়স থেকে পট লেখা শুরু করেছিল, নগেন, ঈশান, অরুণ, সতীশ তার গুরু—তাঁদের পাশে বসে দেখে দেখে শিখেছে। হবিচকের সুধীর পটিদার আমাকে বলেছিল : 'এত নদী নালা খালখন্দ পেরিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াই। সব সময় যে হেঁটে হেঁটে যাই তা নয়, বাসে খেয়ায় পয়সা লাগে, সে পয়সাতেও কলকাতা গিয়ে মাগতে পারতাম। কিন্তু কলকাতায় কেউ তো চাল দেবে না, চাল না পেলে পয়সা আর কতটা রোজগার করবো বলুন ?' সুধীর পট লেখে, ঠাকুরও গড়ে। এছাড়া শীতলপাটি তৈরি করে। জাল তৈরি করে। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় তার করা জয়বাংলা পটের খুব সুনাম হয়েছিল।

মেদিনীপুরের নয়ার পুলিনবিহারী চিত্রকর এক সময় বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় হয়েছিলেন—তাঁর দ্বিতীয় নাম ইমামদি। তাঁর জন্ম মহিষাদল থানার ঠেকুয়াহাট—কিন্তু পরবর্তীকালে নয়া তার স্থায়ী ঠিকানা হয়েছিল। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলা শিল্পকলা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে তিনি পুরস্কৃত হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত নৃত্যনাটক ও দৃশ্যকলা আকাদেমি তাঁকে সম্মান প্রদান করেছিলেন। পুলিনবিহারীর পুত্র ননীগোপাল চিত্রকরের দ্বিতীয় নাম তাজ মহম্মদ। জন্ম হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর মাতুলালয়ে। বাবার কাছেই পট লেখা ও পটের গান গাওয়া শিখেছেন। জুয়াখেলা, মদ্যপান বিরোধী পট প্রচারে তিনি গ্রামীণ জনসমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। পুলিনবিহারীর উত্তরাধিকার আরও দুজন চিত্রকরের রক্তে প্রবাহিত, তাঁরা আনন্দ এবং এবাদত। বাইরের চালচলনে আনন্দ যেমন পুরোপুরি হিন্দুর মতো তেমন এবাদত মনে করে সে মুসলমান। কোনো মৌলবী তাঁকে পট আঁকতে নিষেধ করেছিল—কিন্তু অর্থ রোজগারের তাড়নায় সে নিষেধাজ্ঞা তাঁর পক্ষে মেনে চলা সম্ভব হয়নি। রজনী চিত্রকর যেমন কালীঘাট পটো পেন্টিং স্কুল স্থাপন করেছিলেন তেমন পুলিনবিহারী খুলেছিলেন 'কল্যাণী ট্রাডিশনাল আর্ট স্কুল'। মেদিনীপুরের মহিলা পটুয়াদের মধ্যে নয়ার রানী চিত্রকর এবং ঘাটালের গৌরী চিত্রকরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মালি গ্রামের হরেন্দ্র চিত্রকর নাড়াজোলের বলাই চিত্রকর, কাঁথরদা গ্রামের শ্যামসুন্দর চিত্রকর, নয়ার গুরুপদ চিত্রকরের সুনাম সর্বজনবিদিত। গুরুপদ আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ার কাছে পেনসিলভেনিয়ায় পট প্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি পটকে সমাজের এক ধরনের দর্পণ হিসেবে দেখেছেন।

মেদিনীপুরের পটিদারদের রঙ তৈরির পদ্ধতি অন্যান্য জেলার পটুয়াদের থেকে পৃথক। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইদানীংকালে বাজার থেকে তৈরি করা রঙ কিনেই পট চিত্রন করেন তাঁরা। তবে ড. চিত্তরঞ্জন মাইতি তাঁর গ্রন্থে এই পদ্ধতির বিশদ বিবরণ দিয়েছেন সেটি নিচে উল্লেখ করা হচ্ছে :

হলুদ : হলুদ গুঁড়ো করে বেল আঠা মিশিয়ে রোদে শুখনো করা হয়। পরে জল দিয়ে পটের কাজে ব্যবহার করা হয়।

নীল : সাপকণ্ঠা গাছের পাকা ফল গুঁড়ো করে বা থেঁতো করে রস বের করে বেল আঠা মিশিয়ে রোদে শুখনো করতে হয়। পরে প্রয়োজন মতো জল মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয়।

বেগুনী : পুঁই শাকের পাকা ফলের রসের সঙ্গে বেল আঠা মিশিয়ে এই রঙ তৈরি করতে হয়।

সবুজ : সীম পাতার রসের সঙ্গে বেল আঠা মিশিয়ে এই রঙ তৈরি হয়।

লাল : জনপ্রিয় খয়ের, চুন, সুপারি গুঁড়ো এক সঙ্গে মিশিয়ে লাল তৈরি হয়।

গোলাপি : লাল রঙের সঙ্গে খড়ি মাটি ও বেল আঠা মিশিয়ে তৈরি হয়।

কালো : লম্ফের শিখা থেকে ভুসা কালি ধরে তাতে বেল আঠা মিশিয়ে তৈরি হয়।

এলামাটি বা ভীমসেন : উনুনের পোড়ামাটি সংগ্রহ করে তার সঙ্গে জল মিশিয়ে ছেঁকে নিতে হয়। তারপর তা রোদে শুখনো করে বেল আঠা মিশিয়ে এই রঙ তৈরি হয়। মানুষের গায়ের রঙ রাস্তাঘাট আঁকতে এই রঙ তৈরি হয়।

সাদা : এঁটেল মাটির ঘুসুম পুড়িয়ে গুঁড়ো করে বেল আঠা মিশিয়ে এই রঙ তৈরি হয়।

হালকা সবুজ : চালতার বীজ থেঁতো করে বেল আঠা মিশিয়ে।

হালকা নীল : পুঁইমিচুড়ির কাঁচা ফলের সঙ্গে এঁটেল মাটির ঘুসুম পুড়িয়ে গুঁড়ো করে বেল আঠা মিশিয়ে নিতে হয়।

গেরুয়া : চুনের সঙ্গে কাঁচা হলুদ ও বেল আঠা মিশিয়ে।

ইয়াকুব চিত্রকরের পট : বিষয়—রামায়ণ

মেদিনীপুর জেলার আকুবপুর গ্রামের পটিদার রজনী চিত্রকর ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নেওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। রজনী পট লেখাকে সাধনা বলে মনে করতেন। একটা আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছিলেন : 'জেলা মেদিনীপুর মাজনামুঠার জমিদার প্রাতঃস্মরণীয় দানবীর রাজা যাদব রায়চৌধুরী তাঁহার নিজবাটীতে শারদীয়া প্রতিমা নির্মাণ করিবার জন্য আমার পূর্বপুরুষকে ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার জমিদারির অন্তর্গত দোরো পরগনার আকুবপুর গ্রামে কিছু জায়গীর দিয়া বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি আমরা পুরুষানুক্রমে ছবি আঁকা প্রতিমা নির্মাণ পটচিত্র লেখা প্রভৃতি যাবতীয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পূর্বপুরুষের ভিটা আকুবপুর গ্রামে আজ প্রায় দুইশত বৎসর বসবাস করিতেছি।' এই আত্মজীবনীটি বিস্তারিত ভাবে লেখার সুযোগ পেলে, তিনি তাঁর পূর্বপুরুষ ও সমসাময়িক নানা চিত্রকর পরিজনদের সম্পর্কে লিখে যেতে পারতেন। তিনি নিজের শিক্ষার বিষয়ে জানান : 'বাল্যে পাঠ্যাবস্থায় পিতৃদেবের নিকট চিত্রাঙ্কন মূর্তি নির্মাণ ছোট ছোট পুতুল তৈয়ারি শিক্ষা করি। ১৯০৭/৮ খ্রি. কলিকাতা কালীঘাট পটুয়াপাড়ায় কালীঘাটের প্রসিদ্ধ শিল্পী বলরাম দাস, নিবারণ ঘোষ প্রমুখ শিল্পীগণের নিকট পটচিত্র লেখা শিক্ষা করি। প্রসিদ্ধ শিল্পী চিন্ময়ীলাল চিত্রকর সহকর্মী রূপে বেহালার সাধন চৌধুরীদের রথে আন্দুল-মৌড়ির জমিদারদের রথে ছবি লিখিয়া প্রশংসা অর্জন করি। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জের যুবরাজের অভিষেকোপলক্ষে দরবার মণ্ডপ সাজাইবার ভার লইয়া আশাতীত পুরস্কার অর্জন করিয়াছিলাম। কলিকাতা জোড়াসাঁকোর মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের দমদম বাগানবাড়ি 'চিত্রপুরী'র কুঠিতে বহুদিন চিত্রাঙ্কন করিয়াছি। মেদিনীপুর জেলার দেখালী গ্রামের জমিদার মৃত্যুঞ্জয় সামন্তের বাড়িতে আজ প্রায় ১৫০ বছর আমরা পুরুষানুক্রমে বাসন্তী প্রতিমা নির্মাণ করিতেছি। গত ১৯৩৩ খ্রিঃ লবণ আইন আন্দোলনে ও ১৯৪২ খ্রিঃ আগস্ট আন্দোলনে, কংগ্রেস প্রচারিত বুলেটিনে ব্রিটিশ শাসকের পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী ছবির সাহায্যে প্রচার করি।' রজনী চিত্রকরের পুত্র শ্রীশচন্দ্র চিত্রকরও কালীঘাটের পটশিল্পী হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।
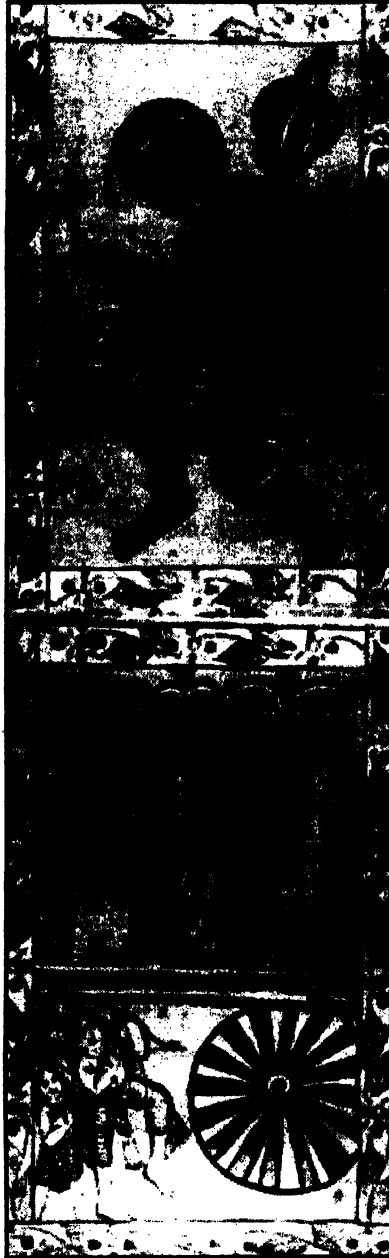
রজনী চিত্রকরের কাকা সম্পর্কে আকুবপুরের প্রবীর চিত্রকর চুয়াত্তর বছর বয়সেও পট লিখেছেন, মূর্তি গড়েছেন। বলেছিলেন : 'জীবনে বছরের পর বছর এই কাজ করেছি, এখন চোখে ঠিক মতো দৃশ্য হয় না, তবু করে যাচ্ছি, যতটা পারি। আনন্দ পাই বলেই তো করি। অনেক জায়গা ঘুরেছি গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে। অভিজ্ঞতাও পেয়েছি ঢের। অনেক পুরস্কার পেয়েছি—বেশির ভাগ মেডেল, দেখুন না এই সমস্ত।' থিয়েটারের দৃশ্যপট এঁকেছেন সাহেব বাড়িতে ডেকরেটিং করেছেন। উত্তরসূরিদের পটশিল্পের প্রতি অনাগ্রহ দেখে অভিমানের সঙ্গে বলেছিলেন : এখনকার ছেলেদের মধ্যে তেমন একটা উৎসাহ দেখি না। তবে ছেলে-ছোকরারা লেখাপড়া শিখে অনেকেই বাবু হয়ে যাচ্ছে বলে, এ-লাইনে কেউ আসছে

না তা ঠিক নয়। আমি নিজে বোঝানোর চেষ্টা করি, বলি— কাজ করে যাও। চেষ্টা করলে কী না সার্থক হয়।'

শুধু আনন্দ পাওয়া নয়, বাঙালির জনজীবনের এক সময় জাগরণের গান গেয়ে দেশের মানুষকে উদ্দীপিত করেছেন। গুরুসদয় দত্ত বলেছিলেন : 'জাতির গণ-সমাজের সাধারণ ভাষাকে পটুয়া শিল্পীগণ আড়ম্বরহীনভাবে কাব্যে রূপ দিয়াছেন। কোন কষ্টকল্পিত বা আয়াসসাধ্য অলঙ্কারের বালাই ইহাতে নাই, অথচ অন্তরের ভাবের প্রাচুর্যের ও ভক্তির একনিষ্ঠ প্রবাহের ফলে এই গীতিকাগুলি সহজ স্বতঃস্ফূর্ত রসসম্পদে ভরপুর। এই সকল গুণাবলীর বিদ্যমোনতার ফলে বাংলার গণ-সাহিত্যে পটুয়াগীতি গৌরবময় স্থান লাভ করিবে।'

পটের ছবির সারল্য তার সংগীতের সারল্যের সঙ্গে কীভাবে একাত্ম হয়ে পারস্পরিক সৌন্দর্য রচনা করে সে বিষয়ে একেবারে নতুন ভাবনার বিশ্লেষণ পাওয়া যায় সুধীন মিত্রর 'পটসংগীত' শীর্ষক নিবন্ধে। তিনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন : 'মালা গাঁথতে সুতোর যে কাজ, পট সংগীতে সুরেরও সেই কাজ। সুতো যত শক্ত হয়, মালা তত দৃঢ় হয়। পটসংগীতের সুরেও একটা সহজ দৃঢ়তা বজায় রয়েছে। সুর এখানে বাণীর সঙ্গে এমন সহজভাবে মিশে আছে যে বাইরের থেকে হঠাৎ মনে হতে পারে এঁদের গানে কোনো সুরই নেই। এই মনে হওয়াটা যে কত বড় ভুল, তার প্রমাণ মিলবে যদি এঁদের সুর সংযোজনের মনস্তত্ত্বকে চিনে নেবার চেষ্টা করা যায়। এঁদের আঁকার ভঙ্গি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সরল। সবচেয়ে কম তুলির টানে এঁরা সবচেয়ে বেশি ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে জানেন। বর্ণের দিক দিয়ে মূল রঙ লাল, নীল ও হলদের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি করে থাকেন, তাও চড়া মাত্রায়। ছন্দ, সহজ, স্বচ্ছন্দ ; ভাব জড়তা ও দুর্বোধ্যতামুক্ত। এককথায় ভাব-ছন্দ-বর্ণ সমস্তই সুস্থ মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজভাবেই যাতায়াত করছে। জোর করে অক্সিজেন সিলিন্ডার বসিয়ে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ করার ব্যবস্থা করা হয়নি। সুরের মধ্যেও তাই অল্পসংখ্যক স্বরের সাহায্য নেওয়া হল। রঙগুলি যত চড়া, ভাবগুলি যত নিটোল, স্বরগুলি তত স্পষ্ট আর ছাড়াছাড়াভাবে লাগানো হল এবং দেখা গেল, সুরগুলিও কখন এক ফাঁকে বর্ণ ভাব ইত্যাদির সঙ্গে সুন্দরভাবে মিশে গিয়ে এদেরই একজন হয়ে গেছে।'

বাংলার পটুয়া সম্প্রদায়ের দারিদ্র্যের দিকটি বিগত সত্তর-আশি বছর নানা ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। সামাজিক বিবর্তনের নানা সংঘাতের মুখোমুখি হয়ে বিলুপ্ত হতে-হতেও যে তার নিজস্ব শক্তির জোরেই এখনও সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়নি, এই শক্তির মূলটি অনুভব করে পটশিল্পের উজ্জীবনের বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে সুপরিকল্পিত কোনও পদক্ষেপ গৃহীত হলে হয়তো তা সম্ভব হত। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সভাপতির ভাষণে এ ব্যাপারে কয়েকটি মূল্যবান কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে উপকারের নামে ওঁদের পরিবেশ থেকে উৎপাটন করে ওদের সাহায্য করতে চেয়েছি— কিন্তু ওদের পরিবেশে গিয়ে ওদের সমস্যাগুলি সম্যক উপলব্ধি করে সাহায্য করিনি। বরাত দিয়ে ওদের ছবি আঁকতে বলেছি—ওরা প্রলুব্ধ হয়ে শহরের দরজায় কড়া নেড়ে নেড়ে পট বিক্রি করতে গ্রামগঞ্জ থেকে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। তাঁদের উপকার করার নামে নিজেরা সমাজসেবী হওয়ার চেষ্টাকেই বড়ো করে দেখেছি। ভালো করার ভান করে পট কিনছি সস্তায়—তাতে তাদের কোনও লাভ হয় না—কিন্তু ব্যবসায়ীরা দালালরা হাজার গুণ পয়সা পাচ্ছেন।' পঁয়ত্রিশ বছর আগে নানকাচকের পিয়ার, রাগে-অভিমানে হরিখালি গ্রামে বসে বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সুধীন মিত্র, কমল মান্নাকে সঙ্গতভাবেই শহুরে মানুষের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনেছিল, আজ বুঝতে পারি তার সমস্তটা অমূলক নয়। তবু এই প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে হরিচকের নগেন চিত্রকরের মতো পটুয়ারা তাঁদের কীর্তি অক্ষয় করে রেখে গেছেন, যাঁকে মেদিনীপুর তথা বাংলা পটের রাজ্যে সম্রাট হিসেবে আখ্যাত করেছিলেন ভোলানাথ ভট্টাচার্যর মতো ক্ষেত্র সমীক্ষক।

পঁয়ত্রিশ বছর আগে, নানকাচকের রোপবান চিত্রকর নগেনের মৃত্যু সংবাদ দিয়েছিল, ঈশানের দুরবস্থার সংবাদ জানিয়েছিল, সেদিন অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছিল, আমি তাঁদের সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম। কিন্তু এক সময় অস্থির রোপবান নিজের মনের ইচ্ছেটা স্পষ্ট করে তুলে ধরে বলেছিল : 'কী হবে বাবু ওদের কথা জেনে, এই অসম্ভব মন্দার বাজারে বরং মরে গিয়ে ভালোই করেছে, ওদের কথা ছেড়ে দেন, আমরা যারা মরার জন্য পড়ে রইলাম, আমাদের নিয়ে কিছু কাজ হয় না ? জানি না রোপবানের ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত কোন জায়গায় ঠেকেছিল। হয়তো সাময়িক এই অভিমান, কোথায় কে কৃপা করবে শুধু সে ভরসাতেই তাঁরা দিনের পর দিন বসে থেকে হা-পিত্যেশ করে পটের থলি ছুঁড়ে ফেয়নি। আজ সিনেমা-টিভির দুরন্ত আগ্রাসনে পটের দিন কি একেবারেই শেষ হয়ে গেছে। মনে পড়ে যায়, এক পড়ন্ত বিকেলে, নানকাচকের খালের ধারে বিশাল অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পঁয়তাল্লিশ বছরের পাতলা গড়ন খাঁদু চিত্রকর তাঁর দুঃখের পাঁচালীর মধ্যেও গভীর আত্মবিশ্বাসে দৃঢ়তার সঙ্গে আমাকে বলেছিল : 'তবু দেখবেন, পটি বন্ধ হবে না কোনওদিন, চলছে চলবে। কমের কম বেশির বেশি। আমাদের কত পিঁড়ি গত হয়ে গেল বন্ধ হয়নি। বাপ ঠাকুরদাও কষ্ট করে টিকিয়ে রেখে গেছে, নষ্ট হতে দেয়নি।' আমি আমার ফিরে দেখায়, খাঁদুর ছেলে ষোলো বছরের বাহারের মুখটা মনে করার চেষ্টা করি, যার বয়স এতদিন একাম্ন অতিক্রম করেছে।

লেখক : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গ্রন্থকার

শ্রীধর জীউ মন্দির গাত্রের টেরাকোটা ভাস্কর্য, চমকা

ছবি : তারাপদ সাঁতরা

রাধাগোবিন্দের মন্দিরে টেরাকোটা ভাস্কর্য, চেঁচুয়া-গোবিন্দনগর

ছবি : তারাপদ সাঁতরা
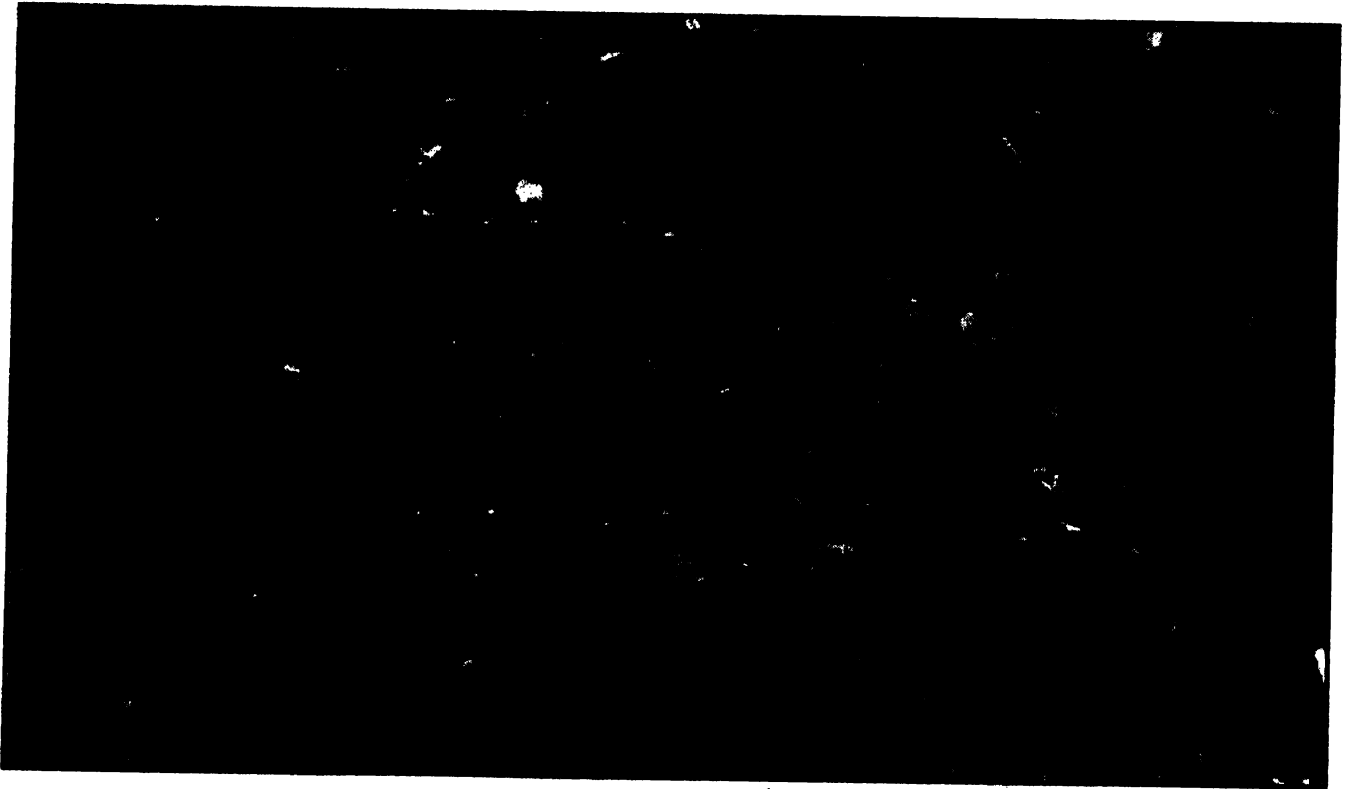
ছো-নৃত্য শিল্পীদের অনুশীলন

মেদিনীপুর জেলার লোকসংস্কৃতি

চিন্ময় দাশ

মেদিনীপুর ভাষা ও সংস্কৃতির উপাদানের কারণে জেলাগুলির মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পাশাপাশি ভৌগোলিক আয়তনের দিক থেকেও এই জেলা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নদ-নদী-সমুদ্র, পাহাড়-সমভূমি-অরণ্য বিস্তৃত এলাকা জুড়ে পরিব্যাপ্ত মেদিনীপুর জেলা চরিত্রগতভাবে একটি মহাদেশের সমতুল। প্রায় এক কোটি মানুষের বসবাস এই জেলায়।

পিলগ্রিম রোড, যা ওড়িশা ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিত, মেদিনীপুর জেলাকে পূর্ব ও পশ্চিম দুই অংশে বিভক্ত করেছে। উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত এই বিভাজিকা পথ বিভাজন করেছে জেলার সংস্কৃতিকেও। দুই অংশের ভূপ্রাকৃতিক গঠনও পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত।

পূর্বের এলাকা কাঁসাই; রূপনারায়ণ, শিলাবতী, হলদি, রসুলপুর, কেলেঘাই, চণ্ডিয়া, চম্পা, কপালেশ্বরী ইত্যাদি ছোটবড় বহু নদীর পলিমাটিতে গঠিত এক বিশাল সমতলভূমি। শ্যামল সবুজ শস্যভূমি ·সমুদ্রের জলরাশি বিধৌত। পণ্ডিতগণ একে দেবভূমি বলে উল্লেখ করেছেন। বিভাজিকা পথরেখার পশ্চিমের এলাকা পাথুরে। ছোটনাগপুর মালভূমির প্রান্তস্থিত এই এলাকা ল্যাটেরাইট পাথর, ছোটবড় পাহাড় আর গভীর বনভূমিতে পরিপূর্ণ। নব্যজীবক যুগের অন্তর্ভুক্ত প্লাইস্টোসিন বা অত্যাধুনিক যুগের পুরাভূমির অন্তর্ভুক্ত বলে এই ভূখণ্ডকে পণ্ডিতগণ বলেছেন পুরাভূমি।

মেদিনীপুর জেলা অনার্য এবং আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গমক্ষেত্র। পূর্বের দেবভূমি এলাকা যেমন আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক উত্তর ভারতের প্রান্তদেশ, তেমনই পশ্চিমের পুরাভূমি এলাকা প্রাক্-আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক দক্ষিণভারতের প্রান্তদেশ। এই দুই সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রান্তদেশ নিয়ে গঠিত মেদিনীপুর জেলা। এই দুই ধারার সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ এবং সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এই জেলার সাংস্কৃতিক চরিত্র। তবুও একথা বলা চলে যে মেদিনীপুরের লোকায়ত সংস্কৃতি প্রাক্-আর্য (অনার্য বা আর্যেতর যাই বলা হোক না কেন) সংস্কৃতি ধারার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। নৃতত্ত্ববিদগণ যাঁদের প্রোটো-অস্ট্রালয়েড বলেছেন (দীর্ঘমস্তক, অনাসা, কৃষ্ণবর্ণ) অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী সেই নিষাদ জাতির রীতিনীতির প্রভাব এই জেলার সাংস্কৃতিক উপাদানে বহুব্যাপ্ত। এর পাশাপাশি রয়েছে আর্য-অনার্য মিশ্র সংস্কৃতি এবং আর্য রীতিনীতির প্রমাণও।

আদিবাসী পটচিত্র

অতীত কথা

মেদিনীপুর জেলায় লোকসংস্কৃতির আলোচনায় আর্য-অনার্য উভয় সংস্কৃতির উল্লেখ ও আলোচনা প্রাসঙ্গিক। পাশাপাশি, এই জেলায় 'প্রত্নপ্রস্তর যুগ থেকে নব্যপ্রস্তর এবং পরে তাম্রপ্রস্তর যুগ পর্যন্ত সময়কালের মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতি বিবর্তনের' সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের উল্লেখও অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কেননা, হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর পূর্বকাল থেকেও মেদিনীপুর অঞ্চলে 'প্রকৃত মানব' বাস করত এবং তারা 'ধাতু ব্যবহারের পূর্বযুগের কৃষ্টির ধারক' ছিল, সে প্রমাণ পাওয়া গেছে বিনপুর থানার সিজুয়া গ্রামে প্রাপ্ত জীবাশ্মীভূত একটি ভগ্ন চোয়াল থেকে। প্রাক্‌হরপ্পীয় যুগের এই নিদর্শনটির বয়স চিহ্নিত হয়েছে ১০ হাজার খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ।

প্রত্নপলীয় যুগের এই চোয়ালটি ছাড়াও, সুবর্ণরেখা উপত্যকার ঘোড়াপিঙ্কা, হাতিমারা, দহমুড়া, ভাদুয়াজুড়ি, হাতিবাড়ি প্রভৃতি ; কংসাবতী উপত্যকার ওড়গোন্দা, অষ্টজুড়ি, বামনডিহি, ভেদাকুই, নয়াগড়, বেগুনডিহা, মুড়ানশোল, তামাজুড়ি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে প্রত্নপ্রস্তর যুগের বহু নিদর্শন। আবার রূপনারায়ণ উপত্যকার তমলুক, ইচ্ছাপুর, অমৃতবেড়িয়া, গেঁওখালি অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে নব্যপ্রস্তর যুগের নিদর্শনসমূহ। এসব কারণে বলা যায় যে প্রত্নপ্রস্তর থেকে নব্যপ্রস্তর কালের সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল এই এলাকায়।

আবার এই জেলার বিস্তৃত অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে তামার তৈরি কুঠার, ফলক, চাঙারি, যুগ্ম পরশু, দীর্ঘ কুঠার, থালা, স্কন্ধযুক্ত কুঠার, অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি বস্তু প্রভৃতি তামার আয়ুধ ও প্রত্নসামগ্রী। পাশাপাশি, খনিজ তাম্র সম্পদের সন্ধান, তাম্র নিষ্কাশনের নিদর্শনমূলক চুল্লি স্তূপীকৃত ধাতুমল আবিষ্কার থেকে বলা হয় যে, এই অঞ্চলে তাম্রভিত্তিক একটি সভ্যতারও বিকাশ ঘটেছিল। তামার সামগ্রী ছাড়াও জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে হাড়ের কুঠার ও শলাকা, হারপুন, রেখাযুক্ত কৃষ্ণ ও লোহিত কৌলাল, চিত্রিত লৌহ কৌলাল ; তাম্রপ্রস্তর পর্বের মৃৎপাত্র, মাটির ঘট, গোলাকার লোহিত মৃৎপাত্র, কর্নেলীয় পাথরে খোদিত শীল প্রভৃতি। এইসব নিদর্শন আশুতোষ মিউজিয়ম এবং তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।
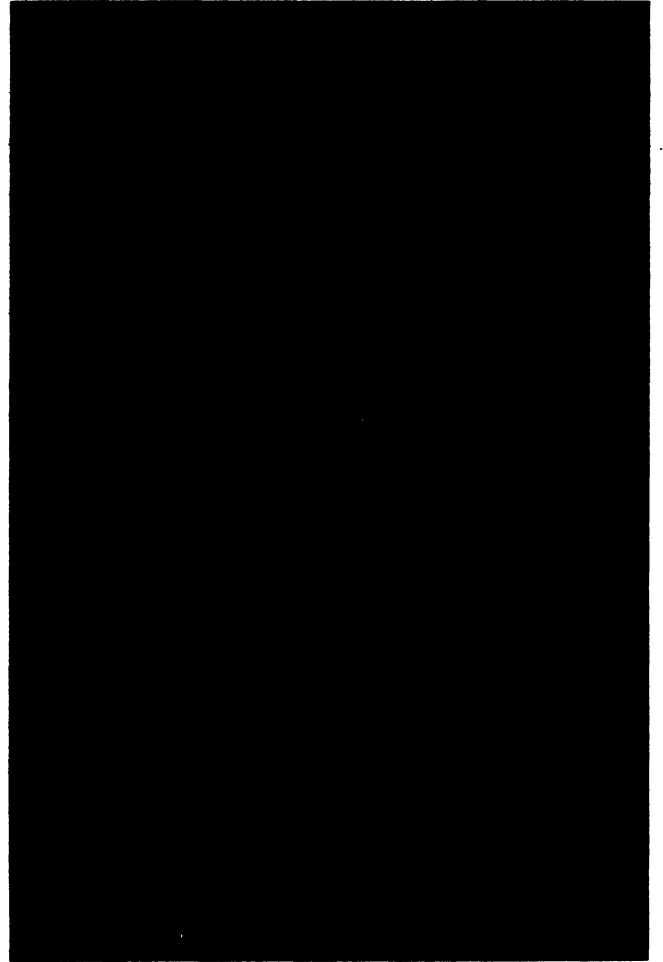
প্রত্নপ্রস্তর যুগ থেকে সেদিনের সভ্যতার বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল যে মানবগোষ্ঠীর হাতে, তামা ও লোহার হাতিয়ার ব্যবহার বা আদিম প্রণালীর কৃষিকাজের সূচনা হয়েছিল যাদের হাতে, আজকের সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, ভূমিজ, লোধা, কোল, ওঁরাও প্রভৃতি প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠীর মানুষজন তাদেরই উত্তরসূরি। মেদিনীপুর জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় সিকিভাগ অংশের এই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বিপুল প্রভাব বিস্তার করে আছে সমগ্র লোকসংস্কৃতির ওপর। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের একটি বক্তব্য উল্লেখ করা এখানে প্রাসঙ্গিক : 'আমাদের সমস্ত শুভানুষ্ঠানে যে আম্রপল্লব ও ঘটের প্রয়োজন হয়, যে কলাবৌয়ের পূজা হয়, অনেক ব্রতে যে ধানের ছড়ার প্রয়োজন
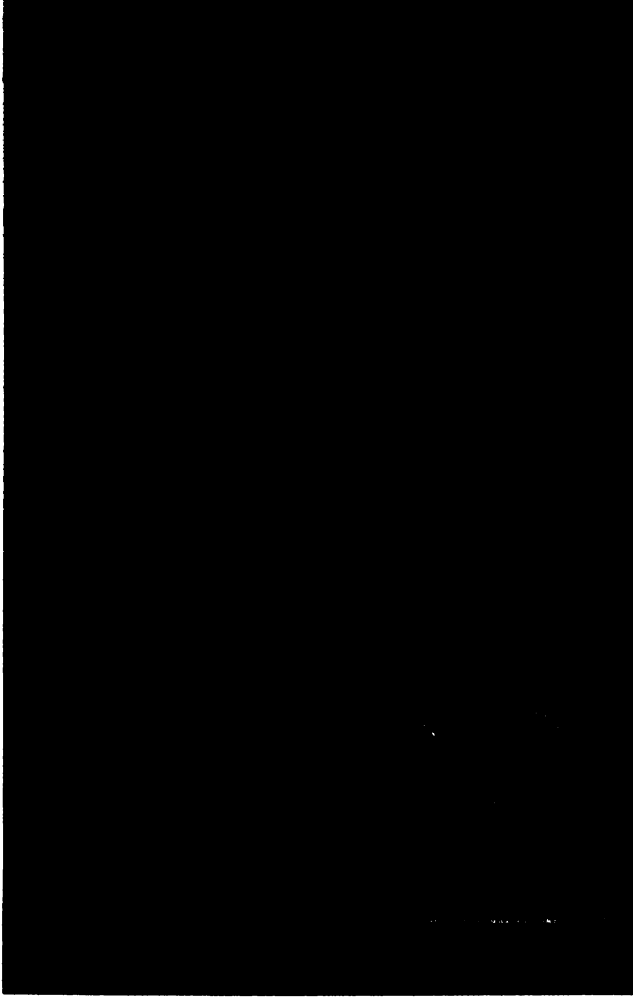
আদিবাসী পটচিত্র

হয়, এ সমস্তই সেই আদিবাসীদের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের এবং বিশ্বাস ও ধারণার স্মৃতি বহন করে। একটু লক্ষ করলে দেখা যায় এইসব ধারণা, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান আদিম কৃষি ও গ্রামসমাজের গাছ-পাথর পূজা, প্রজননশক্তির পূজা, পশুপক্ষীর পূজা প্রভৃতির স্মৃতি বহন করে। আমাদের মধ্যে যে নবান্ন উৎসব এবং আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান প্রচলিত,....বস্তুত, আমাদের দৈনন্দিন আচার-অনুষ্ঠানই বাংলার আদিমতম জন এবং কৌমদের ধর্মবিশ্বাস ও আচারানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত।'

আরও একটি কথা বলা দরকার। সীমান্তের এই জেলাটি বাংলা, বিহার ও ওড়িশা তিন রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। ফলে তিন অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে এই জেলার ভাষা ও সংস্কৃতিতে। মেদিনীপুর জেলার মূল লোকভাষা পূর্বী মাগধী থেকে উদ্ভূত এবং এই ভাষাকে বেষ্টন করে আছে সীমান্ত রাঢ়ী বা ঝাড়খণ্ডী, মধ্যরাঢ়ী এবং ওড়িয়া—এই তিনটি ভাষা। এবং সংলগ্ন অঞ্চলের সংস্কৃতিও।

সমগ্র এই পটভূমিতেই আমরা মেদিনীপুর জেলার লোকসংস্কৃতি বিষয়টি আলোচনা করব। বলে নেওয়া দরকার যে মেটেরিয়াল ফোকলোর বা বস্তু-আশ্রয়ী লোকসংস্কৃতি মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, কৃষি যন্ত্রপাতি, লোকশিল্প বা কারুশিল্প বস্তু নিয়ে যা গড়ে ওঠে, তার আলোচনা এই নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত নয়। লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লৌকিক দেবদেবী, লোক-উৎসব, খেলাধুলা, লোকনাটক, ছড়া-প্রবাদ-ধাঁধা ইত্যাদি ফর্মালাইজড বা নন-মেটেরিয়াল ফোকলোর বা রীতিনিষ্ঠ বা শিল্পাশ্রয়ী লোকসংস্কৃতি নিয়েই এখানে আলোচনা করা হবে। এবং পূর্ববর্তী আলোচনার সূত্র ধরেই পুরাভূমি, দেবভূমি এবং প্রান্তভূমি (ওড়িশা সীমান্ত) এই তিন ক্ষেত্রের উপাদানই বিশ্লেষিত হবে।

পটশিল্প

পুরুলিয়ার ছৌ, বাঁকুড়ার ঘোড়ার মতো পট মেদিনীপুর জেলার পরিচায়ক ও প্রতিনিধিত্বমূলক শিল্প। পট একাধারে হস্তশিল্প (handicraft) এবং প্রদর্শনমূলক শিল্প (performing art)। কাপড়ের ওপর আঠা দিয়ে ক্রমান্বয়ে জোড়া কাগজের একপিঠে দেশিয় উপাদানে প্রস্তুত রং দিয়ে ছবি আঁকেন শিল্পীরা। তুলির একটানে আঁকা এইসব পট আজও রক্ষা করে চলেছে বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্যের ধারাকে।

পটের প্রধানত তিনটি ধারা—দীঘল পট, চৌকো পট ও সরা পট। এর মধ্যে দীঘল পটই অধিক প্রচলিত ও জনপ্রিয়। তবে চৌকো পটও মেদিনীপুর জেলায় রচিত হয়। আর কলকাতার কালীঘাটে প্রচলন হয়েছিল যে সরাপটের, সেসবও মেদিনীপুরের শিল্পীদেরই একটি অংশের হাত ধরে।

পটের ছবি ও গান, দুটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ, একে অন্যের পরিপূরক। ছবি দেখানো এবং গান গাওয়া যুগপৎ চলতে থাকে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই পট ছিল পৌরাণিক বিষয়নির্ভর। কালক্রমে তা মঙ্গলকাব্যের পালাগুলিকে উপজীব্য করে। বেহুলা-লখিন্দর, কমলে-কামিনী, শ্রীমন্ত মসান তেমনই পালা। আরও পরে, সামাজিক বিষয়, সমসাময়িক কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা দীঘল পটের বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়। অতি সম্প্রতি পটুয়াগণ সাক্ষরতা প্রসার, রোগ প্রতিষেধ, মাদকের কুফল, পণপ্রথার অভিশাপ, বন সৃজনের উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে পট রচনা করে তাঁদের সমাজ চেতনার পরিচয় দিচ্ছেন।

পটের আরও কয়েকটি চরিত্রের উল্লেখ করতে হয়। পটের জনপ্রিয়তা উৎসাহিত করে মৌলবাদীদের। মোল্লা-মৌলবীরা ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে পীর-গাজির অলৌকিক ক্ষমতার বর্ণনামূলক একজাতীয় পট রচনা করান, এই সকল পট 'গাজির পট' নামে পরিচিত হয়েছিল। মেদিনীপুর জেলায় গাজির পটের মধ্যে কাঁথি মহকুমার হিজলির পীর, মসনদ-ই-আলা তাজ খাঁ-র কীর্তিপ্রচারক পটটি উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে এদেশে ইংরেজ শাসনকালে খ্রিস্টধর্মের প্রসারকল্পে যীশুখ্রিস্টের মহিমা বর্ণনাত্মক এক ধরনের পটের সৃষ্টি করান খ্রিস্টান যাজকগণ, সেগুলি 'সাহেব পট' নামে অভিহিত হয়। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে পটের জনপ্রিয়তা
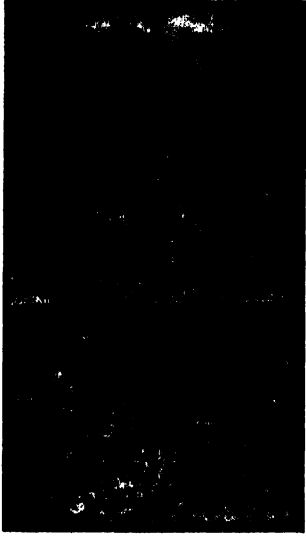
যমপট, শ্যামসুন্দর চিত্রকর

লক্ষ করে রচিত হয় 'আদিবাসী পট'। সেখানে পৃথিবী ও আদিম মানব সমাজ সৃষ্টির সচিত্র বর্ণনা পাওয়া যায়। হিন্দু সম্প্রদায় পরলোক ও পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, ইহজীবনের অনৈতিক কাজকর্মের ফল হিসাবে পরলোকে গিয়ে যমরাজার হাতে কঠোর শাস্তিলাভের ভবিতব্য দেখিয়ে এক ধরনের পট তৈরি হয়, এগুলি 'যমপট' নামে পরিচিত।

এগুলি দীঘল পটের শ্রেণীবিন্যস্ত উদাহরণ। এই জেলার চৌকো পটের মধ্যে বিখ্যাত হল 'চক্ষুদান পট'। চক্ষুদান পটে একজন মৃত ব্যক্তির ছবি এঁকে, কোনও মৃতের পরিবারের সদস্যদের কাছে নিয়ে যান পটুয়া। পটের ছবিতে মৃত মানুষটির চোখ আঁকা থাকে না। এবং বলা হয়, দৃষ্টি না থাকায় পরলোকে গিয়েও মানুষটির দুর্গতির শেষ নাই। পরিবার থেকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক নিয়ে পটুয়া চক্ষুদান করেন ছবিটিতে।

সমস্ত পটশিল্পটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। পট আঁকা, গান রচনা ও সুরারোপ এবং গান গেয়ে পট দেখানো। তিনটি কাজই সমান দক্ষতায় সম্পাদন করতে সমান, এমন শিল্পী সর্বকালেই স্বল্প। কেউ চিত্রাঙ্কনে দক্ষ, কেউ গান রচনা ও সুরারোপে পটু, আবার কারও গানের সুরেলা কণ্ঠ জনপ্রিয়। এভাবে তিনটি ধারার সংমিশ্রণে সমৃদ্ধ হয়েছে পটশিল্প।

ঘাটালের নির্ভয়পুরের যশস্বী পটুয়া গৌরীরানী চিত্রকর রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেছেন তাঁর পটের জন্য। জেলার চণ্ডীপুর থানার হবিচক, নানকারচক ; পিংলা থানার নয়া, তমলুক থানার ঠেকুয়াচক, কাখরদা, দাসপুর থানার নাড়াজোল, নির্ভয়পুর, সাঁকরাইল থানার মুরনিয়া, কেশিয়াড়ি থানার এবং বিনপুর থানার দু-একটি গ্রামে পটুয়া সম্প্রদায়ের বসবাস। অত্যন্ত দরিদ্র এই পটুয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা হিন্দু-ইসলাম উভয় ধর্মকেই অনুসরণ করেন—নামাজ পড়েন, আবার সন্ধ্যাদীপ জ্বালেন তুলসীতলায়।

বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দাপটে আর পাঁচটা লৌকিক উপাদানের মতো পটেরও নাভিশ্বাস উঠেছে। বহু শিল্পীই জীবিকার সন্ধানে পট ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। যাঁরা টিকে আছেন তাঁদের পট এঁকে শহরে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা, পোশাকে পটের ডিজাইন তোলা ইত্যাদি করতে হচ্ছে। অথচ, লোকশিল্পর অসম্ভব শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে পট। সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে সে কাজে হাত দিলে বাংলার প্রাচীনতম ঐতিহ্যের এই উপাদানটিকে রক্ষা করা যেতে পারে এখনও।

পট প্রসঙ্গ শেষ করার আগে পটের গানের অংশবিশেষ উল্লেখ করি। মূল আখ্যায়িকা অংশ বাদ দিলে, পটের গানের আদিতে ও অন্তে দুটি পৃথক পর্যায় থাকে। ভূমিকা পর্যায়ের নাম 'ঠাকুর দেওয়া'। 'আর উপসংহার পর্যায়কে বলা হয় 'প্যালা দেওয়া'। মূল কাহিনি শেষ করে অধিক দক্ষিণালাভের আশায় গৃহস্থের স্তুতিগান করা ও করুণা উদ্রেক করাই এই অংশের মূল প্রতিপাদ্য। এই অংশটি পটুয়াভেদে পৃথক হয়। আবার গৃহস্থভেদে তাৎক্ষণিক পদ সৃষ্টিও করে নেন পটুয়ারা। তেমনই একটি 'প্যালা দেওয়া' অংশ :

শুনেন না গো কত্তাবাবু বলি যে তুমারে।
আমরা নাম গেয়ে যাব দেশ দেশান্তরে।।
হরষ মনে কর বিদায় বলি অতেঃপর।
আমরা নয়ে দেশ-বিদেশে গাইব দশ ঘর।।
এই বয়সে বাঁটে লোকে সোনারূপা কড়ি।
মরে গেলে সঙ্গে দেয় যে বিছনের দড়ি।।
ভাই বল বন্ধু বল কেউ ত কারো নয়।
হাটের হাটুয়া যেন পথের পরিচয়।।
আকাশেতে চেয়ে দেখ কত বেলা হোল।
বকতে বকতে পটিদারের মাথা ধরে গেল।।
শুনেন না যে কত্তাবাবু বলি যে তুমারে।
কতক্ষণ বসিব বাবু তুমার দুয়ারে।।....

পুতুল নাচ

পুতুল নাচের তিনটি ধারা আমাদের রাজ্যে প্রচলিত। ডাঙের পুতুল (Rod puppet), ডোরের পুতুল (string puppet) এবং দস্তানা বা বেণী পুতুল (Gloves puppet)। পুতুলনাচের ইতিহাসে মেদিনীপুর জেলার নাম অগ্রগণ্য এই কারণে যে তিনটি ধারার পুতুলনাচই এই জেলায় বর্তমান, যা অন্য কোথাও নাই।

ডাঙের পুতুল : তিনদিক ঘেরা মঞ্চে উঁচু স্ক্রিনের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাজীকর পুতুল নাজান। পুতুল থাকে তাঁর কোমরের ফিতেয় আটকানো চোঙায় গোঁতা দণ্ড বা লাঠির মাথায়। ঢোলা পোশাকের আড়ালে বাঁধা কাঠির সাহায্যে পুতুল নাচানো হয়। পূর্বে পুতুলবাজি লৌকিক রীতি-নীতি-আঙ্গিকে প্রদর্শিত হলেও, বর্তমানে যাত্রা-থিয়েটারে অনুসৃত সর্বাধুনিক মঞ্চসজ্জা এবং কৃৎকৌশল অবলম্বন করেও তার অনুষ্ঠান হচ্ছে।

মেদিনীপুর জেলার ডাঙের পুতুলনাচের দলগুলি একমাত্র চণ্ডীপুর থানায় অবস্থিত। যোগমায়া, আদ্যাশক্তি, সত্যনারায়ণ পুতুল থিয়েটার ইত্যাদি দল সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠান করে চলেছে। জেলা এমন কি রাজ্যের বাইরেও তারা বায়না পায়।

পূর্বকালে ডাঙের পুতুলের পালা ছিল পৌরাণিক বিষয়-নির্ভর। বর্তমান দর্শকরুচির কথা মাথায় রেখে, এখন কেবল

বাজারচলতি যাত্রাপালার বই কিনে পালা তৈরি হচ্ছে ডাঙের পুতুলনাচে।

ডোরের পুতুল : কালো স্ক্রিনের পটভূমিতে ওপর থেকে কালো সুতোয় ঝুলিয়ে ডোরের পুতুল নাচানো হয়। দু-আড়াই ফুটের পুতুলগুলি, ডাঙের পুতুলের মতোই আম, বেল বা পালধুই কাঠে তৈরি হয়। মুখ তৈরি হয় কুমোরের হাতে, মাটি দিয়েই। ঝলমলে পুরু পোশাকের আড়ালে ঢাকা থাকে পুতুলের শরীর।

কাঁথি থানার ধানসরা, খান কাখুরিয়া, দেউলপোতা, হরিণাপাস দলবাড়, কাঞ্চননগর, কুটাকুটি ইত্যাদি গ্রাম ডোরের পুতুলের জন্য এতটাই খ্যাত যে এলাকাটি 'মেদিনীপুরের চিৎপুর' নামে অভিহিত হয়। মেদিনীপুর জেলার ডোরের পুতুলনাচের দলগুলি হল—মা মনসা, পূর্ণিমা, আলোকলতা, সোনামণি, অগ্রগামী, দিগ্বিজয়ী পুতুল থিয়েটার ইত্যাদি। কোশিয়াড়ি থানায় আমড়াতড়া গ্রামে মা শীতলা পুতুলনাচ নামে একটি দল আছে। পুতুলনাচের দল আছে সাঁকরাইল এবং গোয়ালতোড়ে।

জেলার ডাঙের পুতুলনাচের মতো ডোরের পুতুলনাচ দলগুলি সমৃদ্ধ নয়। কোনও কোনও দলের হতশ্রী দশাও দেখা যায়। এই দৈন্য অবশ্য ডোরের পুতুলনাচের নিজস্ব লোক আঙ্গিকটিকে রক্ষার সহায়ক হয়েছে। নাগরিক সংস্কার তাকে পরিবর্তনের স্রোতে ভাসাতে পারেনি আজও। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষজনই এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত।

পুতুলনাচে এই সেদিনও পুরুষ শিল্পীরাই 'ফিমেল' রোল করতেন। এখন উভয় নাচেই মহিলা 'মাস্টার' না হলে দল চলে না। ফলে গ্রামীণ যাত্রাদল থেকে মহিলা শিল্পীদের এনে পুতুলনাচে যুক্ত করা হচ্ছে।

সাধারণভাবে পৌরাণিক বিষয় এবং মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন কাহিনিকে নির্ভর করে গড়ে ওঠে ডোরের পুতুলনাচের পালা।

দস্তানা বা বেণী পুতুল : পুতুলনাচের একান্তই অন্ত্যজ বা লৌকিক আঙ্গিক বেণীপুতুলনাচ। রঙিন পোশাকে মোড়া ফুটখানেক উচ্চতার দুটি ছোট্ট পুতুল, হালকা কাঠের তৈরি। পেছন থেকে পোশাকের ভেতর হাত গলিয়ে খেলা দেখানো হয়, সেজন্যই এর নাম দস্তানা পুতুল বা Gloves puppet, বসে বা দাঁড়িয়ে বাজীকর প্রকাশ্যে খেলা দেখান, মঞ্চের বালাই থাকে না। পূর্বে ৬/৮ জনের দল তৈরি করে নাচ দেখানো হত—কয়েকজন পুতুল নাচাতেন আর গান গাইতেন, অন্যেরা বাজনদার। বর্তমানে দস্তানা পুতুলনাচ মুমূর্ষু, এক-দুজনের ছোট টিমই কোনওরকমে নাচ দেখিয়ে থাকে।

ভগবানপুর থানার পদ্মতামলি এবং ইক্ষু পত্রিকা গ্রামের ঘোড়ই পদবিধারি অতি দরিদ্র কয়েকটি তপশীলভুক্ত পরিবার শিল্পটিকে টিকিয়ে রেখেছেন। দু-হাতের দুটি পুতুলকে প্রতিপক্ষ হিসাবে কল্পনা করে দেবদেবীর বিবাদ বিষয়ক তরজাগান পরিবেশনে এরা সুপটু। পাশাপাশি বসন্ত, বিষ্ণুপদ বা রামপদ ঘোড়ইয়ের মতো পুতুলশিল্পীরা সাক্ষরতা, পণপ্রথা, বনসৃজন ইত্যাদি বিষয়ে পদ রচনা করে নাচ পরিবেশন করছেন।

বেণী পুতুলের আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য। বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা বা বিষয়ের নেতিবাচক বা অনৈতিক দিকগুলিকে তুলে ধরে তাঁরা গান বাঁধেন। সামাজিক বিচ্যুতি বা ভ্রান্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, সমাজ-বিবেকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

দস্তানা পুতুলনাচের একটি সামাজিক পালার অংশবিশেষ :

> সব জাতি তো মানুষ রে ভাই,
> ভিন্ন কোনও কিছুই নাই।
> রক্ত মাংস দিয়ে গড়া,
> মাটির তৈরি পুতুল নয়।।
> হিন্দু মুসলিম শিখ জৈন,
> যতেক মানুষ দেখি ভাই।
> সবার গায়েই লাল রক্ত,
> কালো কিন্তু কারোর নয়।।...

পটশিল্পের মতোই, সঠিকভাবে লোকশিক্ষা ও বিনোদনের এই উপাদানটিকে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করলে, ধ্বংসোন্মুখ শিল্পধারাটির সংরক্ষণ এবং গণচেতনা বৃদ্ধি উভয় প্রয়োজনই সাধিত হত।

কবিগান

'ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের মৃত্যুর (১৭৬০) পর থেকে ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু (১৮৫৯), একশো বৎসর ধরে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে নাগরিক লোকসংগীতের বিকাশ হয়েছিল তা সাধারণত কবিগান ও গায়কেরা কবিওয়ালা নামে পরিচিত।... কবিগান অধিকাংশ স্থলেই অর্ধশিক্ষিত (কোথাও বা অশিক্ষিত), কিন্তু সংগীতে নিপুণ গায়কদের গান।' এই মন্তব্যের সঙ্গেই ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ই বলেছেন—'কবিগান কিছু নিম্নস্তরের রুচির দ্বারা লালিত হত বলে মার্জিত রুচির কাছে এর বিশেষ কোনও গৌরব বা আকর্ষণ ছিল না।'

তা না থাকলেও সাধারণত জনসমাজে কবিগানের যথেষ্ট কদর ছিল। বস্তুত বর্তমানেও তা আছে। কবিগানের যে চারটি পর্ব, তা এই রকম—ভবানী-বিষয়ক, সখীসংবাদ, বিরহ এবং খেউড়। ভবানী-বিষয়ক অর্থে কালীকীর্তন ; সখীসংবাদ ও বিরহ বৈষ্ণব পদাবলীর ঢঙে রচিত। আর খেউড় হল অশালীন রঙ্গ। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : 'খেউড় গান অনুষ্ঠানের শেষে গাইতে হত, বলাই বাহুল্য এই অংশে পরস্পরের অশ্লীল রঙ্গকৌতুক ও ব্যক্তিগত গালিগালাজ আসরে অশ্লীল উত্তেজনা ছড়াত। তবু খেউড় কিছুটা সহনীয়, কিন্তু 'পচা খেউড়' অতি

অশ্লীল, কুরুচির অনাবৃত প্রকাশ।' বলা বাহুল্য, কবিগানের শেষ পর্বের এই খেউড় অংশ সমাজের একেবারে নীচের তলার শ্রোতাদের মাতোয়ারা করে তুলতে সক্ষম।

মেদিনীপুর জেলায় দীর্ঘকাল ধরে কবিগান একটি শক্তিশালী ধারা হিসাবে প্রচলিত। বেলদা, খাকুড়দা, সমগ্র কাঁথি, তমলুক ও ঘাটাল মহকুমা জুড়ে কবি গানের প্রচলন। এখনও অসংখ্য দল নিয়মিত অনুষ্ঠান করে থাকে। পৌরাণিক বিষয়ের পাশাপাশি সামাজিক বিষয়সহ রাজনৈতিক বিষয় এবং বক্তব্যও কবিগানের উপজীব্য হয়ে উঠেছে। জেলায় কয়েকজন মহিলা কবিরও উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে।

তরজা গান

'তরজা' শব্দটির ব্যবহার হয়েছিল মধ্যযুগে, 'প্রহেলিকা জাতীয় প্রশ্নোত্তরমূলক ছড়া-গান অর্থে'। ডঃ অরুণ কুমার বসু বলেছেন—'তরজা' (< আরবি শব্দ তরজ্-ই-বন্দ্) আরবি-পারসিক ঐতিহ্য বেয়ে মোগল যুগে আর্যা শব্দের সঙ্গে ধ্বনিসাম্যে ছড়া-প্রহেলিকা চাপান-উতোর গীতি অর্থে লোকজীবনে প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয়।'

কবিগানের মতো গ্রামীণ লোকজীবনে বিনোদনের জনপ্রিয় উপাদান হিসাবে তরজা প্রচলিত ছিল। কবিগানের উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক লড়াইয়ের শেষাংশ খেউড়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায় তরজার।

বর্তমানে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দাপটে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান তার জনবিনোদন শক্তি কিছুটা হারালেও, গ্রামাঞ্চলে তরজার জনপ্রিয়তা এখনও বর্তমান। রূঢ়, নগ্ন ভাষায় প্রতিপক্ষকে আক্রমণ ও কুপোকাত করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে শ্রোতার মধ্যেও এক ধরনের উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়। ফলে বিনোদনের এক ভিন্ন মাত্রা সৃষ্টি হয় তরজা গানে। এই বৈশিষ্ট্যটির কারণেই দস্তানা পুতুলনাচ বা পটের গানেও তরজা রীতির অনুসরণ দেখা যায়।

মেদিনীপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে তরজাগান আজও মানুষের কাছে একটি জনপ্রিয় উপাদান। সাধারণভাবে কবিগান অধ্যুষিত এলাকাতেই তরজাগানের প্রচলন এই জেলায়।

পীরের গান

একশ্রেণীর মুসলমান ফকির একক বা দ্বৈতভাবে দয়াল মানিক পীরের অলৌকিক ক্ষমতার বর্ণনামূলক গান গেয়ে ভিক্ষা করেন। অত্যন্ত সুগঠিত একটি হৃদয়গ্রাহী কাহিনিকে সুললিত কণ্ঠে চিত্তাকর্ষক সুরে পরিবেশন করে এঁরা শ্রোতাদের আবিষ্ট করে তোলেন। কেবল মুসলমান নয়, মেদিনীপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে হিন্দু বসতি এলাকাতেও যথেষ্ট কদর আছে পীরের গানের। মানিক পীরের দরগায়, খেজুরির মসনদ-ই-আলার আস্তানায় সব সম্প্রদায়ের মানুষেরই যাতায়াত। জেলার পূর্বাঞ্চলেই যেহেতু মুসলমান বসতি বেশি, এই অংশেই পীরের গানের সমধিক প্রচলন।

একটি গানের একাংশ :

আইল দয়াল গাজি এল একবার।
হাতের আসরফ ফেলে গাজি দরিয়া হোল পার॥
গাজি মুশকিল আসান কর দয়াল মানিক পীর।
ঘরে ঘরে বলে এলাম সত্যপীরের নাম।
এই বাড়িতে বলে যাই গো দেবী লক্ষ্মীর নাম॥ গাজি মুশকিল—
সাঁজ দিও সঞ্জ্যা দিও গোইলে দিও বাতি।
এই সব রমণীর ঘরে লক্ষ্মীর বসতি॥ গাজি মুশকিল—
স্বামী স্বামী কর তুমরা স্বামী কী বা ধন।

স্বামীর চরণে আছে বৈকুণ্ঠ ভুবন॥ গাজি মুশকিল আসান কর—বাংলার কোনও কোনও এলাকায় ওই গান 'জাগ গান' নামেও প্রচলিত।

উপরোক্ত আঙ্গিকগুলি ছাড়াও মেদিনীপুর জেলায় আরও অসংখ্য যে সকল সঙ্গীতের প্রচলন আছে, এই পরিসরে তাদের কয়েকটির অন্তত নামোল্লেখ করা প্রয়োজন। রামরসায়ন, কৃষ্ণযাত্রা (বালক সঙ্গীত ও বালিকা সঙ্গীত) ; মঙ্গলকাব্যনির্ভর অনুষ্ঠান—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল ; কালীনাচ ; বোষ্টমী নাচ ; নন্দ নাচ ; সয়াল গান ; মনসার ভাসান ও ঝাপান গান—গানের যেন শেষ নাই। বিনোদনমূলক এই গানগুলি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রভাবিত ধর্মীয় বিষয়কে উপজীব্য করে রচিত হলেও, লক্ষণীয় সে এগুলির উদ্দিষ্ট সকলেই লৌকিক দেবতা, কেউই পৌরাণিক দেবতা নন।

পুরাভূমির সংস্কৃতি

পুরাভূমি এলাকার অধিবাসীবৃন্দের অধিকাংশই আদিবাসী। অনাদিবাসী উচ্চ ও নিম্নবর্ণের সংখ্যালঘু বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জীবনও আদিবাসীদের সংস্কৃতিতে প্রভাবিত। কৃষিনির্ভর যেকোনও জাতির মতো পুরাভূমির জনগোষ্ঠীর জীবন ও কর্মজগৎ মূলত তিনটি ঋতুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীত। আদিবাসী সমাজেও এই তিনটি প্রধান ঋতুকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে সমগ্র উৎসব অনুষ্ঠানের সূচিপত্র। ঋতু তিনটি হল—ঝেটবঙ্গা (গ্রীষ্মকাল), জারগিডা (বর্ষাকাল) এবং রাবাংদিন (শীতকাল)। এই তিন সময়কালের মুখ্য অনুষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

ঝেটবঙ্গা হল ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ—এই চার মাস। রাঢ় অঞ্চলের শাল, মহুল, কুসুম, আসন প্রভৃতি গাছ নবপল্লবে সেজে ওঠে ওই সময়ে। বনের পাতা, কাঠ, মধু কন্দ প্রভৃতি দরিদ্র বনবাসী আদিবাসীজনের জীবনযাপনের প্রধান উৎস। বনের পূজা না করে কেউ এসব সংগ্রহের জন্য বনে প্রবেশ করে না। পূজার নাম 'শারহুল'। বর্ণহিন্দু সমাজের নবান্নের সঙ্গে ওই উৎসবের তুলনা করা যেতে পারে। শীতের পাতাঝরা

পশ্চিম মেদিনীপুরের আদিবাসী পল্লীতে করম অনুষ্ঠান

বৃক্ষগুলি নবপত্রে যেমন সজ্জিত হয়ে ওঠে, তেমনই মেতে ওঠে মানুষের মনও। নাচে-গানে সেই স্ফূর্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে শারহুল উৎসবে।

ঝেটবঙ্গার মুখ্য অনুষ্ঠান 'বাহাপরব'। বাহা একদিকে যেমন বসন্ত উৎসব, তেমনি বর্ষাবরণের উৎসবও। আদিম মানবগোষ্ঠীর সমস্ত উৎসবই সৃষ্টি হয়েছিল উর্বরতা বৃদ্ধির যাদুক্রিয়া হিসাবে, কেননা, জীবন যে কৃষিনির্ভর, কৃষিকেন্দ্রিক। আজও নাচ আর গানের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গ হিসাবে বাহা উৎসব উদ্‌যাপিত হয় মহাসমারোহে।

এই পর্বের আর এক উৎসব **শিকার পরব**। বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে অনুষ্ঠিত শিকার পরবে আদিবাসী পুরুষ অংশ গ্রহণ করেন-রক্তের টানে। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার উৎসবে জীবনে অন্তত একবার অংশগ্রহণ করতেই হয়, গঙ্গাসাগর মেলার অনুরূপ। শিকার পরবে অংশ না নিলে কোনও যুবককে বিবাহে সম্মত হয় না আদিবাসী তরুণী। শিকার উৎসব যদিও কেবলমাত্র পুরুষের উৎসব, তবুও টুসুগানে শিকার পরবের কথা পাওয়া যায়।

তীর, ধনুক, বর্শা, ঢাঙি, তাবলা, কারসা, টেঁটা ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত আদিবাসী পুরুষ পারগানা বোঙা-র আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। ঢোল, ধামসা, মাদল, শিঙা, বাঁশি, কেঁদরির সুরের তালে নাচে গানে দেবতার সন্তুষ্টি বিধান করে তারা। যৌবন ও যৌনতার দেবতা রঙবুজি বোঙার কাছে এই শিকার পরবেই যৌবনমন্ত্রে দীক্ষিত হয় যুবসমাজ।

শিকার উৎসবও যে কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত, একটি বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করলে, তা স্পষ্ট হবে। শিকার করা পশুর রক্তে শস্যবীজ ভিজিয়ে বপন করার রীতি আছে। উৎপাদন ও উর্বরতা বৃদ্ধির এই সংস্কার আজও প্রচলিত আছে।

জারগিডার সময়কাল আষাঢ় থেকে আশ্বিন। এই সময়কালের প্রধান পরব হোল 'করম'। এটিও একটি কৃষি উৎসব। দুটি করম গাছের ডাল মাটিতে পুঁতে নাচে-গানে বন্দনা করা হয়। একটি ডাল সূর্যের প্রতীক, তিনি করম রাজা। অন্যটি ধরিত্রীর প্রতীক, তিনি রানী। এই দুই শক্তির মিলনে শস্যোৎপাদন ঘটে, পৃথিবী ফলবতী হয়। প্রধানত মাহাত, কুরমি, মুণ্ডা, ভূমিজ সম্প্রদায় ছাড়া অন্যরাও করম পরবে অংশগ্রহণ করেন। অধিক ফসল উৎপাদন, ভাই-এর কল্যাণ এবং সন্তান কামনায় করম দেবতার উপাসনা করেন আদিবাসী রমণী। নাচ ও গানের মাধ্যমে করম পরব উদ্‌যাপিত হয়। এই পরবে অনুষ্ঠিত পাতানাচের ভঙ্গি ফসল রোয়া ও কাটার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ।

পাতা নাচের একটি গান :
ঘরের ভিতর মরদ আমার
সদর ঘাটে ভাসুর।
কেমনে বাহিরাব আমার
পায়ে বাঁধা নূপুর ?

জাওয়া পরবটি উৎযাপিত হয় জারগিডা সময়কালেই। বর্ণ হিন্দু সমাজের রমণীদের জিতাষ্টমী ব্রতের আঙ্গিকের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ জাওয়া পরব। এই পরবটি করম পূজারই একটি পৃথক অঙ্গ। যেহেতু কুমারী মেয়েদের উর্বরতা শক্তি অধিক, সেকারণে অধিক শস্য কামনায় কেবলমাত্র কুমারী মেয়েরা (সদ্য বিবাহিতারাও) এই অনুষ্ঠানটি পালন করে থাকে। একটি ডালার মধ্যে ভেজা বালিতে এলাকার সবরকম শস্য বীজ হলুদ জলে ভিজিয়ে বপন করে। ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীর তিন, পাঁচ, সাত অথবা ন'দিন পূর্বে এই ডালা পেতে প্রতিদিন ডালাকে
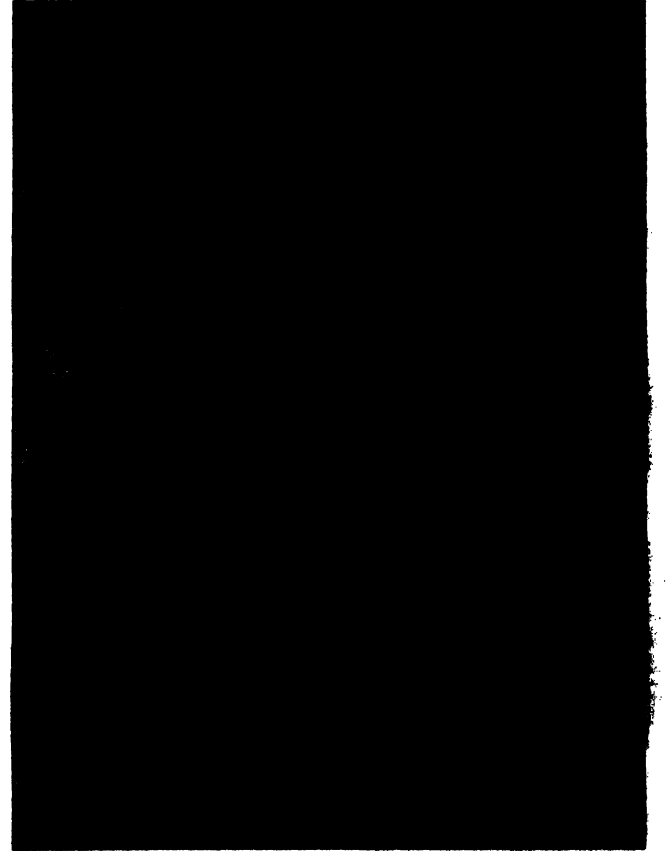
জাওয়া করম অনুষ্ঠান

ছাতা পরবে নৃত্যগীতের আসর

ইন্দ্রধ্বজ নামক শালদণ্ডের পৃষ্ঠপোষক রাজ পরিবারের প্রতীক একটি ছাতা বেঁধে দেওয়ার রীতি আছে। সেই কারণে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায় এটি **'ছাতা পরব'** নামে খ্যাত।

জারগিডা সময়কালের আর একটি উৎসব **'কাদালেটা'**। বর্ষণসিক্ত ক্ষেতে বীজ বপণ করার উৎসব কাদালেটা, অনুষ্ঠিত হয় আদ্রা নক্ষত্রে।

রাবাং দিন-এর সময়কাল কার্তিক থেকে মাঘ মাস। এই সময়ের একটি বড় উৎসব 'সহরাই'। ফসল তোলার উৎসব এটি। ক্ষেতের ফসল, বনের ফলমূল এসময় পরিপক্ক হয়। আনন্দে উদ্বেল মানুষ মেতে ওঠে সহরাই পরবের নাচে গানে।

মধ্যে রেখে নাচগান করে বন্দনা করা হয়। করমপূজার দিন পর্যন্ত এই নাচগান চলতে থাকে।

জাওয়া নাচের গান :

কাঁসাই লদীর বালি আইনব
জাওয়া পাইতব ঘরে লো।
আমাদের জাওয়া উঠাই লিব
করম গাছের তলে লো।
সূর্য্য উঠে দিনে দিনে
আমাদের জাওয়া উঠে কই।
জাওয়ার লাইগে নিয়ম করি
জাওয়া তবু উঠে নাই।।

করম এবং জাওয়া এই দুটিও উর্বরতাবাদ (Fertility Cult)-এর পরিচায়ক অনুষ্ঠান। করম পূজার ডালিতে একটি সবৃন্ত শশা থাকতে হয় আবশ্যিকভাবে। সুদেহী পুত্রসন্তান কামনায় এটি করা হয়। সৃষ্টি বাসনায় আয়োজিত আঙ্গিকে যাঁরা যৌন ভাবনার ছায়া দেখেন, তেমন কোনও কোনও সমাজবিজ্ঞানী এই রীতিটিকে লিঙ্গপূজা (Fallic Worship) হিসাবে বিশ্লেষণ করেন।

জারগিডার একটি বড় অনুষ্ঠান **'ইদ পরব'**। প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয় রাজাগণ যেমন কপিধ্বজ, গরুড়ধ্বজ ইত্যাদির পূজা করতেন, তার অনুকরণে রাঢ় অঞ্চলে রাজন্যবর্গ ইন্দ্রধ্বজের পূজার প্রচলন করেছিলেন কোন এক সময়ে। কালক্রমে সেই পূজাই আজকের লৌকিক উৎসব ইদ পরবে পর্যবসিত হয়েছে।

করম পরবের পরদিনই, অর্থাৎ ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে ইদ পরব। সমগ্র রাঢ়ভূমি মেতে ওঠে প্রাণের আনন্দে। একটি বিশাল শালগাছ মাটিতে প্রোথিত করে, তার পূজা হয়। জাওয়ার অঙ্কুরিত ডালি নিবেদন করা হয় কোথাও কোথাও। গুজরাট প্রদেশের রখোয়া সম্প্রদায়ের কৃষি উৎসব 'বাবো ইদ'-এর সাথে আমাদের ইদ পরবের সাযুজ্য পাওয়া যায়।

'টুসু পরব' শুধু রাবাং দিনের বড় উৎসব নয়, বলা যায় রাঢ়বাসীদের প্রধানতম উৎসব টুসু, সম্বৎসর যার জন্য প্রতীক্ষা। প্রান্তবাসী মানুষজনের জাতীয় উৎসবের মত।

অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে টুসু পেতে সারা পৌষ মাস নাচে গানে টুসুর আরাধনা করা হয়। পোষের সংক্রান্তি যেন বিজয়া দশমী, টুসু বিসর্জনের দিন। দেবী হলেও, টুসু দৈবী মহিমা বর্জিতা, টুসু দরিদ্র পরিবারের কন্যাতুল্য। তাকে বিদায় দিতে কেঁদে ওঠে অন্তর। টুসুর গানে প্রকাশিত হয় সেই বেদনা। কাঁসাই, সুবর্ণরেখা, ডুলুং, কেলেঘাই, তমাল, পারাং নদীগুলির তীরে পৌষ সংক্রান্তিতে মেলা বসে যায় টুসু বিসর্জনকে কেন্দ্র করে। মেলা বসে যায় দূরবর্তী গ্রামগুলিতেও।

আদিবাসী সমাজের জাতীয় উৎসব—টুসু

ইদানিং প্রায় সর্বত্রই টুসুর মূর্তি পূজার চল হয়েছে। তবে মূর্তির সামনে চালের পিটুলি গোলায় চিত্রিত একটি মাটির সরায় গোবরের ডেলা রেখে পূজা করতে হয়। সরাটি ধরিত্রী এবং গোবর উর্বরাশক্তির প্রতীক।

সহরায় বাঁধনা পরব অনুষ্ঠানে গরু পূজা আচারানুষ্ঠান — ছবি : কার্তিক মুর্মু

বাঁধনা রাবাংদিনের বড় উৎসবই নয়, পুরাভূমি এলাকার লোকজীবনে দুটি প্রধান উৎসবের একটি। কৃষির অন্যতম উপকরণ গরুর পূজা এই বাঁধনা পরব। কার্তিক অমাবস্যার (কালীপূজার) রাত্রিতে গরুকে পূজা করার সাথে সাথে গরুর শিঙে তেল মাখানো, মাথায় সদ্য কাটা ধানের 'মোড়' পরানো, আল্পনা আঁকা, মড়দা ঘাসের আঁটি বিছানো, বাঘুৎ-ছাঁদনদড়ি বাঁধনদড়ির উদ্দেশ্যে গোধপূজা, নিমছান, মাছিবাইটা, গরয়া গোঁসাই পূজা, বুড়িবাঁধনা ইত্যাদি বহুরকম লোকাচার ও অনুষ্ঠান পালন করা হয়। শেষদিনের বুড়িবাঁধনাই মূল অনুষ্ঠান। ফুলের মালা, মোড়, কলকের ছাপে গরুকে সাজিয়ে, গলায় ঘণ্টা ও ঘুঙুর বেঁধে, শক্ত খুঁটিতে গরুটিকে বাঁধা হয়। তারপর ঢোল, ধামসার বাজনার বিকট সুরে উত্তেজিত গরুটি লাফ ঝাঁপ করতে থাকে। পৃথিবীর দেশে দেশে বীর্যশক্তির প্রতীক ষাঁড়কে হত্যা করে তার মাংস ভোজনের যে রীতি প্রচলিত, আজকের বাঁধনা তারই পরিবর্তিত রূপ।

বাঁধনা পরবের পর্বে পর্বে আছে গানের আয়োজন। গানগুলির দুটি ভাগ, জাগরনিয়া গানগুলি পূজার বা বন্দনার গান, গৃহস্থের আঙিনায় সেগুলি গীত হয়, তাতে পশুর বন্দনাই প্রধান, আর ডহরিয়া হোল 'পথের গীত, উল্লাস ও আমোদের গীত। ...ডহরিয়া গীতের ভাব চপল, সুর চটুল, লয় দ্রুত।' মাছিবাইটা অনুষ্ঠানে ডহরিয়া গীত গাইবার সময় শালীনতার কোনও বেড়া থাকে না গায়ক-গায়িকাদের। তা সত্ত্বেও বলা হয় 'ডহরিয়া গীতগুলি লোকায়ত মানুষের হৃদয় সংবাদ, রংয়ের গান। লোকায়ত জীবনের কলরবে মুখরিত এই গীতগুলি একই সঙ্গে সমাজ দর্পণ এবং মৃত্তিকা সংলগ্ন মানুষের আশ-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, চিত্র ও চরিত্রের নির্ভুল উচ্চারণ।'

এই সকল উৎসব ও পরবের বাইরেও অসংখ্য বিষয় আছে, লোকায়ত জীবনে যাদের বিপুল প্রভাব। তাদের দুটি একটির কথা বলা দরকার।

গাজন : জেলার পূর্ব পশ্চিম উভয় অঞ্চলেই গাজন সাড়ম্বরে পালিত হয়। শিবের গাজন ও ধর্মের গাজন উভয়ই মেদিনীপুর জেলায় প্রচলিত। চৈত্র সংক্রান্তিতে (কোথাও বৈশাখে) শিবের গাজন, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ধর্মের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। 'দুইই আদিম কৌম সমাজের ভূত ও পুনর্জন্মবাদের বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।' দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে ভক্তদের আত্মনির্যাতন গাজনের বিশেষ অঙ্গ। আগুনপাট, খাঁড়াপাট, নারুনপাট, চক্রপাট, উড়োপাট, জিভ ফোঁড়, রজনি ফোঁড়, চাটু ফোঁড় প্রভৃতি সেইরকম অনুষ্ঠান।

গাজন উৎসবে গান ছাড়াও ভক্তরা পরস্পর ছড়া কাটেন, তাকে জামডালি বলা হয়।

ভীমপূজা : ভীমপূজা মেদিনীপুর জেলার অন্যতম লোকউৎসব। মাঘ মাসের শুক্লা একাদশীতে পূজিত এই ভীম মহাভারতের দ্বিতীয় পাণ্ডব নন। ইনি প্রধান চাষী শিবের সহায়ক অনুচর। রামেশ্বরের শিবায়নে দেখা যায়—

"চন্দ্রচূড় চলে বৃষে চণ্ডী রণ চায়্যা।
পিছু ভীম চলিল চাষের সজ্জা লয়্যা।।
নিমেষেকে ভীম ধান পেলাইলেক কাটি।
সরু সরু হাতের ভৈলেক তিন মুঠি।।"

ভীমের পরিচয়জ্ঞাপক একটি লোকছড়া সংগ্রহ করেছেন তরুণদেব ভট্টাচার্য :

"মেদিনীপুরের হালুই ভীম, ভীম ছড়া চাষী
তাই—ভীম একাদশী।"

দুটি নাচগানের কথা পৃথকভাবে বলা দরকার। সে-দুটি হোল—ছো নাচ এবং ঝুমুর গান। পুরাভূমি এলাকার জনজীবনের সাথে যা অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পৃক্ত।

ছো নাচ : রাঢ় অঞ্চলের গাজন অনুষ্ঠানের আচার-নৃত্যের নামই ছো নাচ। অন্যদিকে, সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ছো নাচ বৃষ্টি-কামনার ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানমাত্র। ছো নাচ বর্তমানে জনবিনোদনের একটি উপকরণ হয়ে ওঠায়, অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট কোনও দিনক্ষণ নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছো নাচের নির্দিষ্ট সময়সীমা হোল চড়কের জাগরণ দিন থেকে রোহিনের প্রথম দিন (১৩ জ্যৈষ্ঠ) পর্যন্ত। আদিবাসী লোকবিশ্বাস অনুযায়ী জ্যৈষ্ঠের তৃতীয় সপ্তাহ 'রোহিন'। রোহিনে বৃষ্টিপাত অবশ্যম্ভাবী এবং রোহিনে বপন করা বীজ ব্যর্থ হয় না।

ছো-নাচের উদ্দাম বাদ্য এবং নৃত্য বৃষ্টি কামনারই অনুষঙ্গ। ধামসা, ঢাক, বাঁশি করতাল ইত্যাদির বজ্রনির্ঘোষ বর্ষার গুরু গম্ভীর মেঘগর্জনের নামান্তর। ছো-শিল্পীদের নৃত্য কৌশল মূলত ৪টি পর্যায়ে বিন্যস্ত—বাঁহি মলকা, উড়া মালট, উফাল ও মাটি দলখা। শিল্পীর শারীরিক বিভঙ্গ ও বাহু আন্দোলন বাঁহি মলকা, যা কালবৈশাখীর ঝড়ের দাপটে আন্দোলিত গাছপালার নৃত্যরূপ। উড়া মালট মুদ্রায় জলবাহি মেঘের 'দ্রুত ও অবিন্যস্ত গতিকে' রূপায়িত করা হয়। উফাল হোল 'বিদ্যুতের চকিত দীপ্তির অনুকরণ'—যা শিল্পীর আকস্মিক লম্ফনের মধ্য দিয়ে প্রদর্শিত হয়। এবং মাটি দলখা হোল বর্ষণসিক্ত ভূমিকে ধীর পদক্ষেপে বিধ্বস্ত করা, কৃষির জন্য যা জরুরি প্রয়োজন।

আদিতে কুর্মি, মাহাত এবং ভূমিজ সম্প্রদায় এই নৃত্যধারাটির ধারক এবং বাহক থাকলেও, বর্তমানে অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায় এবং নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের দরিদ্র মানুষজন এই শিল্পধারায় যুক্ত। জেলার সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে বিভিন্ন গ্রামে ছো-নাচের দল আছে, যারা বাণিজ্যিক ভাবেও অনুষ্ঠান করে বেড়ায়। সাধারণভাবে রামায়ণ-মহাভারত, কিংবা বিভিন্ন লোকপুরানের কাহিনীকে উপজীব্য করে রচিত হয় ছো-নাচের পালা ও গান।

নৃত্যভঙ্গিমার পাশাপাশি ছো-নাচের বৈশিষ্টতার মুখোসে, অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত এই মুখোসগুলি তৈরি হয় প্রধানত পুরুলিয়ার চড়িদা গ্রামে।

মেদিনীপুর জেলার বহু গ্রামে মুখোশহীন ছো-নাচেরও প্রচলন আছে। জামবনি থানার চিলকিগড়ে কাঠের মুখোসের ছো-নাচের দল ছিল রাজবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায়। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই ঘরানাটিকে পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন।

এছাড়া বাঘনাচের কথা বলা দরকার যা জামবনি এলাকায় এখনও টিকে আছে।

ঝুমুর : রাঢ়ভূমি অঞ্চলের জাওয়া ও বাঁধনা পরবের গান বাদ দিলে বাকি সব গানই ঝুমুর গান। পাতানাচ, কাঠিনাচ, ছো নাচ, নাচনি নাচ ইত্যাদি সমস্ত নাচের সাথে যে গান পাওয়া হয়, সবই ঝুমুর। ঝুমুর রাঢ়বাসীর প্রাণের সম্পদ। কারও কারও মতে, রাঢ় এলাকার দ্রাবিড়ভাষী মানুষের প্রেমসঙ্গীতের নাম ঝুমুর।

ঝুমুরের প্রকারভেদ আছে : দাঁড়শালিয়া ঝুমুর, নাচনিশালিয়া ঝুমুর, ভাদুরিয়া বা লৌকিক ঝুমুর, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ঝুমুর, টাঁড় ঝুমুর ইত্যাদি। ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি, প্রেম-বিরহ-দাম্পত্য, উৎসব-অনুষ্ঠান, আচার-আচরণ, খাদ্য-পরিধেয়, অভাব-অনটন ইত্যাদি জীবনের সকল বিষয়ই ঝুমুর গানের বিষয়বস্তু।

গানের ভাষার বহিরঙ্গে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ থাকলেও অচিরেই তা অন্তঃশীলা দুটি লৌকিক নারী-পুরুষের প্রেম-বিরহ, পূর্বরাগ-অভিসার, বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি বাস্তব জীবনচিত্রকেই স্পষ্ট করে তোলে।

দুটি ঝুমুরের কথা বলতেই হয়। নাচনিশালিয়া ঝুমুর আসলে দরবারী ঝুমুর, নাচনির নাচের সাথে পরিবেশিত। আদিতে দরবারী ঝুমুরের যে বিষয় গাম্ভীর্য এবং সৌন্দর্য চেতনা ছিল, নাচনি নাচ ও গানের মানের ক্রমাবনতিতে বর্তমানে তা মূল্য হারিয়ে ফেলেছে। নাচনিদের চটুলতাই এর জন্য দায়ী।

ঝুমুরের অন্য অংশটি হোল টাঁড় ঝুমুর। এতে আবার আষাঢ়্যাগীত ও বাগাল্যা গীত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। মাঠে
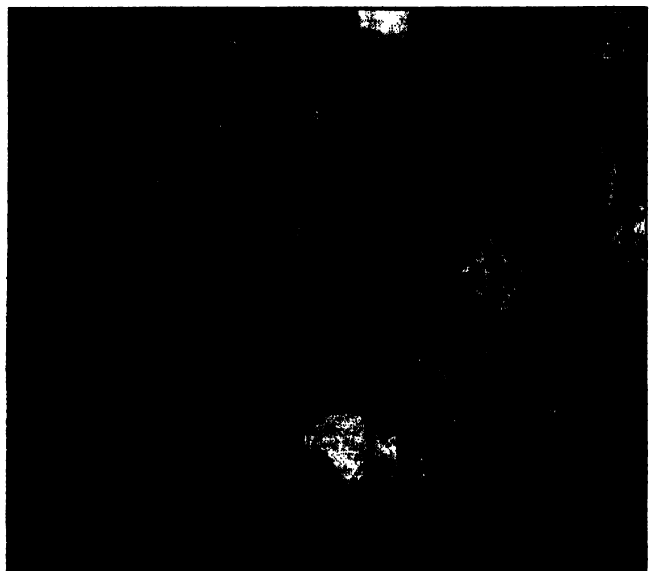
ভাদু গানের প্রতিযোগিতা আসর ছবি : জলেশ্বর পাত্র

কৃষিকাজ, বনজ কাঠ-পাতা-কন্দ সংগ্রহ, গোচারণ ইত্যাদি কাজে লোকালয়ের বাইরে পরিভ্রমণরত নারী-পুরুষ গায় বলেই এর নাম টাঁড় ঝুমুর। অমার্জিত ভাষায় দেহজ প্রেমের বর্ণনামূলক এই গানগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রেমসঙ্গীত।

একটি সীমাবদ্ধ পরিসরের নিবন্ধে মেদিনীপুরের মত বিশাল জেলার লোকায়ত জীবন ও তার সংস্কৃতির চিত্রায়ণ সম্ভব নয়। মুখ্য উপাদানগুলির মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা হোল। কয়েকটির অন্তত নামোল্লেখ করা প্রয়োজন।

আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে নাচ ও গান জীবনের অঙ্গ। কয়েকটি নাচ—পাতানাচ, কাঠিনাচ, ভূয়াং, চাং নাচ, দণ্ডড়ে, লাগুড়ে, সাড়পা, যাদুর, জাওয়া, করম, ঝিকা, চৈরা, দাশাঁয়, ভুংকুট, র‍্যাগড়া, নাচনি ইত্যাদি।

গানের মধ্যে কয়েকটি—ঝুমুর, টুসু, ভাদু, বিহাগীতি, কাঁদনাগীতি, সারগা, চুটকা ইত্যাদি সহ সবরকম নাচের গান।

লোকায়ত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়ের কথাও বলা দরকার। মেদিনীপুর জেলার লৌকিক দেবদেবী এবং লোকউৎসব ও মেলা। বিশদ আলোচনার অবকাশ না থাকায় এগুলিরও একটি তালিকা পেশ করছি আমরা।

লৌকিক দেবদেবী : (তালিকাটিতে দেবদেবী, গ্রাম ও ব্লকের নাম ক্রমান্বয়ে থাকছে) বাঘুৎ (চাঁদাবিলা / সদর ব্লক), হাউড়ি মা (আনন্দপুর / কেশপুর), বীরঝাপট (ঐ), ভানসিং (নতুনবাজার / কেশপুর), হরিয়াবুড়ি (হরিয়াতাড়া / খড়গপুর-১) বাঘাসিনি (কলাইকুণ্ডা / খড়গপুর-১), হিড়িম্বেশ্বরী (ইন্দা / খড়গপুর শহর), ললিত কুমারী (রানীচক / কাঁথি), রক্তাবতী (নামালডিহা / কাঁথি), মেন্যাঝি (মনোহরপুর / দাঁতন), রাই ঠাকুরানী (বাসুদেববেড়িয়া / কাঁথি), জ্বরাপাত্র (নামালডিহা / কাঁথি), কালষণ্ডা (দেউলি / শালবনি), বুড়াকুদরা (আমলাতলি / গড়বেতা), কুনেবুড়ি (ক্ষীরপাই / চন্দ্রকোনা), ব্রহ্মানীদেবী (নারায়ণগড়), জীমূতবাহন (লাড়সা / নারায়ণগড়), মঙ্গেশ্বরী (আমদাবাদ / নন্দীগ্রাম), বুড়াবুড়ি (বড়াবুড়ি / ভগবানপুর), ফুলমণি (এল্লাবনি / সদর), মেনানী বুড়ি (বাগডুবি / সদর), সীতাবালা (কংকাবতী / সদর), হাতিধরা (এনায়েৎপুর / সদর), পাঁচমুড়ি (লাহাটিকরি / সদর), কালকুদরা (গোয়ালতোড়), কালুয়াষাড় (নয়াগ্রাম), সাতাঁই বুড়ি (ডাহি / নয়াগ্রাম) কুয়ানি ঠাকুর (চৌকাপাথরা / নয়াগ্রাম), কলমাবুড়ি (কলমা পুকুরিয়া / নয়াগ্রাম), কুমার সাহেব (লাউদহ সাঁকরাইল), বীরবাঁকুড়া (রামানন্দপুর / সাঁকরাইল), যমুনাবুড়ি (ঐ), কাল মহাজন (বহড়াদাড়ি / সাঁকরাইল) ইত্যাদি। এছাড়া, বিভিন্ন গ্রামের বড়াম ঠাকুর, সাতবহনি। এবং সর্বশেষ বিভিন্ন নামের সিনিদেবতা—ঘাঘরাসিনি, গাড়রাসিনি, লাপুড়িয়াসিনি, পাথরাসিনি, মদনাসিনি, ঝাড়বনিসিনি, দুয়ারসিনি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই তালিকা নেহাতই সংক্ষিপ্ত তালিকামাত্র।

লৌকিক দেবদেবী ও বিবরনির্ভর মেলার একটি সংক্ষিপ্ততম তালিকা : কানাইসর (বিনপুর), তুলসীজাত (নারায়ণগড়), পাটাবিঁধা (বিনপুর), আইখ্যান (বিনপুর), খুঁটান (বিনপুর), পাণ্ডবঘাট (দাঁতন), ছাতুপিণ্ড (গোপীবল্লভপুর), জাঁতাল (সাঁকরাইল), তালবেতাল (গোপী-১), স্বর্গ বাউরি (জামবনি), শালুই (গড়বেতা), কেদার (ডেবরা) ইদ (পিলদা, ঝাড়গ্রাম) ধর্মরাজ (ময়না), কালীয়দমন (দাসপুর), রঙ্কিনী (চন্দ্রকোনা), সখিসেনা (দাঁতন) ইত্যাদি। এছাড়া চড়ক, গাজন, মকর, লৌকিক দেবদেবীর পূজার মেলা, গঙ্গাপূজা, শীতলা পূজা, ভীমপূজা ইত্যাদিতে মেলা বসে বহু সংখ্যক গ্রামে।

আলোচনার পরিধি আর বৃদ্ধি না করে প্রান্ত ভূমির সংস্কৃতি বিষয়ে দু-চার কথা বলা যেতে পারে। তার পূর্বে সমগ্র মেদিনীপুর জেলার প্রচলিত লৌকিক খেলাধূলার দিকেও একবার দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

লৌকিক খেলাধুলা

খেলাধুলার জগৎ শিশুমনের মুক্তির জগৎ। এই খেলাধুলার জগতে শিশু স্বাধীন। শাসক বা নিয়ন্ত্রক না থাকায় নিজের স্বাধীন, মুক্ত ইচ্ছার রূপদান করা সম্ভব হয় তার পক্ষে। শিশুর মন স্বভাবতই অনুকরণপ্রিয়। বড়দের কাজকর্ম, আচার-আচরণের অনুকরণ তারা খেলাধুলার মধ্যে করে। সেজন্য বলা হয় যে, লৌকিক খেলাধুলামাত্রই এক-একটি বিশেষ সময়কালের জীবনের দর্পণ। বলা হয়—'সমাজে যা ছিল না কিংবা নেই তা নিয়ে কখনও কোনও লৌকিক ক্রীড়া সৃষ্টি হয়নি।' এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা হয়ে থাকে যে 'অধুনালুপ্ত অনেক সমাজচিত্র ও জীবনসংগ্রামের হদিস আমরা পেয়ে যেতে পারি লৌকিক ক্রীড়াগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে যেমন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান, দলিল-দস্তাবেজ এবং আরও অনেক কিছুকে গ্রহণ করা হয়, তেমনি হয়তো লৌকিক ক্রীড়াও একদিন ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে গৃহীত হতে পারবে।'

বিস্তৃত আলোচনার পরিসর না থাকায়, মেদিনীপুর জেলায় প্রচলিত লৌকিক খেলাধুলার তালিকা থেকে একশোটি খেলার একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা পেশ করা হল : অষ্টা, আশপাশ, আবদুল (আমপাকা, আমকুল), আঁইসা বঁটি, ইন্জিক ম্যাজিক, ইকিড় মিকিড়, ইচিং বিচিং, ইয়েস খেলা, উজ্জিক ম্যাজিক, উদমাছ, একাদোক্কা, এলাটিং বেলাটিং, কঞ্চি চালা, কাঁঠাল চোর, কান ফুসফুস, কলফা, কড়িখেলা, কাজলপাতি, কানামাছি, কাবাডিম, কাতিখেলা, কুকুর লাঠি, কুমির কুমির, কুলা খেলা, কিতকিত, খইদই, খাঁচিখোঁজ খেঁচা খেলা, গছু গছু, গাইবাছুর, গাছমাকড়ি, গাদি, গাড়াগাড়ি, গরম মুড়ি, গাছ খেলা, গাছপাকুড়, গিল্লি ডাং, গুজি খেলা, গুটিখেলা, গোবর ডাং, গোল্লাছুট, ঘুরঘুর মাটি, চামচিকি, চি খেলা, চিকা খেলা, চিনি বিস্কুট, ছেলকা, জোড় খেলা, ঝাঁই ঝাপট (বা কাল ঝাপুট), ঝাড় বাঁদর, ডাংগুলি, ঢাপা, তালগাছ, তিনগুটি, তিরকাঁড়, দাড়িয়া

বাঁধা, নাচন, নাম পাতাপাতি, পঞ্চাশচোর, পতর খেলা, পদ্মখেলা, পাতাচুরি, পালকি খেলা, পিস্টু খেলা, পেকাটি খেলা, ফরিখেলা, ফলফলাবি, ফিঙ্গা খেলা, ফিসফিসানি, বউবসন্ত (বুড়ি বসন্ত), বাঘবন্দী (বা বাঘমারানি, বাঘছাগল), ব্যাঙ ছিলাতি, বাঁশপতরি, বুড়ি ধাড়ি, বুড়ি ছোঁয়া, বৌবাছকি, ভিজাবিঁধা, ভূত-পেত্নি, ভোগ খেলা, মাংস চুরি, মার্বেল, মোগল-পাঠান, যদুমধু, রসকষ মস্তক, রাজারানী, রাজাগজা, রামশ্যাম, রাম-লক্ষ্মণ, রুমালচুরি, লুকলুকানি, লাঠিগুপা, লুডো, সাতপতর, সীতাহরণ, সাতঘরিয়া, ষোলঘুঁটি, হাডুডু, হাটগাড়, হাঁড়িখেলা এবং হুসধাপ্পা।

এই সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে লৌকিক খেলাধুলার বিশাল বিপুল জগৎ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা হওয়া সম্ভব নয়। কিংবা সমগ্র জেলার সমূহ খেলার তথ্য সংগ্রহ করাও সহজ কাজ নয়। আবার খেলাটির কেবলমাত্র নাম থেকে অনুমান করাও সহজ নয়, কী গভীর সমাজ চেতনার তাৎপর্য এক-একটি খেলা বহন করে। যেমন, নাম থেকেই জানা সম্ভব নয় যে গাদি খেলার বয়স অন্তত দু-হাজার বছর। বাৎসায়নের কামসূত্র গ্রন্থে খেলাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশদ তথ্যের জন্য পাঠক 'বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস' গ্রন্থটির সাহায্য নিতে পারেন।

অধিকাংশ খেলার সঙ্গে ছড়া বলার রীতি আছে। তেমনই দুটি ছড়ার উল্লেখ করে, বিষয়টি শেষ করা যায় :

১। ইন্টু পিন্টু, পাপা সিন্টু
টানটুন খাসা, বেলে খুস ঠাসা
কে কত আনা নেবে বলে দাও না—॥

২। অনা অনা অনা / টাটকা দুধের ফেনা
শিব জটা জটা / বেগুন গটা গটা
হর পার্বতী / লক্ষ্মী সরস্বতী
রাম সীতার বিয়ে / সিঁথেয় সিন্দুর দিয়ে
অলকা বুক ঝলকা / অলকা ছাতি ঝলকা॥

প্রান্তভূমির সংস্কৃতি

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, মেদিনীপুর জেলার প্রশাসনিক সীমানার বারংবার বদল ঘটেছে। দীর্ঘকাল ওড়িশার রাজন্যবর্গ শাসন করেছেন এই অঞ্চল। দীর্ঘকাল জেলার বিস্তৃত এলাকা ওড়িশার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই ঐতিহাসিক কারণে, এবং সীমান্ত হওয়ার সুবাদে মেদিনীপুর জেলার ভাষা ও সংস্কৃতিতে ওড়িশার বিপুল প্রভাব। কেবলমাত্র কথ্য ভাষাতেই নয়, উৎসব-অনুষ্ঠানের লোকাচারে, খেলাধুলা বা ব্রতের ছড়ায়, লোকনাট্যের গানে, লোকসঙ্গীতের ভাষায়, সর্বত্রই ওড়িয়া ভাষার বিপুল প্রভাব মেদিনীপুর জেলার উপর। তার দু-একটি উদাহরণ দিয়ে বর্তমান নিবন্ধ সমাপ্ত করা হবে।

একটি ছেলেভুলানো ছড়া : টুক মাউসি, টুক মাউসি
তু যা মু যাউছি রুসি
নদীকু গলা, পানি পিইলা
ফুড়ুই করলা উড়ি গ-অ-লা॥

'বিহাগীত' সীমান্ত বাংলার বিশিষ্ট গান। বিবাহের পর প্রথম স্বামীর বাড়ি রওনা হওয়ার সময়, পরিবারের প্রিয়জনদের কাছে একে একে বিদায় নিতে গিয়ে কাঁদতে হয় নব পরিণীতা মেয়েটিকে। তার নাম কাঁদনা গীত। শৈশব থেকে এই গান রপ্ত হয় কুমারী মেয়েদের। তেমনই একটি গান—

ইলিশি মছর চেতরা কাঁটা, দাদা গো—
তত্তি দিব বলি কহিছ গটা, দাদা গো—
তত্তি নাই দিনে খাইমু খঁটা, দাদা গো—
কলসির পানি গড়াই থিনু, দাদা গো—
শিব মেল পতরি ছড়াই থিনু, দাদা গো—
শিব অই দলি ফুলমালাকু, দাদা গো—
মুই অই দলি সোনাহারকু, দাদা গো—
সোনা হার কি মহাস কল, দাদা গো—
রূপা হাররে কি বিদায়ি কল, দাদা গো—
দেব কহিথিল দেবতা পাশে, দাদা গো—
মন বেড়িথিল মোহর পাশে, দাদা গো॥

পালকি চড়ে শ্বশুরালয় রওনা হওয়ার গানটি সীমান্ত অঞ্চলে বহু প্রচলিত একটি সার্বজনীন কাঁদনা গীত। দীর্ঘ গানটির স্বল্প একটু অংশ-বিশেষ উল্লেখ করা হল :

উঠিলা সওয়ারি বসিলা নাহি, মাগো
ঘুরি চাঁইবাকু দিশিলা নাহি, মাগো
গুয়া গড়ি গলা ছাড়ি তলকু
মোতে হেজি দলা তলমালকু
ঢ্যাঙা তালগছ বাটকু ছাই
বড় ভাইকে মোর দেবু পঠাই
পালকি ভিতরে সিংঅ পানিয়া
দেখিলে কহিবে যাচা কনিয়া .....॥

সব শেষে একটু দুষ্প্রাপ্য গানের উল্লেখ করছি। বিদেশগত পুত্রের মৃত্যুতে গৃহবাসিনী মায়ের রোদন এই কাঁদনা গীতটি বর্ণমালানুসারে রচিত। তার একটু অংশ :

ক — কাঁদে সকল ধরণী
কেন গেলি মোর কুমরমণি
দরিদ্র রতন খনি—মো ধনরে।।

খ — খুঁজু অছি জাঁহি মেতে
কাঁহি আউ তোকে না হেরি নেত্রে
থিলু পুরাপুরি ক্ষেত্রে—মো ধনরে।।

গ — গলু তুই মোম্বাইকি,
সাথে নেলু কি শম্ভু ভাইকি মো ধনরে॥

ঘ — ঘরকে মনে না কলু
পর ঘর যাই জীবন দেলু—মো ধনরে॥

—ইত্যাদি।

আদিবাসী সমাজের জনপ্রিয় মোরগ-লড়াই খেলা

সীমান্ত এলাকার লোকনাটক 'সীতাচুরি', চিড়িয়া-চিড়িয়াণি, বাঘাম্বর কিংবা ললিতা পালাতে এই ভাষার প্রভাব পাওয়া যায়। প্রভাব আছে কৃষির লোকাচারের ছড়ায়। নল সংক্রান্তির ছড়া :

এইরে অছি ঝোটপাট।
সব পোকের মাথা কাট॥
এইরে অছি কেঁউ আদা।
ধান ফলবে গাদা গাদা॥

সর্বব্যাপ্ত লোকসংস্কৃতিকে সীমিত পরিসর নিবন্ধে চিত্রায়িত করা কঠিন কাজ। লোকায়ত জীবনের শরিক হতে পারলে তবেই তার অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। এই নিবন্ধে যে জলছবি আঁকার চেষ্টা হল, সে কেবল ছবির ইংগিতমাত্র।

গ্রন্থ-সূত্র

১। বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব) / নীহাররঞ্জন রায়
২। বৃহৎ বঙ্গ / দীনেশচন্দ্র সেন
৩। বাঙলা দেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ) / রমেশচন্দ্র মজুমদার
৪। লোকসংস্কৃতি কোষ / সম্পা. ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী
৫। লোকায়ত ঝাড়খণ্ড / ডঃ বিনয় মাহাত
৬। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি / বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি
৭। মেদিনীপুর / তরুণদেব ভট্টাচার্য
৮। লোকসংস্কৃতি / অনিমেষকান্তি পাল
৯। মেদিনীপুর : ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন / সম্পা. বিনোদশংকর দাশ
১০। বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস / ডঃ অসীম দাস
১১। বঙ্গীয় শব্দকোষ / হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১২। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি / বিনয় ঘোষ
১৩। বাংলার লৌকিক দেবতা / গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
১৪। পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা / সম্পা. অশোক মিত্র
১৫। মেদিনীপুর জেলার স্থাননাম / অর্ধেন্দুশেখর বালা
১৬। ORIGIN AND DEVELOPMENT OF BENGALI LITERATURE / Sunity Kumar Chottopadhya.
১৭। Proceedings of the Asiatic Society, June, 1869
১৮। News, Geological Survey of India Vol.-IX Part III 1978
১৯। Bengali District Gazeteers, Midnapore, L. S. S. O'Malley.
২০। Linguistic Survey of India, Sir George Grierson 1903Â

লেখক : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, গবেষক

রঘুনাথের মন্দিরের ভাস্কর্য, সাহেবদের এঞ্জিন চালনার দৃশ্য, আনন্দপুর — ছবি : তারাপদ সাঁতরা

সীতারাম জীউ মন্দিরে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যে নৌকায় তামাক্ সেবনরত সাহেব, আমেদপুর — ছবি : তারাপদ সাঁতরা

রঘুনাথ মন্দিরের টেরাকোটা ভাস্কর্য, কঁয়তা ছবি : তারাপদ সাঁতরা

পুঁথিসাহিত্যে মেদিনীপুর

ত্রিপুরা বসু

ত্রয়োদশ শতকের তাম্বুলি নরপতি প্রাণকরের পুত্র মেদিনীকরের নাম থেকে মেদিনীপুরের নামকরণ করা হয়েছে বলে ঐতিহাসিকদের অভিমত। 'মেদিনীমাতা' অথবা ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ কথিত, ঔরঙ্গজীবের কৃপাধন্য মৌলানা মুস্তাফা মদনী রহমতুল্লাহ সাহেবের নাম থেকেও মেদিনীপুরের নামকরণ করা হয়ে থাকবে। আইন-ই-আকবরির বিবরণ অনুযায়ী 'Midnapur a large city with two forts, one ancient and the other modern caste'. পর্তুগীজ ভ্রমণকারী ম্যানক্সির বর্ণনায় : "The kingdom of Bengala is composed of twelve provinces, Bengala, Angelin, Orissa, Jassore, Midnapur, Cartall, Bacala, Satimauras, Bulra, Dacca and Rajmahal." এইচ ভি বেলীর মতে "The people of Midnapur proper are generally composed of an amalgamated race, who can neither be called Bengalees nor Oriyas, but who are a mixture of both." মেদিনীপুর সম্পর্কে এইসব অভিমত প্রচলিত।

বলা বাহুল্য, এসব তাত্ত্বিক ভাষণ মেদিনীপুরের ইতিহাস রচনার জন্যে নয়। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে মেদিনীপুর জেলার স্বর্ণোজ্জ্বল অবদানের প্রসঙ্গ আলোচনার্থেই প্রাচীন মেদিনীপুর সম্পর্কে দু-এক কথায় 'গৌরচন্দ্রিকা' সম্পন্ন করলাম মাত্র।

শিলাবতী-রূপনারায়ণ-কংসাবতী-সুবর্ণরেখা নদীবিধৌত শাল, মহুয়া, পলাশের অরণ্যে সুশোভিত রাঙামাটির জেলা মেদিনীপুর, স্বভাবকবির কবিত্ববিকাশের সার্থকতম পটভূমিরূপে সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই তৈরি হয়ে আছে। এ জেলার উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের সুজলা-সুফলা মৃত্তিকা যেমন লিখিত সাহিত্যশিল্পকে সম্যকভাবে পরিপুষ্ট করেছে, তেমনি অরণ্য পরিশোভিত বর্তমানের ঝাড়গ্রাম বা প্রাচীন ঝারিখণ্ড ও তার আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের যে বহুবিধ শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটেছিল, তাকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। একদা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পূত পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল ডুলং নদীর অববাহিকা অঞ্চল, মেদিনীপুর সদর-দক্ষিণের কোনো কোনো অঞ্চল। সেই প্রেমময় অমৃতপুরুষের প্রভাবে এ জেলার শিল্প-সংস্কৃতি তো বটেই, পুঁথিসাহিত্যেও যেন এক বিপুল প্লাবন এসেছিল। সুপ্রাচীন বৌদ্ধ জৈন সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল মেদিনীপুর। পরবর্তী কালে ইসলামীয় সুফী মতবাদের ব্যাপক প্রভাবেও মেদিনীপুরবাসীর চিন্তাভাবনায় সাহিত্য-শিল্প নব নব রূপ লাভ করে। জেলার সেকালীন সামন্ত জমিদার ও রাজন্যবর্গ প্রতিভাধর কবিদের সম্মানজনক পদে বরণ করে নিজ নিজ সভায় স্থান দিয়ে তাঁদের কাব্যচর্চায় অনুপ্রাণিত করেছেন। কালের মহাপ্রান্তরে হারিয়ে গেছেন সেইসব গুণগ্রাহী রাজন্যবর্গ ও তাঁদের আশ্রিত কবিকুল। কিন্তু মহাকালের অযুত, অনিবার্য আঘাত সহ্য করে তাঁদের সৃষ্ট বিপুল পুঁথি সম্ভারের অনেকাংশ আজও টিকে আছে। তা থেকেই বোঝা যায়, বাংলাসাহিত্যে এ জেলার করুণা কি অপরিসীম।

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের তিনজন প্রতিনিধিস্থানীয় কবির সারস্বত-সাধনার ক্ষেত্র এই জেলা। এঁরা হলেন 'চণ্ডীমঙ্গল' রচয়িতা কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, 'শিবায়ন' রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য এবং মহাভারত অনুবাদক কাশীরাম দাস। সংস্কৃত সাহিত্য ব্যাকরণ ছাড়াও, বাংলা গদ্যসাহিত্যের উদ্ভবের ক্ষেত্রেও এ জেলার মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান চিরস্মরণীয়।

নানা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে পূর্ণ মেদিনীপুরের মাটিতে স্বভাবকবির দল যুগে যুগে সাহিত্যের নানা ফুল ফুটিয়েছেন। এখানে রচিত বা অনুলিখিত হয়েছে তালপাতা, তুলটকাগজ, ভূর্জপত্রের অসংখ্য পুঁথি, যার পূর্ণাঙ্গ তালিকাকরণ আদৌ সম্ভব বলে মনে হয় না। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর একদা এক অমূল্য উক্তি মেদিনীপুরবাসীকে গর্বিত করেছে : 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় মেদিনীপুর জেলাই প্রথম উনিশ মন পুঁথি দান করে।' প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মেদিনীপুরের অধিকাংশ পুঁথি বিনষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষ করে, ১৯৭৮-এর বন্যা এ জেলার পুঁথিসাহিত্যের চরম সর্বনাশ ঘটিয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দিই : দাসপুর থানার এরেটির মান্না পরিবারের অজস্র পুঁথির স্তূপ এবং বলিহারপুর গ্রামের ভট্টাচার্য পরিবারের বিপুল পরিমাণ বাংলা সংস্কৃত পুঁথি ৭৮-এর বন্যায় ধুয়ে যায়, যদিও এগুলি সংগ্রহ করার জন্যে একাধিকবার আগ্রহীজন সচেষ্ট হয়েছিলেন। গৃহস্বামীর অজ্ঞতা ও কীটের আক্রমণেও নষ্ট হয়েছে বহু পুঁথি, পাণ্ডুলিপি। পুঁথি মালিকের মৃতদেহের সঙ্গে দগ্ধ করা হয়েছে তার সংগৃহীত অজস্র পুঁথি। নদী বা পুষ্করিণীতেও অজস্র পুঁথি বিসর্জন দিয়ে একালের গৃহস্থ 'অসাধারণ পুণ্যকর্ম' সম্পাদন করেছেন। আজও রূপনারায়ণ সন্নিহিত ঘাটাল ও তমলুক মহকুমা, শিলাবতী-কংসাবতী-রূপনারায়ণ নদবেষ্টিত চেতুয়া পরগনা (বর্তমান দাসপুর, ঘাটাল, পাঁশকুড়া, ডেবরা, কেশপুর থানা), ক্ষীরপাই-চন্দ্রকোনা-শালবনী-সবং-পিংলা-ময়না থানার গ্রামগঞ্জে এবং বিশেষ করে বাঁকুড়া, হুগলি ও হাওড়া জেলা সন্নিহিত এলাকায় চেষ্টা করলেই পুরোনো পুঁথির খোঁজ মেলে। কাঁথি মহকুমার দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে, ওড়িষা সন্নিহিত গ্রামগুলিতে আজও এমন অনেক পুঁথি আছে, যেগুলি ওড়িয়া অক্ষরে লেখা হলেও তাদের বেশিরভাগেরই ভাষা বাংলা। কাঁথি শহরের এক শতাধিক বর্ষ প্রাচীন মুদ্রণালয় 'নীহার প্রেস'কে বলা যেতে পারে 'মেদিনীপুরের বটতলা'। এখান থেকে একসময় 'বঙ্গাক্ষরে উৎকলীয় ভাষার' বহু পুঁথি মুদ্রিত ও স্বল্পমূল্যে প্রচারিত হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, আশুতোষ সংগ্রহশালা, ভারতীয় যাদুঘর, এশিয়াটিক সোসাইটি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষৎ, নবাসন আনন্দ নিকেতন ছাড়াও জেলার মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষৎ, ঋষি রাজনারায়ণ পাঠাগার, তাম্রলিপ্ত মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে মেদিনীপুরের শত শত পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি। এছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত আছে বহু পুঁথি। পণ্ডিত পঞ্চানন রায়, অক্ষয়কুমার কয়াল, তারাপদ সাঁতরা, মালীবুড়ো, সুকুমার মাইতি, রাধারমণ সিংহ, তরুণ গবেষক শ্যামল বেরা সংগ্রহ করেছেন অজস্র পুঁথি। বর্তমান লেখকও জেলার নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করেছেন সহস্রাধিক পুঁথি ও প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। ঝাড়গ্রামের রোহিণী রামনারায়ণ পাঠাগার এবং গোপীবল্লভপুর আশ্রমেও সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথির সংখ্যা কম নয় বলে শ্রুত।

জেলার পুঁথিচর্চার অন্যতম দিক পুঁথিচিত্র ও পাটাচিত্র। মহিষাদল রাজবাড়িতে রক্ষিত ফার্সী পুঁথি 'শাহনামা'র চিত্রালঙ্করণ, কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত মেদিনীপুর থেকে প্রাপ্ত দুটি চিত্রিতপাটা (চৈতন্যের কীর্তনদৃশ্য ও শিবপার্বতী), মহিষাদলের রাণী জানকীদেবীর নামযুক্ত, হিন্দীভাষায় নাগরী অক্ষরে ১৭৭২-এ লিপিকৃত এবং ১৫২টি বহুবর্ণের চিত্রে শোভিত তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস', পঞ্চানন রায় সংগৃহীত দশাবতার চিত্রিত দুটি পাটা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

ওপার বাংলার বিভিন্ন পুঁথিশালায় মেদিনীপুরের পুঁথি-পাণ্ডুলিপি সযত্নে রক্ষিত। এরমধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের' কয়েকটি পুঁথির কথা উল্লেখ করি।

এগুলির মধ্যে আছে বীরসিংহ গ্রামে, বিদ্যাসাগরের জন্মের অনেক পূর্বেই অনুলিখিত কয়েকটি পুঁথি—কৃত্তিবাসের 'গয়াতীর্থকথা', 'মহীরাবণ বধ', অভিরাম দ্বিজের 'জৈমিনীভারত অশ্বমেধপর্ব' (১০৮২ বঙ্গাব্দ), কাশীরাম দাসের মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব (১০৮৬ থেকে ১২৬৩ বঙ্গাব্দ), দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'অঙ্গদের রায়বার', 'দাতাকর্ণ', 'কম্বমুনির পারনা', 'কপিলামঙ্গল', 'একাদশীর ব্রতকথা', 'ধ্রুবচরিত্র', 'পারিজাত হরণ', 'প্রসাদ চরিত্র', গোপাল দাসের 'গুরুদক্ষিণা' (১০৮৭ ব.), দ্বিজ মধুকণ্ঠের 'জগন্নাথ বন্দনা', দেবকীনন্দনের 'বৈষ্ণববন্দনা', বৃন্দাবন দাসের 'ভক্তিচিন্তামণি', নরসিংহ দাসের 'হংসদূত' ইত্যাদি। অর্থাৎ সেকালের বীরসিংহ (ঘাটাল থানা) ছিল পুঁথি লিখন-পঠনের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। এছাড়াও বরেন্দ্র মিউজিয়ামে আছে নন্দীগ্রামে ১১০৩ বঙ্গাব্দে লিপিকৃত কৃত্তিবাসের 'সুবাহুর পালা' (নং ৫৮) ও ঘাটাল থানার তাৎকালিক রাজা শোভা সিংহের শাসনভুক্ত চেৎবরদা পরগনার রানীর বাজারে ১২১৮ বঙ্গাব্দে লিপিকৃত দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'অক্রূরাগমন' পুঁথি। বরানগর পাঠবাড়ি আশ্রমে রক্ষিত কয়েক হাজার পুঁথির মধ্যে এই জেলায় রচিত ও অনুলিখিত পুঁথির সংখ্যাও কম নয়। এইসব পুঁথির পুষ্পিকার বিবৃতি থেকেই জানা যায়, জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়েছিল পুঁথি লেখন ও পঠনের কেন্দ্র। এক সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, সীমান্ত লেখক যোগেশচন্দ্র বসু লিখেছেন, 'পিংলার কৈলাসেশ্বর বসু বাং ১২০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৯২ সালে লোকান্তরিত হন। তিনি ১২৫৫ সালে (১৮৪৮ খ্রীঃ) মহাভাগবতের এবং ১২৭০ সালে অদ্ভুত রামায়ণের পদ্যানুবাদ করেন। 'প্রণতি পুষ্পাঞ্জলি' নামে তাঁর একখানি কাব্যগ্রন্থও আছে (মেদিনীপুরের ইতিহাস, ২য় সং, পৃঃ ২৪৪)।' কবির পিতা বারাণসী, পিতামহ যাদবেন্দ্র। কবির কাব্যে প্রদত্ত কাব্য রচনার 'প্রহেলিকা'টি বিশ্লেষণ করে যে ১৫০৭ শকাব্দ (বা ১৫৮৬ খ্রীঃ) পাওয়া যায়, তার সঙ্গে কিন্তু যোগেশচন্দ্র বসুর হিসাব মেলে না। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এঁকে ১৬শ শতকের মানুষ বলেছেন। পুঁথির ভাষাও এর প্রাচীনত্বের প্রমাণ দেয় না। তবে কবি যে অন্ত্যমধ্যযুগের কবি ছিলেন, তা বোঝা যায় ১৭১৭ শকাব্দে অনুলিখিত এবং মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত এঁর একখানি পুঁথি দেখে। সুতরাং মালীবুড়ো কথিত 'সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুঁথির' কবিরূপে কৈলাস বসুর দাবি আপাতত ঐতিহাসিক বিচারে যুক্তিহীন।

বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামের কয়েক পুরুষের বাস পরিত্যাগ করে, অত্যাচারী ডিহিদার মামুদ সরিপের নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চলে আসেন বর্তমান কেশপুর থানার (তাৎকালিক ব্রাহ্মণভূম পরগনা) আড়রাগড়ে রাজা বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে। বাঁকুড়া-পুত্র রঘুনাথ
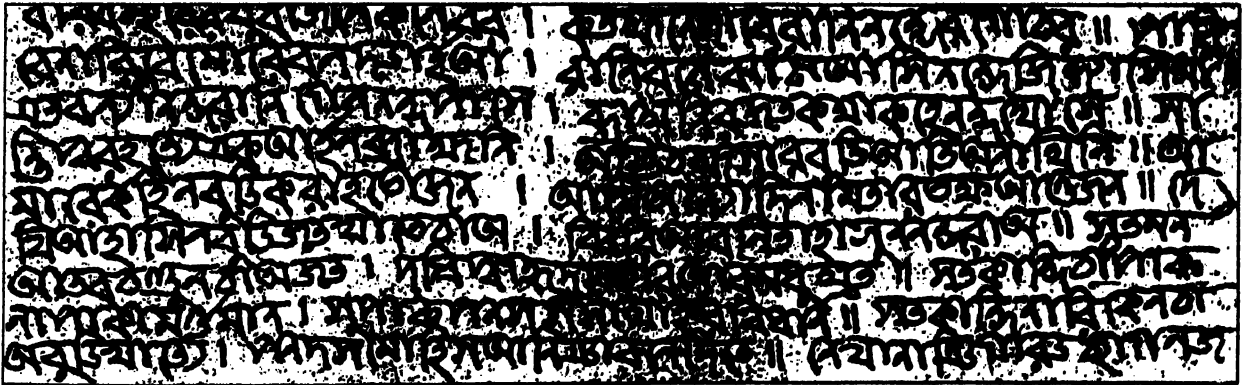
দাসপুর থানার কলাইকুণ্ড গ্রামের কবি শঙ্কর (১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দ) রচিত 'শীতলামঙ্গল' গোকুলপূজা পালা পুঁথির পত্র ছবি : লেখক

মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে চেষ্টা করলেই পাওয়া যায় আঞ্চলিক যাত্রাগান, বৈষ্ণব সাহিত্য, পদাবলী সাহিত্যের এমন সব পুঁথি, যেগুলির ভাষা বাংলা বা ওড়িয়া, কিন্তু অক্ষর বাংলা। গবেষক সুব্রত মুখোপাধ্যায় এই ধরনের কিছু পুঁথি সংগ্রহ করেছেন।

জেলার প্রাচীনতম পুঁথি কোনটি, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন কাজ। সদ্য প্রয়াত জেলার বিশিষ্ট গবেষক মালীবুড়ো (যুধিষ্ঠির জানা) কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত তাঁর এক রচনায় কৈলাস বসুর 'দেবী ভাগবত' পুঁথিটিকে এ জেলার 'সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুঁথি' বলে দাবি করেছেন। তাঁরই সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী কৈলাস বসু, ত্রিলোচন তর্করত্ন নামক এক পন্ডিতের সহযোগিতায় ঐ পুঁথি রচনা শুরু করেন। 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' রায়ের গৃহশিক্ষকরূপে, রাজনির্দেশে ও অনুপ্রেরণায় কবি ১৬শ শতকে রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত 'অভয়ামঙ্গল' বা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য। অরণ্যময় ব্রাহ্মণভূমের রাঙামাটি মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের এই বলিষ্ঠ ও প্রতিনিধিস্থানীয় কবির প্রতিভা বিকাশে সম্যকভাবেই সাহায্য করেছিল। তাঁর কাব্যের 'বণিকখণ্ড' ও 'আখেটিক খণ্ডে' ফুটে উঠেছে সমকালীন দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের অরণ্যনির্ভর এবং কৃষি-শিল্পনির্ভর নগরজীবনের বিশ্বস্ত চিত্র। কবির কাব্যটি তো সার্থকভাবেই ষোড়শ শতকের 'মেদিনীদর্পণ।'

দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেবী শীতলার মাহাত্ম্য কাহিনিমূলক অনেকগুলি কাব্যের পুঁথি রচনা করেছেন মধ্যযুগের মেদিনীপুরের কবিরা। 'শীতলামঙ্গল' নামে পরিচিত

এই কাব্যের আটখানি পালার পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে। কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, 'কবি শঙ্কর' কাব্যের বিভিন্ন ভণিতায় ইনি 'কাতরে কহেন কবি শঙ্কর' বলেছেন। ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানার (তাৎকালিক চেতুয়া পরগনা) কলাইকুন্ড গ্রামে ১৭শ শতকের শেষ দিকে কবি এক কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮শ শতকের প্রথম দিকে তিনি তাঁর কাব্যগুলি রচনা করেন। তাঁর রচিত শীতলামঙ্গল কাব্যের 'কৈলাসপূজা', 'লঙ্কাপূজা', 'গোকুলপূজা', 'নীলধ্বজরাজার পূজা', 'রসুদত্ত', 'গন্ধর্ব', 'বিরাট জাগরণ' পালা; এবং 'পঞ্চানন্দের গান', 'কামিক্ষার বন্দনা', 'সারদামঙ্গল', 'গঙ্গামঙ্গল', 'সত্যনারায়ণ পাঁচালি ফ্যাসরার পালা' ইত্যাদি পুঁথির একাধিক অনুলিপি মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে। কবির বর্ণনানুযায়ী ১১৪৪ বঙ্গাব্দে (১৭৩৭-৩৮ খ্রীঃ) বা ওই সমকালে তাঁর কাব্যগুলি রচিত হয়। বর্ধমান রাজ কীর্তিচন্দ্র এবং বর্তমান হাওড়া জেলার আমতা থানার (তাৎকালিক মণ্ডলঘাট পরগনা) কুলিয়া গ্রামের জমিদার ঠাকুরদাস চৌধুরি কবির কাব্যচর্চার অনুপ্রেরক ছিলেন। প্রাসঙ্গিকভাবে কবি 'বিরাট জাগরণ পালা' পুঁথিতে লিখেছেন—

'পরগনা মণ্ডলঘাটে ভাটোরার সন্নিকটে
কুল্যাগ্রাম মনোহর।
সেই কুল্যাগ্রামে বাস চৌধুরী ঠাকুরদাস
পুর্ণ্যশ্লোক দেবীর কিঙ্কর।।
তার পতিব্রতা নারী মোরে পুত্রস্নেহ করি
দিলা নানা বস্ত্র অলঙ্কার।
শীতলাচরণ সেবি কহেন শঙ্কর কবি
দেবী জারে হল্য ধ্বজাধর।।

তাৎকালিক সরকার মান্দারনের মন্ডলঘাট পরগনার (বর্তমানে হাওড়া জেলা) রূপনারায়ণ তীরবর্তী কুলিয়া-ভাটোরার জমিদার চৌধুরিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সেকালে যথেষ্টই ছিল। মোঘল যুগে রেশম ব্যবসায় প্রভূত বিত্তশালী হয়ে মন্ডলঘাট পরগনার জমিদারী ক্রয় করেন। কাব্য রচনার কাল উল্লেখ প্রসঙ্গে কবি 'পঞ্চানন্দের গান' পুঁথিতে লিখেছেন—

'সংগ্রাম দেবের সুত হরিদাস দেবখ্যাত
পশ্চিম মালিকা পূর্ববাস।
সুদাম দেব তার সুত পুণ্যশ্লোক গুণজুত
তাহার তনয় কৃষ্ণদাস।।
মাধবী জঠরে জন্ম সদা চেষ্টা গান কর্ম্ম
সন এগার চুয়াল্লিশ সালে।
কাতরে শঙ্কর বলে পূর্বজন্ম কৃপাবলে
পঞ্চানন্দ কৃপায় ছলিলে।।

'শীতলামঙ্গল' কাব্যের আর এক বহুখ্যাত কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর পুঁথি বটতলা থেকে একসময় মুদ্রিত হয়। তমলুক মহকুমার পাঁশকুড়া থানার মারোবেড়ে গ্রাম কবির আদি বাসস্থান। সেখান থেকে কবি পার্শ্ববর্তী খয়রা-কানাইচক গ্রামে চলে যান, তাৎকালিক কাশীযোড়া পরগনার (বর্তমান তমলুক মহকুমার উত্তরাংশ) রাজা রাজনারায়ণ প্রদত্ত ভূসম্পদ লাভ করে। রাজনারায়ণের সভাসদরূপেই কবি তাঁর কাব্যগুলি রচনা করেন। ১১৬১ বঙ্গাব্দ বা (১৭৫৪-৫৫ খ্রীঃ) ওই সময়ের কাছাকাছি তিনি শীতলামঙ্গল কাব্যের 'স্বর্গপালা', 'কিষ্কিন্ধ্যাপালা', 'অযোধ্যাপালা', 'মগরাজার পূজাপালা', 'গোকুলপালা', 'পাতালপালা', 'লঙ্কাপালা', 'বিরাট জাগরণ' পালার পুঁথিগুলি রচনা করেন। তাঁর শীতলামঙ্গল প্রথম মুদ্রণ-সৌভাগ্য লাভ করেছিল বলে তিনি ওই কাব্যধারার সর্বাধিক প্রচলিত কবি। মেদিনীপুরের শীতলামঙ্গল গায়করা অনেকেই আজও তাঁর পালাগুলিই গেয়ে থাকেন। কবি লিখেছেন—

'কাশীযোড়া মহাখান মহারাজা নরনারাণ
রাজনারায়ণ তাহার নন্দন।
তাহার সভায় রয়্যা শীতলা আদেশ পায়্যা
দ্বিজ নিত্যানন্দের ভাষণ।।'

কাব্যরচনার কাল সম্পর্কে কবি 'গোকুলপালা' পুঁথিতে লিখেছেন—

'সন এগার একষট্টি আটাশ্যা আশ্বিনে।
শুক্লপক্ষ তিথি তার শনিবার দিনে।।'

অর্থাৎ ১১৬১ বঙ্গাব্দে (১৭৫৪-৫৫ খ্রীঃ) ২৮ আশ্বিন, শনিবার শুক্লপক্ষ তিথিতে কবির ওই কাব্যটি রচিত হয়।

'শীতলামঙ্গল' কাব্যধারার শেষ দিককার কবি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রচিত 'বিভাপালা', 'মগরাজার পূজাপালা', পাতালপূজা', 'লঙ্কাপূজা', 'বিরাট জাগরণপালা', 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী', 'পঞ্চানন্দের গান', 'দেবী লক্ষ্মীর গীত' ইত্যাদির পুঁথি মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার নানাস্থান থেকে পাওয়া গেছে। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানার ক্ষেপুত-উত্তরবাড় গ্রামে কবি এক সাহিত্যপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে কবির জন্মস্থানটি 'কৃষ্ণবাটি' নামে পরিচিত হয়। অক্ষয়কুমার কয়াল এবং তারাপদ সাঁতরা কবির লেখা কয়েকটি নির্ভরযোগ্য পুঁথি উদ্ধার করেছেন। কবির বর্ণনানুযায়ী রূপনারায়ণ নদ সন্নিহিত মেদিনীপুর ও হাওড়া

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে অনুলিখিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য রচিত বাংলা সংস্কৃত ভাষায় লেখা তুলটের পুঁথির পত্র ছবি : লেখক

জেলার গ্রামগুলি ছিল নানাদিক থেকে সমৃদ্ধ। ক্ষেপুত, ভাটরা, তড়া, গোপালনগর ও শ্রীবরা গ্রামের সমৃদ্ধির চিত্র কবির বর্ণনায় বারবার ফুটে উঠেছে। বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্রের আনুকূল্য লাভে কবি ধন্য হন। 'শীতলামঙ্গল' কাব্যের পুঁথিতে কবি লিখেছেন—

'ক্ষেপুত ভাটরা তড়া গোপালনগর শ্রীবরা
পঞ্চপাটে পঞ্চ ভট্টাচার্য্য।
দেব অনুগ্রহে কবি এ পঞ্চপণ্ডিত সেবি
তবে কৈল কবিতায় ধার্য্য।।
রুক্মিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য তড়াবাসী বিদ্যাধুর্য
তার আজ্ঞা করিয়ে পালন।
ভট্ট সার্বভৌম বাসে রামায়ণ রবিশেষে
সপুস্তকে মন্দির দহন।।
গাঙ্গেশ ভট্টাচার্য্য ঋষি গোপালনগর বাসী
শুক্রাচার্য মুনির সমান।
বুঝিয়া কবিত্ব হিত কৃপা করি যথোচিত
তিনি মোর চিন্তিল কল্যাণ।।
ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য বৃহস্পতি সম ধুর্য
শ্রীপাট শ্রীবরা নিবাসিত।
প্রথম কবিত্বভাগে তার আশীর্ব্বাদ মাগে
শতদ্বিজ গোষ্ঠীর সহিত।।
বাঞ্ছারাম বিদ্যাবাগীশ ভালে চন্দ্র যেন গিরীশ
পুত্র পৌত্র পন্ডিত প্রবর।
ভাটোরা ভবনে বসি অবিরত দিবানিশি
নানা শাস্ত্র শিখালে বিস্তর।।'

উদ্ধৃতাংশটি থেকে পূর্ব সীমান্তবর্তী মেদিনীপুর ও পশ্চিম হাওড়ার অনালোচিত ইতিহাসের সন্ধান মেলে। দুঃখের বিষয়, তড়াগ্রামের রুক্মিণীকান্তের গৃহদাহ না হলে হয়তো তাঁর অনূদিত রামায়ণ কাব্য বাংলাসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধিতে সহায়তা করতো।

বর্ধমানরাজের প্রশংসায় কবি পঞ্চমুখ হয়ে লিখেছেন—

'বর্দ্ধমান অধিপতি কীর্তিচন্দ্র নরপতি
চিত্রসেন পুত্র ধনুর্দ্ধর।
কীর্তিচন্দ্র কনেষ্ঠ ভ্রাতঃ মিত্রসেন নরনাথ
তিলকচন্দ্র পুত্র রাজ্যেশ্বর।।
ভকতিতে তেজচন্দ্র স্বর্গের যেন রাজা ইন্দ্র
প্রতাপচন্দ্র তাহ্যর নন্দন।
সে রাজার রাজ্যতটে ক্ষেপুতে ক্ষেপাইপাটে
কৃষ্ণকিঙ্কর করিল রচন।।

এখানে কবি ক্ষেপুতগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'ক্ষেপাই'এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

কাব্যরচনার কাল নির্দেশ করে কবি লিখেছেন—

'ইন্দুমুখে মাটি চষে সমুদ্রে আকাশ ভাসে
বড় এই অদ্ভুত কথন।
সেই সনে এই গীত কৃষ্ণকিঙ্কর বিরচিত
শুনহ সকল সভাজন।।'

ইন্দু = ১, সমুদ্র = ৭, মাটি = ১, আকাশ = ০; এই হিসাব অনুযায়ী ১১৭০ বঙ্গাব্দ (১৭৬৪ খ্রীঃ) কবির কাব্যরচনার কাল।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে তমলুক মহকুমার (কাশীযোড়া পরগনা) কিশোরচক গ্রামে (পাঁশকুড়া থানার কোলাঘাট ব্লকের ভোগপুর অঞ্চল) কবি দয়ারাম দাস জন্মগ্রহণ করেন। দেবী সরস্বতীর বন্দনামূলক আখ্যানকাব্য 'সারদা চরিত' রচনা করে কবি খ্যাতি লাভ করেন। 'ধুলাকুট্যার পালা' নামে পরিচিত এই কাব্যটি বেশ কিছুদিন পূর্বে ইংরেজি অনুবাদসহ প্রকাশিত হয় (Journal of the Dept. of Letters, Cal. University, XXIII and XXIX.)। কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কাশীযোড়া পরগনার রাজা নন্দনারায়ণ বা নরনারায়ণ। বর্তমানের সাক্ষরতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দয়ারামের আলোচ্য কাব্যটিকে অনেকাংশে 'রিয়ালিস্টিক' বলা যেতে পারে; যেমন শঙ্করের রেশমশিল্প সম্পর্কিত 'কামিক্ষ্যার বন্দনা পুঁথিটি। আঠারো শতকের শেষদিকে দয়ারামের 'সারদা চরিত' রচিত হয়। তাঁর লেখা 'লক্ষ্মীচরিত্র' পুঁথির কথাও শোনা যায়।

এ জেলার আর এক যশস্বী কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী সতেরো শতকের শেষদিকে ঘাটাল মহকুমার তাৎকালিক চেৎবরদা পরগনার আটঘরা গ্রামে আবির্ভূত হন। বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের আনুকূল্য লাভে কবি ধন্য হন বলে নিজের পুঁথিতেই ঘোষণা করেছেন। 'বণিকখন্ড' ও 'আখেটিক খন্ড' যুক্ত তাঁর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্য ১৮শ শতকের ২য় বা ৩য় দশকে রচিত হয়। তাঁর 'শীতলামঙ্গল' কাব্যও ওই সময়ের রচনা। 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্যের দুটি অংশ তিনি ১১৮১ বঙ্গাব্দ (১৭৭৪-৭৫ খ্রীঃ) ও ১১৮৩ বঙ্গাব্দ (১৭৭৬-৭৭ খ্রীঃ) রচনা করেন।
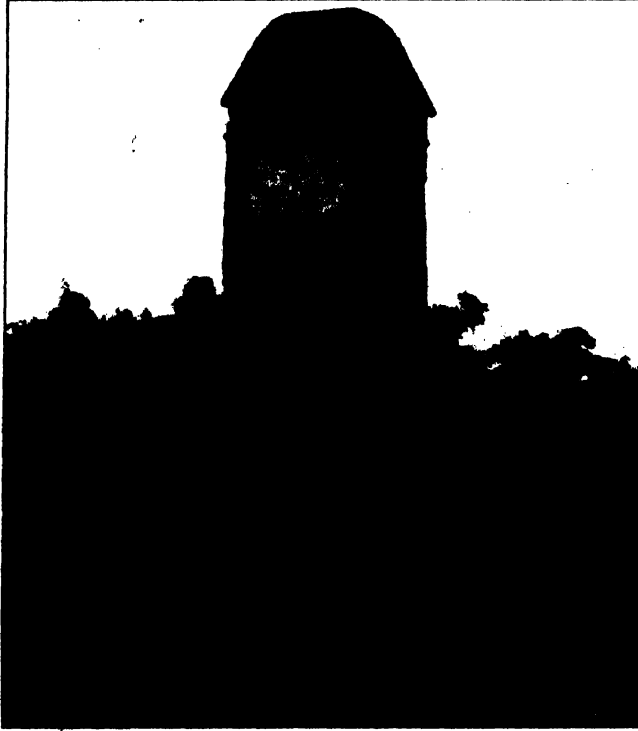
মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত, শিবায়ন রচয়িতা কবি রামেশ্বরের স্মৃতিস্তম্ভ ছবি : লেখক

জেলার আর এক প্রতিনিধিস্থানীয় কবি, 'শিবায়ন' বা 'শিবমঙ্গল' রচয়িতা রামেশ্বর চক্রবর্তী ভট্টাচার্য, বর্তমান ঘাটাল মহকুমার (তাৎকালিক চেৎবরদা পরগনা) যদুপুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আবির্ভাবকাল সতেরো শতকের ছয় বা সাতের দশক। 'শিবমঙ্গলের' একস্থানে কবি লিখেছেন—

'পূর্ববাস যদুপুর হিম্মৎ সিংহ ভাঙেযারে
রাজা রাম সিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশিকীতটে বসিয়া পুরাণপাটে
আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গীত।।'

চেৎবরদার প্রতাপশালী নরপতি শোভাসিংহের ভ্রাতা হিমৎ সিংহের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে কবি সপরিবারে স্বগ্রাম ত্যাগ করে চলে যান বর্তমান মেদিনীপুর শহরের কয়েক কিমি উত্তরে কর্ণগড়ে, রাজা রাম সিংহের আশ্রয়ে। কবির এই গ্রাম ত্যাগের মধ্যেই নিহিত ছিল সৌভাগ্যের ইঙ্গিত। রাজা রাম সিংহের উপাসিতা দেবী মহামায়া ও উপাস্য দণ্ডেশ্বর শিবমন্দিরে আশ্রয় নিয়ে রাজানুকূল্যে, কবি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত শিবায়ন বা 'শিবমঙ্গল' কাব্য। কাব্যরচনার কাল কবির বর্ণনামত ১৭১২ খ্রিস্টাব্দ। পৌরাণিক শিব-পার্বতী কাহিনির এমন অসাধারণ লৌকিকরূপ প্রদান কবিকে আধুনিক যুগেও কালজয়ী করে রেখেছে। গ্রামত্যাগের পূর্বে কবি একটি 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' রচনা করেন। কলকাতার বইপাড়ায় এটি আজও অতি প্রচলিত সত্যনারায়ণ পাঁচালী। এর একটি অসাধারণ উক্তি আজও তাৎপর্যময়—'যবনান্ত জাতিভেদ না থাকিবে আর।' অর্থাৎ দূরদ্রষ্টা কবি আঠারো শতকের প্রায় অন্ধকার প্রথম পর্বেই মানসচক্ষে দেখেছিলেন, জাতিভেদের মত ঘৃণ্য সামাজিক আচার একদিন লুপ্ত হবেই।

জেলার আর এক কবি কবিবল্লভ (ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্তৃক সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় আলোচিত কবি কবিবল্লভ পৃথক ব্যক্তি বলে সঙ্গত কারণে অনুমিত।) ঘাটাল মহকুমার চেতুয়া পরগনার (দাসপুর থানা) বৈদ্যপুর গ্রামে আঠারো শতকের প্রথম দিকে আবির্ভূত হন। কবির প্রকৃত নাম জানা যায়নি। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ বা ওই সময়কালে 'শ্রীগোপনন্দন' (কবি বোধহয় জাতিতে 'গোপ' বা 'সদগোপ' শ্রেণিভুক্ত ছিলেন। অথবা শ্রীগোপ কবির পিতাও হতে পারেন।) কবিবল্লভ শীতলামঙ্গলের 'লবকুশপালা', 'পাতালবর্গ', 'নন্দালয় পালা', চন্দ্রকেতু পালা' ইত্যাদি পুঁথিগুলি রচনা করেন। এ ছাড়া 'দক্ষিণ রায়ের উপাখ্যান' ও 'কালুরায়ের গীত' নামে দুটি পুঁথিও তিনি রচনা করেন।

ঘাটাল মহকুমার 'রানীর বাজার' গ্রামের কবি শঙ্কর কবিচন্দ্র আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে, ১৬৮১ শকাব্দ বা

রামেশ্বর ভট্টাচার্য রচিত 'শিবায়ণ' মৎস্যধরা পালা পুঁথির পত্র লিপি, সাল ১২২১ বঙ্গাব্দ (১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ) ছবি : লেখক

১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে শিশুরক্ষক লৌকিক দেবী ষষ্ঠীর মাহাত্ম্য কাহিনিমূলক কাব্য 'ষষ্ঠীমঙ্গল' পুঁথি রচনা করেন। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'নিদয়ার সাধভক্ষণ' অংশটি অনুসরণে কবি 'ছোটরাণীর সাধভক্ষণ' বর্ণনা করেছেন। ওই এলাকারই আর এক কবি দ্বিজ হরিরামের 'আদ্রিজামঙ্গল' কাব্যের উল্লেখ করেছেন ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে। পণ্ডিত পঞ্চানন রায় তাঁর 'ঘাটালের কথা' বইতে ১১৪৩ বঙ্গাব্দে লিপিকৃত, সতেরো শতকের কবি দ্বিজ গঙ্গাদাসের 'অভয়ামঙ্গলের' কথা বলেছেন। এই কাব্যে বরদার রাজা দলপতি (বা দলপৎ সিং)র উল্লেখ দেখে অনুমান, তিনি ঘাটাল অঞ্চলেরই মানুষ ছিলেন।

প্রান্তীয় রাঢ়ভূমির ঘাটাল এলাকায় 'রাঢ়ের জাতীয় দেবতা' ধর্মঠাকুরের পূজা যথেষ্ট প্রচলিত। এখানকার কবিরা ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কাহিনিমূলক 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যও রচনা করেন। এঁদের মধ্যে কবিরত্ন রচিত 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের 'জালন্দা', 'শালেভর', 'সুরিক্ষা' ও 'হস্তীবধ' পালার পুঁথির খোঁজ দিয়েছেন গবেষকরা।

ড. সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে, 'পদ্মপুরাণের' কয়েকটি উপাখ্যান নিয়ে রচিত 'দেবী মাহাত্ম্য' কাব্যের রচয়িতা দ্বিজ মুকুন্দ কবিভূষণ ছিলেন মেদিনীপুর জেলার মানুষ। তাঁর রচিত এবং ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে লিপিকৃত 'মাধবচরিত্র' পুঁথি পাওয়া গেছে। এর রচনাকাল ১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দ।

সূর্যপুত্র জীমূতবাহনের ব্রত বা 'জিতাষ্টমীর পাঁচালী' রচয়িতা দ্বিজ শম্ভুরাম ছিলেন মেদিনীপুর শহরের নিকটবর্তী পাথরা রতনচক গ্রামের মানুষ। নাড়াজোলরাজ মোহনলাল খান ছিলেন কবির পৃষ্ঠপোষক। তাঁর রচিত 'অনন্তচতুর্দশী ব্রতকথার' পুঁথিও পাওয়া গেছে।

'সুবচনীর পাঁচালী' রচয়িতা মুরলীধর দাসের পুঁথিটির পুষ্পিকা থেকে জানা যায়, কবি গোয়ালপাড়া পরগনার কোলাগ্রামের মানুষ ছিলেন। তিনি কাশীযোড়া পরগনার রাজাদের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন বলে তাঁর পুঁথির বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে।

দ্বিজ রামপ্রসাদের 'সুবচনীর পালা' পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। 'মাধবলতা' ভণিতাবিশিষ্ট কবির 'সুবচনীর পালা' পুঁথি আমাদের হাতে এসেছে। ১৯শ শতকের মাঝামাঝি সময়ের রচনা এটি। ড. সুকুমার সেন এঁকে 'মহিলা কবি' বলেছেন। কিন্তু 'রচিল মাধবলতা কহিলেন ব্যাস' কথাটি থেকে কি তাই মনে হয় ? 'লতা' অর্থে 'তালিকা' নয় কি ?

'কালিকামঙ্গল' রচয়িতা বলরাম চক্রবর্তী কবিশেখর ছিলেন তমলুক মহকুমার কাশীযোড়ার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের (১৬৬৯ খ্রিঃ—১৯৯২ খ্রিঃ) সভাসদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এঁর পুঁথি আছে (নং ২৫৫৯)। কাব্যের 'দিগবন্দনায়' কবি কিরীটকোনার দেবী, বালিডাঙ্গার রাঢ়েশ্বরী, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যার বন্দনা করেছেন। ১৭শ শতকে রচিত এই কাব্যে খুরদা, ঝারিখণ্ড, বিষ্ণুপুর ইত্যাদি স্থাননাম দৃষ্ট হয়।

সম্প্রতি কবি অচ্যুতশেখরের 'গরুড়পুরাণ' পুঁথির কথা জানা গেছে (দ্রঃ 'পশ্চিমবঙ্গ' ২৩ নভেঃ ১৯৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত ড. সুকুমার মাইতির প্রবন্ধ)। তমলুক মহকুমার ময়না থানার কাঁচিচক গ্রাম থেকে উদ্ধারকৃত ১২২ পাতার তুলট কাগজের এই পুঁথিটির ভাষা ও রচনারীতি দেখে মনে হয়, কবি বঙ্গ-উৎকল সীমান্তবর্তী মেদিনীপুরের মানুষ ছিলেন। ওড়িশার যাজপুর, কটক, ভুবনেশ্বর, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন তীর্থস্থান এবং সবং থানার তুলসীচারা গ্রামের প্রসঙ্গ এতে দৃষ্ট হয়। কাব্যটি উৎকলীয় ভাষায় লেখা হলেও এতে আছে অজস্র বাংলা শব্দ।

তমলুকের নিকবর্তী মামুদপুর গ্রামের কবি কুঞ্জবিহারী দাসের 'সত্যপীর পাঁচালী', 'ফ্যাসরার পালা' একসময় স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল।

কবি জগন্নাথের 'আক্ষটির পালা' পুঁথির বর্ণনায় শীতলামঙ্গলের কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর প্রভাব বর্তমান। এটির রচনাকাল আঠারো শতক।

সত্যপীর পাঁচালীর অন্যতম কাহিনি নিয়ে রচিত, হিদারাম মাইতির 'মদনসুন্দর পালা'র একটি পুরোনো পুঁথির সন্ধান দিয়েছেন মালীবুড়ো।

ভাগবত অনুবাদক পরশুরাম রায়ের 'মাধবসঙ্গীত' বা 'সঙ্গীতমাধব'এর মুদ্রিত পুঁথিতে সম্পাদক লিখেছেন, "কবি ১৬শ শতাব্দীর মধ্য বা শেষভাগে কাঁথি মহকুমার চম্পাইনগর গ্রামে এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পার্শ্ববর্তী দ্বাদশকন্যা গ্রামের ক্ষত্রিয়-ভূস্বামী জনৈক শিখরশ্যামের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাগের মধ্যে মাধবসঙ্গীত রচনা করেন।" এ বিষয়ে ড. সুকুমার সেন মহাশয় কিঞ্চিত ভিন্নমত পোষণ করে কবিকে বর্ধমান জেলার মানুষ বলতে চেয়েছেন। তাই এ নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে। তবে কাব্যটিতে যে পরিমাণে উৎকলীয় শব্দ আছে, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক, ইনি বর্ধমান নয়, সীমান্ত মেদিনীপুরেরই মানুষ।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বলরাম কবিকঙ্কনের নাম উল্লেখ করে বলেছেন 'গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কনে।" তাঁর চণ্ডীপাঁচালী পুঁথির কথা কোনো কোনো গবেষক উল্লেখ করেছেন।

বিশ্বভারতী সংগ্রহে দ্বিজ কবিচণ্ডী রচিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যের পুঁথি আছে (নং ১০৫৪)। এই খণ্ডিত পুঁথির ভণিতায় কবি লিখেছেন, 'দ্বিজ কবি চণ্ডী কহে হরিপদাম্বুজে', 'দ্বিজ কবি চণ্ডীগান সেবি চক্রপাণি' ইত্যাদি।

'রচেন শ্রীচণ্ডীদ্বিজ কৃষ্ণগুণগান।
নৃপতি ছত্রসিংহের করিবে কল্যাণ।।'

অর্থাৎ, কবি মেদিনীপুরের তাৎকালিক বগড়ি পরগনার রাজা ছত্র সিংহের (১৮শ শতক) আনুকূল্য লাভ করেন। 'রচেন

শ্রীচণ্ডীদ্বিজ বেতায় বসতি' থেকে জানা যায়, কবি ছিলেন গড়বেতার অধিবাসী। তাঁর রচনারীতি এবং ছত্র সিংহের নামোল্লেখ থেকে বোঝা যায়, আঠারো শতকের গোড়ায় তিনি কাব্যটি রচনা করেন।

বৈষ্ণব পুঁথির জগতে মেদিনীপুরের অবদান অসামান্য। চৈতন্য পরবর্তী যুগের তিন প্রধান বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু যথাক্রমে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা তথা বিহার ও ওড়িশা সন্নিহিত মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। 'ঝারিখন্ড' নামে খ্যাত সেকালীন ঝাড়গ্রাম অঞ্চল শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীরসিকানন্দের প্রচেষ্টায় বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়। দ্বাদশ শাখায় বিভক্ত 'শ্যামানন্দী' বৈষ্ণব সম্প্রদায় সারা জেলায় বৈষ্ণবধর্মের বাণী প্রচার করেন। এরই প্রভাবে রচিত হয় বৈষ্ণব সাহিত্যের অসংখ্য পুঁথি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্যের বিশাল পুঁথিটি। বর্তমান মেদিনীপুর শহরের ২৪ কিমি পূর্বে কেদারকুন্ড পরগনার হরিহরপুর গ্রামে এক কায়স্থ পরিবারে সতেরো শতকের শেষদিকে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগবত অনুসরণে রচিত এই কাব্যে পয়ার ও ত্রিপদীছন্দে সমগ্র কৃষ্ণলীলা সহজ সরল ভাষায় বিবৃত। উৎকলীয় অক্ষরেও কাব্যটি অনুলিখিত হয়।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু বা 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরের নিকটবর্তী ধারেন্দা-বাহাদুরপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা কৃষ্ণ মন্ডল, জননী দুরিকা। যৌবনে সন্ন্যাসগ্রহণ করে তিনি বৃন্দাবনে চলে যান এবং শ্রীনিবাস ও নরোত্তম ঠাকুরের সঙ্গে একসঙ্গে সাধক শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র ও দর্শন অধ্যয়ন করেন। পরে, বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ঝারিখন্ড বা ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে আবির্ভূত হন। আলংকারিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য নরহরি চক্রবর্তী রচিত 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের ১৫শ তরঙ্গে, 'শ্যামানন্দ প্রকাশ ও অভিরামলীলাতে' শ্যামানন্দের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে শ্যামানন্দের 'উপাসনা সারসংগ্রহ', 'অদ্বৈততত্ত্ব', 'বৃন্দাবন পরিক্রমা' গ্রন্থগুলি বৈষ্ণবদর্শনের বিশিষ্ট সম্পদ। ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে শ্যামানন্দ ইহলীলা সম্বরণ করেন।

শ্যামানন্দ-শিষ্য রসিকানন্দের জন্মস্থান ঝাড়গ্রাম মহকুমার সাঁকরাইল থানার ডুলং নদীতীরস্থ রোহিণী গ্রাম। তাঁর জন্ম ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন জমিদার অচ্যুত পট্টনায়ক। তাৎকালিক ময়ূরভঞ্জরাজ বৈদ্যনাথ ভঞ্জ, নৃসিংহপুররাজ উদ্দন্ড রায় এবং পটাশপুর, পাঁচেটগড় ও ময়না রাজ্যের রাজপরিবার তাঁর নিকটে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত 'শাখা বর্ণন' ও 'রতিবিলাস' দুখানি বিখ্যাত বৈষ্ণবকাব্য। এগুলি উৎকলীয় অক্ষরেও বহুল সংখ্যায় অনুলিখিত হয়।

রসিকানন্দের প্রিয় শিষ্য ও সাধক শ্রীগোপীজনবল্লভ দাস ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৫৪ থেকে ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি রচনা করেন সাধক রসিকানন্দের জীবনীকাব্য "শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গল কাব্য।' এটি কেবল এক বৈষ্ণবসাধকের জীবনচরিত নয়। এটি ১৭শ শতকের ওড়িশা সন্নিহিত দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের এক ঐতিহাসিক নিদর্শন। চৈতন্য প্রভাবে ওড়িশা বৈষ্ণবধর্মের প্লাবনে প্লাবিত হয়। কিন্তু বালেশ্বর, মেদিনীপুর, সিংভূম, ময়ূরভঞ্জ ও কেওঞ্জর অঞ্চল সেই আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। এইসব স্থানের মানুষের মধ্যে 'জীবহিংসা', 'মদ্যপান', 'নরহত্যা' প্রভৃতি পাপকর্ম বেড়ে চলেছিল। নৃসিংহপুরের নিষ্ঠুর নরপতি সহস্রাধিক সাধুকে হত্যা করে

শতাধিক বছরের প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথির পত্র ছবি : লেখক

৭১৮টি কাঁথা সংগ্রহ করেন। এমন আরও বহু ঐতিহাসিক ও সামাজিক বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে বিবৃত। কবি লিখেছেন—

'সাধুজন হিংসা করি যত দ্রব্য আনে।
মদ মাংস খায় আর দেই বেশ্যাগণে।।
নানাপূজা করে তারা করিয়া স্থাপন।
না শুনয়ে হরিকথা না শুনে কীর্ত্তন।।
সংকীর্ত্তন শুনিলে মারিতে সবে ধায়।
এগুলার শব্দে লক্ষ্মী দেশ ছাড়ি যায়।।
বৈষ্ণব দেখিলে বলে এগুলা তস্কর।
গ্রাম হৈতে খেদাড়িয়া রাখে তেপান্তর।।

—পূর্ব্ববিভাগ, ৩য় লহরী।

কাব্যটি একসময় ঈশানচন্দ্র বসু কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এর দ্বিতীয় সংস্করণটি ঢাকার মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ— এই চারটি 'বিভাগে' রচিত এই কাব্যটির প্রতিটি বিভাগে আছে ১৬টি করে 'লহরী'। এই তথ্যবহুল কাব্যটি শ্রীপাটগোপীবল্লভপুর থেকে স্বল্পমূল্যে বিতরিত হয়। বর্তমানে এটি প্রায় দুষ্প্রাপ্য।

সহজিয়া এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে মেদিনীপুরে একসময় অপ্রীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সাউরী প্রপন্নাশ্রম থেকে প্রকাশিত অযোধ্যানাথ বসুর 'প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিতীর্থ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী' গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। ওই আশ্রমেও আছে বেশ কিছু বৈষ্ণব পুঁথি।

বিশিষ্ট বৈষ্ণব পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ তমলুক অঞ্চলে বসবাস করে তাঁর কালজয়ী পদাবলী রচনা করেন।

মহাভারতের যশস্বী অনুবাদক কাশীরাম দাস ঘটনাচক্রে জন্মস্থান বর্ধমানের সিঙ্গি থেকে চলে আসেন মেদিনীপুর শহরের নিকটবর্তী আবাসগড়ের রাজপ্রাসাদে। সেখানে দেবমন্দিরে নিয়মিত পৌরাণিক সাহিত্যপাঠ হত। তা শুনতে শুনতে একসময় কাশীরাম সংস্কৃত মহাভারতকে বাংলায় অনুবাদ করতে উদ্যোগী হন এবং তাতে সফল হন। অবশ্য আদিপর্ব, বনপর্ব, সভাপর্ব ও বিরাটপর্বের অংশবিশেষ অনুবাদ করেন মাত্র। ষোল শতকের শেষ দিকে কবির এই অনুবাদকর্ম শেষ হয়। সেই আবাসগড় আজও কাশীরামের স্মৃতি বুকে নিয়ে ধ্বংসস্তূপ রূপে বর্তমান।

ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানার চেতুয়া-বাসুদেবপুর গ্রাম থেকে 'জাহ্নবীমঙ্গল' কাব্যের বিশাল পুঁথিটি সংগ্রহ করেছেন প্রয়াত পণ্ডিত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ। কাব্যটির রচয়িতা তাৎকালিক এক পদস্থ সরকারি কর্মচারী এবং অম্বিকা-কালনার অধিবাসী প্রাণবল্লভ ঘোষ। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ও শিবায়ন রচয়িতা কবি রামেশ্বরের সমসাময়িক (১৮শ শতক) প্রাণবল্লভ, মুর্শিদাবাদ নবাব-সরকারে কর্মরত অবস্থায় কাব্য রচনা শুরু করেন। শেষ করেন চেতুয়া বাসুদেবপুর গ্রামে (দাসপুর থানা)। কবি সম্ভবত ভূমিব্যবস্থার কাজে ওই অঞ্চলে এসেছিলেন।

কাঁথি শহরের কুমরপুর এলাকায় অবস্থিত পুরোনো মুদ্রণালয় নীহার প্রেসকে মেদিনীপুরের 'বটতলা' বলা যাবে। এটি ছিল ওড়িশা-মেদিনীপুর সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ধর্ম-সাহিত্যবিষয়ক পুঁথি-পত্রের বিশিষ্ট প্রকাশনস্থল। একদা শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রনাথের ছাত্র যতীন্দ্রনাথ জানা ছিলেন এই প্রেসের প্রাণপুরুষ। এই প্রেস থেকে বাংলা-ওড়িশা সীমান্তের শতাধিক কবির অসংখ্য পুঁথি, পাঁচালী, ভাগবত ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। এইসব রচনার বেশিরভাগই বঙ্গাক্ষরে কিন্তু উৎকল ভাষায় লেখা। প্রকাশিত সেইসব পুস্তকের কয়েকটি হল অঙ্কসূত্র,

প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে তালপাতায় লেখা বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত পুঁথি 'নারদীয়তন্ত্র রক্ষাকবচ' ছবি : লেখক

অর্জুনগীতা, অনন্তব্রত, উষাহরণ, একাদশী মাহাত্ম্য, কপিলামঙ্গল, কংসবধ, কার্তিক মাহাত্ম্য, গঙ্গাসাগর মাহাত্ম্য, চোরকেলী, জলকেলী, জন্মাষ্টমী, জিতাষ্টমী, দারুব্রহ্ম গীতা, নলনীলের পালা, নিমাই সন্ন্যাস, পীরের জন্ম, বামনজন্ম, বিশ্বরূপ দর্শন, ব্যাসদেব জন্ম, বৈশাখ মাহাত্ম্য, মথুরামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, কৌশল্যা বিলাপ, জানকী রোদন, প্রমীলা বিলাপ, বেহুলা রোদন, রাধার কলঙ্কভঞ্জন, বৃন্দাবতী হরণ ইত্যাদি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুদ্রণকালে কেবল বিষয়বস্তুকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে এইসব রচনার কবি পরিচিতি, রচনাকাল ইত্যাদিকে বাদ দেওয়ার ফলে এগুলি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্যাবলী সংগ্রহ করা যায় না। তবে এগুলি যে সীমান্ত মেদিনীপুরের উৎকল প্রভাবিত এলাকার গ্রামীণ কবিদের রচনা, তাতে সন্দেহ নেই। ওই প্রেস থেকে মুদ্রিত গয়ারাম সরকারের 'সত্যনারায়ণ পাঁচালীর' মদনমঞ্জরী পালায় কবি নিজের বাসস্থান হিসেবে কোন এক বামনপুখুর্‍্যা গ্রামের কথা বলেছেন। তিনি সত্যপীর পাঁচালীর রম্ভাবতী, বল্লভাসুন্দরী, মনোহর ফাসিয়ারা, মর্দগাজী, চম্পাবতী, শশীধর ইত্যাদি পালাগুলিও রচনা করেন বলে সঙ্গত অনুমান। কারণ, মদনমঞ্জরী পালার অষ্টমঙ্গলাতে তিনি ওই পালাগুলির নামোল্লেখ করেছেন। অবশ্য ওড়িশাতে প্রচলিত উৎকলীয় অক্ষরে রচিত কবিকর্ণের ষোলপালাতেও ওই পালাগুলি অন্তর্ভুক্ত। গয়ারাম, সীমান্তবঙ্গের মানুষ ছিলেন বলে মনে করা হয়। প্রশ্ন আসে, গয়ারাম আর কবিকর্ণ কে কার রচনা অপহরণ করেছেন ?

জেলার নানাস্থানে ছিল অসংখ্য পুঁথি অনুলিপির আখড়া। সেখানে লিপি করা হয়েছে জেলা বা জেলার বাইরের অজস্র তাল ও তুলটপত্রের পুঁথি। মেদিনীপুর রাজনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগারে রক্ষিত ২৩টি বাংলা ও সংস্কৃত পুঁথি এবং ১১টি বিরলপ্রাপ্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাশীরামের মহাভারতের একটি বৃহদায়তন আদিপর্বের পুঁথি। অসাধারণ হস্তাক্ষরে লিপিকৃত এই পুঁথিটি নারায়ণগড় থানার কবিরপুর গ্রামের শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দাস বৈষ্ণব ১২৪৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের সোমবার একাদশী তিথিতে 'রাত্রি সাত ঘটিকা সময়ে' অনুলিপি করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহের কৃত্তিবাস রামায়ণের 'সুন্দরাকাণ্ড'-এর একটি সম্পূর্ণ তুলট পুঁথির পুষ্পিকা থেকে জানা যায়, সাকিম হাজীপুরের কুড়ারাম দাস চন্দ, তাৎকালিক বরদা পরগনার (ঘাটাল থানা) খড়ার পৌরসভার উদয়গঞ্জের গোকুলানন্দ দাস ঘোষের পাঠের জন্যে ১১৭৩ বঙ্গাব্দের ১৮ বৈশাখ মঙ্গলবার এটি লিপি করেন। এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

শুধু বাংলা পুঁথিই নয়, এ জেলার কবি পন্ডিতরা সংস্কৃত ব্যাকরণ, তন্ত্রমন্ত্র, শাস্ত্রসংহিতা, আরবী ফার্সী কাব্য কবিতা রচনা করেছেন। কালের নিয়মে কবিরা হারিয়ে গেছেন। থেকে গেছে তাঁদের রচিত পুঁথিপত্রগুলি।

বাঁকুড়া-বর্ধমান-পুরুলিয়া জেলার নানাস্থানে কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করছেন মেদিনীপুর-ওড়িশা সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে আগত উৎকল ব্রাহ্মণরা। এঁদের কোনো কোনো পরিবারে সাহিত্যচর্চা ছিল। অনুসন্ধান করলে এইসব স্থান থেকে বঙ্গাক্ষরে উৎকলীয় পুঁথি আজও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কবে আর সেই কাজ শুরু হবে ? অথচ এ জেলার পুঁথি সাহিত্য আলোচনায় এইসব পুঁথিও গুরুত্বপূর্ণ।

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য ও সংস্কৃতিতে মেদিনীপুরের বিপুল অবদানের নমুনামাত্র এখানে তুলে ধরা হল। বন্যা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, পুঁথি মালিকের বর্তমান বংশধরদের অজ্ঞতাবশত এ জেলার শত শত প্রাচীন পুঁথি বিনষ্ট হয়ে গেছে। বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রহে এবং সংগ্রহশালায় অনালোচিত অনাদৃত অবস্থায় পড়ে আছে মেদিনীপুরে রচিত বা অনুলিখিত বহু পুঁথি। অথচ, এইসব পুঁথি বিষয়ক গবেষণার কাজ যতই বিলম্বিত হবে, ততই দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসও অনালোচিত থেকে যাবে। জানি না, কবে অপসারিত হবে এই অন্ধকার। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেইরকম উদ্যোগ গ্রহণ করে, জেলার সমূহ পুঁথি সংগ্রহ করে একটি পুঁথিশালা তৈরি করতে চাইলে বোধহয় স্বেচ্ছাসেবী মানুষের অভাব হবে না।

গ্রন্থঋণ :

১। যোগেশ বসু, 'মেদিনীপুরের ইতিহাস', ২য় সংস্করণ।
২। গোপীজনবল্লভ দাস, 'শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গল', ১৯৪১।
৩। শ্রীপঞ্চানন মন্ডল, 'পুঁথি পরিচয়', ১, ২, ৩, ৪। বিশ্বভারতী।
৪। ড. বিষ্ণুপদ পান্ডা, 'দ্বারিকাদাসের মনসামঙ্গল', কলি. বিশ্ববিদ্যালয়।
৫। তারাপদ সাঁতরা, 'একটি পাটাচিত্র : সহজিয়া বনাম বৈষ্ণবদের চুলোচুলি দৃশ্য', রাঢ়-বীক্ষণ, আগস্ট, ২০০০।
৬। ত্রিপুরা বসু, 'সাহিত্য সেবায় মেদিনীপুর', ১৯৮১; 'বিস্মৃত কবি ও কাব্য', ১৯৮৭; 'দক্ষিণ রায় ওড়িশা সীমান্তের প্রাচীন কবি ও কাব্য', রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত সাহিত্যিকী পত্রিকা, ১৩৮৯-৯০; 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবি শঙ্কর', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি গবেষণাপত্র, ১৯৮১।
৭। 'মেদিনীপুর জেলা : ইতিহাস ও সংস্কৃতি', ১৯৭২।

লেখক : শিক্ষক, ভারতীয় সার কর্পোরেশন দুর্গাপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, পুঁথি ও পান্ডুলিপি গবেষক

প্রাকৃতিক পরিবেশে আদিবাসী গৃহ

মেদিনীপুর জেলার আদিবাসী সম্প্রদায় : সাঁওতাল

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে

পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুর এবং সবচেয়ে বেশিসংখ্যক আদিবাসী এ জেলাতেই বাস করে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এ জেলার আদিবাসী জনসংখ্যা ৬,৮৯,৬৩৬ অর্থাৎ সারা রাজ্যের আদিবাসী জনসংখ্যার শতকরা ১৮.১১ ভাগ। চাষ-আবাদ, জনমজুর, কুটিরশিল্প, গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা, জঙ্গলের কাঠ-পাতা সংগ্রহ প্রভৃতির মাধ্যমে তারা জীবিকানির্বাহ করে। প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই তাদের শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্রোত প্রবাহিত। প্রকৃতি থেকে যেমন তাদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তেমনই তাদের জীবনধারার চিন্তাভাবনা অর্থাৎ শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আলাদাভাবে কল্পনা করা যায় না। প্রকৃতিনির্ভর এই সব আদিবাসীরা প্রাকৃতিক শক্তিকে সন্তুষ্ট করা জীবনধারণের পক্ষে একটা অত্যন্ত জরুরি কর্তব্য বলে মনে করে। তাই এ জেলার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে ও শ্যামল প্রান্তরে আজও দেখা যায় আদি সংস্কৃতি নিদর্শন— মুণ্ডাদের গ্রামের প্রান্তে 'সার্না' পীঠস্থান, লোধাদের গ্রামে 'ঝড়াম থান' আর সাঁওতালদের গ্রামের প্রান্তে 'জাহের থান'। গ্রাম পত্তনের সময়ে তাদের পূর্বপুরুষরা সেগুলি তৈরি করে গেছে। বিভিন্ন গাছকে দেবতারূপে বা ধর্মীয় প্রতীকরূপে কল্পনা করে তার পূজা-অর্চনা তারা করে চলেছে।

জানা যায়, আঠারো শতকের প্রথম দিকে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে পশ্চিম-সীমান্ত বাংলায় 'জঙ্গলমহল' নামে এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ চিহ্নিত করা হয় এবং তার

মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় অসংখ্য ভূমি-রাজ্য—ভাটভূম, ধলভূম, মল্লভূম, তুঙ্গভূম, সামন্তভূম, বরাহভূম, শিখরভূম, মানভূম প্রভৃতি। এই জঙ্গলমহলের জন্য আলাদাভাবে এক প্রশাসনিক অধিকর্তাও নিযুক্ত হয়। ভূমি-রাজ্যগুলিকে কোম্পানির অধীনে আনা এবং ওই সব অঞ্চলের মূল্যবান সম্পদ লুণ্ঠন করাই ছিল তার কাজ। অরণ্য অঞ্চলের স্বাধীনচেতা মানুষগুলো কিন্তু সহজে কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করেনি, গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরে তারা একটানা সংগ্রাম করেছে ইংরেজ রাজশক্তি ও তার দালালদের বিরুদ্ধে। সংগ্রামে তাদের পরাজয় ঘটেছে, তবে ইতিহাস তাদের সেই সংগ্রামের দৃঢ়তাকে অস্বীকার করতে পারেনি। তারা বর্বর, চুয়াড়, জংলি বলে অভিহিত হয়েছে, কিন্তু সহজে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরাতে চায়নি। সংগ্রামের রীতি-রেওয়াজ না মেনে ইংরেজসেনারা যখন তাদের কুঁড়েঘরগুলোতে আগুন লাগিয়ে নিরস্ত্র, অসহায় ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-বুড়িদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে, তাতেও তারা তাদের স্বাধীন চেতনাকে বিনষ্ট হতে দেয়নি। দীর্ঘদিন এভাবে অরণ্য অঞ্চলের মুণ্ডা-ভূমিজ-খাড়িয়া-হো-সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীরা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাদের রক্ত ছড়িয়েছে পাহাড়ে, মাঠে-ঘাটে, বনে-বাদাড়ে, নদী-নালায়। কারণ, স্বাধীনতার চেয়ে বড় তাদের কাছে আর কিছু নেই।

পরবর্তীকালে আমরা দেখি, এই ইংরেজ শাসকরাই আদিবাসীদের নৈতিক সততার উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করে গেছেন। মেদিনীপুরের কালেক্টর এইচ ভি বেইলি (১৮৫২) তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন—

> "এরা অল্পে তুষ্ট, পরিশ্রমী, সাহসী, সত্যবাদী, বিশ্বাসপরায়ণ ও প্রভুর প্রতি অনুগত। কিন্তু কোনও ব্যাপারে এতটুকু উৎপীড়িত হলে গোটা গ্রাম বাস উঠিয়ে যে জমিদার সহৃদয় ব্যবহার করবেন বলে মনে করে, তার এলাকায় চলে যায়। পিতৃভূমি 'পরে আধা-সংস্কারগত, আধা-অভ্যাসগত মায়া এদের নেই যা সমতলের চতুর ও বেশি সভ্য মানুষদের ভেতরে দেখা যায়। এদের মধ্যে যারা আমাদের আদালতের চারপাশে দালালদের ছলাকলায় পোক্ত হয়ে নিজেদের বৈশিষ্ট্য ভুলে যায়, তারাও যখন মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছে বলে ধরা পড়ে খুবই লজ্জিত হয়।"

যাইহোক—সাঁওতালরাই মেদিনীপুর জেলায় আদিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো গোষ্ঠী। জেলার উত্তর ও পশ্চিমাংশের উঁচু-নিচু জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে তাদের বাস। জাতি বিচারে তারা আদি-অস্ট্রাল শ্রেণীর। মেদিনীপুরে সাঁওতালদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় হ্যামিলটন সাহেবের বিবরণীতে'। তিনি লেখেন—'এখানকার জঙ্গলে কিছু গরিব শোচনীয় এক অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ বাস করেন যাদের বলা হয় সানতাল।' অনেকেই অনুমান করেন, 'সাঁওতাল' শব্দটি সম্ভবত 'সাওন্ত' বা 'সামন্ত' কথা থেকে এসেছে। পূর্বে মেদিনীপুরের এক অংশকে

শূকর পালন। দরিদ্র আদিবাসীদের অন্যতম উপজীবিকা

বলা হত 'সাওন্ত' বা 'সামন্তভূম'। ওখানে বসবাস করার জন্যই হয়তো তাদের নাম হয় সাঁওতাল। তারাও ওই অঞ্চলটিকে 'সাঁত দিসম' বা 'সাঁত দেশ' নামে তাদের পুরাণ কাহিনিতে উল্লেখ করে গেছে। সাঁত দেশের অধিবাসী অর্থাৎ সাঁওতাল এবং এ অন্যের দেওয়া নাম। কারণ, সাঁওতালরা কখনই নিজেদের সাঁওতাল বলে পরিচয় দেয় না। সর্বত্রই তারা নিজেদের 'হড়' বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। 'হড়' কথাটির অর্থ হল মানুষ। পরে জাতি হিসাবে তারা 'খের্ওয়াল জাত' বা 'খের্ওয়াল হপন' বলে পরিচয় দিতে শুরু করে।

মেদিনীপুর সদর (উত্তর ও দক্ষিণ) এবং ঝাড়গ্রাম মহকুমাতেই সাঁওতাল জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি, সে তুলনায় ঘাটাল, তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় তাদের জনসংখ্যা প্রায় নগণ্য। শোনা যায়, এক সময়ে মেদিনীপুর শহরের আশেপাশে বিশেষ করে, কুইকোটা, কেরানিচটি, আবাসগড়, নীলডাঙা, কর্ণগড় পর্যন্ত অঞ্চলে প্রচুর সাঁওতাল বসতি ছিল। চোয়াড় বিদ্রোহের সময়ে এ সব অঞ্চলের সাঁওতালরা ইংরেজসেনার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ি-ঘর, জমি-জায়গা সব ফেলে পাথরকুমকুমি, মৌপাল-পীড়াকাটার নিকটবর্তী অঞ্চলে, ডাঙ্গাপাড়া আর বগড়ি পরগনার দুর্গম বনাঞ্চলে আশ্রয় নেয়। তাদের বংশধরদের কাছ থেকে এ সব তথ্য কিছু কিছু জানা যায়।

এখানে একটা কথা না বলে পারছি না। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতো অনেকেই মনে করেন, মাল-পাহাড়িয়া সাঁওতাল প্রভৃতি অধিবাসীদের মতো চোয়াড়রাও আলাদা এক সম্প্রদায় এবং মোঘল শাসনের আগে থেকেই এ সব অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বসবাস করে আসছিল। আবার কেউ কেউ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার[২] প্রণেতা ও' ম্যালি সাহেবের অভিমতটিকে মেনে নিয়েছেন যে, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও মানভূমের ভূমিজ অধিবাসীরাই চোয়াড়। আমার কিন্তু 'চোয়াড়' বলে কোনও গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় ছিল না বলেই ধারণা। কারণ, এ পর্যন্ত আমি আদিবাসী, উপজাতি কিংবা অন্ত্যজ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এ রকম কোনও গোষ্ঠী নাম পাইনি। বাংলা ভাষায় এটা একটা অবজ্ঞাসূচক গালি যার আক্ষরিক অর্থ 'নীচ ও দুর্বৃত্ত মানুষ'। ভূমিজ, মুণ্ডা সাঁওতাল, কুড়মি, কুরমালি, কোড়া, বাউরি, বাগদি প্রভৃতি স্বাধীনচেতা গোষ্ঠীগুলিকে ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারী ও উচ্চবিত্ত মানুষরা এ ধরনের নাম দিয়েছিল। তারা সবাই ছিল স্থানীয় ভূস্বামীদের অনুগৃহীত। যে সব ভূস্বামী কোম্পানির কোপদৃষ্টিতে পড়ে ধন-মান সব হারাত, তারা সে সব ভূস্বামীদের সাহায্য করত। বলা বাহুল্য, সাধারণ গরিব অধিবাসী ও অন্ত্যজ শ্রেণীর চাষি ও মজুররাই এ বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। তাদের সঙ্গে কোম্পানির যত না লড়াই হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি লড়াই হয়েছিল কোম্পানির অনুগত ও অনুগৃহীত স্থানীয় দেশদ্রোহী মানুষগুলোর সঙ্গে। আমার ধারণার সপক্ষে একটা সাঁওতালি গান এখানে তুলে ধরছি। একজন সাঁওতালও নিজেকে চোয়াড় বলতে দ্বিধাবোধ করেনি, তা এই গানে ব্যক্ত হয়েছে। গানটি ১৮৭০ সালের পূর্বে 'মেদিনীপুর সেরেঞ পুথি' নামক গানের বইয়ে প্রকাশিত হয়, রচয়িতা দুলা হেমব্রম—

সুর : সহরায় রীড়

'ইঞ দ পাপী চোয়াড় গিদরী সীরি উতারগে
জানাম হিলোঃ খনাঃ তেহেঞ হীবিচ্‌গে ;
এতম কঞে কাঁইতিঞ বুরু লেকাগে
অনাতে এ বাবা ! ইঞ দ আঁউডিঞ কান্তাওঃকান।'

অর্থাৎ—

আমি সত্যিই পাপী চোয়াড় ছেলে
জন্মের পর থেকে আজ অবধি ;
ডাইনে বামে পাহাড়ের মতো কল্মষ
এ জন্য ও বাবা ! আমি খুবই অনুতপ্ত।

চোয়াড় বলে যে অন্য কোনও জাতি বা সম্প্রদায় ছিল না, গানটিতে তাই ধরা পড়ে।

সাঁওতালদের কাছে জঙ্গল পরিষ্কার, চাষ-আবাদ ও মাটি কাটা অতি প্রিয় কাজ। এজন্যই জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য এক সময়ে তাদের চব্বিশ পরগনা জেলায় আনা হত। জঙ্গল পরিষ্কার করতে গিয়েই বহু সাঁওতাল পরিবার ওই জেলায় থেকে গেছে। চাষ-আবাদের কাজে তাদের ক্লান্তি নেই, আজও ধান রোয়া ও ধান কাটার সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তারা বর্ধমান, হুগলি ও হাওড়ায় দলে দলে 'নামাল' খাটতে যায়। আর মাটি কাটা ? কয়েক বছর আগেও কলকাতায় মেট্রোরেলের কাজ চলার সময়ে তারা মাটি কাটার কাজ করে গেছে। কিছুদিনের জন্য কলকাতার গড়ের মাঠকে তারা সাঁওতালপাড়া করে নিয়েছিল। সন্ধেবেলায় মেঠো বাঁশির সুর আর মাদলের আওয়াজের সঙ্গে সাঁওতালি গানের সুর কলকাতা ময়দানের পরিবেশকে পালটে দিত। মেদিনীপুর সেন্ট্রালজেল তৈরির সময়েও এ রকম বহু সাঁওতাল বগড়ি পরগনা থেকে মেদিনীপুর শহরে এসেছিল। আজকের দিনের মতো আধুনিক যন্ত্রপাতি তো তখনকার দিনে পাওয়া যেত না ! তাই, বহুদিন ধরে এ কাজ চলেছিল। সে সময়েই জেলখানার পূর্বদিকে কাঁকুরে মাটিতে ডিম্বাকৃতি যে বিরাট পুকুরটি খোঁড়া হয়েছিল সেটা তাদেরই কীর্তি। বিষয়টা কিন্তু চাপা পড়ে আছে। স্বাধীন ভারতে ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের প্রথম আদিবাসী সাংসদ ভরতলাল টুডুর পিতা লক্ষ্মীরাম টুডু ওই সময়েই বগড়ি পরগনা থেকে কাজের সন্ধানে মেদিনীপুরে এসে কুইকোটায় বসবাস শুরু করেন।

আদিবাসী রমণীরা ব্যস্ত কৃষিকাজে

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মেদিনীপুর সদর মহকুমা ও ঝাড়গ্রাম মহকুমাতেই সাঁওতাল জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মেদিনীপুর জেলায় তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা চালায় আমেরিকান ব্যাপ্‌টিস্ট ফরেন মিশন ; অবশ্য শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম প্রচারও মিশনের উদ্দেশ্য ছিল। রেভারেন্ড জে ফিলিপস্ সাঁওতালি ভাষাচর্চা শুরু করেন

শ্রমজীবী আদিবাসী মহিলারা চলেছেন মেলার পথে, মাথায় হাঁড়িয়া আর পিঁপড়ের ডিমের পশরা

এবং তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৪৫ সালে সর্বপ্রথম বাংলা হরফে সাঁওতালি গান ও ছড়ার বই প্রকাশিত হয়। ওই বছরই জলেশ্বরে সাঁওতালদের জন্য তিনি একটা স্কুল স্থাপন করেন। জলেশ্বর তখন বাংলার এলাকাধীন। মেদিনীপুর জেলা কালেক্টর জলেশ্বরের রাজস্ব আদায় করতেন। শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজার আমলেই জলেশ্বরকে ওড়িশা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে জলেশ্বর আবার ওড়িশাভুক্ত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর দিকে এ জেলায় যে সমস্ত মিশনারি সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও সাঁওতালি ভাষার উন্নতির জন্য কাজ করে গেছেন তাঁদের মধ্যে রেভারেন্ড জে ফিলিপস্, রেভারেন্ড জি কেনান ও রেভারেন্ড এল সি কিচেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফিলিপস্ সাহেবের কাজ সম্পর্কে আমি আগেই সামান্য বলেছি। তিনি ১৮৫০ সালে 'সাঁওতালি ভাষা শিক্ষা' এবং ১৮৫২ সালে 'An Introduction to the Santali Language' নামে দুখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে ব্যাকরণসহ পাঁচ হাজার সাঁওতালি শব্দতালিকা পাওয়া যায়। বলতে গেলে সাঁওতালি সাহিত্যের ভাষাচর্চার এটাই আদিমতম প্রচেষ্টা। এরপর সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য প্রয়াস চালান রেভারেন্ড জর্জ কেনান। তাঁর নামে 'Geroge Kenan Fund for Santal literature' তহবিলও তৈরি হয় মিশনের ইতিহাসে পাওয়া যায়। রেভারেন্ড এল সি কিচেন মেদিনীপুর জেলা শিক্ষা কমিটির সদস্য ছিলেন এবং 'Primary Education among Santals of Midnapore' নামক গ্রন্থটি লেখেন। যতদূর সম্ভব তাঁরই চেষ্টায় সাঁওতাল ছেলেরা ভীমপুর সাঁওতাল হাইস্কুল থেকে সাঁওতালি ভাষা নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পায়। এখানে একটা কথা উল্লেখ না করে পারছি না। অবিভক্ত বাংলায় মেদিনীপুর জেলার একমাত্র ভীমপুর সাঁওতাল হাইস্কুলেই নিয়মিত সাঁওতালি পড়ানো হত এবং ছেলেরা সাঁওতালি ভাষা নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে পারত। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এমন কী বিহারের সিংভূম জেলা থেকে বহু সাঁওতাল ছেলে এই স্কুলে পড়তে আসত। আমি যখন এই স্কুলের ছাত্র ছিলাম সে সময় স্কুলে ছ'জন সাঁওতাল শিক্ষক ছিলেন, তাঁরা হলেন—প্রিয়নাথ বাস্কে, রামচাঁদ মাণ্ডি, পরানচন্দ্র টুডু, ধনারাম হেমব্রম, বিদ্যাভূষণ সরেন এবং পদ্মলোচন মাণ্ডি। আমার মনে হয়, একই সঙ্গে এতজন সাঁওতাল শিক্ষক আর কোনও স্কুলেই কাজ করেননি, কোথাও এ রকম উল্লেখ পাওয়া যায় না।

স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরের রক্তাক্ত ইতিহাস আমরা আজও ভুলিনি। বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে জেলার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যেভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, তাতে ক্ষমতাদৃপ্ত ব্রিটিশ রাজশক্তি পর্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। মেদিনীপুর জেলার সাঁওতালরাও এ আন্দোলনে নেমে পড়েছিল স্বাধীনতা অর্জন ও বিদেশিরাজকে এ দেশ থেকে বিতাড়িত করার আশায়। তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল মেদিনীপুর আদিবাসী মহাসভা। আদিবাসী মহাসভার সঙ্গে সেদিন যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন—পারগানা মনসারাম মাণ্ডি, কালিচরণ সরেন, পারগানা সুরেন্দ্রনাথ সরেন, পারগানা শ্রীপতি হাঁসদা, নবীন সরেন, দীনবন্ধু মাণ্ডি, কালিরাম হেমব্রম, গুরাইচন্দ্র সরেন, মঙ্গলচন্দ্র সরেন, ডমন সরেন, ফাগু মুর্মু, সনাতন হাঁসদা, রতন সরেন, সুবোধ সরেন, শ্যামচরণ মুর্মু প্রমুখ। আদিবাসী মহাসভার এই সব নেতারাই মেদিনীপুর জেলায় আদিবাসীদের নানারকম সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করতেন। তাঁদের নির্দেশমতো বিদেশি সরকারকে আর্থিক সংকটে ফেলার জন্য আদিবাসীরা ট্যাক্স ও খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। শিলদা, বিনপুর, পরীহাটি, জামবনি, দাহিজুড়ি, গড়বেতা, শালবনি, গোয়ালতোড়, রামগড় প্রভৃতি অঞ্চলে সরকারি আয়ের উৎস আবগারি দোকানগুলি ভাঙচুর করে জ্বালিয়ে দেয়। থানা পুলিশের সাহস ছিল না সেদিন আদিবাসী গ্রামে গিয়ে দোষীদের বা আন্দোলনকারীদের খুঁজে বের করে। এভাবেই বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে মেদিনীপুরের সাঁওতালরা দলে দলে সাড়া দিয়ে এ দেশকে বিদেশি শাসনমুক্ত করতে চেয়েছে।

সমগ্র পূর্বভারতে সাঁওতাল সমাজের জীবন ও সংস্কৃতি প্রায় একই ; উৎসব-অনুষ্ঠান আর রীতি-নীতিতে তেমন বিশেষ

পার্থক্য লক্ষ হয় না। তাই এ দিকটা আমি আর আলোচনা করছি না।

এবার প্রশ্ন—স্বাধীনতা লাভের পর তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে কতখানি অগ্রগতি হয়েছে ? আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন কতটুকু ঘটেছে ? আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ১৮৪৫ সালে আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন মেদিনীপুরে সর্বপ্রথম সাঁওতালদের মধ্যে কেতাবি শিক্ষার ব্যবস্থা করে। মেদিনীপুর জেলা গেজেটিয়ার্স থেকে জানা যায়, ১৮৮১ সালে এ জেলায় মিশনের সাঁওতাল প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা ছিল ৭৫টি। শুধু ছেলেদের জন্য নয়, মেয়েদের জন্যও স্কুল খোলা হয়েছিল। অথচ, দীর্ঘ এতগুলো বছর পর আজ বলতে হচ্ছে যে তাদের মধ্যে শিক্ষার হার সন্তোষজনক নয়। বিদেশি সরকারের কথা বাদ দিলাম। আমাদের দেশের স্বাধীন সরকার তাদের জন্য কী করল ? তারাও তো স্বাধীন ভারতের নাগরিক। সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলো ভোগ করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার তাদেরও আছে। ভারতের মান, মর্যাদা ও সুনামের ব্যাপারে তারাও জড়িত। তাহলে স্বাধীন দেশের জাতীয় সরকারের বড়ো বড়ো গালভরা প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তারা কেন এত পিছনে ? স্বাধীনতালাভের পর দেখতে দেখতে অর্ধ শতাব্দী কেটে গেল, কিন্তু তাদের খেটে-খাওয়া জীবনযাত্রার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন তেমন কিছুই হয়নি। এর একটা বড়ো কারণ—সংবিধানের অঙ্গীকার নিষ্ঠাভরে পালন করা হয়নি। অথচ, সংবিধানে লেখা আছে :

> "রাষ্ট্র বিশেষ যত্নের সঙ্গে দেশের দুর্বলতর অংশের বিশেষ তফসিলি সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের শিক্ষা ও অর্থনীতিগত স্বার্থপূরণ এবং তাদের সর্বপ্রকার সামাজিক অবিচার ও শোষণ থেকে রক্ষা করবে।"

দীর্ঘদিনের সরকারি কাজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি আজ ভালোভাবেই বুঝতে পারছি যে, শুধুমাত্র প্রশাসনিক যোগ্যতাসম্পন্ন সচিব, আধিকারিক প্রমুখ নিয়োগ করে আদিবাসী উন্নয়ন কিংবা এ ধরনের সমাজ উন্নয়ন সম্ভব নয়, সমাজকল্যাণের মানসিকতা অতি অবশ্য থাকা প্রয়োজন। সমাজদরদী ও জনহিতকর কাজ করার মতো মন থাকা দরকার, নতুবা শত চেষ্টা করেও ফল পাওয়া যাবে না। সরকারি নীতি কিংবা বিভিন্ন প্রকল্প কোনটাই খারাপ নয়, কিন্তু সেগুলি ঠিকমতো রূপ দেওয়াই কঠিন। অধিকাংশ সময়ই দেখা যায়, প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব উপযুক্ত যোগ্য আধিকারিকের উপর পড়ে না। ফলে, বিধানসভায় মঞ্জুরিকৃত বাজেট বরাদ্দ টাকা যেমন অনেক সময় সম্পূর্ণ খরচ হয় না, তেমন প্রকল্প রূপায়ণও ঠিকমতো হয় না। যে টাকা বিধানসভায় মঞ্জুর হয় তা তো ফেরত যাওয়ার কথা নয়। পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে যা দেখেছি, আজও তা দেখছি। শুধু একটুখানিই পরিবর্তন যা চোখে পড়ে, তা হল—পূর্বে আমলা-

দরিদ্র আদিবাসীরা হাঁস-মুরগী পালন করে বিকল্প আয়ের পথ সুগম করেছেন
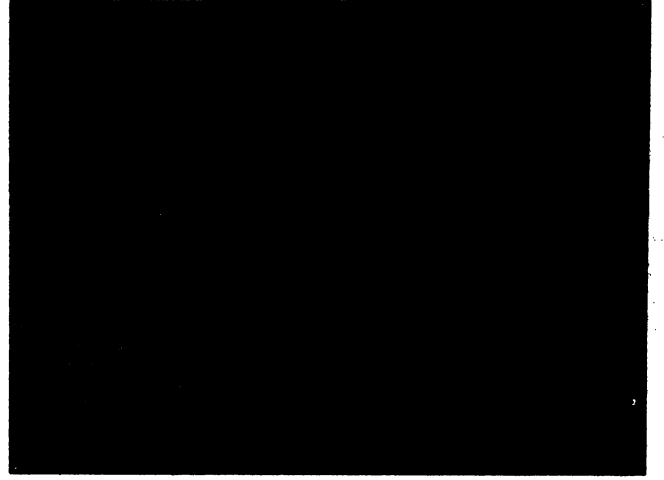
আধিকারিকদের কামরায় জনসাধারণ পৌঁছতে পারত না, আজ পৌঁছতে পারছে। কিন্তু তাতে উন্নয়নমূলক কাজকর্মে খুব যে একটা গতি এসেছে, তা বলা যায় না। আমলাতন্ত্রের ঢিলেমিতে কিংবা লালফিতের গেরোতে আটকে থাকায় বহু সময়েই আশানুরূপ কাজ পাওয়া যায় না। সাঁওতালি ভাষা ভারতের এক অতি প্রাচীন ভাষা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ ভাষা সম্পর্কে গবেষণামূলক কাজ শুরু করেছেন, এজন্য মোটা টাকাও খরচ হবে। সরকারের এ উদ্যোগ সার্থক হোক, আমরা চাই ; কিন্তু দেখা যাচ্ছে সরকারের দায়িত্বশীল আধিকারিকরা এ ব্যাপারে উদাসীন। আর একটা কথা—শুধুমাত্র সরকারের ত্রুটি ধরলেই হয় না, আমাদেরও বহু ত্রুটি আছে। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মেদিনীপুর জেলায় সর্বপ্রথম সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজ শুরু হয়েছিল। সেই হিসাবে মেদিনীপুর জেলায় সাঁলতালদের মধ্যে শিক্ষার হার যা হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি। দেখা যায়, বিশেষভাবে কয়েকটি জায়গায় কিংবা পরিবারের মধ্যে শিক্ষার আলো পড়ায় তাদের আত্মীয়-স্বজনরাই এগিয়ে আছে কিংবা শহর-বাজারে তারা কিছুটা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। কিন্তু তাদের দিয়ে তো আর একটা জাতিকে বিচার করা যায় না, তারা নিজেদের নিয়েই আছে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত সাঁওতাল বাস করে তাদের কথা ভাবে না, নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের কথা ভাবে না। নিজেদের গ্রামে গিয়ে যারা কায়িক পরিশ্রমে দিন চালায়, তাদের সঙ্গে মিশতে পারে না। শহুরে পরিবেশে থেকে থেকে আস্তে আস্তে তারা যেন হারিয়ে ফেলছে জাতীয়তাবোধ। ভাষা ও সংস্কৃতি হারিয়ে গেলে জাতির অস্তিত্ব আর থাকে না। আজকের প্রজন্মের কাছে তাই হতে চলেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার দুটি লাইন এখানে মনে পড়ছে—

> "যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
> পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

আদিবাসী শ্রমজীবী মহিলাদের জীবনসংগ্রাম

এ তো শুধু পশ্চাতে টেনে ধরা নয়, এ হল অস্তিত্বটুকু লোপ করে দেওয়া। ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি হারিয়ে সব কিছু শেষ করে দেওয়া। আজ তাই ঘটতে চলেছে। শহরে বেড়ে ওঠা সাঁওতাল ছেলে আজ তার মাতৃভাষা জানে না, তার ইতিহাস জানে না, আদিবাসী প্রথা, নিয়ম, রীতিনীতি জানে না। তাহলে তার আর জাতীয় বৈশিষ্ট্য থাকল কোথায় ? এ বড়ো বেদনাদায়ক। আর গ্রামের সাধারণ সাঁওতাল ? তার আর সেই শরীরের জৌলুস নেই। সে আর পূর্বের মতো কায়িক প্ররিশ্রম করতে পারে না, আস্তে আস্তে কর্মবিমুখ হয়ে পড়ছে। তার শ্রমশক্তি ঠিক পথে পরিচালিত না হওয়ায় সে আজ বাঁচার তাগিদে এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়ায়। বাধ্য হয়ে সাঁওতাল মেয়েদের আজ অভাবের তাড়নায় সংসারের হাল ধরতে হচ্ছে, রোজগারের জন্য হাটে, মেলায় হাঁড়িয়া-পচাই বিক্রি করে সংসার চালাতে হচ্ছে। পূর্বে তারা হাটে কিংবা মেলায় আনাজপাতি, মুরগি, ছাগল প্রভৃতি বিক্রি করতে নিয়ে যেত, আজ তার বদলে মাথায় করে হাঁড়িয়া-পচাই নিয়ে যাচ্ছে। আমি একটুও অতিরঞ্জিত করে বলছি না। লালগড় হাট, রামগড় হাট, পাঁচখড়ি হাট, পাটাবিল্লা মেলা প্রভৃতি জায়গায় গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে। সাঁওতাল সমাজের এ এক নিদারুণ অবক্ষয়। স্বাধীনতালাভের পঞ্চাশ বছর পরও যদি এ দৃশ্য দেখতে হয় তাহলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার সার্থকতা আর কোথায় ? পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য দেশে নতুন নতুন কল-কারখানা, বাড়ি-ঘর ইত্যাদি তৈরি করে দেশের অগ্রগতি দেখানো, না সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা ? শ্রমজীবী মানুষকে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা না আবদ্ধ থেকে মুক্ত করা ? যেখানে সাধারণ খেটে-খাওয়া দৈনন্দিন জীবন বিভীষিকাময় সেখানে তো আদিবাসী তথা সাঁওতাল সমাজের তো কথাই নেই। আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, উমেদারি বৃত্তি আজও শাসনব্যবস্থার প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু আদিবাসী তথা সাঁওতালরা যদি মানুষের বাঁচার মতো অধিকার পায় তবেই তারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই আমার বিশ্বাস।

১। Description of Hindostan–Walter Hamilton (1820).
২। District Gazetteer, Midnapore (1911)— L.S.S. O'Malley.

লেখক : বিশিষ্ট গ্রন্থকার ও প্রাবন্ধিক

পশ্চিম মেদিনীপুরের আদিবাসী পল্লীতে করমপূজা অনুষ্ঠান

মেদিনীপুরের আদিবাসী সম্প্রদায় : লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান

সুশীল হাঁসদা

সংখ্যা তত্ত্বের বিচারে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মেদিনীপুর জেলাতেই সর্বাধিক সংখ্যক আদিবাসী মানুষের বসবাস। সারা রাজ্যের আদিবাসী জনসংখ্যার শতকরা ১৭.৫৫ ভাগ। এই জেলাতে মেচ, রাভা, লেপচা, ভুটিয়া, গারো, ওরাঁও, মগ ইত্যাদি আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করলেও সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ, লোধা-খেড়িয়া, মাহালী, হো এবং কোড়া প্রভৃতিই প্রধান। এ ছাড়া ডেবরা এলাকায় কিছু কোল জাতির লোক বাস করেন এবং বিনপুর ১নং ব্লকের অধীন বসন্তপুর ও রাধারানি এলাকায় কিছু শবরের বাস। শবরেরা বাংলাভাষী এবং সমস্ত আচার-আচরণেও বাঙালিয়ানার ছাপ।

ভাষাগত দিক থেকে ওরাঁও বাদে এরা অস্ট্রো-এশিয়াটিক গোষ্ঠীভুক্ত। এই ভাষার প্রধান মুণ্ডারী। অন্যদিকে ওরাঁওগণ দ্রাবিড় ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে।

মুণ্ডা : মুণ্ডা কথাটির অর্থ মাথা অর্থাৎ গ্রাম প্রধান বা মোড়ল। মুণ্ডারা বন কেটে বসতি গড়েছিল এবং এইভাবেই গড়ে উঠত গ্রাম। কিছু গ্রাম মিলে গঠিত হত পট্টি। গ্রামের মোড়লের মতোই পট্টিরও একজন প্রধান থাকেন তাঁকে বলা হয় 'মানকি'। গ্রামের মুখ্য ব্যক্তিরা হলেন 'মাঝি', 'পারানি' এবং 'গোভেৎ'।

ঝাড়গ্রাম থানার চন্দ্রী, মরাইপুটি, সাঁকরাইলের তেলাতী, চুনাপাড়া, নারায়ণগড়, বেলদা, কেশিয়াড়ী, গোপীবল্লভপুর ১ ও ২নং ব্লক এবং বেলপাহাড়ী এলাকায় এদের সংখ্যা বেশি।

বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে শিকার উৎসব ছবি : সুবলচন্দ্র হেমব্রম

মুণ্ডারা সিং পদবি ব্যবহার করলেও গোত্র অনুযায়ী 'বুকুরু', 'লোহাতু বুকুরু', পাতরবাড়ে, ষড়ই, গাগরা, চাইড়দা (চাড়িদা), উহাতুঠাকুর, সিঁদরিপাতর, কুঁড়বা, কুক্‌ড়ু, গাঁড়ুয়া, ওদেলগা ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত।

মুণ্ডা গ্রামের মধ্যেই নাচ-গানের আসর বসবার আখড়া থাকে। সাঁওতালদের 'জাহেরথান'-এর মতোই এদের গ্রামেও গাছপালা ঘেরা একটি দেবস্থল থাকে। এটিকে বলা হয় 'সারনা'।

সামাজিক রীতি অনুযায়ী গ্রামের এক প্রান্তে অবিবাহিত যুবকদের একত্রে রাত্রিযাপনের জন্য একটি ঘর থাকে, যেখানে তারা সমাজজীবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। পুরুষেরা জোলা বা তাঁতির বোনা লম্বা এবং চওড়ায় খাটো এক ধরনের কাপড় ব্যবহার করত, যেটিকে বলা হত 'বতই'। মেয়েরাও কোমরের নীচে এবং কোমরের উপর থেকে বুকের উপর দিয়ে কাঁধপার করে পিঠ পর্যন্ত দুটি আলাদা কাপড় ব্যবহার করত। কোমরের নীচের অংশের কাপড়টিকে বলা হয় 'লাহাঙ্গা' আর উপরের দিকের টুকরোটি 'পারিয়া'। কোনও কোনও এলাকায় সাঁওতাল মেয়েদের মধ্যেও এই ধরনের পরিধেয়র ব্যবহার দেখা যায়।

বর্তমানে মেয়ে-পুরুষ সকলেই বাজারের সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদই ব্যবহার করছে। অলঙ্কারের ব্যবহার থাকলেও মেয়েরা গলায় এবং হাতে 'উলকি' পরত। ছেলেরা বাঁ হাতের রিস্টে ন্যাকড়া দিয়ে চামড়া পুড়িয়ে সার বেঁধে গোলাকার দাগ তৈরি করত। এটিকে বলা হয় 'শিখী'। শুধু অঙ্গসজ্জার উদ্দেশ্যেই এসব করা হত না। এর পিছনে একটা বিশ্বাসও কাজ করত। সেটি হল মৃত্যুর পর মানুষের সঙ্গে কিছুই যাবে না। সবকিছুই খুলে নেওয়া হবে। শুধু এই 'শিখী' বা উলকি খুলে নেওয়া যাবে না। আবার এই 'শিখী' বা 'উলকি' যদি না থাকে তাহলে পরলোকে 'যমপুরী'তে গিয়ে তার জন্য সেই ব্যক্তিকে কৈফিয়ত দিতে হবে এবং তার শাস্তি পেতে হবে।

মুণ্ডারা প্রধানত কৃষিজীবী। তবে তারা শিকারও করে থাকে। বর্তমানে এদের সংখ্যাগরিষ্ঠই শ্রমজীবী। জঙ্গলের কাছের গ্রামগুলির বাসিন্দারা বনের পাতা সংগ্রহ করে তা দিয়ে থালা, প্লেট, বাটি তৈরি করেও জীবিকা নির্বাহ করে। এদের প্রধান খাদ্য ভাত-রুটি ইত্যাদি। তবে এরা শিকারপ্রিয় হওয়ায় বিভিন্ন পশুপক্ষীর মাংসও খায়। দানাশস্যের মধ্যে এরা ডাহি জমিতে 'কোদো' চাষ করে, যেটিকে হাঁড়িয়া তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এরা নানান বনজ ফলমূলও সংগ্রহ করে খেয়ে থাকে।

শিশু জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে উলুধ্বনি দেওয়া হয় এবং আট দিন অশৌচ পালন করা হত। এখন এটি তিন থেকে পাঁচ দিনে নেমে এসেছে। ক্ষৌরকর্মাদি এবং প্রসূতি ও নবজাতকের স্নানের মাধ্যমে অশৌচের অবসান ঘটে। মুণ্ডারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষৌরকর্ম করে। জলের মধ্যে তেল ফেলে নবজাতকের ভাগ্য গণনা করা হয়। এর পর নবজাতকের নামকরণ করা হয়। সবার স্নান হলে হাঁড়িয়া-মিশ্রিত জলে তুলসীপাতা ফেলে প্রত্যেকের গায়ে ছিটানো হয়। এরপর সিঙ্গ বোঙ্গার নামে হাঁড়িয়া এবং একটি সাদা মোরগ বলি দেওয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি 'নাড়তা' নামে পরিচিত এবং নাড়তা অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হাঁড়িয়াকে 'নিয়ার হাঁড়িয়া' বলা হয়। শিক্ষা-দীক্ষা এবং সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত প্রথাও ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। হাঁড়িয়া-মিশ্রিত জলের পরিবর্তে এখন গঙ্গাজল ব্যবহৃত হচ্ছে।

কান ফুটো করা মুণ্ডাসমাজের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিন মাস বয়স থেকে বিয়ের আগে পর্যন্ত কান ফুটো করা হয়। কান ফুটো না করলে সে প্রকৃত অর্থে মুণ্ডা বলে গণ্য হবে না। সামাজিক কাজেকর্মে অংশ নিতে পারবে না। এমনকি বিয়ে করতে পারবে না। কান ফুটো করার অনুষ্ঠানটি ঘটা করে করা হয় মকর-সংক্রান্তির পরের দিন। আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করা হয়। নিমন্ত্রিতরা সকলেই একটা মুরগি, মুড়ি, চাল, হাঁড়িয়া ইত্যাদি সঙ্গে আনে। যদি কান ফুটো করার আগে বাচ্চা কাঁদে তাহলে সেই মুরগিটিকে আছাড় দিয়ে মারা হয়। মামা কিংবা দাদু কান ফুটোর কাজটি করেন। যার কান ফুটো করা হয় তাকে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সাজানো হয়। নতুন কাপড় পরানো হয় এবং চাল, দূর্বা, ধান ও প্রদীপ জ্বালিয়ে বন্দনা করা হয়। ফণিমনসার কাঁটা দিয়ে কান ফুঁড়ার কাজ করা হয়। তার আগে ফণিমনসার কাঁটাটি কাঁঠালপাতার ঠোঙ্গায় মুগ-বিরির সঙ্গে রাখা হয়। রাতে আত্মীয়দের হাঁড়িয়া খাওয়ানো হয় এবং নাচগান হয়।

মুণ্ডাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহের তেমন উল্লেখ পাওয়া না গেলেও অপেক্ষাকৃত কমবয়সে বিবাহের প্রচলন আছে। ছেলেপক্ষ থেকেই বিবাহের প্রথম প্রস্তাব আসে। ঘটক থাকে। পাত্রী দেখতে যাওয়ার আগে ঘটির জলে দূর্বাঘাস, ধানের আগড়া, সরষে এবং আতপচাল ফেলে দেওয়া হয় বর-কনের নাম দিয়ে। যদি বর-কনের নাম দেওয়া চাল দুটি একত্রে এসে যায় তাহলে ধরে নেওয়া হয় বিবাহ সুখের হবে। তখন কনে
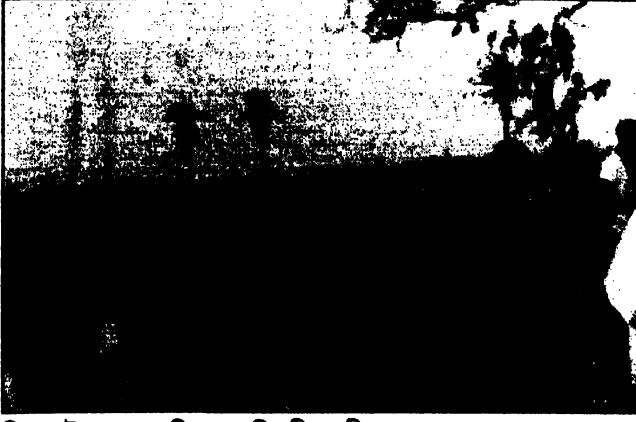
বিবাহ উৎসবে সুসজ্জিত আদিবাসী রমণীরা বরকে আবাহন করছেন
ছবি : কার্তিক মুর্মু

দেখতে যাওয়া হয়, অন্যথায় প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। ছাদনাতলায় বিয়ে হয়। শালগাছের ডাল, কলাগাছ পুঁতে সেখানে ঘট স্থাপন করা হয়। সাঁওতালদের ন্যায় মুণ্ডাসমাজেও কনে-পণ প্রদেয়। তবে গাই-গরু দান করবার প্রথা চালু নেই। বর-কনের রক্তে ভেজানো ন্যাকড়া 'সিনাই' পরস্পরের ঘাড়ে-গলায় ছোঁয়ায়। তারপর হয় সিঁদুরদান। বর-কনে সিঁদুর দিয়ে পরস্পরের কপালে দাগ কাটে এবং মালাবদল করে।

মুণ্ডাসমাজেও বিধবা এবং স্বামী-পরিত্যক্তা নারীর পুনরায় বিয়ের বিধান আছে। এটাকে 'সাঙ্গা বাপলা' বলা হয়। তবে এই স্ত্রীদের পূজাআর্চা এবং সমস্ত সামাজিক কাজকর্মে অধিকার থাকে না।

মুণ্ডাসমাজে এতদিন ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে বিবাহকর্মাদি সম্পন্ন করা হত না। নিজেদের সমাজের 'দেহুরী' বা 'পাহান' এরাই পূজারী বা পুরোহিতের কাজ করত। এখন সময় এবং অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডাদের পূজা-পাশায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং বাঙালি হিন্দু মতে সমস্ত পূজাআর্চা করা হচ্ছে।

মুণ্ডাদের মৃত্যু হলে শবদেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়। দশ দিন অশৌচ পালন করে এগারো দিনের মাথায় শ্রাদ্ধকর্মাদি করে এদের গোঁসাই বা গুরুবাবা। ছোট ছেলে-মেয়ের মৃত্যু হলে অবস্থা অনুযায়ী তিন দিন, পাঁচ দিন বা সাত দিনে শ্রাদ্ধাদি করা হয়। শ্রাদ্ধাদিতেও এখন বাঙালি হিন্দুমত এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরই প্রাধান্য।

মুণ্ডারা সিং বোঙ্গার উপাসক। পরলোকগত পূর্বপুরুষদেরও তারা দেবজ্ঞান করে। সিং বোঙ্গা বা পূর্বপুরুষদের তুষ্ট রাখতে তাদের উদ্দেশে মোরগ বা মুরগি উৎসর্গ করে থাকে। শূকর বা পাঁঠা বলি হয় না। মুণ্ডারা চণ্ডী পূজাও করে। অন্যান্য দেব-দেবীদের মধ্যে 'বুরু বোঙ্গা', 'ইকিড় বোঙ্গা' এবং 'নাগেএরা' উল্লেখযোগ্য। মুণ্ডাদের মধ্যে ধীরে ধীরে বাঙালি হিন্দুদের দেব-দেবীরও প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

পালিত উৎসব অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে 'বাহা', 'সহরায়', 'কারাম' এবং 'মকর' উল্লেখ করা যায়। পাঁতা-নাচ মুণ্ডাদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়।

এই সমাজে শিক্ষার হার খুবই কম। নারী-শিক্ষার হার অতি নগণ্য। তাই বিভিন্ন ভূত প্রেতে এদের বিশ্বাস আছে। ডাইনি-বিদ্যাতেও এদের বিশ্বাস আছে এবং অসুখ-বিসুখে তেল পাত দেখা হয়।

তবে অতি দ্রুত মুন্ডাসমাজের প্রচলিত রীতিনীতি ভেঙে যাচ্ছে। মুণ্ডারী ভাষার চেয়ে বাংলাভাষার প্রতিই এদের টান বেশি এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয়েও বাঙালি-হিন্দু ঘেঁষা।

ভূমিজ : পণ্ডিতদের মতে ভূমিজরা মুন্ডাদেরই একটি শাখা। এরা নিজেদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে না পেরে ধীরে ধীরে হিন্দুদের মতোই সমস্ত আচার-আচারণ করে। মুণ্ডাদের সঙ্গে এদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দূরত্ব তৈরি হওয়ায় আর কোনও রকম যোগাযোগ থাকেনি। এরা পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী জনসংখ্যার ৭ শতাংশ। মেদিনীপুর জেলার মধ্যে গোপীবল্লভপুর ১নং, গোপীবল্লভপুর ২নং এবং বেলপাহাড়ী ব্লক ভূমিজ অধ্যুষিত।

ভূমিজদের পোশাক-পরিচ্ছদ একসময় মুন্ডাদের মতোই ছিল। কিন্তু বর্তমানে অন্যান্য দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ যে ধরনের পোশাক ব্যবহার করে ভূমিজদের ব্যবহৃত পোশাকও তার বাইরে নয়। আগে তামা এবং পেতলের বাজু, বাংকি, চন্দ্রহার ইত্যাদি অলঙ্কার ব্যবহার করত। এখন বাজু, বাংকি, চন্দ্রহারের দিন শেষ। এখন সোনা-রুপোর দিকেই ঝোঁক বেশি। আর সঙ্গতির অভাবে বাজারে অতি সস্তার ইমিটেশন গরিব, মধ্যবিত্ত সবার অলঙ্কারের স্বাদ মেটাচ্ছে।

করম পূজা অনুষ্ঠান

কৃষিকার্যই এদের প্রধান জীবিকা। ভূমিজসমাজ পিতৃতান্ত্রিক। ভূমিজসমাজেও নিজস্ব পঞ্চায়েত এবং তার প্রধান থাকে, যেখানে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা এবং বিবাদের সমাধান করা হয়।

বাহা নৃত্যানুষ্ঠান

শিশু জন্মালে পরদিন অশৌচ পালন করা হয়। তারপর ক্ষৌরকর্ম এবং স্নানের মধ্য দিয়ে অশৌচ অবস্থার অবসান ঘটে। প্রসূতি এবং নবজাতকের অশৌচ কাটে একুশ দিনের মাথায়।

ভূমিজদের মধ্যেও 'পুলগু', 'হেমব্রম', 'পত্তি' প্রভৃতি গোত্রীয় বিভাগ এবং ধর্মীয় প্রতীক আছে। একই গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। অন্য জাতির সঙ্গে বিবাহ কার্যত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বরপণ নেই, আছে কন্যাপণ। ছাদনাতলায় মহুয়া এবং সিধা গাছের ডাল পুঁতে 'মাভওয়া' তৈরি করে ঘট বসানো হয়। এই সব প্রচলিত প্রথার বাইরেও ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করা হয়। মন্ত্রপাঠ করে পুরোহিতই বিয়ে দেন। সিঁথিতে সিঁদুরদান, মালাবদল, একসঙ্গে সাত-পা হাঁটা ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বিয়ের সাতদিন পরে স্নানের পর বর কয়েকবার তীর নিক্ষেপ করে এবং নিক্ষিপ্ত তীর খুঁজে আনতে হয় নববধূকে। সমাজে বিধবা-বিবাহ এবং বিচ্ছেদের পর পুনর্বিবাহ অনুমোদিত।

ভূমিজদের প্রধান দেবতা হলেন 'মিঞ বোঙ্গা'। গ্রাম-পুরোহিতকে বলা হয় 'লায়া'। ছাগল, মুরগি ইত্যাদি বলির প্রচলন আছে। ভূমিজরা 'বাযুত' দেবতারও পূজা করে। এছাড়া 'জাহিরবুরু', 'গরামধরম', 'ধুনকুদরা' ইত্যাদি দেব-দেবীও ভূমিজদের পূজ্য।

ভূমিজদের উৎসবগুলির মধ্যে 'বান্দনা', 'সারহুল', 'করম পরব' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগের দিনে তারা বাৎসরিক শিকারকেও উৎসব বলে গণ্য করত। বান্দনার সময় রাতে গাই জাগানো হয় এবং বান্দনার তৃতীয় এবং চতুর্থ দিনে বলদ এবং মোষ খুঁটানো হয়। মুণ্ডাদের মতোই ভূমিজরাও 'বুরু বোঙ্গা' এবং 'বড়াম' দেবতার পূজাও করে থাকে।

মৃতকে দাহ করাই সাধারণ নিয়ম। তবে বসন্ত বা কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে মৃতদেহ জঙ্গলের কোনও খাল বা গর্তে ফেলে দেওয়া হয়। ভূমিজদের আলাদা শ্মশান থাকত। মৃতের বাড়িতে তিনদিনের মাথায় তিতাভাত হয়। তারপর দশদিন অশৌচ পালন করে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হয়। আগে 'লায়া' সমস্ত পূজাআর্চার কাজ করলেও বর্তমানে হিন্দু বাঙালি রীতি অনুসারে ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা শ্রাদ্ধের কাজ করানো হয়।

মাহালি : পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে জলপাইগুড়ি এবং মেদিনীপুর জেলাতেই অধিক সংখ্যক মাহালির বাস। মাহালিদেরকে সাঁওতালদেরই বিচ্ছিন্ন শাখা বলে ধরা হয়। তারা পেশায় সাঁওতালদের থেকে আলাদা হওয়ার কারণেই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হয়। বাঁশের ঝুড়ি, কুলো, ডালা ইত্যাদি তৈরি করাই এদের পেশা। সাঁওতালদের মতোই মাহালিরা বিভিন্ন গোত্রে যেমন—হেমব্রম, মুর্মু, হাঁসদা, কিসকু, বেস্‌রা, টুডু, মাণ্ডি, বাস্‌কে, সরেন, চঁড়ে শ্যামা, গুঁদলি, ডুংরী ইত্যাদিতে বিভক্ত। গোত্রগুলির সামাজিক রীতি বা প্রথা পালনে কিছু তারতম্য এবং বিধিনিষেধ লক্ষ্য করা যায়। কেউ সুপারী খায় না, কেউ সিঁদুর ব্যবহার করে না, কারও শাখা পরা নিষিদ্ধ আবার কারও হলুদ রাঙা কাপড় চলে না। গ্রাম পরিচালনার নিয়ম এবং সংগঠন সাঁওতালদের মতোই। পোশাক-পরিচ্ছদ এবং গয়নাগাঁটির ব্যবহার সাঁওতালদের আদলেই। মেয়েরা উল্‌কি এবং ছেলেরা 'শিখী' পরে।

বাচ্চা জন্মালে পঞ্চম দিনে নখ-চুল কেটে স্নানের মাধ্যমে অশৌচ অবস্থার শেষ হয় এবং পাড়াপ্রতিবেশীদের 'নিম দাঃমড়ি' (তিতাভাত) এবং হাঁড়িয়া খাওয়ানো হয়। এটিকে 'ছাটিয়ার' অনুষ্ঠান বলা হয়। এই সময় নবজাতকের নামকরণও করা হয়। এই অনুষ্ঠান শিশু জন্মের পঞ্চম দিনে করা হয় বলে একে 'মড়ে মাহাঁ' বলেও চিহ্নিত করা হয়।

সহরায় উৎসবে গৃহের নতুন রঙ

অল্প বয়সেই ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের প্রথম প্রস্তাব আসে ছেলেপক্ষ থেকেই। কন্যাপণ প্রচলিত আছে। কনে পছন্দ হলে পাত্র-পক্ষের কর্তা ব্যক্তিরা মালা অথবা শাড়ি দিয়ে কনেকে আশীর্বাদ করে। তারপর বিয়ের দিন স্থির হয়। বিয়ের সময় বর বাম হাতের তর্জনী এবং বুড়ো আঙুলের মধ্যে সিঁদুর
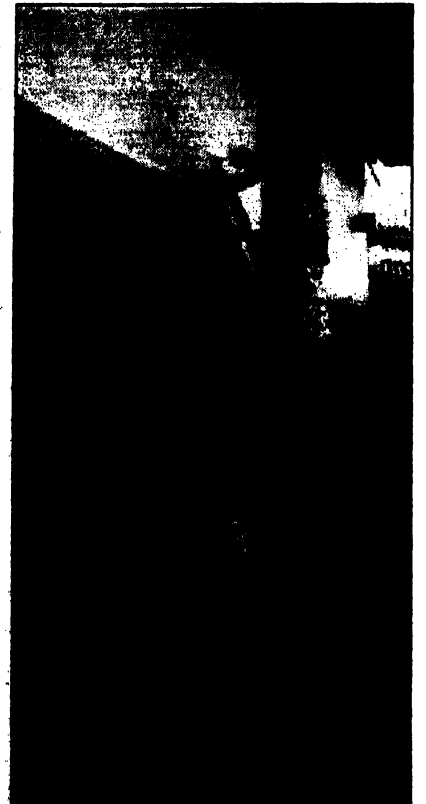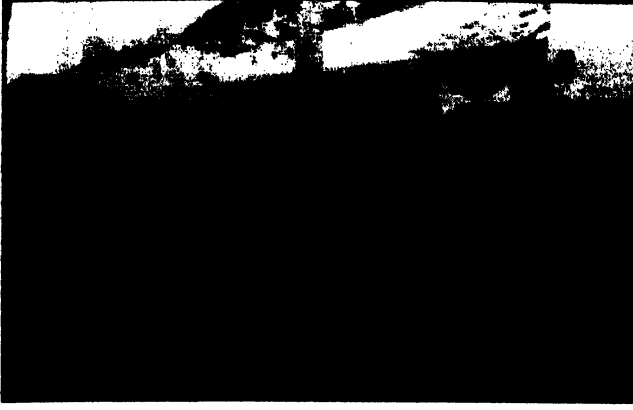
সহরায় অনুষ্ঠান ছবি : কার্তিক মুর্মু

ধরে নিয়ে কনের মাথায় পরপর পাঁচ-বার সিঁদুর প্রদান করে এবং এতেই বিবাহের কাজ সম্পন্ন হয়।

ছেলে-মেয়ে ভালোবেসে বিয়ে করলে সমাজের কর্তারা কনেপক্ষের মোড়ল এবং ওয়ারিশ ডেকে কন্যাপণ আদায় ও সামান্য শাস্তিবিধানের মাধ্যমে বিবাহটিকে বিধিসম্মত করে নেওয়া হয়। বিধবা এবং স্বামী-পরিত্যক্তা মহিলারও পুনরায় বিবাহ হয়।

মাহালিরাও সাঁওতাল, মুন্ডা এবং ভূমিজদের মতো 'বাহা', 'সহরায়', 'কারাম', 'দাঁসাই', 'মাঘসিম' ইত্যাদি উৎসব পালন করে। এখন অবশ্য দুর্গাপূজাও আদিবাসীদের আঙিনায় হাজির হয়েছে। তাই পূজায় নতুন জামা-কাপড় ইত্যাদির চল হয়েছে। অবশ্য 'মকর' পরব আগে থেকেই এরা পালন করে আসছে, তখনও নতুন বস্ত্র পরিধানের একটা রীতি চলে আসছে।

মাহালিরা 'সিঞ বোঙ্গা' বা সূর্যদেবের উপাসক। 'জাহের থানে' ছাগ, মুরগি বলি দিয়ে সিঞ বোঙ্গাকে তুষ্ট করা হয়। সিঞ বোঙ্গা ছাড়াও মাহালিরা ধরম দেবতার পূজা করে শীতকালে। পূজাস্থলে লম্বা বাঁশের মাথায় একখণ্ড কাপড় পতাকার মতো উড়িয়ে দেওয়া হয় এবং মাটির হাতি-ঘোড়া চারপাশে সাজিয়ে রেখে সিঁদুর পরানো হয়। গ্রাম্য পুরোহিতই সমস্ত পূজাদি সম্পন্ন করেন।

মাহালিরা মৃতদেহ দাহ করে আবার কবরও দেয়। দাহ এবং কবর দেওয়ার সময় গোত্রের বিভাগ অনুযায়ী অনুসৃত বিধির প্রয়োগে সামান্য হেরফের হয়ে থাকে। দশদিন অশৌচ পালনের পর শ্রাদ্ধকর্মাদি সম্পন্ন হয়। মৃতের সৎকারের দিনে সন্ধের সময় মৃতের পরিজনেরা দু-তিনজন গ্রাম্য ব্যক্তিকে নতুন কুলোর মধ্যে কিছু আতপচাল ফেলে তার ওপর বিলি কাটতে কাটতে মৃতের আত্মাকে আহ্বান করা হয়। মৃতের আত্মা তাদের ওপর ভর করলে পরিজনেরা তার ইহলোক ত্যাগের কারণ জানতে চান এবং মৃত্যুর কারণ জানতে পারেন। শ্রাদ্ধের দিনে মৃতের উদ্দেশে ভেড়া, ছাগল, মুরগি ইত্যাদির মাথায় আঘাত দিয়ে মেরে রক্ত উৎসর্গ করা হয়। জল এবং রান্না করা খাদ্যও পরলোকগত আত্মার প্রতি নিবেদন করা হয়।

কুটিরশিল্পের কাজে মেয়েরা পুরুষদের সমান দক্ষ হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষদেরই প্রাধান্য। অবশ্য গ্রাম্য পূজাদিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ স্বীকৃত, যেটা অন্য আদিবাসীদের মধ্যে অনুপস্থিত। এদের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং শিক্ষা ক্ষেত্রেও তারা একেবারে পিছিয়ে। শতকরা এক শতাংশেরও কম।

অন্যান্য পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের মতো মাহালিরাও নানান ভূত, প্রেত, ডাইনি, কুদরা ইত্যাদি এবং মন্ত্রতন্ত্র ও কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন।

কোড়া : কোড়াদের পরিচিতি মাটি কাটার শ্রমিক হিসাবেই। এরাও মুণ্ডাদেরই এক বিচ্ছিন্ন শাখা। একসময় ধলো, মালো, সোনরেখা, বাদামিয়া, শিখরিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন গোষ্ঠী হিসাবে এদের পরিচয় ছিল। যে অঞ্চলে এরা বাস করে সেখানকার কথ্যভাষায় এরা কথা বলে। মাটি কাটা এদের পেশা হওয়ায় গাঁইতি, কোদাল, কুড়াল, সাবল, ঝুড়ি এবং ঝাঁকা (বাঁক সম্বলিত এক ধরনের শিকে) থাকে। উপার্জনের কাজে নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে সমান শ্রম দেয়। মাটি কাটার কাজে কোড়াদের একচেটিয়া অধিকার বজায় না থাকায় তারা জীবিকা অর্জনের জন্য অন্যান্য কাজও করে। শিকারজীবী না হলেও এরা মাঝে মধ্যে ছোটখাটো শিকার অভিযান করে।

কোড়ারাও কতকগুলি গোত্রে বিভক্ত। গ্রাম প্রধান বা পুরোহিত 'মাহাতো' হিসাবে পরিচিত। তিনিই যাবতীয় অভিযোগের নিষ্পত্তি এবং পূজা-পাশার কাজ করেন।

কোড়া মায়ের কোলে সন্তান এলে মুণ্ডাদের মতো নয়দিন অশৌচ থাকে। নবম দিনে আদিবাসী সমাজের সাধারণ প্রথা অনুসারে শুচিকর্ম সম্পাদন করা হয়।
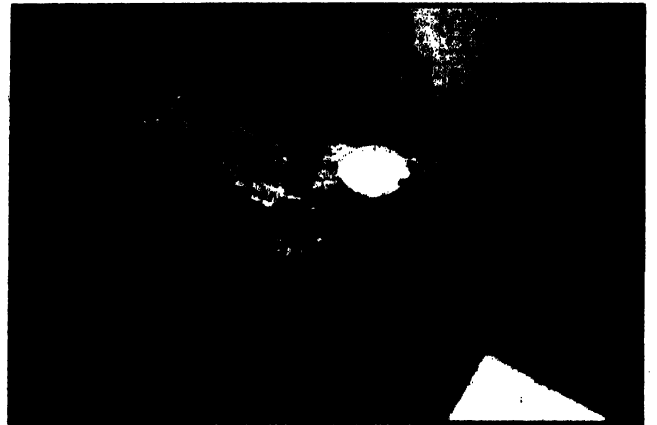
সহরায় অনুষ্ঠানে গরু পূজায় আলপনা ছবি : কার্তিক মুর্মু

কোড়াসমাজে বিবাহের নিয়ম অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর অনুরূপ। খুব একটা তারতম্য লক্ষ্য করা যায় না। এদের মধ্যেও 'সাঙ্গা' বিবাহ চালু আছে।

কোড়ারা বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসক হলেও অন্যান্য আদিবাসীদের মতোই কোনও মূর্তিপূজা করে না। কোড়াদের

গ্রাম-দেবতা বা গরাম ঠাকুরের উদ্দেশে হাঁস, মুরগি, ভেড়া, পাঁঠা উৎসর্গ করা হয়। বনের দেবতা 'রাগেশ্বর'-কেও তারা পূজা করে। কোড়া মেয়েরা মাহালি মেয়েদের মতোই পূজা-অর্চনার সমান অংশীদার। কোড়ারাও 'করম', 'সহরায়', 'সাকরাত' ইত্যাদি উৎসব পালন করে থাকে।

কোড়াদের মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়। শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হয় দশম দিনে। শ্রাদ্ধাদির কাজকর্ম মুণ্ডাদের মতো করেই করা হয়। কোড়ারা সমাজে অবহেলিত এবং শিক্ষা-দীক্ষায় অত্যন্ত অনগ্রসর ও আর্থিক দিক থেকেও দরিদ্রসীমার নীচে।

লোধা : মেদিনীপুর জেলার জঙ্গল এলাকায় লোধারা বাস করে। ঘাটাল, তমলুক, ঝাড়গ্রাম মহকুমা এবং মেদিনীপুর সদরের গ্রামগুলিতেই এরা সংখ্যাধিক্য। প্রায় ৩৫৪টি গ্রামে বাস করে। আসলে এরা শিকারী জাত। ছোট ছোট পশু-পক্ষী শিকার করে এবং জঙ্গলের ফলমূল, মধু, ধুনা প্রভৃতি বনজ দ্রব্য সংগ্রহ করে জীবিকা অর্জন করে থাকে। লোধাদের প্রাক-দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীর বলেই মনে করা হয়। এরা যে অঞ্চলে বসবাস করে সেই অঞ্চলের ভাষাতেই কথা বলে। অরণ্য ধ্বংসের ফলে বনজ দ্রব্যের লভ্যতা কমে যাওয়ায় লোধাদের কিছু অংশ ধীরে ধীরে কৃষিকাজের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে এবং চাষী হিসাবে রীতিমতো সাফল্য অর্জন করছে। তবে অপরিমিত এবং অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের দরুন এরা কৃষি পেশার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করার ভরসা পায় না। সকালবেলায় পান্তা খেয়ে মেয়ে-পুরুষ এমনকি অল্পবয়সীরাও জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এবং আহরিত দ্রব্যাদি বাজারে বিক্রি করে খাদ্যদ্রব্য কিনে পড়ন্ত বিকেলে বাড়ি ফেরে। এটাই এদের জীবনের রুটিন।

লোধারা নয়টি গোত্রে বিভক্ত যথা—কোটাল, মল্লিক, নায়েক, দিগার, ভুক্তা, পরামাণিক, দণ্ডপাট, আহরি, ভুঁইয়া।

লোধাদেরও একজন গ্রাম প্রধান এবং 'দেহরি' বা পূজারী থাকেন। শিশু জন্মাবার একুশ দিনে অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে অশৌচ কাটে। অতি অল্প বয়সেই লোধারা ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয়। লোধাসমাজেও কনেপণ দেওয়া-নেওয়া হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে সিধা গাছের গোড়ার মাটি ব্যবহার এদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কনের মামাই কন্যা সম্প্রদান করেন। লোধাদের মধ্যেও পুনর্বিবাহ স্বীকৃত।

লোধাদের নিজস্ব কোনও উৎসব না থাকায় এরা টুসু এবং বাদনা পালন করে। পুরুষেরা 'চাঙ্গ' নাচ করে। এ ছাড়া ঝুমুর এবং পাঁতানাচ করতেও দেখা যায়। মেয়েরা টুসু ইত্যাদির গীত গাইলেও তাদের সমাজের নাচ-গানে অংশ নিতে দেখা যায় না।

লোধাদের পূজিত দেব-দেবীর মধ্যে 'বড়াম' দেবতাই প্রধান। দেব-দেবীর পূজা লোধা পুরোহিতই করে থাকে। পূজাতে কোনও জীব উৎসর্গ করা হয় না। জঙ্গলের ফলমূল দিয়েই দেবতার পূজা করা হয়। বড়াম দেবতার অধিষ্ঠান জঙ্গল সংলগ্ন কোনও বড় গাছের নীচে। লোধারা বনদেবী 'চণ্ডী'রও উপাসক। তাঁরও অধিষ্ঠান গাছের নীচে। ফল-ফুল এবং ছাগল, মুরগি তাঁর উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়।
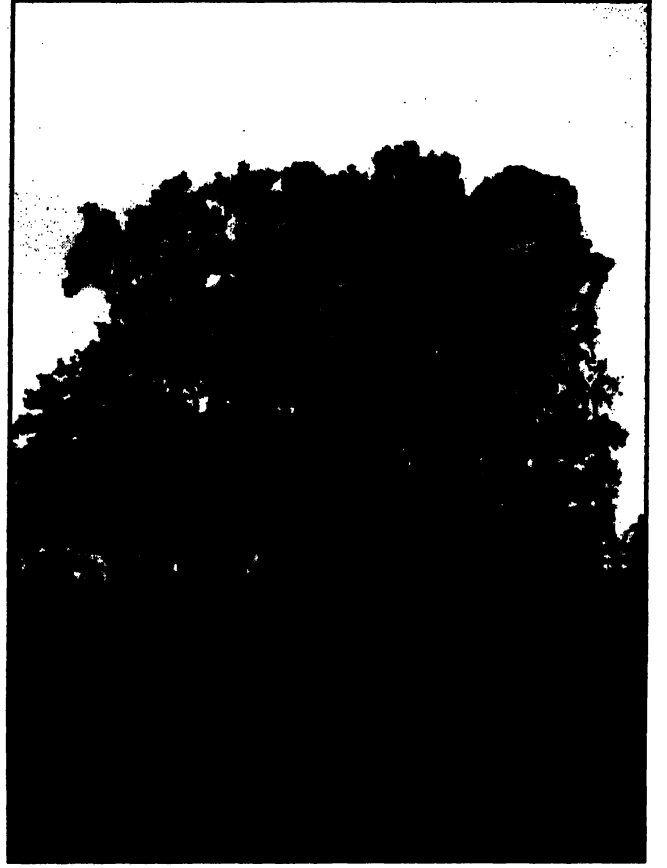
চিলগোড়া গ্রামে জাহের থান — ছবি : জহরলাল হাঁসদা

এ ছাড়াও তারা মা শীতলা, বসুমাতা এবং 'ধরম দেবতার' পূজা করে থাকে। উৎসবে কিংবা বিয়ের সময় বসুমাতা ও ধরম দেবতার পূজা করা হয়।

লোধারা ভূত, প্রেত, ডাইনি, যুগনী এবং তুক-তাক ও মন্ত্রের ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস করে। রোগ অসুখে গাছ-গাছড়ারও ব্যবহার তারা করে থাকে।

মৃতদেহ পোড়ানোও হয় আবার কবরও দেওয়া হয়। ভূত-প্রেতদের দূরে রাখতে মৃতের খাটিয়ায় কাস্তে বা লোহার কিছু রাখা হয়। মৃতদেহ চিতায় চাপানোর আগে পর্যন্ত একজন মৃতের খাটিয়াটি ধরে রাখে। দশদিন অশৌচের পর শ্রাদ্ধাদি হয়। পরলোকগত আত্মাদের প্রতি জল উৎসর্গ করা হয়। রান্না করা খাবারও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে নিবেদন করা হয়। গর্ভাবস্থায় লোধা রমণীর মৃত্যু হলে কোনও অশৌচ পালন করা হয় না।

অরণ্য সন্নিহিত অঞ্চলের লোধারা কদাচিত স্নান করে বা তাদের পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার করে। হতে পারে সারাদিন খাদ্য অন্বেষণ এবং সংগ্রহের কাজেই তাদের সমস্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার জন্য এমন করে। আবার একটির বেশি পরিধান না থাকার জন্য সেটি কেচে পরিষ্কার করবার কোনও অবকাশ থাকে না। এটি তাদের শোচনীয় দুর্দশারই পরিচায়ক। অনেক

সংস্থা এদের উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত থাকলেও বাস্তবে তেমন কোনও পরিবর্তনের ছাপ চোখে পড়ে না। তাই বেঁচে থাকার তাগিদে এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রচেষ্টায় তারা নানান অসামাজিক কাজেকর্মেও জড়িয়ে পড়ছে।

খেড়িয়া : খেড়িয়ারা আদি কোল গোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং মুন্ডাদের সঙ্গে আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। এরা সামগ্রিক অর্থেই নিরক্ষর। এদের ভাষা লুপ্তপ্রায় এবং ছড়া, কাহিনী, লোককথা ইত্যাদির তেমন কোনও প্রচলন না থাকায় সামাজিক প্রথাগুলি ধরে রাখা যায়নি। লোধাদের সঙ্গে খেড়িয়াদের কিছু কিছু মিল থাকলেও গোত্র ও ধর্ম আলাদা। জঙ্গল এবং পাহাড় বা তাদের কোলে এদের বাস।

খেড়িয়ারা পাহাড়ী-খেড়িয়া, দুধ-খেড়িয়া এবং ঢেলকি-খেড়িয়া ইত্যাদি গোত্রে বিভক্ত। খেড়িয়াদের জীবিকার স্থায়ী কোনও পেশা নেই। জঙ্গল থেকে ফল-মূল, শাক-পাতা কিংবা পশু-পাখি শিকার করে দিন যাপন করে। জঙ্গল থেকে কাঠ, পাতা, মধু সংগ্রহ করে তা বিক্রি করেও তারা জীবিকা অর্জন করে।

খেড়িয়ারা এখন আর গোত্রীয় বিধিনিষেধ মেনে চলে না। তবে পূর্বে গোত্রীয় প্রতীককে খাদ্য হিসেব ব্যবহার করতে পারত না। স্পর্শ করলে স্নান করে অপরাধ খণ্ডন করতে হত।

খেড়িয়া নারী মুণ্ডা পুরুষের স্ত্রীরূপে গ্রহণযোগ্যা। কিন্তু মুন্ডা মেয়ের বিয়ে খেড়িয়া ছেলের সাথে কখনও হয় না। বিয়ের প্রথম প্রস্তাব আসে পাত্রপক্ষের থেকে। কন্যাপণ হিসাবে এক থেকে দশটি পর্যন্ত গরু-বাছুর দিতে সম্মত হলে তবেই বিয়ের দিন স্থির হয়। খেড়িয়াদের বিয়ে মাঘ মাস ছাড়া অনুষ্ঠিত হত না। বিয়ের সাবেক নিয়ম ছিল অন্য যে কোনও আদিবাসীদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিয়ের আগের দিন কনের পরিজনেরা কনেকে সঙ্গে করে বরের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ওই গ্রামে পৌঁছে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়। সেখানে বরযাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং উভয় পক্ষকেই একটি করে মাটির জলের পাত্র দেওয়া হয়। সারাদিন খাওয়া-দাওয়া এবং নাচ-গানে অতিবাহিত হয়। পরের দিন খুব সকালে বর-কনেকে তেল মাখিয়ে স্নান করানো হয়। পাঁচ আঁটি খড় মাটিতে বিছিয়ে তার উপর একটি জোয়াল রাখা হয়। এই জোয়ালের উপর বর-কনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর দেয় আর কনেও বরের কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দেয়। এইভাবেই বিবাহ সম্পন্ন হয়। কনেপণের সম্পূর্ণ দেয় মিটিয়ে দিলে কনের বাবা মেয়েকে কাপড়-চোপড় দেয় এবং বিয়ের এক মাস পর জামাইকে একটি 'এঁড়ে' গরু দান করে।

বিধবা বিবাহ সমাজে প্রচলিত। সে ক্ষেত্রে একটি গরু কনেপণ হিসাবে প্রদেয়। বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে কনেপক্ষকে গৃহীত পণের গরু ফেরত দিতে হয়। বিচ্ছেদপ্রাপ্ত মহিলার পুনরায় বিয়ে হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কনেপণের মূল্য দুটি গরু।

সম্পত্তির উত্তরাধিকারে বড় ছেলে দুই অংশ বেশি পায়। এ ছাড়া একই পিতার স্বাভাবিক নিয়মে বিবাহিত স্ত্রীর ছেলেরা পৈতৃক সম্পত্তির অংশ সাঙ্গা করা স্ত্রীর ছেলেদের চাইতে বেশি পায়।

নানান আরাধ্য দেব-দেবীর মধ্যে 'গিরিং' বা সূর্যদেব প্রধান এবং বাড়ির কর্তা তার জীবৎকালে অবশ্যই একটি মুরগি, একটি শূকর, একটি ছাগল, একটি ভেড়া এবং সব শেষে একটি মহিষ বলি দেবে। 'জোলোঃ দুবো' বা চাঁদকেও তারা দেবতা মানে।

খেড়িয়াদের মধ্যেও ভূত-প্রেত, চুড়িন, মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদিতে বিশ্বাস আছে। খেড়িয়ারা মৃতদেহ দাহও করে আবার কবরও দেয়। মৃত্যুজনিত অশৌচ সাত থেকে দশদিন পালন করা হয়।

আজ থেকে ১৩০-৪০ বছর আগেকার আদিবাসীদের সামাজিক রীতিনীতি এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। শিক্ষার প্রসার, যোগাযোগ বৃদ্ধি, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং সার্বিকভাবে মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, একটু খেয়ে-পরে বাঁচার ইচ্ছা মানবসমাজের সাংস্কৃতিক জগতেও অনিবার্যভাবেই একটা পরিবর্তনের ছাপ পড়েছে। তাই আদিবাসীদের জীবনেও তাদের সেই মান্ধাতার আমলের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি অটুট থাকার কথা আশা করা যায় না। তাই তখনকার সঙ্গে এখনকার একটা তফাত চোখে পড়বেই। খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলনের যে মৌলিকত্বের জোরে আদিবাসীদের অতি সহজেই চেনা যেত, আজকের দিনে সেটা দিয়ে তাদের চেনা নাও যেতে পারে। এটাই খুব স্বাভাবিক। আজকের সভ্য সমাজও নিশ্চয়ই চায় না যে, আদিবাসীরা আগের মতোই জঙ্গলের ফল-মূল আহরণ করে বা পশুপাখি শিকার করে জীবনধারণ করুক এবং অরণ্যচারী হিসাবে নিজেদের পরিচয় বহন করুক। আদিবাসীদের নিজেদের সমস্ত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হুবহু বজায় রাখতে গেলে তাদের আবার জঙ্গলেই ফিরে যেতে হবে। সেটা যেমন সম্ভব নয়, তেমনই সভ্যতা বা অগ্রগতির নামে বা অন্য সংস্কৃতির তুলনামূলক বিচারে নিজেদের সংস্কৃতিকে নিকৃষ্ট ভেবে তাকে অবহেলা এবং ত্যাগ করলেও তারা অনেক কিছুই যা সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিচারে মূল্যবান সেগুলিকে হারিয়ে বসবে। আদিবাসীদের মধ্যে এমন কিছু গোঁড়া মানুষ আছেন যাঁরা ওইসব পুরনো প্রথাগুলিকে সংস্কৃতি রক্ষার নামে আঁকড়ে রাখতে চান, যার ফাঁক-ফোকর দ্বারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারেন।

আদিবাসী সংস্কৃতিতে ইতিবাচক এমন অনেক কিছু উপাদান আছে যা তথাকথিত উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষজনের কাছেও অনুকরণীয়। কাজেই সেই সব ঐতিহ্যমণ্ডিত মূল্যবান সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিকে রক্ষা করা প্রয়োজন। যা কিছু ভাল তা আপনা-আপনি অক্ষত থাকবে না, যদি না তার রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়।

লেখক : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক
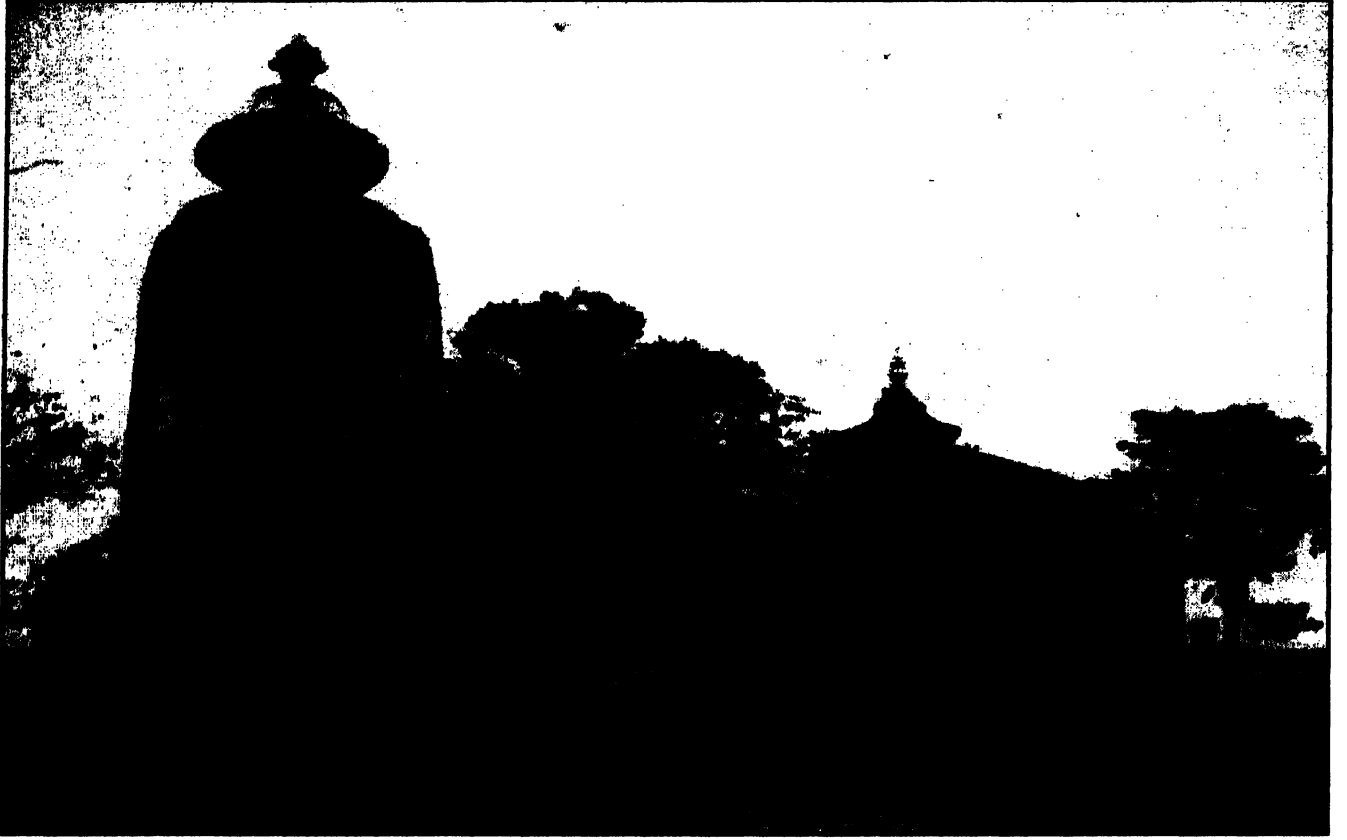
রামেশ্বরনাথের মন্দির, দেউলবাড় ছবি : তারাপদ সাঁতরা
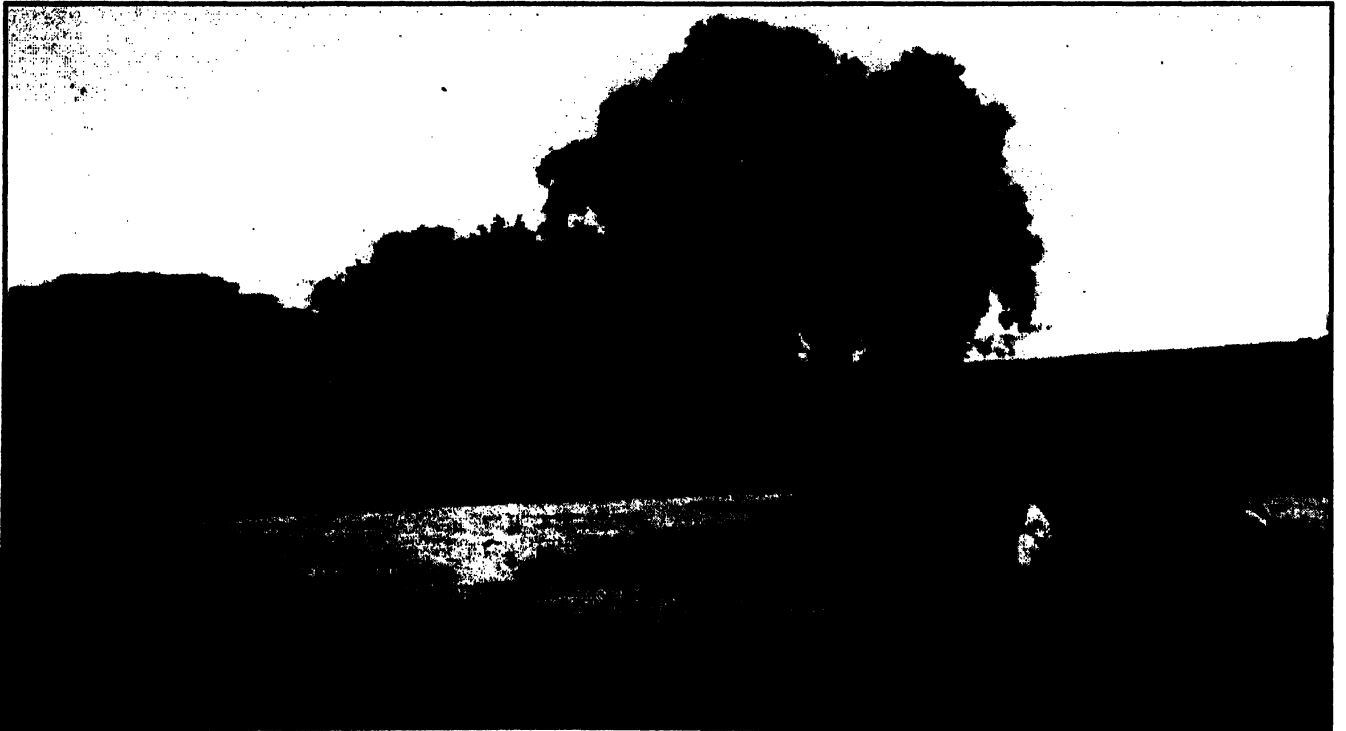
করমবেড়া পাথরের স্থাপত্য, গগনেশ্বর ছবি : তারাপদ সাঁতরা

বাহা অনুষ্ঠানে নৃত্যগীতের আসর

মেদিনীপুরের ঐতিহ্য : নৃতাত্ত্বিক মূল্যায়ন

বেলা ভট্টাচার্য

মেদিনীপুর জেলা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ জেলাই নয়, রাজ্যের প্রাচীনতম ভূমিরূপও বটে। বন্দরনগর তাম্রলিপ্তের সভ্যতার সূচনা ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে। পরিসর ঐতিহাসিক সভ্যতার সীমানা ছাড়িয়ে জেলার প্রাচীনত্বের শিকড় বিস্তৃত রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক কালেও। কাঁথির সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল ; দীঘার নবীন এবং কাঁথির প্রাচীন বালিয়াড়ি ভূতাত্ত্বিক সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নবীন হলেও, জেলার উত্তর-পশ্চিমের প্রত্যন্ত মালভূমি ও বন্ধুর আদি ভূপ্রাকৃতিক পরিবেশে আদিম মানুষের পদচিহ্ন পড়ে ছিল লক্ষ বছর পূর্বে। এই অঞ্চলে আদিবাসীদের বসবাস ও শুরু হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগেই। বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় মেদিনীপুরের ঐতিহ্য তাই সুপ্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক, ঐতিহাসিক ও বর্তমানকালে সংস্কৃতির অপূর্ব বিন্যাস মেদিনীপুরকে দিয়েছে এক অনন্য চরিত্র। এখানে বলা প্রয়োজন যে, মেদিনীপুর শহরের পত্তন হয়েছিল ত্রয়োদশ শতকে। আর স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের অবদানের কথা প্রায় সকলের কাছে সুবিদিত। বর্তমান প্রবন্ধে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূপ্রাকৃতিক পটভূমিকায় প্রাগৈতিহাসিক, ঐতিহাসিক ও সমকালীন যুগে মানুষের জীবনধারা ও সংস্কৃতি তথা আদিবাসী সমাজের এক সংক্ষিপ্ত আলেখ্য তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন

মানব সংস্কৃতির উষালগ্ন থেকেই মেদিনীপুর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভূতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম ভূমিভাগের দেখা মেলে এই জেলারই মূলত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। এগুলিকে বলা হয় আর্কিয়ান সিস্ট্‌স। পৃথিবীতে প্রাণের উন্মেষের বহু আগেই এই শিলাস্তর গঠিত হয়েছিল। এছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে প্যারাসিস্ট্‌স আর প্যারা নিস্‌ প্রস্তরনির্মিত ভূমিস্তর। বর্তমানে মেদিনীপুরের এই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল (ঝাড়গ্রাম-বেলপাহাড়ি-বাঁশপাহাড়ি) মূলত ছোটনাগপুরের মালভূমিরই একটি বিস্তৃতির অংশবিশেষ। এই ঢেউ খেলানো মালভূমি অঞ্চলকে ভেদ করে রয়ে গিয়েছে সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, তারাফেণী ইত্যাদি নদী-উপনদী। গড়ে একশো থেকে তিনশো মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এই নদীগুলির উপত্যকায় আমরা পাচ্ছি বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির নিদর্শন।
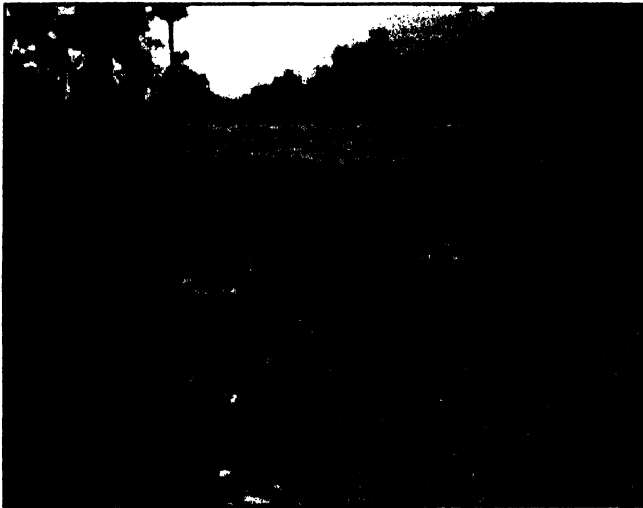
প্রাগৈতিহাসিক ভূ-স্তর বিন্যাসে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা কিছু হাতিয়ার

প্রাগৈতিহাসিক আদিম মানুষের (হোমো ইরেক্টাস) দ্বারা প্রায় দেড় লক্ষ বছর পূর্বের ব্যবহৃত হাতিয়ার সামগ্রীর নিদর্শন পাওয়া যায় পশ্চিম অঞ্চলের একাধিক নদী উপত্যকায়। এই সমস্তই হল পুরাপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার যে সময় আদিম মানুষ সদা ভ্রাম্যমাণ গোষ্ঠীবদ্ধ শিকারির জীবনযাপন করত। বর্তমান মানুষের প্রত্যক্ষ উত্তরপুরুষ নিয়ানডারথাল মানুষদের মুস্তেরীয় সংস্কৃতির ধারা যে একদা এ অঞ্চলে প্রবহমান ছিল, তা আমরা জানতে পারি ওই সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাপ্ত হাতিয়ারগুলি থেকে। মুস্তেরীয় ডিস্ক, পয়েন্ট, বিভিন্ন ধরনের স্ক্র্যাপার এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মেদিনীপুরের এই অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরেরই, যথা—আদি, মধ্য ও অন্ত বিকাশের সাক্ষাতও আমরা পেয়েছি।

মধ্য প্রস্তর যুগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচুর হাতিয়ার ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে মূলত তারাফেণী নদীর দুই তীরবর্তী অঞ্চল থেকে। এই নদীরই পার্শ্বস্থ কেচেন্দা অঞ্চলে এত প্রচুর পরিমাণে ক্ষুদ্র হাতিয়ার ফলক পাওয়া গিয়েছে যে অনুমান করা হয়—এই অঞ্চল প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের হাতিয়ার উৎপাদন কেন্দ্র ছিল। এই সাংস্কৃতিক যুগটির সূচনা হয়েছিল বর্তমান যুগের (হোলোসিন) প্রারম্ভে অর্থাৎ প্রায় ৮ থেকে ৫ হাজার খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে।

নব্যপ্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হাতিয়ার মেদিনীপুরের বহু স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশে প্রাপ্ত নব্যপ্রস্তরযুগীয় হাতিয়ারের সঙ্গে মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি ইত্যাদি অঞ্চলে প্রাপ্ত হাতিয়ারের কিছু সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মেদিনীপুরে প্রাপ্ত এই হাতিয়ারগুলি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নব্যপ্রস্তরযুগীয় ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। ধারণা করা হয় যে, মেদিনীপুরে এই সমস্ত নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার আনীত হয়েছিল অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাভাষী মানুষের দ্বারা। এইসব মানুষ (যেমন, কোল, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ ইত্যাদি) যে নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্য বহন করে আনল, তা তাদের কৃষিকার্য-প্রধান অর্থনৈতিক জীবনের এক প্রভাব বলেই আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়।

তাম্রাশ্ম যুগ

তাম্রাশ্ম ও তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের কিছু তাম্রনির্মিত বস্তু সামগ্রীর নিদর্শন আমরা এই জেলার তামাজুড়ি, সিজুয়া (বিনপুর), চাতলা (কাঁথি) ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলগুলি থেকে পাচ্ছি। এরপরেই আমরা ঐতিহাসিক যুগে পর্দাপণ করি, যে সময়ের সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল তাম্রলিপ্ত বা তমলুক। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সময়েই আমরা এই অংশে উন্নত সভ্যতার নিদর্শন পাই। প্লিনি, টলেমির বিবরণ পরবর্তী কালে ফা হিয়েন, হিউয়েন সাঙের ভ্রমণলিপি ইত্যাদিতেও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ পাচ্ছি। এইভাবেই জেলার এক অংশের প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির সঙ্গে অপর অংশের ঐতিহাসিক সভ্যতার এক ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্নতার স্রোত এই জেলাটিকে নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সংস্কৃতি সভ্যতার ক্রমোন্নয়ন নিরূপণের এক গুরুত্বপূর্ণ আধারে পর্যবসিত করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই জেলার বিনপুর থানা এলাকার সিজুয়ায় তারাফেণী-কংসাবতী নদী উপত্যকায় প্রায় ১০,০০০ বছরের প্রাচীন মানবদেহের জীবাশ্মীভূত নিম্ন চোয়াল আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজ্যে প্রাপ্ত মানবজীবাশ্মের মধ্যে এটিই প্রাচীনতম, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এটি হোমো স্যাপিয়েন্স বা বর্তমান মানুষের।

ঐতিহাসিক যুগ

ঐতিহাসিক সভ্যতায় পদার্পণের সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণগুলি আমরা পাচ্ছি তাম্রলিপ্ত থেকে। শুধু বন্দর শহর হিসাবে নয়, ধর্মীয় সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবেও প্রাচীনকাল থেকেই তাম্রলিপ্ত
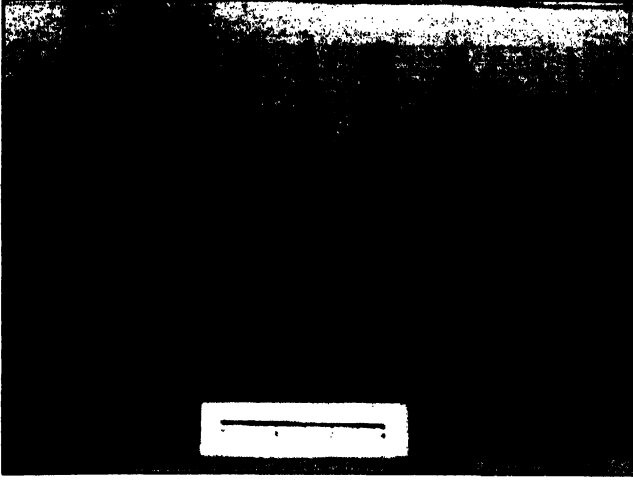
মধ্যপ্রস্তর যুগের ক্ষুদে হাতিয়ার

গুরুত্বপূর্ণ। তাম্রলিপ্ত ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল ছিল বৌদ্ধধর্মের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। হিউয়েন সাঙ বা ফা হিয়েনই নয়, অন্যান্য চৈনিক পরিব্রাজক যেমন ইং সিঙ, তাং চেং জেং, লুই লুন, উ হিন চেং কন প্রমুখের ভ্রমণলিপিতেও এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে। ফা হিয়েনের বিবরণী থেকে জানা যায় এই অঞ্চলে ২৪টি বৌদ্ধবিহার ছিল। মহান সম্রাট অশোকের পুত্র ও কন্যা, মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা এই স্থান থেকেই বোধিদ্রুম-সহ সিংহলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন সমুদ্রপথে। হিউয়েন সাঙের বিবরণী থেকে জানতে পারা যায় যে, মৌর্য সম্রাট একটি প্রায় তিন মিটার উচ্চ স্তম্ভ তাম্রলিপ্তে নির্মাণ করেন।

মন্দির-দেউল : লোকায়ত পরিবৃত্ত

ধর্মজীবনের প্রসঙ্গেই এসে পড়ে, মন্দির ও দেবালয়ের কথা। দীর্ঘকাল প্রশাসনিক ভাবে ওড়িশার অধীন থাকার কারণে, এখানকার মন্দিরশৈলীতে স্পষ্ট ওড়িশি প্রভাব দেখা যায়। ওড়িশার পিঢ়রীতির মন্দির স্থাপত্যের অনুপম বিকাশ লক্ষ করা যায় বড়দেউল বা মূল মন্দিরের জগমোহন পরিদর্শন কক্ষের মধ্যে। এই রীতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলি হল গড়বেতার কণ্ডরেশ্বর মন্দির, লালগড়ের সন্নিকটস্থ ডাইনটিকরির রঙ্কিনী দেবীর ল্যাটেরাইট নির্মিত মন্দির ইত্যাদি। মেদিনীপুর শহরের নিকটস্থ তালকুই গ্রামের মন্দিরে ; দাঁতন, কেশিয়াড়ির মন্দিরগুলিতে পিঢ়রীতির প্রভাব দেখা যায়। জোড়বাংলা মন্দিরশৈলীও একটি গুরুত্বপূর্ণ শৈলী ; চন্দ্রকোনার দক্ষিণবাজারের মন্দিরটি এই শৈলীর সাক্ষ্য বহন করে। ঈষৎ বক্র সুঠাম চারচালা রীতিতে তৈরি হয়েছে জয়ন্তীপুরের মন্দিরটি। ঘাটাল, কোন্নগরের সিংহবাহিনীর মন্দির চারচালা রীতিতে নির্মিত প্রাচীনতম মন্দির। এছাড়া উল্লেখযোগ্য হল, গোপীবল্লভপুরের রামেশ্বরনাথ মন্দিরটি।

মেদিনীপুরের মন্দিরগুলির গুরুত্ব শুধু ঐতিহাসিক কারণেই নয়, সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনায়ও এগুলি গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানত আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে স্থানীয় রাজা, সামন্ত প্রভুরা মন্দির, দেউল ইত্যাদি নির্মাণ করেন। দেখা গিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে আদিবাসীদের আরাধ্য দেবদেবী কিঞ্চিৎ 'সংস্কার' হয়ে স্থান পেয়েছে এই সমস্ত মন্দিরে। ফলত আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এ সমস্ত দেবালয়ের গুরুত্ব তো কমেইনি উপরন্তু এই সমস্ত মন্দিরের অবস্থানে, প্রকরণে, পূজার উপচারে, আঙ্গিকে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ ঘটেছে প্রবলভাবে। রুক্মিণীদেবীর মন্দির, চিল্‌কিগড়ের কনকদুর্গা মন্দির এই সংযোগেরই সাক্ষ্য বহন করে। আদিবাসী সংস্কৃতি হিন্দুধর্মের লোকায়ত স্তরের অত্যন্ত কাছাকাছি। বস্তুত এই স্তরে শিথিল শাস্ত্রীয় রীতিনীতির বেড়াজাল পরস্পরের মিলনকে ব্যাহত করেনি। ঝাড়গ্রামের বৈশাখী ও চৈত্র গাজন, হরকালীর বিবাহ, বিনপুরের কলাইসর পাহাড়ে আদিবাসীদের মেলা প্রভৃতি আদিবাসী ও লোকায়ত হিন্দুসমাজ পরস্পরের আরও কাছাকাছি এসেছে। ফলস্বরূপ পারস্পরিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রটি প্রসারিত হয়েছে। এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে লোকায়ত সংস্কৃতির গঠন ও প্রকাশে আদিবাসী জীবনের ধর্মীয় আচার, রীতিনীতি ও বিশ্বাসের স্পষ্ট প্রভাব পড়েছে।

জনপরিসংখ্যান তথ্য

আদমশুমারি গণনা বর্ষ ২০০১ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার মোট জনসংখ্যা ৯৬,৩৮,৪৭৩ —যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ১২.০১ শতাংশ, নারী ও পুরুষের জনসংখ্যা হল যথাক্রমে ৪৯,২৯,০০০ এবং ৪৭, ২৯,০০০ জন। শতাংশের বিচারে নারী মোট জনসংখ্যার ৪৮.২৮ এবং পুরুষ ৫১.৭২ শতাংশ। গ্রাম ও শহরভিত্তিক জনবিন্যাস হল মোট জনসংখ্যার ৮৯.৫১ শতাংশ (৮৬,২৭,৫১৯ জন) গ্রামীণ, ১০.৪৯ শতাংশ (১০,১০,৯৫৪ জন) শহর নিবাসী।

সারণি-১

জনসংখ্যা, নারী-পুরুষ ২০০১ (আদমশুমারি-২০০১)

রাজ্য/জেলা	মোট	পুরুষ	নারী	লিঙ্গানুপাত
পশ্চিমবঙ্গ	৮,০২,২১,১৭১ (১০০)	৪,১৪,৮৭,৬৯৪ (৫১.৭২)	৩,৮৭,৩৩,৪৭৭ (৪৮.২৮)	৯৩৪
মেদিনীপুর	৯৬,৩৮,৪৭৩ (১০০)	৪৯,২৯,০০০ (৫১.১৪)	৪৭,০৯,৪৭৩ (৪৮.৮৬)	৯৫৫

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে মোট জনসংখ্যার ৫১.২৮ শতাংশ (২,৯৬,০৬,০২৮ জন) পুরুষ এবং ৪৮.৭২ শতাংশ (২,৮১,২৮,৬৬২ জন) নারী। মেদিনীপুর জেলায় প্রায় একইরকম নারী-পুরুষ জনবিন্যাস লক্ষণীয় : ৫১.০৮ শতাংশ (৪৪,০৬,৭৯৩ জন) পুরুষ এবং ৪৭.৯২ শতাংশ (৪২,২০,৭২৬ জন) নারী। শহরাঞ্চলে মোট জনসংখ্যার ৫১.৬৬ শতাংশ পুরুষ ও ৪৮.৩৪ শতাংশ নারী। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে প্রতি হাজার পুরুষে নারী সংখ্যানুপাত হল যথাক্রমে ৯৫৮ ও ৯৩৬ জন। রাজ্যের তুলনায় মেদিনীপুর জেলায় প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা বেশি (হাজারে ৪৩ জন)।

সারণি-২
গ্রাম ও শহরের জনবিন্যাস, ২০০১

রাজ্য/জেলা	মোট	পুরুষ	নারী	লিঙ্গানুপাত
পশ্চিমবঙ্গ				
গ্রাম	৫,৭৭,৩৪,৬৯০ (৭১.৯৭ %)	২,৯৬,০৬,০২৮ (৫১.২৮ %)	২,৮১,২৮,৬৬২ (৪৮.৭২ %)	৯৫০
শহর	২,২৪,৮৬,৪৮১ (২৪.০৩ %)	১১,৮৬,১৬৬ (৫২.৭৫%)	১,০৬,০৪,৮১৫ (৪৭.২৫ %)	৮৯৩
মেদিনীপুর				
গ্রাম	৮৬,২৭,৫১৯ (৮৯.৫১ %)	৪৪,০৬,৭৯৩ (৫১.০৮ %)	৪২,২০,৭২৬ (৪৮.৯২ %)	৯৫৮
শহর	১০,১০,৯৫৪ (১০.৪৯ %)	৫,২২,২০৭ (৫১.৬৬ %)	৪,৮৮,৭৪৭ (৪৮.৩৪ %)	৯৩৬

সারণি-৩
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতাংশ) ১৯৯১-২০০১

রাজ্য/জেলা		মোট	পুরুষ	নারী
পশ্চিমবঙ্গ	মোট	১৭.৮৪	১৬.৮৩	১৮.৯৪
	গ্রাম	১৬.৯৪	১৬.৩৪	১৭.৫৬
	শহর	২০.২০	১৮.০১	২২.৭৫
মেদিনীপুর	মোট	১৫.৬৮	১৫.০৩	১৬.৩৭
	গ্রাম	১৪.৮৭	১৪.৩৪	১৫.৪১
	শহর	২৩.১৪	২১.১২	২৫.৩৭

মেদিনীপুর জেলায় ১৯৯১-২০০১ মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১৫.৬৮ শতাংশ। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে এই বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১৪.৮৭ ও ২৩.১৪ শতাংশ। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে পুরুষের তুলনায় নারী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। শহরাঞ্চলে নারী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৫.৩৭ শতাংশ ও গ্রামাঞ্চলে ১৫.৪১ শতাংশ। রাজ্যের তুলনায় মেদিনীপুরে নারী ও পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শহরাঞ্চলে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫১-২০০১ বিগত ৫ দশকে বিভিন্ন বৃদ্ধির হারের তারতম্য ঘটেছে, (সারণি-৪ ও ৫) তবে ১৯৮১-২০০১ সময়কালে রাজ্যের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথেষ্ট কম, কিন্তু নগরায়ণের হার বেশি।

সারণি-৪
রাজ্য ও জেলাস্তরে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১৯৫১-২০০১ (শতাংশ)

রাজ্য/জেলা		৫১-'৬১	'৬১-'৭১	'৭১-'৮১	'৮১-'৯১	'৯১-২০০১
পশ্চিমবঙ্গ	মোট	৩২.৮০	২৬.৮৭	২৩.১৭	২৭.৭৩	১৭.৮৪
	গ্রামাঞ্চল	৩১.৮১	২৬.৩৮	২০.৩৬	২৩.০১	১৬.৯৪
	শহরাঞ্চল	৩৫.৯৭	২৮.৪১	৩১.৭৩	২৯.৪৯	২০.২০
মেদিনীপুর	মোট	১৭.৮৫	২৬.৮৯	২২.৩৯	২৩.৫৭	১৫.৬৮
	গ্রামাঞ্চল	২৯.২৬	২৬.৯৯	২১.২৪	২১.৭৩	১৪.৮৭
	শহরাঞ্চল	২৯.০২	২৫.৬৯	৩৬.৩২	৪৩.৩৪	২৩.১৪

সারণি-৫
রাজ্য ও জেলাস্তরে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত (প্রতি হাজার পুরুষে)

রাজ্য/জেলা		১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১
পশ্চিমবঙ্গ	মোট	৮৯৫	৮৭৮	৮৯১	৯১১	৯১৭	৯৩৪
	গ্রামাঞ্চল	৯৩৯	৯৪৩	৯৪২	৯৪৭	৯৪০	৯৫০
	শহরাঞ্চল	৬৬০	৭০১	৭৫১	৮১৯	৮৫৮	৮৯৩
মেদিনীপুর	মোট	৯৫৫	৯৫২	৯৪৫	৯৫১	৯৪৪	৯৫৫
	গ্রামাঞ্চল	৯৬১	৯৬৩	৯৫২	৯৫৬	৯৪৯	৯৫৮
	শহরাঞ্চল	৮৮৫	৮৩০	৮৬৫	৯০২	৯০৪	৯৩৬

সারণি-৬
শিশু (০-৬) জনসংখ্যা, ২০০১

রাজ্য/জেলা		মোট	পুরুষ	নারী	লিঙ্গানুপাত	মোট জনসংখ্যার শতাংশ
পশ্চিমবঙ্গ	মোট	১,১১,৩২,৮২৪	৫৬,৭১,১৫২	৫৪,৬১,৬৭২	৯৬৩	১৩.৮৮
	গ্রাম	৮৯,৪১,৯৪২	৪৪,৪৬,৬৮৯	৪৩,৯৫,২৫৩	৯৬৭	১৫.৪৯
	শহর	২১,৯০,৮৮২	১১,২৪,৪৬৩	১০,৬৬,৪১৯	৯৪৮	৪৯.০৭
মেদিনীপুর	মোট	১৩,৫৪,৩০৬	৬,৯৩,৯৮০	৬,৬০,৩২৬	৯৫২	০৯.৭৪
	গ্রাম	১২,৪২,৪৬৮	৬,৩৬,৩৪১	৬,০৬,১২৭	৯৫৩	১৮.০৮
	শহর	১,১১,৮৩৮	৫৭,৬৩৯	৫৪,১৯৯	৯৪০	১৪.০৩

জনপরিসংখ্যান সমীক্ষায় ০—৬ বছরের শিশু একটি মূল্যবান সূচক। জেলার মোট শিশুসংখ্যা ১৩,৫৪,৩০৬ ; যা মোট জেলা জনসংখ্যার ১৭.৬৮ শতাংশ। রাজ্যের মোট শিশুর ১২.১৭ শতাংশ রয়েছে এই জেলায়।

গ্রামে মোট জনসংখ্যার ১৮ শতাংশ শিশু। স্বাভাবিক কারণেই শহরাঞ্চলে শিশু জনসংখ্যা মোট শহরাঞ্চলের জনসংখ্যার ১৪.০৩ শতাংশ। রাজ্যের তুলনায় জেলার কন্যাশিশু সংখ্যার হার কিছু কম। জেলার কন্যাশিশু প্রতি হাজারে ৯৫২ জন। গ্রামে ও শহরাঞ্চলে এই হার হল যথাক্রমে ৯৫৩ ও ৯৪০, যা রাজ্যের তুলনায় কিছু কম। ১৯৯১-২০০১ দশকে জেলায় শিশু সংখ্যা বৃদ্ধির হাল হল ১৫.৬৪ শতাংশ, যা রাজ্যের (১৭.৮৪ %) তুলনায় ২.১৬ শতাংশ কম। মেদিনীপুর জেলার গ্রামে ও শহরাঞ্চলে এই দশকে শিশু সংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১৪.৮৭ ও ২৩.১৪ শতাংশ।

মেদিনীপুরের জনসংখ্যার ১৮.১৬ শতাংশ তফসিলি সম্প্রদায় এবং ৮.৪৮ শতাংশ আদিবাসী। উভয় সম্প্রদায়ই মূলত

সারণি-৭
জনসংখ্যা, তফসিলি, আদিবাসী, ২০০১

রাজ্য/জেলা		জনসংখ্যা মোট	তফসিলি	আদিবাসী
পশ্চিমবঙ্গ	মোট	৮,০২,২১,১৭১ (১০০ %)	২,০৪,২০,৮৯৪ (২৫.৪৬ %)	৫১,২৩,৩৫৯ (৬.৩ %)
	গ্রামাঞ্চল	৫,৭৭,৩৪,৬৯০ (৭১.৯৬ %)	১,৬৫,৬৮,০৯৫ (৮১.১৩ %)	৪৪,৪৭,১২০ (৮৬.৮০ %)
	শহরাঞ্চল	২,২৪,৮৬,৪৮১ (২৮.০৪ %)	৩৮,৫২,৭১৯ (১৮.৮৭ %)	৬,৭৬,২৩৯ (১৩২০ %)
মেদিনীপুর	মোট	৯৬,৩৮,৪৭৩ (১০০ %)	১৭,৫১,০৩০ (১৮.১৬ %)	৮,১৭,১৭৪ (৮.৪৮ %)
	গ্রামাঞ্চল	৮৬,২৭,৫১৯ (৮৯.৫১ %)	১৬,০৪,৩৫৮ (৯১.৬২ %)	৭,৮২,৮৫৭ (৯৫.৮০ %)
	শহরাঞ্চল	১০,১০,৯৫৪ (১০.৪৯ %)	১,৪৬,৬৭২ (৮.৩৮ %)	৩৪,৩১৭ (৪.২০ %)

সারণি-৮
গ্রাম ও শহরাঞ্চলে কর্মে নিযুক্তির হার, ২০০১

রাজ্য/জেলা		মোট	পুরুষ	স্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ	মোট	৩৬.৭৮	৫৪.২৩	১৮.০৮
	গ্রামাঞ্চল	৩৭.৯৩	৫৪.৩০	২০.৭০
	শহরাঞ্চল	৩৩.৮২	৫৪.০৮	১১.১৩
মেদিনীপুর	মোট	৩৯.০৫	৫৪.৬১	২২.৭৯
	গ্রামাঞ্চল	৪০.০৬	৫৫.১৫	২৪.৩০
	শহরাঞ্চল	৩০.৫৫	৫০.০১	৯.৭৭

গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে শহরাঞ্চলে মোট আদিবাসী জনসংখ্যা ৪.২০ শতাংশ বাস করলেও পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ৬.৩ শতাংশ বাস করে শহরাঞ্চলে। অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলার আদিবাসীদের নগরায়ণ অত্যন্ত সীমিত।

মেদিনীপুর জেলায় মোট জনসংখ্যার ৩৯.০৬ শতাংশ কর্মে নিযুক্তি, যা রাজ্যের তুলনায় ১.১৩ শতাংশ বেশি। গ্রামাঞ্চলে কর্মে নিযুক্তির হার ৩৯ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৩০.৫৫ শতাংশ। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কর্মে নিযুক্তির হার যথাক্রমে ২২.৭১ ও ৫৪.৬১ শতাংশ। নিযুক্তির হারে স্ত্রী ও পুরুষের জনসংখ্যার ব্যবধান ৩২ শতাংশ, যা রাজ্যের ক্ষেত্রে ৩৬ শতাংশ। অর্থাৎ রাজ্যের তুলনায় জেলায় স্ত্রী কর্মীর সংখ্যা ৪ শতাংশ বেশি।

পেশাগত বিভাজন মোট কর্মে নিযুক্তদের ২৮.১৬ শতাংশ চাষী এবং ৩১.৬৬ শতাংশ কৃষি শ্রমিক। গৃহশিল্পে নিযুক্তির হার ৭.৪১ শতাংশ। অন্যান্য কাজে রয়েছে ৩২.৭৭ শতাংশ। পুরুষ কর্মীদের ৩১.২৬ শতাংশ চাষী, ২৮.৪৭ শতাংশ কৃষিশ্রমিক এবং ৩৬.৫৬ শতাংশ অন্যান্য কর্মে নিযুক্ত। স্ত্রীকর্মীদের ২০.০৪ শতাংশ চাষী, ৩৯.৬৫ শতাংশ কৃষিশ্রমিক এবং অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত রয়েছে ২৩.২৭ শতাংশ। স্ত্রী ও পুরুষ কর্মীদের মধ্যে পেশাগত ব্যবধান রয়েছে।

সারণি-৯
কর্মে নিযুক্তি জনসংখ্যা ও হার (শতাংশ), ২০০১

রাজ্য/জেলা		মোট জনসংখ্যা	কর্মে নিযুক্ত	হার	কর্মে নিযুক্ত নয়	হার
পশ্চিমবঙ্গ	মোট	৮,০২,২১,১৭১ (৩৬.৭৮)	২,৯৫,০৩,২৭৮	৩৬.৭৮	৫,০৭,১৭,৮৯৩	৬৩.২২
	পুরুষ	৪,১৪,৮৭,৬৯৪	২,২৫,০০,৪৮০	৫৪.২৩	১,৮৯,৮৭,২১৪	৪৫.৭৭
	স্ত্রী	৩,৮৭,৩৩,৪৭৭	৭০,০২,৭৯৮	১৮.০৮	৩,১৭,৩০,৬৭৯	৮১.৯২
মেদিনীপুর	মোট	৯৬,৩৮,৪৭৩ (৩৯.০৬)	৩৭,৬৪,৯২৭	৩৯.০৬	৫৮,৭৩,৫৪৬	৬০.৯৪
	পুরুষ	৪,৯২,৯০০	২৬,৯১,৫৩৪	৫৪.৬১	২২,৩৭,৪৬৬	৪৫.৩৯
	স্ত্রী	৪৭,০৯,৪৭৩	১০,৭৩,৩৯৩	২২.৭৯	৩৬,৩৬,০৮০	৭৭.২১

সারণি-১০
মেদিনীপুর : কর্মে নিযুক্তির হার ও পেশা, ২০০১

	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ জনসংখ্যা	স্ত্রী জনসংখ্যা
মোট জনসংখ্যা	৯৬,৩৮,৪৭৩	৪৯,২৯,০০০	৪৭,০৯,৪৭৩
কর্মে নিযুক্ত জনসংখ্যার হার	৩৭,৬৪,৯২৭ (৩৯.০৬ %)	২৬,৯১,৫৩৪ (৪০.০৬ %)	১০,৭৩,৩৯৩ (৩০.৫৫ %)
কৃষক	১০,৬০,২৫৮ (২৮.১৬ %)	৮,৪১,২৭৭ (৩১.২৬ %)	২,১৮,৯৮১ (২০.৪০ %)
কৃষি শ্রমিক	১১,৯২,০২২ (৩১.৬৬ %)	৭,৬৯,৪১০ (২৮.৪৭ %)	৪,২৫,৬১২ (৩৯.৬৫ %)
গৃহ হস্তশিল্পে নিযুক্ত	২,৭৮,৯৪৭ (৭.৪১ %)	৯৯,৭৭৪ (৩.৭১ %)	১,৭৯,১৭৩ (১৬.৬৯ %)
অন্যান্য কর্মে নিযুক্ত	১২,৩৩,৭০০ (৩২.৭৭ %)	৯,৮৪,০৭৩ (৩৬.৫৬ %)	২,৪৯,৬২৭ (২৩.২৭ %)

গ্রামাঞ্চলে কৃষি কাজে নিযুক্তির হার বেশি ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্তির হার কম। জেলার ২৮.১৬ শতাংশ কৃষক, গ্রামাঞ্চলে এই পেশায় নিযুক্ত রয়েছে ৩০.৩৬ শতাংশ, যা রাজ্যের তুলনায় ৫ শতাংশ বেশি। গ্রামাঞ্চলে কৃষিশ্রমিক প্রায় ৩৪ শতাংশ এবং গৃহশিল্পে নিযুক্ত রয়েছে ৭.৬৬ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত রয়েছে ২৭.৩৬ শতাংশ।

সারণি-১১
গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্তির হার (শতাংশ), ২০০১

রাজ্য/জেলা		চাষী	কৃষিশ্রমিক	গৃহশিল্প	অন্যান্য
পশ্চিমবঙ্গ	মোট	১৯.০৩	২৪.৯২	৭.৩০	৪৮.৭০
	গ্রামাঞ্চল	২৫.৩৬	৩৩.০৪	৭.৮০	৩৩.৮০
	শহরাঞ্চল	০.৮০	১.৫২	৫.৮৬	৯৯.৮২
মেদিনীপুর	মোট	২৮.১৬	৩১.৬৬	৭.৪১	৩২.৭৭
	গ্রামাঞ্চল	৩০.৩৬	৩৩.৯২	৭.৬৬	২৭.৬৬
	শহরাঞ্চল	৩.৫৮	৬.৩৬	২.৪০	৮৭.৬৫

শহরাঞ্চলে মোট জনসংখ্যার ৩৩.৮২ শতাংশ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত। রাজ্যের তুলনায় কর্মে নিযুক্তির হার ৩ শতাংশ বেশি। শহরে কৃষকের সংখ্যা হল ৩.৫৮ শতাংশ, যেখানে রাজ্যে রয়েছে ০.৮ শতাংশ। কৃষিশ্রমিক ৬.৩৬ শতাংশ, যা রাজ্যের তুলনায় ৫ শতাংশ বেশি। মেদিনীপুর জেলার শহরাঞ্চলের বিশেষত্ব হল ১০ শতাংশের কিছু বেশি কৃষিনির্ভর। অন্যান্য পেশায় নিযুক্তির হার ৮৭.৬৫ শতাংশ, যা রাজ্যের শহরাঞ্চলের তুলনায় ৪ শতাংশ কম। মেদিনীপুর শহরের ৩২.৫৩ শতাংশ কর্মে নিযুক্ত। পুরুষ ও স্ত্রী কর্মীসংখ্যা যথাক্রমে ৫৩.০৬ এবং ১৯.০৮ শতাংশ। অন্যান্য কাজে নিযুক্তির হার পশ্চিমবঙ্গের মোট শহরাঞ্চলের তুলনায় ৪ শতাংশ কম।

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ৬টি শহরের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায়, কর্মে নিযুক্তির হার সর্বাপেক্ষা বেশি হলদিয়ায়, ৩৫.০১ শতাংশ। ঝাড়গ্রামে (৩২.৭০ শতাংশ) নিযুক্তির হার মেদিনীপুর শহরের (৩২.৫৩ শতাংশ) তুলনায় সামান্য বেশি। সর্বাপেক্ষা কম কাঁথি শহরে, ২৫.৮৭ শতাংশ। পেশাগত বৈশিষ্ট্যেও পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের ৬টি শহরে কিছু তারতম্য রয়েছে। চন্দ্রকোনা শহরে ১০ শতাংশের বেশি কৃষক। কৃষি মজুর হল ২২.৬৩ শতাংশ। সুতরাং কৃষিনির্ভরতার হার প্রায় ৩৩ শতাংশ। মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের চিত্রটি আলাদা। কৃষিভিত্তিক নির্ভরশীলতা ১ থেকে ৩ শতাংশ। অন্যান্য পেশায় নিযুক্তির হার যথাক্রমে ৯৩.৩৩ ও ৯৩.২০ শতাংশ। হলদিয়া শহরেও কৃষিনির্ভরতা ১৪ শতাংশের বেশি ও অন্যান্য কাজে নিযুক্তির হার ৮৩.৪২ শতাংশ।

রাজ্যে গ্রামীণ সাক্ষরতা প্রসারে মেদিনীপুরের স্থান উল্লেখযোগ্য। ২০০১ সালের জনগণনায় মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতার হার নির্ণীত হয় ৭৪.৪২ শতাংশ, যা এই রাজ্যের অন্যান্য জেলার মধ্যে অগ্রবর্তী। শহরাঞ্চলে সাক্ষরতার হার ৮১.৩৪ শতাংশ এবং জেলার মোট সাক্ষরতা ৭৫.১৭ শতাংশ। কলকাতা (৮১.৩১ শতাংশ), উত্তর চব্বিশ-পরগনা (৭৮.৪৯ শতাংশ), হাওড়া (৭৭.৬৪ শতাংশ), হুগলি (৭৫.৫৯ শতাংশ) জেলার পরেই সাক্ষরতা হারের বিস্তারে মেদিনীপুর জেলার স্থান।

গত পাঁচ দশকের সাক্ষরতা হারের বিস্তার নীচের সারণি থেকে সহজেই বোঝা যায়। পঞ্চাশ বছর পূর্বে সাক্ষরতার হার ছিল ২১.৩৩ শতাংশ, যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭৫ শতাংশের বেশি।

সারণি-১২
মেদিনীপুর জেলার সাক্ষরতার হার ১৯৫১-২০০১ (শতাংশ)

	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১
মোট	২১.৩৩	৩২.২৬	৩৮.৪৭	৪৮.৫২	৬৯.৩২	৭৫.১৭
পুরুষ	২৯.৫৪	৪৯.০০	৫৩.০২	৬২.৯৩	৮১.২৭	৮৫.২৫
নারী	১২.২৩	১৪.৪৮	২২.৮৮	৩৩.৩০	৫৬.৬৩	৬৪.৬৩

উপরের সারণি থেকে জানা যায়, ১৯৫১-৬১ দশকে সাক্ষরতার হার প্রায় ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৬১-৭১ দশকে এই বৃদ্ধির হার কিছু কম, মাত্র ৬ শতাংশ। কিন্তু ১৯৭১-৮১ দশকে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে ১৯৮১-৯১ দশকে, যা প্রায় ২১ শতাংশ। স্ত্রী সাক্ষরতার হার ১৯৭১ থেকে ক্রমাগত উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে। ৮ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটে ১৯৬১-৭১ দশকে। ১০ শতাংশ ঘটে ১৯৭১-৮১ দশকে। পরবর্তী দশক অর্থাৎ ১৯৮১-৯১ দশকে সর্বাধিক বৃদ্ধি ঘটে ১০.৪২ শতাংশ। ১৯৯১-২০০১ দশকে ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে

সাক্ষরতার হার হয়েছে ৬৪.৬৩ শতাংশ। ১৯৫১-২০০১ সালে নারী সাক্ষরতার হার ৫২ শতাংশের কিছু বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলে এই বৃদ্ধির হারের তারতম্য খুবই কম। তবে ১৯৮৯-২০০১ সালে গ্রামাঞ্চলে স্ত্রী সাক্ষরতার হার বেশ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি-১৩
শহর ও গ্রামাঞ্চলে নারী সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার ১৯৫১-২০০১ (শতাংশ)

	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	১৯৫১-২০০১
শহরাঞ্চল	২০.১৩	৩৭.৪৮	৪৬.৩৯	৫৫.২১	৭০.১২	৭২.৯২	৫২.৭৯
বৃদ্ধির হার	—	১৭.৩৪	৮.৯১	৮.৯০	১৪.৮৩	২.৮০	
গ্রামাঞ্চল	১১.৬৯	১২.৬৩	২০.৯৭	৩১.২৮	৫৫.১৩	৬৩.৬৩	৫২.০২
বৃদ্ধির হার	—	০.৯৪	৮.৩৪	১০.৩১	২৩.৮৫	৮.৫০	

মেদিনীপুরের আদিবাসী সমাজ

মেদিনীপুরের ভূপ্রকৃতির মধ্যে যেমন রয়েছে বৈপরীত্য, তেমনই এই জেলার জাতিবিন্যাসে এক দ্বৈতসত্তা সহজে লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন আদমশুমারি থেকে প্রাপ্ত জনবিন্যাসের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বর্ণহিন্দু ও মাহিষ্য মানুষজন মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পূর্ব যেমন—কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল ইত্যাদি অঞ্চলে সর্বাধিক ; বিপরীতভাবে এসব অঞ্চলে আদিবাসী জনসংখ্যা অত্যন্ত কম। অন্যদিকে ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুর সদর মহকুমায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের আধিক্য সহজে চোখে পড়ে। এখানকার গ্রামগুলির নামকরণের মধ্যে (যেমন—টুশ্‌কাগুলি, ধলহড়া, ওঁড়গোদা, ডুমুরগোদা ইত্যাদি) আদিবাসী প্রাধান্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

মেদিনীপুরের আদিবাসীদের সংখ্যা জেলার মোট জনসংখ্যার ১৩.১২ শতাংশ। আবার পশ্চিমবঙ্গের মোট আদিবাসী জনসংখ্যার ১৫.৯৬ শতাংশই বাস করে মেদিনীপুরে। জেলাভিত্তিক আদিবাসী জনসংখ্যার বিচারে মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করে।

জেলার আদিবাসীদের মধ্যে সর্বাধিক হল সাঁওতাল। ভূমিজদের জনসংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। মুণ্ডা আদিবাসীরা বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এ ছাড়া মেদিনীপুরের অপর উল্লেখযোগ্য আদিবাসী হল লোধা এবং শবর, যারা বহুদিন ধরে নিজস্ব ঐতিহ্যগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হারিয়ে এবং অদ্ভুত আর্থ-সামাজিক পরিবেশে ছিন্নমূলের ন্যায় বাস করছে (যদিও বর্তমানকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোধাদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করছে)। লোধাদের সঙ্গে তুলনীয় খেরিয়ারা যদিও এদের জনসংখ্যা এ জেলায় তেমন নয়, যতটা পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায়। ওঁরাও সম্প্রদায় যেমন বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে, তেমনই মেদিনীপুর ও খড়্গপুর শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দু-এক জায়গায়

করম ওঁরাও সম্প্রদায়ের পূজা। করম উৎসবের দিনগুলিতে ওঁরাও নারীপুরুষ সারারাতব্যাপী নৃত্যগীত করেন

এদের দেখা যায়। এরা মূলত শ্রমজীবী। এরা শহরের আশপাশের বিভিন্ন কল-কারখানায়, চালকলে কাজ করে, ভ্যান, রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। কোরা আদিবাসীদের সাঁওতালদের থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হলেও বর্তমানে এরা একটি পৃথক সম্প্রদায়। জনসংখ্যার বিচারে কোরারা নগণ্য না হলেও, অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় এদের জনসংখ্যা যথেষ্ট কম।

●

মেদিনীপুরের অপর উল্লেখযোগ্য আদিবাসী হল লোধা এবং শবর, যারা বহুদিন ধরে নিজস্ব ঐতিহ্যগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হারিয়ে এবং অদ্ভুত আর্থ-সামাজিক পরিবেশে ছিন্নমূলের ন্যায় বাস করছে (যদিও বর্তমানকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোধাদের পুনর্বাসনে চেষ্টা করছে)

●

জনসংখ্যাতত্ত্বের পটভূমিকায় মেদিনীপুরের আদিবাসী

২০০১ সালের আদমশুমারির হিসাব অনুযায়ী মেদিনীপুরের মোট জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ছিয়ানব্বই লক্ষ। দ্রুত নগরায়ণের ফলে বিগত এক দশকে (১৯৯১-২০০১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে ১৫.৩৮ শতাংশ। এই সময়ে গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার স্ফীতির হার যথাক্রমে ১৪.৮৭ শতাংশ ও ২৩.১৪ শতাংশ। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে এই হার যথাক্রমে ১৬.৯০ শতাংশ ও ২০.২০ শতাংশ। এই সংখ্যাগুলি থেকেই বোঝা যায় মেদিনীপুর জেলার নগরায়ণের ব্যাপ্তি।

নিম্নের সারণিতে মেদিনীপুরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বরূপ জানা যায়।

সারণি-১৪

মেদিনীপুরের জনসংখ্যা (১৯৮১-২০০১)

আদমশুমারি বছর	মোট জনসংখ্যা	আদিবাসী জনসংখ্যা	তফসিলিভুক্ত জনসংখ্যা
১৯৮১	৬৭,৪২,৭৯৬	৫,৩৮,৮৭৭	৯,৮৪,৭৩১
১৯৯১	৮৩,৩১,৯১২	৬,৮৯,৬৩৬	১৩,৬১,৮২৮
২০০১	৯৬,৩৮,৪৭৩	৮,১৭,১৭৪	১৭,৫১,০৩০

আদমশুমারি ২০০১ তথ্য অনুসারে আমরা বলতে পারি, ১৯৯১-২০০১ সময়সীমার মধ্যে আদিবাসী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৮.৪৯ শতাংশ; যেখানে উল্লিখিত সময়কালে (১৯৯১-২০০১) জেলার মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ১৫.৪৮ শতাংশ হারে। এ থেকেই বলতে পারা যায়, সাধারণ জনসংখ্যার তুলনায় আদিবাসী জনসংখ্যার স্ফীতি হয়েছে অধিক মাত্রায়।

জেলার জনসংখ্যাগত তথ্য ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্য বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। যথা—

১) শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে (২৩.১৪ শতাংশ)।

২) জেলার আদিবাসী ও তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও জীবিকার প্রয়োজনে তারা জেলার বাইরে চলে যাচ্ছে না।

৩) অধিকাংশ তফসিলিভুক্ত মানুষ গ্রামেই বসবাস করছে; কেননা বর্তমানে জীবিকা নির্বাহ করার মতো কাজ তারা গ্রামের মধ্যেই পেয়ে যাচ্ছে।

জনপরিসংখ্যান

মেদিনীপুর জেলার জনসংখ্যাতত্ত্বগত যে কোনও আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না আমরা এই জেলার আদিবাসী জনসংখ্যার যথাযথ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ না করি। জেলার মোট জনসংখ্যার প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯৫৫ জন। গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যায় এই বিন্যাসের কিছু হেরফের হয়। গ্রামাঞ্চলে প্রতি হাজার পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯৫৮ জন; আবার শহরাঞ্চলে স্বাভাবিক কারণেই স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম; প্রতি হাজার পুরুষে ৯৩৬ জন। কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যে পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যার এতটা তফাৎ দেখা যায় না; জেলার আদিবাসীদের মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। এ থেকে একটাই মন্তব্য করা যায় যে, আদিবাসী জনসংখ্যায় স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যার অনুপাতে একটি সুন্দর ভারসাম্য রয়েছে।

সাম্প্রতিককালের একটি সমীক্ষা জেলার জনসংখ্যা সংক্রান্ত কতকগুলি উল্লেখযোগ্য তথ্য উদঘাটিত করেছে। জেলার আদিবাসীদের মধ্যে জনসংখ্যাতত্ত্বের পরিভাষায় শিশুদের (০-১৪ বছর) সংখ্যা শতকরা ৩৭ ভাগ। ১৫ থেকে অনূর্ধ্ব ৫০ বছরের মানুষেরা মোট জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ অধিকার করে থাকে। ৫০ বছরের ঊর্ধ্বের মানুষের হার শতকরা ১০ শতাংশ। জনসংখ্যায় ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিরা মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৪ ভাগ দখল করে থাকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ মানুষের বয়স ২১ বছর। অর্থাৎ জনসংখ্যা তত্ত্বের বিচারে, বয়সের দিক থেকে এই আদিবাসীদের সমাজ নবীন এবং উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বর্ধিষ্ণু।

জন্মহার ও মৃত্যুহার কোনও জনসংখ্যার দুটি উল্লেখযোগ্য দিক। জেলার আদিবাসীদের জন্মহারের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, প্রতি হাজার জনসংখ্যা পিছু জন্মহার প্রায় ৩০, আর প্রতি হাজার জনসংখ্যায় মৃত্যুহার ২৮। এখানে আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এই যে, এক বছরের কমবয়স্ক শিশুমৃত্যুর সংখ্যা প্রতি হাজারে ২৪২, পাঁচ বছরের নীচে এই সংখ্যা ৪৪ এবং ৫০ ও তদূর্ধ্ব জনসংখ্যায় প্রতি হাজারে বাৎসরিক গড়ে ৮৮ জনের মৃত্যু হয়।

শিক্ষা : গ্রামাঞ্চলের আদিবাসী : ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুসারে মেদিনীপুর জেলায় সাক্ষরতার হার হল ৭৫.১৭ শতাংশ। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে এই হার যথাক্রমে ৬৪.৬৩ শতাংশ এবং ৮৫.২৫ শতাংশ। শহর ও গ্রামের মধ্যে সাক্ষরতার হারের পার্থক্য রয়েছে। শহরাঞ্চলে সাক্ষরতার হার ৮১ শতাংশ আর গ্রামাঞ্চলে ৭৪ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ৬৪ শতাংশ স্ত্রীলোক ও ৮৫ শতাংশ পুরুষ শিক্ষিত।

●

একটি নমুনা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার হার শতকরা ৩৬ শতাংশ। এর মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার হার অত্যন্ত কম, মোট স্ত্রীলোকের সংখ্যার মাত্র ২০ শতাংশ।

●

অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সাক্ষরতার হারের ফারাক রয়েছে ১১ শতাংশ। সাম্প্রতিক আদিবাসী জনসমষ্টির উপরে কৃত একটি নমুনা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার হার শতকরা ৩৬ শতাংশ। এর মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার হার অত্যন্ত কম, মোট স্ত্রীলোকের সংখ্যার মাত্র ২০ শতাংশ। নিম্নে প্রদত্ত সারণিটি কতকগুলি নির্দিষ্ট গ্রামে বিভিন্ন আদিবাসীদের সাক্ষরতার চিত্রটি প্রকাশ করবে।

সারণি-১৫
নির্দিষ্ট গ্রামভিত্তিক আদিবাসী সাক্ষরতা
(শতাংশ) ১৯৯৩-৯৪

আদিবাসী	গ্রামের নাম	সাক্ষরতা শিক্ষার হার (মোট)	পুরুষদের শিক্ষার হার	নারীদের সাক্ষরতার হার	পুরুষ-নারী সাক্ষরতার হারের পার্থক্য
খেরিয়া	গোদাপিয়াশাল	৩৯.৩	৬০.৯	২১.২	৩৯.৭
মাহালি	ঝন্টিবান্টি	৫২.৬	৭০.০	৩৩.৩	৩৬.৭
সাঁওতাল	ধাবনী	৩৯.৩	৫০.০	১৯.০	৩১.০
মুণ্ডা	মুড়াডাঙা	২৪.৩	৩৫.৬	১২.৮	২২.৮
ভূমিজ	বাগডুবি	৪১.৮	৫২.৪	৪২.৩	১৭.১

নারী-পুরুষের সাক্ষরতার হারে আদিবাসী সমাজে যেমন প্রভূত ফারাক দেখা যায়, তেমনই স্তরভেদে আদিবাসী জনসমাজে শিক্ষার হার বিভিন্ন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের সংখ্যা মোট সাক্ষর জনসমষ্টির সিংহভাগ দখল করে রেখেছে।

আদিবাসীদের মধ্যে বর্তমান প্রজন্মের কাছে প্রথাগত শিক্ষা যে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, নিম্নে আদিবাসীদের বয়সভিত্তিক সাক্ষরতার সারণিটি বিশ্লেষণ করলে এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সারণি-১৬
আদিবাসী সাক্ষরতার হার (শতাংশ)
১৯৯৩-৯৪

বয়স	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
১০ ও তদূর্ধ্ব	৩৬	৫১	২০
১০-১৪	৬৬	৭০	৬০
১৫-২৪	৪৫	৬০	২৯
২৫-৩৪	৩৫	৫৬	১১
৩৫-৪৪	৩৩	৪৬	১৯
৪৫ ও তদূর্ধ্ব	১২	২২	২

উপরের সারণিতে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, ১০—১৪ বছর বয়সের মধ্যে সাক্ষরতার হার অত্যন্ত বেশি, যা বর্তমানে আদিবাসীদের শিক্ষার প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহকে প্রকাশ করে এবং তারা একটু বেশি বয়সে প্রাথমিক শ্রেণীতে ভর্তি হচ্ছে।

দ্রুত স্ত্রীশিক্ষার হার বৃদ্ধি বংশলতিকাধারার নৃতাত্ত্বিক প্রয়োগ ও বিশ্লেষণে বিশেষভাবে জানা যায়। সাম্প্রতিক তাঁতিগেড়িয়া অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষায় তিনটি প্রজন্মের মধ্যে শিক্ষার দ্রুতির হার পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে যে, বর্তমান প্রজন্মে শিক্ষার হার প্রবলভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যানগত তথ্য নীচের সমীক্ষায় প্রদর্শিত হল।

সারণি-১৭
শিক্ষার দ্রুতি (শতাংশ)

প্রজন্ম	শিক্ষার হার	দ্রুতি	পুরুষ	স্ত্রী
তৎপূর্ববর্তী প্রজন্ম	১.৬	—	—	—
পূর্ববর্তী প্রজন্ম	১৫.৬	৮৮	৫৭৮	—
বর্তমান প্রজন্ম	৩৪.৩	১২০	৬৯	২৭৫

উপরে উল্লিখিত সারণি থেকে যা পাচ্ছি তা হল, বর্তমান প্রজন্মে স্ত্রীশিক্ষার দ্রুতির মান ২৭৫ শতাংশ, সেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে এই মান ৬৯ শতাংশ। এই থেকে বোঝা যায় যে, অধুনা শিক্ষার প্রতি বালিকা ও কিশোরীদের আগ্রহ ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলিতে এবং অপর একটি সারণিতে প্রদত্ত পরিসংখ্যানগত তথ্যে আমরা দেখেছি, ৪৫ বছর ও তদূর্ধ্ব জনসমষ্টিতে স্ত্রীশিক্ষার হার অত্যন্ত কম (মাত্র ২ শতাংশ), যেখানে ১০-১৪ বছরের জনসংখ্যায় এই হার ৬০ শতাংশ এবং সমসাময়িককালে তাদের শিক্ষার দ্রুতির হার ২৭৫, এ কারণে মন্তব্য করা যায়, বর্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষার হার এবং সেই সঙ্গে সামগ্রিকভাবে সাক্ষরতার হারের বৃদ্ধি আদিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আদিবাসী সমাজবিন্যাস

কৌম (ক্ল্যান) ভিত্তিক সমাজ সংগঠন আদিবাসীদের সামাজিক বিন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্য। কৌমগুলির নামকরণ সাধারণত পরিবেশের কোনও প্রাণী বা উদ্ভিদ কিংবা কোনও জড় বস্তুর নামে করা হয়। কোনও নির্দিষ্ট কৌম যে বস্তুর নামে নামাঙ্কিত (টোটেম), সেই বস্তুটির ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওই নির্দিষ্ট কৌমভুক্ত লোকজনদের কিছু বাধানিষেধ থাকে। এককথায় বলা যায়, মেদিনীপুরের আদিবাসীদের কৌম-টোটেম-ট্যাবু অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে। এগুলি শুধু তাদের ভাবজগৎ বা মনোজগতেই নয়, তাদের পার্থিব জীবনযাত্রার সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। যদিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে কৌমভিত্তিক জীবনাচরণের ধারা বর্তমানে ব্যাহত হলেও, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায় এখনও এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব দেখা

যায়। বিশেষ করে, আন্ত-বিবাহ ও অন্তঃবিবাহ নিয়ন্ত্রিত হয় কৌম-টোটেম বিধিনিষেধের মাধ্যমে। যেখানে কৌমের মধ্যে আন্ত-বিবাহ দেখা যায়, সে ক্ষেত্রে একটি কৌম একাধিক ক্ষুদ্র কৌমে বিভাজিত, আর বিবাহ সংঘটিত হয় একই কৌমভুক্ত একাধিক ক্ষুদ্র কৌমের মধ্যে। বস্তুত এই ক্ষুদ্র কৌমগুলি এক একটি পূর্ণাঙ্গ কৌমে বিকশিত হয়ে আন্ত-বিবাহে বাধা দেয়। সাঁওতাল ও ওঁরাওদের মধ্যে একই গ্রামে বিবাহ কাম্য না হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর প্রচলন দেখা যায়, কিন্তু কোনও প্রকৃত মুন্ডা গ্রামে, একই গ্রামের মধ্যে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। মুন্ডারা মনে করে, গ্রামদেবীর পূজার প্রসাদ যারা গ্রহণ করে তারা একই বৃহৎ পরিবারভুক্ত, অর্থাৎ বিবাহের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ সম্পর্কের আওতায় পড়ে, যে কারণে এ ধরনের বিবাহ সম্ভব নয়।

আদিবাসী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল : পূজাপার্বণ

সাঁওতালদের জাহের থান আর মাঝি থানের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। তাদের ধর্মীয় জীবনে জাহের থান আর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে মাঝি থান। জাহের থানে অধিষ্ঠান করেন জাহের এরা, গোঁসাই এরা তুরুকুমনরেকো প্রভৃতি বোঙা—এটাই সাঁওতালদের ধারণা। বোঙারা হল এক অতি প্রাকৃত নৈর্ব্যক্তিক শক্তি, যাদের কোনও দৃশ্যমান বিগ্রহ নেই। সাঁওতালরা মনে করে, প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনার নিয়ন্ত্রক এই বোঙারা। এরাই বিভিন্ন বিপদে-আপদে তাদের রক্ষা করে, তাদের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি দান করে। নৃতাত্ত্বিকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, ধর্মের দিক দিয়ে এরা 'অ্যানিমিস্ট'। অধ্যাপক ডি এন মজুমদার তাদের ধর্মীয় জীবনে বোঙাদের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতির কথা বিচার করে তাদের 'বোঙাবাদী' বলে অভিহিত করেছেন, আর তাদের ধর্মও হল মূলত বোঙাবাদ। মারাং বুরু হলেন এদের প্রধান বোঙা, সর্বশক্তিমান অতি প্রাকৃতিক প্রতিভূ। বিভিন্ন ধর্মীয় পূজা-পার্বণে তারা এই বোঙাদের স্মরণ করে, তাদের উদ্দেশে পূজা নিবেদন করে। বর্তমানে হিন্দু সমাজের সংস্পর্শে আসা সাঁওতালরা মারাং বুরুকে হিন্দু দেবতা শিবেরই একটা রূপ বলে মনে করে। প্রতি গৃহে অধিষ্ঠিত থাকেন ওরাক্ বোঙা ও আব্‌গে বোঙা—বিভিন্ন পার্বণে যাদের উদ্দেশে পূজা উৎসর্গ করা হয়। সাঁওতালদের মধ্যে ছাড়াও অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায় যেমন মুন্ডাদের মধ্যেও মারাং বুরুর উপস্থিতি দেখা যায়। যদিও সিং বোঙাই হল মুন্ডাদের প্রধান দেবস্থানীয় অতি প্রাকৃতিক পুরুষ। ভূমিজ আদিবাসী সম্প্রদায় মুন্ডাদের থেকে বহুকাল আগে উদ্ভূত হলেও বর্তমানে তারা লোকায়ত হিন্দু ধর্মে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। বোঙা পূজা ছাড়াও বিভিন্ন পূজা-পার্বণে পূর্বপুরুষের উদ্দেশে পূজা নিবেদন করা প্রায় সকল আদিবাসী সমাজেরই বৈশিষ্ট্য। বর্ণহিন্দু ও লোকায়ত হিন্দু সমাজেও পূর্বপুরুষকে স্মরণ করার প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে। এভাবে আদিবাসী ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম আঙ্গিকে ও প্রকরণে পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে।

পূজা-পরবে মুখরিত আদিবাসী সমাজ। 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' কথাটি আদিবাসীদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য বললে নিতান্ত অসত্য ভাষণ হয় না। সাঁওতালদের মধ্যেই কম করে ১০-১১টি পরবের প্রচলন দেখা যায়। এগুলি হল : (১) এরক্ সিম, (২) হরিহর সিম্, (৩) ইরুগুদ্‌লি, (৪) করম, (৫) জাঁতার / জান্‌থাড়, (৬) সোহরাই, (৭) সাকরাত, (৮) মাঘসিম, (৯) বাহা, (১০) মা'মরে, (১১) সেন্দ্রা।

মুণ্ডাদের প্রধান পরবগুলি হল : (১) মাঘ পরব, (২) ফাগু পরব, (৩) করম পরব, (৪) শাহরুল, (৫) আউগা পরব, (৬) সোহরাই।

করম পূজা অনুষ্ঠান

সাঁওতালদের ক্ষেত্রে যেমন জাহের থানে, তেমনই মুন্ডাদের ক্ষেত্রে তাদের সারনায় অধিকাংশ ধর্মীয় পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

আদিবাসী সমাজের এক আশ্চর্য দর্পণ তাদের এই পরবগুলি। শুধুমাত্র তাদের আনন্দমুখর জীবন-ধারারই নয়, তাদের সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তনের এক পরোক্ষ প্রতিফলন হয় এই পরবগুলিতে। তাদের অর্থনৈতিক জীবনের ক্রমোন্নয়নের ধারাটিও যেন অভিব্যক্ত হয়েছে এর মধ্যে। সাকরাত, টুসু, পৌষ পার্বণ ইত্যাদি প্রায়ই একই সময়ে বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ে দেখা গেলেও, তারা মূলত কৃষিকেন্দ্রিক জীবনযাত্রারই প্রতিফলন। ফসল ঘরে তোলার পর যে স্বচ্ছল অবস্থা তা-ই যেন ব্যক্ত হয় তাদের সোহরাই, গো বাধ্‌না আর গোয়াল পূজার মধ্যে। আবার এরক্ সিম, হরিহর বোঙা পূজা ইত্যাদি সম্ভবত ঝুম্ চাষভিত্তিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই একই প্রকারের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় দিচ্ছে

ওঁরাওদের মধ্যে প্রচলিত করম পূজা। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অবস্থাই নয়, আদিবাসীদের সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনেরও রূপকধর্মী বহিঃপ্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাদের বিভিন্ন পরবগুলির মধ্যে। নিম্নে প্রদত্ত সারণিতে আমরা আদিবাসীদের সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন পরবগুলির একটা রূপরেখা পাই ; সেই সঙ্গে এও দেখি কীভাবে এই পরবগুলি তাদের জীবনের সামগ্রিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

সারণি-১৮
আদিবাসীদের বিভিন্ন পরব

অর্থনৈতিক	সামাজিক	রাজনৈতিক
এরক্ সিম	অরাক বোঙা	লো বীর সেন্দ্রা
হরিহর সিম	আব্গে বোঙা	মাঘসিম
সাকরাত	জমসিম	বাহা
সোহরাই	মাক্মরে	
বাধ্না		

আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক বিবর্তন : মেদিনীপুরের আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রচলিত পরবগুলির নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে উদঘাটিত হয় তাদের আদিম প্রাগৈতিহাসিক গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত অবশেষ। সেন্দ্রা, বাহা ইত্যাদি তাদের আদিম শিকারী ও সংগ্রাহক জীবনের প্রতীকী প্রকাশ। বাহায় ফুল, লতা, পাতা ইত্যাদি কুড়িয়ে নেওয়ার মধ্যে আর সেই সমস্ত দিয়ে পূজার উপকরণ সর্জনের মধ্যে আমরা আদিবাসীদের আদিম সংগ্রাহক জীবনের এক ঝলক প্রতিভাস দেখতে পাই। বাহা শব্দের অর্থ ফুল, তা আবার প্রজননশীল নারীত্বেরও প্রতীক। হয়তো বাহার এই ফুলের উৎসবের মধ্যে তাদের সামগ্রিকভাবে বর্ধিত হওয়ার এক ইঙ্গিত সুপ্ত থেকে যায়। সেন্দ্রা হল তাদের শিকার উৎসব, এর মূল 'মোটিভ'ই হল শিকার। বাহাতে নারীত্বের মহিমা মর্যাদামণ্ডিত হলেও, সেন্দ্রা পরবের শিকার অভিযানে আমরা নারীদের অংশগ্রহণ করতে দেখি না। তাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক রক্ষণশীলতা ইত্যাদি প্রাধান্য পায় সেন্দ্রা পরবে। অন্যভাবে দেখলে সেন্দ্রা পরব তাদের সাংবৎসরিক রাজনৈতিক সমাবেশও বটে। এখানে তাদের সামাজিক তথা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা একাধিক স্তরে ক্রিয়াশীল থাকে। এক সময় এই শিকারভিত্তিক জীবনযাত্রার উত্তরণ ঘটে আদিম প্রথার ঝুম্ চাষ ব্যবস্থায়। এরক্ সিম, হরিহর, ইরুগুদলি ইত্যাদি যেন এই অর্থনৈতিক জীবনের ক্রমোন্নয়নের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রকাশ। আবার এই ব্যবস্থা থেকেও তাদের আরোহণ হয় এর এক প্রকার জীবনযাত্রায়। তা হল, লাঙলের দ্বারা কৃষিকার্য, সেই সঙ্গে উদ্বৃত্ত ফসল। অবশ্য এও সত্যি যে, এক অর্থনৈতিক জীবনচর্চা কখনই আর এক অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায় না। বরং কোনও-না-কোনওভাবে তারা উপস্থিত থাকে, একে অপরের সম্পূরক হয়ে। বস্তুত আদিবাসীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি কৃষিকার্য আর শিকারী-সংগ্রাহক জীবনের সহাবস্থান। এক ব্যবস্থা আর এক ব্যবস্থার সঙ্গে এক অপূর্ব মিথোজীবীতায় আবদ্ধ হয়ে, প্রকৃতির হাজার প্রতিকূলতার মধ্যেও আদিবাসীদের উদ্বর্তন সম্ভব করে তুলছে। সময়ের সঙ্গে কৃষিকার্য যখন আদিবাসীদের মুখ্য জীবিকা হয়ে দাঁড়াল, তখনও এর প্রতিফলন আমরা পেলাম তাদের পরবের মধ্যে। এই সময়েরই প্রকাশ আমরা দেখি সোহরাই, গো বাধ্না, খুন্টোই ইত্যাদি পরবে। আর সাক্রাত হল কৃষিকার্য আর শিকার ঝুম্ জীবনের অন্তর্বর্তী পর্যায়ে উদ্ভূত একটি উৎসব।

●

আদিবাসী ও অনাদিবাসী সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটে একটা পর্যায়ে। বিশেষত, যখন আদিবাসী সংস্কৃতি ও হিন্দু সমাজের তথাকথিত ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি মিলেমিশে এক অনবদ্য রূপ পরিগ্রহ করে। যে সংশ্লেষণের পরিচয় আমরা পাই দাসাই পরবে, কাঠিনাচে, শীতলা, মনসা পুজো আর কালী পুজোয় পারস্পরিক আদান-প্রদানের নক্শিকাঁথায়।

●

আদিবাসী ও অনাদিবাসী সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটে একটা পর্যায়ে। বিশেষত, যখন আদিবাসী সংস্কৃতি ও হিন্দু সমাজের তথাকথিত ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি মিলেমিশে এক অনবদ্য রূপ পরিগ্রহ করে। যে সংশ্লেষণের পরিচয় আমরা পাই দাসাই পরবে, কাঠিনাচে, শীতলা, মনসা পুজো আর কালী পুজোয় পারস্পরিক আদান-প্রদানের নক্শিকাঁথায়। আদিবাসী-অনাদিবাসী সংস্কৃতির এই সংশ্লেষণের ফলশ্রুতি এইভাবেই এক মিশ্র গ্রামীণ সংস্কৃতির দ্যোতনায় ভরপুর হয়ে ওঠে।

লেখক : অধ্যাপিকা, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়,
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, নৃতত্ত্ব বিভাগ

জগন্নাথ মন্দির, বাহিরী
ছবি : প্রশান্ত প্রামাণিক

লোকেশ্বর শিবমন্দির, ময়নাগড়
ছবি : তারাপদ সাঁতরা
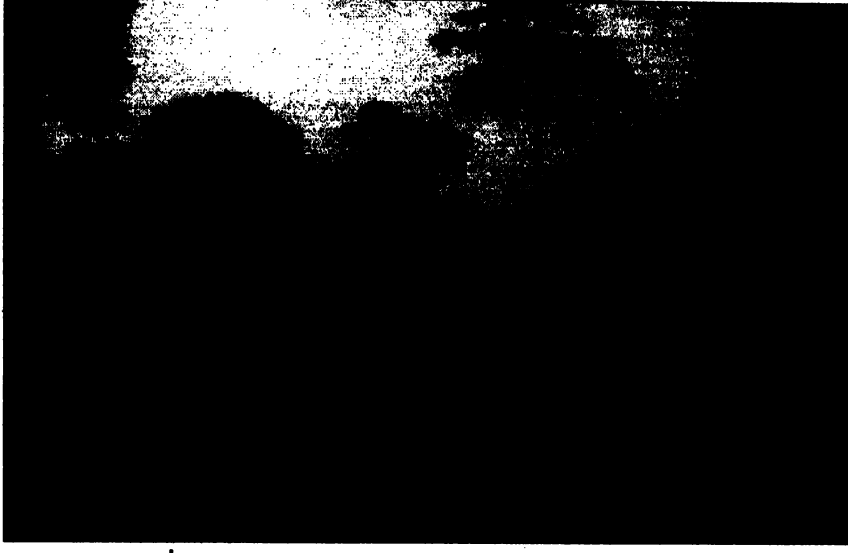
মেদিনীপুরের এক এক অঞ্চলে, এক এক গোষ্ঠীতে এক এক ধরনের ভাষা

মেদিনীপুরের বাংলা ভাষা

অনিমেষকান্তি পাল

লেখার সময় সারা বাংলায় বাংলা ভাষার একটাই রূপ, কিন্তু বলবার সময় এক-এক অঞ্চলে এক-এক রকম। এমন কি একই গ্রামে দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখে দুইরকমের বাংলা ভাষা। মুখের ভাষার এই রূপভেদকে সাধারণত উপভাষা বলা হয়েছে এতদিন। তবে ভাষার যে সর্বজনমান্য লিখিত রূপ তাও অনেক রূপেরই একটি যা মান্যতা অর্জন করেছে। শিক্ষিত লোকের কথ্য ভাষায় ওই রূপটিই মান্য বা আদর্শ বলে স্বীকৃত। কিন্তু মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে গ্রামীণ মানুষের মুখে অনেকগুলি কথ্যরূপ শোনা যায়। এগুলিকে পরস্পর থেকে আলাদা করে দেখানো বেশ কঠিন। এ প্রবন্ধে যত দূর সম্ভব সংক্ষেপে এবং সহজ করে ওই কাজটি করার চেষ্টা করা হবে।

মেদিনীপুরের ভূপ্রকৃতি ও জনগোষ্ঠী

(ক) বর্তমানে মেদিনীপুরই পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড়ো জেলা। এই জেলার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য অন্যান্য জেলা থেকে অনেক বেশি। তেমনি জনগোষ্ঠীগত (ethnic) বৈশিষ্ট্যও অনেক। কাজেই এই জেলাতে বাংলা ভাষার নানা কথ্যরূপ বা উপভাষা প্রচলিত থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কথাটা বর্তমান আলোচনায় উত্থাপিত হচ্ছে কেন ?
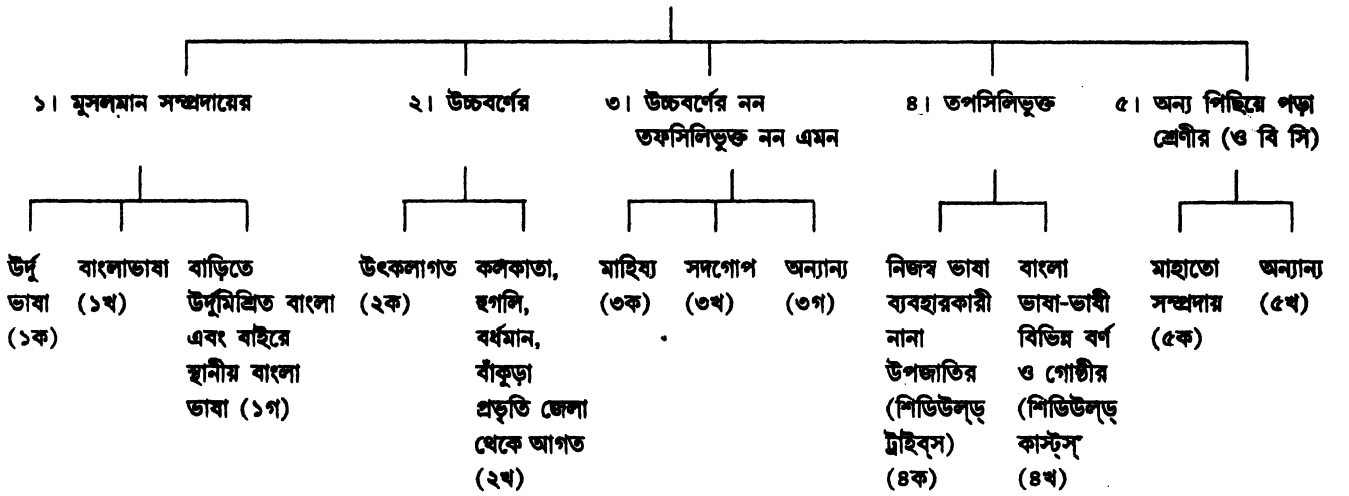
আগেকার দিনে যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা নিতান্ত কম ছিল। তার ফলে অঞ্চলগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল। মানুষ গোষ্ঠিবদ্ধ হয়ে অঞ্চলে অঞ্চলে বংশ পরম্পরায় বসবাস করত। এক-এক অঞ্চলে বা এক-এক গোষ্ঠীতে এক-এক ধরনের ভাষা অভ্যাস (speech habits) গড়ে উঠত। একটি ভাষার কথ্যরূপে এই জন্যেও বিভিন্নতা গড়ে ওঠে। মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম দিক জুড়ে লাল মাটি, শালবন, ছোট ছোট টিলা এবং পাহাড়, ঢেউ খেলানো, উঁচুনিচু ডাঙা জমি। কোথাও কোথাও ল্যাটেরাইট বা মাকড়া পাথর ছড়ানো অনুর্বর ডাহি মাঠ। এই পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূবৈশিষ্ট্য আলাদা রকমের। তেমনি আলাদা রকমের ভূবৈশিষ্ট্য দেখা যায় দক্ষিণ মেদিনীপুরের মোহানা ও সমুদ্র সন্নিহিত অঞ্চলটিতে। এখানে মাইলের পর মাইল বালিয়াড়ি, কাজুবাদামের জঙ্গল, ঝাউগাছের সারি এবং নারকেল গাছ। আর মাঝে মাঝে পানবরজ। তৃতীয় ভূবৈশিষ্ট্যযুক্ত অঞ্চলটিকে বলা যায় পূর্ব
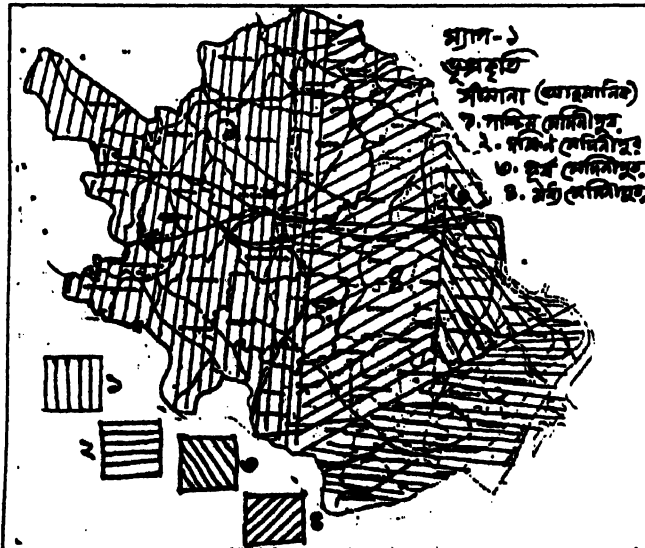
হাটে-বাজারে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষায় ভিন্নতা সুস্পষ্ট

মেদিনীপুরের নিচু পলিমাটি অঞ্চল ; খাল, বিল, নালা ডোবা এবং নদী সন্নিহিত অঞ্চল। ধানখেত, পানবরজ আর নারকেল গাছ। চতুর্থ ভূবৈশিষ্ট্যযুক্ত অঞ্চলটি হল উত্তর ও মধ্য মেদিনীপুরের উঁচু পলিমাটি অঞ্চল। নালা আছে কিন্তু নদী নেই। অঞ্চলটি খরাপ্রবণ। উত্তরদিকে আলুর চাষ লক্ষণীয়। এই চারটি অঞ্চলকে ছোট একটি ম্যাপে দেখিয়ে দেওয়া যায় খুবই সহজে। (ম্যাপ-১)

(খ) তারপর বলতে হয় জনগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যের কথা। মেদিনীপুর জেলার বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের মোটামুটিভাবে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নেওয়া যেতে পারে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ওড়িশা থেকে আগত মানুষেরা দক্ষিণ মেদিনীপুরেই বাস করেন বেশির ভাগ। তপসিলি সম্প্রদায়ের মানুষেরা বাস করেন পশ্চিম মেদিনীপুরেই প্রধানত। উত্তর মেদিনীপুরের বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের বেশির ভাগ হুগলি, হাওড়া এবং বাঁকুড়া জেলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আর পূর্ব মেদিনীপুরের বেশির ভাগ মানুষই হলেন মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত।
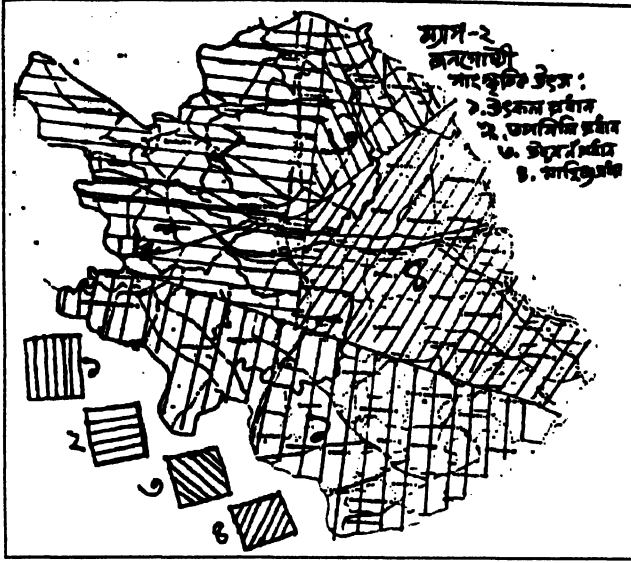
মাহাতো সম্প্রদায় পশ্চিম মেদিনীপুরের বাসিন্দা। উত্তর ও মধ্য মেদিনীপুরে সদগোপ সম্প্রদায়ের মানুষদের বাস। তবে এসব কথা মোটামুটিভাবে বলা যায় মাত্র। এ সম্বন্ধে সঠিক হিসেব পাওয়া কঠিন। তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষেরা (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য) বেশির ভাগই মেদিনীপুর জেলায় বসবাস করছেন ইংরেজ আমল থেকে। তাঁরা চাকরিজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষক, আইন ব্যবসায়ী হিসেবে এসে পরে ভূ-সম্পত্তির অধিকারি হয়েছেন। তবে হুগলি জেলার যে অংশ পরে মেদিনীপুরের উত্তর সীমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেখানে উচ্চবর্ণের মানুষেরা অনেক আগে থেকেই বসবাস করে চলেছেন।

(গ) আমরা এখানে একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করে দেখাতে পারি।

রেখাচিত্রটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে সাংস্কৃতিক দিক থেকে মেদিনীপুরের মানুষেরা পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে উদ্ভূত। এর মধ্যে মুসলমানরা জেলার প্রত্যেকটি অঞ্চলেই বসবাস করেন। কিন্তু বাকি মানুষেরা জেলার এক-একটি অঞ্চলে বসবাস করেন। এই বিষয়টিও ম্যাপের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে। (ম্যাপ-২) জাতি-গোষ্ঠীগত এই ছকটি মনে রাখা প্রয়োজন এই জন্যে যে ভাষা অভ্যাসের (speech habits) সঙ্গে জন-গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রেই অতি সুস্পষ্ট।

মেদিনীপুরের বাংলাভাষা

(ক) বাংলার যেটি কেন্দ্রীয় উপভাষা, যাকে বলা হয় মান্য, শিষ্ট চলিত বাংলা অথবা ইংরেজি আলোচনায় যাকে বলা হয় Standard Colloquial Bengali (SCB) তা, মেদিনীপুর জেলার একটি বিশেষ অঞ্চলে সাধারণ মানুষেরও স্বাভাবিক কথাবার্তার ভাষা। মান্য চলিত বাংলাই তারা ঘরে-বাইরে ব্যবহার করেন। তবে কোথাও কোথাও, কারও কারও উচ্চারণে কিছু পার্থক্য ঘটতে দেখা যায়। আবার সারা জেলাতেই এমন মানুষ প্রচুর যাঁরা লেখাপড়া শিখেছেন এবং সেইসঙ্গে মান্য চলিত বাংলায় কথা বলা অভ্যাস করেছেন। বাংলাভাষার ক্ষেত্রেও এঁরা দ্বিভাষী। নিজেদের বাড়িতে, স্বগ্রামে, স্বজনদের সঙ্গে কিংবা নিজেদের অঞ্চলে এঁরা বাংলা ভাষার স্থানীয় কথ্যরূপটি ব্যবহার করেন আবার শিক্ষায়, প্রশাসনে, বক্তৃতা ইত্যাদিতে, বাইরের লোকের সঙ্গে কথোপকথনের সময় ব্যবহার করেন মান্য চলিত বাংলা। এঁদের উচ্চারণে ঘরের ভাষার ভাষাঅভ্যাসগুলি বেশি করে ধরা দেয়। তা শুনলেই বোঝা যায় যে মান্য চলিত বাংলা এঁদের শিখতে হয়েছে। এ ভাষা তাদের কাছে অর্জিত দ্বিতীয় ভাষা।

(খ) মেদিনীপুরে বাংলাভাষার যে কথ্যরূপগুলি প্রচলিত আছে তা মান্য চলিত ভাষা থেকে কতটা পৃথক এবং পরস্পরের সঙ্গেই বা তাদের পার্থক্য কতটা ? প্রাথমিকভাবে একটা ধারণা দেওয়ার জন্যে নিচের উদাহরণগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে—

মান্য চলিত ভাষায়	আঞ্চলিক কথ্য ভাষায়	প্রচলনের অঞ্চল
ছেলে	ছেলে	ঘাটাল, চন্দ্রকোণা
ঐ	ছুয়া	রামনগর
ঐ	কুনা	বীণপুর
ঐ	চনকা	পাঁশকুড়া
ঐ	ছ্যানা	পিংলা, ডেবরা
ঐ	টকা	নন্দীগ্রাম, খেজুরী

অর্থাৎ এক 'ছেলে' শব্দটিরই আরও পাঁচটি বিকল্প আছে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে। এই বিভিন্নতাগুলি
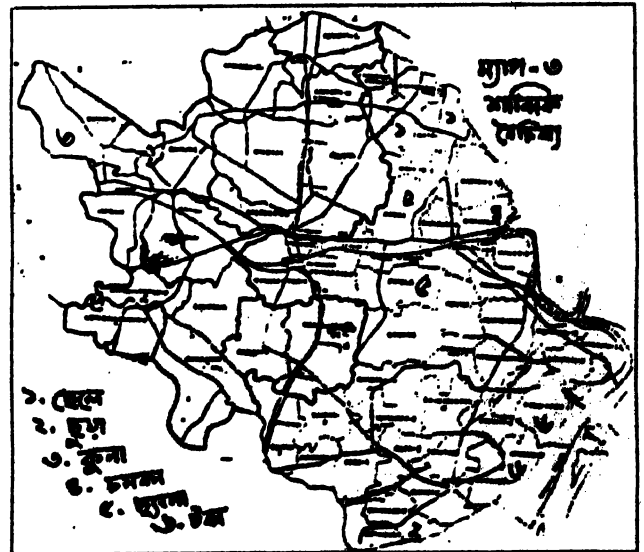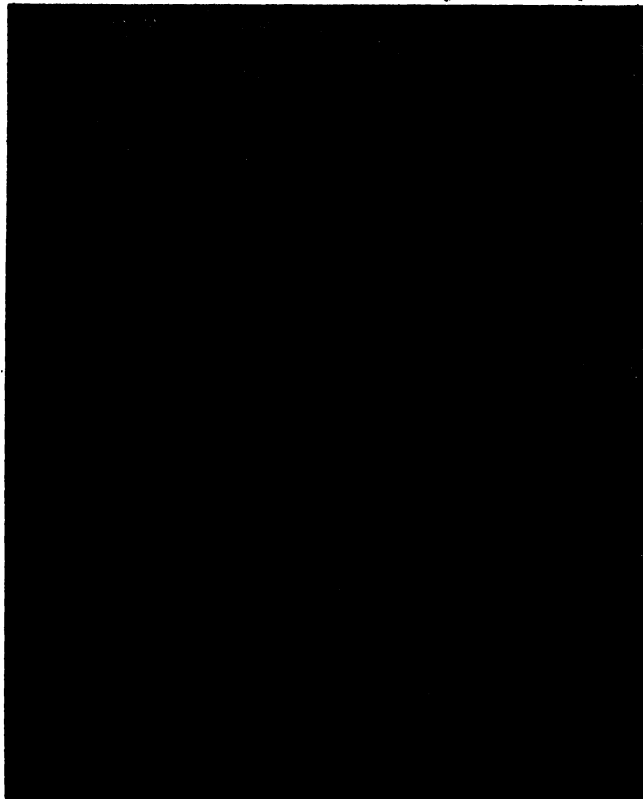
মেদিনীপুরের কাকমারা উপজাতি, ডান হাতে লোহার ছুরি

মেদিনীপুর জেলার একটি ম্যাপে সহজেই দেখানো যেতে পারে। (ম্যাপ-৩) মেদিনীপুরে বাংলা ভাষার যে কথ্যরূপগুলি প্রচলিত আছে সেগুলি মান্য চলিত থেকে কতটা পৃথক এবং পরস্পরের থেকেই বা কতটা পৃথক তা এই তালিকা থেকে কিছুটা হয়তো বোঝা যাবে। এই পার্থক্য অবশ্য শব্দভাণ্ডারগত। তবে সব শব্দে এতটা পার্থক্য নজরে পড়ে না। কারণ প্রায়োগিক ক্ষেত্রে নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক চাপ ক্রিয়াশীল থাকে। সেই চাপের নিচে পার্থক্যগুলি ক্রমেই কমে যায়।

ভাঙা তেলুগু ভাষী কাকমারাদের অস্থায়ী কুঁড়ে ঘর   ছবি : ত্রিপুরা বসু

(গ) জানা দরকার সামগ্রিকভাবে মেদিনীপুর জেলায় কোন কোন স্বরধ্বনি এবং কোন কোন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়। সামগ্রিক তালিকাটির সঙ্গেই উল্লেখ থাকা চাই মান্য চলিত বাংলার ধ্বনি থেকে যে ধ্বনিগুলি আলাদা সেগুলির এবং তাদের প্রচলন স্থানের। ভাষা সম্বন্ধীয় আলোচনায় ধ্বনির স্থানই সর্বাগ্রে।

স্বরধ্বনি	চলিত	মেদিনীপুরী	প্রচলন স্থান
১। সংবৃত পশ্চাৎ	উ	উ যথা টুসু	জেলার সর্বত্র
২। অর্ধ-সংবৃত পশ্চাৎ	ও	ও যথা চোর	ঐ
৩। অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ	অ	অ যথা ঘর	ঐ
৪। বিবৃত মধ্য	আ	আ যথা কাড়া	ঐ
৫। সংবৃত সম্মুখ	ই	ই যথা পিসি	ঐ
৬। অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ	এ	এ যথা কে	ঐ
৭। বিবৃত সম্মুখ	অ্যা	অ্যা যথা ছ্যানা	ঐ
*৮। অর্ধ-বিবৃত	মধ্য-অ'	অ' যথা ব'ড়'	পশ্চিম মেদিনীপুর
*৯। অল্প তালব্যীভূত অর্ধ-বিবৃত-সম্মুখ	—	আ' যথা বেনা'	মধ্য মেদিনীপুর
*১০। অল্প তালব্যীভূত অর্ধ-বিবৃত-সম্মুখ	—	এ'-যথা দেখে'	পশ্চিম মেদিনীপুর

তালিকার প্রথম ৭টি মূল স্বরধ্বনি বা ফোনিম, আর শেষ ৩টি পুরক স্বরধ্বনি বা অ্যালোফোন।

ব্যঞ্জন ধ্বনি	চলিত	মেদিনীপুরী	প্রচলন স্থান
১। কণ্ঠ্য স্পৃষ্ট অঘোষ অল্পপ্রাণ	ক	ক, যথা কথা	জেলার সর্বত্র
২। কণ্ঠ্য স্পৃষ্ট সঘোষ অল্পপ্রাণ	গ	গ, যথা গরু	ঐ
৩। মূর্ধন্য স্পৃষ্ট অঘোষ অল্পপ্রাণ	ট	ট, যথা টাকা	ঐ
৪। মূর্ধণ্য স্পৃষ্ট সঘোষ অল্পপ্রাণ	ড	ড, যথা ডাক	ঐ
৫। দন্ত্য স্পৃষ্ট অঘোষ অল্পপ্রাণ	ত	ত, যথা তালা	ঐ
৬। দন্ত্য স্পৃষ্ট সঘোষ অল্পপ্রাণ	দ	দ যথা দাম	ঐ
৭। ঔষ্ঠ্য স্পৃষ্ট অঘোষ অল্পপ্রাণ	প	প, যথা পুতুল	ঐ
৮। ঔষ্ঠ্য স্পৃষ্ট সঘোষ অল্পপ্রাণ	ব	ব, যথা বল	ঐ
৯। কণ্ঠ্য নাসিক্য	ঙ	ঙ, যথা ব্যাঙ	ঐ
১০। দন্তমূলীয় নাসিক্য	ন	ন, যথা নাক	ঐ

১১। ঔষ্ঠ্য নাসিক্য	ম	ম, যথা মাথা	ঐ
*১২। দন্ত্য নাসিক্য	ন	ন, যথা বন্ধ	ঐ
*১৩। মূর্ধন্য নাসিক্য	ণ	ণ, যথা গণি	দক্ষিণ মেদিনীপুর
*১৪। তালব্য নাসিক্য	ঞ	ঞ, যথা বাহ্‌রাইঞ	পশ্চিম মেদিনীপুর

প্রথম ৮টি স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনই মূলধ্বনি। কিন্তু ৬টি নাসিক্যধ্বনির মধ্যে ৯, ১০, ১১ সংখ্যক ধ্বনিগুলি মূলনাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি। ১২, *১৩, *১৪ সংখ্যক নাসিক্যগুলি পূরকধ্বনি।

১৫। তালব্য ঘৃষ্ট অঘোষ অল্পপ্রাণ	চ	চ যথা চড়	জেলার সর্বত্র
১৬। তালব্য ঘৃষ্ট সঘোষ প্রাণ	জ	জ, যথা জল	ঐ
১৭। কণ্ঠ্যস্পৃষ্ট অঘোষ মহাপ্রাণ	খ	খ, যথা খাল	ঐ
১৮। কণ্ঠ্যস্পৃষ্ট সঘোষ মহাপ্রাণ	ঘ	ঘ, যথা ঘা	ঐ
১৯। মূর্ধন্য স্পৃষ্ট অঘোষ মহাপ্রাণ	ঠ	ঠ, যথা ঠাকুর	ঐ
২০। মূর্ধন্য স্পৃষ্ট সঘোষ মহাপ্রাণ	ঢ	ঢ, যথা ঢোল	ঐ
২১। দন্ত্য স্পৃষ্ট অঘোষ মহাপ্রাণ	থ	থ, যথা থাক	ঐ
২২। দন্ত্য স্পৃষ্ট সঘোষ মহাপ্রাণ	ধ	ধ, যথা ধান	ঐ
২৩। ঔষ্ঠ্য স্পৃষ্ট অঘোষ মহাপ্রাণ	ফ	ফ, যথা ফুল	ঐ
২৪। ঔষ্ঠ্য স্পৃষ্ট সঘোষ মহাপ্রাণ	ভ	ভ, যথা ভুল	ঐ
২৫। তালব্য ঘৃষ্ট অঘোষ মহাপ্রাণ	ছ	ছ, যথা ছানা	ঐ
২৬। তালব্য ঘৃষ্ট সঘোষ মহাপ্রাণ	ঝ	ঝ, যথা ঝড়	ঐ
*২৭। মূর্ধন্য তাড়িত মহাপ্রাণ	—	ঢ়, যথা বুঢ়া	পশ্চিম মেদিনীপুর

১৭ সংখ্যক থেকে ২৬ সংখ্যক ১০টি মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের সবকটিই মূল ব্যঞ্জনধ্বনি, কিন্তু *২৭ সংখ্যক মূর্ধন্য তাড়িত মহাপ্রাণটিকে পূরক ব্যঞ্জনধ্বনি হিসেবে গণ্য করতে হবে।

২৮। দন্তমূলীয় কম্পিত	র	র, যথা রাখ	জেলার সর্বত্র
২৯। দন্তমূলীয় তাড়িত অল্পপ্রাণ	ড়	ড়, যথা ঘোড়া	ঐ
৩০। দন্তমূলীয় পার্শ্বিক	ল	ল, যথা লাল	ঐ
*৩১। মূর্ধন্য পার্শ্বিক	—	ল, যথা জল	দক্ষিণ মেদিনীপুর
৩২। কণ্ঠনালীয় উষ্ম	হ	হ, যথা হাল	জেলার সর্বত্র
৩৩। দন্ত্য শিশ্	স	স, যথা বস্তা	ঐ
*৩৪। দন্তমূলীয় তালব্য শিশ্	শ	শ, যথা শোনা	ঐ
৩৫। তালব্য অর্ধস্বর	য়	য়, যথা যায়	ঐ

*৩১ ও ৩৪ সংখ্যক ধ্বনিটিকে পূরক ধ্বনি হিসেবে গণ্য করলে মোট হিসেব দাঁড়াবে মূল স্বরধ্বনি ৭টি। আর অর্ধস্বর একটি এবং ২৮টি মূলব্যঞ্জন ধ্বনি। কাজেই মোট মূলধ্বনির সংখ্যা হল ৩৬। চলিত বাংলার সঙ্গে তুলনায় মূলধ্বনির ক্ষেত্রে পার্থক্য মাত্র একটি। মেদিনীপুরের অধিকাংশ লোকের কথ্য ভাষায় দন্ত্য শিশ্ ধ্বনিটিই মূলধ্বনি আর মান্য চলিত বাংলায় দন্তমূলীয় তালব্য শিশ্ ধ্বনিটি হল মূলধ্বনি। মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে, মূলধ্বনি বা ফোনিমের সংখ্যা উভয়ক্ষেত্রে একই। মেদিনীপুরের বাংলা কথ্য ভাষায় উচ্চারণগত যে পার্থক্য তা হল পূরকধ্বনি বা অ্যালোফোনগুলির ক্ষেত্রে। বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেওয়া দরকার।

মেদিনীপুরী কথ্যবাংলার ধ্বনি বিচার

(ক) যদিও ধ্বনিবিচার সাধারণ পাঠকের কাছে জটিল মনে হওয়া স্বাভাবিক, তথাপি আলোচনাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বিষয়টি এড়িয়ে গেলে। সাতটি মূল স্বরধ্বনির উচ্চারণ মান্য চলিত বাংলার সঙ্গে অভিন্ন। তবু যুগল শব্দে বৈপরীত্য স্পষ্ট করার প্রচলিত ভাষা-বৈজ্ঞানিক রীতিটি মান্য করা উচিত।

মূল স্বরধ্বনি সংখ্যা সাত, যথা—

অ—যেমন 'দকান' শব্দের প্রথম অক্ষরে উচ্চারিত হচ্ছে। আর তার পাশে দোকান শব্দের প্রথম অক্ষরে পাওয়া যাচ্ছে—ও।

দকান/দোকান শব্দযুগলে অ স্পষ্ট।

আ—যেমন 'বাটা' শব্দের প্রথম অক্ষরে, কিন্তু 'ব্যাটা' শব্দের প্রথম অক্ষরে আছে অ্যা।

বাটা/ব্যাটা শব্দযুগলে আ স্পষ্ট।

ই—লিখা/লেখা ; ই/এ : ই স্পষ্ট।

উ—টুকা/টোকা ; উ/ও : উ।

ও—ওঠা/উঠা ; ও/উ : ও।

এ—দেশি/দিশি ; এ/ই : এ।

অ্যা—ব্যাটা/বেটি ; অ্যা/এ : অ্যা।

সাত শব্দযুগল সাতটি মূল স্বরধ্বনিকে স্পষ্ট করে তুলেছে। তবে লক্ষ করার বিষয় হল সাতটি মূল স্বরধ্বনিরই আনুনাসিক উচ্চারণ হয় এবং তার ফলে অর্থ পরিবর্তন ঘটে যায়। এক্ষেত্রেও যুগলশব্দে বৈপরীত্য স্পষ্ট করা হবে। যথা—

অ : অঁ — বধু/বঁধু
আ : আঁ — বাধ/বাঁধ
ই : ইঁ — টিকা/টিঁকা
উ : উঁ — পুজি/পুঁজি
ও : ওঁ — খোজা/খোঁজা
এ : এঁ — বেটে/বেঁটে
অ্যা : অ্যাঁ — প্যাচ/প্যাঁচ। সাতটি ক্ষেত্রেই আনুনাসিকতা শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

(খ) এবার বিবেচনা করে দেখা যাক অ', আ' এবং এ'—এই তিনটি পূরক স্বরধ্বনির প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য। বাস্তবিক এগুলিকে পূরক স্বরধ্বনি বলার প্রধান কারণ হল—বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতেই কেবল এগুলি উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন—পরে ই বা উ ধ্বনি থাকলে অর্ধবিবৃত পশ্চাৎ স্বর অ পরিবর্তিত হয়ে অর্ধবিবৃত মধ্য স্বর অ' হিসেবে উচ্চারিত হয় যেমন অ'তি, অ'তুল ইত্যাদি শব্দে দেখা যায়। তবে পশ্চিম মেদিনীপুরে এই কারণ ছাড়াই অ' উচ্চারণ শোনা যায়, যেমন ব'ড়' শব্দে। এই ধ্বনিটি অনেকে 'ও' মনে করেন। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ স্পষ্ট, যথা—

কোনে আর ক'নে কিংবা বোনে আর ব'নে, কিংবা ধোনে আর ধ'নে, ইত্যাদি বিপরীত যুগল থেকে ধরা পড়ে। অল্প তালব্যীভূত অর্ধ-বিবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনিটি আর একটি পূরক স্বরধ্বনি যা পশ্চিম মেদিনীপুরে শোনা যায় বিশেষ একটি অবস্থানে। শব্দান্তে ধ্বনিটির উদ্ভব হয় ই এবং আ যখন যুক্ত হয়ে এক ধ্বনিতে পরিণত হয়, যেমন—বেনিয়া থেকে বেনা'। এই ধ্বনিটি স্পষ্ট ধরা পড়ে।

বেনা : বেনা' শব্দযুগল থেকে কিংবা বেলা : বেলা' শব্দযুগল থেকে। আর একটি পূরক স্বরধ্বনি হল—অল্প তালব্যীভূত অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি—এ'। এর অবস্থানও শব্দান্তে এবং এর উদ্ভব হয় ই এবং এ যুক্ত হয়ে এক ধ্বনিতে পরিণত হলে, যেমন দেখিয়া থেকে দেখে'। ধ্বনিটি স্পষ্ট
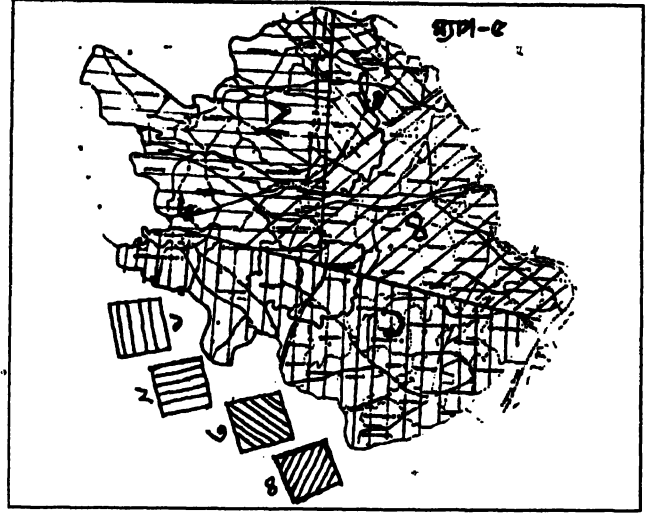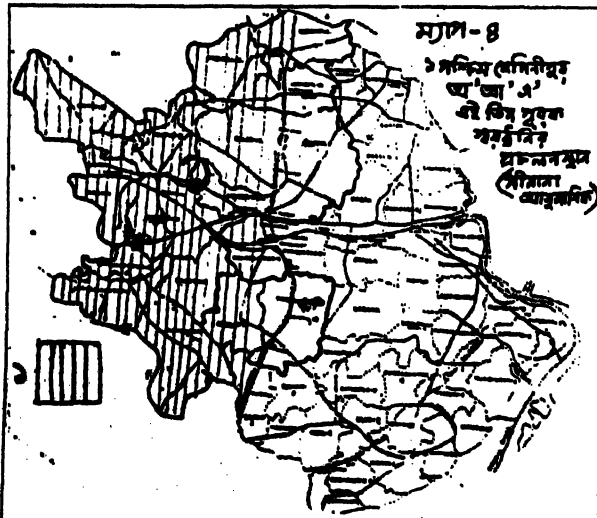
ধরা পড়ে দেখে : দেখে' কিংবা এসে : এসে' ইত্যাদি শব্দযুগল থেকে।

(গ) ২৮টি মূল ব্যঞ্জনধ্বনি এবং ১টি মূল অর্ধস্বরধ্বনি যেহেতু চলিত বাংলার মতোই মেদিনীপুরে উচ্চারিত হয়ে থাকে তাই নতুন করে তাদের পরীক্ষা বাহুল্য। কেবল তিনটি নাসিক্য পূরক ধ্বনি—(১) দন্ত্য নাসিক্য-ন, (২) মূর্ধন্য নাসিক্য-ণ এবং (৩) তালব্য নাসিক্য—ঞ আলাদাভাবে বিচার করা আবশ্যক। তাছাড়া আরও তিনটি পূরক ব্যঞ্জনধ্বনি আছে, যথা—(৪) মূর্ধন্য তাড়িত মহাপ্রাণ-ঢ়। (৫) মূর্ধন্য পার্শ্বিক—ল, এবং (৬) দন্তমূলীয় তালব্য শিশ—শ। এই ছয়টি পূরক ধ্বনিই বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে উদ্ভূত হয় এবং বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে শোনা যায়।

একটি নাসিক্য পূরক ব্যঞ্জন—দন্ত্য নাসিক্য-ন শোনা যায় জেলার সর্বত্র দন্ত্যধ্বনির সঙ্গে যুক্ত অবস্থায়, যেমন বন্ধ শব্দে কিংবা চিন্তা শব্দে। মূর্ধন্য নাসিক্য ণ শোনা যায় কেবল দক্ষিণ মেদিনীপুরে। ধ্বনিটি শব্দান্তেই সাধারণত পাওয়া যায়, যেমন—পূজাকরণ। তালব্য নাসিক্য ধ্বনিটি শোনা যায় পশ্চিম মেদিনীপুরে। এ ধ্বনিটিও সাধারণত শব্দান্তেই পাওয়া যায়, যেমন—সিখাইঞ দিছে, বলিঞ দিব ইত্যাদি প্রয়োগে। মূর্ধন্য তাড়িত মহাপ্রাণ পূরক ধ্বনি—ঢ় শোনা যায় কেবল পশ্চিম মেদিনীপুরেই, যেমন বুঢ়া, বাঢ়া ইত্যাদি শব্দান্তে। এর পর বলা দরকার মূর্ধন্য পার্শ্বিক পূরক ধ্বনি ল-এর কথা। এই পূরক ব্যঞ্জনটি দক্ষিণ মেদিনীপুরেই কেবল শোনা যায় বেলা., গলে. ইত্যাদি শব্দে। এই ধ্বনিটি শব্দের আদি, মধ্য, অন্ত—তিন অবস্থানেই শোনা যায়। তালব্য শিশ ধ্বনিটি—শ্ চলিত বাংলার মূলধ্বনি কিন্তু মেদিনীপুরের উত্তরাঞ্চলে এবং শিক্ষিত লোকের মুখে এটির উচ্চারণ শোনা যায়, তাই মেদিনীপুরে এটি পূরক ধ্বনি হিসেবেই গণ্য হবে। মেদিনীপুরে দন্ত্য শিশ্—স ধ্বনিই একমাত্র মূল শিশধ্বনি হিসেবে গণ্য করতে হবে। *৪ নং ও *৫ নং ম্যাপে পূরকস্বর ও পূরক ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলির প্রচলন স্থান দেখানো হল।

মেদিনীপুরের বাংলাভাষায় কোথাও কোথাও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়

মেদিনীপুরী কথ্যবাংলার নমুনা

(ক) কথ্য বাংলার কমপক্ষে চারটি প্রকারভেদ পূর্বে প্রদর্শিত পাঁচটি ম্যাপ থেকে ধরা পড়ছে। তবে প্রকার-ভেদগুলির সূক্ষ্মতর এবং বিস্তৃততর বিশ্লেষণ থেকে সংখ্যাটি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে প্রথমে কিছু নমুনা পরীক্ষা করা যেতে পারে। দক্ষিণে সমুদ্রের কাছাকাছি কাঁথি মহকুমার কথ্য ভাষাকে বাইরের বাঙালিরা বোধহয় বাংলা বলে মনে করবেন না প্রথমবার শোনার সময়। কথার টান ওড়িয়া ভাষার মতো। অনেক শব্দ এবং শব্দাংশও তাই। দুটি ধ্বনি মূর্ধন্য ণ এবং মূর্ধন্য ল. .এখানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যা বাংলাদেশের অন্যত্র শোনা যায় না। কাঁথি মহকুমার রামনগর থানার গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে সংগৃহীত কথ্য ভাষার একটি নমুনা—

(১) **"হউ, তুমে বস, মুতউকা লগেই আনুচি। না না মু এখুন আউ তউকা খিমিনি। হউ, খাও। তউকাতে খিয়া হেলা., এখুন মু গণি।"** মানে—হোক, তুমি বোসো, আমি তামাক সেজে আনছি। না না, আমি এখন আর তামাক খাব না। হোক, খাও। তামাক তো খাওয়া হল—এখন আমি গেলুম।

(২) লালমাটি, শালবন ভরা, ঝাড়গ্রাম মহকুমার জামবনি থানার চিচড়া গ্রাম থেকে সংগৃহীত দ্বিতীয় নমুনাটি হল—**"তুই এখনও বসি আছু যে, চাঁন করবু নাই ? মুই তোর সঙ্গে যামু নাই। নাই যদি যাবু তো বল মুই তোর বাবাকে বলি দোঁওঠ।"** মানে—তুই এখনও বসে আছিস যে চান করবি না ? আমি তোর সঙ্গে যাব না। না যদি যাবি তো বলি, আমি তোর বাবাকে বলে দিচ্ছি।

(৩) এই একই অঞ্চলে মাহাতো সম্প্রদায়ের লোকেদের মুখে একটু অন্য রকমের কথ্যভাষা শোনা যায়। সুবর্ণরেখা নদীর অপর পাড়ের নয়াগ্রাম থানার বাছুরখোয়ার গ্রাম থেকে সংগৃহীত নমুনাটি হল—**"তুই কাঁহি যাছি, হামদের সঁগে ঢের লোক যাবেক, তপুবনের কাদা জলে সিনাবেক। হামার মা হামকে টুসুগান সিখাইঞ দিছে। উহার কথা বাদ দে৷ উ হছে ছটফটিয়া লোক।"** মানে—তুই কোথায় যাচ্ছিস ? আমাদের সঙ্গে অনেক লোক যাবে, তপোবনের কাদাজলে নাইবে। আমার মা আমাকে টুসু গান শিখিয়ে দিয়েছে। ওর কথা বাদ দে। ও হচ্ছে ছটফটে লোক। উচ্চারণে আনুনাসিকতা এবং মহাপ্রাণতা অর্থাৎ 'হ' ধ্বনির বাহুল্য এই অঞ্চলের কথ্যভাবার বৈশিষ্ট্য। অসমাপিকা ক্রিয়াপদের শেষে তালব্য নাসিক্য অর্থাৎ ঞ ধ্বনির উচ্চারণ এর আর একটা বৈশিষ্ট্য।

(৪) হুগলি নদীর এ পাড়ে জেলার পুবসীমানায় সুতাহাটা, মহিষাদল, নান্দীগ্রাম—এই নদীসন্নিহিত, নারকেল গাছ, পলিমাটি এবং জলাভূমি অঞ্চলের কথ্য ভাষার নমুনাটি সংগৃহীত হয়েছে মহিষাদল থানার সুঁদরা গ্রাম থেকে। **"মুই মহিষাদলের রথের কথা কইঠি, তমানে সুন। রথের দিন মনকার কি আনন্দ। মনে ঘরনু দুটার সময় বেরাইলি। উরুমালে টাকা বাঁধলি। মনে যখন কেলান পাড়ে গেলি, দুরনু দেখিঠি কত্তলোক যায়ঠে, আসেঠে।"** মানে—আমি মহিষাদলের রথের কথা বলছি। তোমরা শোনো। রথের দিন আমাদের কি আনন্দ। আমরা বাড়ি থেকে দুটোর সময় বের হলুম। রুমালে টাকা বাঁধলুম। আমরা যখন ক্যানাল পাড়ে গেলুম, দূর থেকে দেখছি—কত্তলোক যাচ্ছে আসছে। চলিত বাংলার সঙ্গে এর পার্থক্য দেখা যাচ্ছে সর্বনাম পদ—আমি, আমরা ইত্যাদির বেলায় আর সমাপিকা ক্রিয়াপদ—যাচ্ছে, দেখছি ইত্যাদির বেলায়। কথ্য ভাষার এই রূপটি পূর্ব মেদিনীপুরে শুনতে পাওয়া যায়। তবে এর অনেক প্রয়োগই মধ্যাঞ্চলেও প্রচলিত আছে।

(৫) তবে পূর্বাঞ্চলের কথ্য ভাষার সঙ্গে মধ্যাঞ্চলের কথ্য ভাষার কিছু কিছু পার্থক্যও আছে। মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত পিংলা থানার নন্দবাড় গ্রাম থেকে সংগৃহীত নমুনাটি থেকে পার্থক্যটি স্পষ্ট হবে আশা করি।

"ক্যান ডাকছুলগ ?—তুই সকালনু খাওনি। কার দরে গেছলু ? সিগ্নি খেয়া লে। মন্নে যাব চ একজ্যেগা। মা ঐ সুনছি মোর এক বন্ধু ডাকেরে। তুই মোর ছ্যানাকে ডাকুরু ?"—মানে, কেন ডাকছিলে গো ? তুই সকাল থেকে খাসনি। কার বাড়ি গিয়েছিলি ? শিগগির খেয়ে নে। আমরা যাব চল এক
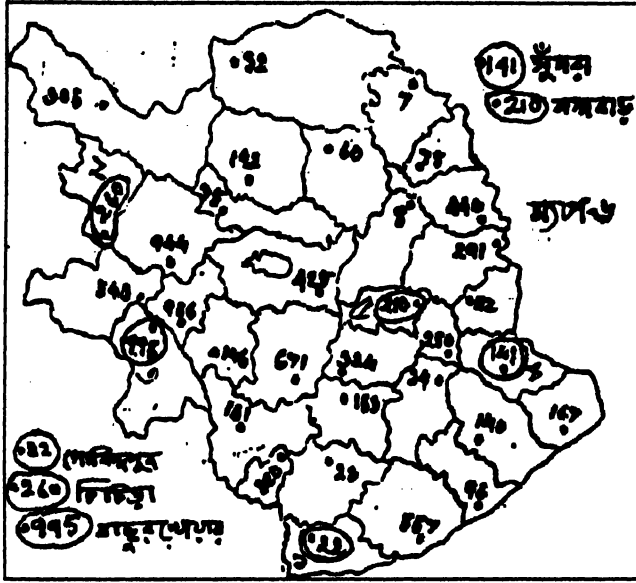
জায়গায়। মা ঐ শুনছ আমার এক বন্ধু ডাকছে। তুই আমার ছেলেকে ডাকছিস ?

(৬) ঘাটাল, চন্দ্রকোণা, দাশপুর, কেশপুর প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলের কথ্যভাষা কলকাতার চলিত বাংলার মতই। অবশ্য কিছু কিছু পার্থক্যও আছে। তবে সে পার্থক্য খুব বড়ো নয়। যেমন—শিশ্‌ধ্বনির দন্ত্য উচ্চারণ এ অঞ্চলেও শোনা যায়। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতেই উপভাষার রূপগত এবং ধ্বনিগত পার্থক্য সবচেয়ে বেশি। মধ্যাঞ্চলের গ্রামগুলিতেই এইসব বৈশিষ্ট্য মেশামেশি করে থাকে লোকসাধারণের কথ্য ভাষায়। সব খুঁটিনাটি বা 'ডিটেল' ধরে বিচার করলে মেদিনীপুরী কথ্য বাংলার রকমফের চারটির বেশিই দাঁড়াবে মনে হয়। তবে প্রধান ভাগ চারটি। এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ অল্প। ৬ নং ম্যাপে যে গ্রামগুলি থেকে কথ্য ভাষার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের অবস্থান দেখানো হল।

মেদিনীপুর জেলায় স্বাধীনতার পরে থানার সংখ্যা ছিল মোট চৌত্রিশটি। তার মধ্যে একটি হল খড়্গপুর শহর থানা। কথ্যভাষার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল খড়্গপুর শহর বাদে তেত্রিশটি থানা থেকে। পরে অবশ্য থানার সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু থানাওয়াড়ি মৌজানম্বর বা জে এল নম্বরে কোনও পরিবর্তন হয়নি। কাজেই পুরোনো 'একইঞ্চি-এক মাইল' অনুপাতের জেলা ম্যাপে মৌজানম্বর দেখানোর কোনও অসুবিধে নেই। থানাওয়াড়ি জে এল নম্বর জানা থাকলে গ্রামের অবস্থানটি জেলাম্যাপে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। ৭ নং ম্যাপে এই ভাবেই গ্রামগুলির অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

এখানে একটি তালিকাতে মহকুমা ধরে গ্রামগুলির নাম, থানার নাম এবং জেল এল নম্বর দেওয়া যেতে পারে।

(ক) **সদর উত্তর মহকুমা**—শালবনি থানা—ভাঙাবাঁধ গ্রাম, জে এল নং-১৯২। কোতোয়ালি থানা—চাঁইপুর গ্রাম, জে এল নং ৩৫। কেশপুর থানা—উদয়পুর গ্রাম, জে এল নং-৬০। গড়বেতা থানা—আমজোর গ্রাম, জে এল নং-৩২। মোট চার থানার চারটি গ্রাম। (খ) **সদর দক্ষিণ মহকুমা**—নারায়ণগড় থানা—তুতরাঙ্গা গ্রাম, জে এল নং-৬৭১। দাঁতন থানা-আড়বনা গ্রাম, জে এল নং-১৫১। সবং থানা-কোল্ডিপুর গ্রাম, জে এল নং-৩২৪। পিংলা থানা—নন্দবার গ্রাম, জে এল নং-২১০। ডেবরা থানা-গোপীনাথপুর গ্রাম, জে এল নং-৩। খড়্গাপুর লোকাল থানা—গ্রাম বারহিঁদু, জে এল নং-৪২৫। কেশিয়াড়ি থানা—নছিপুর গ্রাম, জে এল নং-১৪৬। মোট সাত থানার সাতটি গ্রাম। (গ) **কাঁথি মহকুমা**—কাঁথি থানা—রামচন্দ্রপুর গ্রাম, জে এল নং-৫৫৭। এগরা থানা—এগরা কসবা গ্রাম, জে এল নং-২৩। ভগবানপুর থানা—গোপীনাথপুর গ্রাম, জে এল নং-৩৪। রামনগর থানা—গোবিন্দপুর গ্রাম, জে এল নং-২২। পটাশপুর থানা—পায়রানগরী, জে এল নং-১৫৩। থানা খেজুরি—মতিলাল চক গ্রাম, জে এল নং-৯৬। নন্দীগ্রাম থানা—আমদাবাদ গ্রাম, জে এল নং-১৪০। থানা মোহনপুর—কেওটখলিশা গ্রাম, জে এল নং-৩২০। আট থানার মোট আটটি গ্রাম। (ঘ) **ঝাড়গ্রাম মহকুমা**—ঝাড়গ্রাম থানা—নহরিয়া গ্রাম, জে এল নং-৯৪৪। শাঁকরাইল থানা—শালবনি গ্রাম, জে এল নং-৯৫৬। নয়াগ্রাম থানা—বাছুর খোয়ার গ্রাম, জে এল নং-৯৯৫। বীণপুর থানা—শিলদা গ্রাম, জে এল নং-৩০৫। জামবনি থানা—চিঁচড়া গ্রাম, জে এল নং-২৬০। গোপীবল্লভপুর থানা—ভোলা গ্রাম, জে এল নং-৫৪৩। ছয় থানা—মোট ছয়টি গ্রাম। (ঙ) **ঘাটাল মহকুমা**—ঘাটাল থানা—চকসাদী উত্তর পাড়া, জে এল নং-৭৮। দাশপুর থানা—জ্যোত ঘনশ্যাম গ্রাম, জে এল নং-২৪০। চন্দ্রকোণা থানা—গুচুরে গ্রাম, জে এল নং-৭। থানা তিন। মোট গ্রাম—তিন। (চ) **তমলুক মহকুমা**—সুতাহাটা থানা—হাতিবেড়্যা গ্রাম, জে এল নং-১৬৭। ময়না থানা—পশ্চিম নৈছনপুর গ্রাম, জে এল নং-২৫০। মহিষাদল থানা—সুঁদরা গ্রাম, জে এল নং-১৪১। পাঁশকুড়া থানা—আমলহাণ্ডা গ্রাম, জে এল নং ২৯১। তমলুক থানা—শালিকা
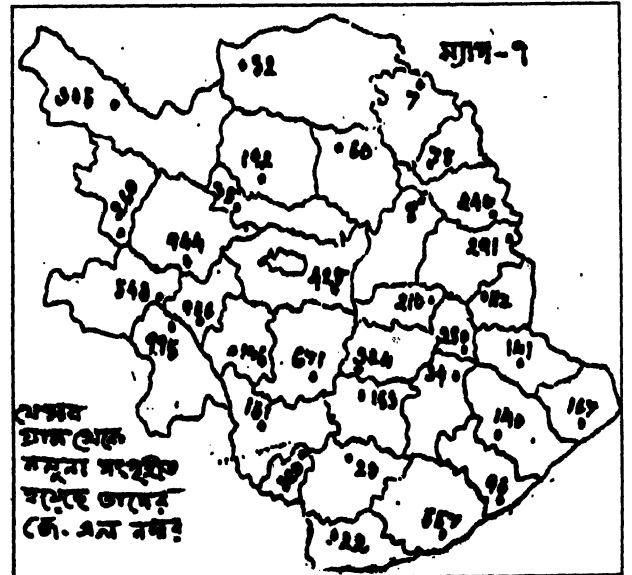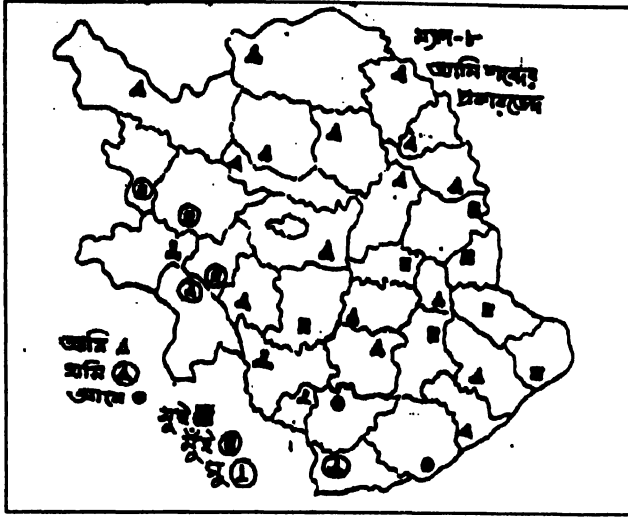
দামোদরপুর গ্রাম, জে এল নং-১১২। মোট পাঁচ থানার পাঁচটি গ্রাম। সব মিলিয়ে তেত্রিশ থানার তেত্রিশটি গ্রাম থেকে প্রচলিত কথ্য ভাষার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

কিছু প্রাথমিক তথ্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্য প্রথমেই 'ছেলে' শব্দের পাঁচটি বিকল্পের প্রচলন ক্ষেত্র ৩ নং ম্যাপে প্রদর্শন করা হয়েছে। তারপর পাঁচটি প্রধান কথ্যরূপকে পাশাপাশি রাখা হয়েছে। তারপর তাদের প্রচলন স্থান প্রদর্শন করা হয়েছে ৬ নং ম্যাপে। ৭ নং ম্যাপে জে এল নম্বর দিয়ে তেত্রিশটি গ্রামের অবস্থান বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আবার ৮ নং ম্যাপে 'আমি' শব্দের ছয়টি বিকল্পের প্রচলন ক্ষেত্রগুলি দেখানো হয়েছে। 'আমি' শব্দের ছয়টি বিকল্প হল—আমি = (১) আমে, (২)হামি, (৩) মুই, (৪) মুঁই, (৫) মু, (৬) মুঁ। এরপর বিভিন্ন ভাষিক উপাদানের প্রচলন ক্ষেত্র প্রদর্শন করা যেতে পারে।

মেদিনীপুরের কথ্যবাংলার রূপমূল

ভাষার দুটি উপাদানই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—(১) ধ্বনি, (২) রূপ। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান আরও স্পষ্ট করে বলে মূল ধ্বনি বা ধ্বনিমূল আর মূল রূপ বা রূপমূল। এই দুই প্রধান ভাষিক উপাদানের মধ্যে ধ্বনিমূল বা মূল ধ্বনিগুলি আগেই
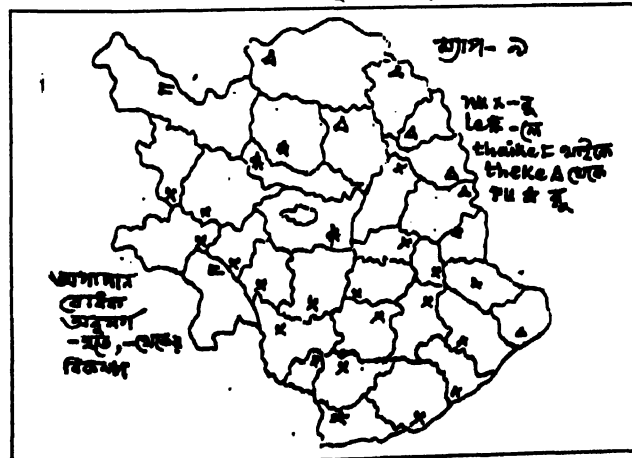
দেখানো হয়েছে। বাকি আছে রূপমূলের প্রদর্শন। কিন্তু ধ্বনিমূলের তুলনায় রূপমূলের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় সবগুলি রূপমূল প্রদর্শন করা একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তাই বেছে বেছে কয়েকটি প্রধান রূপমূল প্রদর্শন করেই আপাতত আলোচনা সমাপ্ত করতে হবে। 'ছেলে' এবং 'আমি' এই রকম শব্দকে রূপমূল বলে গণ্য করা হয়। এগুলিকে বলা যায় মুক্ত রূপমূল। এগুলির নানা রকম পরিবর্তন ঘটানো যায়। বস্তুত, কথ্যভাষার মুক্ত রূপমূলের ভাণ্ডারটি লিখিত ভাষার ভাণ্ডারের চেয়ে অনেক ছোট। তথাপি, প্রতিটি মুক্ত রূপমূলের আঞ্চলিক ভেদ বা বিকল্প প্রদর্শন করাও আপাতত সম্ভব হবে না স্থানাভাবে। তাই মাত্র দুটি শব্দের বা মুক্ত রূপমূলের বিকল্প প্রদর্শন করা গেল। এ দুটি হল 'ছেলে' এবং 'আমি'।

বাংলা ভাষার বদ্ধ রূপমূল বলতে বোঝায়—(১) শব্দবিভক্তি এবং অনুসর্গ পদ (২) ক্রিয়াবিভক্তি, (৩) বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে যোজ্য প্রত্যয় এবং ক্রিয়াপদে যোজ্য প্রত্যয়, (৪) উপসর্গ। ব্যাকরণের বইয়ে এইসব বিষয়ের
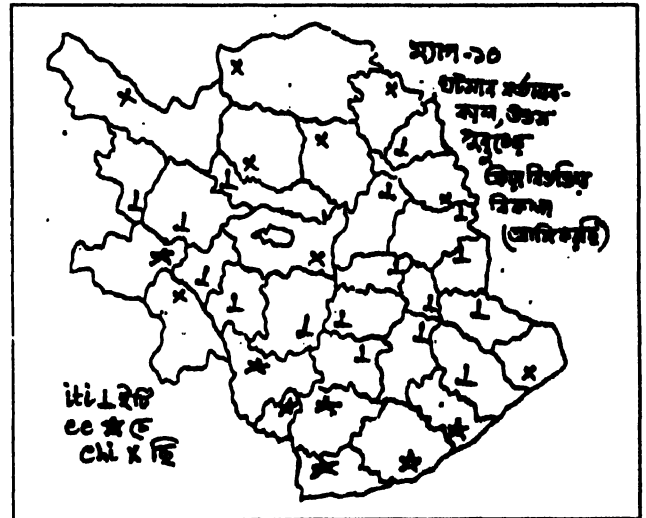
আলোচনা থাকে। কথ্য ভাষার অন্তত পাঁচটি ব্যাকরণ বই লেখার মতো ভাষিক উপাদান মেদিনীপুরের কথ্য ভাষায় পাওয়া যাবে অনায়াসে। এই প্রবন্ধে তার সুযোগ নেই। মাত্র চারটি বদ্ধ রূপমূলকে তাদের আঞ্চলিকরূপে প্রদর্শন করা হচ্ছে ৯, ১০, ১১, ১২ নং ম্যাপে।

৯ নং ম্যাপে প্রদর্শিত হয়েছে অপাদান কারকবোধক 'হতে', 'থেকে' ইত্যাদির চারটি বিকল্প, যথা—'থেকে' = থাইকে লে/নু/রু। চলিত বাংলায় যেখানে 'থেকে' শব্দটি ব্যবহৃত হয় সেখানে মেদিনীপুর জেলার কথ্য ভাষায় এই চারটি বিকল্পের কোনও একটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোথায় কোথায় কোন্ কোনটি ব্যবহৃত হয় ৯ নং ম্যাপে তা স্পষ্ট দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১০ নং ম্যাপে প্রদর্শিত হয়েছে ঘটমান বর্তমান কালের উত্তম পুরুষের ক্রিয়াবিভক্তির দুটি বিকল্প 'ইটি' এবং 'চে', যথা—ছি = ইটি/চে/। চলিত বাংলায় যেখানে
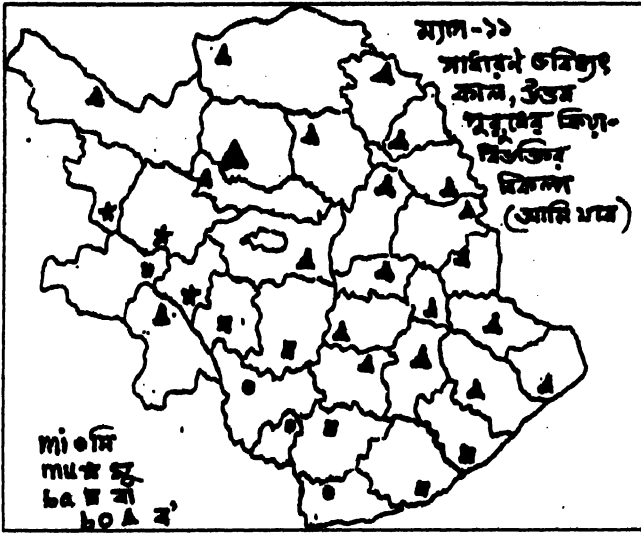
'করছি' ব্যবহৃত হয়, সেখানে এই দুটির কোনটি কোথায় ব্যবহৃত হয় তা ১০ নং ম্যাপে স্পষ্ট দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১১ ও ১২ নং ম্যাপে দেখানো হয়েছে সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের দুটি ক্রিয়া বিভক্তি। ১১ নং ম্যাপে সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের উত্তম পুরুষের ক্রিয়া বিভক্তির তিনটি বিকল্পের কোনটি কোথায় ব্যবহৃত হয় তা দেখানো হয়েছে। বিকল্প তিনটি হল ব' = মি/মু/বা/। চলিত বাংলার 'আমি যাব' বোঝাতেই তিনটি বিকল্প ক্রিয়াবিভক্তির একটি না একটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ১২ নং ম্যাপে সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের প্রথম পুরুষের ক্রিয়াবিভক্তির দুটি বিকল্পের কোনটি কোথায় ব্যবহৃত হয় তা দেখানো হয়েছে। বিকল্প দুটি হল—বে = বেক/ব/। চলিত বাংলার 'সে যাবে' বোঝাতে এই বিকল্প ক্রিয়া বিভক্তি দুটির একটি না একটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চলের কথ্যভাষার নমুনা

যেহেতু দক্ষিণ মেদিনীপুরের কথ্য ভাষারই, মান্য চলিত বাংলার সঙ্গে, পার্থক্য সবচেয়ে বেশি তাই এখানে দক্ষিণ মেদিনীপুরের কথ্য ভাষার কিছু নমুনা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করা হল। গোটা জেলার নমুনা স্থানাভাবে উপস্থিত করা গেল না।

(ক) থানা-রামনগর, গ্রাম-গোবিন্দপুর, জে এল নং-২২। সংবাদদাতা—বিষ্ণুপদ সার।

"রজনী, কিরে কি হৌচি ? আউ কি হব ভাই, চাসবাসর কাজ হৌচি। মুঁ আস্‌সি কেনে কুহত ? কুহ কেনে আসিচ। কালকি তু মতে গটে মজুর দেতো। তুমহর কি হব। আমহর কাল দখন বিলর রুয়া হবা আছরি চারজন মজুর হেইচি, তুও দবু। কি, ঠিক দবু না কুহ। তু জদি না দউ তেবে মোর চার জন মজুর বসি যিব। কাজর কিছি হবনি। হঁ, হঁ, মু দেমি।"

"ছুয়া ও ছুয়া বেল ভারি গলা। তু এতে বেল জা সুইচু। বেল ভারি গলানি নাকি ? হঁ, ঘড়িয়ে বেল হেলানি, তু এতে বেলজা বিছানারু উঠিনি ? হউ উঠুছি। মা, আজ মুঁটিকে বেলামুনু ইস্কুল জিমি। কেনেরে ? আজ মোর দসটার ইস্কুল বসিব। নয়টার আগরু জিঁতি ভাত হয়। এতে বেলা মুনু ভাত রাঁধি হবনি। কাজ অছি। তু আজ দুটিয়া পখল খাই জা। দেখুছু তো কাজ সারি উঠতে অনেক বেল হেই জিব। তু তেল মাখি গা ধেই আয় জা। মুঁ কিছি গটে তরকারি করুচি। মু গা ধেই আসসি। খাইতে দিঅ। চালায়। সেই নুন মালাটা ঘিনি আসি বস। তরকারিটা খুব ভল হেইচি মা। জল কাঁহি। অঁচেই মি। এই যে ঘটিটা বসসি। অঁচেই পড়।"

(খ) থানা—এগরা, গ্রাম—এগরা কসবা। জে এল নং-২৩। সংবাদদাতা—সুনীল পট্টনায়ক।

আমার মেনকার আজি ছুটি অছি। প্রায় মাসেখেনে হেলা আমে মেদিনীপুর আস্‌সে। এত্তেদিন হেলা বেলে বি ঘরর মা মন যায়নি। কিছিদ্দিন ছুটি থিলা। ঘর যিবার কথা বি ভাবথেলে। কিন্তু ভালা লাগলানি। ঘর যাইতে দেরি হেলা কেনে—মা, দাদা এর মেনে খুব ভাব্‌থ্‌লা। আমে আমে আগুনু ঠিক করি রকথলে দোলর কি যিবা। কিন্তু অউ রইতে ইচ্ছা হেলানি। ঘর যিবা বলিকি তেক্‌খুনি বারিই পড়লে। প্রায় অড়িই ঘণ্টার ভিতরে ঘর কোতর পৌঁছি গলা। তেখুন রাত প্রায় বারটা। ঘরকু আইলে। মা-মা বলি ডাকলে। মা তেখুনবি চিন্তায় ঘুমায়নি বেলে● ডাকবাকু উঠি আসিকি দরজা খুলি দেলা। গড় করলে মাকু। মা আনন্দর একদম চোখনুকি জল● বারকিই পকিইল্যা। মার চোখর জল● মুছি দেলে। তারপর বাবা, দাদা এর মেনে আইল্যা। তার মেনকু বি আমে গড় করলে। খুব ভোগ পাইথ্‌ল্যা। মা আনকু পখল, পেঁইজ আউ ঝাল দেলা। আমে আনন্দর খাইকি মুখ ধুইকি মার কোত্‌র শুই পড়লে। ঘুমনি যেখুন উঠি তেখুন দেখি বৌদি চা আনিকি আমার কোত্‌র আইস্‌কি কৌচি—ঠাকুরপো, উঠি পড়, অনেক বেলা হেইচি, লিঅ, চা খিঅ।

(গ) থানা—কাঁথি, গ্রাম—রামচন্দ্রপুর। জে এল নং-৫৫৭। সংবাদ দাতা—সঞ্জয়কৃষ্ণ দাস।
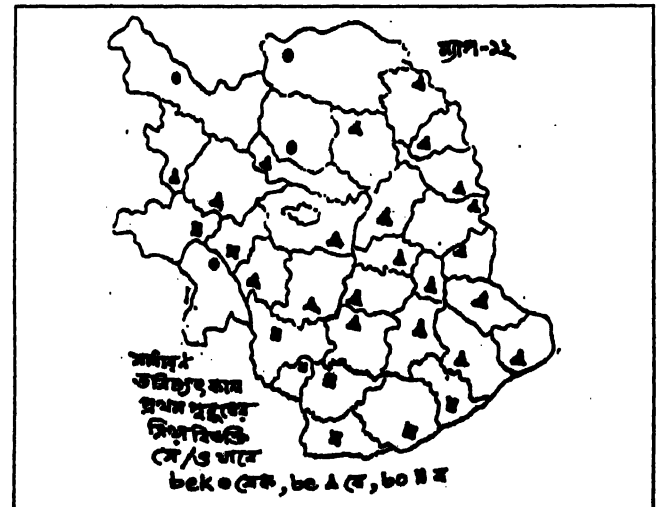
এক বন্ধু অনেকদিন পরে আমর ঘরর আসথিলা। তার সাঙ্গর অনেক কথা কইথিলে। কানু এতেদিন তু কেমা যাইথিলু রে। তোর মোটে দেখা সাকখাত পাওয়া যাইনি যে। তোর ঘরর সব ভাল অছি ? তু একেইদিন কিরকম কাটাইলু, ভালা ত ? —আরে সময় পাইনি। নহনে যেখুন সেখুন ত চালি আসব। তোর উপর কি কোন রাগ করচে মনে করচু নেকি। আচ্ছা, গটেয় যুক্তি করবা আয়। কি যুক্তি করবু কত। আমর শরিরটাত আজ মোটে ভালা নাই। তাই কুনমা জিবানি কউচে। তেবে তু কেমা জিবু কউচু ক। আরে আমে কউচে তোর ঘরর কোতর সমুদ্র অছি। আজ বিকালা. বেড়িইতে জিবা কউচে। তু কি যাইতে পারবু। আরে তু কি মনে করচু জুনপুট এইঠি-নেকি। সে অনেক রাস্তা জাইতে হব। তু যাইতে পারবু কিনা ক ত। তোর কুন অসুবিধা হব নি। তু হলু বড় লোকর পো। তার গোড় আর ভুঁইর পড়ব বেলিকি আমর কাঁই মনে হয়নি। আরে এসব কথা কি কউচু। আর হয়ত আমকু পচরিবুনি কিনা। তেখুন কি হব জানু ? তোর সাঙ্গর অনেক লয়া বন্ধুবান্ধব জুটব। তু আর আমাদিগকু পচরিবু নি। তোর কথা কি আমে কুনদিন ভুলতে পারি ? সে হবনি। যা বাদ দো এখুন তুকি বিকালে● বেড়িইতে জিবু ? হউ, গণে হব আউ কি।

(ঘ) থানা—মোহনপুর, গ্রাম—কেওট খলিসা, জে এল নং-৩২০। সংবাদদাতা—শ্রীকণ্ঠ সাহু।

কিগ রাখাল খত্‌টত্‌ সবু বহি পকিল ? নানা, খত্‌টত্‌ বহিকি আউ কি হব। চাসত এ বছর হবার কথা কাঁই কিন্তা দিশেনি। আজ্জাতি জল্‌টল্‌ হ্যালানি। ভগবান যে তার কি ভাবচি কে জানে। মিনি হংগ মুঁবিত সেই কথা কঁয়া কি যে হব—আমর আউ বঁচলে নি। আউ ইস্তি পর পর যিদি বছর কুবছর চাস মারু হয় তাহেনে কিস্তি কি লোকর চল্‌ব। যা থিলা লোক সবু ত বিকি কিনি কি সেস করি পকিলা। হঁ ভগবানর কথা—মনস সেঠি কি করি পারে ? আমর বিযে কিস্তিকি চলবা। যাহা মুঠে পাইথিলে সবুত লোকর দেই টেই উঠবাকু আউ কাঁই থিলা। কিযে করমি—রাতরাতিকে নিঁদ হয়নি। ৩—দিন লবার লোক ঝনে আউ ন লবার লোকবি সেই। কথার অছি—রখে হরি মারে কে, মারে হরি রখে কে। সেবিচ কথা—তেবে হঁ সেদনে ভানুবাবু কি কউথিলে যে গবরমেন্ট কি যন্ত্র বারকিচি যে পাতাল● নু জল● উঠি কি চাস করা হব। তাহানে যুগটা লউটি যাঁতা। পাতাল● নু জল● উঠিইব আউ চাস করব। কেই বিঘা জমি তাহর চাস হব ? ইগো-না, মেসিনবি সাঙ্গর দব গবরমেন্ট। দেনে, মেসিন ফিট করদেনে জল● উঠবা মুঁকয় লবাকু কইথিনে বেলে খড়রা দেই দেই যাতা—দেনে, যা হউ সবু লোক বসিকি কিছিকিছি চাঁদা-ভেদা উঠিকি বুঢ়া মাহাদেব কত্তর সোত্তান কর্ দেইথিনে বা বুঢ়াকু ডুবিই টুবিই রখথিনে জল্‌টল্ যিদি কিছি হেই যাতা বোধহয়। কি কউ রাখাল ? মুঁ বি এই কথা কইমি কউথিনি।
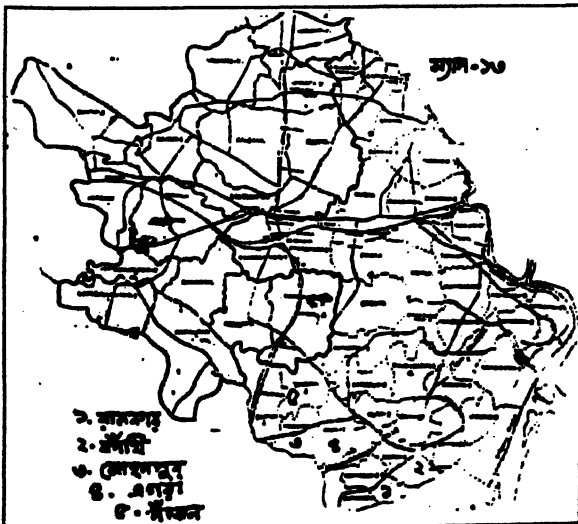
(ঙ) থানা—দাঁতন, গ্রাম—আড়বনা, জে এল নং-১৫১। সংবাদদাতা তপন কুমার প্রধান।

সাত বেউনি ঠাকুরর পূজার বসিছন পুজারি। গাঁর কেত্তে লুক পূজার ডলা লেইকি ঠাকুরর পূজা দিতে আসিচন। কেই মানসিক করিচি গটে ছেলি আবলে কেই বা দুটিয়া, কেই বা সোলআনা, আবলে কাহারবি বিস্তর অসুখ করিচি। সেই দিয়ার ঠাকুরর কোত্তর ধারনা দেইচি। ঠাকুরর নাম ডাক বা তাঁকর দয়ার কথা বিস্তর দূর ছড়িই যাইচি। যদি কিছি হারিই যায় বা কেই যদি বিপদর পড়ে, বা বিস্তর অসুখ করিচি, সেই সময়র যদি সিত্র সেই ঠাকুরকু মানসিক করে তাহানে তাহার ইচ্ছা পূরণ হেই যায়। আউ সেই সাত বেউনি ঠাকুরর পূজা করন পদু মাঝি। সেই দিয়ার তাঁকর নামডাক বিস্তর থিলা। গাঁর ভিতর এঁছু তাঁকর অবস্থা ভালা। ঠাকুরর নামর সিত্র কেত্তেবার কেত্তে লুককু অনেক ডেমরিয়া দেইচন। সেঁহির কেত্তে লুকর উপকার হেইচি। এই ভাবর তাঁকর আয় বেস হেই থায়। আউ বিস্তর সম্মান পাইথান।

কিছু কিছু ম্যাপে দেখা গেছে যে দক্ষিণাঞ্চলীয় কথ্যভাষাটি এই পাঁচটি থানার বাইরেও প্রচলিত আছে। কিন্তু নিঃসন্দেহে দক্ষিণাঞ্চলীয় কথ্য ভাষার মূল ঘাঁটি হচ্ছে এই পাঁচ থানা—রামনগর, কাঁথি, মোহনপুর, এগরা এবং দাঁতন (*১৩ নং ম্যাপ) এই থানাগুলি ওড়িশার বালেশ্বর জেলার সংলগ্ন। কিন্তু এই কথ্যভাষাটির উপর ওড়িয়া ভাষার প্রভাব স্পষ্ট হলেও এটি বাংলারই একটি উপভাষা। এই অঞ্চলের মানুষও মনে করেন যে তাদের মাতৃভাষাটি বাংলাই বটে। সতর্ক পাঠক নমুনাগুলি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে বদ্ধ রূপমূলগুলির কোনও কোনওটিতে ওড়িয়া প্রভাব থাকলেও সেগুলি মান্য বা শিষ্ট ওড়িয়ার জিনিস নয় আর প্রকাশভঙ্গিতে, শব্দসমবায় গঠনে মান্য চলিত বাংলার প্রভাব স্পষ্ট। এ আলোচনার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখক সচেতন। সময় এবং সুযোগ এলে সে অসম্পূর্ণতা দূর করা যাবে।

লেখক : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক
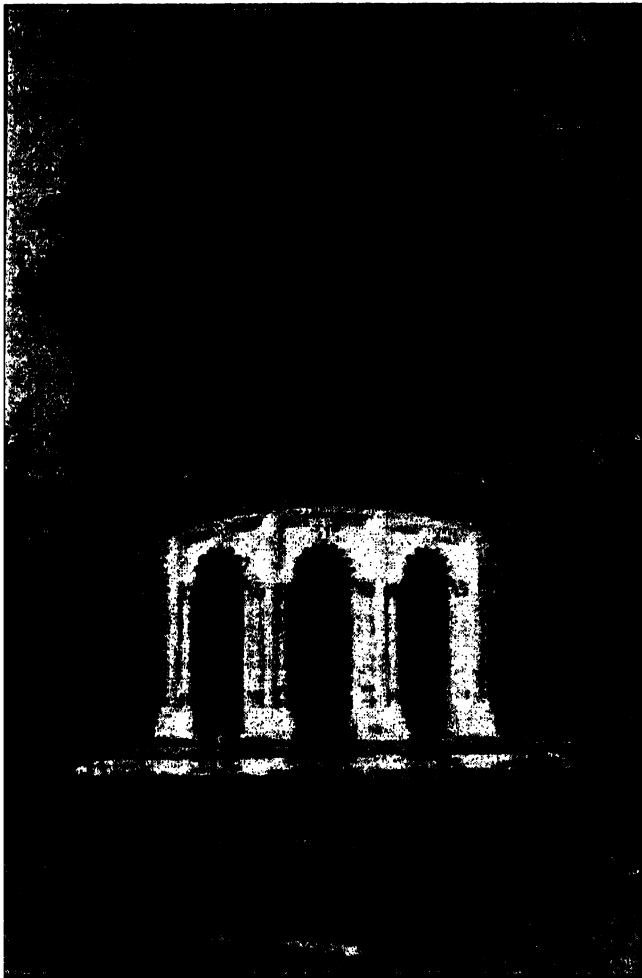
দধিপবনজিউ মন্দির, জোগারডাঙা
ছবি : তারাপদ সাঁতরা

ডাইনটিকরির পীঢ়া দেউল, ডাইনটিকরি
ছবি : তারাপদ সাঁতরা

তমোলুক প

মাসিকপত্র ও সমালো

তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক
বিবরণ।
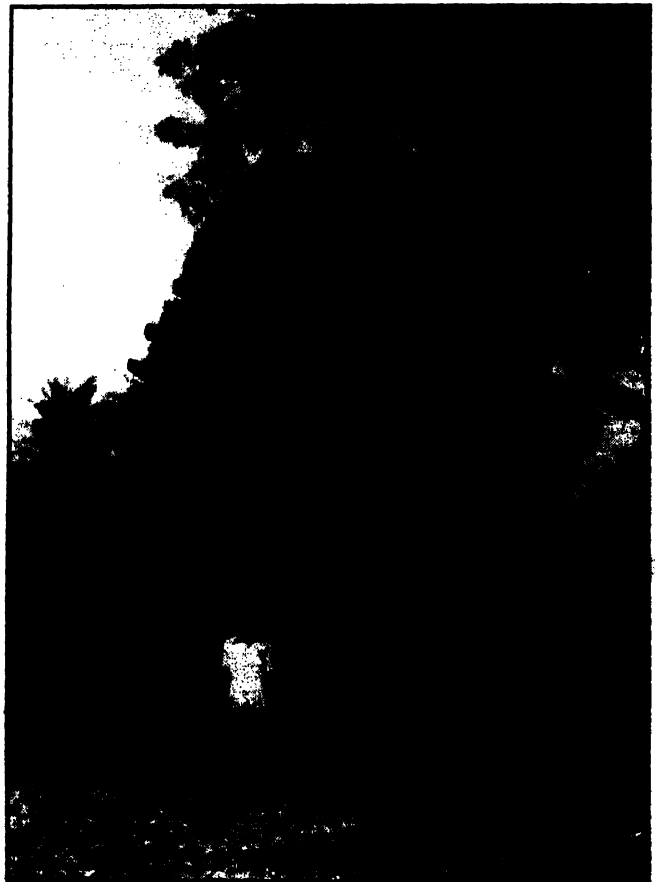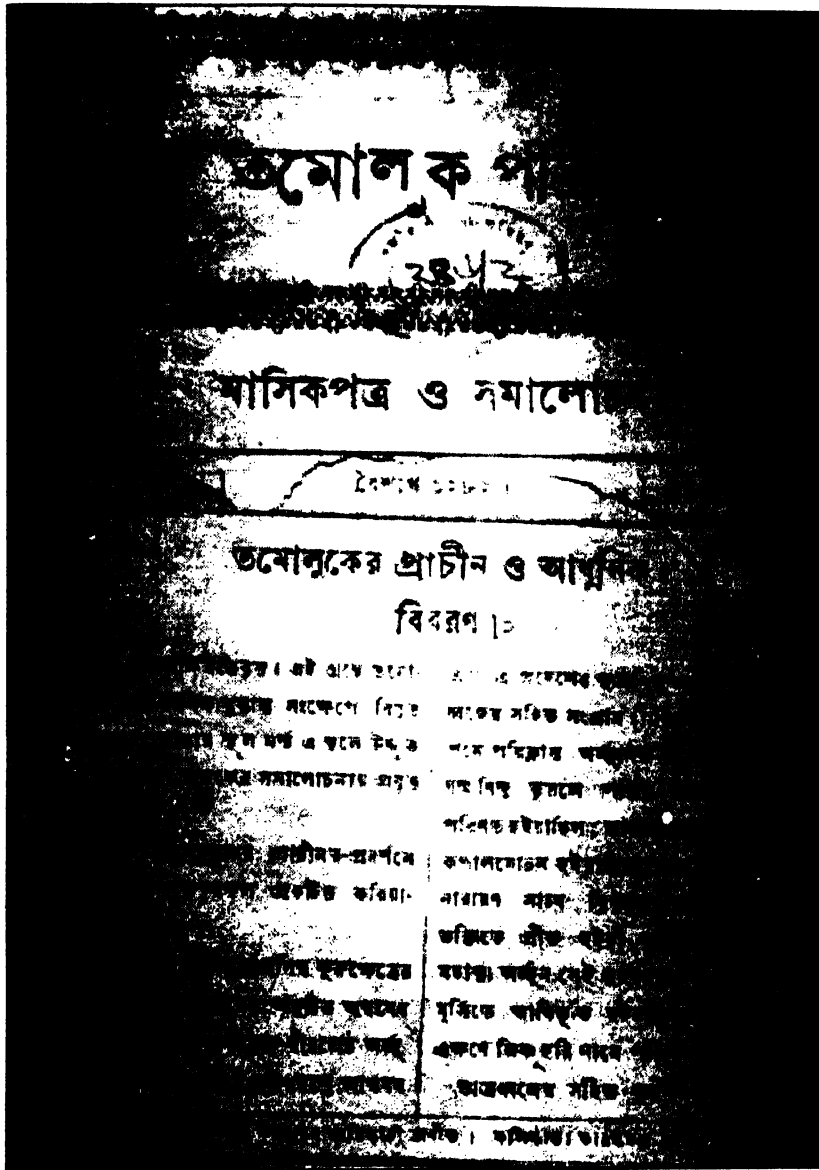
সাহিত্যচর্চায় মেদিনীপুর

আজহারউদ্দীন খান্

প্রকৃত সাহিত্য দেশ-কাল-সীমার দ্বারা আবদ্ধ নয়—রস উপভোগ করার হকদার সবাই। তবু বিশেষ একটা স্থানের ও কালের সাহিত্য আলোচনা করার সার্থকতা এই যে ওই অঞ্চলের কোনও বিশেষ লক্ষণ সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল কিনা, সাহিত্যের পালাবদলের সঙ্গে নিজেদের মনপবনের পাল তোলা হয়েছিল কিনা এবং বর্তমান গতিপথের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা হচ্ছে কিনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ খতিয়ে দেখা যায় এবং প্রতিটি অঞ্চলের সাহিত্যচর্চার ইতিহাস যদি লেখা যায় তাহলে বাংলা সাহিত্যের একটা সামগ্রিক রূপ বেরিয়ে আসতে পারে এবং সেটিই হবে বাংলা ও বাঙালির প্রকৃত মুখশ্রী। জেলার সাহিত্যের রূপরেখা বিবলিওগ্রাফি আকারে 'বীক্ষণী' নামক পুস্তিকায় দিয়েছি ; এখানে তবু সাহিত্যচর্চার স্বরূপ ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে মূলধারাগুলির সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

কাব্যসাহিত্য

জীবিকার ক্ষেত্রে স্রষ্টা প্রথম থেকে শ্রমিক ও কৃষক থাকলেও সমাজের কর্তৃত্বভার তাদের হাতে আসেনি। কাজেই স্বাভাবিক কারণে সাহিত্যের 'পেট্রন' তারা নয়, ছিল রাজতন্ত্র। পাঠক তারা হতে পারে কিন্তু তাদের পড়ার কোনও দাম ছিল না যতক্ষণ না রাজসভায় কবি রাজা কর্তৃক শিরোপা পান। রাজবন্দনা তাই সাহিত্যের একটি অচ্ছেদ্য অংশ ছিল। প্রাচীন ও

মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল রাজসভাশ্রিত আর বাংলা সাহিত্যের জন্ম তো হোসেন শাহের রাজসভায়। খুব বেশিদিনের কথা নয়—মাত্র চতুর্দশ শতকের ঘটনা এটি। আজ জমিদারি চলে গেছে কিন্তু একদিন এ জেলায় রাজা-জমিদারদের অভাব ছিল না। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার সাহিত্য রাজা-জমিদারদের দ্বারাই পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তর সৃষ্টি করে—তাঁকে এবং তাঁর প্রেমধর্মকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তার তরঙ্গ মেদিনীপুর জেলার কবি-কণ্ঠকে মুখর করে তুলেছিল। পদাবলী কর্তাদের মধ্যে শ্যামানন্দ, রসিকানন্দ, গোপীজনবল্লভ দাস, গোবর্ধন দাস, কানুরাম দাস, শ্যামদাসের নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। শ্যামানন্দ মেদিনীপুর জেলার খণ্ডেশ্বর গ্রামে সদগোপ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতার নাম দুরিকা। শ্যামানন্দের কয়েকটি ভাইবোনের অকাল মৃত্যু হওয়ায় শ্যামানন্দকে 'দুখিয়া' বলে ডাকা হত। বৈষ্ণব সমাজে তিনি 'শ্যামানন্দ' 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' নামে পরিচিত। বৈষ্ণব সমাজে একসময়ে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাচার্য যে সম্মানে পূজিত হতেন সেই সম্মান পরবর্তী কালে শ্যামানন্দও পেয়েছিলেন। "প্রেমবিলাস" গ্রন্থে রয়েছে—

নিত্যানন্দ ছিলা যেই নরোত্তম হৈলা সেই
শ্রীচৈতন্য হৈলা শ্রীনিবাস।
শ্রীঅদ্বৈত যাঁরে কয় শ্যামানন্দ তিহোঁ হয়
ঐছে হৈলা তিনের প্রকাশ।

শ্যামানন্দ ওড়িশায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন—নরহরি চক্রবর্তীর "ভক্তি রত্নাকর" গ্রন্থে শ্যামানন্দের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। শ্যামানন্দের এ পর্যন্ত তিনটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়—"অদ্বৈত তত্ত্ব", "উপাসনা সার সংগ্রহ", "বৃন্দাবন পরিক্রমা"। এছাড়া বৈষ্ণবদাসের "পদকল্পতরু"তে শ্যামানন্দের কয়েকটি পদাবলী রয়েছে। ১৬৩০ খ্রিঃ তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর শিষ্য রসিকানন্দ শ্যামানন্দী সম্প্রদায়ের নেতা হন। তিনি তাঁর গুরুর স্মরণে গোবিন্দপুরে এক মহোৎসবের আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে অনেক বৈষ্ণব মহাজন গোবিন্দপুরে উপস্থিত হয়েছিলেন। "শ্যামানন্দ প্রকাশ" ও "অভিরামলীলা" গ্রন্থে শ্যামানন্দ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

রসিকানন্দ ১৫৯০ খ্রিঃ মেদিনীপুর জেলার রোহিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর "শাখাবর্ণন" "রতিবিলাস" নামে দুটি গ্রন্থ আছে এবং "পদকল্পতরু"তে তাঁর রচিত কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। রসিকানন্দের বংশধররা বর্তমানে গোপীবল্লভপুর অঞ্চলে বসবাস করছেন, তাঁরা 'গোপীবল্লভপুরের গোস্বামী' নামে পরিচিত। গোপীবল্লভপুর ওড়িশার সীমান্তবর্তী হওয়ায় ওই সময় গোপীবল্লভপুর প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং লোকাচার ইত্যাদির ওপর ওড়িয়া সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে। এই প্রভাব শুধু গোপীবল্লভপুর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, মেদিনীপুর জেলার যে যে অংশ ওড়িশার সীমান্তবর্তী যেমন দীঘা, কাঁথি, মোহনপুর, এগরা, দাঁতন, বেলদা, নারায়ণগড় এইসব অঞ্চলে ওড়িশার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলে কথাবার্তায় যেমন তেমনি পুঁথিপত্রে ওড়িয়া শব্দ ও বাক্যের আধিক্য দেখা যায়। বিষ্ণুপদ পণ্ডা এই জাতীয় প্রচুর পুঁথি আবিষ্কার করেছেন এবং মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যে ওড়িশা কবিকুলের অবদান সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। গোপীজনবল্লভ দাস নারায়ণগড় থানার ধারেন্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গ্রন্থ "রসিকমঙ্গল" প্রধানত তাঁর গুরু রসিকানন্দের চরিত্র বন্দনা। চৈতন্যদেবের জীবনকে অবলম্বন করে চরিত সাহিত্যের সূত্রপাত। প্রাক-চৈতন্যের যুগে পৌরাণিক চরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা বাংলা সাহিত্যের বিষয় ছিল, কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করে দেখালেন যে মানুষও সাহিত্যের বিষয় হতে পারে। চরিত সাহিত্য রচনায় "রসিকমঙ্গল" একটি বিশিষ্ট সংযোজন। বৈষ্ণব সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন বাসুদেব ঘোষ এই জেলার লোক ছিলেন না কিন্তু তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় এই জেলার তমলুকে অতিবাহিত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন, তমলুকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহ তৈরি করে পূজার্চনা আরম্ভ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ এখনও আছে।

শ্যামানন্দের শিষ্য শ্যামদাস কেদারকুণ্ড পরগনার হরিহরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রধান গ্রন্থ "গোবিন্দমঙ্গল" ও "একাদশীব্রত"। "গোবিন্দমঙ্গল"-এ শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রলীলার কথা তিনি গানের মতো গেয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন। তৎকালীন অনেক জমিদার তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিষ্করভূমি দান করেছেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে ভক্তকবি—শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তনই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা মিলন-বিরহ বর্ণনা এই যুগের কবিদের প্রধান ও একমাত্র উপজীব্য ছিল কারণ তাঁরা সাহিত্য-সাধনা করবেন বলে পদাবলী রচনা করেননি, ধর্মের খাতিরে পদাবলী রচনা করেছেন—অধিকাংশ পদকর্তাই বৈষ্ণবধর্মের প্রচারক ছিলেন। তাই সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন ব্যথা-বেদনা তাঁদের কবিতার ওপর বড় একটা ছায়াপাত করেনি কারণ একে উপজীব্য করলে মোক্ষলাভের আশা বিন্দুমাত্র থাকবে না। এজন্যে দেখি সেকালে জমিদারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহ, শাসকের বিরুদ্ধে শোষিতের অভ্যুত্থান বিচ্ছিন্ন আকারে ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও আমাদের কবিরা নিশ্চুপ ছিলেন। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রামেশ্বর ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী) "শিবায়নে" সাধারণ মানুষের দুঃখ-ব্যথা-বেদনাকে রূপ দিয়েছেন, হর-পার্বতীকে আমাদের লোকালয়ের মধ্যে এনেছেন, শিবকে দিয়ে জমিতে লাঙল পর্যন্ত চবিয়েছেন, আমাদের সংসারে আপনজনরূপে চিত্রিত করে যে অপূর্ব

মানবিক গৌরব দান করেছেন তা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পরম বিস্ময়। রামেশ্বরের সঙ্গে উপরোক্ত কবিদের মানসধর্মের পার্থক্য ছিল—তাঁরা চেয়েছেন বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ও প্রচার আর রামেশ্বর চেয়েছেন পথচলতি মানুষের কল্যাণ, তারা যেন মোটা ভাত ও মোটা কাপড় পায়। পরকালের চর্চার চাইতে ইহকালের সাধনাকেই তিনি স্থান দিয়েছেন সর্বাগ্রে। আমাদের বাংলায় উনিশ শতকে যে জাগরণ এসেছিল যার মূলমন্ত্র ছিল 'Man is the measure of all things', সেই জাগরণের আগমনী আমরা রামেশ্বরের কণ্ঠে শুনেছিলাম। তাই মানবধর্মী সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি আমাদের প্রণম্য। রামেশ্বরের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে পরবর্তী কালে গবেষণা করেছেন এই জেলারই পঞ্চানন চক্রবর্তী, তাঁর সম্পাদনায় "রামেশ্বর রচনা সংগ্রহ" বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ইতিপূর্বে ঈশানচন্দ্র বসু "শিবায়ন" সম্পাদনা করেছিলেন। রামেশ্বরের জন্ম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের বরদা পরগনার যদুপুর গ্রামে। বরদা পরগনার জমিদার হেমৎ সিংহের অত্যাচারে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের আশ্রয়ে ও উৎসাহে তিনি "শিবায়ন" রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে আর দুজনের নাম উল্লেখ করা অবশ্য কর্তব্য। ষোড়শ শতকের "চণ্ডীমঙ্গল" রচয়িতা কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর জন্ম এ জেলায় নয়, বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে। ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে ভিটেমাটি ত্যাগ করে মেদিনীপুরে চলে আসেন। এই জেলার আড়রা গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায় তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁর মতো মহাভারত রচয়িতা কাশীরাম দাসও এই জেলার লোক নন—তাঁর জন্ম বর্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রামে কিন্তু তিনি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আবাসগড়ের রাজার আশ্রয়ে থেকে পাঠশালায় শিক্ষকতা করতেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত একশ্রেণীর ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য রচিত হয়েছিল যা বাংলা সাহিত্যে "মঙ্গলকাব্য" নামে পরিচিত। "মঙ্গলকাব্য" প্রধানত তিন শ্রেণীর—বৈষ্ণব, পৌরাণিক ও লৌকিক। বৈষ্ণব মঙ্গল বলতে বোঝায় রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্য বিষয়ক আখ্যান কাব্য। গোপীজনবল্লভ দাসের "রসিকমঙ্গল" শ্যামদাসের "গোবিন্দমঙ্গল" এই শ্রেণীর কাব্য। পৌরাণিক মঙ্গল অর্থাৎ "চণ্ডীমঙ্গল"। মেদিনীপুরে চণ্ডীর কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত আছে কিন্তু গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। লৌকিক দেবতা বলতে শিব, সারদা, শীতলা, সত্যনারায়ণ ইত্যাদিকে বোঝায়। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের "শিবায়ন", "সত্যনারায়ণ কথা" নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর "শীতলামঙ্গল" দয়ারাম দাসের "সারদামঙ্গল" প্রভৃতি তার উদাহরণ। এছাড়া কিছু শাক্তপদাবলী ইতঃস্তত বিচ্ছিন্নভাবে রচিত হয়েছে, রাজাদের শাক্তপদাবলী।
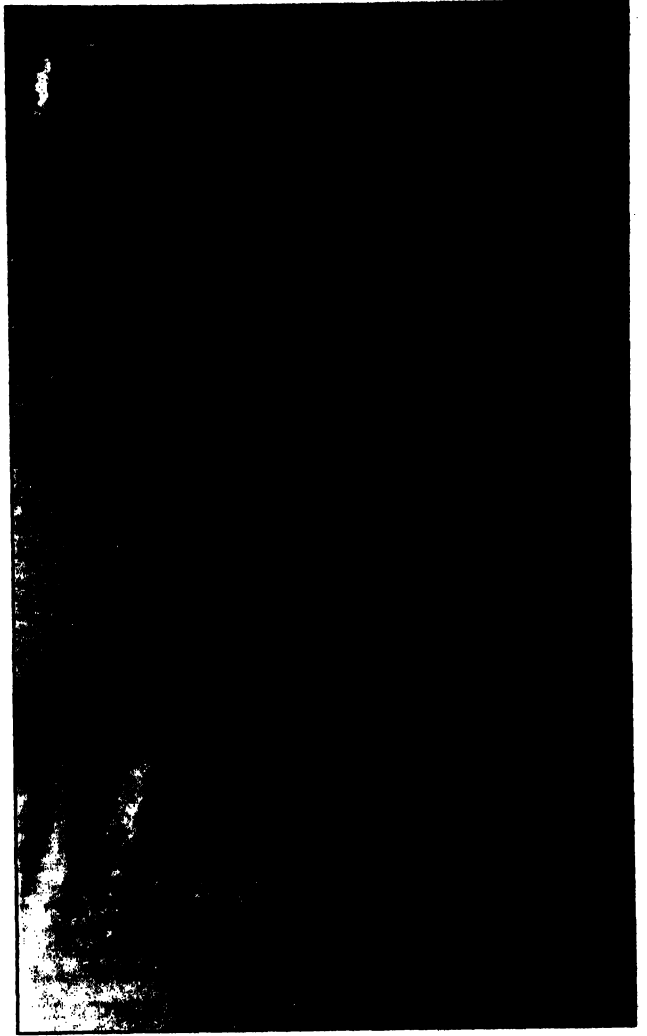
মাইকেল মধুসূদন কিছুকাল তমলুকে কাটিয়েছিলেন

এরপর যেসব কবি এলেন তাঁরা বাংলাদেশের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ফেললেন। বাংলাদেশ তখন সম্পূর্ণ ইংরেজের পদানত হয়েছে। ইংরেজ ও ইংরেজি শিক্ষার নব আলোকে দিকে দিকে যে রোমাঞ্চ জেগেছিল, ইয়ংবেঙ্গলের প্রভাবে বাংলা কবিতার জন্মান্তর সূচিত হয়েছিল যার হোতা ছিলেন মধুসূদন, যাঁকে কেন্দ্র করে বাংলা কবিতা পক্ষবিস্তার করেছিল। সেই রোমাঞ্চ কলকাতা অতিক্রম করে সুদুর মফঃস্বলে এসে পৌঁছয়নি অথচ মেদিনীপুর থেকে কলকাতা যাবার পথ খুলে দিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সেই পথ বেয়ে নতুন সভ্যতার আলো আমাদের জেলার কবিদের চোখ টানেনি। কিছু কিছু মাইকেলের অক্ষম অনুকরণ হয়েছে যেমন হেম-নবীন করেছিলেন। তাঁদের অনুকরণেই বামাচরণ দাস (কর্ণবধ কাব্য), রাধাগোবিন্দ পাল (কুরুকলঙ্ক কাব্য, সমুদ্রমন্থন কাব্য), শেখ ওসমান আলী (লালচাঁদ, দেবলা) উমেশচন্দ্র মহাপাত্র (সংযুক্তা) প্রমুখ কণ্ঠ সেধেছেন কিন্তু কাব্যের spirit অর্থাৎ

যুগের প্রাণধর্ম তাঁদের মনোলোকে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। আমাদের জেলায় তখনও পুরোদমে চলেছে গতযুগের ঢঙে পদ্যরচনার একাধিপত্য। কবি-লড়াই, গদাভারত, কীর্তন, শ্যামাসংগীত, আগমনী গান ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে রচিত হয়েছে। এসময় প্রধান কয়েকজন লোককবি হচ্ছেন নবীন বাউল, হরিবোল দাস, রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণাময়ী দেবী, তারিণী দেবী—এ ধারা বজায় রেখেছেন রাজা মহেন্দ্রলাল খান, নিবারণচন্দ্র পাল, সু-মো-দে, অপর্ণা দেবী প্রমুখ। যদিও মধুসূদন কিছুকাল তমলুক অঞ্চলে ছিলেন। তখন মধু-প্রতিভা নির্বাপিত প্রায়, তবু এই সমিধ থেকে কিয়ৎ পরিমাণে উদ্বুদ্ধ হবার চেষ্টাও তাঁরা করেননি।

মধুসূদনের পর বাংলা কবিতায় যাঁর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল তিনি রবীন্দ্রনাথ, অথচ দুঃখের বিষয় এই জেলার সাহিত্যিকদের চৈতন্যে তিনি বিচিত্র ও অপরূপভাবে প্রতিভাত হতে পারেননি। তাঁকে কেন্দ্র করে একদা যে রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজের উদ্ভব হয়েছিল এই শতকের গোড়ার দিকে, তাকেই সামনে রেখে এই জেলার কবিরা তাঁদের সাধনা শুরু করেছিলেন। তাই আমরা দেখি কল্লোল-কালিকলম-সবুজপত্র-পরিচয় গোষ্ঠীর আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের নতুন নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করছে তখনও এই জেলার কবিরা ওই রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজকেই আদর্শ করে রেখেছেন। বিমলাশঙ্কর দাস, বিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, সত্যেন্দ্রনাথ জানা, জগদানন্দ বাজপেয়ী, দুর্গাপ্রসাদ সাহু, দিবাকর ঘোষ প্রভৃতির রচনা তার নিদর্শন। তাঁদের কবিতায় আধুনিক জীবন-যন্ত্রণার কিছু স্পর্শ ছিল যেমন বিমলাশঙ্কর দাস, দিবাকর ঘোষের রচনায় কিন্তু উচ্ছ্বাস ও আবেগ বেশি ছিল, মিলযুক্ত পয়ারের বাইরে পদচারণা করতে ভরসা পাননি। তবে বিমলাশঙ্কর দাস জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যানুবাদে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার হয়েছে, গান্ধীজি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয় ঘটেছে, শ্রমিকশ্রেণীর হাতে জারতন্ত্রের অবসান ঘটেছে, নতুন সমাজবাদের জন্ম হয়েছে, ইংরেজ শাসন কঠোরতর হয়েছে, জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে, রাউলাট আইন জারি হয়েছে ইত্যাদি ঘটনাসমূহ বাংলা কবিতাকে নবজন্মদানের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে—যার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছিল কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে। স্বাধীনতার আন্দোলন মেদিনীপুরে দুর্বার হয়ে উঠেছে—আইন অমান্য আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, লবণ আন্দোলন, খাজনা বন্ধ আন্দোলন যাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল সেই দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল তিনি নিজেও একজন লেখক ছিলেন—"স্রোতের তৃণ" নামে আত্মচরিত লিখেছিলেন। কিন্তু সবাইকে দিয়ে তো সব কাজ হয় না। রচনাকর্মে যে স্থিতধী থাকা দরকার তা দেশপ্রাণের ছিল না, কিন্তু সে সময় তো আরও অনেক লেখক ছিলেন তাঁরাও তো স্বাধীনতার সাহিত্য রচনা করতে পারেননি। তাঁদের চোখের সামনে পর পর তিনজন ইংরেজ জেলাশাসককে হত্যা করা হয়েছে, বছরের পর বছর কারফিউ জারি হয়েছে, যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, বিয়াল্লিশের আন্দোলনে কাঁথি তমলুক উত্তাল হয়ে উঠেছে, তবু উদ্দীপনামূলক কোনও কবিতা রচিত হল না যা সাহিত্যের সামগ্রী হতে পারে অর্থাৎ সমগ্র বাংলাদেশের প্রাণের গান হতে পারে। নজরুল ইসলামের অনুকরণে কিছু অক্ষম কবিতা রচিত হয়েছিল যেমন হরিসাধন পাইন, বিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ', যতীন্দ্রনাথ আঢ্য প্রভৃতি কিন্তু সেগুলি দেশের জনমানসে বাসা বাঁধতে পারেনি। কিন্তু সামাজিক ঔদাসিন্য, বর্ণাশ্রমিক জাতিভেদমূলক অত্যাচার, কিছু কিছু ঘটনা যা গান্ধীজির হরিজন আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে অবিচার বলে মনে হয়েছিল তাঁরা তাৎক্ষণিক মুহূর্তকে ততোধিক তাৎক্ষণিক তুলিকায় রূপায়ণ করেছেন। কিন্তু সময়ের উজান বয়ে ওই সব রচনার ওপর চেক কাটলে আজকের কাব্য-ব্যাংকে ক্যাশ করা যায় না। তাই এই পর্বে যা বিস্তৃতি রামেশ্বরের পর থেকে বিশ শতকের পঞ্চাশ দশকের পূর্ব পর্যন্ত—নাম দেওয়া যেতে পারে 'আধুনিক পূর্ব যুগ', প্রাপ্তিযোগ হিসাবে এক কথায় বলা যেতে পারে নীটফল শূন্য। তাহলেও এখনও এই ধারায় কিছু কিছু কবি কবিতা লিখছেন, মাঝে মাঝে চমকে দেবার মতো দু-একটা পঙক্তিও থাকে। সুধীর বেরা (অভিজ্ঞান লগ্ন) গোষ্ঠবিহারী কুইলা, (দেবধূপ) জগদানন্দ বাজপেয়ী (মণিকাঞ্চন) হাফিজুর রহমান (অন্বেষা, নকীব, মাটি-মানুষ-বাঙালি) প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

কল্লোল-কালিকলমে যে আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল সেই সূচনা আমাদের জেলায় পাওয়া গিয়েছিল পঞ্চাশের দশকে—অমর ষড়ংগী (কবিতা সংগ্রহ), প্রভাকর মাঝি (আকাশের নীল চোখ, কবিতা না কবিতা, মৃত্যুকে জিজ্ঞাসা), শম্ভু চট্টোপাধ্যায় (দুর তরঙ্গ, রঙীন মাছের ঘর, শ্রেষ্ঠ কবিতা), ফণিভূষণ আচার্য (ধূলিমুঠি সোনা, আমরা ভাসানে যাচ্ছি, ধর্মদা আর কতদূর), মৃত্যুঞ্জয় মাইতি (আবাদ, গ্রাম নদী বন, দূরের বন্ধু), শিশিরকুমার দাশ (জন্মলগ্ন), চিত্তরঞ্জন মাইতি (রোদ বৃষ্টি ভালবাসা) প্রমুখের কবিতায়। মাঝখানে বাংলা কবিতার মর্মবাণীর সঙ্গে এখানকার কবিতায় যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণ করেছেন ওপরের কবিরা, মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তাঁরা। এঁদের মধ্যে অনেকেই কবিতার ক্ষেত্র থেকে সরে অন্যদিকে মনোনিবেশ করেছেন কিন্তু তাঁদের গঠিত কাব্য ঐতিহ্যকে সচল রেখেছেন ষাটের এবং পরবর্তী দশকের কবিরা। একটি অসন্তোষজনক অতৃপ্তিকর তালিকা দিচ্ছি যেমন বিনোদ বেরা (মীরা মৌমাছি ও অন্যান্য), বীতশোক ভট্টাচার্য (শিল্প, অন্যযুগের সখা, নতুন কবিতা, এসেছি জলের কাছে) বিপ্লব

মাজী (সূর্যমুখীর অরণ্যে, বিষুব দিগন্ত, উষ্ণ মণ্ডলের রাত ও সমুদ্র, ভালবাসা কলম্বাসের জাহাজ, অশ্রুর স্থাপত্য, স্মৃতির গ্যালারি, বাবার চোখে সূর্যাস্ত), প্রভাত মিশ্র (হাওয়া রাতের কথা, পোকামাকড়ের দেশে, সাজানো সকাল, জলজননী, ভোরে একদিন) ভবতোষ শতপথী (অরণ্যের কাব্য), মিলনেন্দু জানা (প্রতিবাদী মুখ, বাংলা আমার দুঃখ আমার, অন্য মাটি অন্য চোখ, রবীন্দ্রনাথ লেনিন), শিশির চক্রবর্তী (টেক্কা বিবি নহলা গোলাম, সোহাগ.শীতলপাটি) প্রণব মাইতি (স্বয়ং স্থপতি, অসহ্য অধুনা, ফুটপাথে পোর্ট্রেট, সময়ের সীমানায় দাঁড়িয়ে, যৌবন কেন যায়, সৈকতে শেষ শিল্প) শম্ভু রক্ষিত (প্রিয় ধ্বনির জন্য কান্না, সঙ্গহীন যাত্রা, স্ববাহন নিষাদ) সুধাংশু বাগ (ঈশ্বরী আয় রৌদ্রছায়ায়, অরণ্যের আজন্ম অসুখ), চিত্ত সাহু (কবিতা স্টেডিয়াম) শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য (নদীপারে), কালীপদ কোঙার (ভিড়ের মধ্যে একা, না আমি কোথাও যাব না), অমিতাভ দাস (সুধা তোমাকে, নীচু মেঘ), অমিতেশ মাইতি (মায়াশিকলের গান), প্রভাতকুমার দাস (বিষণ্ণ প্রবাস এবং হিরণ্ময় অনুভব) দীপক কর (লাঞ্ছিত প্রত্যয়, বাতাসে শীতের অর্গান), উদয় চট্টোপাধ্যায় (সব ফুলই সূর্যমুখী, আমার ছায়ারা), হরপ্রসাদ সাহু (আঁধি ও আনন, পরিযায়ী কথা), সন্তোষকুমার মাজী (প্রকৃতি ও পরমা, অবিনশ্বর জাতক, বুকের মধ্যে বাগানবাড়ি, সময়ের পদাবলী, অনন্ত জলের টানে, ঘুম এসে দু-চোখে জড়ায়, স্মৃতিস্বপ্নমালা), রামেশ্বর পাণিগ্রাহী (সঙ্গ প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ, ভ্রমণে একদা কোজাগরী), সূর্য নন্দী (এবং সংহতি, জন্মশিকড়), বিরূপাক্ষ পাণ্ডা (একদিন নয় প্রতিদিন), মানসকুমার চিনি (স্রোতের ছায়া, নতজানু চিররাত্রি), অচিন্ত্য নন্দী (কালজানি নদী জানে) অজিত মিশ্র (বিষণ্ণ বাউল, গুচ্ছ নিমফুল, এসো শব্দ), রাসবিহারী দত্ত (যুদ্ধে আছে কবি), নিশীথ ষড়ংগী (আগুনের পাখি, রুমাল খাতা ও বকুলগন্ধ, মনে রাখা নিচু মেঘ), অশোক মহান্তী (আবহ সকাল, ধৃতরাষ্ট্রের মা) আবদুস শুকুর খান (জীবনের অসমাপ্ত কবিতা, নবজন্মে ফিরি মৃত্যুর বিষাদে, উপেক্ষায় ফেরালে মুখ, আত্মার পাখি, নৈঃশব্দের স্বর), অনুরাধা মহাপাত্র (ছাইফুল স্তূপ, অধিবাস মণিকর্ণিকা, জনান্তিকে অঙ্গবন্দনা), সোফিওর রহমান (মুহূর্তের মানচিত্র, রক্তাক্ত ঘরানার কবিতা), এস মহীউদ্দীন (নিজস্ব ভাবনার দিনরাত্রি এবং অন্তরা) খগেশ্বর দাস (নিজস্ব পালক), সুকুমার রঞ্জন ঘোষ (মেঘময়ূরের আপন দেশে), পরেশ সেন (আরোহণ), জহরলাল বেরা (এই মেঘ ও জ্যোৎস্না, আঁশ ও আদ্রভূমি), রামরঞ্জন রায় (অধরা গাছের গন্ধ), দেবাশিস প্রধান (মধ্যদিনের খরদাহ, শুভেচ্ছায় আছো নীল পাতা) কামরুজ্জামান (আজ যদি আমায় কারও হৃদয়ে আঘাত করতে বলো), দীপঙ্কর দাস (বাস রাস্তার ধারে), তাপস মাইতি (বন্দীত্বে আমি এবং অন্যান্য), ঋত্বিক ত্রিপাঠি (জ্যোতিবাবু ও তুমি), তমালিকা পণ্ডা শেঠ (একটি কোরকের মুক্তি) আনজু বানু (বরফের পুতুল), বিষ্ণু সামন্ত (কোনও পাপ নেই, শব্দ ভুলে যাই, দুঃখ যখন
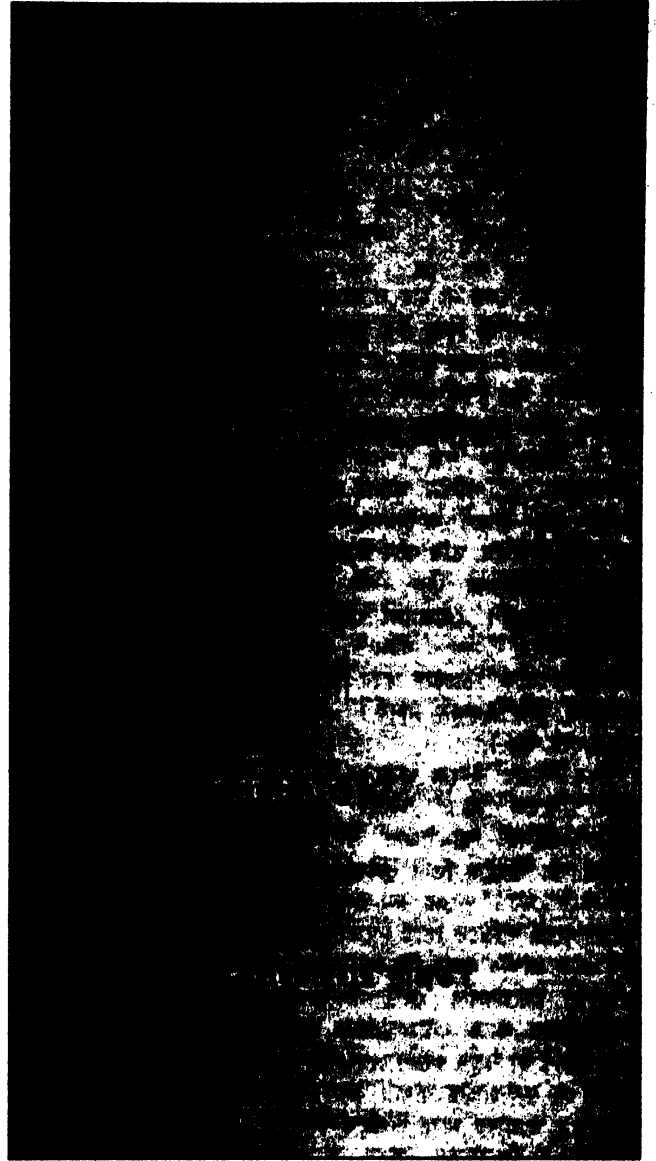
বালক বালিকাদের জন্য রচিত 'বোধোদয়'

অনিবার্য, সাপ ভদ্র ব্যবহার চায়, পোড়ামাটির আংটি, কবিতার নাম ভালবাসা), শিখা সামন্ত (সময় সংলাপ, কালি ঝরে যায়।) শ্যামলকান্তি দাশ (কাগজকুচি, লাল রঙের স্বর্গ, ছোট শহরের হাওয়া), রতনতনু ঘাঁটি (জরিপনামা), শ্যামল রক্ষিত (এই দেশ এই জেলখানা, আমরা প্রসঙ্গ বদলাতে চাই), তুষারকান্তি দাস (হে লাবণ্য ফিরে যাও), দুরন্ত বিজলী (নত আছি অনুগত, সজনে কুঁড়ি), মনোরঞ্জন খাঁড়া (বালক ও নেবুফুলের গন্ধ, অর্ণব কুমার পণ্ডা (প্রস্তর যুগের স্মৃতি), নীলাঞ্জন কুমার (ভাতকাপড়ের কবিতা), রোশেনারা মিশ্র (আমার কবিতা), স্বপন মল্লিক (সার্কাসের বাঘ), তপনকুমার মাইতি (প্রেম নিভিয়ে দাও প্রিয়, নষ্ট হৃদয়ের নক্ষত্রমালা), নরেশ দাস (স্বাধীনতা কতদূর, অলিন্দ বাগান), সন্ধ্যা ভৌমিক (শিশিরে করেছি স্নান), আর্জুমান্দ লায়লা (গোধূলী বেলায়),

প্রফুল্ল পাল (মানুষের ভিতর মানুষ) এবং এমনি আরও কত কবি যাঁরা কবিতার রূপ ও শরীর নির্মাণে ফর্ম ও কনটেন্টের সন্ধানে সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছেন—দু-হাতে লুটে নিচ্ছেন কাব্যের যা কিছু আনন্দের উপাচার, মন ভরিয়ে দিচ্ছেন এই সুবাসে যে তাঁরা ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে তাবত বঙ্গভাষীর প্রিয় কবি হয়ে যাচ্ছেন।

গদ্য সাহিত্য

প্রমথ চৌধুরীকে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, বাংলা গদ্য যাঁরা সৃষ্টি করেছেন তাঁরা সকলেই যে দেশের লোক সে ভূভাগ আধা-ওড়িশা অর্থাৎ মেদিনীপুর। বাংলা গদ্যের পরিপুষ্টি সাধনে খ্রিস্টান মিশনারীদের সঙ্গে এদেশের যাঁরা সহযোগী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মেদিনীপুরের সন্তান মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯) অন্যতম। ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দে বিদেশি সাহেবদের এ দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেই কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। বিদেশি সাহেবরা যাতে বাংলা ভাষা আয়ত্তে আনতে পারেন সেদিকে দৃষ্টি রেখেই তিনি 'প্রবোধচন্দ্রিকা' 'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ', 'রাজাবলি' 'বেদান্তচন্দ্রিকা' গ্রন্থ রচনা করেন। রামমোহন পণ্ডিতি ও চলতি বাংলা গদ্যে একটা ঋজুতা ও দার্ঢ্য এনেছিলেন আর বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৯৯১) তাকেই শিল্পরূপ দিয়েছিলেন যার নাম 'বিদ্যাসাগরী স্টাইল'। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির (১৮৫৯-১৯৫৬) মতে বিদ্যাসাগরের শিশুপাঠ্য গদ্য এই অঞ্চলের ভাটার অবিকৃতরূপ কিন্তু গদ্যসাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর রচনার মধ্যেই বাংলা গদ্যের একটি সুষ্ঠু সমন্বয়ী শিল্পরূপ পেয়েছিলাম কিন্তু তাতে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকীর্তি ম্লান হয়নি। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে বলেছেন, "যে

গদ্য ভাষারীতির তিনি প্রবর্তন করেছেন তার ছাদটি বাংলা ভাষার সাহিত্য রচনা-কার্যের ভূমিকা নির্মাণ করে দিয়েছে।... সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলা ভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত, তাকে নানা নব নব পরিণতির অন্তরাল অতিক্রম করে সম্মানের অর্ঘ্য নিবেদন করা বাঙালির নিত্যকৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়।" বিদ্যাসাগরের প্রথম জীবনচরিতকার মেদিনীপুরের সন্তান তাঁরই ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন। ১৮৯১ খ্রিঃ সেপ্টেম্বরে তার "বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত" প্রকাশিত হয়। পরে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত "বিদ্যাসাগর" গ্রন্থের ভুলত্রুটি সংশোধনার্থে "ভ্রম নিরাশ" নামে পুস্তিকা বেরোয়। তারপর বিদ্যাসাগরের বহু জীবনী বেরিয়েছে। মেদিনীপুরের লেখকরাও লিখেছেন যেমন জ্ঞানেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর), ঋষি দাস (বিদ্যাসাগর), রাসবিহারী রায় (বিদ্যাসাগর পরিচয়) প্রবোধচন্দ্র বসু (বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন) ডঃ রামরঞ্জন রায় (জীবনসন্ধানী বিদ্যাসাগর) প্রভৃতি। এরকম আর একটি বিষয়ে পথিকৃৎ হবার কৃতিত্ব মেদিনীপুর দাবি করতে পারে সেটি হল মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত রচনা। জীবনচরিত লিখেছিলেন কাঁথির প্রসন্নকুমার ঘোষ।

বিদ্যাসাগরের রচনাভঙ্গি কিংবা তাঁর আদর্শে বিশ্বাসী কিংবা নবজাগরণের আদর্শে প্রভাবিত এই জেলায় এমন কেউ ছিলেন না যাঁর নাম করতে পারি। ২৪ পরগনার বোড়াল গ্রামের রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) মেদিনীপুর জেলা স্কুলের (অধুনা কলেজিয়েট স্কুল) প্রধানশিক্ষক পদে নিয়োগপত্র পান (১৮৫১)। প্রধানশিক্ষক থাকাকালীন (ফেব্রুয়ারি ১৮৫১—মার্চ ১৮৬৬) মেদিনীপুরের সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতিসাধনে বহু হিতকর কাজ করেছিলেন। ১৮৪১ সালে মেদিনীপুরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-১৮৯০)—১৮৫২ খ্রিঃ সমাজের পুনর্গঠন করেন রাজনারায়ণ বসু। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন যেটি এখন 'রাজনারায়ণ বালিকা বিদ্যালয়' নামে পরিচিত। প্রধানত তাঁরই প্রচেষ্টায় এবং তৎকালীন কালেক্টর এইচ ভি বেলির সহযোগিতায় ১৮৫৪ খ্রিঃ ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়—বর্তমানে সেটি 'রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার' নামে পরিচিত। রাজনারায়ণ এখান থেকেই "ধর্মতত্ত্ব দীপিকা" "ব্রহ্মসাধন" বইগুলি রচনা করেন এবং তাঁর আত্মচরিতে তৎকালীন মেদিনীপুরের একটি চিত্র পাওয়া যায়। তিনি বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত বিধবাবিবাহ সমর্থন করেছিলেন—সহোদর দুর্গানারায়ণ ও মদনমোহনের বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন। রাজনারায়ণ এইসব কাজে মেদিনীপুর থেকে খুব বেশি একটা সহযোগিতা পাননি। তাঁর জীবনকাহিনী বিশেষ করে মেদিনীপুরে অবস্থানের বিস্তৃত বিবরণ লিখেছেন হরিপদ মণ্ডল। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রেরও কথা এসে পড়ে। তিনি ও তাঁর অগ্রজ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও সঞ্জীবচন্দ্র
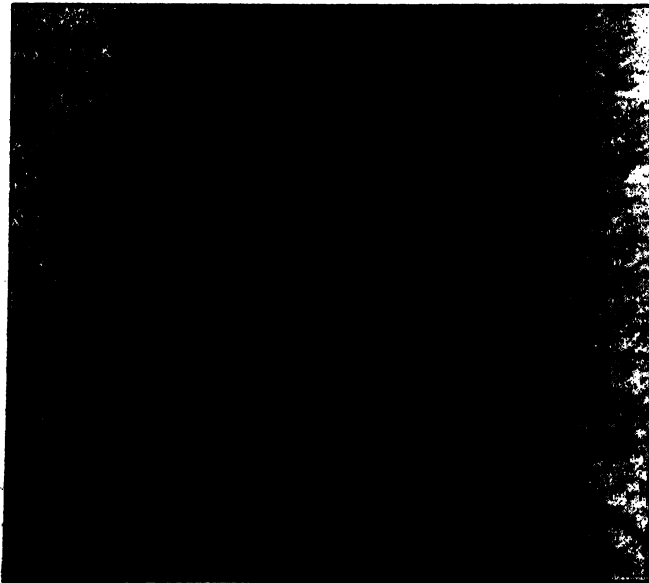
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ছিলেন

চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র ১৮৩৬ সালে প্রথমে মেদিনীপুর কালেক্টরীর খাজাঞ্চি ছিলেন। ১৮৩৮ সালে তিনি ডেপুটি কলেক্টর হন। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬০ সালে নেগুয়া-কাঁথির মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছিলেন—দরিয়াপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে অমর হয়ে আছে। মেদিনীপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের অবস্থান সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র বসু "বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন" নামে একটি বই লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর আরও দুটি বই রয়েছে (বঙ্কিম সাহিত্যে স্বপ্নদর্শন, বঙ্কিম সাহিত্যে নৌকাযাত্রা)। পূর্বে বলেছি, নবজাগরণের প্রভাব জেলাকে সঞ্জীবিত করতে পারেনি তবে বাংলা গদ্যের ক্রমবিবর্তনে জেলার সাহিত্যসেবীরা কিছু উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পেরেছেন। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কাজলাগড়ে কিছুদিন সেটেলমেন্ট অফিসার ছিলেন। কাজলাগড়ে তাঁর স্মরণে একটি স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে। তাঁর রচনায় মেদিনীপুর প্রসঙ্গ নেই আর মেদিনীপুরবাসীও তাঁর সম্পর্কে কিছু লেখা লেখেননি তবে আর পাঁচটা জেলার মতো তাঁর নাটকাদি মঞ্চস্থ করেছে।

রাজনৈতিক প্রয়োজনে বাংলা-ওড়িশার সীমারেখা অনেকবার পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু মানুষের ভাষা আচার-বিচার ইত্যাদির পরিবর্তন হয়নি। কাব্যসাহিত্যের অধ্যায়ে বলেছি যে মেদিনীপুরের সীমান্তবর্তী অঞ্চল কিছুটা ওড়িশা ও বিহার দ্বারা প্রভাবিত। গোপীবল্লভপুর-রোহিণী-সাঁকরাইল ওধারে দীঘা-কাঁথি-নারায়ণগড়-দাঁতন, ডেবরা-সবং-তমলুক-নন্দীগ্রাম অঞ্চলে বাংলা-ওড়িয়া মিশ্রিত একপ্রকার কথ্যভাষা প্রচলিত আছে। এই কথ্যভাষা পুঁথিপত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। এইসব অঞ্চলের অধিবাসীরা ভৌগোলিক দিক দিয়ে বাঙালি কিন্তু অন্তঃপুরে ওড়িয়া প্রভাবিত বাংলায় অর্থাৎ ওড়িয়ায় কথাবার্তা বলেন। এই জাতীয় উপভাষায় গোলকনাথ বসু "সোনার পাথরবাটি" নামে একটি গ্রাম্য উপন্যাস লিখেছিলেন। ভাষার নমুনা একটু দেওয়া হল—

> ঃ কে উটীমা মালাঝি নাকি ? আগো এঠি কিনি গো ? হাই আস্থু নাকি ? মর‍্যা যাইমা, মোর আঁইখে পুড়ুমা, উঠ্‌মা উঠ্, ভাগ্যামানী আয়োযানী হয়া পাক্কামুড়ে ঝুরাপর্, হাতের লুহাখাড়ু শীত্তল হৌ, মুন্দের মুণ্ডে তাটি দিয়া ছেনাপেনা বিন্দোল লিয়া সুখেসন্তে ঘব্বর কর্। মালোমা ! মোর আর ধূরতড়িক লজ্জর কাটেনি, খালি ছ্যাব্ ছ্যাব্ করে। ইত্যাদি

ড. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য "বাগর্থ" গ্রন্থে উক্ত উপন্যাসের ভাষাগত বিচার করেছেন এবং পুরো উপন্যাসটি তুলে দিয়েছেন। এই আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে পুরোপুরি উপন্যাস আর কেউ লেখেননি তবে পরবর্তী কালে গুণময় মান্না, বিষ্ণু ভৌমিক, ভগীরথ মিশ্র, নলিনী বেরা, অনিল ঘড়াই সৃষ্ট চরিত্রের মুখে কিছু কিছু আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ করেছেন। গুণময় মান্না প্রধানত ঘাটাল অঞ্চলের চাষীভূষোদের ভাষা, বিষ্ণু ভৌমিক দীঘা অঞ্চলের জেলেদের চরিত্রে, নলিনী বেরা ঝাড়গ্রাম সাঁকরাইল অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করেছেন।

এরপর উপন্যাস রচনায় যাঁদের নাম করতে হয় তাঁরা প্রধানত বঙ্কিম অনুসারী লেখকবৃন্দ। বঙ্কিমের ধ্যানধারণায় পুষ্ট হয়ে তাঁরা উপন্যাস রচনা করেছেন। মন্মথনাথ নাগ, মহেন্দ্রনাথ দাস, প্রবোধচন্দ্র সরকার, পাঁচুলাল ঘোষ প্রমুখের নাম করা যেতে পারে। মন্মথনাথ নাগের "কলঙ্ক", "কমলাক্ষী" উপন্যাসে নীতিবাদী বঙ্কিমের ছায়া লক্ষ করা যায়। মহেন্দ্রনাথ দাসের "রূপান্তর" উপন্যাসে নতুন-পুরাতনের দ্বিধা থরথর দ্বন্দ্ব না গ্রহণ না বর্জন দোদুল্যমান চিত্তের প্রকাশ দেখা যায়। উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু তখন উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্তের দিকে চলে আসছে—শরৎচন্দ্র তখন এসে পড়েছেন। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ঘাটাল মহকুমার চন্দ্রকোণার অধিবাসী প্রবোধচন্দ্র সরকার। উনিশ শতকের বগড়ি অঞ্চলের নায়েক বিদ্রোহকে অবলম্বন করে "শালফুল" নামে এক উপন্যাস রচনা করেন। শিল্প ক্ষমতার দিক দিয়ে নয় স্থানিক উপাদানকে নিয়ে যে উপন্যাস রচনা করা যায় তা তিনি এই জেলায় প্রথম দেখালেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-১৯৩২) বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন পাঁচুলাল ঘোষ। তিনি সে সময়কার প্রতিষ্ঠিত লেখক—'ভারতী', 'প্রবাসী', 'যমুনা', 'ভারতবর্ষ', 'মানসী' ও 'মর্মবাণী'র

নিয়মিত লেখক ছিলেন। "আপেল", "আঙুর" তাঁর গল্পগ্রন্থ আর "আঁধারে শিউলি" তাঁর উপন্যাস। 'ভারতী' পত্রিকা তাঁর 'আঙুর' গল্পগুচ্ছ সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, "ছোট গল্প রচনার আর্ট পাঁচুবাবু আয়ত্ত করিয়াছেন। পাঁচুবাবুর 'আঙুর' মিষ্টরসে পরিপূর্ণ, যিনি স্বাদ গ্রহণ করিবেন, তিনি মুগ্ধ হইবেন, একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন করে বাংলা উপন্যাসে শরৎচন্দ্র এমন এক নিচুতলার জগতকে নিয়ে এলেন যাঁর কথা ইতিপূর্বে আর কেউ লেখেননি। লাঞ্ছিতা, অবমানিতা নারীত্বকে তিনি মর্যাদা দিয়ে সাহিত্যের জাতে তুললেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের রসোপভোগ করেছেন কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির আদলে জেলার লেখকরা গল্প উপন্যাস লেখেননি বরং তাঁর সম্পর্কে রসসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন যেমন কানাইলাল ঘোষ (শরৎচন্দ্র), প্রমথনাথ পাল (শরৎ-সাহিত্যে নারী, দত্তা পরিচয়, মানুষ শরৎচন্দ্র) সচ্চিদানন্দ পাঠক (দত্তা-পরিচিতি), মনোরঞ্জন জানা (শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ও দর্শন) প্রভৃতি। তবে যাঁরা আধুনিক উপন্যাসের লক্ষণ ও দৃষ্টিভঙ্গি ধরতে পারেননি তাঁরা শরৎচন্দ্রের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন যেমন মনোরঞ্জন পাত্র (অনুপমা), বিজয়কৃষ্ণ ঘোড়ই (যাবো কি যাবো না), কালীপদ চৌধুরী (ছেলেটা, রাক্ষুসী সরোবর) প্রমুখ।

শরৎচন্দ্রের আবেগপ্রবণতাকে কল্লোল-কালিকলমের লেখকরা কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের রোম্যান্টিকতার আবরণে জড়িয়ে দিলেন। এই রোম্যান্টিক আবেগপ্রবণতা থেকে মুক্ত হয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে তীক্ষ্ণোজ্জ্বল চোখে জীবনসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অন্তঃপুরে যাত্রা করেছিলেন সেই পথের সহযাত্রী হয়েছেন সুশীল জানা ও গুণময় মান্না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘাটাল ও মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। সুশীল জানা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগ্য উত্তরাধিকারী, অন্যান্য কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল, স্বাতন্ত্র্যে প্রখর, বৈশিষ্ট্যে দীপ্ত। তাঁর গল্প উপন্যাসে জীবনের বক্রদিক অতি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। শাসক-শোষকের অত্যাচারে নিপীড়িত জনতার মর্মবেদনার আলেখ্য অঙ্কনে তিনি সিদ্ধহস্ত। দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় গল্প 'পদচিহ্ন', 'ঘরের ঠিকানা', 'মহানগরী' মধ্যবিত্ত সমাজের বেঁচে থাকার নিরন্তর প্রয়াসের আলেখ্য। 'সূর্যগ্রাস', 'বেলাভূমির গান' প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি পরম দুঃসাহসে তির্যকভঙ্গিতে শিল্পীর সংযতবোধের সঙ্গে সত্যের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন। গুণময় মান্নার 'লখীন্দর দিগার' (১৯৫০)। 'কটাভানারি' (১৯৫৩), 'শালবনি' (১৯৭৭) উপন্যাসে সমাজের নীচুতলার নিঃস্ব হয়ে যাওয়া কৃষকের কান্নাকে নগ্নমূর্তিতে অঙ্কিত করে সভ্যতার অন্তঃসারশূন্য দেউলে রূপটি অনাবৃত করেছেন। ঘাটালের নিম্নবিত্ত কৃষক সমাজে লেখকের জন্ম (১৯২৫)। জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি সেই সমাজের হাসি-কান্না-দুঃখকে নৈর্ব্যক্তিক নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে অঙ্কিত করেছেন। মার্ক্সীয় সমাজদর্শনে তিনি বিশ্বাসী, কিন্তু শিল্পকুশলতারগুণে মতবাদ থেকে জীবনবাদই তাঁর কাছে অধিকতর প্রিয়। দু'খণ্ডে 'জুনাপুর স্টিল' উপন্যাস শ্রমিক জীবনের আলেখ্য—শ্রমিকেরা কিভাবে নিষ্পেষিত শোষিত হচ্ছে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্ব শ্রমিকদের কিভাবে ক্ষতিসাধন করে তার যেমন চিত্র আছে তেমনি শোষণও নিষ্পেষণ থেকে সাম্যের ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজগঠনে শ্রমিকদের যে বৈপ্লবিক ভূমিকা রয়েছে সেটির প্রতিও তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সমাজের বনিয়াদ যে শ্রমিক ও কৃষক এই বোধে উদ্দীপ্ত হয়েই তিনি উপন্যাস লেখেন। বামপন্থী জীবনবোধের সার্থকতম কলাকৃতির অন্যতর দৃষ্টান্ত তাঁরা। রমাপদ চৌধুরীর জন্ম খড়গপুরে (২৮ ডিসেম্বর, ১৯২২), শৈশবকাল এখানে কেটেছে, রেলওয়ে স্কুলে পড়েছেন। তারপর জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দিনগুলো তাঁর বাইরে বাইরে অতিবাহিত হয়েছে। কয়লাখাদের শ্রমিকদের জীবনের কাহিনী কিছু কিছু 'ঝুমরাবিবির মেলা' 'দরবারী' বইয়ে বর্ণনা দিয়েছেন।

'প্রথম প্রহর'-এ নিজের বাল্যকালকে পটভূমি করে তৎকালীন খড়্গপুরের একটি রোম্যান্টিক উপন্যাস লিখেছেন। তিনি এ পর্যন্ত চল্লিশের ওপর উপন্যাস লিখেছেন। বিষ্ণু ভৌমিক 'সাগর সঙ্গম' উপন্যাসে দিঘা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জেলেদের জীবন ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের ভাষাকে আপন অভিজ্ঞতায় জারিত করে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছিলেন—বর্তমানে তিনি প্রায় নীরব। ভগীরথ মিশ্র বর্তমান সমাজের ক্ষতগুলিকে প্রকাশ করতে গিয়ে মেদিনীপুরের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রধান গ্রন্থ 'মৃগয়া' (১-৪), 'জানগুরু', 'চারণভূমি', 'আড়কাঠি'। নলিনী বেরা, অনিল ঘড়াই গল্প উপন্যাসে সমাজের নীচুতলার মানুষের জীবনসংগ্রাম ব্যক্ত করেছেন। দুজনেই গ্রামীণ জীবনকে দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। নলিনী বেরার প্রধান গ্রন্থ 'শবরপুরাণ', 'এই এই লোকগুলো', 'ইরিনা সুধন্যরা', 'অপৌরুষেয়', 'বাজারিয়া বউ'। অনিল ঘড়াই নগরকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে নিজের গ্রামীণ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। 'জন্মদাগ' 'দৌড়বোগাড়ার উপাখ্যান', 'স্বপ্নের খরাপাখি', 'কলের পুতুল', 'মুকুলের গন্ধ', 'প্লাবন', 'বোবাযুদ্ধ' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রয়াত রাধানাথ মণ্ডল, শিবতোষ ঘোষ নগরজীবনকেন্দ্রিক গল্প উপন্যাস লিখেছেন কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতার মধ্যে ফাঁক ও ফাঁকি থেকে যায় কারণ তাঁরা মানুষ হয়েছেন গ্রামে। গ্রামের গন্ধ ঝেড়ে ফেলার জন্য নিজেদের স্মার্ট করে তোলার দিকে তাঁদের প্রবণতা বেশি। রাধানাথের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'অমিতাভ অর্জুন সে নয়' 'আটঘরার মহিম হালদার', 'পদক্ষেপ', শিবতোষ ঘোষের প্রধান গ্রন্থ 'খেলনাপাতি', 'ভূমিদাস'। অকালপ্রয়াত নীতিশ ভট্টাচার্য (১৯৫৩-১৯৮৯) ব্যতিক্রম। বেদের পটভূমিকায় প্রথম বাংলা

উপন্যাস তাঁর 'যম ও যমুনা' (আগস্ট ১৯৮৯) রচিত হলেও আর্য-অনার্যের সংঘর্ষে ভারতীয় সমাজের তৎকালীন একটি চিত্র পাওয়া যায়! রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'ভোলগা থেকে গঙ্গা' কিংবা বনফুলের 'স্থাবর' উপন্যাসের সমগোত্রীয় 'যম ও যমুনা'। 'আড্ডা' (সেপ্টেম্বর ১৯৯০) নামে গল্পগ্রন্থ ও 'তৃষ্ণা' নামে একটি উপন্যাস রয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় মাইতির গ্রামজীবনের ওপর লেখা 'নদী মাটি মানুষ', 'নিঃসঙ্গ নায়ক', 'শেষ প্রহরের ঘণ্টা', 'রূপনারায়ণ' ইত্যাদি। চিত্তরঞ্জন মাইতির গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিচিত্র ধরনের—নগর জীবনের ঘটনা যেমন তাঁর কাছে সাবলীল তেমনি গ্রামীণ জীবনেরও আবার ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়েও তিনি উপন্যাস গল্প লিখতে সমান পারঙ্গম। তাঁর প্রধান গ্রন্থ হল এ 'ড. জনসনের ডায়েরি', 'অগ্নি কন্যা', 'ভোরের রাগিনী', 'হিরণ্যগড়ের বধূ', 'পরমা', 'মোহিনী', 'কালের কল্লোল', 'ফরেস্ট বাংলা', 'আঁধার পেরিয়ে', 'নির্জনে খেলা' প্রভৃতি। ফণিভূষণ আচার্যও কিছু উপন্যাস লিখেছেন—গ্রাম ও নগর জীবনের মধ্যে তিনি সমীকরণ করেছেন। তাঁর গ্রন্থের নাম 'জ্যোৎস্নায় বাঘবন্দী খেলা', 'হলুদ পাখীর ডাক', 'সরণী' ইত্যাদি। বাজীরাও সেন (পূর্ণচন্দ্র গুঁই) প্রধানত ঐতিহাসিক উপাদানের ('পঞ্চ নদীর তীরে', 'ইতিহাসের প্রেম'), সুধীর করণ লৌকিক জীবনের কিছু সার্থক মিষ্টিমধুর গল্প উপন্যাস লিখেছেন (রুক্মিনী বিবি)। গভীর জীবনবোধের পরিচয় না থাকলেও মোজাহারুল ইসলাম (আমার পৃথিবী তুমি, সোনাঝরা দিন, কখনো অন্যমনে), বাসুদেব মাইতি (স্বয়ম্বরা, মহানগরীর নারী) সুধীর মল্লিক (নোনাবাঁধ, সাবিত্রী সংবাদ, নীড়ের মায়া), বিজয়কৃষ্ণ ঘোড়ই (যাবো কি যাবো না), ভবেশ বসু (মন্দিরে আজান) বরুণ মাইতি (সুবর্ণরেখার মানুষ, ধূলোট), অরুন্ধতী সেন (প্যাসেঞ্জের জানালা ও অন্যান্য), ক্ষিতীশ সাঁতরা (পূজনীয় পিতৃদেব), মনোরঞ্জন পাত্র (অনুপমা), কালীপদ চৌধুরী (রাক্ষুসী সরোবর, ছেলেটা) মন্মথ নাথ দাস (পরিধি সংকীর্ণতর) প্রমুখ সোজাসাপটা ঘরোয়া ভঙ্গিতে গল্প উপন্যাস লিখে থাকেন। রাধাপ্রসাদ ঘোষাল (নিহত নির্জন, ছিন্নভিন্ন, বর্ণপরিচয়), রমাপ্রসাদ ঘোষাল বক্তব্য বিষয় থেকে বিষয়টাকে কীভাবে পরিবেশন করা যায় সেদিকেই তাঁদের লক্ষ্য। রসরচনায় 'সম্বুদ্ধ' অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত (শিকার কাহিনী ১-২, ডায়েলেকটিক্স 'প্রবুদ্ধ' প্রবোধচন্দ্র বসু (গালভর্তি হাসি, পকেটভর্তি হাসি) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে ছয় ও সাত দশকের মাঝামাঝি সময়ে শাস্ত্রবিরোধী অর্থাৎ অ্যান্টি উপন্যাস, গল্প রচনায় যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল সেই আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন সুনীল জানা ও সুবিমল মিশ্র (অ্যান্টি-গল্প সংগ্রহ, অ্যান্টি-উপন্যাস সংগ্রহ)। ভ্রমণ সাহিত্য রচনায় চিত্তরঞ্জন মাইতির 'শৈলপুরী কুমায়ুন' 'কলাভূমি কলিঙ্গ'। কল্যাণী প্রামাণিকের 'দুনিয়া দেখছি' সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হিমালয়ের তিন তীর্থ', বিপ্লব মাজীর 'মস্কোর ডায়েরী' গীতা মুখোপাধ্যায়ের 'আমার দেখা চীনের গণ কমিউন' সুনাম অর্জন করেছে। অনুবাদে অরুণা হালদার (তারা), ঋষি দাস (রলাঁ রচিত মহাত্মাগান্ধী, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, বিবেকানন্দের জীবন, প্রাৎসিয়া দোলাদ্দারের মা প্রভৃতি)। প্রণব বাহুবলীন্দ্র (ওমর খৈয়াম, গীতগোবিন্দ, মেঘদূত, বিদ্যাসুন্দর), বীতশোক ভট্টাচার্য (আজারবাইজানের কবিতা), বিপ্লব মাজী (কোয়াসি মোদো, অকতাভিও পাস, প্রশান্ত সামন্ত (শেলি, বায়রন, কীটসের কবিতা), পিনাকীনন্দন চৌধুরী (রসুল গামজাতভের কবিতা), কালীপদ কোঙার (খুঁটোর পর ঝোলানো লোক', শ্রীরাধা, মৈথিলী কবিতা জ্বলন্ত সূর্য)। শিশুসাহিত্য রচনায় যামিনীকান্ত সোম (বাংলার সৃজনী প্রতিভা, নীলপাখি, পুথি পুরাণের গল্প, পুরানো দিনের পুরানো কথা, বেতার কারসাজি) প্রভাকর মাঝি (ছানুবাবুর ছড়া), পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায় (অশরীরীর দান), শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী (মুক্তি সাধনায় বাংলা, জাগ্রত মেদিনী, জাতির জনক যাঁরা), অলোকনাথ চক্রবর্তী (ঘেঁটুর কথা, ভাদুর কথা, টুসুর কথা, গুরুদক্ষিণা), প্রবোধকুমার ভৌমিক (মেদিনীপুরের কথা ও কাহিনী) ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় (এবং পুরের টিকটিকি), অনিমেষকান্তি পাল (কাশতানকা, আকাশযানের কথা, জলযানের কথা, ডাকাতের মেয়ে রাহুতি) প্রমুখ যশস্বী হয়েছেন ।

স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলন বাংলার সূচিভেদ্য অন্ধকারময় গ্রামকেও আলোড়িত করেছিল। সমাজ-সংস্কার, বিলাতি দ্রব্য বর্জন, দেশের ঐতিহ্য উদ্ধারের কিছু কিছু প্রচেষ্টা এই জেলায় হয়েছে এবং এরই প্রেরণায় জেলার ইতিহাস ও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। এই ধারা এখনও প্রবহমান। যেমন যোগেশচন্দ্র বসুর 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' ত্রৈলোক্যনাথ পালের 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' (নারায়ণগড়, কর্ণগড়, নাড়াজোল, বলরামপুর ও ধারেন্দা), ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিতের 'তমোলুক ইতিহাস', পঞ্চানন রায়ের 'দাসপুরের ইতিহাস' (পরে প্রণব রায় সহযোগে 'ঘাটালের কথা'), মহেন্দ্রনাথ করণের 'হিজলীর মসনদ-ই-আলা' (২য় সংস্করণ যদুনাথ সরকার কর্তৃক সংশোধিত), রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজা শোভাসিংহের বিদ্রোহ ও শ্রীশ্রী বিশালাক্ষী মাতার ইতিহাস, রাধারমণ চক্রবর্তীর 'কর্ণগড়ের ইতিকথা', রাসবিহারী রায়ের মেদিনীপুর সংক্রান্ত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রচনা, ইন্দু বসুর 'বাংলার ছড়া' ঈশানচন্দ্র বসুর প্রাচীন সাহিত্য (শিবায়ণ, ধর্মমঙ্গল গোবিন্দমঙ্গল) সম্পাদনা। পরে মহকুমা ভিত্তিক, থানা ভিত্তিক কিছু ইতিহাস রচিত হয়েছে যেমন যুধিষ্ঠির জানার 'বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস' অধরচন্দ্র ঘটকের 'নন্দীগ্রাম থানার ইতিবৃত্ত', কেদারনাথ পাহাড়ীর 'সমসাময়িক নারায়ণগড়' সত্যেন ষড়ংগীর 'সাঁকরাইল থানার ইতিবৃত্ত', রামানুজ দাস মহন্তের 'বগড়ীর কথা', প্রবোধচন্দ্র বসুর 'ভগবানপুর থানার ইতিবৃত্ত', হরিপদ মাইতির 'স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ময়না থানা', বঙ্কিম ব্রহ্মচারীর 'হলদিয়ার ইতিকথা' (১-২), বিভূতিভূষণ

জানার 'ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনে হলদিয়া', তারাশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'বৃহত্তর গড়বেতার ইতিহাস', গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ইতিহাস' (১-২) ইত্যাদি।

কিছু জাতিতত্ত্বমূলক আলোচনা বেরিয়েছে—গান্ধীজির হরিজন আন্দোলনে একদিকে বর্ণাশ্রম জাতিরা যেমন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য কলম ধরেছেন তেমনি যাঁদের নীচু করার জন্য তাঁরা লিখেছিলেন তাঁরাও তার জবাব দিয়েছেন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য। কুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায়ের 'বারেন্দ্র রাঢ়ীয় ও মধ্যদেশী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ' ব্রজনাথ চন্দ্রের 'শোলাঙ্কি বা শুক্রিজাতির আদি বৃত্তান্ত', নিরঞ্জন দেব সিংহের 'বায়মল্ল বঙ্গোৎকলে আগত শোলাঙ্কি রাজপুত ক্ষত্রিয়' চন্দ্রশেখর ঘোষ দাসের 'কায়স্থ কুলদর্পণ', মণীন্দ্রনাথ মণ্ডলের 'আর্য পৌণ্ড্রিকের বৃত্তিবিচার', 'মহেন্দ্রনাথ করণের 'পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ' ইত্যাদি তার উদাহরণ। কিছু ধর্মীয় আচার আধ্যাত্মসাধনমার্গেরও আলোচনা হয়েছে যেমন মণীবিনাথ বসু সরস্বতীর 'ভাগবততত্ত্বজিজ্ঞাসা', শিবানন্দ স্বামী 'সুগম সাধন পন্থা' (১-৪) 'পূর্ণ ব্রহ্মরাম ও রামনাম মহিমা', ঈশ্বরচিন্তা ও পূজন', স্বামী জগদীশ্বরানন্দের 'কল্কিগীতা' 'দিব্যদৃষ্টি' কানন দেবীর 'উপলব্ধি বিচার', 'ত্রিনয়নী'। চৈতন্যদেবকে নিয়েও আলোচনা হয়েছে যথা—যুধিষ্ঠির জানার 'চৈতন্য আবির্ভাবের পটভূমিকা', 'উপেক্ষিতা বিষ্ণুপ্রিয়া', 'চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্য', বিষ্ণুহরি জানার 'ভারতাত্মা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি সম্বলিত আলোচনার বইও কিছু লেখা হয়েছে যেমন এস এম আখতার হোসেন রচিত 'বিশ্বতীর্থ হজ ও যিয়ারত' 'ইসলামি শিক্ষা ও বিধান', সাইয়্যেদা কানীজ মুস্কার 'ইসলামে নারীর অধিকার', 'ইসলামের পঞ্চতন্ত্র', 'কোরআনে নবীদের ইতিহাস' ইত্যাদি। এখানে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের কথাও এসে যাচ্ছে। এই জেলায় কোনও দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়নি। সুচতুর ইংরেজ শাসক নানারকম ছল-চাতুরী দিয়ে দেশের সর্বত্র দাঙ্গা বাধিয়ে দিত। স্বাধীনতার পরও যে দাঙ্গা হয়েছে তা এ জেলার মাটিকে স্পর্শ করেনি। এই জেলার লেখক শেখ ওসমান আলী ইংরেজ সরকারের উচ্চপদে থেকেও ভারতের পরাধীনতা ও হিন্দু-মুসলমানের বিরোধে ব্যথিত হয়েছেন। তিনি 'হাফেজ', 'কোহিনুর', 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় এই বিষয় নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধাদিতে তাঁর মুক্তবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় বিশেষ করে 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায়' (কোহিনুর, মাঘ-ফাল্গুন ১৩১৩, বৈশাখ ১৩১৪) প্রবন্ধটির মধ্যে এখনও ভেবে দেখার মতো উপাদান রয়েছে। জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনী রচিত হয়েছে যেমন হেমচন্দ্র কানুনগোর 'বাঙলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা', 'অনাগত সুদিনের তরে', অতুলচন্দ্র বসুর 'মেদিনীপুরের বোমা ও পিস্তল' (১৯৬২), মেদিনীপুরের বোমার মামলা (১৯৭৪), চিত্তরঞ্জন দাসের 'মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাস', গোপীনন্দন গোস্বামীর 'বাংলার হলদিঘাট তমলুক' রোহিনীমঙ্গলের 'শোভাসিংহের বিদ্রোহ' বিনোদ শংকর দাসের 'জঙ্গল মহাল', নগেন্দ্রনাথ রায়ের 'বিদ্রোহিনী রানী শিরোমণি' ও মেদিনীপুরের 'প্রথম কৃষক গণবিদ্রোহ', বসন্ত কুমার দাসের 'স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুর', তারাশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর', বিনয়জীবন ঘোষের 'বিপ্লবী মেদিনীপুর', 'অগ্নিযুগের অস্ত্রগুরু হেমচন্দ্র' ঈশানচন্দ্র মহাপাত্রের 'শহীদ ক্ষুদিরাম', 'শহীদ প্রদ্যোৎকুমার', প্রমথনাথ পালের 'দেশপ্রাণ শাসমল', মন্মথনাথ দাসের 'দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ', তারাশঙ্কর পাণিগ্রাহীর 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও সমকালীন ভারতের মুক্তিসংগ্রাম', সুশীলকুমার ধাড়ার 'কুমারচন্দ্র জানা', তমলুকের জাতীয় সরকার ও সতীশচন্দ্র সামন্ত, প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিকের 'কংগ্রেস রথ-সারথি যাঁরা', 'আমাদের লালবাহাদুর', ঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিকের 'বিশ্বগুরু মহাত্মা গান্ধী', স্বদেশরঞ্জন দাসের 'মানবেন্দ্রনাথ : জীবন ও দর্শন' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

সাহিত্য ও সমাজের বিভিন্ন বক্তব্যবিষয়কে যথাযথ সুশৃঙ্খল ও সুসংহতভাবে প্রকাশ করার নৈপুণ্যের ক্ষেত্রে যাঁরা যশস্বী হয়েছেন শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধির আশঙ্কা নিয়েই তার একটি তালিকা দিচ্ছি। ভাষাতত্ত্ব ও উপভাষা আলোচনায় বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (বাগর্থ সমীক্ষায় 'লিপিবিবেক' ব্যাকরণের ইতিহাস), সুকুমার মাইতি (শিলালিপি, তাম্রলিপ্তিক উপভাষা, উপগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি ১-২) অর্ধেন্দুশেখর বালা (মেদিনীপুর জেলার স্থান নাম : সমাজতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ), লোকসাহিত্য সংস্কৃতি আলোচনায় সুধীর করণ (সীমান্ত বাংলার লোকযান, লোকসাহিত্যে ঈশপ), রাধাগোবিন্দ মাহাত (ঝাড়খণ্ডের সংস্কৃতি), বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত (ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য), অনিমেষকান্তি মাল (লোকসংস্কৃতি), বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি (দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি), জীবেশ নায়েক (প্রসঙ্গ দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা), কৃষ্ণানন্দ দে (লোককান্ত মেদিনীপুর), সরিতা ভৌমিক (পরবের আঙিনায়), মনোরঞ্জন মাইতি (বাংলা ও রুশ লোকসাহিত্য), তারাশিস মুখোপাধ্যায়, শোভারানী চক্রবর্তী (বর্তমান বঙ্গ সমাজে যাদুবিদ্যা ও লোকায়ত বিশ্বাসের ধারা), পুরাতত্ত্ব আলোচনায় প্রণব রায় (মেদিনীপুরের পুরাকীর্তি), মহম্মদ ইয়াসিন পাঠান (মন্দিরময় পাথরা-র ইতিবৃত্ত), প্রাচীন সাহিত্য আলোচনায় নিরঞ্জন চক্রবর্তী (ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য, ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীকার ও বাংলা সাহিত্য, বিদ্যাপতি সমীক্ষা), নরেশচন্দ্র জানা (বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার), সত্যবতী গিরির (বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ) গীতা পালের (উনিশ শতকের গীতিকবিতা), আধুনিক সাহিত্য আলোচনায় দীপ্তি ত্রিপাঠি (আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়), সুধারকর চট্টোপাধ্যায় (অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ, আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান, কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য), পশুপতি শাসমল (স্বর্ণকুমারী ও বাংলা

সাহিত্য), বিষ্ণুপদ পণ্ডা (কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ও বাংলা গীতিকবিতার ধারা, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত), শিশিরকুমার দাশ (মাইকেলের কবি-মানস, বাংলা ছোটগল্প, গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব, ফুলের ফসল), রামজীবন আচার্য (নজরুল এক বিস্ময়, নজরুল কবিতার ভাব ও রূপ), লায়েক আলি খান (নজরুল প্রতিভা), প্রশান্ত সামন্ত (বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল), রামরঞ্জন রায় (ছোট গল্পের রূপশিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি ও ঔপন্যাসিক, প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিচিত্র জগৎ), বীতশোক ভট্টাচার্য (গদ্য সংগ্রহ, কবিতার অ আ ক খ), স্বরাজ গুছাইত (বিনির্মাণ ও সৃষ্টি : বাংলা উপন্যাস), বৈরাগ্য চক্রবর্তী (সাহিত্য সংস্কৃতির প্রথা বিরোধী ভাবনা), দিব্যাংশু মিশ্র (সাহিত্যতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব পরিভাষা), সুস্নাত জানা (উত্তর প্রবেশ, জীবনানন্দ আলো বলয়ের দিকে), তপনকুমার মাইতি (কবিবাক্য), সন্তোষকুমার প্রতিহার (পরিচয়, বিচিত্রা, কবিতা পত্রিকার লেখক), ছন্দ ও অলঙ্কার আলোচনায় হরিহর মিশ্র (ব্যঞ্জনা ও কাব্য), সুহৃদকুমার ভৌমিক (বাংলা ছন্দের বিবর্তন), শৈলী বিজ্ঞান আলোচনায় আশিসকুমার দে (উপন্যাসের শৈলী : তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সমালোচনা ও শৈলী বিজ্ঞান, মধ্যযুগের সাহিত্য : ভাষাপট ও ভাবকথা), রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনায় গুণময় মান্না (রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-কাব্যের বিবর্তন, রবীন্দ্র-রচনার দর্শনভূমি), মনোরঞ্জন জানা (রবীন্দ্র-পরিচয়, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও সমাজ, রবীন্দ্র-নাটকের ভাবধারা), শ্রীমন্ত জানা (রবীন্দ্র মনন), সত্য ঘোষাল (রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী, নিন্দা পঙ্কের পারিজাত), অনুত্তম ভট্টাচার্য (দিনের আলোয় রবীন্দ্রনাথ, প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ, মৃণালিনী রবীন্দ্রনাথ), জীবনী-সাহিত্য রচনায় ঋষি দাস (শেকসপীয়র, জর্জ বার্নাড শ, রামমোহন, চিত্তরঞ্জন, শরৎচন্দ্র, বাদশা খান, দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি)। প্রভাতকুমার দাস (জীবনানন্দ দাশ), রবীন্দ্রনাথ মাইতি (ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণব জীবনী, চৈতন্য পাঠকর), জীবনকৃষ্ণ মাইতি (ঠাকুর রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বাভাষ, বিষ্ণুহরি জানা (ভারতাত্মা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য), অতুলচন্দ্র মেইকাপ (আজাদ-হিন্দ-ফৌজ ও নেতাজী), শঙ্কর ভট্টাচার্য (নাট্যাচার্য শিশিরকুমার) ঐতিহাসিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিমাংশুভূষণ সরকার (দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, কোরিয়া ও জাপানের প্রাচীন সাহিত্য এবং ভারতীয় সংস্কৃতি, হিন্দুযুগে দ্বীপময় ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা), শ্যামাপ্রসাদ বসু (মধ্যযুগে ভারত, ওয়াহাবী থেকে খিলাফত একটি ব্রিটিশ বিরোধী অধ্যায়, ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ একটি উৎসের সন্ধানে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : বিয়াল্লিশের আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে বাংলা ও বাঙালি), শ্যামাপদ ভৌমিক (খড়্গপুর : ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বৈচিত্র্যময় মেদিনীপুর), হরিপদ ঘোষাল (বিশ্বসভ্যতার ধারা), অমলেশ ত্রিপাঠি (স্বাধীনতার মুখ, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস), রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় আলোচনায় দেবেন দাস (ভারত কোন পথে, উপজাতি সমস্যা ও ঝাড়খণ্ড আন্দোলন), বিমলানন্দ শাসমল (ভারত কি করে ভাগ হলো, স্বাধীনতার ফাঁকি, ভারতের রাজনীতি ও মুসলমান), নিলয় মিত্র (সমাজতন্ত্রের রক্তে সংগ্রাম ফ্যাসিবাদের পরাজয়), মনস্তত্ত্ব আলোচনায় রমেশ দাস (শিশুমন), শিক্ষাতত্ত্ব আলোচনায় সুখময় সেনগুপ্ত (বাঙালি মণীষীর শিক্ষাচিন্তা ও সাধনা), হরিসাধন গোস্বামী (মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন, শিক্ষাসাধনায় পূর্বসূরী, যুগের অভিব্যক্তি ও শিক্ষা), সংগীত ও নৃত্য বিষয়ে সুধাংশুশেখর শাসমল (ধ্বনির শিল্প রবীন্দ্রসংগীত), স্নিগ্ধা পাল (নৃত্ত-নৃত্য-নাট্য), কৃষিকার্য ও উদ্যান রচনা বিষয়ে বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ (প্রাথমিক উদ্যান বিদ্যা, ফুলের বাগান, শাক-সবজি চাষের কথা), সূচি ও কোষ গ্রন্থ রচনায় প্রভাতকুমার দাস (কবিতা পত্রিকার সূচি), প্রিয়নাথ জানা (বঙ্গীয় জীবনী কোষ), বাসুদেব মাইতি (রবীন্দ্র-রচনা কোষ ১-২) বীতশোক ভট্টাচার্য (বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভিধান), অনুত্তম ভট্টাচার্য (রবীন্দ্র রচনা অভিধান খ ১-২), গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে পীযূষকান্তি মহাপাত্র (গ্রন্থবিদ্যা : ইতিকথা তত্ত্বপ্রয়োগ, গ্রন্থাগার সংগঠন), বিদেশি সাহিত্যের ওপর আলোচনায় সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন (অভিমানী নায়ক অলডাস হাকসলি), বিপ্লব মাজী (তলস্তয়, নির্জন আয়নায়) সংস্কৃত ও সাহিত্য আলোচনায় পরাগরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (বেদ পরিচয়, বেদের সংহিতায় নারী), সুব্রতকুমার দিণ্ডা (গীতার শিক্ষা ও ভারতের আধ্যাত্মিকতা), নমিতা চক্রবর্তী (সংস্কৃত নাটকের গল্প), তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিশেষ করে বৌদ্ধধর্ম পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যালোচনায় অরুণা হালদার (অভিধর্মকোষ সম্পাদনা) সুনীতিকুমার পাঠক (তিব্বত, চাণক্য রাজনীতি শাস্ত্র, মসুবাক্ষ নীতিশাস্ত্র—সংস্কৃত-তিব্বতী দ্বিভাষিক সংস্করণ), বিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনায় সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র (পদার্থ-বিকিরণ বিশ্ব, মহাবিশ্বের কথা, সৃষ্টির পথ, ভরের বর্ণালী কণাত্বকরণ, মেঘনাদ সাহা : জীবন ও সাধনা), সন্তোষকুমার ঘোড়ই (পপুলার সায়েন্স, ফলিত বিজ্ঞান, মাথাটাই যাদের গবেষণাগার), প্রশান্ত প্রামাণিক (মহাসময়ের ইতিবৃত্ত), সুধাংশু পাত্র (আজকের বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা, পদার্থবিজ্ঞানের সহস্র জিজ্ঞাসা, পৃথিবী মানুষ ও মহাকাশ, বিশ্ব পরিবেশ ও মানুষ, মহাসাগরের মহাবিস্ময়), ভবানীপ্রসাদ সাহু (ভূত ভগবান শয়তান বনাম ড. কাভুর, শরীর ঘিরে সংস্কার, অধার্মিকের ধর্মকথা, ওষুধ খেয়ে অসুখ, আংকুপাংচার)।

বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে মেদিনীপুর বরাবর যোগাযোগ রেখে চলেছে, কোনও ক্ষেত্রেই সে পিছিয়ে থাকেনি। ইদানীকালে কিছু বিভিন্ন মণীষীর শতবর্ষ পূর্তি উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। ১৯৩৮-এ বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বঙ্কিম গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন।

সেই প্রকাশনার সমূহ অর্থ ঝাড়গ্রাম রাজা নরসিংহ মল্লদেব বহন করেন। অনুরূপভাবে পরিষদ থেকে প্রকাশিত বিদ্যাসাগর রচনাবলী প্রকাশের অর্থ তিনি দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উৎসব ১৯৬১ সালে জেলার সর্বত্র পালিত হয় কিন্তু উল্লেখযোগ্য স্মারক গ্রন্থ বেরোয়নি। ১৯৬৬-তে ফরাসি মণীষী রম্যা রঁল্যার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সঙ্গে একটি মূল্যবান স্মারকপুস্তিকা বেরোয়। বিদ্যাসাগরের দেড়শত বছর জন্মবার্ষিকীর সময় বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজের প্রযত্নে বিপুলাকার 'বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ' (১৯৭৪) বেরোয়। এই গ্রন্থের লভ্যাংশ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিকে দান করে প্রতিবছর মেদিনীপুর শহরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবর্ষে 'দিব্যায়ন' (১৯৭৩), বঙ্গরঙ্গমঞ্চ শতবর্ষ উপলক্ষে 'বঙ্গরঙ্গ মঞ্চ শতবর্ষপূর্তি' স্মারক গ্রন্থ' (১৯৭৩), শরৎচন্দ্র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে 'শরৎবীক্ষা' (১৯৭৯), ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'কমিউনিস্ট হলাম' (১৯৭৬), ভারত ছাড় আন্দোলন ও আজাদ হিন্দ সরকারের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'ভারত ছাড় আন্দোলন' এবং আজাদ হিন্দ সরকার সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা (১৯৯৩), স্বাধীনতা সংগ্রামী আভা মাইতির স্মরণে 'অনন্য আভা' (১৯৯৭), সুকুমার সেনগুপ্তের স্মরণে 'অপ্রতিম' (১৯৯৫), বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের স্মরণে স্মারক গ্রন্থ (১৯৯৮) প্রকাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাট্যসাহিত্য

নাটকের কথা বলার আগে একটা কথা পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল, আর যে কথাটা খুবই দুঃখের এবং ক্ষোভের কথা। রূঢ় শোনালেও বলতে হবে মেদিনীপুর জেলায় স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরের নাট্যকারদের কোনও অবদান নেই। গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদ-শচীন সেনগুপ্ত-মন্মথ রায় প্রমুখের নাটকগুলিই জেলার সৌখীন দলেরা অভিনয় করেছেন এবং ওইসব নাট্যকারদের নাটক মঞ্চস্থ করেই দেশবাসীকে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করেছেন। এই জেলায় স্বাধীনতা সংগ্রাম অর্থাৎ চুয়াড় বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, লবণ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, শ্বেতাঙ্গ নিধন, বিয়াল্লিশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, পঞ্চাশের মন্বন্তর ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও কোন বিষয়টি জেলার নাট্যকারদের উদ্দীপ্ত করেনি। নাট্যকার মন্মথ রায় মেদিনীপুরের স্বাধীনতা আন্দোলনকে অবলম্বন করে 'মহাভারতী' নাকি রচনা করেছিলেন কিন্তু জেলার নাট্যকাররা কেন জানি না এই বিষয়ে উৎসাহী হলেন না অথচ নাটকের বিষয়বস্তু ওইসব সংগ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

মেদিনীপুরে নাটক রচনার প্রধানত দুটি ধারা—এক জমিদার শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু নাটক রচনা, দুই, নিজস্ব উদ্যমে কিছু নাটক রচনা। প্রথম ধারায় জমিদারেরা কিছু কিছু পৌরাণিক ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন, দ্বিতীয় ধারায় নিজস্ব উদ্যমে যে সব নাটক রচিত হয়েছে তার মধ্যে মানবজীবনের সমস্যার কথা বেদনার কথা পরিস্ফুট হয়নি। 'নবান্ন' নাটক যখন নাট্য সাহিত্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করল তখনও এই জেলার নাট্যকারেরা পুরনো দিনের স্বপ্নেই বিভোর ছিলেন।

এ পর্যন্ত মেদিনীপুরে যা নাটক লেখা হয়েছে তাকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—প্রাচীন ও আধুনিক। প্রাচীনের দলে পড়েন গোলকচন্দ্র বসু (কাচের কাঞ্চন থালা), ভুবনচন্দ্র কর মহাপাত্র (শঙ্খচূড়), কালিদাস দত্ত (বঙ্গে চৌহান, কাদম্বরী), সুরেশচন্দ্র রায় বীরবর (দুর্গম সংহার নাটক, রত্নাকর, বিষ্ণুচক্র, দেবদানব লঙ্কারণ, মা দুর্গা, ঋষি-কন্যা, মাথুর, রাজভক্তি, বিষ্ণুচক্র), বঙ্কিমবিহারী পাল (মেঘদূত) প্রভৃতি। এই পর্বের লেখকদের নিজস্ব জীবনবোধ ছিল না, তাঁরা জনপ্রিয় নাটকগুলি সামনে রেখে তারই অনুকরণে নিজেদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

আধুনিকদের মধ্যে অর্থাৎ মঞ্চে সিন উইংসের জাঁক-জমক ধারা পরিবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ যে বিপ্লব এনেছিলেন সেই রীতিকে স্বাগত জানিয়ে যাঁরা নাটক রচনা করেছেন তাঁরা হলেন সু-মো-দে, চিত্তরঞ্জন রায়, ঋষি দাস, সত্যেন্দ্রনাথ জানা, সমরেশচন্দ্র রুদ্র, পরিমল ঘোষ, অতনু সর্বাধিকারী, শ্রীজীব গোস্বামী (বাসুদেব দাশগুপ্ত) প্রমুখ।

সু-মো-দে 'উদার অভ্যুদয়'-এ বিদ্যাসাগরের জীবনের কয়েকটি খণ্ড চিত্র তুলে ধরেছেন—সংগ্রামী-তেজস্বী-আপসহীন বিদ্যাসাগরকে শেষে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত করে এমনি ভক্তিভাব এনে ফেলেছেন যা বিদ্যাসাগর চরিত্রের বিপরীত। আধুনিকদের মধ্যে কেউ কেউ ইউরোপিয় নাটকের অনুবাদ কিংবা ভাবানুসরণে নাটক রচনা করেছেন, যেমন ঋষি দাস (দুয়ে দুয়ে বাইশ), চিত্তরঞ্জন রায় (মোনাভ্যানা)। সত্যেন্দ্রনাথ জানা 'রবিতর্পণ' (১৯৪৪), 'পনেরো আগস্ট' (১৯৫০) নামে দু'টি নাটক রচনা করেছেন। প্রথম নাটকটিতে প্রথমের দিকে নিজস্ব কিছু কবিতা আছে পরে 'পঁচিশে বৈশাখ', 'বাইশে শ্রাবণ', 'স্বপ্ন দাদু' নামে তিনটি নাটিকা রয়েছে। নাটকের উপাদান ও আধার, সংলাপের স্বাভাবিকত্ব সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তাঁর ছিল না। পরিমল ঘোষের 'গর্ত' নাটক স্ত্রীচরিত্রবর্জিত রঙ্গ-নাটিকা। মোজহারুল ইসলামও কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক ও সামাজিক নকশা রচনা করেছেন যেমন, 'দিল্লীর মসনদ', 'অগ্নিস্নান', 'মুক্তিবিধান', 'বিচার', 'কবি সমাচার', 'শেষ দান', 'বিচারকের ফাঁসী'। দেশভাগের সময় তিনি ওপারে চলে যান এবং তাঁর যাবতীয় সাহিত্যকর্ম ওপার থেকেই প্রকাশিত হয়। শিশুনাটকও কিছু লেখা হয়েছে যেমন হরিপদ মান্না 'একটুখানি হাসিখেলা', যামিনীকান্ত সোমের 'খেলাঘর', 'একঘরে' প্রভৃতি নাটক। ছোটদের নাটক হিসেবে এগুলি সফল নাটক নয়, মঞ্চে অভিনীত হবার মতো নাটকও নয়। আধুনিকদের মধ্যে প্রকৃত

নাটকের লোক আছেন তিনজন তাঁরা হলেন সমরেশচন্দ্র রুদ্র, অতনু সর্বাধিকারী ও শ্রীজীব গোস্বামী।

সমরেশচন্দ্র রুদ্র মেদিনীপুর জেলায় প্রথম একাঙ্ক নাটক লেখেন। 'দুর্বার' নামে তাঁর একাঙ্ক নাটকের সংকলনও বেরিয়েছিল। কিন্তু তিনি তাঁর শক্তির সদ্ব্যবহার করলেন না চমক দিয়েই নিভে গেলেন। এদিক দিয়ে আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করেছেন অতনু সর্বাধিকারী ও শ্রীজীব গোস্বামী। এ দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কিন্তু এঁরা দুজনেই জীবনবাদী নাট্যকার—উপস্থাপনা ও রচনারীতির দিক দিয়ে স্বতন্ত্র। অতনু নিজে যেখানে একটু আড়ালে থাকতে ভালবাসেন সেখানে শ্রীজীব নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপনে সোচ্চার। ফলে অতনু যেখানে শিল্পরীতিতে ব্যঞ্জনাধর্মী সেখানে শ্রীজীব কিছুটা প্রচারধর্মী। নাটক মঞ্চস্থ কিংবা পরিচালনার ব্যাপারে শ্রীজীব যতটা সক্রিয় সেই অনুপাতে অতনু ততটা সক্রিয় নন। শ্রীজীব নিজস্ব নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে যেমন আগ্রহী তেমনি অন্য লেখকের নাটক যাতে জনতার কথা আছে পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর প্রয়াস ক্লান্তিহীন। অতনু এদিক দিয়ে কিছুটা অন্তর্মুখীন। অতনুর তিনটি নাটকের বই বেরিয়েছে 'সিঁড়ি' 'লঘুগুরু' 'শ্বেতছায়া'। লঘুগুরু নাটক অসকার ওয়াইলড-এর গল্প অবলম্বনে প্রধানত সিরিও কমিক আর শ্বেতছায়া নারীবর্জিত রহস্য নাটক। শ্রীজীব গোস্বামীর অধিকাংশ নাটক 'গণনাট্য' 'প্রসেনিয়াম' পত্রিকার মধ্যে আবদ্ধ আছে। তাঁর গ্রন্থাকারে নাটকের বইগুলি হচ্ছে—'ফুলওয়ালী', 'তেলেঙ্গানা', 'শঙ্খচূড় ও অন্যান্য তিনটি নাটক'। 'সমুদ্রের কান্না', 'দুই তরঙ্গ', 'শানদেওয়া কাস্তে', 'মেঘবাহার পালা', 'আলোর ঠিকানা', কিছু গল্পের নাট্যরূপ যেমন শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী', সুশীল জানার 'বার্তাবহ'—এই হচ্ছে তাঁর মোটামুটি নাটক। তিনি দুটি যাত্রার পালাও লিখেছেন। মেদিনীপুরে কিছু যাত্রাপালা লেখা হয়েছে যেমন বঙ্কিমবিহারী পাল, সুরেশচন্দ্র রায়, বীরবর কিন্তু ওইগুলি অধিকাংশই পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক। রাজনৈতিক ও সমাজবিপ্লব সহায়ক বিষয় অবলম্বন করে যাত্রাজগতে ইদানীং যে নবজীবন সঞ্চার করা হয়েছে তার সার্থক অনুসারী হিসেবে মেদিনীপুর জেলায় শ্রীজীব গোস্বামীর নাম সর্বাগ্রে করতে পারি। উত্তর কোরিয়ার একটি অপেরাধর্মী বিপ্লবী কাহিনী 'The flower girl'কে যাত্রাপালায় 'ফুলওয়ালী' নামে তিনি রূপান্তরিত করেছেন। তেলেঙ্গানার কৃষক সংগ্রামকে কেন্দ্র করে তিনি 'তেলেঙ্গানা' নামে একটি পালা রচনা করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ায় স্তালিনের নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধের যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তারই পটভূমিকায় 'জোয়া' নাটক গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে রাখাল মণ্ডলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকায় তাঁর 'সংগ্রাম' নাটকটি স্মরণীয়।

'কৃষ্টিসংসদ' নামে একটি দল গঠন করে (ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শাখা) শ্রীজীব তাঁর রচিত নাটক ও যাত্রাপালা পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অভিনয় করিয়ে বিপুল প্রশংসা অর্জন করেছেন। আজকের সমস্যা থেকেই তিনি তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন আর তার মধ্যেই তিনি মুক্তি খোঁজেন। জেলার সর্বত্র সৌখিন নাটকের দল রয়েছে, তাঁরা কিছু কিছু নাটক অভিনয় করে থাকেন, অভিনীত নাটকগুলি কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বরচিত হয়ে থাকে। নাটক প্রযোজনা, অভিনয় অর্থাৎ টেকনিকের বিভিন্ন দিকগুলির ওপর বিদগ্ধ আলোচনা করেছেন পবিত্র সরকার 'নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ' গ্রন্থে। নাটকের কলাকৌশলের ওপর বিদগ্ধ আলোচনায় তিনি ছাড়া আর কেউ উল্লেখযোগ্য নন।

অপরাপর ভাষায় সাহিত্য চর্চা

সাঁওতালি সংস্কৃত হিন্দি ইংরেজি সাহিত্যে মেদিনীপুরের লেখকরা যে সাধনার স্বাক্ষর রেখেছেন তার পরিচয় খুব বেশি আমাদের জানা নেই।

আদিবাসী সাহিত্যের জনক সাধু রামচাঁদ মুর্মুর জন্ম মেদিনীপুর জেলার বিনপুর থানার কামারবাঁদি গ্রামে (১৮৯৮, ১ মে)। সারাজীবন এই গ্রামে থেকেই সাহিত্য রচনা করেছেন। সাঁওতাল সমাজে তাঁর সাহিত্য জাতীয় সাহিত্যরূপে সম্মানিত। তাঁর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব সাঁওতালি ভাষার লিপি তৈরি করে সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর গান ও কবিতা পশ্চিমবঙ্গ বিহার ওড়িশা ও অসমের সাঁওতালদের মুখে মুখে শুনতে পাওয়া যায়। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'লিটা গোড়েত' সাঁওতাল সমাজে মহাকাব্যরূপে পঠিত হয়। 'সারিধরম সেরেঞ্ঞ পুঁথি' (১-২), 'অনড়হেঁ ইশরড়', 'সংসার ফেঁদ' নাটক প্রভৃতি তাঁর প্রধান গ্রন্থ। তাঁর কিছু গ্রন্থ সম্প্রতি সাধু রামচাঁদ মুরমু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ঝাড়গ্রাম থেকে সাঁওতালি ভাষা বাংলা অক্ষরে রূপান্তরিত করে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ডিমাই সাহিজের ৩০৮ পৃষ্ঠার একটি বই বেরিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর গান ও কবিতার একটি সংকলন 'অনল মালা' নামে প্রকাশ করেছেন। ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে রামচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁর জন্মশতবর্ষে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ মেদিনীপুর জেলা কমিটির ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'শব্দের মিছিল' সাধু রামচাঁদ মুরমু বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন। এই সংখ্যায় সাঁওতাল সাহিত্যের বিশেষজ্ঞরা বাংলাভাষায় রামচাঁদের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছেন। এই সংখ্যাটি এখন পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে একমাত্র নির্ভরযোগ্য সংকলন। সাঁওতালি ভাষার লেখক বৈদ্যনাথ মাণ্ডির 'তারাস', 'অলঃদুরাং', 'জ-বাহা', 'দু পুলাড়্', 'সারেচ-আঁশ' প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। তিনি নিজের সমাজ সম্পর্কে বাংলা ভাষায় দুখানি মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেছেন—'সাঁওতয়ালী লেখক সংস্কৃতি', 'লোকায়ত সমাজজীবনে আদিবাসী'। রূপচাঁদ হাঁসদা সাঁওতালী ভাষায় শ্রীমদভাগবতগীতার অনুবাদ দু'খণ্ডে করেছেন 'মোড়ে সিঞ

আদিবাসী সাহিত্যের জনক সাধু রামচাঁদ মুর্মুর প্রতিমূর্তি

টুলো পণ্ডিতদের দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত এবং একজন প্রকৃত পণ্ডিতের লেখা হয়েছে। দ্বিতীয় বইটিতে নারী স্বাধীনতা যাকে আমরা ইদংনীং Women Lib বলে থাকি বেদ নারীকে সেই স্বাধীনতা কতটা এবং কিভাবে দিয়েছে তার বিশ্লেষণ আছে। সংস্কৃত পুরাণের অনুবাদ হয়েছে যেমন নীতীশ ভট্টাচার্য 'গরুড় পুরাণ' অনুবাদ করেছেন, নমিতা চক্রবর্তী সংস্কৃত ক্লাসিক নাটককে গল্পাকারে 'সংস্কৃত নাটকের গল্প' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তিনিও কিছু সংস্কৃত নাটক বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় রামকানাই তর্কভূষণ 'কৃষি সম্ভবম্' কাব্য, পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ 'প্রমদ্বরা' একাংক নাটক 'কথাবোধ' ও 'ঈশপীয় নীতি-কথা' নামে যুক্তাক্ষর বর্জিত সংস্কৃত গল্পের বই রচনা করেন। সতীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ 'মুদ্রারাক্ষস', রমেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ 'কাদম্বরী'র টীকাকার ছিলেন। লক্ষ্মীকান্ত মিশ্র রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতার সংস্কৃতে ভাবানুবাদ 'নির্ঝর শিখরম্' গ্রন্থে করেছেন। তাঁর নিজস্ব 'বাণীদূতম্' নামে একটি খণ্ডকাব্য রয়েছে। ড. অরুণা হালদার (১৯১৮-১৯৯৮) সংস্কৃত ভাষায় ভারতবিদ্যার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন এবং সেগুলি দেশ-বিদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মনোরঞ্জন করেছে। তিনি লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিজ্ঞান, ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার আমন্ত্রিত অধ্যাপিকা ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার্থীদের কাছে সহজসাধ্য করে তোলার জন্য যে বইটি প্রতিটি ছাত্রকে পড়তে হয় সেই অবিস্মরণীয় 'Helps to the study of Sanskrit'-এর লেখক জানকীনাথ শাস্ত্রী এই জেলার ঘাটাল মহকুমার পাইকমাজিটার চট্টোপাধ্যায় বংশের সন্তান।

মোড়ে ত্রিদা'। 'মিৎ জড় কলম', 'হিহিড়ি পিপিড়ি' তাঁর কাব্যগ্রন্থ।

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙলায় সংস্কৃত চর্চা স্বাভাবিক কারণে ব্যাপক হয়নি। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃতের প্রসার যেভাবে হয়েছে ঠিক সেই অনুপাতে বাঙলায় ততটা হয়নি। বাঙলায় যেটুকু হয়েছে তার জন্য মেদিনীপুর একটি গৌরবময় অংশ দাবি করতে পারে। এই জেলায় সংস্কৃত ভাষায় কাব্য নাটক ইত্যাদি রচিত হয়েছে। মেদিনীপুর জেলায় কিছু কিছু সংস্কৃত পঠন পাঠনের চতুষ্পাঠী এখনও আছে যেগুলি এখনও দেবভাষার ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। এই চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতরাই প্রধানত শিক্ষাদান প্রসঙ্গে কিছু গ্রন্থ লিখেছেন। সংস্কৃত ভাষায় যেমন লিখেছেন তেমনি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ এবং ওই সম্পর্কে আলোচনা গ্রন্থও লিখেছেন। নীলকণ্ঠ মজুমদার (গীতারহস্য) রামজয় তর্কালঙ্কার (সাংখ্যভাষ্য সংগ্রহ) রামদয়াল মজুমদার (গীতা পরিচয়) কুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায় (বেদস্তুতি), সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (পুরোহিত দর্পণ) প্রধানত সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা মূল সংস্কৃত থেকে বেদ, গীতা, সাংখ্যের ভাষ্য ও পূজা পদ্ধতি বাংলা ভাষায় রচনা করেছেন। তাঁদের ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে পরাগরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 'বেদ পরিচিতি', 'বেদ সংহিতায় নারী' বই দুটি রচনা করেছেন। প্রথম গ্রন্থে বেদ কী, বেদের উৎপত্তি, বৈদিক সাহিত্য, বেদাঙ্গ, বেদ পাঠের বিভিন্ন প্রণালী, বেদের কাল নির্ণয়, ধর্ম ও দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে বেদের মূল্যায়ন তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে করেছেন। তিনি সংস্কৃত পণ্ডিতদের মতো বেদের প্রতি অপরিসীম ভক্তি নিয়ে ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নে অগ্রসর হননি ; তিনি প্রধানত মানবিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বেদের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন ফলে তাঁর বইটি

ছায়াবাদ যুগের অর্থাৎ আধুনিক হিন্দি সাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠি যিনি 'নিরালা' নামে খ্যাত তাঁর জন্ম তমলুকের মহিষাদলে। তাঁর কবিতায় বাংলা সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর ঋণ স্পষ্টোচ্চারিত, বিশেষ করে ছন্দ শৃঙ্খল ভেঙে হিন্দিতে গদ্য কবিতার প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথের ছন্দ থেকেই নেওয়া। কবির গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ বিষয়ক অর্ধশতাধিক গ্রন্থ তাঁর আছে। ভারতবিদ্যাবিষয়ক গবেষণাধর্মী অনেক প্রবন্ধ অরুণা হালদার হিন্দি ভাষাতে রচনা করেছেন।

বাংলা সংস্কৃত হিন্দি ছাড়া ইংরেজি ভাষাতেও মেদিনীপুরের লেখকগণ উল্লেখযোগ্য চর্চা করেছেন। মেদিনীপুরের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে সোহরাওয়ার্দী পরিবারের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই পরিবারের পূর্বপুরুষ পারস্য থেকে ভারতে আসেন এবং মেদিনীপুরে বসতি স্থাপন করেন। এই বংশের প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে কৃতি। প্রাচ্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত আইনবিদ স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দি (১৮৮০-

১৯৩৫) মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯০৫ সালে লন্ডনের আর্কিবল্ড কনস্টেবল অ্যান্ড কোং নামক বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা থেকে তাঁর The Sayings of Muhammad' বইটি বেরোয়। তখনও তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হয়নি। এই বইটি তলস্তয়ের (১৮২৮-১৯১০) প্রিয় ছিল—মৃত্যুর পর বইটি তাঁর জামার পকেট থেকে পাওয়া গিয়েছিল। আবদুল্লাহ্ সাহেবের বাকি পুস্তকের মধ্যে 'The Moslem Law of Marriage and Inheritance', 'A History of Moslem Legal Institution', 'Outlines of the Historical Development of Muslim Law' আলেকজাণ্ডার ডেভিড রাসেলের সঙ্গে Handbook of Muslim Jurisprudence' সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রধান ছিলেন, সিনেট সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য ও ওই সভার সহসভাপতি ছিলেন। তাঁর ভ্রাতা হাসান সোহরাওয়ার্দি চিকিৎসা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সুনাম ও খ্যাতির অধিকারী ছিলেন—তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন। তাঁদের ভাগ্নে পাণ্ডিত্যের কিংবদন্তি পুরুষ বহু ভাষাবিদ সাহেদ সোহরাওয়ার্দী অক্সফোর্ডের ইংরেজি সাহিত্যের এম এ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, দিলীপকুমার রায়, বিষ্ণু দে, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অপূর্ব চন্দের বন্ধু ছিলেন। 'পরিচয়' গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন—'পরিচয়' মাসিক পত্রের প্রথমের দিকে তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধের কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজি ভাষায় তিনি সারাজীবন লেখনি চালনা করেছেন। ইংরেজি ভাষায় তাঁর কিছু প্রবন্ধ প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন 'Prefaces' (1938), Essays in verse'। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শিল্পী যামিনী রায় সম্পর্কে তিনিই সর্বপ্রথম আলোচনা (The Art of Jamini Roy P115-138) করে তাঁর শিল্পকলার প্রতি বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন—সেটি Prefaces গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ ছাড়া বাটোল্ডের মূল রুশ থেকে Musalman Culture গ্রন্থের অনুবাদ ইংরেজি ভাষায় করেন। পাণ্ডিত্যের তুলনায় তিনি কিছুই লেখেননি বলতে হবে।

ইংরেজি ভাষায় মেদিনীপুর জেলার ইতিহাস লিখেছেন নরেন্দ্রনাথ দাস (History of Midnapore 1-3, Fight for Freedom in Midnapore 1928-38), গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায় (History of Bagree Rajya, Midnapore–The Forerunner of India's freedom struggle), মহেন্দ্রলাল খান (History of Midnapore Raj) ম জেলার রাজবংশের ইতিহাস লিখেছেন, রীনা পাল স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরের মহিলাদের অবদান (Women of Midnapore in Indian freedom struggle), বিয়াল্লিশের আন্দোলনের কাহিনী লিখেছেন সতীশচন্দ্র সামন্ত (August Revolution and two years of National Govt. in Midnapore), ক্ষুদিরামের জীবনী লিখেছেন ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র (The Revolutionary Boy of India), খড়্গপুরের রেলওয়ে শ্রমিক আন্দোলনের ওপর গবেষণা করেছেন শ্যামাপদ ভৌমিক (History of Bengal Nagpur Working class Movement 1905-47 with special Reference to Kharagpur)। জেলার অধিবাসীদের নিয়ে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করেছেন মহেন্দ্রনাথ করণ (A short History and Ethnology of the cultivating Pods), প্রবোধকুমার ভৌমিক (The Lodhas of West Bengal : A Socio-Economic study, Socio-Cultural Profile of frontier Bengal, Occultism in frienge Bengal)। লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন প্রদ্যোৎকুমার মাইতি (The Goddess Monasa : A socio-cultural study) মন্দির সম্পর্কে গবেষণা করেছেন গঙ্গাধর সাঁতরা (History of Midnapore Temples) ও প্রশান্তকুমার মণ্ডল (Interpretation of Terracottas from Tamralipta)। তাম্রলিপ্ত বন্দর সম্পর্কে গবেষণা করেছেন হিমাংশুভূষণ সরকার (The Port of Tamralipta in fiction and History)। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব নিয়েও তাঁর বই আছে (Indian influence on the Literature of Java and Bali, Indian cultural Relation for Indian and North-East Asia, Cultural Relation between India & South-East Asian countries, Trade and Commercial Activities of Southern India in Malaya Indonesia, Corpus of the Inscription of Java)। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠি তাঁর অধিকাংশ ভাবনাচিন্তা ইংরেজি ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করেছেন—Extremists challange, Trade and Finance in the Bengal Presidency 1793—1833, Vidyasagar the Traditional Modernism তাঁর উল্লেখযোগ্য বই। উপেন্দ্রনাথ বলও (১৮৮৩—১৯৪৭) ইতিহাস সম্পর্কীয় রচনা ইংরেজিতেই লিখেছেন A short History of Brahmo Samaj 1828—1928, Raja Rammohan Roy, Ancient India, Mediaeval India, Modern India, Indian Administration, Europe since Waterloo etc। বিনোদশঙ্কর দাশ জঙ্গলমহল বিক্ষোভ নিয়ে গবেষণা করেছেন Civil Rebellion in Frontier Bengal তাঁর নামকরা বই। এ ছাড়া ওড়িশার ইতিহাসও রচনা করেছেন Glimpses of Orissa, studies in Economic History of Orissa. বাংলা গদ্য বিষয়ে গবেষণা করেছেন শিশিরকুমার দাশ (Early Bengali Prose) গ্রন্থাগার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন পীযূষকান্তি মহাপাত্র (Folklore Library) অলডাস হাকস্লের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন (Aldous Huxley : The Philosopher and Novelist) ; ভারতীয় লেখক যাঁরা ইংরেজি সাহিত্যচর্চা করেছেন তাঁদের নিয়ে আলোচনা করেছেন তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় (Janus face)। জাঁ পল সাত্রের দর্শন
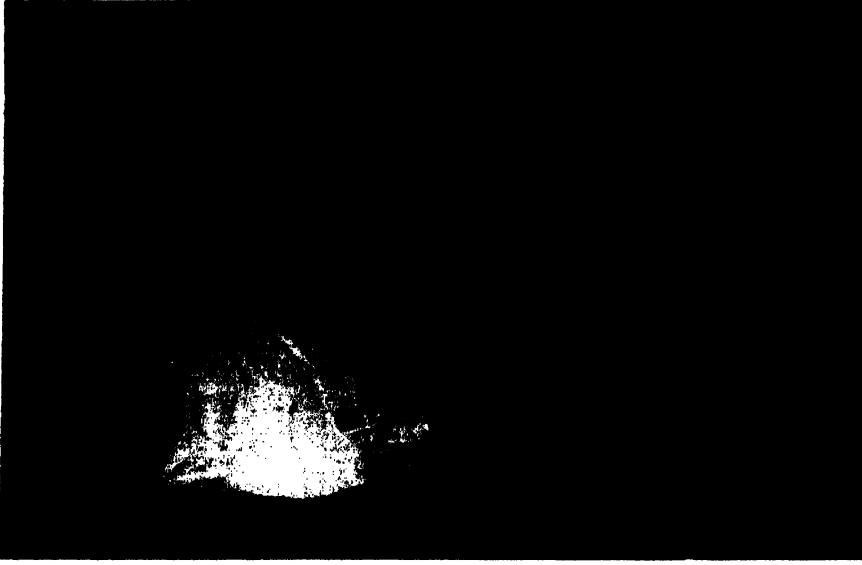
আদিবাসী সাহিত্যসভা, কবি সম্মেলন ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতারত মন্ত্রী উপেন কিস্কু, মঞ্চে উপবিষ্ট পবিত্র সরকার ও সুধীপ্রধান

পত্র-পত্রিকা :

মেদিনীপুর জেলার সংবাদনির্ভর ও নির্ভেজাল সাহিত্য পত্রিকা অজস্র বেরিয়েছে এবং এখনও প্রচুর বেরোয়। কিন্তু গুটিকয় সংবাদনির্ভর দৈনিক, সাপ্তাহিক ছাড়া আর সবই হয় অবলুপ্ত কিংবা অনিয়মিত। পত্রিকা নানা ধরনের নানা বিষয়ের বেরিয়েছে। কবিতার কাগজ লিটল ম্যাগাজিন মিনি পত্রিকা যখন যে ঢেউ উঠেছে তখন সেই ঢেউ মেদিনীপুরের সংস্কৃতি মানসকে ধাক্কা দিয়েছে।

বাংলা সাময়িক পত্রিকা প্রথম বেরোয় ১৮১৮ সালে মার্সম্যানের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে 'দিগদর্শন' ও সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ'। সাহিত্যপ্রধান পত্রিকা ছিল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের

নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রভাকর সেনগুপ্ত (Person, Existence & Freedom)। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা ডঃ অরুণা হালদার (১৯১৮—১৯৯৮) বসুবন্ধু রচিত 'অভিধর্মকোষঃ : ভাষ্যম' (১৯৭৫) সম্পাদনা করে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের ওপর নতুন করে আলোকপাত করেছেন। Some 'Psychological Aspects of Early Buddhist Philosophy Based on Abhidharmakosa of Vasubandhu' ১৯৮১ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। অভিধর্মকোষে বিস্তৃত টীকার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, তার শিক্ষানীতি তথা সাহিত্য দর্শন পালি-প্রাকৃত-ভাষাতত্ত্ব আলোচনা এমন নিপুণভাবে করেছেন যে তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি একটি নতুন গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। ইংরেজিতে যাকে source material বলে সেই material-এর সাহায্যে গ্রন্থটির সম্পাদনা ও দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করেছেন। বহু source material-এর মধ্যে তাঁর গ্রন্থটিও একটি মূল্যবান আকর গ্রন্থরূপে মর্যাদা পেয়েছে। তিনি সংঘাতী বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ইংরেজি ভাষায় তিন খণ্ডে ভারতীয় চিন্তাধারার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে এক বিশাল গ্রন্থ রচনায় মগ্ন ছিলেন—কাজটা কত দূর এগিয়েছিল বলতে পারব না। বিজ্ঞান ও অঙ্কের সূত্র নিয়ে সূর্যেন্দুবিকাশ কর মহাপাত্র, পুলিনবিহারী সরকার (১৮৯৪—১৯৭১), অনিল গায়েন প্রমুখ ইংরেজি ভাষায় বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। বাংলা ভাষা ছাড়া সংস্কৃত হিন্দি ইংরেজিতে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে মেদিনীপুরের বাহাদুরী বড় গলায় জাহির করার বিষয় না হতে পারে তবে যেটুকুর বিবরণ দেওয়া হল তার মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে উৎসাহী হবার মতো বিষয় থাকতে পারে।

'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩০)। মেদিনীপুরের প্রথম পত্রিকাটি ছিল সংবাদপত্র। জেলা কালেক্টর এইচ ভি বেলির পৃষ্ঠপোষণে ১৮৫১ সালে প্রকাশিত 'Midnapore and Hijli Guardian.' মেদিনীপুর ও হিজলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ।' পত্রিকাটি দ্বিভাষিক ছিল। সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ১৮৭৪ সালে জেলার প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা 'তমোলুক পত্রিকা' তমলুক থেকে ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিতের সম্পাদনায় বেরোয়। এর দু'বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' বেরিয়েছে। ১৮৭২ সালে জেলা থেকে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সম্পাদনায় সঙ্গীত সম্পর্কে মাসিকপত্র 'সঙ্গীত সমালোচনী' বেরোয়—সঙ্গীতের ওপর বাংলা ভাষায় প্রথম পত্রিকা। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী নিজে একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর রচিত গ্রন্থ 'ঐকান্তিক স্বরলিপি', 'মৃদঙ্গ মঞ্জরী', 'কণ্ঠকৌমুদী', 'সঙ্গীত সার' সঙ্গীত জগতে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছিল। ১৮৭৭ সালে হৃদয়নাথ দাসের সম্পাদনায় সংবাদপ্রধান পাক্ষিক 'মেদিনীপুর সমাচার', ১৮৭৯ সালে অখিলচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'মেদিনী', ১৮৯৮ সালে দেবদাস করণের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'মেদিনী বান্ধব' বেরিয়েছিল।

নির্ভেজাল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা কাঁথি থেকে ১৮৯৬ সালে তারকগোপাল ঘোষ, বারাণসী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গিরিজা বসুর তত্ত্বাবধানে 'কান্তি' বেরোয়—পত্রিকাটির আয়ু ছিল মাত্র এক বছর। ১৯০৬ সালে রামদয়াল মজুমদারের সম্পাদনায় মাসিক 'উৎসব', ১৯১১ সালে প্রসন্নকুমার ঘোষের সম্পাদনায় মাসিক 'সুরভি' বেরোয়। 'সুরভি' বছর চারেক চলেছিল। প্রসন্নকুমার নিজে ছিলেন কবি, তাঁর 'কুসুমকলিকা' নামে কাব্যগ্রন্থ ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্র সেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। ১৯২২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

থেকে মনীষীনাথ বসু সরস্বতীর সম্পাদনায় মাসিকপত্র 'মাধবী' বেরোয়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে যেমন সতীশচন্দ্র আঢ্যের 'পূজায় বৈচিত্র্য ঝাঁপান' মূল পরিষদ পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। 'মাধবী' পত্রিকা একাদিক্রমে ছ' বছর চলেছিল, তারপর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ১৯৪০ পর্যন্ত চলে। 'মাধবী' যখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল তখন রাসবিহারী রায়ের সম্পাদনায় 'মেদিনীবাণী' ১৯৩৮-এ এবং প্রমথনাথ পালের সম্পাদনায় ১৯৪৪-এ মাসিক 'প্রভাত', ১৯৪৭-এ সুহৃদ রুদ্র কলকাতা থেকে বের করেন উচ্চমানের সাহিত্যপত্র মাসিক 'দ্বন্দ্ব', প্রতাপচন্দ্র রায় ১৯৪৭-এ ত্রৈমাসিক 'কালান্তর' বের করেন। 'দ্বন্দ্ব' 'কালান্তর' পত্রিকার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত লেখকরা জড়িত ছিলেন। এই দুটি পত্রিকায় জেলার গন্ধ ছিল না। প্রধানত কলকাতার প্রখ্যাত লেখকরাই ওই কাগজ দুটিতে লিখতেন। ইতিমধ্যে কাঁথি থেকে মধুসূদন জানার সম্পাদনায় সংবাদনির্ভর সাপ্তাহিক 'নীহার' ১৯০১ সালে, তমলুক থেকে শ্রীধর অধিকারীর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক তমালিকা ১৯০৩ সালে, মেদিনীপুর শহর থেকে মন্মথনাথ নাগের সম্পাদনায় 'মেদিনীপুর হিতৈষী' ১৯০৭ সালে, সাতকড়িপতি রায়ের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'সত্যবাদী' ১৯২২ সালে বেরোয়। সংবাদনির্ভর সাপ্তাহিক আরও অনেক বেরিয়েছে। এগুলির মধ্যে ১৯৪২ সালে 'প্রদীপ', ১৯৪৭ সালে 'স্বরাজ ও সংগঠন', ১৯৫২ সালে পাক্ষিক 'মেদিনীপুর পত্রিকা' ১৯৫৩ সালে সাপ্তাহিক 'মেদিনীপুরের কথা' বেরোয়। শেষোক্ত পত্রিকা প্রধানত বামপন্থী ছিল। তখনকার অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র ছিল। কলকাতার দৈনিক স্বাধীনতার আদলে সাপ্তাহিক পত্রিকাটির সংবাদাদি সাজানো হত। পত্রিকার শারদ সংখ্যা রচনা ও চিত্রণের বৈচিত্র্যে জেলার পত্রিকা ঐতিহ্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। বর্তমানে উক্ত পত্রিকাগুলি লুপ্ত। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ভাবধারায় উদ্দীপ্ত হয়ে স্বদেশরঞ্জন দাস ১৯৩২ সালে সাপ্তাহিক দিনমজুর, ১৯৩৫ সালে 'বিশ্ববার্তা', ১৯৪৩ সালে 'জনতা' বের করেন। ইংরেজি (খড়্গপুর টাইমস ১৯৫২ পাক্ষিক, খড়্গপুর এক্সপ্রেস সাপ্তাহিক) হিন্দি (সমাচার ক্রান্তি খড়্গপুর) তেলেগু ও সাঁওতালি (হাড়িয়া সকাম, দেবনী তিনগুণ) ভাষায় দু-একটি সাপ্তাহিক পাক্ষিক সংবাদপ্রধান পত্রিকা বেরিয়েছে। তমলুক হলদিয়া থেকে তমালিকা পণ্ডা শেঠের সম্পাদনায় সংবাদ সাপ্তাহিক 'আপনজন' বেশ দাপটের সঙ্গে ১৬ বছর ধরে বেরুচ্ছে। মাঝে মিনি পত্রিকার যে চল উঠেছিল তার নিদর্শনও পাওয়া যায়। খড়্গপুর থেকে 'উতরোল' নামে মাসিক মিনি পত্রিকা মাস ছয়েক চলেছিল। দৈনিক কাগজও মেদিনীপুর শহর থেকে 'উপত্যকা' 'বিপ্লবী সব্যসাচী' 'মেদিনীপুর টাইমস', 'ছাপা খবর' 'মেদিনীপুর বার্তা', কাঁথি থেকে 'দৈনিক চেতনা' 'তীরভূমি' বেরুচ্ছে।

সাপ্তাহিক 'মেদিনীপুরের কথা' সংবাদনির্ভর পত্রিকায় যেমন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনেছিল তেমনি ক্ষীণজীবী দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'পিয়াসী' সাহিত্যপত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছিল। আধুনিক সাহিত্যের কলধ্বনি 'পিয়াসী'র মধ্যেই শোনা গিয়েছিল। সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক মাসিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা মাঝে-মধ্যে জেলার নানা জায়গা থেকে বেরিয়ে থাকে, কিছু উল্লেখযোগ্য রচনাও তাতে থাকে, সম্পাদনার বৈশিষ্ট্যও চোখে পড়ে। প্রধানত কবিতা ও কবিতা আলোচনামূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রণব মাইতির 'সাহিত্য সম্প্রতি' দীপক করের 'ধানসিঁড়ি' সমীরণ মজুমদারের 'অমৃতলোক' বিপ্লব মাজীর 'এই সময়' লক্ষ্মণ কর্মকারের ত্রৈমাসিক সৃজন' সূর্য নন্দীর 'এবং শায়ক', জহরলাল বেরার 'ল্যাকাটু', দেবাশিস প্রধানের' কবিতার কাগজ' রামরঞ্জন রায়ের 'প্রকৃত অঙ্গীকার' হরেকৃষ্ণ সাহুর 'লোককৃতি' পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ মেদিনীপুর জেলা শাখার ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'শব্দের মিছিল' প্রায় নিয়মিত বেরোয়। কিছু কিছু সাহিত্যপত্র চমক দিয়ে মিলিয়ে গেছে যেমন খড়্গপুরের 'বর্তিকা' 'তরুণদের মুখপত্র 'প্রতীক' ইত্যাদি। 'ডুলুং' 'উচ্চারণ' 'বেহুলা' এখনও অনিয়মিতভাবে কখনও-সখনও প্রকাশিত হয়।

সংবাদনির্ভর ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা ছাড়া বিশেষ বিষয়ের ওপর কিছু পত্রিকা বেরিয়েছে। পূর্বে সঙ্গীত বিষয়ক মাসিকপত্রের কথা উল্লেখ করেছি। ১৯৫০ সালে প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক 'শিক্ষাব্রতী' নামে শিক্ষা বিষয়ক মাসিকপত্র বের করেন, ১৯৫৫ সালে রঘুনাথ মাইতি আইন বিষয়ক মাসিক 'বাংলা আইন' ১৯৫০ সালে শ্রুতিনাথ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় কিশোরদের জন্য মাসিক সাহিত্যপত্রিকা 'এলাটিং বেলাটিং' 'সুসাথী' 'নয়ন', চলচ্চিত্র বিষয়ক 'টলিউড' 'মৃণাল' 'রূপযানী' 'প্রতিবিম্ব' (মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটির বার্ষিক মুখপত্র), বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা 'বিজ্ঞান মনীষা' চাষবাস সম্পর্কে 'পল্লী প্রচার' বেরিয়েছে। কৌতূহলি পাঠক জেলার পত্র-পত্রিকার প্রামাণ্য তালিকার জন্য 'বীক্ষণী' দেখতে পারেন।

কথা শেষ :

কথা শেষ হয়ে এল, কিন্তু সাহিত্যে শেষ কথা বলে কিছু নেই। জীবন ছোট সাহিত্য দীর্ঘ। মেদিনীপুরে যা সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তার হিসেব-নিকেশ করে দেখা গেল, জমার ঘরে কিছু ফসল উঠেছে। অনেক ফসলই তোলা হল না কিছুটা অসাবধানতায়, বেশ কিছু অজ্ঞতায়। সবকিছু স্বীকার করে যেটুকু তোলা হল সেটুকু আঞ্চলিকতার সংকীর্ণ বেড়া দিয়ে ঘেরা নয়, সেটি শুধু মেদিনীপুরের জন্য নয়, তার ভোগদখলের স্বত্ব সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পাঠক যাঁরা তাঁদেরই প্রীত্যর্থে নিবেদিত।

লেখক : গ্রন্থকার ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক
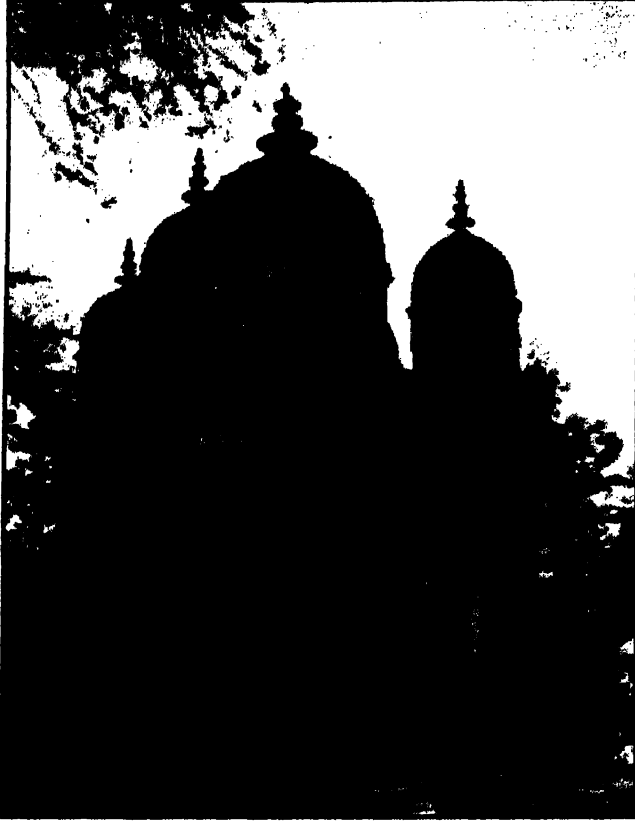
কৃষ্ণরায় জীউ-র পঞ্চরত্ন মন্দির, বগড়ি-কৃষ্ণনগর
ছবি : তারাপদ সাঁতরা

নারাণেশ্বর শিবমন্দির, শিয়ালসাই
ছবি : তারাপদ সাঁতরা
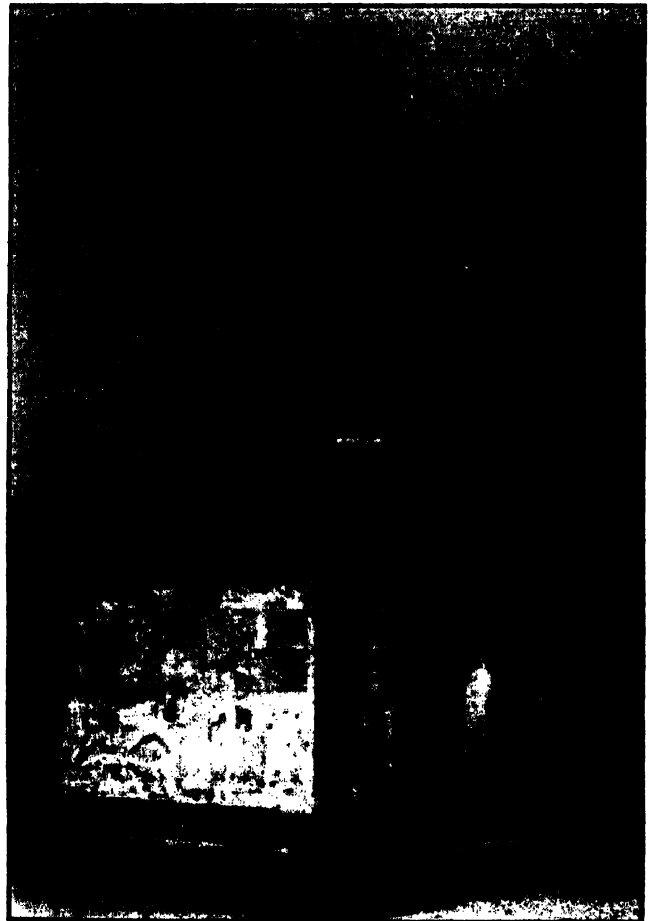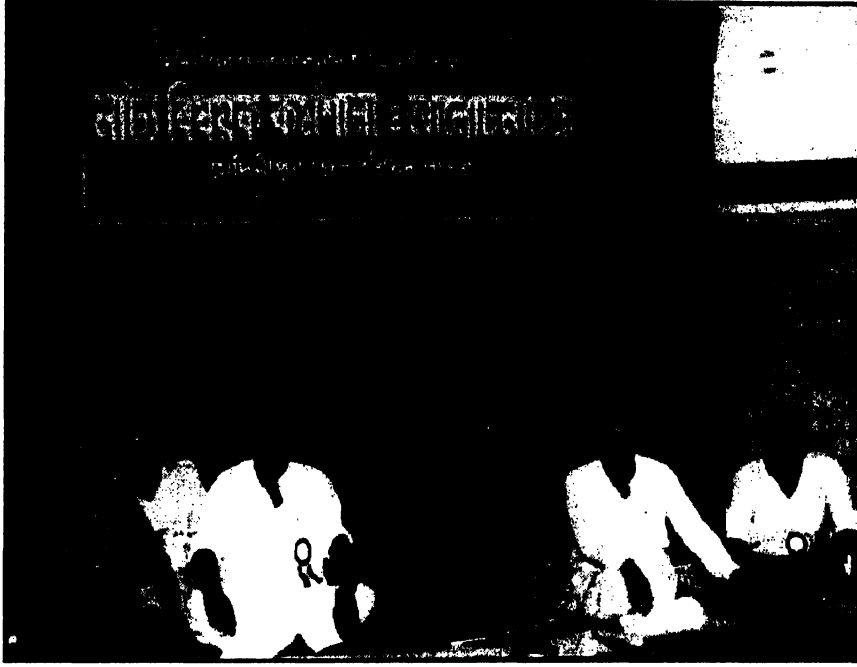
মেদিনীপুর জেলার সংস্কৃতি ও নাট্য আন্দোলন

বাসুদেব দাশগুপ্ত

নাটক মাধ্যমটি সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতিরই একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই কারণে, যে কোনও স্থান, এমনকি বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমাজের সংস্কৃতি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলেই যেমন নাট্যচর্চার প্রসঙ্গ আসতে বাধ্য, আবার বিপরীতভাবে নাট্যচর্চার প্রসঙ্গে আলোচনা টানতে গেলে প্রাথমিকভাবে স্থানটির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করা একান্ত দরকার।

মেদিনীপুর জেলার নাট্য আন্দোলনের একটা প্রামাণিক রেখাচিত্র উপস্থিত করার আগে তাই এই জেলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে দু'চার কথা বলতেই হয়। আবার যেহেতু মেদিনীপুরে নাটক তথা থিয়েটারধর্মী নাট্যচর্চার শুরুটা হয়েছে উনবিংশ শতকের শেষ অংশে, আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায় ১৮৭৪-৭৫ সালে ; তাই জেলার সাংস্কৃতিক জগতটাও ঠিক ওই সময় থেকেই দেখার চেষ্টা করা দরকার।

"যে মেদিনীপুরের বক্ষে বসিয়া দ্বিজ রামেশ্বর শিবায়ণ রচনা করিয়া ভক্তিরঙ্গের পুলকে বঙ্গদেশ এতদিন মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, যে মেদিনীমাতার শ্যামল বনানীর নিভৃত অঙ্কে কত কবিরগান রচয়িতাগণ উদ্দাম হাস্যরসের সহিত প্রগাঢ় কবিত্ব শক্তির সমন্বয় সাধন করিয়া বাঙ্গালা দেশের মধ্যে মেদিনীপুরের নিজস্ব গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যে দেশের যাত্রা, কথকতা, তরজা, ঝুমুর প্রভৃতি গানের দল বিমল আনন্দ অনুষ্ঠানের উৎসব রজনীর প্রতি দীপশিখাকে হাসির প্রভায় অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া দিত,

উনবিংশ শতাব্দীর সেই সেকালের হাসিরাশির পার্শ্বে মেদিনীপুরে কিরূপে নবভাবধারায় নাট্যরঙ্গের প্রতিষ্ঠান সকল গড়িয়া উঠিয়াছিল, কোনও লিখিত আখ্যায়িকার অভাবে তাহার ইতিবৃত্ত আজ মূক ও নীরব" [*চারুচন্দ্র সেন—নাট্যরঙ্গে মেদিনীপুর*]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর শাখার তৎকালীন মুখপত্র 'মাধবী'তে প্রকাশিত এবং ১৯৭৩ সালে মেদিনীপুর বঙ্গরঙ্গমঞ্চ শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির স্মারক গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত রচনাটির উদ্ধৃতি একটু বড় করে তুলে দেবার কারণ হল উনবিংশ শতকের শেষাংশে মেদিনীপুরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের একটা চিত্র এতে পাওয়া যেমন যাচ্ছে, তেমনই চারুবাবুর উক্তিতেই জেলার ওই সময়কার নাট্যচর্চার তেমন কোনও ইতিহাস ছিল না। চারুবাবুই প্রথম এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করেন এবং অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন, যা তাঁর রচনায় লিপিবদ্ধ করেছেন, তাই জেলার নাট্যচর্চা সম্পর্কে আলোকপাত করার সময় শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র সেনের এই রচনাটির কিছু তথ্য বর্তমান লেখকেরও প্রয়োজন হবে।

জেলার সংস্কৃতি :

একটি বিষয় দায়িত্ব নিয়েই বলা যায় যে মেদিনীপুরের সাংস্কৃতিক জগৎটি খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ ও মূল্যবান সম্পদে ভরা। শুধু 'শিবায়ণ'ই নয়, মেদিনীপুর একদিকে বাংলার আদি সঙ্গীত কীর্তন ছাড়াও শীতলামঙ্গল, রাম-রসায়ন, মনসামঙ্গল, সত্যপীরের গান, যুগীযাত্রা, ললিতাপালা, গদাভারত ইত্যাদি নানা শিল্পের সৃষ্টিতে উজ্জ্বল ছিল। মেদিনীপুর জেলার কবিওয়ালারা সারা বাংলার সম্পদ হিসেবে আজও বিবেচিত। এই জেলার 'জাড়া' ছিল কবিগানের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়পুষ্ট রাজা ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রধানত পৌরাণিক বিষয়বস্তুকে নিয়েই এইসব শিল্পমাধ্যমগুলির বিকাশ ঘটলেও, আবার রাজা-জমিদারদের বিকৃত রুচি ও লালসা তৃপ্তির উপাদান জোগাতে কবিগান যেমন প্রায়শঃই আদিরসাত্মক কথা ও গানে ভরে উঠত, তেমনই ওই জমিদার শ্রেণিগুলির লালসাসিক্ত রুচির উপাদান হিসেবেই সৃষ্ট নটুয়া, খেমটা, চিড়িয়া-চিড়িয়ানি, ঢপ ইত্যাদি উপাদানগুলিও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে পড়ে একটা সময়। কিন্তু এত সাংস্কৃতিক ধনসম্পদের অধিকারী মেদিনীপুর জেলাতে একটা অদ্ভুত বৈপরীত্যের দিক রয়ে গেছে। তা হল, ধ্রুপদী, মার্গ ও রাগসঙ্গীতের ক্ষেত্রে মেদিনীপুর জেলায় কোন বিশিষ্টতার দাবি করার মতো কৃতী শিল্পীর খোঁজ পাওয়া যায়নি। একমাত্র ব্যতিক্রম হল মহিষাদল রাজ-পরিবার, যাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই সম্পদটিকে রক্ষা ও বিকশিত করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। বিশেষত রাজা দেবপ্রসাদ গর্গবাহাদুরের নামটিই এক কথায় সুপরিচিত। সঙ্গীতানুরাগী হিসেবে বর্তমান লেখকও তার বাল্যকালেই এই নামটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। তবুও বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, যা কিনা এই জেলার প্রায় এক উঠোনের

মেদিনীপুর জেলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০০

প্রতিবেশী, সেই বিষ্ণুপুর ধ্রুপদ ও রাগসঙ্গীতে যে একটা নতুন ঘরানার সৃষ্টি করেছিল, মেদিনীপুর সেরকম কোনও দাবি আজও করতে পারেনি।

রাজা-জমিদার আশ্রিত মেদিনীপুর জেলার এই সাংস্কৃতিক সম্পদের পাশেই আর একটি বিশাল ও অসাধারণ সংস্কৃতির ভাণ্ডার মেদিনীপুরকে বিশিষ্টতা প্রদান করেছে। এই সম্পদ হল লোকসংস্কৃতির মূল্যবান হীরেমুক্তো। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর তার আশ্রিত রাজা ও জমিদারকুলের সীমাহীন শোষণ ও অত্যাচারে ন্যুব্জদেহ গ্রামীণ শোষিত কৃষিজীবী মানুষ একদিকে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় ভাবনা, সামাজিক সংস্কার বা কুসংস্কারকে উপজীব্য করে, অপরদিকে তাদের জীবন যন্ত্রণার ক্ষোভকে মিশিয়ে, সৃষ্টি করেছে ঝুমুর, টুসু, ভাদু, কাঠিনাচ, পাতানাচ, ছৌ-নৃত্য ইত্যাদি অসাধারণ লোকশিল্প।

আবার এই সম্পদকে আরও বর্ধিত করেছে যুগযুগান্তের সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত ও বঞ্চিত সেই আদিবাসী উপজাতি মানুষের সৃষ্ট করম, বাহা, লাগুড়ে, ভূয়াং, ঝিকা, দং ইত্যাদি অনেক সঙ্গীত ও নৃত্যের অনবদ্য শিল্প পসরা। এই হল মেদিনীপুরের সাংস্কৃতিক আঙিনার বৈচিত্র্যপূর্ণ অবয়ব।

সময় ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে—১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলায় যে কৃষক জাগরণ দেখা দেয়, তার ঢেউ মেদিনীপুরের গ্রাম-গঞ্জকেও উত্তাল করে তোলে। তেভাগা সংগ্রামের ঐতিহ্য ত' ছিলই। তাই এই গণ-সংগ্রাম ও গণ-আন্দোলন একটা নির্দিষ্ট শ্রেণি দৃষ্টিকোণ থেকেই ছড়িয়ে পড়ে। উত্তাল আন্দোলন ও সংগ্রাম, শাসকশ্রেণিগুলির বারবার আক্রমণ গণহত্যা ও অত্যাচারের পর আবার দ্বিগুণ শক্তিতে এই গণ-সংগ্রাম যেমন বেগবান হয়, তেমনই এর ঢেউয়েই ১৯৭৭ সালে গঠিত হয় জনগণের সরকার, বামফ্রন্ট সরকার। এরপরের ইতিহাস শুধু অধিকার অর্জন, অধিকার রক্ষা। এরই পাশাপাশি গ্রামীণ জনগণের হাতে অর্পিত হল জীবনকে এগিয়ে নেবার অধিকার তথা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সে আলোচনার

কৃষ্টি সংসদ—১৯৭২। নাটক : বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, পরিচালনায় : শ্রীজীব গোস্বামী

স্থান অন্যত্র। এখানে শুধু এইটুকুই বলা যায় উনিশ শতকে সৃষ্ট মেদিনীপুর জেলার সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির একটা বড় অংশ এখনও বিদ্যমান। সামন্ততান্ত্রিক ভাবাদর্শে রচিত ধর্মীয় বা পৌরাণিক নানা বিষয় নিয়ে আজও যেমন কবি, তরজা, ঝুমুর, টুসু, ভাদু বা কাঠিনাচ, পাতানাচ, ছৌ-নৃত্য চলেছে, এরই পাশে আবার গণ-সংগ্রামের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এইসব শিল্পমাধ্যমসহ আদিবাসী শিল্পগুলির মধ্যে ঘটে গেছে বিরাট পরিবর্তন। প্রগতিশীল গণ-সংস্কৃতির ভাবধারায়, বলা যায় শোষিত মানুষের ভাবাদর্শে শ্রেণি-সংগ্রামের বিষয়বস্তুও ক্রমশ বেশি করে স্থান নিয়েছে পুরাতন প্রথাকে পাশে সরিয়ে দিয়ে।

শুধুমাত্র সংস্কৃতি আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করলে অগুণিত তথ্য ও প্রমাণ এই বক্তব্যের স্বপক্ষে হাজির করা যায়। কিন্তু যেহেতু মেদিনীপুরের নাট্য-আন্দোলনই এই আলোচনার বিষয়বস্তু, তাই জেলার সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা দেবার চেষ্টাই এখানে করা হয়েছে।

নাট্যচর্চা : আন্দোলন :

মেদিনীপুর জেলাতে থিয়েটার প্রথায় নাট্যাভিনয় শুরু হয় ১৮৭৫ সালে। বিশাল এই জেলায় তখনও রেললাইন চালু হয়নি। জেলাশহর মেদিনীপুরে আসতে হত লঞ্চ বা স্টিমারে। এই ১৮৭৫ সালে খড়্গাপুরের মালঞ্চ গ্রামের (বর্তমানে খড়্গাপুর পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত) জমিদার প্রিয়নাথ রায়ের বাড়িতে রথযাত্রা উপলক্ষে দুটি নাটক দু'দিন অভিনীত হয়। এই নাটকের পরিচালনা ও অভিনয়ে ছিলেন তৎকালীন ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র, পরবর্তীকালের যশস্বী চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সরকার। সুহৃদ ও সহপাঠী প্রিয়নাথ রায়ের বাড়িতে গ্রীষ্মের ছুটিতে এসে উনি মেদিনীপুর শহরের বল্লভপুর মহল্লায় সখের নাট্যদল গঠন করেন। ধনী জমিদার ও বনেদী পরিবারের মানুষরাই এই দলে যুক্ত হন। বল্লভপুর থেকে মালঞ্চ গিয়েই দু'দিন উক্ত নাটক দুটি এঁরা প্রযোজনা করেন।

এরপর ক্রমশ নাট্যাভিনয়ের উদ্যোগ সারা জেলাতেই ছড়িয়ে পড়ে। কবিগানের অত্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক জাড়া গ্রামের জমিদার যোগেন্দ্রনাথ রায়ের বাড়িতেও নাটক অভিনীত হয়। ১৮৭৬-৭৭ সালের কোনও এক সময়ে মেদিনীপুর শহরের চিড়িমারসাই অঞ্চলে রামগোবিন্দ নন্দীর বিরাট প্রাসাদের দ্বিতল 'হলে,' 'হরিশচন্দ্র', 'রামাভিষেক' নাটকসহ 'চক্ষুদান' নামে একটি প্রহসনও অভিনীত হয়। এই একই সময়ে তমলুক শহরে, ১৮৮৬ সালে 'পূর্ণচন্দ্র' নাটক দিয়ে থিয়েটারের শুরু। ১৮৭৬ থেকে ১৯৩০-৩২ পর্যন্ত এভাবেই মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে নাট্যচর্চা শুরু হয়। মহিষাদলের রাজভ্রাতা গোপালপ্রসাদ গর্গ একটি ড্রামাটিক ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে দুর্গামণ্ডপে একটি মঞ্চও স্থাপিত হয়। পাঁশকুড়ার পাশে বর্ধিষ্ণু গ্রাম রঘুনাথবাড়ির জমিদার মহান্তবাবুরা গভীর নাট্যানুরাগী হয়ে ওঠেন। ১৯৫৬-৫৭ সাল নাগাদ নিজগ্রামে থিয়েটার প্রচলন করতে গিয়ে বর্তমান আলোচক রঘুনাথবাড়ির মহান্তবাবুদের বাড়িতে যান। সেখানে থিয়েটার 'হল' বা মঞ্চই শুধু নয়, গ্যাসবাতি ও হ্যাজাক দিয়ে সৃষ্ট আলোক প্রক্ষেপণের ব্যবস্থা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন।

১৮৮১-৮২ সালে গোপালচন্দ্র মাইতির নেতৃত্বে 'হিন্দু থিয়েটার' গঠিত হয়। এঁরা কলাইকুন্ডা গড়ে (বর্তমান মিলিটারি এয়ারবেসের কাছাকাছি) 'সীতাহরণ' নাটকটি অভিনয় করেন। এই হিন্দু থিয়েটার স্মরণীয় এই কারণেই, যে এই প্রথম মেদিনীপুর জেলায় একজন নারীশিল্পী অন্যান্য পুরুষ শিল্পীর সঙ্গে নারী চরিত্রে অভিনয় করেন। তৎকালীন কীর্তন গায়িকা রাজলক্ষ্মী দেবী এই দুর্লভ সম্মান লাভ করেন। এরপর হিন্দু থিয়েটার খোদ জেলা শহরে স্থানান্তরিত হয়। পুরুষের পরিবর্তে নারী চরিত্রে নারীরাই অংশগ্রহণ করেন। বলাই বাহুল্য, তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় কলকাতার মতো মেদিনীপুরের নারীশিল্পীরাও উঠে এসেছিলেন নিষিদ্ধপল্লী থেকে। কিন্তু এইসব অত্যাচারিতা, অসহায়, নিরক্ষর নারীদের মধ্যে যে অসাধারণ শিল্পীসত্তা লুকিয়েছিল, তার পরিচয় রেখেছেন, মাখনবালা, কুলবালা, প্রমদাসুন্দরী, মনমোহিনী, অম্বিকাসুন্দরী প্রমুখ শিল্পীরা।

১৮৮৫-৮৬ সালে কর্ণেলগোলার গঙ্গারাম দত্তের বাড়িতে প্রথম মঞ্চ বেঁধে 'শ্রীবৎস-চিন্তা', 'সীতাহরণ' নামে দু'টি নাটক এবং 'সুরুচির ধ্বজা' প্রহসনটি দু'দিন ধরে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। মেদিনীপুরে এই প্রথম টিকিট বিক্রয় করে অভিনয় হয়। কলাকুশলীদের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ বসু, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী দেবী ও মনমোহিনী দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। এই হিন্দু থিয়েটারের মিস পূর্ণকুমারী শুধু গান ও অভিনয়েই যে কৃতিত্বের দাবি রেখেছিলেন তাই নয়, জেলার প্রথম নারীশিল্পী হিসেবে, তিনি প্রথম সঙ্গীত রেকর্ড করার দুর্লভ সম্মানেরও অধিকারী হন।

পেশাদারি ভিত্তিতে নাট্য উদ্যোগ :

একমাত্র মেদিনীপুর শহরেই এই উদ্যোগ নেবার তথ্য আছে। অন্য কোনও মহকুমা-শহর বা এলাকার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগের তথ্য হাতে নেই। রঘুনাথবাড়ীর থিয়েটার মঞ্চও ছিল নিতান্তই মরসুমী এবং তাও অনেক পরের কথা।

হিন্দু থিয়েটার থেকে গঙ্গানারায়ণ পাল বেরিয়ে গিয়ে 'নিউবেঙ্গল থিয়েটার' গঠন করেন। এঁরাই ১৮৮৬ সালে জমিদার গৌরীবালা করের কাছ থেকে ছোটবাজার মহল্লায় (বর্তমান বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্রাঞ্চের লাগোয়া স্থানে) তিনশো আশি টাকায় কয়েক কাঠা জমি কিনে একটি ছোট মঞ্চসহ প্রেক্ষাগৃহের মতো স্ট্রাকচার নির্মাণ করেন। এখানে নিয়মিতভাবে ১৮৮৭ সাল থেকে 'নরমেধ যজ্ঞ' ও 'লক্ষ্মণ বর্জন' নাটক অভিনীত হয়েছে। এরপর এখানেই 'মোহমুক্তি', 'ধ্রুবচরিত্র', 'ভ্রান্তি', 'সাবিত্রী-সত্যবান' এবং 'ওথেলো' নাটক মঞ্চস্থ হয়। বর্তমানে এই মঞ্চের কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু ১৯৫২-৫৩ সাল অবধি এর ভগ্ন মঞ্চটির অবশেষ বর্তমান আলোচকের নজরেও পড়েছে। এখন আর নেই। পেশাদারী ভিত্তিতে থিয়েটার ২/৩ বছরের বেশি স্থায়ী হয়নি। অচিরেই ভেঙে যায়।

যতদূর স্মরণে আসছে, তা হ'ল 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দির' গঠিত হবার আগে বর্তমান জেলা হাসপাতালের উল্টোদিকে একটি নাট্যমঞ্চ হয়েছিল। পরে সেটি 'মাতৃসদনে' রূপান্তরিত হয়। এখন নতুন বাড়ি হয়ে স্বাস্থ্যদপ্তরের গৃহে পরিণত হয়েছে। এখানে কিছু কিছু নাটক হয়েছিল এবং সিনেমাও (টকি) হয়েছে বলে শোনা গেছে।

এই সময়কালে যে কয়েকটি অপেশাদার নাট্যদল গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে মেদিনীপুরে ডায়মন্ড থিয়েটার, বান্ধব নাট্যসমাজ, মহিষাদল রাজবাটীতে রাজ ড্রামাটিক ক্লাব, তমলুক স্পোর্টসম্যান রিক্রিয়েশন ক্লাব, কোলাঘাটে টাউন ক্লাব, ঝাড়গ্রামে আলাপনী ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। আরও নাম আছে, স্থানাভাবে অনুল্লেখিত রইল।

●

ভারতের বুকে ফ্যাসীবিরোধী লেখকসংঘের জন্ম ও সংগ্রাম ; ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অভ্যুদয় ও বিকাশের সময়কালের মধ্যেও মেদিনীপুর জেলাতে উল্লেখ করার মতো কোনও নাট্যকার ও নাটকের খোঁজ মেলেনি। মেদিনীপুরের নাট্যজগৎ সেই ক্রান্তিকালীন অগ্নিক্ষরা দিনগুলিতে 'কর্ণার্জুন', 'সাজাহান' আর 'পাণ্ডব গৌরব' নিয়েই মত্ত থেকেছে।

●

ইতিহাসের বিদ্রূপ :

ইতিহাসের বিদ্রূপ কথাটি বর্তমান নিবন্ধকারকে ব্যবহার করতে হয়েছে, বিষয়টির সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ করার তাগিদেই। এখানেও উল্লেখ করছি—এ কারণেই যে বিষয়টি বেদনাদায়ক। ১৯৩২-৩৩ সাল থেকে অগ্নিগর্ভ গোটা মেদিনীপুর জেলা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘুম কেড়ে নেয়। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য সামনে রেখে সশস্ত্র এবং অহিংস সংগ্রামের এই দুর্বার স্রোতধারা সারা দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রেরণাস্থল হিসেবে উপস্থিত হয়েছিল। ব্রিটিশ পুলিশের গুলি, কারাগার, ঘরজ্বালানো থেকে ফাঁসির মঞ্চে তুলে হত্যা করার বীভৎসতা, মেদিনীপুর জেলার তরুণ-তরুণী এমনকি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরও মনে জ্বেলেছিল এক দুর্বার সংকল্পের অনল। কিন্তু কি হতভাগ্য এই জেলার তৎকালীন লেখক-শিল্পী ও সাহিত্যিকবৃন্দ, স্বাধীনতার সপক্ষে যাদের কলম থেকে একটি সঙ্গীত বা একটি নাটকও সেদিন বার হয়ে আসেনি। কারণ একটিই—স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গরিষ্ঠ অংশও যেমন গীতা আর মা কালীর বন্দনা করেই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, তেমনই তৎকালীন অধিপতি সংস্কৃতি তথা সামন্তবাদী সংস্কৃতির ভাবধারাতেই জেলার শিল্পী-সাহিত্যিকরা আচ্ছন্ন ছিলেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রা ও গানে অনুপ্রেরিত দু'একটি দল ও শিল্পী যে স্বদেশী গান করেননি তা নয়, তবে মুকুন্দ দাসের গানই তাঁরা গাইতেন বা কিছু অনুকরণ করেছেন।

এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ফ্যাসীবাদের অভ্যুদয়, হিটলারের ন্যাৎসীবাহিনীর আগ্রাসন, সোভিয়েত ভূমি আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাপী রোমাঁ রোলাঁ, আঁরি বারবুস, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথসহ কবি সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের প্রতিবাদ ; ভারতের বুকে ফ্যাসীবিরোধী লেখকসংঘের জন্ম ও সংগ্রাম ; ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অভ্যুদয় ও বিকাশের সময়কালের মধ্যেও মেদিনীপুর জেলাতে উল্লেখ করার মতো কোনও নাট্যকার ও নাটকের খোঁজ মেলেনি। মেদিনীপুরের নাট্যজগৎ সেই ক্রান্তিকালীন অগ্নিক্ষরা দিনগুলিতে 'কর্ণার্জুন', 'সাজাহান' আর 'পাণ্ডব গৌরব' নিয়েই মত্ত থেকেছে। জেলার কোনও অংশ থেকে যদি একটা সংগ্রামের নাটক বা একজন নাট্যকারেরও খোঁজ মিলত, তাহলে দুঃখটা অত থাকত না।

এতবড় তে-ভাগা আন্দোলন হয়েছে, জেলার একটা ব্যাপক অংশের দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায় তে-ভাগার লড়াইয়ে সামিল হয়েছেন, কিন্তু সেক্ষেত্রেও জেলার গণশিল্পীদের কাজ প্রায় নেই বললেই চলে। অতি সম্প্রতি 'শব্দের মিছিল' পত্রিকার তে'ভাগা-৫০ বছর সংখ্যার জন্য অনুসন্ধানের ফসল হিসেবে চিন্ময় দাস, চিত্ত সাহু রচিত 'মাটীর প্রতি' নামে ১টি কবিতাসহ পাঁচটি গান ও রাখালরাজ মণ্ডল রচিত 'সংগ্রাম' শীর্ষক একটি খণ্ডিত নাটক প্রকাশ করেছে। তাও আবার শুধু পঞ্চম অঙ্ক, হয়তো পুরো নাটকটি আছে। যা হোক, তবু

তে-ভাগা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে অন্তত সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী কৃষকদের বা নেতৃত্বের মধ্য থেকে যেটুকু উদ্যোগ দেখা গেল, তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

এই সময়কালে (১৯৩০-৫৫) জেলার দু'জন নাট্যকারের সন্ধান মেলে, তা হল—(১) বঙ্কিমচন্দ্র পাল : নাটক 'সাইক্লোন', 'মেঘদূত', (২) সুরেন্দ্রমোহন দে (কবি সু-মো-দে) : নাটক 'উদার অভ্যুদয়'। শেষোক্ত নাটকটি বিদ্যাসাগরের জীবন ও কৃতি নিয়ে রচিত বলেই শুধু একটু উল্লেখের দাবি রাখে।

বিকল্প নাট্যভাবনা ও নাট্য-আন্দোলনে রূপান্তর :

১৯৪৩ সালে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের গর্ভ থেকেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উদ্ভব। বাংলায় এই সংগঠনের শিল্প প্রযোজনার ব্যাপ্তি বিদ্যুতের মতোই ছড়িয়ে পড়েছিল। মেদিনীপুরে কিন্তু এই সংগ্রামের খুব একটা প্রভাব সেদিন ছিল না। একমাত্র শিল্পী শৈলেন দত্তের নেতৃত্বে একটি অপরিশীলিত গানের দল ছাড়া গণনাট্য সংঘের কোনও নাট্যদল গড়ে ওঠেনি।

কৃষ্টি সংসদ—১৯৭৬। নাটক : বিলাসী
রচনা : শরৎচন্দ্র, নাট্যরূপ ও পরিচালনায় : শ্রীজীব গোস্বামী

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভ, দেশের কল-কারখানার বৃহৎ মালিকগোষ্ঠী ও জমিদারদের ক্ষমতায় আসীন হওয়া এবং অচিরেই তাদের অনুসৃত অর্থনীতির ফলে দেশব্যাপী চূড়ান্ত অবিচার, অব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী শ্রমিক ও কৃষকদের ওপর অবর্ণনীয় শোষণের ফলে জনগণের মন থেকে স্বাধীনতার আনন্দ অচিরেই উবে গেল। শোষক-শাসক শ্রেণিগুলির সঙ্গে শোষিত শ্রেণিগুলির দ্বন্দ্ব ক্রমশ আপসহীন হয়ে উঠল। পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক-কৃষকদের সংগ্রাম কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নির্দিষ্ট সাংগঠনিক রূপ নিল।

এই সময়ে গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় সংগঠন ভেঙে নতুন নতুন দল সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। গণনাট্য সংঘ ১৯৫৮-তে চূড়ান্তভাবে ভেঙে গেলেও পশ্চিমবঙ্গে কিছু শিল্পী কয়েকটি শাখার মধ্য দিয়ে নাট্য আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট থাকল। শিল্পে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করে "শিল্পের জন্য শিল্প" তত্ত্বের তখন রমরমা বাজার। নবনাট্য আন্দোলন নামে আলাদা একটি নাট্য প্রবাহেরও সৃষ্টি হল। যাদের নাটক প্রধানত শিল্পের নামে শ্রেণি-সমন্বয়ের কথা বলতে লাগল। এই রকম একটা পরিস্থিতিতেও কিন্তু মেদিনীপুরের সখের নাট্য-গোষ্ঠীগুলির কোনও মাথাব্যথা ছিল না, তারা তখন 'উল্কা', 'তটিনীর বিচার', 'পি ডব্লিউ ডি' ইত্যাদি নাটকের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে।

কৃষ্টি সংসদ :—সারা জেলার এরকম একটা বন্ধ্যা পরিস্থিতির মধ্যেই ১৯৫৬ সালে মেদিনীপুর শহরের কতিপয় তরুণের প্রয়াসে 'কৃষ্টি সংসদে'র জন্ম হল। নিঃসন্দেহে বলা যায়, নাটকের ক্ষেত্রে শুধু বিষয়বস্তুতেই নয়, সামগ্রিক নাট্য প্রযোজনাতেই পুরনো প্রথা ভেঙে ব্যতিক্রমী প্রথাকে (যার জন্মদাতা গণনাট্য সংঘ) ধরেই কৃষ্টি সংসদ শুরু করল পদযাত্রা। প্রচলিত ভাবধারার বিপরীতে বৈপ্লবিক মতাদর্শ গ্রহণ করলেও, সেদিনকার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তরুণদের ভাবনার স্বচ্ছতা ছিল না। তাই ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'রুপোলী চাঁদ' নিয়ে যাত্রা শুরু হল। যদিও মঞ্চ, সংগীত, আলোক ও নির্দেশ সবকিছুতেই মেদিনীপুরের দর্শকবৃন্দ এক নতুন ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হন। এরপরই সংগঠকদের মতাদর্শের ভিত যত মজবুত হতে থাকে, ততই নাট্য নির্বাচন ও পরিচালনায় পরিবর্তন হতে থাকে। পরপর 'নীচের মহল', 'রক্তকরবী', 'পথিক', 'মৌচোর', 'শেষ সংবাদ' নাটকগুলি গোটা জেলায় কৃষ্টি সংসদকে শীর্ষস্থানীয় নাট্যদলের আসনে অধিষ্ঠিত করে দেয়। অরুণ মাইতি নির্দেশক, বাসুদেব দাশগুপ্ত সংগীত পরিচালক তথা নির্দেশক, রতন দাস মঞ্চ ও আলোক নির্দেশক, হিসেবে যেমন জনপ্রিয় হন, তেমনই কেষ্ট দাস, অসময় দাস, নির্মলেন্দু মাইতি, সন্তোষ দাস, শিবানী স্বর্ণকার, কেতকী দত্ত প্রমুখ শিল্পীদের নাম ছড়িয়ে পড়ে গোটা জেলায়। এই সময়কালটা ছিল রাজনৈতিকভাবে দুর্যোগপূর্ণ। ১৯৬২-তে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে উগ্র জাতীয়তাবাদের ভয়ঙ্কর প্রচারে সারা দেশের সঙ্গে মেদিনীপুর জেলাতেও চলেছে দেশপ্রেমের নামে যথেচ্ছাচারের বন্যা। এরই মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দলের মধ্যে জাতীয় গণতন্ত্র ও জনগণতান্ত্রিক পরিবর্তনের আদর্শকে কেন্দ্র করে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। জাতীয় গণতান্ত্রিক আদর্শের মতাবলম্বীরা সরাসরি শাসকদের সঙ্গে হাত মেলাল। তারই পরিণতিতে প্রগতিশীল শিবির সম্পূর্ণ দুটি আলাদা ভাগে ভাগ হয়ে গেল। সাংস্কৃতিক জগতে, বিশেষত কৃষ্টি সংসদের অভ্যন্তরেও এর ঢেউ আছড়ে পড়ল। কৃষ্টি সংসদের গরিষ্ঠ অংশের শিল্পীরা জনগণতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করলেন। কিছু শিল্পী অপর ভাবাদর্শকে গ্রহণ করে সংগঠন ত্যাগ করলেন। এই সময়েই বাসুদেব দাশগুপ্ত, 'শ্রীজীব গোস্বামী' ছদ্মনামে নাটক লেখা শুরু করেন। ১৯৬৭ সালে শ্রীজীব গোস্বামীর পূর্ণাঙ্গ নাটক 'সমুদ্রের কান্না'র (সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী) প্রথম অভিনয় শুধু

তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে তাই নয়, এই নাটক থেকেই জেলার প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শে ও শ্রেণীসংগ্রামের সপক্ষে নাট্য আন্দোলনেরও সূচনা হয়।

কৃষ্টি সংসদের এই অভিযানে জেলাতেও একটা সুস্পষ্ট ছাপ পড়ে। দ্রুততার সঙ্গে জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রগতিশীল নাট্যধারায় দীক্ষিত শিল্পীদের নিয়ে নাট্যদল গঠিত হতে থাকে। কৃষ্টি সংসদেরই অন্যতম নেতৃত্ব অরুণ মাইতির উদ্যোগে খড়্গপুর শহরে মশাল নাট্যসংস্থার উদ্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্টি সংসদের সঙ্গে একাত্মতা নিয়েই এই দলের জন্ম। মশালেরও বৈশিষ্ট্য এটাই যে, এখানে তখনই নাট্যকার চিত্ত পালের আবির্ভাব ঘটে, যাঁর বর্তমান প্রতিষ্ঠা 'অমল গুপ্ত নামেই'। চিত্ত পালের 'ন্যাশনাল পার্ক', 'ওরা দুজন' এবং 'প্রবাহ' নাটকগুলি অরুণ মাইতির নির্দেশনা ও বাসুদেব দাশগুপ্তের সংগীত পরিচালনায় জেলাতে আর একটি মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত হয়। মশালের 'ন্যাশনাল পার্ক' বিশ্বরূপা থিয়েটার আয়োজিত সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে। কিন্তু দুঃখজনক এটাই যে চিত্ত পাল কর্মক্ষেত্রে বদলি হবার পরেই 'মশাল' ভেঙে গেল। অরুণ মাইতি 'নিশান' নামক নাট্য সংস্থার (ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংঘ) নির্দেশক হয়ে এখনও কর্মরত।

খড়্গপুরে ছয়ের দশকে আলকাপ দলটি গড়ে ওঠে। প্রগতিমনস্ক শিল্পীরা এই দলে এখনও নাটক করে চলেছেন। এঁদের 'কোর্ট মার্শাল' নাটকটি যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। আরও কিছু নাট্যদল খড়্গপুরে গড়ে উঠেছিল ; কিন্তু বর্তমানে সেগুলির অবলুপ্তি ঘটেছে। জেলার অন্যান্য স্থানের মধ্যে মোটামুটি প্রগতিশীল নাট্যধারার চিন্তা নিয়ে এখনও যেসব দল কাজ করছে—ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শাখাগুলি ছাড়া, সেইসব দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

(ক) মেদিনীপুর শহর—

(১) নিশান—(ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংঘ) খুবই পরিণত ও অনেক সফল নাট্য প্রযোজনার অধিকারী। (২) উদয়ন—তরুণ নাট্যকার-পরিচালক সুরজিৎ সেনের নেতৃত্বে তরুণ শিল্পীদের বলিষ্ঠ দল। ইতিমধ্যেই অনেক পুরস্কারের অধিকারী। (৩) উত্তরণ—সাতের দশকে উদ্ভব। অনেক সফল প্রযোজনা করেছে। এখনও মোটামুটি সক্রিয়। এছাড়া মরশুমী দু' একটি সখের নাট্যদল মাঝে-মধ্যে ওঠে, আবার মিলিয়েও যায়।

(খ) **খড়্গপুর**—আলকাপের কথা আগেই উল্লিখিত। এছাড়া অন্য নাট্যদলের তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য নাম নেই।

(গ) **তমলুক**—পূর্বে নানা নাট্যদলের অভিনয়ের ধারা থাকলেও বর্তমানে (১) পরিচালক রক্তকমল দাশগুপ্তের আনন্দলোক নাট্যসংস্থাই এখনও নতুন আঙ্গিক ও বিষয়ের উপস্থাপনাযুক্ত নাট্য প্রযোজনা করে চলেছে। (২) আনন্দলোক ড্রামাটিক ক্লাব নামে আর একটি সংস্থাও নাটক করে।

কৃষ্টি সংসদ—২০০১। নাটক : অগ্নিশুদ্ধি।
রচনা ও পরিচালনা : শ্রীজীব গোস্বামী

(৩) ব্রাইট ফিউচারের নাম এককালে খুব শোনা গেলেও বর্তমানে সম্ভবত অবলুপ্ত।

(ঘ) **মহিষাদল**—মল্লার নাট্যগোষ্ঠীরই ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। অন্যান্য কয়েকটি দল আছে। বর্তমান আলোচকের কাছে তাদের নাম এখনও অপরিচিত।

(ঙ) **নন্দীগ্রাম**—উদয়ন নাট্যসংস্থার জন্ম সম্ভবত ছয়ের দশকের শেষ দিকে। এই সংস্থা সুকুমার পাহাড়ীর নেতৃত্বে এখনও প্রগতিশীল নাট্যধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

(চ) **ঝাড়গ্রাম**—একসময়ে কয়েকটি দল গড়ে উঠলেও বর্তমানে বলাকা সাংস্কৃতিক চক্রের নামই অগ্রগণ্য, এদের একটি ছোট প্রেক্ষাগৃহ আছে। এছাড়া মাঝে-মধ্যে দু-একটি দলের নাম উঠে এলেও স্থায়িত্বের দাবি রাখে না।

হয়তো আরও কিছু দল বা গ্রুপ রয়ে গেল। এইসব দল তাঁদের প্রযোজনা ও দলের ইতিহাস জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

জেলার নাট্য আন্দোলন : ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ :

মেদিনীপুর জেলার সংস্কৃতি ও নাট্য আন্দোলনের বিকাশ ও অগ্রগতির নেতৃত্বদানকারী সংগঠনটি হল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ। এটি উল্লেখ না করলে সত্যের অপলাপ হবে। জেলাতে বর্তমানে এই সংগঠনের ৬০টি শাখাসহ অনুসারী আরও ৭/৮টি ইউনিট সংগীত, নৃত্য ও অন্যান্য শিল্প প্রযোজনার সঙ্গে নিয়মিত নাটকও প্রযোজনা করে চলেছে। এই কারণেই গণনাট্য সংঘের কার্যক্রমের হিসাবটা এই রচনায় আলাদা করেই তুলে ধরা হয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মেদিনীপুর জেলাতে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও নাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ হল কৃষ্টি সংসদ, মেদিনীপুর। ১৯৬৯ সালে এই দলটি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অনুমোদন লাভ করে। কৃষ্টি সংসদের ওপরেই

জেলায় গণনাট্য সংঘের বিস্তারের দায়িত্বটি স্বভাবতই এসে বর্তায়। কৃষ্টি সংসদের নেতৃস্থানীয় শিল্পী-কর্মীরা দ্রুততার সঙ্গে সারা জেলার বিভিন্ন স্থানের শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন। এভাবেই ১৯৭৩ সালে মাত্র ৫টি শাখা নিয়ে গণনাট্য সংঘের জেলা কমিটি গঠিত হয়। এর পরের বছরগুলিতে নানা অনুকূল ও প্রতিকূল সাংস্কৃতিক তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, শাসকশ্রেণীগুলির চরম অত্যাচার ও আক্রমণের মধ্যেও গণনাট্য সংঘের অগ্রগতিকে রোধ করা যায়নি। সেই পথ ধরেই সংগ্রাম চালিয়ে আজ গণনাট্য সংঘের মেদিনীপুর জেলা সংগঠন রাজ্যের মধ্যে বৃহত্তম জেলা—সংগঠনে পরিণত। যেহেতু নাট্য আন্দোলনই আলোচনার বিষয়, তাই জেলায় গণনাট্য সংঘের যে যে শাখাগুলি নিয়মিত নাটক করে, শুধু তাদেরই পরিচিত এখানে দেওয়া হচ্ছে।

মেদিনীপুর সদর মহকুমা :

(১) **মেদিনীপুর শহর**— (ক) কৃষ্টি সংসদ : রাজ্যের সবকটি জেলাসহ আসাম, ওড়িশা ও বিহার পর্যন্ত এই শাখার নাটক ও যাত্রার অভিনয় একসময় বিস্তৃত ছিল। এখনও তা রাজ্যের মধ্যে নিয়মিত ক্রিয়াশীল ও স্বপ্রতিষ্ঠ।

শাখার প্রযোজিত এতাবৎ পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটকের সংখ্যা শতাধিক। নাটকগুলির শতকরা নব্বইভাগ-এর রচয়িতা শ্রীজীব গোস্বামী। এছাড়া শাখা স্পার্টাকাস, ফুলওয়ালী তেলেঙ্গানা, জোয়া, চরতমাল, দজ্জালবাঈ ও পদচিহ্ন এই সাতটি যাত্রা প্রযোজনা করে। যেগুলির মধ্যে স্পার্টাকাস, ফুলওয়ালী ও তেলেঙ্গানার প্রতিটির অভিনয় সংখ্যা পাঁচশতাধিক। স্পার্টাকাস ছাড়া প্রতিটি যাত্রাপালার রচয়িতাও শ্রীজীব গোস্বামী। বর্তমানেও এই শাখা নিয়মিতভাবে সফল নাট্য প্রযোজনা করে চলেছে। (খ) ক্রান্তিক : তরুণ শিল্পীদের নিয়ে গঠিত শাখাটি নয় দশকের প্রথম থেকে কাজ করছে। বেশ কয়েকটি সফল প্রযোজনা করেছে। এই শাখায় তিনজন নাট্যকার উঠে এসেছেন। এঁরা হলেন—জয়ন্ত চক্রবর্তী, পার্থ মুখার্জি ও তুষার ভট্টাচার্য। এঁরা নিয়মিত নাটক করেন। (গ) উজান : স্বল্পদিন হল প্রতিষ্ঠিত ও গণনাট্য সংঘের শাখা হিসেবে অনুমোদিত। বেশ কয়েকটি সফল প্রযোজনা করেছে। নাট্যকার নন্দন ভট্টাচার্যের ২/১টি নাটক রসোত্তীর্ণ হয়েছে। উল্লেখযোগ্য নাটক : 'চারাগাছ'।

(২) **গড়বেতা**—(ক) রঙ্গম : দীর্ঘদিনের শাখা। নাটক সফল হচ্ছে। এদের 'হাজার হাতের গল্পো' আজও চলেছে। (খ) আঙ্গিক—নতুন শাখা। নাটক সফল হচ্ছে। এদের ২/১টি নাটক বেশ জনপ্রিয় হয়েছে।

(৩) **কেশপুর** : প্রয়াস—দীর্ঘদিনের শাখা। এখন নাটক প্রযোজনাই করে। প্রবীণ নাট্যকার বীরেন দণ্ডপাট বহু সফল নাটকের রচয়িতা ও প্রয়োগকর্তা।

খড়্গপুর মহকুমা :

(১) মৃদঙ্গম, খড়্গপুর : ধারাবাহিক নাটক প্রযোজনা অব্যাহত। খড়্গপুর শহরে বর্তমানে সব থেকে বেশি নাটক প্রযোজনা করে চলেছে। 'গণপৎ কাহার', 'ঢোলিয়া', 'খাঁচা থেকে আকাশ' সহ 'মড়া' 'কঙ্কাল' এদের সফল প্রযোজনা।

(২) নন্দন, কেশিয়াড়ি : গণনাট্য সংঘের একটি বলিষ্ঠ শাখা। আদিবাসী উপজাতি শিল্পীরাও এই শাখার নিয়মিত শিল্পী। বহু সফল নাটকের প্রযোজনা করেছে। নাট্যকার পথিক ঘোষ বিক্ষিপ্তভাবে হলেও এখনও নাটক লিখছেন।

কৃষ্টি সংসদ—২০০১। নাটক : অগ্নিশুদ্ধি।
রচনা ও পরিচালনা : শ্রীজীব গোস্বামী

ঘাটাল মহকুমা :

(১) দাসপুর সাংস্কৃতিক পরিষদ : অনেক নাটক মঞ্চস্থ করেছে। নাট্যকার নন্দদুলাল গুছাইত নিয়মিত নাটক লেখেন।

(২) গণবাণী, সোনামুই : নিয়মিত নাটক করতে চেষ্টা করে। বিশিষ্ট নাট্যকার পঞ্চানন গোস্বামী প্রয়াত হবার পর প্রযোজনার সমস্যা ক্রমশ কাটিয়ে তুলছে। গণনাট্য সংঘের জেলা নাট্য প্রতিযোগিতায় 'সাপ' নাটকটি মঞ্চস্থ করে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে।

তমলুক মহকুমা :

(১) রক্তিম, কোলাঘাট : জেলাতে গণনাট্য সংঘের দ্বিতীয় অনুমোদিত শাখা। নাট্যকার কার্তিক ঘোষের পরিচালনায় 'হারাণের নাতজামাই', 'দুই তরঙ্গ' সহ বহু সফল নাটকের প্রযোজনা করেছে। কার্তিক ঘোষ প্রয়াত হবার পর বর্তমানে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে।

হলদিয়া মহকুমা :

(১) মুক্তধারা, হলদিয়া : ১৯৮১-তে উদ্ভব হলেও সারা রাজ্যেই সংগীত, নাটক, তরজা, গম্ভীরা ইত্যাদি নানা সফল শিল্প-সৃষ্টির দাবি রেখেছে। এদের নাট্যকার-পরিচালক শঙ্কর

●

একদিকে উচ্চ প্রযুক্তির হাত ধরে বৈজ্ঞানিক গণমাধ্যমের সব থেকে উন্নত প্রক্রিয়া টেলিভিশনের শতাধিক চ্যানেলের কৃপায় জনসাধারণের ব্যাপক অংশ যেমন ঘরে ঢুকে গেছে, পাশাপাশি প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও ক্রমশ এক বন্ধ্যা চিন্তা-ভাবনার প্রসার ঘটছে, যা অভাবনীয় হলেও সত্য।

●

তিয়ারি, সুদীপ চৌধুরি প্রায়শই নাটক লেখেন। এদের অনেক সফল প্রযোজনার মধ্যে 'সূর্য শিকার', 'পরাণ মণ্ডলের বিচার', 'শত্রু' ইত্যাদি। এই শাখার সাফল্যও সমগ্র রাজ্যস্তরে ছড়িয়ে গিয়েছে।

(২) সূর্যতোরণ, হলদিয়া : ভাল শাখা। নাটকই প্রধান। নিয়মিত নাটক করে।

পরিশিষ্ট :

মেদিনীপুর জেলার বর্তমান নাট্য আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেবার চেষ্টা করা হল—যা খুবই অসম্পূর্ণ। অনেক নাট্যদলের নাম অনিবার্যকারণে অনুক্ত থেকে গেল।

এই বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ আজ গণ-আন্দোলনের পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গে নাটকের দর্শকের সংখ্যা ক্রমশ যেমন ক্ষীয়মাণ হয়ে চলেছে, স্বাভাবিকভাবেই নাটক প্রযোজনার প্রচেষ্টাও প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। একদিকে উচ্চ প্রযুক্তির হাত ধরে বৈজ্ঞানিক গণমাধ্যমের সব থেকে উন্নত প্রক্রিয়া টেলিভিশনের শতাধিক চ্যানেলের কৃপায় জনসাধারণের ব্যাপক অংশ যেমন ঘরে ঢুকে গেছে, পাশাপাশি প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও ক্রমশ এক বন্ধ্যা চিন্তা-ভাবনার প্রসার ঘটছে, যা অভাবনীয় হলেও সত্য। চোখ খুলে তাকালেই যে বিষয়টি চোখে পড়বে, তা হল, এ রাজ্যের সমস্ত নাট্যদলের শতকরা নিরানব্বই ভাগ দলই প্রগতিশীল নাট্যধারার আদর্শে দীক্ষিত, অথচ তাদের নাট্য প্রযোজনার হার কমছে কেন ? কমছে একদিকে চাহিদার অভাবে। দল ও গ্রুপগুলি অভিনয়ের আহ্বান না পেতে পেতে নাটক করার কোনও মানে আছে কিনা ভাবতে শুরু করেছে। শুধু কলকাতার বাজারে রমরমিয়ে কিছু দলের দাপট চলেছে। নাটকের বিষয় যাই হোক না কেন, এঁরাই বর্তমানে টিকে যাচ্ছেন।

মেদিনীপুরেও এর কোনও ব্যতিক্রম নেই। শুধু গণনাট্য সংঘের শক্তিশালী কয়েকটি শাখাসহ কিছু দল ও গ্রুপ এই অবস্থাতেও নাট্যআন্দোলন জারি রেখেছে।

লেখক : বিশিষ্ট প্রবন্ধকার
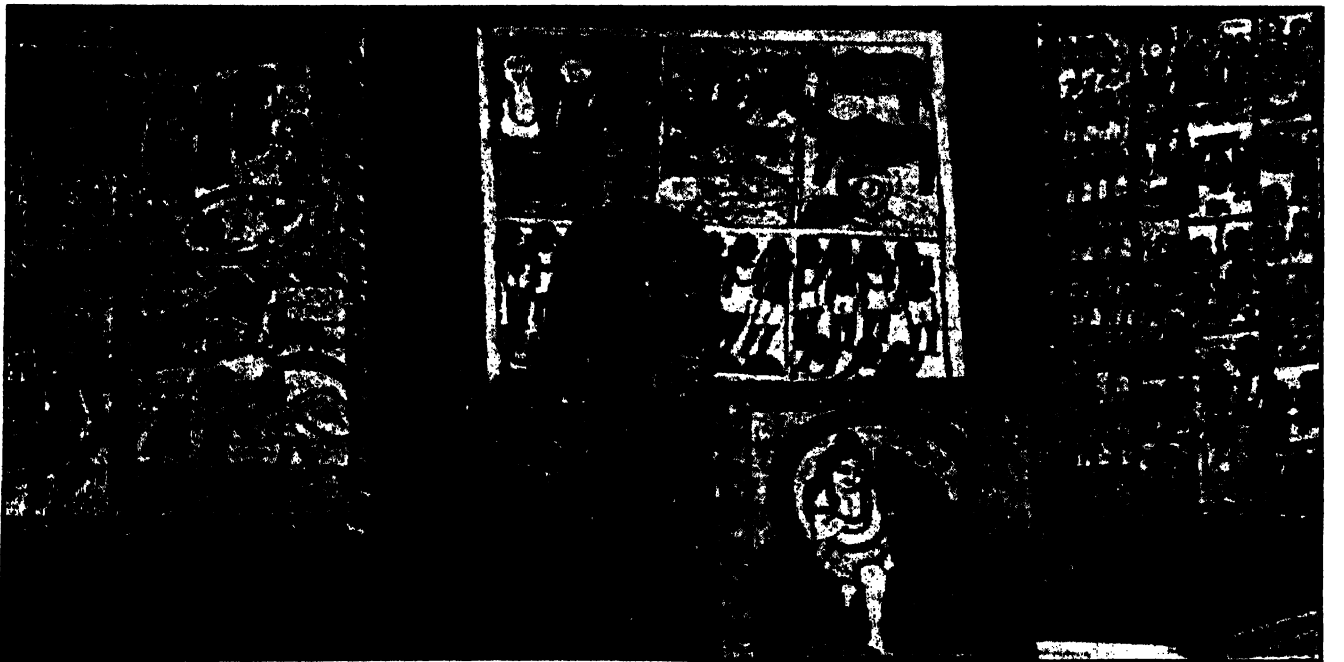
পূর্ব মেদিনীপুরের ঝর্ণা চিত্রকর বৃটিশ কাউন্সিলে তাঁর সৃষ্টি প্রদর্শন করছেন
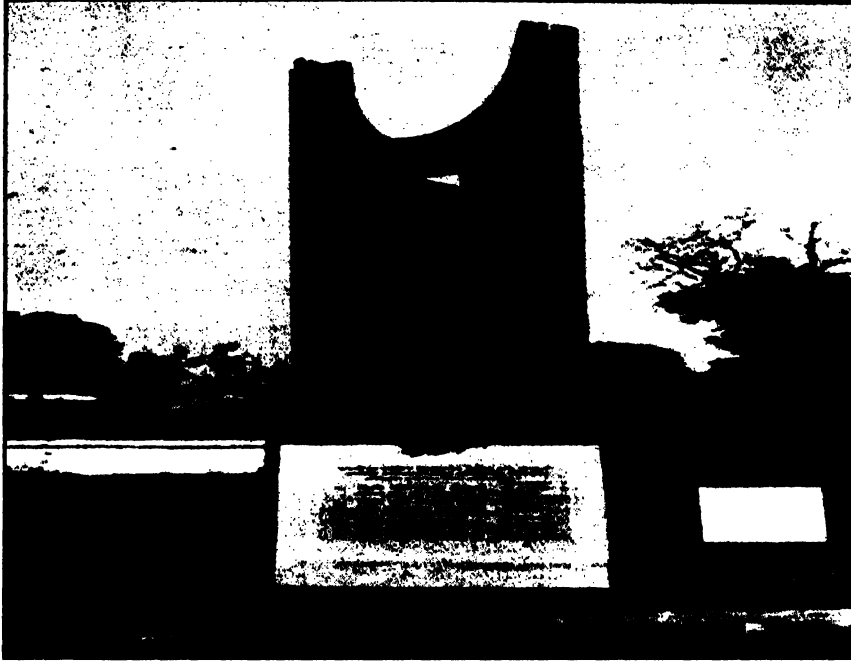
মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের শহীদস্তম্ভ

মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস

(১৭৬০-১৯০৫)

ধীরাজমোহন ভট্টাচার্য

"চুপে চুপে
বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী
দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে"

বিদেশী ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে এসেছিল ব্যবসা বাণিজ্য করতে। কয়েক শতকের মধ্যেই রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে সে আমাদের দেশে প্রভুত্ব বিস্তারে সচেষ্ট হল এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় যে তার এই প্রয়াস শেষপর্যন্ত সফল হয়েছিল। কিন্তু তার এই সাম্রাজ্য বিজয়ের পথ খুব মসৃণ ছিল না। প্রথম থেকেই গণআন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল তার সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে। মেদিনীপুর জেলা এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ্‌-দৌলাকে হারিয়ে দিয়ে ইংরেজ কোম্পানি বাংলার শাসক নির্বাচনের ভূমিকা অর্জন করেছিল। মীরজাফরের কাছ থেকে তারা পেয়েছিল ২৪ পরগনার জমিদারি। ১৭৬০ সালে মীরজাফরকে গদিচ্যুত করে ইংরেজরা তাঁরই জামাতা মীরকাশিমকে নবাবী পদে বসাল। বিনিময়ে মীরকাশিম ইংরেজদের দিলেন মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রামের জমিদারি।

১৭৬০ সালে জমিদারি লাভ করেই কোম্পানি জনস্টোন নামে এক কর্মচারীকে মেদিনীপুরের রেসিডেন্টরূপে প্রেরণ করলেন। এরপর থেকে দু'চার বছর অন্তর অন্তর রেসিডেন্ট পরিবর্তন হত এবং সকলেই নিজস্ব জ্ঞান ও অভিরুচি অনুযায়ি জমিদার বা রায়তদের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ভূমি

ঝাড়গ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত চুয়াড় বিদ্রোহের দুশো বছর উদ্‌যাপন

ব্যবস্থা চালু করার সুপারিশ করতেন। কিন্তু সব ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি, জমিদার ও কৃষকদের সামর্থ যাচাই না করে প্রয়োজনে জোরজুলুম করে বর্ধিত হারে খাজনা আদায় করে কোম্পানির তহবিল স্ফীত করা।

১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর থেকে শাসক ইংরেজ এদেশের ভূমি ব্যবস্থাকে আমূল ঢেলে সাজাতে বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন মোটেই সহজসাধ্য কাজ ছিল না। কারণ তখন জেলার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল জুড়ে ছিল গভীর জঙ্গল। এই সময় মেদিনীপুর জেলার মধ্যে ছিল বহু পরগনা যথা বর্তমান পুরুলিয়া জেলার বরাভূম, পাঞ্চেত, দামপাড়া, বর্তমান বাঁকুড়া জেলার রাইপুর, সিমলাপাল, ছাতনা, ফুলকুশমা, বিহারের ধলভূম, ঘাটশিলা, ওড়িশার ভোগরাই, জলেশ্বর প্রভৃতি। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলগুলি জঙ্গলমহাল নামে পরিচিত হয়।

এই বিশাল জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে বাস করতেন বহু ছোটবড় জমিদার ও ভূস্বামী। মুঘল আমলে এইসব জমিদারবৃন্দ মাঝে মধ্যে শাসকদের নামমাত্র কর দিতেন। আর যেহেতু এই অঞ্চল ছিল দুর্গম ও শ্বাপদসঙ্কুল সেজন্য মুঘল শাসকবৃন্দ তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন এবং এখানে কোনপ্রকার প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ করতেন না। তার ফলে এই অঞ্চলের জমিদারদের স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে কোন অসুবিধা হয়নি। জমিদারদের অধীনে থাকত বেশ কয়েকজন সর্দার। আবার সর্দারদের অধীনে পাইকরা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করত। জমিদারদের এইসব কর্মচারী হাতে নগদ বেতন পেত না। পারিশ্রমিক হিসেবে জমিদারদের কাছ থেকে তারা পেত স্বল্প খাজনায় বা বিনা খাজনায় চাষযোগ্য জমি। কোম্পানির শাসন শুরু হওয়ার আগে মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশে এই ব্যবস্থাই কায়েম ছিল।

কিন্তু এ জেলায় ইংরেজ শাসন চালু হওয়ার পর থেকেই চিরাচরিত প্রথাগুলির উপর আঘাত নেমে আসে। মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাঞ্চলের জমিদারবৃন্দ বর্ধিত হারে খাজনা প্রদান করতে অস্বীকার করে। এর ফলে রেসিডেন্ট গ্রাহাম ১৭৬৭ সালে সেনাপতি ফার্গুসনকে প্রেরণ করেন অবাধ্য জমিদারদের কাছ থেকে জোর করে খাজনা আদায়ের জন্য। প্রথম অভিযানে ফার্গুসন অনেক জমিদারকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। কিন্তু সবচেয়ে বাধা এল ঘাটশিলার জমিদারের কাছ থেকে। তিনি ফার্গুসনের বাহিনীকে নাজেহাল করলেও শেষপর্যন্ত অবস্থা বেগতিক দেখে নিজের ঘাঁটি ছেড়ে চলে যান। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জগন্নাথ ধলকে বর্ধিত হারে খাজনা দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ধলভূমের রাজা বলে ইংরেজরা স্বীকৃতি দিলেন। কিন্তু জগন্নাথ ধলের বর্ধিত হারে খাজনা দেওয়ার কোন ইচ্ছা ছিল না। খাজনা বাকি পড়ায় আবার তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্যদল প্রেরিত হল। জগন্নাথ ধল দুর্ভেদ্য জঙ্গলে পালিয়ে গেলেন। তখন ইংরেজরা জগন্নাথের ভাই নিমু ধলকে ঘাটশিলার জমিদাররূপে স্বীকৃতি দিলেন। জগন্নাথ ধল নীরবে এই ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার পাত্র ছিলেন না। তিনি কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। ১৭৬৮ সালে তাঁকে দমন করার জন্য প্রেরিত সেনাপতি ক্যাপ্টেন মরগ্যান সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন "The whole country up in arms against the British authority ...." (J. C. Price. Notes on the History of Midnapur—Page 58) তাঁর উপলব্ধি হল যে এই বিদ্রাহ শুধু একজন আঞ্চলিক জমিদারের একক বিদ্রোহ নয়। এই অঞ্চলের সব জমিদারই তাদের পাইক বরকন্দাজকে সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। নিরুপায় মর্গ্যান জমিদারদের প্রতি নরম নীতি গ্রহণে বাধ্য হলেন। তবে জগন্নাথ ধলকে দমিত করা কোম্পানির সেনাপতিদের পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে পড়েছিল। জগন্নাথ ধল পার্শ্ববর্তী এলাকার সব জমিদারকে সঙ্ঘবদ্ধ করে ১৭৭৪ সালে আবার ঘাটশিলা অভিমুখে অভিযান করেন। সারা জঙ্গলমহালে জ্বলে ওঠে বিদ্রোহের আগুন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বুঝতে বাকি ছিল না যে এই ব্যাপক বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র জগন্নাথ ধল। পুনরায় তাঁকে জমিদারি ফিরিয়ে দেওয়াই হল এলাকায় শান্তিস্থাপনের একমাত্র রাস্তা। তাই শেষপর্যন্ত কোম্পানি ১৭৭৭ সালে জগন্নাথ ধলকে তাঁর ঘাটশিলার পুরনো জমিদারিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বাধ্য হয়েছিল।

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জঙ্গল-মহালের জমিদার-কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ এই সংগ্রামকে ইংরেজ ঐতিহাসিক J. C. Price 'চুয়াড় বিদ্রোহ' নামে অভিহিত করে একে খাটো করে দেখাতে চেয়েছেন। এইরূপ আখ্যা দিয়ে ইংরেজরা বোঝাতে চেয়েছিল যে এই বিদ্রোহ পরিচালনের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তারা হল দুর্বৃত্ত, বর্বর, শিক্ষাদীক্ষাহীন। সুতরাং এই ধরনের বিদ্রোহ দমন করা অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় এবং এরজন্য প্রতিটি শিক্ষিত, মার্জিত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির ইংরেজ সরকারকে প্রশংসা করা উচিত। এরূপ মানসিকতা ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব থেকেই জাত। এ হল ইংরেজদের প্রকৃত সত্যকে আড়াল করার এক হীন অপচেষ্টা। বাস্তবিকপক্ষে এই বিদ্রোহ ছিল মূলত কৃষক বিদ্রোহ। জঙ্গল মহালের উত্তর ও উত্তর-

পশ্চিম অংশের যারা আদিবাসিন্দা ভঞ্জ, কুরমালি, কোড়া, ভূমিজ, কুর্মী, বাগদী, লোধা, সদ্‌গোপ, মাহাতো প্রভৃতি শ্রেণীর লোক এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল। এমনকি বিদ্রোহীদের নামের তালিকা থেকে প্রতীয়মান হয় যে বহু মুসলমানও এই বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

জগন্নাথ ধলের জমিদারি পুনঃপ্রাপ্তির পরে অল্প কয়েক বছর বিদ্রোহ স্তিমিত ছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বগড়ী পরগনাতে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠল। ইংরেজদের দাবিমত খাজনা মেটাতে না পারায় জমিদার যদু সিংকে পদচ্যুত করে জমিদারি দেওয়া হয় যদুপুত্র ছত্র সিংকে। পিতার প্রতি অপমান ও দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ছত্র সিং আদিবাসী প্রজাদের নিয়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। একই সময়ে বাঁকুড়া ও বীরভূমের জঙ্গল রাজ্যগুলিতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। এইভাবে ইংরেজ সরকার এক ব্যাপক বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য গভর্নর জেনারেল স্বয়ং এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ছত্র সিং-এর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে এই চূড়ান্ত বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলা এই বিদ্রোহকে সরকারি নথিপত্রে 'চুয়াড় বিদ্রোহের প্রথম পর্ব' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

জমি বন্দোবস্ত নিয়ে ইংরেজ সরকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তখনও অব্যাহত। ১৭৭৭ থেকে ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত চলে প্রতি এক বছরের জন্য জমিদারদের সঙ্গে জমি বন্দোবস্ত। কর্নওয়ালিশ এলেন গভর্নর জেনারেল হয়ে ১৭৮৬ সালের সেপ্টেম্বরে। ভারতের মাটিতে পা দিয়েই তিনি দীর্ঘস্থায়ী জমি বন্দোবস্তের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। ১৭৮৯-৯০ সালে তিনি চালু করলেন দশ-শালা ভূমি বন্দোবস্ত। কিন্তু এর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা হল। যে বন্দোবস্তই করা হোক না কেন তার মূল উদ্দেশ্য ছিল জমিদার ও কৃষকদের অবাধে শোষণ। বর্ধিত হারে রাজস্ব না দিলে জমিদারদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার নীতি গৃহীত হল। ১৭৯৩ সালের বন্দোবস্তে বিভিন্ন এলাকার শান্তিরক্ষার ভার নিলেন ইংরেজ সরকার। সুতরাং জমিদারবৃন্দ এই সম্মানজনক দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হলেন। তাদের পাইক-বরকন্দাজ বাহিনী পোষণ করার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেল। পুরুষানুক্রমে যে কৃষককুল জমিদারকে সেবার বিনিময়ে নিষ্কর পাইকান জমি ভোগ করে আসছিল তাদের জমির উপরও চড়া হারে খাজনা ধার্য হল। সুতরাং জমিদার ও তাদের প্রজাবৃন্দ লক্ষ্য করলেন যে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে। তাই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ফেটে পড়ল।

১৭৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ ও বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণাংশ জুড়ে আরম্ভ হল ব্যাপক বিদ্রোহ। একে বলা হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ের চুয়াড় বিদ্রোহ। মেদিনীপুর জেলার কর্ণগড়, শিরোমণি, পাঁচখুরি, সাতপাটি, শালবনি,

●

১৭৯৩ সালের বন্দোবস্তে বিভিন্ন এলাকার শান্তিরক্ষার ভার নিলেন ইংরেজ সরকার। সুতরাং জমিদারবৃন্দ এই সম্মানজনক দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হলেন। তাদের পাইক-বরকন্দাজ বাহিনী পোষণ করার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেল। পুরুষানুক্রমে যে কৃষককুল জমিদারকে সেবার বিনিময়ে নিষ্কর পাইকান জমি ভোগ করে আসছিল তাদের জমির উপরও চড়া হারে খাজনা ধার্য হল। সুতরাং জমিদার ও তাদের প্রজাবৃন্দ লক্ষ্য করলেন যে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে। তাই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ফেটে পড়ল।

●

কেশপুর, আনন্দপুর, ধলহরা, ধারেন্দা, রামগড়, শিলদা, গোপীবল্লভপুর, নাড়াজোল, বগড়ী, চন্দ্রকোণা, ময়না, জলেশ্বর প্রভৃতি ছিল বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি। এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বগড়ীর গোবর্ধন দিকপতি, কর্ণগড়ের রানি শিরোমণি, রাইপুরের জমিদার দুর্জন সিং। এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য ইংরেজ ফৌজ একদিকে অমানুষিক তাণ্ডব চালায় অপরদিকে বিদ্রোহী জমিদারদের রাজস্বের পরিমাণ কমিয়ে একটা রফায় আসার চেষ্টা করে।

আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সুচতুর ইংরেজদের কাছে বিদ্রোহীদের পরাভব স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু ইংরেজদের শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ কৃষকরা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন এবং অসম যুদ্ধে শহিদত্ব অর্জন করেছিলেন তার জন্য উত্তরপুরুষগণ অবশ্যই গর্বিত। এই চুয়াড় বিদ্রোহ ছিল বৃটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে কৃষকদের সশস্ত্র প্রতিবাদ।

চুয়াড় বিদ্রোহের আগুন নিভতে না নিভতেই মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশ জুড়ে আদিবাসী কৃষকদের যে বিক্ষোভ আরম্ভ হয় তাকে ইংরেজরা 'বগড়ীর নায়েক হাঙ্গামা' (১৮০৬—১৬) নাম দিয়েছিল। বগড়ী পরগনার আদিবাসীদের বলা হত নায়ক বা লায়েক বা বাগ্‌দী। এরা প্রয়োজনে বগড়ীর জমিদারের পাইক বা বরকন্দাজরূপে কাজ করতেন এবং তার বিনিময়ে জমিদার প্রদত্ত জায়গীর ভোগ করতেন। বগড়ীরাজকে রাজ্যচ্যুত করার সময়ে নায়কদের জায়গীর জমিগুলিও ইংরেজরা বাজেয়াপ্ত করেছিল। এর ফলে নায়কগণ জমিজমা হারিয়ে এক ভয়াবহ সঙ্কটের মধ্যে পড়ে।

কৃষকের নীল পেটানোর কাজ

নায়কগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অধীর হয়ে ওঠেন। তাদের নেতৃত্ব দেন বগড়ীরাজেরই এক প্রাক্তন সেনাপতি অচল সিংহ। তাঁর প্রধান ঘাঁটি হল গড়বেতার নিকটস্থ শিলাবতী নদীর পাশে গণগণির অরণ্য। এই স্থানে বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইংরেজদের খণ্ডযুদ্ধ বাধে। বিদ্রোহী নায়েকরা গেরিলা যুদ্ধের নীতি অবলম্বন করে ইংরেজ বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। এমনই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সেনাপতি কামান ব্যবহার করতে বাধ্য হলেন। কামানের গোলাতে বনভূমি বিধ্বস্ত হল এবং বহু বিদ্রোহী নায়েক প্রাণ হারালেন কিন্তু বিদ্রোহী সেনাপতি অচল সিংহকে ধরা গেল না। তিনি অন্যত্র পালিয়ে গিয়ে ইংরেজদের উপর চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাতে আরম্ভ করলেন। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় ইংরেজরা অচল সিংহকে গ্রেপ্তার করে এবং বিনাবিচারে গুলি করে হত্যা করে। অচল সিংহের অনুগামী ২০০ জন বিদ্রোহীকে নৃশংসভাবে গাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়। এইভাবে নায়েক বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত হয়।

ইংরেজ কোম্পানির শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অনেক সময় অহিংস আন্দোলনের রূপও ধারণ করত। এর অন্যতম নিদর্শন মেদিনীপুর জেলার মলঙ্গীদের আন্দোলন। বাংলার লবণ তৈরির অন্যতম কেন্দ্র ছিল মেদিনীপুরের তমলুক ও হিজলী অঞ্চল। এই অঞ্চলে প্রায় ৬০,০০০ কারিগর লবণ উৎপাদনে নিযুক্ত ছিল। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই কোম্পানি ধীরে ধীরে লবণ উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করে। যদিও লবণ ব্যবসা থেকে কোম্পানির লাভ হত বিপুল পরিমাণে। লবণ শ্রমিক অর্থাৎ মলঙ্গীদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। লবণ উৎপাদনের কাজে শারীরিক ক্লেশ, উৎপীড়ন এবং তার পরিবর্তে স্বল্প মজুরি এমন ভয়ানক আকার ধারণ করেছিল যে অনেক সময় মলঙ্গীরা তা সহ্য করতে না পেরে প্রায়ই কারখানা ত্যাগ করে পালিয়ে যেতেন। এই উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে মলঙ্গীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেও কর্তৃপক্ষ তাদের অভাব অভিযোগ দূরীকরণের জন্য কোন ব্যবস্থা নেননি।

১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রেমানন্দ সরকার নামে জনৈক ব্যক্তি বিভিন্ন কারখানা ঘুরে ধর্মঘট করে দাবি আদায়ের জন্য মলঙ্গীদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন। তাঁর নেতৃত্বে কয়েকশত মলঙ্গী কোম্পানির লবণ কারখানার সমগ্র পরিচালন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাঁরা কাঁথির লবণ অফিসের ইংরেজ এজেন্টের কাছারি ঘিরে ফেলে। প্রেমানন্দকে পাইক বরকন্দাজরা গ্রেপ্তার করলে মলঙ্গীরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অবস্থা বেগতিক দেখে এজেন্ট সাহেব তাদের সকল দাবি পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

ইংরেজ রাজত্বের সূচনা থেকেই শুধু মেদিনীপুরেই নয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে যে কৃষক অভ্যুত্থান ও আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার পরিণতি ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রাহ। যদিও ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের গুলিবর্ষণে এই বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল তথাপি সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ এর দ্বারা প্রবলভাবে আলোড়িত হয়নি। তবে শ্বেতাঙ্গ সমাজ অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিল এবং তাঁরা কঠোরতম ব্যবস্থা নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেননি। মেদিনীপুর জেলায় বৃন্দাবন তেওয়ারি নামে জনৈক ব্রাহ্মণ সিপাহী জনগণকে বিদ্রোহের জন্য উত্তেজিত করায় তাঁকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই ঘটনা জনগণের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতা প্রমাণ করেছিল যে সনাতন পদ্ধতিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্বারা ইংরেজ শক্তিকে উচ্ছেদ করা যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন জাতীয় চেতনার বিকাশ। প্রসঙ্গত ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। এই বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটছিল। তবে যে দুজন বরেণ্য ব্যক্তি ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে মেদিনীপুর জেলাতে জাতীয় চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিলেন তাদের নাম হল রাজনারায়ণ বসু ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

রাজনারায়ণ বসু ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরের সরকারি জেলা স্কুলের (বর্তমানে কলেজিয়েট স্কুল) প্রধান শিক্ষকরূপে এখানে আসেন। এই পদে তিনি বৃত ছিলেন ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত। তাঁর মেদিনীপুরে অবস্থানকালীন জেলা স্কুলের উন্নতি করা ছাড়াও তিনি বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন যার লক্ষ্য ছিল শিক্ষা বিস্তার, নৈতিক জীবন গঠন, শরীর গঠন ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ। এইসব সংগঠনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মেদিনীপুরের ব্রাহ্মসমাজের পুনঃস্থাপন, জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার প্রতিষ্ঠা, সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন, বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সাধারণ পাঠাগার স্থাপন ইত্যাদি। প্রসঙ্গত জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভায় তিনি যে বক্তব্য রাখেন তারই ভিত্তিতে জাতীয় সভা ও হিন্দুমেলার সূচনা হয়। মেদিনীপুরের মাটিতে তিনি জাতীয়তাবাদের যে বীজ বপন করেছিলেন ক্রমশ তা মহীরুহে পরিণত হয়েছিল।

মেদিনীপুর জেলার সুসন্তান বিদ্যাসাগর ছিলেন মানবতাবাদী সমাজ সংস্কারক। তাঁর সৃজনী প্রতিভা সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিককে আলোকিত করেছিল। বাংলা গদ্যের নির্মাণ ও তার ভাবপ্রকাশ সাহিত্যে সৃষ্টির উপযোগী করে তুলেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সমাজকল্যাণের দৃষ্টি সামনে রেখেই তিনি সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হন। জনশিক্ষা প্রসারের জন্য 'বর্ণ পরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, 'কথামালা', 'বোধোদয়' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। মাতৃভাষায় শিক্ষার উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। নদিয়া, হুগলি, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের বিশেষ সরকারি বিদ্যালয়ের পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত হয়ে তিনি ঐ সকল জেলায় জনশিক্ষা প্রসারে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনে তাঁর এই কর্মসূচি সফল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তাই শেষপর্যন্ত তাঁকে নিযুক্তির তিন বছরের মধ্যে পদত্যাগ করতে হয়। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর জন্মভূমি বীরসিংহে একটি ইঙ্গ-সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন যে নারী শিক্ষার বিস্তার না হলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। তাই ১৮৫৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন জেলায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তার মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় স্থাপিত হয়েছিল তিনটি বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয় এবং ঐ বছরেই তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে বাংলায় প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

কৌলিন্য প্রথা ও বহু বিবাহের ন্যায় সামাজিক কলঙ্ক দূর করার জন্য তিনি সংস্কার আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু সরকারি তরফে তেমন উৎসাহ বা সমর্থন না পাওয়ায় তাঁর এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। কিন্তু তা হলেও বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক দৃঢ়তা, মানবতাবোধ মেনিদীপুর তথা সারা বাংলাদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করেছিল এবং মানসিক জড়তা কাটাতে সাহায্য করেছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ফলশ্রুতি হিসেবে বঙ্গদেশের সর্বত্র একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। মেদিনীপুর জেলাতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এই শ্রেণী ছিল রাজনীতি সচেতন। সুতরাং ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'ভারত সভা' স্থাপন করেন তখন মেদিনীপুর জেলাতে স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাব পড়েছিল। ভারতসভার উদ্দেশ্য ছিল চারটি—(১) জনমত গঠন (২) ভারতের সকল শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য স্থাপন (৩) অবহেলিত সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়তদের স্বার্থ রক্ষা করা (৪) ভারতীয় জনগণকে রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করা। ভারতসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর, ঘাটাল, কাঁথি, রামজীবনপুর প্রভৃতি স্থানে মোট ২৯টি শাখা সংগঠন খোলা হয়। এগুলিকে বলা হত রায়ত সভা। জমির উপর রায়তদের বৈধ স্বত্তাধিকার স্থাপন করাই ছিল রায়ত সভাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতসভা পরিচালিত বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এইভাবে এই জেলার মানুষ যুক্ত হয়।

ইংরেজ শাসনের অবাঞ্ছিত দিকগুলি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করানো এবং তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক প্রয়াসে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে ন্যাশানাল কনফারেন্স আহূত হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ এতে যোগদান করেন। ১৮৮৫ সালে কলকাতাতেই আবার এর দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে মেদিনীপুর শহর, রামজীবনপুর, ঘাটাল মহিষাদল প্রভৃতি স্থানের জনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যোগদান করেছিলেন।

১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ায় ভারতের রাজনীতি নতুন খাতে প্রবাহিত হয়। প্রথম থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে এই জেলার সংযোগ স্থাপিত হয়। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে এই জেলার প্রতিনিধিবৃন্দ নিয়মিত যোগদান করতেন। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন মেদিনীপুরের খ্যাতনামা উকিল জাড়ার যোগেশচন্দ্র রায়, কার্তিকচন্দ্র মিত্র, বিপিনবিহারী দত্ত প্রমুখ।

উনবিংশ শতকের ৯০-এর দশকে নীল চাষের বিরুদ্ধে গড়বেতা অঞ্চলের কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ মূর্ত হয় 'গোচর আন্দোলনে'। মেদিনীপুর জেলার নীলকর সাহেব কোম্পানি পরিচিত ছিল মেদিনীপুর জমিদারি কোম্পানি নামে। কোম্পানির দালালদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় গড়বেতা অঞ্চলের রায়তেরা নীল চাষ বন্ধ করে দেন। এতে রুষ্ট কোম্পানি অন্যায়ভাবে বহু জমিতে কৃষকদের দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা গোচারণের অধিকার বন্ধ করে দেয়। এর বিরুদ্ধে কৃষকগণ বিচারের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারস্থ হন ; কিন্তু সেখানেও তাঁরা সুবিচার পাননি। বরং কৃষকেরা গোচারণের চেষ্টা করলে জমিদারি কোম্পানির সিপাইরা বাধার সৃষ্টি করে এবং সরকারের তরফে ঐ সব জমিতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এরপর কৃষকেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে আদালতের দ্বারস্থ হন এবং শেষপর্যন্ত প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে তাদের গোচারণের অধিকার স্বীকৃত হয় এবং কৃষকদের মামলা করার যাবতীয় খরচ জমিদারি কোম্পানিকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়।

কংগ্রেসের সর্বভারতীয় অধিবেশনে সাধারণত জাতীয় সমস্যাসমূহ আলোচিত হত, সেখানে প্রাদেশিক স্তরের অভাব-অভিযোগ বা সমস্যা আলোচনার কোন সুযোগ ছিল না। তাই জাতীয় কংগ্রেসের বাঙালী নেতৃবৃন্দ এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি স্থাপন করেন এবং প্রতি বছর বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করা হয়। সেই অনুযায়ী ১৯০১ সালে মেদিনীপুরে প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশন মেদিনীপুরের মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল।

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই এই সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য প্রবল আকার ধারণ করে। যারা নিয়মতান্ত্রিক অর্থাৎ আবেদন-নিবেদনের নীতি অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন তাদের বলা হত মডারেট বা নরমপন্থী। এর প্রতিবাদে যারা সংগ্রামমুখী আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন তাদের বলা হত Extremist বা চরমপন্থী। এই আদর্শগত বিভেদের প্রভাব মেদিনীপুরেও অনুভূত হয়।

বিংশশতকের প্রথম থেকেই মেদিনীপুর চরমপন্থী বা সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। এর পেছনে রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র অরবিন্দ ঘোষের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯০২ সালে বরোদার মহারাজার চাকরি ত্যাগ করে মেদিনীপুরে আসেন এবং হেমচন্দ্র দাসকানুনগো, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে নিয়ে এখানে একটি বিপ্লবী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই কেন্দ্রের সভ্যদের মাতৃমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করতে হত গীতা ও তরবারি স্পর্শ করে। প্রসঙ্গত এই সময়ে বাংলাদেশে মোট চারটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারমধ্যে তিনটি কলকাতায় এবং একটি মেদিনীপুরে। মেদিনীপুরের বিপ্লবী কেন্দ্রটিই ছিল সর্বপ্রথম। ১৯০৩ সালে মেদিনীপুরে আসেন স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা। ধর্মালোচনা ছাড়াও তরুণদের জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সেজন্য ছাত্রদের নৈতিক ও শারীরিক উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুরে শরীর চর্চার আখড়া প্রতিষ্ঠা করলেন। সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এইসব অখড়াগুলির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ধীরে ধীরে মানুষ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন। সে এক স্বতন্ত্র অধ্যায়।

সূত্র নির্দেশ :

১। Notes on the History of Midnapur (Vol. I)
২। Midnapur District Census Report (1951)
৩। Civil Disturbances during the British Rule in India (1765—1857)—S. B. Chaudhuri
৪। স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর (প্রথম খণ্ড)—বসন্তকুমার দাস
৫। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)—ডঃ গৌরীপদ ভট্টাচার্য
৬। মেদিনীপুর ইতিহাস ও বিবর্তন (প্রথম খণ্ড)—সম্পাদক ডঃ বিনোদশঙ্কর দাশ
৭। বিদ্রোহিনী রাণি শিরোমণি ও মেদিনীপুরের প্রথম কৃষক গণবিদ্রোহ—নগেন্দ্রনাথ রায়

লেখক—প্রাক্তন অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
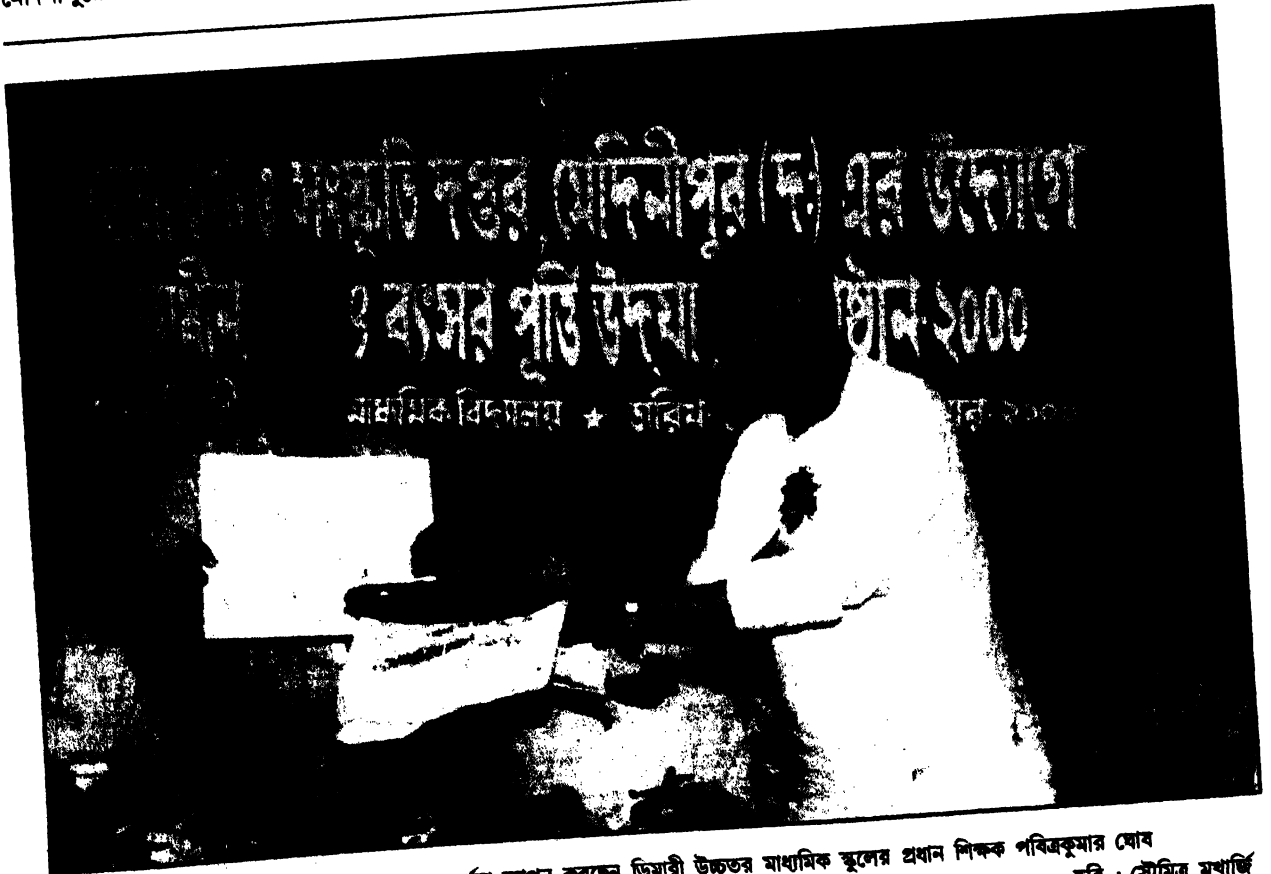
বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী সুশীলকুমার ধাড়াকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করছেন ডিমারী উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক পবিত্রকুমার ঘোষ
—ছবি : সৌমিত্র মুখার্জি
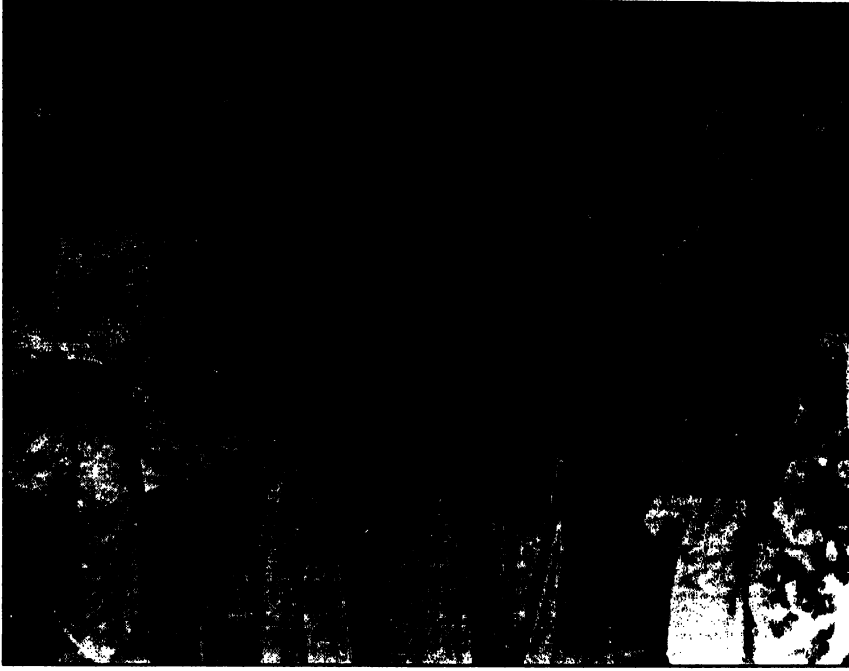
মেদিনীপুরের কংগ্রেস অধিবেশনে নেতাজী

স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর

১৯০৫-১৯৪৭

রীণা পাল

জেলা মেদিনীপুর সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মন্তব্য 'It is land of Revolt' অর্থাৎ বিদ্রোহের পীঠ-স্থান—বাস্তবিকই সুপ্রযোজ্য। বাংলার মাটিতে বাংলার মাটিতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের সূচনা লগ্নে মেদিনীপুরের আদিবাসী বা বনবাসী কৃষিজীবী এমনকি জমিদার শ্রেণীও বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিল—যথা চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৬৭-১৮০০), নায়েক বিদ্রোহ (১৮০৬-১৮১৬), জমিদার বিদ্রোহ (১৮৩৭) এবং মলঙ্গী বিদ্রোহ (১৮০০-১৮০৪)।

তারপর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে স্বাদেশিকতার পিতামহ ঋষি রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে বিভিন্ন সংস্কারমুখী আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৫১ সালে তিনি প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে আসেন) রাজনারায়ণের প্রভাবে কয়েকজন যুবক জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্যারীলাল ঘোষ এবং হেমচন্দ্র কানুনগো বিপ্লবী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৯০২) একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। "মেদিনীপুরে যে গুপ্ত সমিতি গঠিত হয় তারই সুসংগঠিত কর্ম প্রচেষ্টা ১৯০৮ সাল পর্যন্ত কেবল মেদিনীপুরে নয় সমগ্র বাংলায় এবং ভারতে এক বিপ্লব বহ্নি সৃষ্টি করেছিল।" (বসন্ত দাস—স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, প্রথম খণ্ড)।

সভা সমিতি গঠনের মাধ্যমে উদারপন্থী রাজনীতির যে ধারা উনিশ শতকের তিরিশের দশক থেকেই প্রচলিত ছিল মেদিনীপুরে তার প্রভাবও দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ ১৮৭৬ খ্রিঃ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে যে Indian Association'র প্রতিষ্ঠা হয় তার শাখা গড়ে ওঠে মেদিনীপুর সদর, ঘাটাল, রামজীবনপুর, তমলুক, কাঁথি, মহিষাদল প্রভৃতি ২৯টি এলাকায়।

জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গেও মেদিনীপুরের প্রথম দিক থেকেই যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ১৯০১ খ্রিঃ মেদিনীপুরের বার্জ টাউনে জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্ব সুরেন ব্যানার্জি, কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং জানকীনাথ ঘোষাল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন কার্তিকচন্দ্র মিত্র। সম্পাদক ক্ষীরোদবিহারী দত্ত। এঁরা ছিলেন মেদিনীপুরের সুপরিচিত কংগ্রেসসেবী। এঁরা ছাড়াও আরও একটি উল্লেখযোগ্য নাম জাড়ার যোগেশচন্দ্র রায়, যিনি কংগ্রেসের সর্বভারতীয় অধিবেশনে যোগ দিতেন।

মেদিনীপুরে জাতীয়তাবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে একটি ব্যাপক ভিত্তি ছিল তা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে পরিস্ফুট হয়। ১৯০৫'এর ৭ আগস্ট মেদিনীপুর শহরের বেলী হলে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সহস্রাধিক ছাত্রের উপস্থিতিতে বিদেশী পণ্য বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, স্বদেশী সামগ্রী সরবরাহের জন্য ছাত্র ভাণ্ডার স্থাপন, বিলাতি সামগ্রী বিক্রেতা দোকানগুলিতে পিকেটিং, পথ পরিক্রমা, সভা, হরতাল ও রাখিবন্ধন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন অংশের রাজনৈতিক তৎপরতা স্বদেশী আন্দোলনের আকার নিয়েছিল। এ সময় জেলায় বহু আখড়ার সৃষ্টি হয়। এই সব আখড়ায় চরকায় সুতাকাটা, ব্যায়াম, কুস্তি ইত্যাদি শেখান হত। "সে সময় জেলাতে আখড়ার সংখ্যা কেহ রাখে নাই, কিন্তু সমগ্র জেলায় যে উৎসাহ, উদ্দীপনা, শরীর গঠনের যে দৃঢ় মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে মনে হয় জেলাতে কয়েকশত ব্যায়াম, কুস্তি ও লাঠি খেলার আখড়া ছাত্র ও যুবক দলকে নূতন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। এমন একটিও মহকুমা বা থানা বাকি ছিল না যেখানে ব্যায়াম ও কুস্তির আখড়ার সৃষ্টি হয়নি"—(বসন্ত দাস-স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর-প্রথম খণ্ড)। যুবকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রচারে পত্র-পত্রিকার ভূমিকাও উল্লেখ্য। তাদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিল নীহার, তমালিকা এবং মেদিনীবান্ধব।

মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে শিক্ষিত ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা স্বদেশী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। জমিদার সমর্থকদের কয়েকজন হলেন—জাড়ার জমিদার যোগেশচন্দ্র রায় এবং তাঁর পুত্রদ্বয় কিশোরীপতি রায় ও সাতকড়িপতি রায়, নাড়াজলের রাজা নরেন্দ্রলাল খান ও তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রলাল খান, মুগবেড়িয়ার জমিদার দিগম্বর নন্দ,
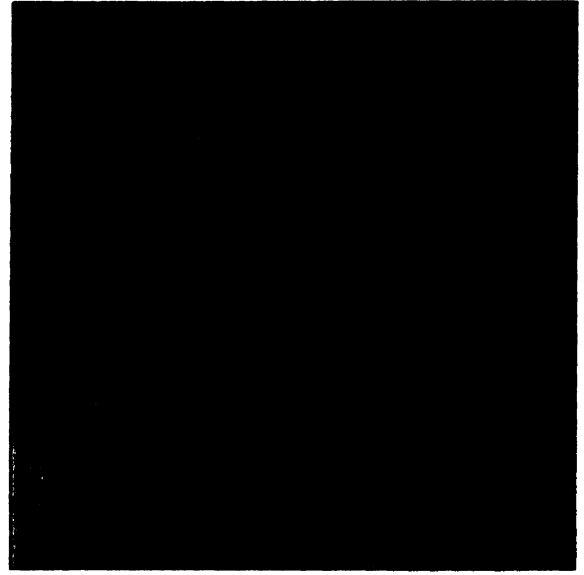
দেশভক্ত নরেন্দ্রলাল খান

কলাগেছিয়ার জমিদার গিরিশচন্দ্র মাইতি ও তাঁর পুত্র জগদীশচন্দ্র মাইতি, কাঁথির শাসমল, তমলুকের রক্ষিত প্রমুখ।

বঙ্গভঙ্গ পর্বে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্য পিকেটিংকে কেন্দ্র করে গ্রেপ্তার এবং কারাদন্ডের ঘটনা ঘটে ১৯০৮ সালে খেজুরী থানার ঠাকুর নগরের দোলপূর্ণিমা মেলায়। আদালতের রায়ে ছয় মাসের কারাদন্ড প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক হলেন—ক্ষীরোদনারায়ণ ভূঞ্যা, শশীভূষণ বেরা, সৃষ্টিধর জানা, যামিনীকান্ত পড়িয়া এবং রমেশচন্দ্র মণ্ডল।

স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপ কিন্তু থেমে থাকেনি। মেদিনীপুরে গুপ্ত সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হেমচন্দ্র কানুনগো নিজের সম্পত্তি বিক্রি করে প্যারিসে বোমা তৈরির কৌশল শিখতে যান (১৯০৬ আগস্ট)। তিনি ফিরে এসে ৩২ নম্বর মুরারিপুকুর রোডের বাগান বাড়িতে যুগান্তর দলের বিপ্লবীদের সঙ্গে বোমা প্রস্তুত কার্যে লিপ্ত হলেন। প্রথম বোমাটি তৈরি হলো পূর্ববঙ্গের লেফটেন্যান্ট গভর্নর র‍্যামফিল্ড ফুলারকে মারার জন্য, কিন্তু ব্যর্থ হলো। এরপর মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় স্টেশনের নিকট ট্রেন ধ্বংস করে ছোটলাট অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের জীবননাশের চেষ্টা করেও বিপ্লবীরা ব্যর্থ হলো (১৯০৭, ৬ ডিসেম্বর)। এর ফলে মেদিনীপুর বোমার মামলা নামে খ্যাত একটি মামলা সরকার কর্তৃক দায়ের করা হয়, তাতে শতাধিক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়। তারপর বিপ্লবীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হলেন মজঃফরপুরের অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড। হেমচন্দ্রের সুপারিশে মেদিনীপুরের কিশোর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুকে প্রফুল্ল চাকির সঙ্গে এই কাজের জন্য মজঃফরপুরে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিপ্লবীদের বোমায় (১৯০৮, ৩০ এপ্রিল) কিংসফোর্ডের পরিবর্তে নিহত হলেন মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি। প্রফুল্ল চাকি ধরা পড়ার পূর্বেই আত্মহত্যা করেন এবং বন্দী ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয় (১৯০৮, ১১ আগস্ট)। এই
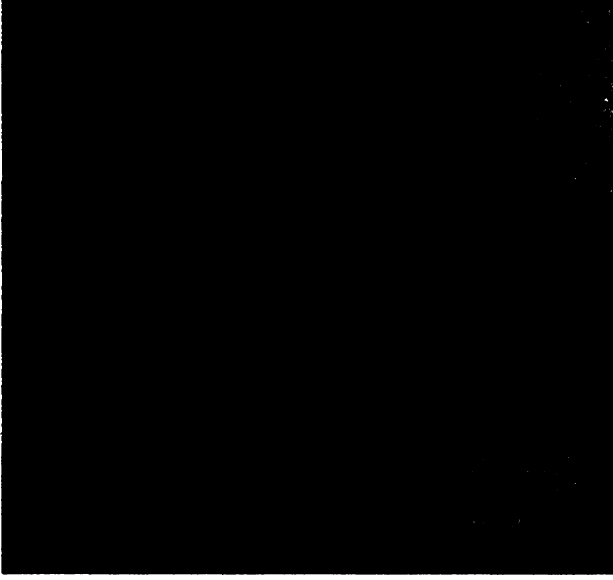
শহীদ ক্ষুদিরাম বসু

হত্যাকাণ্ডের সূত্র ধরে কলকাতা ও মেদিনীপুরে তল্লাশ চালিয়ে পুলিশ সমগ্র গুপ্ত দলকে গ্রেপ্তার করে। শুরু হয় আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা। এই মামলা চলার সময় নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী রাজসাক্ষী হওয়ায় তাঁকে জেলের মধ্যে মেদিনীপুরের গুপ্ত সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সত্যেন বসু ও কানাইলাল দত্ত হত্যা করেন (১৯০৮, ১ সেপ্টেম্বর)। ফলে সত্যেন ও কানাইলালের ফাঁসি হয়। আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হেমচন্দ্র কানুনগোর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয় এবং পূর্ণচন্দ্র সেনের কারাদন্ড হয়।

অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে অনেক রাজনৈতিক ডাকাতি হয়েছিল। ১৯০৯ খ্রিঃ নদিয়া জেলার হলুদ বাড়িতে বিপ্লবী বাঘা যতীনের নির্দেশে যে রাজনৈতিক ডাকাতি হয়েছিল সেই মামলায় অভিযুক্ত মেদিনীপুরের গণেশ দাস ও শৈলেন দাসের সাত বছর সশ্রম কারাদন্ড হয়েছিল।

মেদিনীপুরের বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য কর্তৃপক্ষ ১৯১৩ সালে জেলা বিভাগের দ্বারা এর সংঘশক্তি দুর্বল করার চেষ্টা করলে জেলার জনসাধারণের তীব্র প্রতিবাদে সে প্রস্তাব কার্যকরী হতে পারেনি।

১৯১৪'এর আগস্ট মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। বিপ্লবী বাঘা যতীনের পরিকল্পনা অনুযায়ী জার্মানি থেকে মাভেরিক জাহাজে অস্ত্র আমদানির যে ব্যবস্থা বিপ্লবীগণ করেছিলেন তাতে মেদিনীপুরের গড়বেতা থানার বসন্ত সরকারের উপর চাঁদ-বালিতে থেকে অস্ত্রশস্ত্র রাখার দায়িত্ব পড়েছিল। শুধু তাই নয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর পরি-কল্পনা মত সারা ভারত-ব্যাপী যে বিদ্রোহ সং-গঠনের ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে মেদিনীপুর জেলার দায়িত্ব ছিল বসন্ত সরকার, তারাপদ মুখার্জি, বিপিন হাজরা, মনু ভট্টাচার্য প্রমুখের উপর। এই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। ভারত রক্ষা আইনে বসন্তবাবু গ্রেপ্তার হন। তিনি চার বছর অন্তরীণ ছিলেন।

এই সময় ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব দেশবাসীর সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করে দিল। বিপ্লবী আন্দোলন দমনকারী রৌলট আইন, জালিয়ানাওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড এবং মুসলমান সমাজের ধর্মগুরু খলিফার মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নকে সামনে রেখে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে (১৯২০, ৪ সেপ্টেম্বর) অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হলে মেদিনীপুর জেলাতে অভূতপূর্ব জাগরণের সৃষ্টি হয়। অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়েছিল তার প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন মেদিনীপুরের বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাস। শুধু তাই নয় মেদিনীপুরে তাঁকে সভাপতি এবং কিশোরীপতি রায়কে সম্পাদক নির্বাচিত করে যে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়েছিল তার অধীনে শাখা সংগঠন হিসেবে পর্যায়ক্রমে স্থাপিত হয় তৎকালীন চারটি মহকুমায়, তেত্রিশটি থানায় এবং দুই শত সাতাশটি ইউনিয়নে কংগ্রেস কমিটি। শাখা প্রশাখায় সংগঠনের বিস্তৃতির ফলে মেদিনীপুর গণসংগঠন, গণচেতনা এবং গণআন্দোলন সুষ্ঠভাবে পরিচালনা শুধু অসহযোগ আন্দোলনে নয়, আইন অমান্য এবং ভারত ছাড় আন্দোলনেও সম্ভব হয়েছিল অধিকতর তৎপরতায় এবং দক্ষতায় (ডাঃ রাসবিহারী পাল এবং অধ্যাপক হরিদাস মাইতি— স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, তৃতীয় খণ্ড)।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচির দুটি দিক ছিল— গঠনমূলক ও বর্জনমূলক। স্বদেশীকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে চরকা ও তাঁতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অস্পৃশ্যতা বর্জন, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপন, মাদকদ্রব্য বর্জন, লোকমান্য তিলকের স্মৃতিতে একটি স্বরাজ্য তহবিল গঠন প্রভৃতি বিষয়গুলি গঠনমূলক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। অপরপক্ষে সম্মানীয় পদ ও সরকারি
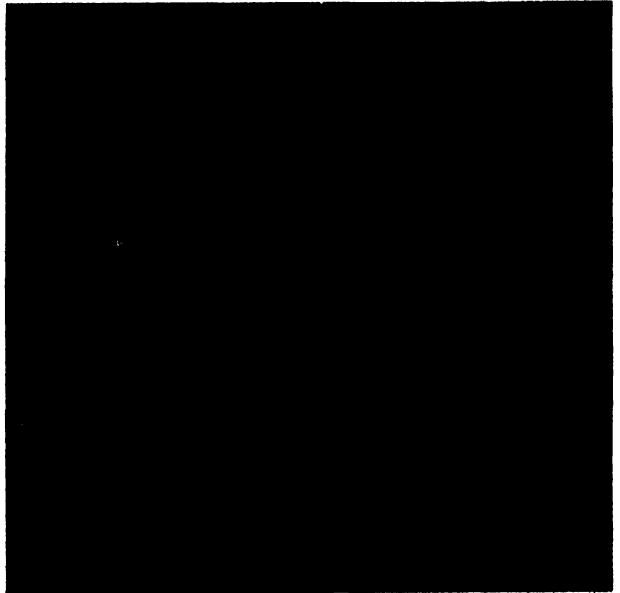
শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ বসু

উপাধি বর্জন, সরকারি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্জন এবং বিদেশী পণ্য বর্জন প্রভৃতি বিষয়গুলি দ্বিতীয় কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্জনমূলক কর্মসূচি অনুসৃত হয়েছিল মেদিনীপুর জেলায় বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনায়। বাংলাদেশে হাইকোর্টে আইন ব্যবসা পরিত্যাগকারী প্রথম আইনজীবী হলেন মেদিনীপুরের বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। বীরেন্দ্রনাথের পথ অনুসরণ করে জেলায় আইনজীবীদের একাংশ আদালত বর্জন করেছিলেন। হাইকোর্টে বীরেন্দ্রনাথ ছাড়াও আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করেন সাতকড়িপতি রায়। জেলায় বিভিন্ন আদালত যাঁরা বর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আইনজীবী ছিলেন ১৭ জন, মোক্তার ৩ জন এবং ১ জন মুহুরি। আদালত বর্জনের পরিপূরক হল সালিশী বিচার। জেলার প্রতিটি থানায় · সালিশী আদালত গঠিত হয় গণ্যমান্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে।

মেদিনীপুরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষক সরকারি স্কুল ও কলেজ ত্যাগ করে আন্দোলনে অংশ নেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনেও মেদিনীপুর সক্রিয় ছিল। কাঁথি মহকুমার কলাগেছিয়া জাতীয় বিদ্যালয়, তমলুক মহকুমার অনন্তপুর ও কাঁকুড়দা জাতীয় বিদ্যালয় ছাড়াও জেলায় বেশ কিছু সংখ্যক মধ্য ও প্রাথমিক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। এবং এই সকল বিদ্যালয় যাদবপুরের জাতীয় শিক্ষা সংসদের অনুমোদন প্রাপ্ত ছিল। জেলার জাতীয় স্কুলগুলির শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ চরকা ও খদ্দর জনপ্রিয় করতে সচেষ্ট ছিলেন। নন্দীগ্রাম থানার কুলাপাড়া ও দুর্গাচক, ভগবানপুর থানার জুখিয়া, রামনগরের কাদুয়া, সবং-র বিষ্ণুপুর এবং পটাশপুরের অমর্ষি উল্লেখযোগ্য খাদি কেন্দ্র ছিল। মদ বিক্রয় কেন্দ্রে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের সত্যাগ্রহের ফলে জেলায় মদ বিক্রয় অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে পঙ্ক্তি ভোজনের ব্যবস্থা হয়। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সুদৃঢ়করণের জন্য প্রতিটি মহকুমায় গঠন করা হয় শান্তি কমিটি।

সমগ্র জেলাতে যখন অসহযোগ কর্মযজ্ঞের বিপুল সাড়া পড়ে গিয়েছিল সেই সময় জেলাতে একটি নূতন আইনের প্রবর্তন জনগণের দৃষ্টিকে সচকিত করে তুলেছিল। বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইনের বলে সরকার মেদিনীপুর জেলায় পঞ্চায়েতী প্রথার পরিবর্তে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনে প্রবৃত্ত হোল। এই আইনের বিধান অনুসারে লোকের উপর ১২ টাকার স্থলে ৮৪ টাকা ট্যাক্স হতে পারে এমন সম্ভাবনা থাকায় লোকে ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ল। সরকারিভাবে প্রদেশ কংগ্রেসের সম্মতি ও গান্ধিজীর কাছ থেকে সাংগঠনিক পর্যায়ে অনুমতি না পাওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের উপর নির্ভর করে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল নির্ধারিত ট্যাক্স প্রদানে বিরত থেকে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেন। গ্রামীণ সমাজের সকল প্রকার শক্তি আন্দোলনে যুক্ত হয় এবং ক্রমে ক্রমে তা সমগ্র জেলায় বিস্তার লাভ করে। জেলার সর্বত্রই সরকার কোনরকম ট্যাক্স আদায় করতে পারেনি। বিনা বাধায় মাল ক্রোক হয়েছে এবং ক্রোকী মাল বিক্রয় করা সম্ভব হয়নি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর Indian Struggle গ্রন্থে লিখেছেন—The success of the No Tax Campaign gained Considerable strength and self confidence to the people of Midnapore and popularity to their leader Mr. B. N. Sasmal. এইভাবে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের সমবেত প্রতিরোধের ফলে সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় ২২৭টি ইউনিয়ন বোর্ড ১৯২২ সালের প্রথম দিকেই প্রত্যাহৃত হয়েছিল। 'আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের মেদিনীপুর জেলার এই ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ আন্দোলনই প্রথম সফল সত্যাগ্রহ। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে নবার্জিত এই সাফল্য শোষণের বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সাধারণ লোককে সচেতন করে তুলেছিল এবং পরবর্তীকালের ভাগচাষ আন্দোলনগুলিতে বোর্ড বর্জন আন্দোলনের প্রভাব ছিল অপরিসীম। এইভাবে জাতীয়তাবাদী গ্রামীণ নেতৃবর্গের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথই প্রথম ব্যক্তি যিনি সম্পন্ন থেকে দরিদ্র সব সম্প্রদায়ের সকল স্তরের লোককে কংগ্রেসের পতাকা তলে সমবেত করে সাফল্যের সঙ্গে উপনিবেশিক শক্তির বিরোধিতা করেন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে জনসাধারণের অংশ গ্রহণের মধ্যে গান্ধী আদর্শের বাস্তব রূপদান করেন (বিনোদশঙ্কর দাস—মেদিনীপুর-ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন)।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

১৯২২'এর ৫ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশের চৌরিচৌরার হিংসাত্মক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। আন্দোলন প্রত্যাহারে গান্ধীর সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের অনেক নেতার মনঃপূত হয়নি। এই অবস্থায় চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবর্গ তখনকার ব্যবস্থাপক সভায় যোগদানের মাধ্যমে অবাঞ্ছিত ও জনস্বার্থ-বিরোধী আইনের বিরোধিতা
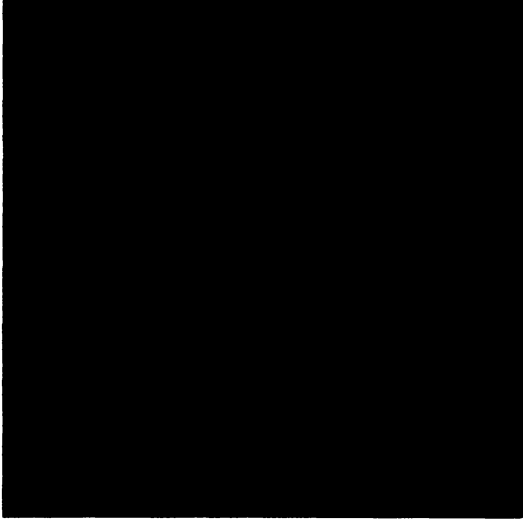
শহীদ কানাইলাল দত্ত

করবার উদ্দেশ্যে নতুন কর্মসূচি নিয়ে স্বরাজ্য দল নামে এক পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। মেদিনীপুর জেলার কর্মীগণের উপর এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়েছিল। মেদিনীপুরের গ্রামীণ সংগঠকরা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দলে প্রবেশ করেন এবং গান্ধীপন্থী পরিবর্তন বিরোধীরা গঠনমূলক কর্মসূচিতে আত্মনিয়োগ করেন।

এই রাজনৈতিক পর্ব পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় মেদিনীপুরে বিপ্লবী আন্দোলন আরম্ভ হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং এই আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে পরিমলকুমার রায়, প্রফুল্ল ত্রিপাঠী, পুলিনবিহারী মাইতি, বীরেন্দ্রনাথ মাঝি, সন্তোষকুমার মিশ্র ও হরিপদ ভৌমিক প্রমুখ ছাত্রদের মিলিত চেষ্টায় মেদিনীপুর শহরের টাউন স্কুলে 'মিলন মন্দির' নামে একটি ক্লাব গঠিত হয় (১৯২৪)। আবার এদেরই চেষ্টায় শহরের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হয় মেদিনীপুর যুব সংঘ (১৯২৭'এর ফেব্রুয়ারি)। যুব সংঘের সভাপতি ছিলেন রাজা দেবেন্দ্রলাল খান। এই সময়ে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার গ্রুপের দীনেশচন্দ্র গুপ্ত (বাংলার অন্যতম শহিদ) মেদিনীপুরে এসে মেদিনীপুর কলেজের ছাত্ররূপে স্বীয় কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে থাকেন। দীনেশ গুপ্ত মেদিনীপুরে আসার পর মেদিনীপুরের যুব গোষ্ঠী দীনেশের কেন্দ্রীয় সংগঠন, বি ভি'র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কালক্রমে মেদিনীপুরের বি ভি গোষ্ঠী একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়। মেদিনীপুরে পর পর তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিধন এই গোষ্ঠীর দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

১৯২৯'এর ৩১ ডিসেম্বর লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। অহিংস সংগ্রামের পথে আইন অমান্য, ট্যাক্স বন্ধ প্রভৃতি কর্মধারা অনুসরণ করে পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনার নেতৃত্ব ন্যস্ত হয় মহাত্মা গান্ধীর উপর। ১৯৩০'এর ১২ মার্চ লবণ আইনভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে গান্ধী সবরমতী আশ্রম থেকে ৭৯ জন সহকর্মী নিয়ে গুজরাটের ডান্ডি অভিমুখে পদযাত্রা শুরু করেন, এবং ৬ এপ্রিল ডান্ডিতে লবণ তৈরি করে সমগ্র দেশব্যাপী লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।

মেদিনীপুর জেলার প্রায় সর্বত্রই আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছিল। ৬ এপ্রিল থেকে সমুদ্র উপকূলবর্তী কাঁথি ও তমলুক মহকুমার বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত লবণ প্রস্তুতের কর্মসূচি অব্যাহত থাকে। যে সকল স্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাদের অন্যতম হল কাঁথি মহকুমার পিছাবনী এবং তমলুক মহকুমার নরঘাট। কাঁথি মহকুমার পিছাবনীতে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের স্বেচ্ছাসেবীরা লবণ আইনভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে সমবেত হন। বে-আইনি লবণ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কাঁথি মহকুমায় ৫৬টি কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। ১৯৩০'এর মে মাসের মধ্যে তমলুক মহকুমায় ৯টি লবণ উৎপাদন কেন্দ্র খোলা হয়। মেদিনীপুর জেলায় লবণ আইন অমান্য আন্দোলন বিশেষ জোরদার হয়। এই সংগ্রাম দুর্বার আকার ধারণ করে যখন মহিলাগণ মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে লবণ সত্যাগ্রহে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করেন। কয়েকটি লবণ কেন্দ্র পরিচালিত হয়েছিল মহিলাদের দ্বারা। ভগবানপুর থানার শিউলিপুর, ময়না থানার ঘোড়ামারা এবং নন্দীগ্রামের বারদুয়ারি লবণকেন্দ্র পরিচালিত হয়েছিল মহিলাদের নেতৃত্বে। লবণ সত্যাগ্রহ পর্বে কারাদন্ডপ্রাপ্ত মহিলাগণ হলেন— তমলুক মহকুমার মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রভাবতী মাইতি, লক্ষ্মীমণি হাজরা, চারুশীলা জানা, সুরমা হোতা, কিরণবালা মাইতি, মায়ালতা দাস, ননীবালা দাস, যমুনাবালা দেবী, সুবোধবালা কুইতি, ইন্দুমতী ভট্টাচার্য, প্রভাবতী সিংহ, চিকনবালা জানা, সুহাসিনী দেবী, সত্যবতী দেবী, নিত্যবালা গোল, চিন্ময়ী দাস,

শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা
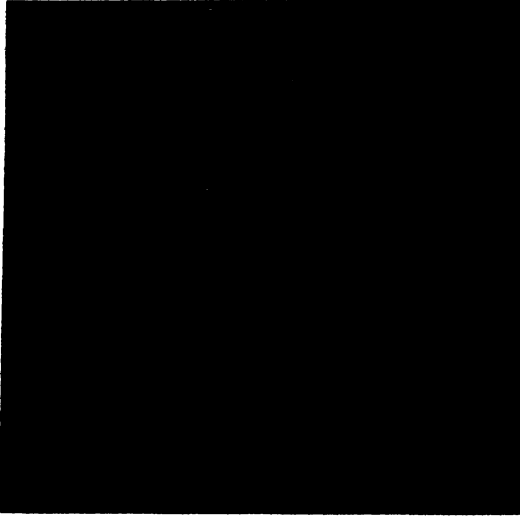
শহীদ মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত

নিত্যবালা জানা, লক্ষ্মীরানি চ্যাটার্জি, গিরিবালা প্রধান, কাদম্বিনী প্রধান, খুল্লনা প্রধান, হিরণময়ী দাস, নিমাইবালা মাইতি, প্রসন্নকুমারী মাইতি, যামিনীবালা মাইতি, সৌদামিনী দাস, কৈলাসী মিশ্র, শোভাময়ী দাস, চিকনবালা ভারতী, বিজয়া দাস, নিস্তারিণী দাস, দুর্গাময়ী বেরা প্রমুখ। কাঁথি মহকুমার সিন্ধুবালা মাইতি, সুখদাময়ী রায়চৌধুরী, কুসুমকুমারী মণ্ডল, গীতা ভৌমিক, ভগবতী শাসমল, রাজবালা শাসমল, বিন্দুবালা দাস, মাতঙ্গিনী পাল, নর্মদা পাল, কোকিলকুমারী দাস, সত্যভামা জানা, প্রভাবতী ব্যানার্জি, সৌদামিনী পাহাড়ী, বিজনবালা গিরি, সাবিত্রী মান্না, সুখদামণি দাস, অন্নদামণি দাস, রাসবালা মাইতি, বাসন্তী বেরা, মুক্তকেশী তামলি, সুনীতি গিরি, দময়ন্তী গিরি, সরোজিনী গিরি, শান্তিলতা গিরি, জাহ্নবী দাস, মণিবালা মান্না, হরিপ্রিয়া দাস প্রমুখ। মেদিনীপুর মহকুমার চারুশীলা গোস্বামী, বিন্দুবালা শাসমল, ননীবালা মাইতি, নিবারণী দাস, সরযূশোভনা বসু, বিরাজমোহিনী মাইতি, মনোরমা দাস, সরযূবালা দাস, সুরূপা দাস, সত্যেশ্বরী বোস, সাবিত্রীরানি বোস, সুকুমারী বোস, চারুশীলা সেনগুপ্ত, সুষমা সেনগুপ্ত, চারুশীলা পালিত, কাননবালা পট্টনায়ক, অম্বিকাবালা দাসী, সাবিত্রী দে, সত্যবালা দাসী, সুশীলাবালা দে প্রমুখ। 'কারাদণ্ডের দিক দিয়ে বিচার করলে বাংলাদেশে মেদিনীপুরের স্থান দ্বিতীয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসারে লবণ সত্যাগ্রহে মেদিনীপুরে কারারুদ্ধ সত্যাগ্রাহীর সংখ্যা ১৪২৯ জন' (স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, তৃতীয় খণ্ড)।

মেদিনীপুরে আন্দোলনের ব্যাপকতা রোধে কর্তৃপক্ষ ১৯৩০'এর ৬ মে মেদিনীপুর, কাঁথি, তমলুক ও ঘাটালের আইন অমান্য পরিষদগুলি বে-আইনি ঘোষণা করে। শুধু তাই নয় আইন অমান্য আন্দোলনের কবল থেকে রেহাই পাবার জন্য জেলাশাসক জেমস পেডি জেলা বিভাজনে পর্যন্ত উদ্যত হয়েছিলেন। যদিও তাঁর সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। বর্ষা সমাগমে লবণ কেন্দ্রগুলিতে যথাযথভাবে কাজ চালান সম্ভবপর না হওয়াতে গ্রামে গ্রামে ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন শুরু হোল। বৃটিশ সরকারও ব্যাপক সন্ত্রাস চালিয়ে আন্দোলনের গতিরুদ্ধ করতে চাইল। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশে পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে। কাঁথি মহকুমার প্রতাপদীঘি ও নরঘিয়া, ঘাটাল মহকুমার চেচুঁয়াহাটে লবণ আইন অমান্য আন্দোলন কালে এবং সদর মহকুমার ক্ষীরাই, কাঁথি মহকুমার খেরসাই এবং চোরাপালিয়ায় খাজনা বন্ধ আন্দোলন কালে জনসাধারণের প্রতিরোধ আন্দোলন প্রবল হয়। জনসাধারণের প্রতিরোধ ভেঙে ফেলতে পুলিশ গুলি চালালে প্রতাপদীঘিতে ৩ জন, নরঘিয়াতে ১ জন, চেচুঁয়াহাটে ১৪ জন, ক্ষীরাই'এ ১৭ জন, খেরসাই'এ ১ জন, চোরাপালিয়ায় ৩ জন মৃত্যুবরণ করেন।

মেদিনীপুরবাসীর দুই পর্বের লবণ সত্যাগ্রহ (১৯৩০-১৯৩৪) সমগ্র ভারতের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লবণ সত্যাগ্রহে মেদিনীপুরবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকাকে অভিনন্দন জানিয়ে মহাত্মা গান্ধী এক পত্রে লেখেন—I tender my congratulation for your courage and patience with which you have borne your sufferings.

এদিকে মেদিনীপুরের বিপ্লববাদী কাজকর্মে আইন অমান্য আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব দেখা যায়। মেদিনীপুরের বি ভি গোষ্ঠীর সদস্যরা আইন অমান্য আন্দোলনে পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে রাজনৈতিক হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯৩১'এর ৭ এপ্রিল বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত ও জ্যোতিজীবন ঘোষের গুলিতে অত্যাচারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডি নিহত হন। পেডি নিধনের পর বিমল দাশগুপ্ত এবং জ্যোতিজীবন দুজনেই কলকাতায় পালিয়ে এলেন। ১৯৩১'এর ২৯ অক্টোবর কলকাতায় ইউরোপীয় বণিক সমিতির সভাপতি ভিলিয়াসকে তাঁর অফিসে হত্যার চেষ্টার মাধ্যমে বিমল দাশগুপ্ত আবার
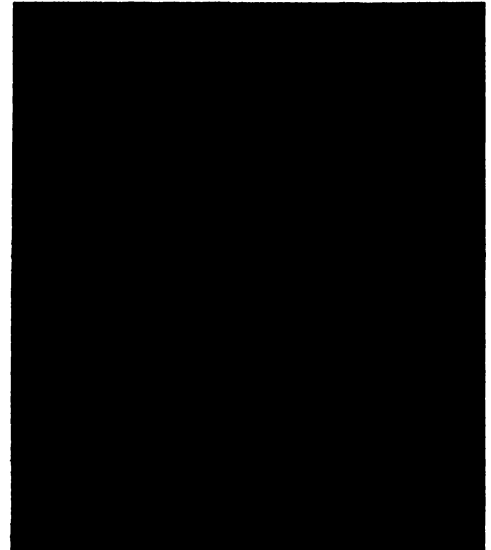
শহীদ অনাথবন্ধু পাঁজা

আত্মপ্রকাশ করলেন। স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের বিচারে বিমলের দশ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড হয়। প্রমাণাভাবে পেডি হত্যার দায়ে বিমলকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়নি। ১৯৩২'এর ৩০ এপ্রিল মেদিনীপুরের দ্বিতীয় জেলাশাসনকর্তা মিঃ ডগলাস জেলাবোর্ড অফিসে মিটিং চলাকালীন দুই তরুণ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও প্রভাংশু পালের রিভলবারের গুলিতে নিহত হলেন। ১৯৩৩'এর ১২ জানুয়ারি তারিখে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রদ্যোতের ফাঁসি হয়। আর প্রভাংশুর নাম অজ্ঞাত থেকে যায়। পর পর দুজন জেলাশাসকের হত্যাকাণ্ডে মেদিনীপুরে নেমে আসে ভয়াবহ পুলিশী নির্যাতন। ১৯৩৩'এর ২ সেপ্টেম্বর বাংলার ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় দিন। মেদিনীপুরের দুই কিশোর বিপ্লবী অনাথ পাঁজা ও মৃগেন দত্ত তদানিন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বার্জকে পুলিশ লাইনের সুরক্ষিত এলাকার মধ্যে হত্যা করে চরমদণ্ড দেন। বার্জের দেহরক্ষীর গুলিতে বিপ্লবীদ্বয়ের মৃত্যু হয়। এ ঘটনার অব্যবহিত পরে কামাখ্যা ঘোষ, নন্দদুলাল সিংহ, সুকুমার সেন, সনাতন রায় নির্মলজীবন ঘোষ, রামকৃষ্ণ রায় ও ব্রজকিশোর চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, নির্মলজীবন ঘোষ ও রামকৃষ্ণ রায়ের হল মৃত্যুদণ্ড, অপর আসামীগণকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্যন্ত বার্জ হত্যাকাণ্ডই বোধ হয় সমগ্র বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের শেষ সফল প্রয়াস' (বিনোদশঙ্কর দাস—মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন)।
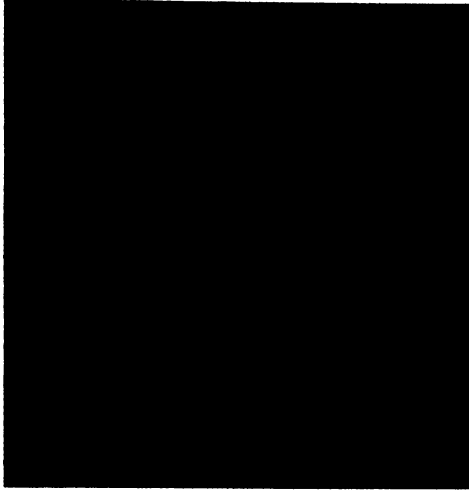
শহীদ রামকৃষ্ণ রায়

১৯৩৯'এর সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হোল। ভারতীয়দের মতামতের তোয়াক্কা না রেখে ব্রিটিশ সরকার ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করল। এই পটভূমিতে এল গান্ধিজীর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের আহ্বান। এতে পরীক্ষিত কর্মীদের বাছাই করা হল। তাঁরা যে যার কেন্দ্রস্থল থেকে প্রচার করতে করতে দিল্লির দিকে এগোবে। প্রচার হিসেবে থাকবে "এ যুদ্ধ আমাদের নয়, এতে একটি পয়সাও নয়—একটি মানুষও নয়।" ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রেও মেদিনীপুর অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে।

ভারতে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সহযোগিতা লাভ করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আপসমূলক প্রস্তাব প্রকাশ করেন এবং স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে ভারতবর্ষে আপস মীমাংসার জন্য পাঠানো হচ্ছে বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু ক্রীপসের প্রস্তাবে ভারতকে স্বাধীনতা দানের কোন উল্লেখ ছিল না। এই কারণে জাতীয় কংগ্রেস ক্রীপসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস ১৯৪২'এর ৮ আগস্ট ভারত ছাড় প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই সংগ্রামী প্রস্তাবের অপেক্ষায় সারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষ কত উৎকণ্ঠা, কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। সারা ভারতবর্ষে সাজ সাজ রব, মেদিনীপুরেও পড়ে গিয়েছিল সাজ সাজ রব।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কট, সভা সমিতির মাধ্যমে আন্দোলনের লক্ষ্য প্রচার, থানায় থানায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন প্রভৃতি প্রস্তুতির মাধ্যমে আন্দোলনের সূচনা হয়। যেমন—তমলুক মহকুমায় পরীক্ষিত বাছাই স্বেচ্ছা-সেবকদের নিয়ে 'বিদ্যুৎ বাহিনী' এবং মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাদের নিয়ে 'ভগিনী সেনা' গঠন করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের আন্দোলনের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে এই মহকুমায় 'বিপ্লবী' নামক বুলেটিন আত্মপ্রকাশ করে ১৯৪২'এর ২৪ সেপ্টেম্বর। আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে এক গোপন সভায় স্থির হয়েছিল যে ২৯ সেপ্টেম্বর সমগ্র জেলায় সরকারি আদালত, অফিস ও পুলিশ থানা ও অন্যান্য সরকারি কর্মকেন্দ্র একযোগে আক্রমণ করা হবে। এই উদ্দেশ্যে জেলার বিভিন্ন মহকুমায় সমর পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪২'এর ২৮ সেপ্টেম্বর রাত্রিতে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক জেলার প্রধান সড়ক ব্যবস্থা ছিন্ন করে। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে পরিবহন ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তোলেন। পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৯ সেপ্টেম্বর জেলার বিভিন্ন অংশে জনগণ একযোগে ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হয়। তমলুক থানা আক্রমণ কালে পুলিশের গুলিতে ৭৩ বৎসরে বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা সহ দশজনের মৃত্যু হয়। থানা আক্রমণকালে পুলিশের গুলি বর্ষণে মহিষাদলে তেরোজন এবং নন্দীগ্রামে পাঁচজন নিহত হন। এই ভাবে

শহীদ ব্রজকিশোর চক্রবর্তী

ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমা ও কাঁথি মহকুমার পটাশপুর ও খেজুরিতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তমলুক বা তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত, অর্থসচিব—অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এবং সমর ও স্বরাষ্ট্র সচিব ছিলেন সুশীলকুমার ধাড়া। এই জাতীয় সরকার দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। ১৯৪২'এর ১৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৪'এর ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সরকার কাজ করে গেছে। গান্ধীর নির্দেশে ১৯৪৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর জাতীয় সরকার আত্মসমর্পণ করে।

শহীদ নির্মলজীবন ঘোষ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান (১৯৪৫, আগস্ট) ও ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পর ভারতে দেখা দেয় গণ-অভ্যুত্থানের এক কালপর্ব। এই কালপর্বের নেতৃত্ব ছিল প্রধানত কমিউনিস্টদের হাতে। ছাত্র ফেডারেশন, কিষাণ সভা এবং ট্রেড ইউনিয়নে তারা তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ১৯৩৮ সালের শেষ দিকে মেদিনীপুর শহরে কমিউনিস্ট পাঠচক্র ও ছাত্র ফেডারেশন গঠনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট কার্যক্রমের সূচনা হয়। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে খড়গপুর ও মেদিনীপুর শহর, তমলুক মহকুমার মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, লক্ষ্যা, মহম্মদপুর ও কলাগেছিয়া, কেশপুর থানার আমলপুর এবং দাসপুর থানার কালোড়ায় কমিউনিস্ট পার্টির শাখাকেন্দ্র খোলা হয়। ১৯৩৮ সালে মেদিনীপুর জেলায় কিষাণ সভার কার্যক্রমের সূত্রপাত হয়। মেদিনীপুর জেলায় কিষাণসভা গঠনে ভূপাল পাণ্ডা, সরোজ রায়, মোহিনী মণ্ডল এবং দেবেন দাশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা ফ্লাউড কমিশনের (১৯৪০) সুপারিশ অনুযায়ী ফসলের দুই তৃতীয়াংশ ভাগচাষীর অধিকার আদায়ে ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তেভাগা আন্দোলন শুরু করে। কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি মেদিনীপুরেও কৃষকসভার নেতৃত্বে তেভাগা সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে। এই জেলায় তেভাগা আন্দোলন তমলুক ও ঘাটাল মহকুমায় জঙ্গী রূপ গ্রহণ করে। বিশেষ করে নন্দীগ্রাম, মহিষাদল, সুতাহাটা, পাঁশকুড়া থানায় জোতদার ও পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে কৃষকসভার স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে। কৃষক পরিবারের তরুণী বিমলা মাঝির নেতৃত্বে কৃষক নারী বাহিনী প্রতিরোধ আন্দোলনে এগিয়ে এসেছিল। সরকারি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল যে পুলিশ বাহিনীকে 'অস্ত্র সজ্জিত হয়ে মহিলা সমেত কৃষক জনতা ঘেরাও করে', এক সংঘর্ষে পুলিশ গুলি চালায়। জনতার কাছে পুলিশ পরাজিত হয় এবং দুটি গুলি ভরা বন্দুক পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা হয়। ১৯৪৭'এর ২৭ ফেব্রুয়ারি মেদিনীপুর জেলার পাঁচখুরি গ্রামে প্রদেশিক কৃষক সম্মেলনের দশম অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন কৃষ্ণবিনোদ রায়। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে কিছু সংখ্যক আন্দোলনকারী নেতার গ্রেফতার এবং অন্যান্য নেতার আত্মগোপনের ফলে জেলায় তেভাগা আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। "বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণ সভার প্রতিবেদন অনুযায়ী তেভাগা আন্দোলনে অবিভক্ত বাংলার ৩১১৯ জন বন্দীর মধ্যে মেদিনীপুরের বন্দী সংখ্যা ছিল ২০০" (বিনোদশংকর দাস—মেদিনীপুর, ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন)।

এ পর্যন্ত যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল, তা থেকে আমরা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারব যে মেদিনীপুর জেলার সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, কাবিগর থেকে সামন্ত প্রভু জমিদারগণ সকলেই বিভিন্ন সময়ে কখনও একত্রে, কখনও বা আলাদা আলাদা ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যাপক অংশগ্রহণ করেছে। তাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের স্থান প্রশ্নাতীত।

সূত্র নির্দেশ :

১। স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড—বসন্তকুমার দাস।
২। স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর-তৃতীয় খণ্ড—ডাঃ রাসবিহারী পাল এবং অধ্যাপক হরিপদ মাইতি।
৩। মেদিনীপুর, ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন—প্রথম খণ্ড—সম্পাদক বিনোদশঙ্কর দাস।
৪। বাংলার হলদিঘাট তমলুক—গোপীনন্দন গোস্বামী।
৫। শহিদ রক্তে সিক্ত মেদিনীপুর—মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতি।
৬। কৃষকসভার ইতিহাস—মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল।
৭। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী—কমলা দাশগুপ্ত।
৮। নন্দীগ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রাম—বঙ্গভূষণ ভক্তা।
৯। স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর—তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য।
১০। স্বাধীনতা সংগ্রামের মঞ্চে ভারতের নারী—কৃষ্ণকলি বিশ্বাস।
১১। স্বাধীনতা সংগ্রামে সুতাহাটা—বঙ্কিম ব্রহ্মচারী।
১২। মেদিনীপুরে স্বাধীনতার গণসংগ্রাম—খেজুরী থানা বসন্তকুমার দাস।
১৩। ডেবরা থানার ইতিকথা—বলাইচন্দ্র হাজরা।
১৪। বাংলার তেভাগা সংগ্রাম—সুনীল সেন।
১৫। ভারতের কৃষক আন্দোলন—সুনীল সেন।
১৬। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে রক্ষিত রেকর্ডস্।

লেখক : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

স্বাধীনতা-উত্তর মেদিনীপুরের গণ-আন্দোলন

(১৯৪৭-১৯৬৫)

শ্যামাপদ ভৌমিক

সংগ্রামই মেদিনীপুর জেলার সনাতন ঐতিহ্য। যার সূচনা, যতদূর জানা যায়, মধ্যযুগের প্রথমভাগ থেকেই। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের মেদিনীপুরবাসীর ঐতিহাসিক গণ-আন্দোলনসমূহ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসনের ভিতকে নড়িয়ে দিয়েছিল।

ভারতের জাতীয় দলগুলির রাজনৈতিক কৌশলি কার্যকলাপ কিংবা বাক্‌সর্বস্ব বক্তৃতার জন্য নয়, সাধারণ খেটে খাওয়া মেহনতি জনগণের ব্যাপক আন্দোলনের ফলেই উপনিবেশিক সরকার অবশেষে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালের ভারতের অব্যাহত অবনত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই বিভিন্ন জেলার শহর ও গ্রামাঞ্চলের গণ-আন্দোলনের উদ্দীপনা জুগিয়েছিল। ১৯৪৬ সালে খড়গপুরের রেল শ্রমিক ধর্মঘট ও নন্দীগ্রাম, সূতাহাটা, মহিষাদল প্রভৃতি অঞ্চলের ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন সম্মিলিতভাবে গণ-আন্দোলনের চেহারা নিয়েছিল।

স্বাধীন ভারত সরকারের কাছে মেদিনীপুরবাসীর বিশেষ কিছু দাবি ছিল না। তারা কেবল চেয়েছিল খেয়ে পরে শান্তিতে, সাধারণ ও স্বাধীনভাবে বাঁচতে। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ ছিল দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতিব এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী বছরগুলিতে ভারতীয় সমাজের বিত্তশালী সম্প্রদায়ই কেবল এই প্রগতির ফলভোগের সুযোগ পেয়েছিল। ১৯৪৭-'৪৯ সালের মধ্যে জনসাধারণের জীবনযাত্রার

মান অত্যন্ত নেমে গিয়েছিল—দরিদ্রের দারিদ্র্য আরও বেড়ে গিয়েছিল। ফলে, দেশের সামাজিক উত্তেজনা ও শ্রেণি সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই ১৯৪৬ সালে বাংলার আইনসভা ভাগচাষী-দের স্বার্থ রক্ষায় অনুকূল আইন পাশ করা সত্ত্বেও ভাগচাষীদের সংগ্রাম বন্ধ হয়নি। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলায় আবার তেভাগা সংগ্রাম গেরিলাযুদ্ধের আকার ধারণ করে কংগ্রেস সরকারকে রীতিমত বিপাকে ফেলে দিয়েছিল।

এই প্রেক্ষাপটে ১৯৪৮ সালে ঋণ মকুবের দাবিতে নন্দীগ্রামে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। কৃষক সমিতি সিদ্ধান্ত নেয় মাল ক্রোক হলে সম্মিলিতভাবে বাধা দেওয়া হবে। মেদিনীপুর জেলার শ্রীপুর গ্রামের গৌরাঙ্গ বেরার বাড়িতে পুলিশ ও কংগ্রেসের সেবাদল কর্মীরা মাল ক্রোক করতে এলে কৃষকনেতা শরৎচন্দ্র দাস ও চিত্ত গিরি বাধা দেয়। জনতার চাপ দেখে পুলিশ ফিরে যায়। কিন্তু উভয় নেতার নামে গ্রেপ্তারি পরো-য়ানা জারি করে। উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা করা হয় এবং বহু কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তথাপি বেশ কিছু নেতা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এড়িয়ে আত্মগোপন করে পরোক্ষভাবে তখনকার কৃষক আন্দোলন পরি-চালিত করতে থাকে। কৃষক আন্দোলনকে জোরদার করতে ১৯৪৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মেদিনীপুর জেলার গোপাল-চক গ্রামে কৃষক সমিতির গোপন জেলা সম্মেলন আহূত হয়। কৃষকনেতা ভূপাল পাণ্ডা, অনন্তমাজি, রাখাল বাগ, কানাই ভৌমিক, বংশী সামন্ত, কংসারী হালদার, সরোজ মুখার্জী প্রভৃতি এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। ২২ ফেব্রুয়ারি পতাকা উত্তোলন করে এবং শহিদ স্মৃতিতে মাল্যদান করে যথারীতি সম্মেলন শুরু হয়। কিন্তু পুলিশ ও কংগ্রেসের সেবাদলের অতর্কিত আক্রমণে কৃষকনেতারা পালিয়ে কিংবা ছদ্মবেশ ধারণ করে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু সতেরজন কৃষক ধরা পড়ে। প্রতিবাদে এগিয়ে আসে নরসিংহপুর, ২নং বাবুখাঁনবাড়, মনুচক, ভীমকাটা, জালপাই, শ্রীপুর, রামচক গোপালচক ও পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রায় দশ হাজার পুরুষ ও মহিলা। মিছিলে মিছিলে ছেয়ে যায় অঞ্চলটি। মিছিলের পুরোভাগে ছিল মহিলারা। মহিলাদের সঙ্গে পুলিশের ধাক্কাধাক্কি বেধে যায়। কিছু মহিলা আহত হয়। পুলিশ গুলি চালায়। পিছিয়ে আসা জনতা কয়েকটি বাড়ি ও হাটের চালাঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। ধৃত কৃষকনেতা শরৎচন্দ্র দাস, বঙ্কিম গিরি, রাখাল

তেভাগা আন্দোলনের নেতা
কংসারি হালদার
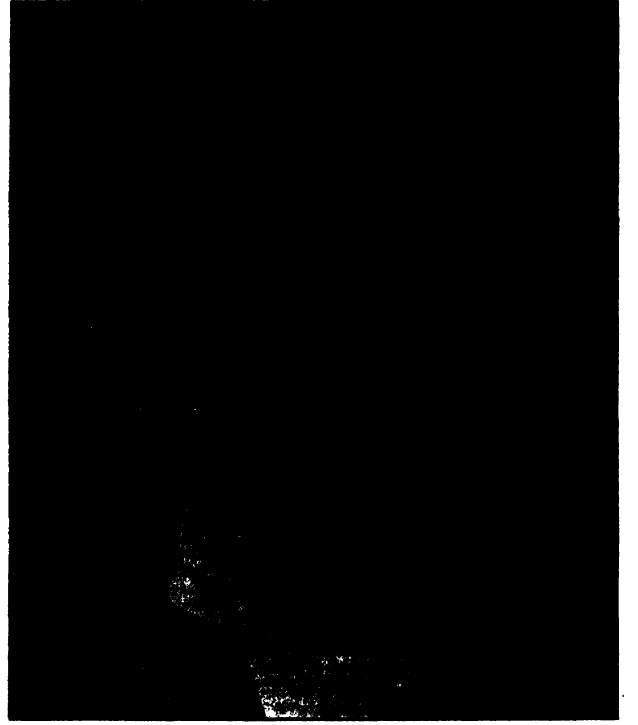
সরোজ মুখার্জি

মণ্ডল প্রমুখকে তমলুক জেলে আটক করা হয়। বন্দীরা শরৎচন্দ্র দাসের নেতৃত্বে জেল কর্তৃপক্ষের দেওয়া অখাদ্য ও দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের নেতা শরৎ দাস মহকুমাশাসক জেল পরিদর্শনে এলে তাঁর গায়ে ফেন মেশানো পাতলা ডাল ছুঁড়ে দেয়। ভাগ্য ভাল, মহকুমাশাসক অবিবেচক ছিলেন না। তিনি অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বন্দীদের দাবিগুলি স্বীকার করে নেন। তখন থেকে বন্দীরাই প্রতিদিনের খাবারের সরকারি বন্দোবস্ত দেখাশুনা করতো। এছাড়া জেলের ভিতর সংবাদপত্র, বই পড়াশুনার ব্যবস্থা, বিশেষ দিবস উদ্‌যাপন, প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে সভা করার অনুমতিসহ দাবিগুলি মহকুমাশাসক মেনে নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, এ সময় তুমলুক জেলে প্রায় এক হাজার নারী পুরুষ বন্দী অবস্থায় ছিল। তাদের সম্মিলিত প্রতিবাদের ফসল হল উপরিউক্ত দাবিসমূহ আদায়।

ওই বছরে (১৯৪৯) জোতদাররা সেবাদলের সাহায্যে ভাগজমি থেকে চাষীদের উচ্ছেদ করতে থাকে। মেদিনীপুর জেলার নরসিংহপুরের জোতদার যদুপতি জানা, রমানাথ দাস জনৈক ভাগচাষীকে জমি থেকে লাঠিয়াল দিয়ে তাড়াতে চাইলে কৃষকনেতা বিহারী দাসের নেতৃত্বে ওই চাষী রুখে দাঁড়ায়। মালিক ও তাদের লাঠিয়ালকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। এই ঘটনা চাষী-উচ্ছেদ রোখো আন্দোলনে শক্তি ও প্রাণ সঞ্চার করে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে জোতদারদের গুণ্ডাবাহিনী ধান রোয়া জমিগুলি দখল করে নেয়। একদিকে দরিদ্র কৃষক, অন্যদিকে মহাজন, জোতদার, কংগ্রেসের সেবাদল ও পুলিশবাহিনী। কিন্তু গরিব কৃষকরা পুলিসের গুলি চালনাকে উপেক্ষা করে প্রত্যক্ষভাবে জমিদার ও জোতদারদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে আহত হয়। পুলিশ একের পর এক স্থানীয়

নেতাদের গ্রেপ্তার করতে থাকে। তবু কৃষক আন্দোলন হতোদ্যম হয়ে পড়েনি। তারা ধীরে ধীরে অন্যান্য ফ্রন্টের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

১৯৪৮-৫১ সাল পর্যন্ত (যখন কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি ঘোষিত) সাধারণ কৃষক ও কমিউনিস্ট কর্মী ও সমর্থকরা অন্তরীণ থেকে তেভাগা আন্দোলনের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে। মহিষাদল, নন্দীগ্রাম লাগোয়া থানার কৃষক সম্প্রদায় কমিউনিস্টদের সম্পর্কে কংগ্রেসের কুৎসা ও অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে গ্রামের পর গ্রাম ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে মহিষাদল থানার কলাগেছিয়াতে ধান কাটার আন্দোলনে লাটদার গোরী জানা ধানের জমিতেই কৃষকদের উপর গুলি চালায়। সংগ্রামী কৃষকরা ভয়ে ভীত না হয়ে গুলির সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দুকসহ লাটদার গোরী জানাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। প্রত্যাশিতভাবে পুলিশ জোতদারের পক্ষ নিয়ে উল্টে চাষীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। জোতদারের এই আক্রমণের মোকাবিলা করে কৃষকরা। নেতৃত্ব দেন শচীন বর্মণ। এই লড়াই-এ প্রাণ দেন তিনজন—শ্যামাপদ বর্মণ, পরমেশ্বর দাস (চুনাখালি) ও বসন্ত হাজরা (ভান্ডার জলপাই)। মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায় এরাই প্রথম শহিদ। এখানেই প্রথমে গুলি চলে।

মেঘনাদ সাহা

১৯৫২ সালে মেদিনীপুর জেলায় তিনটি আন্দোলন বিশেষ ব্যাপ্তি ও গুরুত্বলাভ করে। (এক) রাজনৈতিক বন্দী- মুক্তি আন্দোলন, (দুই) শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন, (তিন) খাদ্য আন্দোলন। সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্যারোলে মুক্ত বন্দীদের (যাঁদের মধ্যে নির্বাচিত এম এল এ এবং এম পি-রাও ছিলেন।) সরকার আবার জেলে ফিরিয়ে নিয়ে যায় এবং বিনা বিচারে আটক সমস্ত বন্দীদের মুক্তি না দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। জেলার বামপন্থীরা কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে সরকারের এহেন ঘোষণার প্রতিবাদ জানায়। তাদের সামনে কর্তব্য দাঁড়াল, (১) গরিবের নৈতিক সমর্থনলাভে বঞ্চিত কংগ্রেস সরকারের এই ঘোষণার বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রাথমিক অধিকার, ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকারকে রক্ষা করা ; (২) আন্দোলনে যারা সবেমাত্র অংশগ্রহণ করেছে তাদের সংগঠিত ও শিক্ষিত করা ; (৩) জনগণের আন্দোলন পরিচালনার জন্য আর্থিক সংস্থান করা, প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবী আন্দোলনের অংশ হিসাবে বন্দীমুক্তির দাবিতে মেদিনীপুর, তমলুক, কাঁথি, খড়গপুর, ঘাটাল, গড়বেতা প্রভৃতি শহরগুলিতে জনসভা, স্বাক্ষর সংগ্রহ, টেলিগ্রাম প্রভৃতির মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। গ্রামাঞ্চলেও স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়। তমলুক শহরে ডাঃ মেঘনাদ সাহার হাতে ১২০০০ স্বাক্ষর অর্পণ করা হয় এবং সারা জেলায় ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষ স্বাক্ষরদান করে প্রতিবাদ জানায়। প্রদেশ ও জেলাগুলির এই মিলিত আন্দোলনের ফলে সরকার বন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে মেদিনীপুর জেলার বন্দীরাও মুক্তি পায়।

এই আন্দোলনের মধ্যে সংযুক্ত ফ্রন্ট গড়ে না উঠলেও মেদিনীপুর জেলার সমস্ত কংগ্রেস-বিরোধী দলই প্রকাশ্যে এই দাবির প্রতি সমর্থন জানায়। এমনকি জনসংঘের এম পি ও এম এল এ-রাও মেদিনীপুরে কমিউনিস্ট পার্টির সভায় বক্তৃতা করে। কিছু কিছু কংগ্রেস কর্মীও বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার সমেত সর্বশ্রেণীর লোকেরাই এই আন্দোলনকে সমর্থন করে। তবে এই আন্দোলন পরিচালনায় তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতৃত্বের ত্রুটি ছিল। তারা তাদের সমস্ত সদস্য ও পার্টিতে নতুন আসা কর্মীদের কাজে লাগাতে পারেনি এবং ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারেনি। তাছাড়া, আন্দোলনটি ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
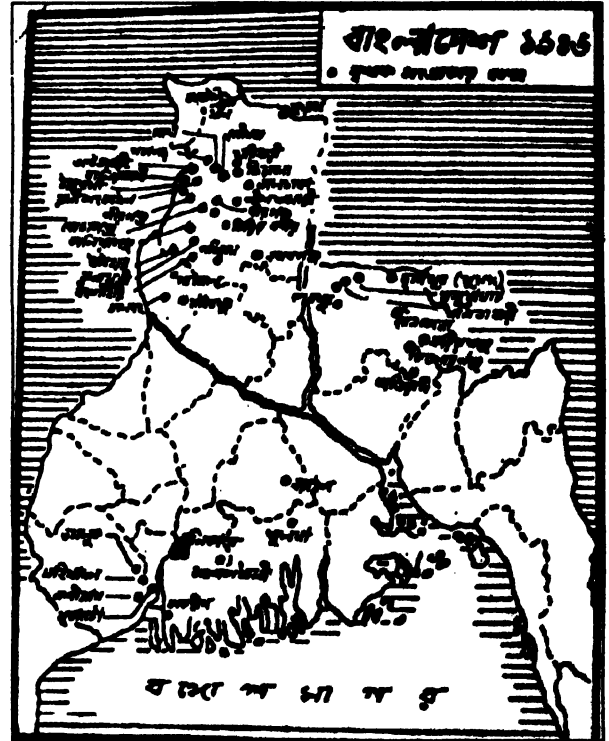
১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একদিকে প্রাদেশিক ভিত্তিতে ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর আক্রমণ করে, অন্যদিকে জেলা স্কুল বোর্ড ব্যাপকভাবে প্রাথমিক স্কুল ছাঁটাই করতে আরম্ভ করে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে সব শিক্ষকরা প্রচার করেছিল তাদের মাইনে বন্ধ করে দেওয়া হল। এই আঘাত সব থেকে বেশি নেমে এসেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান মেদিনীপুরের উপর। সরকারের এই আক্রমণ তার শিক্ষা সংকোচন নীতিরই প্রতিফলন। স্কুল বোর্ডের অভিযোগ মেদিনীপুর জেলায় অনেক বেশি স্কুল। তাছাড়া শিক্ষকরা ভাল করে ছাত্রদের পড়ায় না। জানা যায়, শিক্ষার মান উঁচু করার জন্য স্কুল ও শিক্ষক ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা সরকারের নির্বাচনের আগেই ছিল। কিন্তু তখন কার্যকরী করেনি ভোটের ফলাফলে প্রভাব পড়তে পারে বিবেচনা করে। নির্বাচনের পর গদি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়ার পরই স্কুল বোর্ড ছাঁটাই নীতি প্রয়োগ করে। এর বিরুদ্ধে মেদিনীপুর জেলার সর্বত্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হল। কৃষকনেতা দেবেন দাশ ও নিকুঞ্জ চৌধুরীর বিশেষ উদ্যোগে কৃষক প্রজা পার্টি, জনসংঘ, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি রাজনৈতিক দল ও কৃষকসভা, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রভৃতি গণসংগঠন ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের নিয়ে মেদিনীপুর জেলা শিক্ষা সংরক্ষণ কমিটি গড়ে উঠল মেদিনীপুর শহরে, সর্বদলীয় সম্মেলন থেকে। আন্দোলনের সূচনাতেই প্রায় বারো হাজার স্বাক্ষর শিক্ষা দপ্তরের কাছে পাঠানো হয়েছিল। সম্মেলন থেকে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি স্কুল বোর্ডের সভাপতির সঙ্গে দেখা করে নিম্নোক্ত দাবিগুলি জানায়। (১) সমস্ত স্কুল ছাঁটাই বন্ধ করতে হবে ; (২) সমস্ত শিক্ষকের বাকি টাকা পরিশোধ করতে হবে ; (৩) প্রতি হাজারজন পিছু অথবা ১ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে একটি করে প্রাথমিক স্কুল মঞ্জুর করতে হবে ; (৪) সমস্ত বে-আইনি নোটিশ প্রাথমিক শিক্ষকদের উপর থেকে তুলে নিতে হবে। জেলা শিক্ষা সংরক্ষণ কমিটি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে। ১৯৫২ সালের ২৯ জুলাই ঘাটাল, তমলুক, কাঁথি, গড়বেতা ও তমলুকের বিভিন্ন বাজারগুলিতে হরতাল পালিত হয়। কাঁথিতে ৫/৬ জন শিক্ষক গ্রেপ্তার বরণ করে। অবশেষে সরকার কয়েকটি দাবি মেনে নেয়। যথা : (১) শিক্ষকদের বকেয়া-বেতন দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হল ; (২) অধিকাংশ শিক্ষকের উপর শাস্তি দেওয়ার জন্য জারি করা নোটিশ প্রত্যাহৃত হল ; (৩) সরকার ঘোষণা করল প্রতি দেড় হাজার জনসংখ্যায় একটি করে প্রাথমিক স্কুল করা হবে ইত্যাদি।
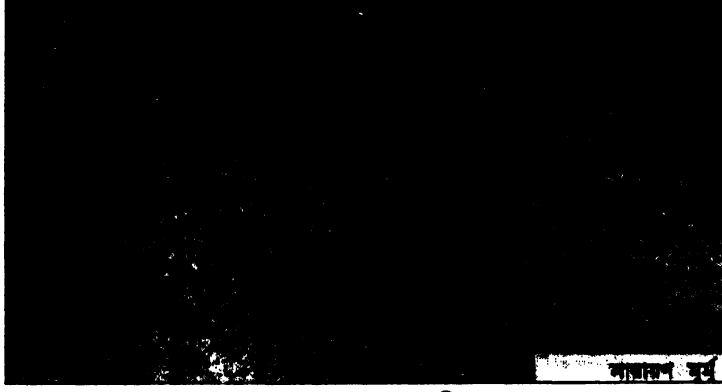
তেভাগা সংগ্রামের শহীদ

তবে এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাও ছিল। জেলার অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা এই আন্দোলনে ও হরতালে যোগ দেয়নি। জেলার সমস্ত কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এই আন্দোলনের সপক্ষে সংঘবদ্ধ হয়নি। গ্রামের মানুষ ও যুবসমাজকেও এই আন্দোলনের সক্রিয়ভাবে সামিল করা যায়নি। তবে অশিক্ষিত গরিব খেত মজুরদের এই আন্দোলনে পরোক্ষ অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। তারা সরকারি সাহায্যের তোয়াক্কা না করেই স্কুলগুলি চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাদের দৃঢ় সংগ্রামী মানসিকতা সরকারকে ৫/১১/৫৩ তারিখের নমনীয় সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছিল।

১৯৫২ সালে মেদিনী-পুরের খাদ্য আন্দোলন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সাধারণ নির্বাচনের সময় থেকেই জেলার কৃষকনেতা দেবেন দাশ, ভূপাল পাণ্ডা প্রভৃতি 'বে-পরোয়া ধান সীজ'-এর বিরুদ্ধে এবং থানা কর্ডন তুলে নেওয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। নির্বাচনের পরে যখন 'ধান সীজ' করা আরম্ভ হল তখন তার বিরুদ্ধে জেলার মানুষ প্রতিরোধ আরম্ভ করল। চন্দ্রকোণা, পটাশ-পুর, খেজুরি, ভগবানপুর প্রভৃতি এলাকায় জনসাধারণ কোথাও সংগঠিত ভাবে, কোথাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ আরম্ভ করে। এমনকি প্রয়োজনে পুলিশের সঙ্গে সাহসী মোকাবিলাও করে। ফলে বে-পরোয়া ধান সীজের তীব্রতা অনেক কমে যায়। অনতিবিলম্বে মেদিনীপুর জেলার ধান-চালের দাম দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ব্যাপক ধান- চাল চোরাই চালানে জেলার বাইরে বেরিয়ে যায়। এর বিরুদ্ধে সারা জেলাব্যাপী গণ-সংগ্রাম গড়ে ওঠে। কেশপুর, খেজুরি, ভগবানপুরে কিছু কিছু চোরাই ধান আটক করা হয়। সড়কপথের ও নদীর ধারগুলির গ্রামগুলিতে আন্দোলনের তীব্রতা লক্ষিত হয়। বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলনের ফলে ধানের ও চালের দাম যথেষ্ট পরিমাণে কমে যায়। সরকার জেলার কয়েকটি অঞ্চলে আংশিক রেশন ব্যবস্থা চালু করে। এই আন্দোলন পরিচালিত করতে গিয়ে কৃষকনেতাদের কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, চোরাই চালানে জনতার যে অংশ যুক্ত ছিল তাদের অধিকাংশই ছিল গ্রাম্য বেকার, খেত-মজুর প্রভৃতি গরিবরা। কমিউনিস্টরা কি ধরনের গরিব দরদি তারা তা ভেবে আশ্চর্য হচ্ছিল। তবে ১৯৫২ সালের মেদিনীপুরের খাদ্য আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও দমননীতির প্রতিবাদে ছাত্রদের হরতাল পালন খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত ও উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৩ সালে মেদিনীপুর জেলায় দুটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন সংগঠিত হয়। এক, ভাগচাষী উচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলন ; দুই, দ্বিতীয় দফার খাদ্য আন্দোলন। তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম দাবি ছিল—'আধি নয়, তেভাগা চাই'। পরে তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি সংযুক্ত হয়, 'জোতদারের খামারে নয়, নিজ খামারে ধান তোল।' এ ব্যাপারে জোতদারদের প্রচণ্ড আপত্তি হওয়ায় 'মাঠ খামার', 'পঞ্চায়েত খামার' বা 'তে-হাত খামার' ইত্যাদি দাবি ওঠে। জমিদার ও জোতদারদের এবারে লক্ষ হয় জমি থেকে ভাগচাষীকে উচ্ছেদ করা। এই কাজ করতে গিয়ে তারা ভাড়াটে গুন্ডার আশ্রয় নেয়। খেজুরী থানার বড় কষালিয়া গ্রামের জমিদার বিভূতি ভুঁইঞা, সুতাহাটা থানার জোতদার সুধীর বেরা, চকলালপুরের জমিদাররা কৃষকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। কেউ রণে ভঙ্গ দিয়ে আত্মরক্ষা করে, কেউ খুন হয় আবার কেউ কেউ কৃষকদের খুন করে। তথাপি তারা শেষরক্ষা করতে পারেনি। পুরুষ ও মহিলা কৃষকদের সম্মিলিত আক্রমণে তারা পিছু হটে। পুলিশের আক্রমণকে প্রতিহত করে কৃষকরা নিজ খামারে ধান তোলে। ভাগচাষীরা প্রাদেশিক কৃষকসভার নির্দেশে শ্লোগান তোলে—(১) সর্বত্র পঞ্চায়েত খামার কায়েম কর, (২) ফসলের এক-তৃতীয়াংশ প্রথমেই আদায় করে নাও, (৩) ভাগ বোর্ডে ভাগচাষীদের প্রকৃত প্রতিনিধি চাই, (৪) বর্গাদার আইন সংশোধন কর, (৫) ভাগচাষীদের উচ্ছেদ বন্ধ কর, (৬) খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি চাই প্রভৃতি। এই আন্দোলনে কৃষকদের সফলতার মূল নজির হল—সুতাহাটা থানার ৫ হাজার বিঘা বর্গা জমির ধান তারা নিজ খামারে কিংবা তে-হাত খামারে তোলে। সুতাহাটা থানার চিরঞ্জিবপুর, দরবালিচক, হাতিবেড়্যা প্রভৃতি গ্রামে ৭২৬ বিঘা জমির ধান পঞ্চায়েত খামারে ওঠে এবং এই ভাগচাষ আন্দোলন রাজারামপুর, ভবানীপুর, বড়বাড়ি, ঈশ্বরদা, আনন্দপুর, খানপুর প্রভৃতি বহু গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে।

এই ভাগচাষী উচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলনে কৃষকদের নেতৃত্ব দিয়েছেন দেবেন দাশ, অনন্ত মাজি, ভূপাল পাণ্ডা, সুকুমার সেনগুপ্ত, মনুচক গ্রামের বঙ্কিম গিরি, পুরুষোত্তমপুরের ভাকু অগাস্তি, কার্তিক সাঁতরা, মহম্মদপুরের পঞ্চানন মাইতি, সেখ নেজিমুদ্দিন, কেঁদেমোরির রজনী গুছাইত, কুঞ্জপুরের কুমেদ পাহাড়ি, কাঁথি থানার গুনিয়া গ্রামের শ্রীনিবাস মাইতি, দক্ষিণ ভগবানপুরের রমণী সাউ, বাঘাদাঁড়ির রঘুনাথ বল, রাতুলিয়ার রাখালচন্দ্র মাইতি, গোকুলনগরের সতীশ মান্না, টাকাপুরার অরবিন্দ খাটুয়া, দেবীপুরের বিহারীলাল দাস, সুরেন্দ্রনাথ ভুঁইএগ, ফণী পাঁজা, কিশোরী জানা, পতিত জানা, অনুধ্বজ কুইল্যা, ঘাটালের ডাঃ যতীশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। চাষীদের ফসল রক্ষার জন্য ও আন্দোলনকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করার জন্য বিমলা মাজির নেতৃত্বে মহিলারা সংগঠিত আন্দোলন শুরু করে। কৃষকদের এই আন্দোলনের সঙ্গে শহরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনসমূহকে যুক্ত করে বড় বড় মিটিং মিছিল করার চেষ্টা করা হয়। মেদিনীপুর জেলার কালিকাকুন্ডু, চণ্ডীপুর, মাগুরিয়া, টাঁপি, জগৎপুর প্রভৃতি এলাকাতেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৫২-৫৩ সালে মেদিনীপুর জেলায় লেভী প্রথা বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি লেভী প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী না হলেও সরকারি বিভাগ—যেরূপ অন্যায়ভাবে এই নীতির প্রয়োগ করে তার প্রতিবাদ করে। জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের তুলনায় লেভী প্রথার আঘাত বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও ধনী কৃষকদের উপর বেশি করেই পড়ে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধানে তমলুক ও সদর মহকুমাতে বিভিন্ন প্রগতিশীল ব্যক্তির, বিশেষত সদরে প্রজাপার্টির উপস্থিতিতে মধ্যবিত্ত ও গরিব কৃষকের লেভী রদ করার দাবিতে সম্মেলন হয়। গড়বেতা ও ঘাটালেও এই সম্মেলন হয়। উল্লেখ্য, ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের লেভী বিরোধী আন্দোলন সমগ্র খাদ্য আন্দোলনের একটি বিশেষ অধ্যায় ছিল, কিন্তু কোনও সময়ই খাদ্য আন্দোলনের মূল অংশ ছিল না।

ইতিমধ্যে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যাভাব দেখা দিতে আরম্ভ করে। জেলার সমস্ত অংশে চালের দাম বাড়ে। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। সরকারকে খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব নিতে হবে, মেদিনীপুর জেলাকে ঘাটতি জেলা হিসাবে ঘোষণা করতে হবে, অন্তত আধা রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে প্রভৃতি দাবিতে জেলার বিভিন্ন অংশে সভা, সমাবেশ ও মিছিল হয়। সরকারি দপ্তরে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। অবশেষে সরকার মেদিনীপুর জেলাকে ঘাটতি জেলা হিসাবে স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে আধা রেশন ব্যবস্থা চালু করে। ১৭ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬২৫ টাকা কৃষিঋণ দেয়, ৮৫ হাজার লোককে রিলিফ দেওয়ার ব্যবস্থা করে, ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা বলদ কেনার জন্য ঋণ মঞ্জুর করে।

ঘাটালের একটি এলাকায়, বর্ধণের জমিদারিতে, খাজনা ধার্য হত একটি বিশেষ প্রথায়। জমিদারের গোমস্তা প্রতি বছর এক-একটি এলাকা প্রদক্ষিণ করে কোন জমিতে কৃষককে কতটা খাজনা দিতে হবে তা নির্ধারণ করে দিত। এই প্রথাকে 'কুথ' প্রথা বলা হত। গোমস্তারা অন্যায়ভাবে বেশি 'কুথ' ধার্য করত। আর খাজনা আদায়ের নামে কৃষকদের উপর নানাভাবে জুলুম করত। ১৯৫৩ সাল থেকে 'কুথ' প্রথার বিরুদ্ধে খীসরা, এলোচক, নিমপাতা, দুবরাজকুণ্ডু, জয়নগর, আনন্দপুর, বাংরাল, মুগডাল, মহারাজপুর, ভাঙ্গাদহ, বারিন্দি প্রভৃতি গ্রামে কৃষকরা সংগঠিত হতে শুরু করে এবং আন্দোলন আরম্ভ করে। কৃষকসভার পক্ষ থেকে মিছিল করে জমিদারের কাছে দাবিগুলি পেশ করা হয়। জমিদার কৃষকদের দাবি মেনে নেয়। কৃষক আন্দোলন জয়যুক্ত হয়। খাজনা ৩০/৪০ টাকার পরিবর্তে ৬/৮ টাকায় নেমে আসে। বিশ বছরের খাজনা মকুব হয়। কৃষকরা

তাদের নিজেদের জমিতে নিজেরাই 'কুথ' করে পৌষ সংক্রান্তির দিন দল বেঁধে জমিদারের কাছারিবাড়িতে খাজনা মিটিয়ে আসে—যার পরিমাণ ছিল প্রায় ৮/৯ হাজার টাকা (৮০০/৯০০ কৃষকের কাছ থেকে)। এই সাফল্যের ফলে মেদিনীপুর জেলার কৃষকসভার মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। আরও বেশি সংখ্যক কৃষক বিভিন্ন আন্দোলনে কৃষকসভার নেতৃত্বে আস্থাশীল হয়।

১৯৫৪-র ১০ ফেব্রুয়ারি সারা রাজ্যে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি-র আহ্বানে ১৮,০০০ মাধ্যমিক শিক্ষক অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সরকারের কাছে শিক্ষকদের দাবি ছিল, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী ৩৫ টাকা মহার্ঘভাতা এবং ৭৩ টাকা থেকে ১৮০ টাকা পর্যন্ত মাসিক মাইনে দিতে হবে। কিন্তু সরকার শিক্ষকদের দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করলে শিক্ষকরা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শুরু করতে বাধ্য হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি শিক্ষকরা হরতাল পালন করে। শিক্ষকদের মিটিং, মিছিল, ডেপুটেশন চলে। কেবল কলকাতায় আন্দোলন করতে গিয়ে ৬ জন শিক্ষক নিহত ও ১৫৭ জন আহত হন। এই সময় মেদিনীপুরের শিক্ষক আন্দোলন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। দীর্ঘকাল মেদিনীপুরের শিক্ষকদের নেতৃত্বে ছিলেন জগদীশ দাস, কিশোর মহাপাত্র, রঘুনাথ ঘোষ প্রভৃতি। ১৯৪৮ সালে আসানসোল সম্মেলনের পর কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষকরা মেদিনীপুরের শিক্ষক সংগঠনে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। ১৯৫৪ সালে শিক্ষকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলা ও দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য খড়গপুর, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কাঁথি ও দাসপুরে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। জেলার সামাগ্রিক পরিচালনার দায়িত্ব পায় খড়গপুর সংগ্রাম (অ্যাকশন) কমিটি যার নেতৃত্বে ছিলেন তরুণ শিক্ষক শুভেন্দু রায়। তাঁকে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করতেন ঈশ্বর মহাপাত্র, হীতেন ঘোষশর্মা প্রভৃতি। শিক্ষকদের উপর গুলি-চালনার প্রতিবাদে খড়গপুর ও মেদিনীপুরে কয়েকটি মিটিং মিছিল হয়। সারা বাংলায় শিক্ষক আন্দোলন আরও জোরদার হলে এবং বিধানসভায় বিরোধীরা মুলতুবি প্রস্তাব আনলে ডাঃ রায় অবশেষে কয়েকটি দাবি মেনে নিলে এবং আন্দোলনে ধৃত সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিলে ২১ ফেব্রুয়ারি শিক্ষকদের কর্মবিরতির অবসান হয়।

চুয়ান্নর এই আন্দোলন কলকাতায় বিশেষ রূপ ধারণ করে গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হলেও মেদিনীপুরে এই আন্দোলন তেমন দানা বাঁধেনি। কৃষকনেতা দেবেন দাসের আন্তরিক আগ্রহে মেদিনীপুরে সর্বপ্রথম শিক্ষক আন্দোলনের সূচনা হয় এবং এই সময় মেদিনীপুরে শিক্ষক সমিতির আপসপন্থী অংশ কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

১৯৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে পর্তুগীজ উপনিবেশিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে গোয়ার মুক্তি আন্দোলন প্রবল হয়। সেখানে সত্যাগ্রহীরা 'কর বন্ধ আন্দোলন' আরম্ভ করে। পর্তুগীজ শাসকরা 'অমানুষিক অত্যাচার' করে এই আন্দোলন দমন করতে চেষ্টা করে। ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল গোয়ার মুক্তি আন্দোলন সমর্থন করে এবং গোয়ায় সত্যাগ্রহী প্রেরণ করে। ১৫ অগাস্ট ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সহস্র সহস্র সত্যাগ্রহী গোয়া অভিযানে অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সত্যাগ্রহীরাও ছিল। জুলাই মাসে ৫২ জন সত্যাগ্রহীসহ আর এস পি নেতা ত্রিদিব চৌধুরী গোয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন ও গ্রেপ্তার বরণ করেন। মেদিনীপুর জেলার কমিউনিস্ট নেতা সরোজ রায় বাংলার আর একটি সত্যাগ্রহী দলের নেতৃত্ব দেন। সরোজ রায় ১৯৫৫ সালের ২৩ অগাস্ট গড়বেতায় ফিরে এলে অগণিত নরনারী বিভিন্ন ধ্বনি ও বাদ্যযন্ত্র সহকারে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং কমিউনিস্ট পার্টি, কৃষক সমিতি, মহিলা সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন সংগঠন সরোজ রায়কে মাল্যভূষিত করে। অতপর বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে কৃষকনেতা সরোজ রায়কে নিয়ে বিশাল জনতা তিন মাইল রাস্তা পরিভ্রমণ করে। এই উপলক্ষে গড়বেতায় আয়োজিত এক জনসভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আইনজীবী নন্দগোপাল দত্ত। সভায় সরোজ রায় গোয়ায় বাংলার বিশেষত মেদিনীপুরের সত্যাগ্রহীদের অসীম বীরত্বের বর্ণনা দিয়ে নেহরুর নিষ্ক্রিয় নীতির তীব্র নিন্দা করেন। গোয়াকে সাম্রাজ্যবাদীদের কবল মুক্ত করার অটুট সংকল্প নিয়ে সভা ভঙ্গ হয়। শুধু গড়বেতা নয়, গোয়াবাসীদের মুক্তির সপক্ষে মেদিনীপুর শহর, খড়গপুর, কাঁথি প্রভৃতি এলাকায় সভা কিংবা মিছিল হয়। পর্তুগীজ সৈন্যের গুলিতে ২০ জন সত্যাগ্রহী নিহত হলে মেদিনীপুরের প্রায় সমস্ত শহরে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়।

১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গ বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করলে সারা পশ্চিমবাংলায় প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে মেদিনীপুর শহরসহ অন্যান্য মহকুমা শহরগুলিতে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। মেদিনীপুরের শিক্ষাবিদরা একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে বঙ্গ বিহার সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে। কয়েক হাজার প্রতিবাদী স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়। কৃষকরা বিভিন্ন জায়গায় মিছিল করে প্রতিবাদ জানায়। মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস রাজনৈতিক সম্মেলনে বঙ্গ ও বিহার সংযুক্তি প্রস্তাবকে স্বাগত জানালে বিরোধীদের সঙ্গে হাতাহাতি শুরু হয় এবং তিনজন প্রস্তাব-বিরোধী আহত হয়। দাসপুরে ৫ হাজার নরনারীর সভায় প্রতিবাদ আন্দোলনের শপথ গ্রহণ করা হয়। সংযুক্তির বিরুদ্ধে ফেব্রুয়ারি মাসে গড়বেতায় মন্ত্রীর সভার সম্মুখে বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয় এবং কয়েকজন কারাবরণ করে। এই আন্দোলনে যুব ও মহিলা এবং খড়্গপুরের শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আন্দোলন ব্যাপক রূপ ধারণ করলে ৪ মে ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গ বিহার সংযুক্তি প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন। তবে কংগ্রেস জনসমর্থন হারাতে শুরু করে। এ সময়ের উপনির্বাচনে মেদিনীপুরের খেজুরি আসনে কংগ্রেস প্রার্থী পরাজিত হয়।

মেদিনীপুরের জনগণের একের পর এক সংগ্রাম শুধু বামপন্থী দলকে নয়, অন্যান্য বহু গণতান্ত্রিক দলকেও সংহতি শক্তি দান করেছিল। এর ফলে কংগ্রেস দল কতটা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, পঞ্চাশের দশকের শেষ প্রান্তে ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের ঘটনাবলী তার ইঙ্গিত দেয়। ১৯৫৯ সালের প্রথমদিকে বাজারে চালের অভাবে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ের খাদ্য সংকট এতটাই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যে দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সরকার এই সংকট দূর করতে ব্যর্থ হয়। 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি'র আহ্বানে ২৫ জুন সরকারি খাদ্যনীতির প্রতিবাদে সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। সস্তাদরে খাদ্যের দাবিতে মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন সংঘটিত হতে থাকে। মেদিনীপুরবাসী খাদ্যের দাবির সঙ্গে প্রকৃত ভূমি সংস্কার ও কর্মহীনদের জন্য কাজের দাবি করে। নির্বিচারে সার্টিফিকেট জারি করে সরকারি ঋণ আদায়ের জন্য জুলমের প্রতিবাদ জানানো হয়। মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ী থানায় দেড় সহস্রাধিক লোকের সভা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিউনিস্ট পার্টির জগন্নাথ রাউল ও বক্তৃতা করেন কৃষক নেতা দেবেন দাশ, এম এল এ সরোজ রায়, প্রফুল্ল মাইতি প্রমুখ। সভা থেকে বে-আইনি হস্তান্তরিত জমি উদ্ধার, কৃষক উচ্ছেদ বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে অর্ডিন্যান্স জারি ও ব্যাপক রিলিফের ব্যবস্থার দাবি করা হয়। মে মাসে খাদ্যের দাবিতে খড়্গপুরে ৮ হাজার নরনারীর, বিশেষত শ্রমিকদের সভা হয়।

অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

খাদ্যমন্ত্রী কর্তৃক পয়লা জানুয়ারি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণাদেশ বলবৎ হওয়ার পর থেকে একদিকে যেমন চালের দুষ্প্রাপ্যতা বাড়ল, অন্যদিকে সেই সুযোগে চলল কালোবাজারি। অন্যান্য জেলার মতো মেদিনীপুর জেলার বহু অঞ্চলে ২৮ থেকে ৩০ টাকা মন (প্রায় ৩৯ কেজি) দরে চাল বিক্রির সংবাদ পাওয়া গেল। সরকারি দরে রসিদ লিখে বালিচকের কয়েকটি মিল মালিক ব্যবসায়ীদের কাছে চাল ছাড়তে শুরু করল। এসবের বিরুদ্ধে সরকারের ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না মূলত দুটি কারণে। এক, সরকারের খাদ্য দপ্তরই মোটা চাল মিহি চালের দামে বিক্রি করে লাভ করত অর্থাৎ সরকারই অন্যায্য পথ নিত। দুই, সরকারের পরোক্ষ সহায়তা ছিল এই কালোবাজারিদের পিছনে। তৎকালীন রাঘববোয়াল ·চোরাকার-বারীদের নিয়ন্ত্রণ ও শায়েস্তা করার সদিচ্ছা সরকারের ছিল না।
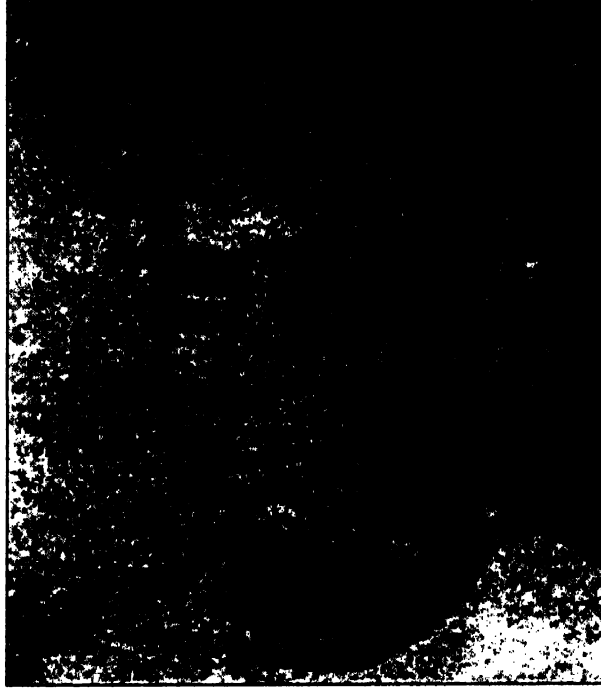
মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শুরু হয় চৌদ্দই জুলাই থেকে। চলেছিল বিশে আগস্ট পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে আইন অমান্য করে প্রায় ১,৬৩১ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হন। সংগ্রামের প্রথম পর্যায় শুরু হয় মেদিনীপুর জেলা থেকে। কিছুদিন পূর্বে সেচমন্ত্রী অজয় মুখার্জি বলেছিলেন যে, ভারতের কোনও রাজ্যে যা করতে পারেনি, তাঁরা তাই করেছেন এবং সেই অভিনব জিনিসটি হল কন্ট্রোল না করেও কন্ট্রোল। সম্ভবত এই অভিনব জিনিসের ফলেই সমগ্র পশ্চিমবাংলা, বিশেষত মেদিনীপুরের কৃষক সমাজ ঘোরতর সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত হয়েছিল। জেলার বিভিন্ন স্থানে সেই থেকেই অনাহার ও অর্ধাহারের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল। খেজুরি, গড়বেতা, ভগবানপুর প্রভৃতি থানায় সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। ঘাটাল, তমলুক ও সদর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় খাদ্য সংকটে জর্জরিত কৃষক রেশন ও রিলিফের অভাবে চরম দুর্গতি ভোগ করছিল। জমি, জায়গা, লাঙল, গরু ও তৈজসপত্র বিক্রির ঘটনাও বেড়ে চলেছিল। কিন্তু মেদিনীপুরবাসী এই অবস্থাকে মুখ বুজে সহ্য করতে রাজি হয়নি। সেইজন্য বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয় সংগ্রামের প্রস্তুতি। রাজ্যব্যাপী আসন্ন সংগ্রামের প্রথম মহড়া শুরু হয় মেদিনীপুরে। মেদিনীপুর-বাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি এক বিবৃতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলে, 'তাহাদিগকে এই ব্যাপকতর গণ সংগ্রামের মোকাবিলা করিতে হইবে। সরকারের জনস্বার্থ-বিরোধী খাদ্য নীতির বিরুদ্ধে মেদিনীপুরের জনগণ ইতিমধ্যেই যে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন সেজন্য কমিটি মেদিনীপুরবাসীকে অভিনন্দন জানাইতেছেন।'

এই পরিপ্রেক্ষিতে সাতাশে জুলাই অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য খাদ্য উপদেষ্টা বোর্ডের সভা। মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় যে ওই সাতাশে জুলাইয়ের সভাতে কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ যোগদান করবে এবং কমিটি কর্তৃক ঘোষিত এগার দফা দাবির স্বীকৃতির জন্য পুনর্বার সরকারের নিকট দাবি জানাবে। কিন্তু সাতাশে জুলাইয়ের সভাতে সরকার পক্ষ শুধু যে বিরোধীদের দাবি অগ্রাহ্য করল তাই নয়, সরকার পক্ষ, বিশেষত

খাদ্যমন্ত্রীর অসম্মানজনক মনোভাবে বিরোধীরা সভা ত্যাগ করতে বাধ্য হল। হিন্দু মহাসভার সদস্যরাও বিরোধীদের সঙ্গে এই সভাকক্ষ ত্যাগ করে। সভায় সরকার পক্ষের সঙ্গে থেকে যায় পি এস পি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যরা। বলা বাহুল্য, ফরওয়ার্ড ব্লক তখন মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। সাংবাদিকদের কাছে সভাকক্ষ ত্যাগের কারণগুলি সম্বন্ধে বিরোধীরা জানায় যে—(১) মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও লেভি প্রত্যাহারে বিরোধী দলের কোনও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি, (২) টেস্ট রিলিফ, কৃষি ঋণ, রেশন প্রভৃতি সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি পালিত হয়নি, (৩) মজুত শস্য উদ্ধারের জন্য জনগণের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়নি, (৪) সংশোধিত রেশন ও উচিত মূল্যের দোকানে চাল বিক্রয় সম্প্রসারিত করা হয়নি এবং (৫) মন্ত্রিমণ্ডলী, বিশেষত খাদ্যমন্ত্রীর অপমানজনক মনোভাব প্রদর্শন।

অগাস্ট মাসের শুরু থেকেই পশ্চিমবাংলার জেলায় জেলায় শুরু হয়ে যায় খাদ্য আন্দোলনের প্রস্তুতি। মেদিনীপুর জেলায় শুরু হয় পদযাত্রা, কৃষক সমিতির উদ্যোগে জনসভা, খাদ্য কনভেনশন প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারের বিপক্ষে অভিযোগ ছিল, (১) সরকারি যন্ত্রের অপব্যবহার, দুর্নীতি ও অর্থের অপচয়, ট্যাক্সি, ট্রাক, বাস এবং কন্ট্রাক্ট ও সমবায় বিতরণে স্বজনপোষণ, নির্বাচনে দলীয় স্বার্থে সরকারি রিলিফ, কায়েমি স্বার্থকে পুষ্ট করার জন্য জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপ, পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে পেটোয়া যন্ত্রে পরিণতকরণ, কল্যাণমূলক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি শত্রুতা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাসমূহে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দানে অস্বীকৃতি, তদন্ত কমিটি সমূহের রিপোর্ট ধামাচাপা দেওয়া, বিধানসভার সর্বসম্মত প্রস্তাবসমূহ অগ্রাহ্য করা, রাজনৈতিক বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা, মৌলিক অধিকার পদদলিত করার উদ্যোগ প্রভৃতি।

পনেরই আগস্ট—স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যলগ্নে, মধ্যরাত্রি থেকে পি এস পি ছাড়া কলকাতা ও শহরতলীতে বিভিন্ন বামপন্থীদল ও গণ-সংগঠনের অফিস খানাতল্লাশি হল। গ্রেপ্তার হলেন মেদিনীপুরের কয়েকজন নেতা—যথা যতীন চক্রবর্তী, তারাপদ দে, সরোজ রায়, বিশ্বনাথ মুখার্জি, গীতা মুখার্জি প্রমুখ। বিশে আগস্ট মেদিনীপুরের কয়েক হাজার দরিদ্র মানুষ আদালত ও বি ডি ও অফিসে আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করে। উল্লেখ্য, আন্দোলনের মুখে দিশেহারা সরকার গ্রহণ করেছিল তাদের শেষ অস্ত্র দমননীতি। কয়েকজন কৃষক নেতার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হল। ধরপাকড় চলল। মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আইন অমান্যকারী শান্তিপূর্ণ জনগণের উপর পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জের সংবাদ সংবাদপত্রের শিরোনামে এল। সরকার যাদের গ্রেপ্তার করল তাদের রাজবন্দীর মর্যাদাও দিতে চায়নি। অবশ্য বন্দীরা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের দাবি আদায় করে এবং রাজবন্দী রূপে স্বীকৃতি পায়। একত্রিশে অগাস্ট মেদিনীপুর জেলার সদরে, তমলুকে ও ঘাটালে—এই তিন স্থানে শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর হিংস্র লাঠিচার্জ হয় এবং বহু মানুষ আহত হয়। পয়লা সেপ্টেম্বরে মেদিনীপুর জেলার তমলুকে আদালতের সম্মুখে অবস্থানকারী পাঁচ হাজার ঘুমন্ত নরনারীর উপর পুলিশ নৃশংসভাবে লাঠিচার্জ করে। ফলে পঞ্চাশজন আহত হয়, তন্মধ্যে আঠারোজনের অবস্থা সংকটজনক। এছাড়া, শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে পুলিশ বহু নর-নারীকে গ্রেপ্তার করে।

১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন ব্যাপ্তি ও গভীরতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গৌরবোজ্জ্বল ছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মেদিনীপুরবাসী যে অতীতের মতো দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ তা আর একবার প্রমাণিত হল। সব থেকে বড় কথা, এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনসমূহকে একেবারে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে কারা জমিদার, জোতদার, মহাজন ও ধনিক শ্রেণীর পক্ষে, আর কারা বঞ্চিত, দরিদ্র, বুভুক্ষু সাধারণ মানুষের সঙ্গে। প্রমাণিত হয়, দমন-পীড়নে আন্দোলন স্তব্ধ হয় না বরং আরও বেগবান হয়।

তবে আন্দোলনের ধারা সবসময় এক থাকে না। ঐতিহাসিক কারণেই ওঠানামা হয়—মন্থর হয়। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত মেদিনীপুরের গণ-আন্দোলনসমূহ কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবে ছোটখাট মিটিং, মিছিল, জমি দখল আন্দোলন প্রভৃতি অব্যাহত থাকে। ছাত্র, যুব, নারী ও শ্রমিকরা ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ হয় ও বৃহত্তর গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। তবে এই সময়কালে মেদিনীপুরের কোনও গণ-আন্দোলনই তেমন তীব্রতালাভ করতে পারেনি। কেননা, ১৯৬২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের পটভূমিকায় কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে মতাদর্শগত বিতর্ক এতটাই চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল যে—তা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের বিভক্ত করে দিয়েছিল। পারস্পরিক মতানৈক্য মেদিনীপুর জেলার গণ-আন্দোলনকে তখন অনেকটা দুর্বল করে দিয়েছিল। তার উপর, জেলার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বামপন্থী নেতাকে '৬২ সালে চীনের দালাল আখ্যা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

ষাটের দশকের প্রথম থেকেই সারা মেদিনীপুর জেলায় খাদ্য সংকট থাকলেও ১৯৬৬ সালের আগে বড় রকমের কোনও আন্দোলন সংগঠিত হয়নি। '৬৬-র খাদ্য আন্দোলন মেদিনীপুর জেলায় সংঘটিত হয়েছিল আরও ব্যাপক ও তীব্রভাবে। ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল ছাত্র, যুব, শিক্ষক, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ। শহর ও গ্রামের মেহনতি মানুষের সংগ্রামী ঐক্যের ভিতও রচিত হয়েছিল। সংহত, মজবুত ও অগ্রগামী হয়েছিল মেদিনীপুরের গণতান্ত্রিক শক্তি তথা গণ-আন্দোলন।

লেখক : বিশিষ্ট প্রবন্ধকার

মেদিনীপুরের মনীষী

হরিপদ মণ্ডল

বাংলা, বিহার ও ওড়িশা—এই তিনটি প্রদেশের প্রত্যন্ত সীমার মিলনভূমি মেদিনীপুর জেলা বহুবিধ সংস্কৃতিধারার অপূর্ব সমন্বয়েরও পীঠস্থান। জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা সাহিত্য-শিল্প-সংগীতচর্চায় বিচিত্র মনীষার বিকাশে এই রাঢ়-দিগন্তের ভূমিকা অনন্যসাধারণ। যেসব কালজয়ী মনস্বী ব্যক্তি মেদিনীপুর তথা বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম কয়েকটি জ্যোতিষ্কের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেবার ক্ষুদ্র প্রয়াস এই সীমিত পরিসরের নিবন্ধে।

এটা নিশ্চয়ই আশ্চর্যের মনে হয়, যখন আমরা জানি মেদিনীপুর নামকরণের পশ্চাতে নিহিত আছে এক স্মরণীয় মনীষীর অমূল্য অবদান। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে ত্রয়োদশ শতকে ওড়িশার শাসক প্রাণকর নামে এক নৃপতির মহান পুত্র মেদিনীকর ওড়িশার অধীনস্থ এই সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসী হয়ে এর শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্বান সেই রাজপুত্র রচনা করেছিলেন **মেদিনীকোষ** নামে এক অভিনব সংস্কৃত শব্দাভিধান বা কোষগ্রন্থ। সেই মনীষী রাজা মেদিনীকরের নামানুসারেই পরে এই দিগন্তভূমির নাম হয় মেদিনীপুর। এ হল ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৩১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ের কথা। (মেদিনীপুর নামের অন্যান্য কয়েকটি গৌণ কাহিনিও আছে। এ ক্ষেত্রে সেগুলি আলোচ্য নয়।)

প্রবহমানকালের অগ্রগতিতে ঘটে দেশের সভ্যতা- সংস্কৃতির

রূপান্তর, লাভ হয় নবতর পথে সে সবের পরিপুষ্টি, বিকাশ ও সমৃদ্ধি। মধ্যযুগে যে সকল বিদগ্ধ ব্যক্তি কাব্য-সাহিত্যচর্চায় তাঁদের মনীষার স্বাক্ষর স্থায়িভাবে রেখে গিয়েছেন, তাঁদের অন্যতম কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম, কাশীরাম দাস, সাধক শ্যামানন্দ ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (আনুঃ ১৫৪৭-১৬২০) : এই জেলায় ভূমিষ্ঠ না হলেও কঠোর দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে জন্মস্থান বর্ধমানের দামুন্যা গ্রাম পরিত্যাগ করে ১৫৭৫ সালে আশ্রয় নিয়েছিলেন মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার আড়রাগড়ের ভূস্বামীর গৃহে। আড়রাগড়ের জমিদার বাঁকুড়া রায় তাঁর বিদ্যাবত্তা ও কবিত্বশক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে নিজপুত্রের শিক্ষাগুরু রূপে নিযুক্ত করেন। যথাকালে নিজ প্রতিভাবলে তিনি সুবিখ্যাত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করে কবি খ্যাতি অর্জন করেন এবং কবিকঙ্কন উপাধিও লাভ করেন। করুণ রসাত্মক এই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য মধ্যযুগীয় পল্লীসমাজের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর আলেখ্য। বিগত কয়েক শত বৎসর যাবত এই কাব্য উপন্যাসতুল্য বর্ণনানৈপুণ্য ও নাটকীয়তার গুণে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ও শহরে পূজাপার্বণে পালাকীর্তন হিসেবে পরম সমাদরে গীত হয়ে আসছে এবং লোকায়ত শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্পদরূপে পরিগণিত হয়েছে।

কবি কাশীরাম দাস (১৬শ-১৭শ শতক) : বর্ধমানের জন্মভূমি পরিত্যাগ করে এসে স্থায়িভাবে বসবাস করেছিলেন মেদিনীপুরের আবাসগড়ের রাজার আশ্রয়ে রাজবাড়ির গৃহশিক্ষকরূপে। এই আবাসগড়ে অবস্থানকালেই তিনি মহাভারতের বাংলা কাব্যে অনুবাদ করেছিলেন, যদিও মৃত্যুর পূর্বে তিনি তা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। তাঁর উত্তরসূরীরা শেষাংশ সম্পন্ন করলেও কাশীদাসী মহাভারত আজও বাঙালির গৃহপাঠ্য পুণ্যকাব্য।

সাধক শ্যামানন্দ (১৭শ শতক) : মেদিনীপুরের ধারেন্দা বাহাদুর গ্রামের সদ্গোপ বংশীয় শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের সন্তান এই বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক শ্যামানন্দ। বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে যৌবনে সংসারবিবাগী হয়ে শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে গমন করেন এবং শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তম ঠাকুরের সঙ্গে সতীর্থরূপে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁদের তিনজনকে উৎকলে ও গৌড়বঙ্গে ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। শ্যামানন্দ মেদিনীপুর ও উৎকলে, শ্রীনিবাস মধ্যবঙ্গে ও নরোত্তম ঠাকুর উত্তরবঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ভারপ্রাপ্ত হন। ভক্তগুরু শ্যামানন্দের তিনখানি সাধনগ্রন্থ অদ্বৈত তত্ত্ব, উপাসনা সার সংগ্রহ ও বৃন্দাবন পরিক্রমা বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ আদরনীয় গ্রন্থ। ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দেহত্যাগের কথা জানা যায়। তাঁর শিষ্যগণ দ্বাদশ শাখায় বিভক্ত।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী, আনুঃ ১৬৬৭-১৭৪৮) : ঘাটাল মহকুমার যদুপুর গ্রামের অধিবাসী সাধক-কবি রামেশ্বর মঙ্গলকাব্যের রচয়িতা হিসাবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত শিব সংকীর্তন 'শিবায়ণ' ও সত্যপীরের পাঁচালী সুপরিচিত কাব্য। অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে স্থানীয় চেতুয়া-বরদার জমিদার শোভা সিংহের ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহের অত্যাচারের ফলে কবি স্বগ্রাম ত্যাগ করে কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানে বসেই বিখ্যাত 'শিবায়ণ' কাব্য রচনা করেছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (আনুঃ ১৭৬২-১৮১৯) : আধুনিক বাংলার নবযুগের সূচনায় বিদগ্ধ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অবদান সমধিক উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ভাগে জলেশ্বরের নিকটবর্তী কোনও গ্রামে তাঁর জন্ম। সীমানা বিন্যাসের পূর্বে সেই অঞ্চল অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ওড়িশার অন্তর্গত ছিল। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবার রাঢ় অঞ্চলের চট্টোপাধ্যায় পদবিযুক্ত ব্রাহ্মণ পরিবার। ভ্রমক্রমে কেউ কেউ তাঁকে ওড়িশার লোক বলে উল্লেখ করেছেন আগেকার লেখাপত্রে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যানুশীলন করেছিলেন উত্তরবঙ্গে এসে নাটোরের সভাপণ্ডিতের নিকট প্রথমে এবং তৎপরে অন্যত্র। তৎকালে তাঁর বিদ্যাচর্চা ছিল মূলত সংস্কৃত ভাষা সাহিত্য ও শাস্ত্রাদির মাধ্যমে এবং সে সবের শিক্ষায় তিনি মেধাবী বিদ্যার্থী হিসাবে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। শিক্ষালাভ শেষ করে যৌবনে তিনি কলকাতার অধিবাসী হন এবং ১৮০৫ সালে কেরী সাহেবের সুপারিশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। একই সঙ্গে তিনি বাংলা বিভাগেরও অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সম্ভবত তিনিই বাংলাভাষার প্রথম গদ্য লেখক যিনি ছাত্রদের জন্য প্রথম পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন এবং বাংলা গদ্যের সেই আদি যুগে তিনিই প্রথম বরণীয় পণ্ডিত-লেখক। পাঠ্যপুস্তক রচনা ও বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনায় নিঃসন্দেহে তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্বসূরী। সমালোচকদের কেউ কেউ তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক বলেও অভিহিত করেছেন এবং তা অমূলক বা অযৌক্তিকভাবে নয়। তাঁর রচিত বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, রাজাবলি, বেদান্তচন্দ্রিকা, প্রবোধচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ সেকালে বহুপঠিত ও আদৃত। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় সুপ্রিম কোর্টের প্রথম জজপণ্ডিত হিসাবে নিযুক্ত হন। প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত হয়েও তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। তাঁর রচিত 'রাজাবলি' পুস্তকটিকে বাঙালির রচিত প্রথম ভারতের ইতিহাস বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন। সুপণ্ডিত মার্শম্যান সাহেব মৃত্যুঞ্জয়ের পাণ্ডিত্যকে ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থকার ডক্টর জনসনের অপরিমেয় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) : 'বিদ্যাসাগর' এই উপাধি কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি অর্জন করলেও সারা ভারতে বিদ্যাসাগর বলতে একমাত্র প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত

'শোকোচ্ছ্বাস' পুস্তিকায় প্রকাশিত কাঠখোদাই ছবি (১৮৯১)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেই বোঝায়। ১৮২০ সালে ২৬ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরের উত্তরাঞ্চলে বীরসিংহ গ্রামে তাঁর জন্ম এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতী দেবী। বালক বিদ্যাসাগর পিতার সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করে নিজ মেধাবলে সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে মাত্র ২০ বছর বয়সে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেছিলেন। তারপর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক ও পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেছিলেন। তাঁর অমিত চরিত্রবল, সমাজসেবা, বিশেষ করে বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ প্রথা রোধ, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও দীন দুঃখী-পীড়িতের প্রতি অনুরাগ, সার্বজনীন শিক্ষা প্রসার, সংস্কৃত শিক্ষা পদ্ধতি সংস্কার, বাংলা ভাষার সংস্কার ও সাহিত্য-সাধনা তাঁকে ভারতবাসীর হৃদয়ে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। তিনি বাঙালির কাছে শুধু বিদ্যাসাগর ছিলেন না, ছিলেন দয়ার সাগর, করুণার প্রতিমূর্তি। বিধবা বিবাহ প্রচলন, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও অন্যান্য সমাজসেবায় তাঁর অন্যতম সহযোগী ছিলেন মেদিনীপুরের তৎকালীন জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মনীষী রাজনারায়ণ বসু।

রাজনারায়ণের জন্ম দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলায় হলেও তাঁর পরিবারবর্গ তৎকালে মেদিনীপুরের অধিবাসী হয়েছিলেন এবং মেদিনীপুরের নবজাগরণে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। বিদ্যাসাগর ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯) : রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরকে তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র করেছিলেন এবং মেদিনীপুরের জনগণকে ভালবেসেছিলেন বলে তিনি 'মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ' রূপেই পরিচিত হয়েছিলেন। রাজনারায়ণ ছিলেন বিদ্যাসাগর ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের অন্যতম অকৃত্রিম বন্ধু। মেদিনীপুরে অবস্থানকালে তিনি গঠন করেছিলেন 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা', সুরাপান নিবারণী সমিতি, জ্ঞানদায়িনী সভা। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বেলী হল লাইব্রেরী (বর্তমানে রাজনারায়ণ স্মৃতি গ্রন্থাগার), অলিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। জ্ঞানসাধক এই মহান মনীষী রচনা করেছিলেন 'শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগরণের পরিকল্পনা-পত্র'। এই পত্রই ভারতসভা ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মূল নীতির সূচনা করে। তাঁর উদ্দীপনাময় দেশপ্রেম, নিরলস জনজাগরণ প্রচেষ্টা, জ্ঞান-সাধনা ও আধ্যাত্মিক জীবনবেদের জন্য তাঁকে 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পিতামহ' আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। কেউ কেউ তাঁকে 'স্বাদেশিকতার মন্ত্রগুরু' বা 'ঋষি' নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও শহিদ সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং দুই দৌহিত্র শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্র ঘোষ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

রাজনারায়ণ বসু

সংগীতনায়ক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী : আধুনিক বাংলায় সংগীতজগতের শিরোমণি ক্ষেত্রমোহন জন্মগ্রহণ করেছিলেন চন্দ্রকোণায় ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে। পিতা রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণাতেই তিনি সংগীতজগতে প্রবেশ করেছিলেন। বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের গৃহে থেকে সংগীত শিক্ষা করে সংগীতকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করে কলকাতা পাথুরিয়াঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগীতসভার গায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ঐকতান বাদন (অর্কেস্ট্রা), অঙ্করমাত্রিক স্বরলিপি রচনা, সংগীত-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি বিষয়ের তিনিই পথিকৃৎ। ১৮৫৮ সালে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয়ে তিনিই প্রথম অর্কেস্ট্রা বা ঐকতান বাদনের প্রবর্তন করেন। বঙ্গসংগীত বিদ্যালয় ও বেঙ্গল আকাদেমি অব মিউজিক নামক দুটি প্রতিষ্ঠানে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন প্রধান শিক্ষক। সৌরীন্দ্রমোহনের সংগীত বিদ্যালয় থেকে তাঁকে 'সংগীতনায়ক' উপাধি ও স্বর্ণপদক দান করা হয়। সংগীততত্ত্ব বিষয়ে রচিত তাঁর বিপুল গ্রন্থ 'সংগীত-সার' প্রকাশিত হলে (১৮৬৯) সংগীতজগতে তাঁর খ্যাতি প্রসারিত হয়। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে ঐকতানিক স্বরলিপি, কণ্ঠকৌমুদী, আশু-রঞ্জনী-তত্ত্ব প্রভৃতি। সংগীতজগতের স্বনামধন্য শিল্পীদের মধ্যে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, নবীনকৃষ্ণ হালদার, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন তাঁরই শিষ্য।

বাসুদেব ঘোষ (পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক) : বাসুদেব বৈষ্ণব যুগের এক উজ্জ্বল রত্ন। পদাবলী রচয়িতা ও সুকণ্ঠ গায়ক হিসাবে বৈষ্ণব সমাজে তাঁর প্রভূত খ্যাতি ছিল, বিশেষত তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত অনুরক্ত অনুচর। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর তিনি মেদিনীপুরের তমলুকে এসে বসবাস করেন এবং তমলুক থেকেই পুরী যাতায়াত করতেন মহাপ্রভুকে দর্শন করতে। তমলুকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ আজও নিত্য পূজিত হয়। সহজ, সুললিত ও মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি রচনা করেছেন 'গৌরাঙ্গচরিত' ও 'নিমাই সন্ন্যাস' নামে দুখানি জনপ্রিয় গ্রন্থ। শ্রীচৈতন্যদেবের বহু বিতর্কিত তিরোধান কাহিনি যে অল্প কয়েকখানি গ্রন্থে পাওয়া যায়, বাসুদেবের পুস্তক তার মধ্যে অন্যতম। বাসুদেবের পূর্বপুরুষের বাস চব্বিশ-পরগনার কুমারহট্টে, কিন্তু তিনি জন্মেছিলেন মাতুলালয়ে শ্রীহট্টের বুড়ন গ্রামে। মৃত্যু তমলুকে।

ঈশানচন্দ্র বসু (১৮৪৩-১৯২২) : মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুর অন্যতম প্রিয় ছাত্র ঈশানচন্দ্র বাংলা সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর জন্ম ডেবরা থানার হরিহরপুর গ্রামে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষাতেও কৃতবিদ্য ছিলেন। মনীষী রাজনারায়ণের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী হয়ে তিনি কলকাতায় তাঁর কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সহ-সম্পাদক পদে বৃত হয়ে জ্ঞানানুশীলনের সুযোগ গ্রহণ করেন এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিশিষ্ট লেখকরূপেও আত্মপ্রকাশ করেন। রাজা রামমোহন রায়ের লুপ্তপ্রায় ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থাবলীর সংকলন করার দুরূহ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। অবশ্য এ বিষয়ে প্রথম পথিকৃৎ ছিলেন মনীষী রাজনারায়ণ বসু। তিনি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বক্তৃতাবলীরও প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে ছিল তাঁর বিপুল উৎসাহ। তাঁর লিখিত 'নারীনীতি' ও 'স্ত্রীদিগের প্রতি উপদেশ' সর্বজন প্রশংসিত পুস্তক। কলকাতার ভবানীপুর কাঁসারীপাড়াতে তিনি উদ্যোগী হয়ে হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একটি ক্ষুদ্র জীবনী রচনা করেছিলেন। ভারতী, নব্য ভারত, নবজীবন, জন্মভূমি ইত্যাদি পত্রিকায় এবং মেদিনীপুরের মেদিনীবান্ধবে তাঁর লিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত। গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি বহু প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন এবং কতকগুলি প্রকাশও করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্য-সেবকগণের মধ্যে তাঁর নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তিনি বাংলা ১৩১৯ সালের (ইং ১৯১২) ২৮ আশ্বিন দেহত্যাগ করেন।

কার্তিকচন্দ্র মিত্র (১৮৪৮-১৯০২) : মেধাবী কার্তিকচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ঈশান স্কলার, মেদিনীপুর জেলার প্রথম এম এ এবং প্রথম পি আর এস। তিনি ছিলেন মেদিনীপুর জেলাস্কুলের (বর্তমান কলেজিয়েট স্কুল) মনীষী রাজনারায়ণ বসুর আমলে সর্বাপেক্ষা কৃতী ছাত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৬৪ সালের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন এবং পরবর্তী এফ এ, বি এ এবং এম এ—সব পরীক্ষাতেই শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। শেষে ১৮৭২ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্টুডেন্টশীপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দশ হাজার টাকা বৃত্তি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তৎকালেও তাঁর মতো মেধাবী যুবক কোনও সরকারি চাকরি করতে উৎসাহী হননি। তাঁর জন্ম হয়েছিল খড়্গপুর থানার জকপুর সংলগ্ন চকগণেশ গ্রামের সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারে। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি মেদিনীপুরেই আইনজীবী হয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং জনসেবার মধ্যেও নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন। মেদিনীপুর টাউন স্কুল প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম কীর্তি।

অধ্যক্ষ নীলকণ্ঠ মজুমদার (১৮৫৬-১৯০১) : নীলকণ্ঠের জন্ম মেদিনীপুর শহরের পূর্বে পাথরা-জনার্দনপুর গ্রামের প্রখ্যাত মজুমদার পরিবারে। শিক্ষালাভ মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে এবং পরে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কৃতবিদ্য বিদ্যার্থী হিসাবে তিনি সব পরীক্ষাতেই উচ্চস্থান লাভ করেছিলেন এবং ১৮৭৭ সালে এম

এ পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। ১৮৮১ সালে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্টুডেন্টশীপ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে পি আর এস বৃত্তিও লাভ করেছিলেন। অধ্যাপনাকেই তিনি জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ঢাকা, রাজশাহী ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার পর তিনি কৃষ্ণনগর কলেজ ও কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের অধ্যক্ষ পদে বৃত হয়েছিলেন। কোনও প্রথম শ্রেণীর সরকারি কলেজে স্থায়িভাবে অধ্যক্ষের পদ লাভ কোনও বাঙালির পক্ষে এই প্রথম। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল বহু বিস্তৃত। তিনি কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর লিখিত গীতা-রহস্য, বিবাহ ও নারীধর্ম, Are We Aryans ? এবং The Village Schoolmaster তাঁর গভীর মননশীলতার স্বাক্ষর বহন করছে।

রামদয়াল মজুমদার (১৮৬০-১৯৩৯) : নীলকণ্ঠ মজুমদারের ভ্রাতা রামদয়াল মজুমদারও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন এবং বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করে যেমন খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তেমনই ধর্ম ও দর্শন চর্চা দ্বারা তিনি আধ্যাত্মিক জগতের গভীরে প্রবেশেরও সাধনা করেছিলেন। তিনিও ছিলেন সুলেখক এবং ওঁর গীতার ব্যাখ্যাও সর্বজন সমাদৃত হয়েছিল। তিনি একটি দার্শনিক পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে গীতা পরিচয়, ভারত সমর, ভদ্রা, সাবিত্রী ও উপাসনাতত্ত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুরাওয়ার্দি পরিবারের কয়েকজন মনীষী

মেদিনীপুর জেলার মুখোজ্জ্বলকারী কৃতী পণ্ডিতগণের মধ্যে মেদিনীপুরের সুরাওয়ার্দি পরিবারের কয়েকটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের নাম অবশ্যই অগ্রগণ্য। এই পরিবারের আদি বাস ছিল পিংলা থানার ঘোড়ামারা গ্রামে।

স্যার জাহাবুর রহিম জহিদ সুরাওয়ার্দি : স্যার জাহাবুর রহিম জহিদ সুরাওয়ার্দি ছিলেন স্কুল-কলেজের কৃতী ছাত্র। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে এম এ পাশ করার পর বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বিলাত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এসে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী হন। ভারত সরকার তাঁর গভীর আইনজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করেন। অবসরগ্রহণের পর তিনি রেলওয়ে বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর অসামান্য যোগ্যতার পুরস্কারস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

আবদুল্লা অল-মামুন সুরাওয়ার্দি : ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের অন্যতম কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন ও পারসী সাহিত্য—এই তিনটি বিষয়ে এম এ পাশ করেন। তারপর ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসে কলকাতা হাইকোর্টে কয়েক বছর ব্যারিস্টারি করেন। কিন্তু বিদ্যাচর্চায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ থাকায় আইন ব্যবসা ত্যাগ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯১১ সালে তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ঠাকুর' আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। আবদুল্লা সাহেব বহুভাষাবিদ সুপণ্ডিত ছিলেন। পি এইচ ডি, ডি-লিট প্রভৃতি উপাধি অর্জন তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। মেদিনীপুর জেলায় তিনিই প্রথম ডক্টরেট। ইসলাম আইন ও ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। এই সম্বন্ধে তিনি কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেছেন। ১৯২০ সালে মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই বোর্ডের তিনিই প্রথম বেসরকারি সভাপতি। তাঁর সামগ্রিক কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৩৪ সালে তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত হন। স্যার আবদুল্লা বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ, সাইমন কমিশন, এশিয়াটিক সোসাইটি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। ১৯৩৫ সালের ১৪ জানুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেন।

স্যার হাসান সুরাওয়ার্দি : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান ভাইস-চ্যান্সেলর। তিনি ও তাঁর অগ্রজ অধ্যাপক আবদুল্লা অল-মামুনের মতো বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগবশত এ দেশের মেডিক্যাল শিক্ষালাভের পর উচ্চতর বিদ্যালাভের জন্য বিলাতে গিয়েছিলেন। নিজ কৃতিত্বগুণে তিনি ভারতীয় রেলওয়ের চিফ মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত হন। এই পদে তিনিই প্রথম ভারতীয়। আবার ভারতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিলের তিনিই প্রথম নির্বাচিত সহকারী সভাপতি। ১৯৩১ সালে তিনি নিযুক্ত হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে। শেষ জীবনে বিলাতে ভারত-সচিবের উপদেষ্টা পদেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্যার উপাধিতে ভূষিত হন। এ ছাড়া দেশ-বিদেশের বহু সম্মানও লাভ করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বিচারপতি আবদুর রহিম (১৮৬৭-১৯৫২) : বিচারপতি রহিম মেদিনীপুরের সুসন্তান। মেদিনীপুর শহরের এক বিশিষ্ট ধনী পরিবারে তাঁর জন্ম। কলেজিয়েট স্কুল থেকে সসম্মানে এন্ট্রান্স পাশ করবার পর তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তারপর বিলাত থেকে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারজীবী হিসাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৯০০ সালে তিনি চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ১৯০৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর' আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁর মুসলমান আইন সম্পর্কিত বক্তৃতামালা 'প্রিন্সিপল্‌স অব মহামেডান জুরিস্‌প্রুডেন্স' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ সালে

তিনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ওই স্থানে দুবার তিনি অস্থায়ী প্রধান বিচারপতিরূপেও দায়িত্ব পালন করেন। ভারতের মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠায় তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সভাপতি হিসাবে ১৯৩৫ সালে বিলাতের জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কনফারেন্সে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মৃত্যু ১৯৫২ সালে।

মনীষী সূর্যকুমার অগস্তি (১৮৫৭-১৯২৫) : প্রশাসনিক কর্মের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থেকেও সূর্যকুমার অগস্তি তাঁর স্বদেশপ্রেম, সমাজসেবা, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করে দেশবাসীর হৃদয় জয় করেছিলেন। তাঁর অপূর্ব স্মৃতিশক্তি ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা পূর্বসূরী কার্তিকচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁর ছাত্রজীবন গৌরবোজ্জ্বল। বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষাতেই উচ্চস্থান লাভ করে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং সরকারি বৃত্তি বা পুরস্কার লাভ করেছিলেন। সর্বশেষে ১৮৮১ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিও অর্জন করেছিলেন। কিছুকাল তিনি কয়েকটি কলেজে অধ্যাপনা করার পর সরকারি প্রশাসনে এসে আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে বৃত হয়েছিলেন। ১৯২১ সালে মেদিনীপুরে যে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হয়, তাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে যে অভিভাষণ প্রদান করেছিলেন, তা ছিল তাঁর প্রবল সাহিত্যানুরাগ ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। মহাত্মা গান্ধীর সংবর্ধনা সভারও তিনি ছিলেন সভাপতি।

সূর্যকুমারের জন্ম গড়বেতায়। তখন গড়বেতার শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি ইংরেজি বিদ্যালয়। তাঁর মতো কৃতী, তেজস্বী ও উদ্যোগী পুরুষ বিরল। তিনি ছিলেন নীরব সাধক ও দেশসেবক। নাম-যশের পশ্চাতে তাঁর বিন্দুমাত্র স্পৃহা ছিল না।

বিজ্ঞানী পুলিনবিহারী সরকার (১৮৯৪-১৯৭১) : জন্ম তমলুক শহরে। প্রথম শিক্ষা তমলুক হ্যামিল্টন হাইস্কুলে। কৃতী ছাত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতায় উচ্চশিক্ষা লাভ করে প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নে মৌলিক গবেষণা করে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। কলকাতায় তাঁর সতীর্থ ছিলেন মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি প্রমুখ কৃতবিদ্য বিজ্ঞান-সাধক। স্কানডিয়াম, গাডোলিয়াম এবং ইউরোপিয়ামের উপর গবেষণার কৃতিত্ব প্রথমত তাঁরই। ১৯৪৬ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খোদ অধ্যাপক এবং ১৯৫২ সালে রসায়ন বিভাগের প্রধান পদে উন্নীত হন। ৪০টিরও বেশি ভারতীয় খনিজ পদার্থের রাসায়নিক উপাদান বার করে সেগুলির রাসায়নিক সংকেতও নির্ধারণ করেছেন। তিনি তেজস্ক্রিয়তা এবং ভূ-তাত্ত্বিক বয়স নির্ণয় করার কাজে অন্যতম পথিকৃৎ। ১৯৩৮ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠানেরও তিনি সদস্য ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর পিতামহ যাদবচন্দ্রের নামানুসারে কলকাতার দক্ষিণের একাংশের নামকরণ যাদবপুর হয়েছে। বিজ্ঞানী পুলিনবিহারী আমাদের বিজ্ঞান গবেষণার একজন আধুনিক পথপ্রদর্শক ও মেদিনীপুরের গৌরব।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (১৮৮১-১৯৩৪) : বিশিষ্ট ব্যারিস্টার, প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে পরিচিত হলেও বীরেন্দ্রনাথের সমাজসেবায় ও

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

জনসংগঠনে কৃতিত্ব ছিল অসামান্য। স্বাধীনচেতা বক্তা ও চিন্তাশীল লেখক হিসাবেও তিনি সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর জন্ম কাঁথি শহরের নিকটবর্তী চণ্ডীভেটি গ্রামে। শিক্ষালাভ কাঁথি, কলকাতা ও লন্ডনে। কলকাতা হাইকোর্টে ও মেদিনীপুর জেলা কোর্টে তিনি অতি সুনামের সঙ্গেই আইনজীবী হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। কিন্তু সব কিছু পরিত্যাগ করে তিনি দেশের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। স্বরাজ্য দলে যোগদান, মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ডের কর বন্ধ আন্দোলনে নেতৃত্ব তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি প্রাদেশিক ও ভারতীয় আইনসভার সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলায় ও রাজদ্রোহে অভিযুক্ত ক্ষুদিরামের মেদিনীপুর আদালতের প্রথম মামলায় তিনি বিনা পারিশ্রমিকে আসামীপক্ষ সমর্থন করেছিলেন। জননেতা হিসাবে প্রদত্ত তাঁর ভাষণগুলি এবং তাঁর লিখিত 'স্রোতের তৃণ' পুস্তকখানি তাঁর বিদগ্ধ মনীষার স্বাক্ষর বহন

করে। মেদিনীপুরের জনমানসে তাঁর এতখানি গভীর প্রভাব ছিল যে, তাঁকে মেদিনীপুরের 'মুকুটহীন রাজা' এবং 'দেশপ্রাণ' আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছিল।

র‍্যাংলার বীরেন্দ্রনাথ দে (১৮৮১-১৯৫২) : মেদিনীপুরের তথা বাংলার এক সুসন্তান। মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অন্যতম কৃতী ছাত্র। ১৯০১ সালে অংকশাস্ত্রে অনার্সসহ পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিষয় নিয়ে বি এ পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তারপর বিলাত যান, ১৯০৬ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অংকশাস্ত্রে ট্রাইপস্ পাশ করে ভারতের ষষ্ঠ র‍্যাংলার হবার মর্যাদা লাভ করেন। কিন্তু তিনি আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরে ভারতে ফিরে সরকারি উচ্চপদে আসীন হন। তৎকালে মধ্যপ্রদেশের অর্থ বিভাগের সেক্রেটারি ও পরে বেরারের কমিশনার রূপে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিলে ভারত সরকার তাঁকে সি আই ই উপাধিতে ভূষিত করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পর মেদিনীপুরের মানুষ হিসাবে তিনিই দ্বিতীয় সি আই ই, কিন্তু কিছুকাল পরে ব্রিটিশ কর্মচারি ও ভারতীয় কর্মচারিদের মধ্যে বৈষম্যমূলক ব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি অকাতরে অতি উচ্চপদের সরকারি চাকরিও পরিত্যাগ করেন। ধর্মাচরণ, স্বদেশসেবা ও শিক্ষা বিস্তারে সমধিক আগ্রহী হয়ে বহুবিধ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

হেমচন্দ্র দাস কানুনগো (১৮৭১-১৯৫০) : প্রধানত বিপ্লবী হিসাবে বিখ্যাত হলেও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও চিন্তাশীলতার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। শহিদ সত্যেনের

হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো)

সঙ্গে শহিদ ক্ষুদিরামের অন্যতম বিপ্লবগুরু রূপে তিনি গুপ্ত আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষক হিসাবে তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী ও কলেজের বিজ্ঞানাগারের সহায়ক পরীক্ষক। ফ্রান্সে গিয়ে চিত্রবিদ্যা ও রাসায়নিক বোমা তৈরির কলাকৌশল অধিগত করেছিলেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী মহিলা মাদাম কামার নির্দেশে প্রথম জাতীয় পতাকা তৈরি করে জার্মানির স্টুটগার্ট শহরের সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে ব্যবহারের জন্য মাদাম কামার হাতে দিয়েছিলেন। বিপ্লবীর শাস্তি আন্দামানে দ্বীপান্তর সহাস্যে বরণ করে একটি দেশাত্মবোধক সংগীত রচনা করেছিলেন। তাঁর সুলিখিত দুটি পুস্তক 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা' ও 'অনাগত সুদিনের তরে' এখনও তাঁর দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি ও মননশীলতার পরিচায়ক।

উপেন্দ্রনাথ বল (১৮৮৪-১৯৪৭) : অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বল প্রধানত শিক্ষাব্রতী হলেও মনস্বী এবং তেজস্বী লেখক ও বক্তা হিসাবে বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। খেজুরী থানার জাহানাবাদ গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস ও অর্থনীতি উভয় বিষয়ে এম এ পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনের পর লক্ষ্ণৌ ও পরে লাহোর কলেজে সুনামের সঙ্গে অধ্যাপনা করেছিলেন। ইংরেজিতে সুলেখক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী, ইংরেজ জাতির ইতিহাস, ভারতের ইতিহাস প্রভৃতি পুস্তকগুলি তাঁর অনন্য প্রতিভার অবদান। ব্যক্তিজীবনে তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও সংগীতকার অতুলপ্রসাদ সেনের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। শেষ জীবনে কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজে অধ্যাপনাকালে ছাত্রদরদী ও জনপ্রিয় মানুষ হিসাবে সকলের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করেছিলেন। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রাহ্মসমাজ ছাত্রাবাস।

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (আনুঃ ১৮০০-১৮৭২) : সুগায়ক ও সংগীতকার হিসাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সংগীত সাধক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর মতোই রমাপতি সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জন্ম তাঁর মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা শহরে। প্রথম যৌবনে গায়ক পিতা গঙ্গাবিষ্ণুর কাছে, পরে বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ও পশ্চিম প্রদেশীয় কলাবত মহম্মদ বক্স, আসমৎ উল্লা এবং বৈদ্যনাথ দুবের কাছে সংগীতশিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁর অন্যতম কীর্তি 'মূল সংগীতাদর্শ' গ্রন্থ রচনা। এই গ্রন্থে তিনি তানসেন প্রমুখ ধ্রুপদী সংগীতজ্ঞের রচিত হিন্দি ধ্রুপদ গানের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে বাংলাভাষায় এইটিই প্রথম মৌলিক পুস্তক। এই গ্রন্থে রমাপতির নিজের ও তাঁর পত্নী করুণাময়ী দেবীর রচিত কিছু গানও প্রকাশিত হয়েছে। তিনি হিন্দি, সংস্কৃত, ফারসি ও ওড়িয়া ভাষা উত্তমরূপেই শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং কিছুকাল কাঁথিতে নিমকমহলের চাকরিও করেছিলেন। তৎপরে বহু বৎসর বর্ধমানরাজ মহতাপচাঁদের দরবারে সভাগায়ক হিসাবে এবং কিছুকাল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহেও গায়করূপে অবস্থান করেছিলেন। সংগীতকার হিসাবে বর্ধমানের রাজসভায় তিনি 'কবীন্দ্র' উপাধিতে সম্মানিত হয়েছিলেন।

জ্যোতির্ময় নন্দ (১৯০৮-১৯৯৬) : সাম্প্রতিককালে বিদ্যাবত্তা, শাস্ত্রজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চা এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনে মেদিনীপুরের যাঁরা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতির্ময় নন্দ তাঁদের অন্যতম। তিনি জন্মেছিলেন কাঁথি মহকুমার মুগবেড়িয়া গ্রামের লব্ধকীর্তি ভূস্বামী 'নন্দ' পরিবারে। ভোলানাথ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষরূপে, কাঁথি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অন্যতম পরিচালক হিসাবে এবং বাংলাভাষা ও সংস্কৃতের সুলেখক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল বহুবিস্তৃত। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে জনকল্যাণের ব্রত ছিল তাঁর জীবনবেদ। সমাজসেবা, বিশেষত নারী-সমাজের উন্নতি, জাতিভেদ প্রথা রোধ, পরিবেশ দূষণ নিবারণ এবং সুস্থ সংস্কৃতি ও নৈতিকতার প্রসার নিয়ে আজীবন তিনি সংগঠন ও প্রচার কাজ চালিয়ে গেছেন। বিত্তবান ব্যক্তির বংশধর হয়েও তিনি সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের সঙ্গে মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন।

বিশাল এই জেলার মনীষীগণের পূর্ণাঙ্গ তালিকা বা তাঁদের সম্যক পরিচিতিদান ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। সুধীসমাজে বরণীয় ও স্মরণীয় মানুষের মধ্যে আজও যাঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়, তাঁদের মধ্যে আছেন—সুলেখক স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্র বসু, নরেন্দ্রনাথ দাস, অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী, বসন্তকুমার দাস, মহেন্দ্রনাথ করণ, দেবদাস করণ, অতুলচন্দ্র বসু, রাসবিহারী রায়, শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, সাতকড়িপতি রায়, ডক্টর অনিলকুমার গায়েন, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, স্বামী অমলানন্দ, পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য, ভক্তিতীর্থ, ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত, ত্রৈলোক্যনাথ পাল, পঞ্চানন রায় (গবেষক), কবি বিভূতি বিদ্যাবিনোদ, নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন (বিদ্যাসাগর-তনয়), বিজ্ঞানী নারায়ণচন্দ্র রাণা, বিজ্ঞানী মণিলাল ভৌমিক, ডক্টর প্রবোধকুমার ভৌমিক, সাহিত্যিক ঋষি দাস, ডক্টর সুধাংশু তুঙ্গ, অধ্যাপক বিনয়জীবন ঘোষ, অধ্যক্ষ শ্যামাদাস ভট্টাচার্য ও ডক্টর বিষ্ণুপদ পণ্ডা। সহস্র মেঘাচ্ছন্ন ঝটিকাপ্রবাহের মধ্যেও এঁদের কালোত্তীর্ণ প্রতিভা ও মনীষার স্বাক্ষর মেদিনীপুর তথা বাংলার শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বহুবিস্তৃত ক্ষেত্রে এখনও দীপ্যমান।

তথ্যসূত্র :

১। মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশচন্দ্র বসু
২। বঙ্গসাহিত্যে মেদিনীপুর—যোগেশচন্দ্র বসু
৩। স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর (প্রথম খণ্ড)—বসন্তকুমার দাস
৪। আলো : মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল পত্রিকা (১৯৭২-১৯৯২)
৫। সাহিত্যসাধক চরিতমালা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
৬। সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান—সাহিত্য সংসদ
৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ড. সুকুমার সেন
৯। সব্যসাচী (পত্রিকা, মেদিনীপুর)
১০। মেদিনীপুর টাইমস্ (পত্রিকা)
১১। বিশ্বকোষ—বিশ্বকোষ পরিষদ (কলকাতা)
১২। মেদিনীপুরের গৌরব কাহিনী—সলিল মিত্র
১৩। চন্দ্রকোণার ইতিবৃত্ত—কানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী
১৪। কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ পত্রিকা (১৯৪৭-৫০)
১৫। প্রভাত পত্রিকা (পুরাতন)—প্রমথনাথ পাল সম্পাদিত

লেখক : প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

দীঘার বালুকাবেলায়
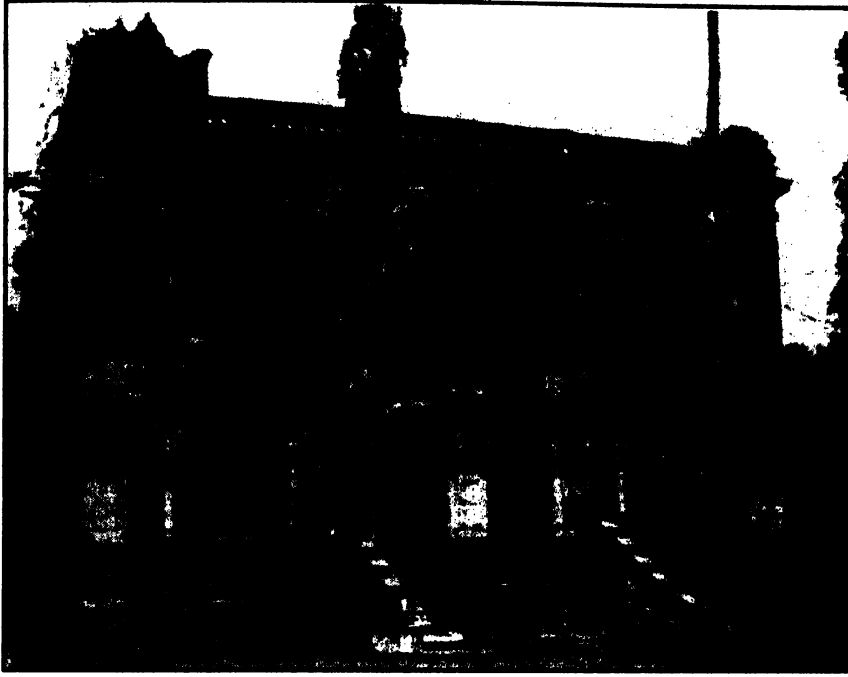
পুরানো রাজবাড়ি, মহিষাদল   ছবি : লেখক

মহিষাদল : দীনেন্দ্রকুমার রায় ও অন্যান্য

শেখর ভৌমিক

আজ থেকে কুড়ি বছর আগে জন ক্রমফিল্ড লিখেছিলেন শহরগুলির ওপর মাত্রাতিরিক্ত মনোনিবেশের ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু জনপদগুলির কথা বা তাদের গুরুত্ব গবেষকরা অনেক সময়ই বিস্মৃত হন।[১] তিনি নিশ্চিতভাবে কলকাতার কথা বলতে চেয়েছেন। ইতিহাসবিদদের এই আক্ষেপ ১৭ বছর পরেও যায়নি। মাত্র তিন বছর আগে অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায় লিখছেন—১৯৮১ সালে ভারতের ছোট-বড় শহরের সংখ্যা তিন হাজারের উপরে ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এই গৌরবময় ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় শহরের উপর ঐতিহাসিক কাজ খুবই কম হয়েছে।[২] শহর বলতে অধ্যাপক রায় নিশ্চয়ই 'মেট্রোপলিটন' শহর বা আমেদাবাদ, লখনউ বা মুর্শিদাবাদ বোঝাননি, তুলনায় কম পরিচিত শহরগুলির কথাই তিনি সম্ভবত বলতে চেয়েছেন।

আসলে এই বড় শহরগুলির পরেও অনেক রকমের শহর আছে, আছে তাদের স্তর, আয়তন, প্রকৃতিগত পার্থক্য। কলকাতার কথা বাদই দিলাম, শিলিগুড়ি বা বহরমপুরের সঙ্গে ডায়মন্ডহারবার বা তমলুকের যেমন পার্থক্য আর কী। এই আঞ্চলিক মফস্বল শহর বা তার সন্নিহিত এলাকাগুলি নিয়ে বিজ্ঞাননিষ্ঠ গবেষণা আজও তেমন নজরকাড়া নয়। আমরা ভুলে যাই যে, এই সমস্ত বড় নগর-শহরের বাইরেও আছে এক বিশাল জগৎ, চলমান স্থানীয় বা আঞ্চলিক
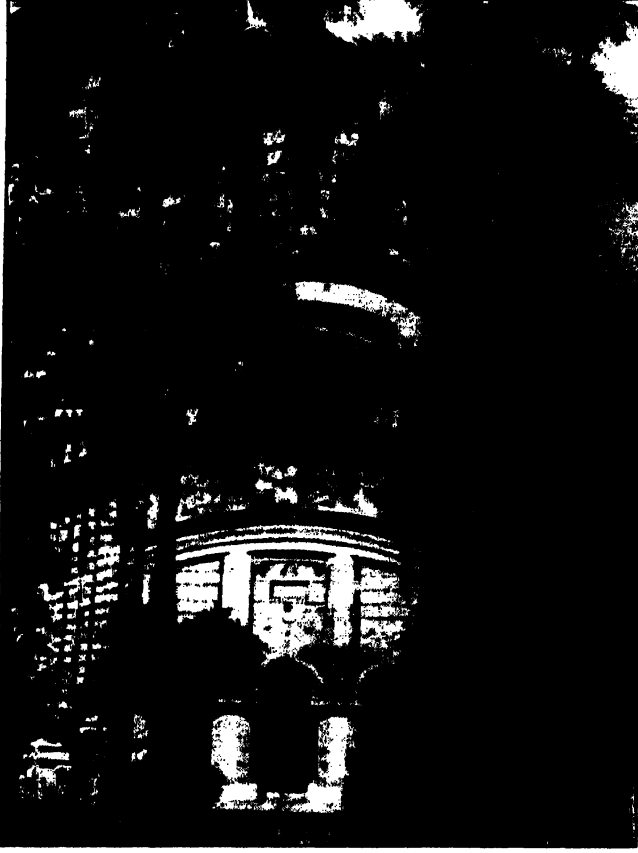
গোপালজীউর মন্দির, মহিষাদল

জনপদগুলির ইতিহাসের এক সমান্তরাল স্রোত, যাকে না জানলে ঐতিহাসিক জ্ঞান আহরণ সম্পূর্ণ হয় না। গ্রামবাংলারও যে এক সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস রয়েছে, সেখানেও যে নানান সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তর, সংস্কৃতির ভিন্নধর্মী রূপ—'elite-popular', স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী যুগে সামাজিক নেতৃত্বদানের জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা আর তার নানান মাধ্যম 'tool'—বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মন্দির-নাটমন্দির বা আটচালা নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন, জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড, পৌরসভা, না হলে কংগ্রেস রাজনীতি—এ সবই আমাদের জানা আবশ্যক। সুখের কথা, সম্প্রতি ঐতিহাসিকদের গবেষণার ঝোঁক এদিকেও সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিষয়টিকে একটু অন্যরকমভাবে বলেছেন অধ্যাপক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—'We have now started questioning the essentialism of categories like caste, class or nation and are talking about fleeting solidarities and protean identities. 'Imagining' India or the 'Construction' of communalism are now favoured themes for serious history writing on South Asia.'[৩]

প্রাচীন বাংলার গ্রাম শহরের ওপর নীহাররঞ্জন রায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থটি থেকে আমরা বিভিন্ন অঞ্চলের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কথা জেনেছি।[৪] মধ্যযুগের নগরপত্তন, নগরবিন্যাসের কথা পেয়েছি চণ্ডীমঙ্গলে—কায়স্থ, বণিক, নবশায়ক, ইতরজাতি, ব্রাহ্মণ—কীভাবে তাঁরা ঢুকছেন বা এককথায় নগরায়নের এক চমৎকার বর্ণনা।[৫] আবার অন্নদামঙ্গলে আমরা বর্ধমান নগরের ছবি দেখলাম—চৌদিকে শহর মাঝে মহল রাজার

আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার[৬]

বেশ কিছুকাল পর একই ধরনের আর একটি চিত্র পাচ্ছি নদিয়া-কৃষ্ণনগরের দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের রচনায়।[৭]

আরও দুজন বিখ্যাত মানুষের লেখায় আমরা বিগত শতাব্দীতে গ্রামবাংলার বেশ কয়েকটি জায়গার পরিচয় পাই। একজন যদুনাথ সর্বাধিকারী, যিনি উত্তর ভারত যাবার পথে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করার সময় তাঁর 'ভ্রমণের রোজনামচা'য় সেই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছিলেন[৮], আর অন্যজন সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়। দীনেন্দ্রকুমারের লেখায় যেমন তাঁর জন্মস্থান অবিভক্ত বাংলার মেহেরপুর বা রাজশাহীর নানা প্রসঙ্গ এসেছে, তেমনই এসেছে মেদিনীপুরের (অধুনা পূর্ব মেদিনীপুর) মহিষাদলের রথের কথা, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের কথা বা মধ্যহিংলীর মিত্র পরিবারের গ্রন্থাগারের কথা, রাজাদের কথা[৯]—সব মিলিয়ে উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলার এক বর্ধিষ্ণু জনপদের সমৃদ্ধ বর্ণনা।

॥ ২ ॥

"সে এক রাজার দেশ। অক্ষয় 'ঠাকুরমার ঝুলিতে' এ রাজাদের কথা নেই। এঁদের হাতিশালে হাতি ছিল না, কিন্তু ঘোড়াশালে ঘোড়া ছিল। মেজ রাজকুমারের বডিগার্ড জি সাহেব টগবগিয়ে ঘোড়া ছোটাতেন, জাঁকজমক ছিল। পালা-পার্বণে আশাসোঁটা নিয়ে লোকলস্কর বের হতো। ল্যান্ড, ফিটন, মোটরগাড়ি—তাও ছিল। এ রাজ্যে তিনটে রাজপ্রাসাদ ছিল—ফুলবাগ, লালবাগ, রঙ্গীবসান। মেজ রাজকুমার থাকতেন রঙ্গীবসানে। ফরাসি শিল্পীর কল্পনায় গড়ে ওঠা এ প্রাসাদের চওড়া সিঁড়ির দু-ধারে পাথুরে সিংহ। সেই সিংহের পিঠে চেপে আমরা যখন-তখন আফ্রিকার জঙ্গলে শিকার করতেম।"[১০]

এই রাজার দেশেই একদিন শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে এসেছিলেন সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় ও জলধর সেন। দুজনেই অবিভক্ত বাংলার নদিয়া জেলার মানুষ, এসেছিলেন রাজ 'হাইস্কুল'-এ শিক্ষকতা করতে। দীনেন্দ্রকুমার এসেছিলেন আগেই। জলধর সেনের কথায়—"বাঙ্গালা দেশে আসিয়া আমি যখন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মহিষাদলের রাজার বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইয়া যাই, সেই সময় আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় সেখানে ছিলেন। তিনিই আমাকে মহিষাদলে যাইতে বাধ্য করেন; চাকুরী করা তখন আমার অভিপ্রেতই ছিল না,.......।"[১০ক] দীনেন্দ্রকুমার এখান থেকেই ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পাশ করেছিলেন। দীনেন্দ্রকুমারের সেই 'স্মৃতিকথা'য় যাওয়ার আগে মহিষাদলের একটি পরিচিতিদান আবশ্যক।

তমলুক, জলামুঠা, মাজনামুঠা-সহ মহিষাদল পরগনা হিজলি ফৌজদারীর অন্তর্গত হয় ১৭২৮ খিস্টাব্দ নাগাদ।[১২] এরও ৪৫ বছর পর ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর সমগ্র বাংলাদেশকে যে পাঁচটি 'ডিভিশন'-এ ভাগ করা হয় 'Salt tract' তার অন্যতম। হিজলি, মহিষাদল এবং তমলুক ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এই মহল ছিল এক 'এজেন্ট'-এর অধীন।[১৩] ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে হান্টার মহিষাদলের যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ১২১টি গ্রাম, ৪টি 'এস্টেট'-সহ সেকালে মহিষাদলের আয়তন ছিল ৪৩,৫৯১ একর বা ৬৭.৯৯ স্ক্যয়ার মাইল।[১৪]

সপ্তদশ শতকে জনার্দন উপাধ্যায় নামক এক পশ্চিম দেশীয় সামবেদীয় ব্রাহ্মণ মহিষাদল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।[১৪.১] এর পর থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত একে একে দুর্যোধন, রামশরণ, রাজারাম, শুকলাল ও আনন্দলাল উপাধ্যায় মহিষাদলে রাজত্ব করেন। এই আনন্দলালেরই স্ত্রী রানী জানকীর সময়ে দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয় এবং মছলন্দপুরে একটি থানা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৫]

রানী জানকী মহিষাদলে আজও এক কিংবদন্তি। তাঁর সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয় গোপালজিউর নবরত্ন মন্দির (১১৮৫ বঙ্গাব্দ) ও রামজিউ মন্দির (১১৯৫ বঙ্গাব্দ)। ধর্মকার্যে রানী বিস্তর অর্থ ব্যয় করেন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা সন ১২৮২) ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত লিখেছিলেন, 'আনন্দলালের ধর্মপরায়ণা সহধর্মিণী রানী জানকী রাজত্ব গ্রহণ করিয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ভূ-সম্পত্তি ও বৃত্তি প্রদান করিয়া সংস্কৃত বিদ্যালোচনার পক্ষে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি দেবতা ও মন্দিরাদি এবং অতিথিশালা এ পর্যন্তও তাঁহার ধর্মনিষ্ঠার প্রচুর পরিচয় প্রদান করিতেছে...... ইহার রাজত্বকালে কোম্পানী বাহাদুরের দশশালা বন্দোবস্ত হয় এবং সেই বন্দোবস্তকালীন তাঁহার নামের সহিত রাণী উপাধি সংযুক্ত ছিল। শুনিতে পাই, তমলুকস্থ সল্ট এজেন্ট মেঃ উইলিয়মডেন্ট সাহেবের প্রেরিত গভর্ণমেন্ট রিপোর্টে তাহার প্রমাণ আছে।[১৬]

অষ্টাদশ শতকে রাঢ় বাংলার গ্রামদেশে বর্গী হাঙ্গামার কথা সকলেরই জানা। মহিষাদলও এই উৎপাতের হাত থেকে রেহাই পায়নি বলেই মনে হয়। শ্রুতিপরম্পরায় প্রচলিত গীতি কাব্যেই এ ধরনের একটি ইঙ্গিত রয়েছে—

> 'মার হাট্টায় কাট্যা কুট্যা লুট্যা পুট্যা খায়।
> মায়ের মত রাণী জানকী বাঁচায় সেই দায়।[১৭]

রানী জানকীর রাজত্বকালে বর্গী হাঙ্গামার সেই ভয়ঙ্কর রূপ তার পূর্বচরিত্র হারালেও মনে হয় গীতি চরয়িতা একথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, বর্গী হাঙ্গামার হাত থেকে বা তার কু-প্রভাব থেকে রানী মহিষাদলকে রক্ষা করেছিলেন। বিনয় ঘোষ লিখেছেন, বর্গীর হাঙ্গামার সময় আনন্দলাল উপাধ্যায় একদল পোর্তুগিজ গোলন্দাজ সৈনিক নিযুক্ত করেন, তাদের নিষ্কর জমি ও গ্রাম দান করেন। 'এখনও সেই গ্রামে বংশধররা বাস করছেন'[১৮] ১৯১১ খিস্টাব্দে ও'ম্যালি মছলন্দপুর অঞ্চলের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন—'In this neighbourhood there is a curious colony of christians numbering a little more than two hundred. They claim to be descendants of some portuguese gunners imported by the Raja of Mahishadal to protect him against the raids of the Marathas ; but beyond the fact that they are christians and some of them have portuguese names, they are not distinguishable from the other inhabitants.'[১৯] আজও মহিষাদলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গেঁওখালির নিকটে মীরপুর গ্রামটি 'পোর্তুগিজ গ্রাম' নামে পরিচিত, সেখানে গির্জা এবং খ্রিস্টান কবরখানাও রয়েছে। ও'ম্যালি কি তাহলে এটির কথাই বলেছিলেন ? ইতিহাস বলে খ্রিস্টান মিশনারিরাও গেঁওখালিতে আসতেন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে হাওড়া ব্যাপটিস্ট মিশনারির একজন ধর্মযাজক উইলিয়াম কেরি ধর্মপ্রচারে এসে গেঁওখালিকে 'টাউন' বলেই উল্লেখ করেছেন। **'A Missionary Tour in the Hughli and Howrah District'** গ্রন্থে তিনি লিখছেন : '.....The town is a closely packed assemblage of native
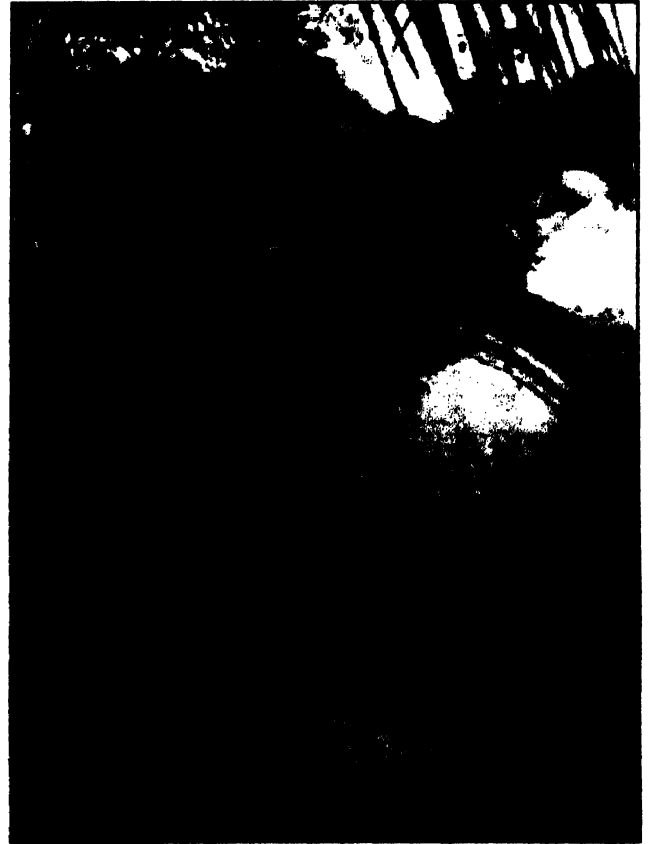
রামজীউর মন্দির রামবাগ, মহিষাদল

গেঁওখালির গীর্জা সৌজন্যে : কল্পনা সেনগুপ্ত

huts.......The streets, which are narrow and dirty, wind about the edges of malarious tanks : along the side of a disused canal. The whole place densely crowded, has a bad unhealthy smell.....'[১৯.১]

যাই হোক, ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে জানকীর মৃত্যুর পর তাঁর পোষ্যপুত্র মতিলাল সিংহাসনে বসেন এবং তাঁর সময়েই এই রাজসিংহাসনকে কেন্দ্র করে এক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যার বিষয়বস্তু নিয়ে যে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা পাওয়া যায় তা পরস্পর-বিরোধী। ১৮৫২-য় জেলা কালেক্টর H. Bayley **'Memoranda of Midnapore'**-এ যে তথ্য প্রদান করেন তার সঙ্গে ১৯১১-য় জেলা কালেক্টরের বক্তব্যের সাদৃশ্য নেই।[২০] মতিলাল অবশ্য নিজের অধিকার রক্ষার্থে সরকারের কাছে আবেদনও করেছিলেন।[২১] মতিলাল অন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিজেই পরমাত্মীয় গুরুপ্রসাদ গর্গকে ধনসম্পত্তি, রাজ্য ও রাজপ্রাসাদ 'হেবা' করে দেন। পরে গুরুপ্রসাদের মৃত্যু হলে মতিলাল আবার রাজ্যভার গ্রহণ করে রাজকার্যে সংলিপ্ত হলেই সমস্যার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্যই রানী মন্থরাই জয়ী হন বলে ভগবতীচরণ লিখেছেন এবং গর্গ পরিবারই এর পর থেকে মহিষাদলের রাজসিংহাসনকে দখলে রাখেন।[২২]

রাজার মৃত্যু বা পুত্রসন্তানের অভাববশত মহিষাদলে একাধিকবার রাজকার্যে রানীদের এগিয়ে আসতে দেখা গিয়েছিল। রানী জানকী ছাড়াও রানী মন্থরা বা রানী ইন্দ্রাণীর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইন্দ্রাণী শাসন করেন নাবালক পুত্রের অভিভাবক বা 'রাজমাতা'রূপে। রানী ইন্দ্রাণী ১৮২২ থেকে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।[২৩] তিনিও রানী জানকীর মতোই ধর্মকার্যে প্রচুর ব্যয় করতেন। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুলাই তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—'শ্রীমতী মহিষাদলের রানী ও শ্রীযুক্ত বাবু গুরুপ্রসাদ বসু শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া প্রত্যেকে পাঁচশত করিয়া এক সহস্র দীন দরিদ্রেরদিগের কারণ কর দিয়া তাহারদিগকে দর্শন করাইয়াছেন।'[২৪]

ইন্দ্রাণী তনয় রামনাথ সাবালক হয়ে রাজপদ লাভ করেন। সতীদাহ তখন নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী রিমলা ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে হুগলির মাহেশে সহমরণে গিয়ে সতী হন।[২৫] Bayley অবশ্য বলেছেন ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে আগরপাড়ায় এই সতীদাহর ঘটনা ঘটেছিল।[২৬]

পরবর্তী রাজা লছমনপ্রসাদের রাজত্বকালও সমস্যাপীড়িত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর বহু জনকল্যাণমূলক কাজের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত লিখেছেন 'লছমনপ্রসাদ গর্গের সময় জমিদারির সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পূর্বে ইনি একটি বহুব্যয়-নির্মিত বিস্তীর্ণ সেতু এবং একখানি প্রকাণ্ড রথ প্রস্তুত করিয়া বহু ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। পুলটী রাজবাটীর সম্মুখস্থ শোভার প্রধান কারণ এবং রথখানি এরূপ বৃহৎ যে সচরাচর তাহার সমতুল্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এক্ষণে ইনি নিজ ব্যয়ে একটি মধ্যম শ্রেণীর ইংরাজি বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেশে বিদ্যাচর্চার অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। তাহার সমুদয় ভার নিজেই বহন করিয়া থাকেন এবং বালকদিগকেও কোনরূপ বেতন প্রদান করিতে হয় না।...... ভাটপাড়ার বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্নকে ৫ বিসি (১০০ টাকা মূল্যের) ধান্যের বৃত্তি বিধান করিয়া দিয়াছেন।.....নিজ ব্যয়ে একটি ইংরেজি ডিস্পেন্সারি ও হসপিটাল এবং একটি দেশীয় চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া দুঃস্থ প্রজাগণের জীবন সম্বন্ধেও মহান উপকার সাধন করিতেছেন। ডিস্পেন্সারিতে একজন উপযুক্ত সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন চিকিৎসার কাজ করিতেছেন।'[২৭]

১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে তমলুকে যে ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় সেখানে ইনি মাসিক ১০ টাকা হিসাবে চাঁদা দিতেন। সেখানকার চিকিৎসালয়েও তিনি মাসিক ৫ টাকা সাহায্য দিতেন। এছাড়া কাঁথির ইংরাজি বিদ্যালয়ে মাসিক ২০ টাকা, পাঁশকুড়ার ইংরাজি বিদ্যালয়ে মাসিক ৮ টাকা ও গেঁওখালির বঙ্গ বিদ্যালয়ে মাসিক ৬ টাকা করে তিনি সাহায্য দিতেন। ১২৮১ সালে যে ছাত্রটি তাঁর বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিল তাকেও মাসিক ২ টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হত। লছমনপ্রসাদ মেদিনীপুরে উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যও এককালীন ৫০০০ টাকা ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য 'মেদিনীপুর রিলিফ কমিটি'-তে

নতুন রাজবাড়ি, মহিষাদল

১০০০ টাকা ও তমলুকে ১০০ টাকা দিয়েছিলেন। এছাড়া তাঁর অনেক 'গোপনীয় দান'ও ছিল। তিনি একটি সংস্কৃত চতুস্পাঠীও স্থাপন করেছেন।[২৮] ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে মহিষাদলে একটি টোলের উল্লেখ করেছেন কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। মাধবচন্দ্র সার্বভৌমর স্মৃতি শাস্ত্র এখানে পড়ানো হত। তারাচাঁদ তর্কসিদ্ধান্ত এখানে পড়াতেন।[২৯] সম্ভবত লছমনপ্রসাদের সময়েই মহেশচন্দ্রর পিতা মহিষাদল রাজপরিবার থেকে ১০০ বিঘা নিষ্কর জমি লাভ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন—'About fifty years ago my father now deceased received from the then head of the Mahishadal Raj Family a grant of 100 bighas of rent-free land and this land has came down to his heirs.'[৩০]

১২৮৫ বঙ্গাব্দে লছমনপ্রসাদ মারা গেলে মহিষাদল কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হয়। নীলমণি মণ্ডল ও শূদ্র নারায়ণ প্রধান একশত টাকা বেতনে সহকারী 'ম্যানেজার' নিযুক্ত হন। এফ এইচ ম্যাকলীন 'ওভারসিয়ার' নিয়োজিত হন। ঈশ্বরীপ্রসাদ ও জ্যোতিপ্রসাদকে কলকাতায় পাঠানো হয়। ছোট পুত্র রামপ্রসাদকে পাঠানো হয় মেদিনীপুরে রাধানাথ রায়ের তত্ত্বাবধানে। ঈশ্বরীর তখন পনের বছর বয়স, প্রথমা স্ত্রীর বয়স আট, দ্বিতীয়া স্ত্রীর সাত। প্রথমজনকে পাকুড়ে তাঁর পিত্রালয়ে গোপীলাল পাঁড়ের কাছে পাঠানো হয়। দ্বিতীয়জন অবশ্য লছমনপ্রসাদের স্ত্রীর কাছেই রইলেন।[৩০.১]

১৮৯২ থেকে ৫০ বছর আগে হলে তা ১৮৪২ হয়, আর ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে লছমনপ্রসাদই রাজা ছিলেন। মহেশচন্দ্র ও তাঁর দাদা মাধব সার্বভৌমর কথা অবশ্য দীনেন্দ্রকুমারও উল্লেখ করেছেন।

লছমনপ্রসাদের মধ্যম পুত্র জ্যোতিপ্রসাদও পিতৃদেবের পথ অনুসরণ করেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে চার্লস ইলিয়ট সস্ত্রীক তমলুকে এলে তার স্মারক হিসাবে তিনি গেঁওখালিতে 'ইলিয়ট ডিস্পেন্সারি' প্রতিষ্ঠা করেন এবং মেদিনীপুর হাসপাতালে একটি 'অপারেশন থিয়েটার' তৈরির জন্য ৫০০০ টাকা দেন।[৩১]

লছমনপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরীপ্রসাদ। তাঁর সময় রাজার মধ্য ইংরাজি স্কুল অবৈতনিক 'হায়ার ক্লাস স্কুল'-এ পরিণত হয়।[৩২] ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে রাজপরিবার প্রদত্ত ৫০০০ টাকার একটি অনুদানের সাহায্যে এই মহিষাদলেই জেলার একমাত্র শিল্প বিদ্যালয়টি চালু হয়।[৩৩] ঈশ্বরীপ্রসাদের দুই পুত্র সন্তান—সতীপ্রসাদ ও গোপালপ্রসাদ। দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন, এঁরা দুজন রাজপরিবারের অলঙ্কার ছিলেন।[৩৪] স্বাধীনতা সংগ্রামের জীবিত কিংবদন্তি ডঃ সুশীল ধাড়ার লেখায়

আমরা সতীপ্রসাদের বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় পেয়েছি। তিনি লিখছেন—"হা! কুত্র রাজা সতীপ্রসাদ'; পণ্ডিতপ্রবর 'অষ্টতীর্থ' প্রয়াত চিন্তামণি ঘোড়ই মশায় এই বিলাপ দিয়ে তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছিলেন রাজাবাহাদুরের প্রয়াণের পরেই, মহিষাদল রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে আয়োজিত শোকসভার জন্য।...... এই বিলাপ 'হায় রাজা সতীপ্রসাদ, তুমি এখন কোথায়'—অংশটি তমলুক মহকুমার পথে মাঠে অনুরণিত হতে শুনেছি।......'[৩৪] আনুমানিক ১৯২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান বলে ডঃ ধাড়া লিখেছেন। যাই হোক, নিশ্চিতভাবে এই পারিবারিক ঐতিহ্যই সতীপ্রসাদ তনয় কুমার দেবপ্রসাদ গর্গকে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'মহিষাদল পরগনা'য় প্রথম মহাবিদ্যালয়টি স্থাপনের অনুপ্রেরণা দান করেছিল। এ সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নথি থেকে পাওয়া তথ্যটি এইরকম—'To obviate the difficulties of the students of the Tamluk Sub-division, the proprietors of the Mahishadal Raj Estate decided to open a college in this Sub-division. Affiliated up to the I. A. standard of the Calcutta University was granted in 1945. The college was at first started in the Mahishadal Raj High English School. The building cost Rs. 1,40,000 which was borne by the Mahishadal Raj Estate. The Estate also made a donation of Rs. 25,000/- when the college was first started. The college was opened by K. N. Katju, Governor of West Bengal on January 3, 1949. It was granted extension of affiliation in commercial subjects up to I. A. standard to the B. A. standard in 1948. With effect from June 1956 the Government of West Bengal has taken over the college as a Government sponsored one. It has well equipped library and has its extra curricular activities and also a number of stipends and scholarships.'

[*Hundred years of the University of Calcutta, Supplement*, University of Calcutta, Kolkata, 1957, পৃ. ৯১]

বিদেশি ক্ষত্রিয় যোদ্ধা ও ব্যবসায়ী হিসাবে এসে ছলে-বলে-কৌশলে রাজারা এখানে অধিষ্ঠিত হন। আগে এখানে মাহিষ্য ও স্থানীয় অধিবাসীরা কর্তৃত্ব করতেন। তাই এদের শ্রদ্ধাভক্তি বা সমর্থনলাভের জন্য দান-খয়রাত, পুরোহিত পোষকতা, দেবদেবী বৃত্তি, দেবালয়—সবই তাদের করতে হয় বলে বিনয় ঘোষ লিখেছেন। মর্যাদারক্ষার জন্য এ ধরনের কাজ সকলকেই প্রায় করতে হয়।[৩৬] বিশ্বময় পতি ও মার্ক হ্যারিসন লিখছেন—'Zamindars, merchants and other local notables contributed generously—along with Europeans—to the cost of dispensaries in their area,......'[৩৭] আসলে আগেকার স্থানীয় সমাজের নেতাদের চেয়ে নিজেদের 'চ্যাম্পিয়ন' হিসাবে প্রমাণ করার দরকার ছিল। না হলে স্বীকৃতি, বৈধতা অর্জনের ক্ষেত্রে বোধহয় কোনও সমস্যা ছিল। যাই হোক, গর্গরা সেটি পেরেছিলেন এবং বেশিরকমভাবেই পেরেছিলেন, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

দেওয়ান বাড়ি, মহিষাদল

সম্ভবত ঈশ্বরীপ্রসাদের রাজত্বকালের একেবারে শেষেই দীনেন্দ্রকুমার রায় ছাত্র হিসাবে মহিষাদলে আসেন। দীনেন্দ্রকুমারের কাকা 'মহিষাদল রাজ এস্টেট'-এর প্রধান 'ম্যানেজার' ছিলেন। সম্ভবত তিনিই যদুনাথ রায়। কারণ দীনেন্দ্রকুমারের লেখায় যে নামগুলি আমরা একাধিকবার পেয়েছি, 'এস্টেট'-এর 'সাব-ম্যানেজার' (sub-Manager)

নীলমণি মণ্ডল তাঁদের অন্যতম। আগেই উল্লেখ করেছি ১২৮৫ বঙ্গাব্দে মহিষাদল 'এস্টেট' 'কোর্ট অব ওয়ার্ড'-এর অধীন হলে নীলমণিবাবু সহকারী 'ম্যানেজার' পদে উন্নীত হন। ১২৯২ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে কালিদাস সিংহ অবসরগ্রহণ করলে উমেশচন্দ্র মিত্র 'ম্যানেজার' পদে নিযুক্ত হন। যদুনাথ রায়কে 'পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট' পদে উন্নীত করা হয়।[৩৮] দীনেন্দ্রকুমার লিখেছিলেন নীলমণিবাবুকে উলঙ্ঘন করে তাঁর কাকাকে 'ম্যানেজার' নিযুক্ত করা হয়েছিল।[৩৯] সুতরাং এই যদুনাথবাবুই দীনেন্দ্রকুমারের কাকা ছিলেন একথা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। প্রসঙ্গত বলে রাখা যেতে পারে, কর্মসূত্রে যাঁরা এই মহিষাদল রাজ 'এস্টেট'-এ এসেছেন তাঁরা অনেকেই ছিলেন উন্নত রুচিবোধসম্পন্ন, সাহিত্যচর্চা, সুর সাধনা—সবই তাঁদের মধ্যে পরিলক্ষিত হত। যেমন ইংরেজ আমলের একেবারে শেষে ক্ষিতীশচন্দ্র আইচের কথাই বলা যেতে পারে ; ইনি ছিলেন মার্জিত রুচিবোধসম্পন্ন, রবীন্দ্রপ্রেমী এক মানুষ।[৪০] এই ক্ষিতীশবাবুই History and Account of the Mahishadal Raj Estate গ্রন্থটি লিখেছিলেন ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ।

রাজপরিবারের অবক্ষয়ের দিনগুলি দীনেন্দ্রকুমার প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এই দৃশ্য তাঁকে পীড়িত করেছে, চিন্তাক্লিষ্ট করেছে। কিন্তু এটিই তখন স্বাভাবিক ঘটনা, সমস্ত দেশীয় শক্তি, আঞ্চলিক শক্তিই তখন অবক্ষয়ের পথে। কলকাতার 'বানিয়া', 'ফড়ে'রা টাকা ধার দিয়ে সঙ্কটকালে এদের জমিদারি, প্রভাব-প্রতিপত্তি ধরে রাখার উদ্যোগকে (যা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হত) মদত দিত, পরে ধার শোধ না করতে পারলে তাদের সর্বস্বান্ত করত। শহর কলকাতার নব্যধনীরা এভাবেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর সময় থেকে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হয়। হয় এরা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করত, না হলে ব্যবসার টাকায় ইংরেজ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ক্রয় করত। মেদিনীপুরের দুর্গাপুরে রামদুলাল দে-র সম্পত্তি ছিল।[৪১] বাগবাজারের গোকুল মিত্রের কাছে পারিবারিক দেবতা মদনমোহনকে পর্যন্ত বন্ধক রাখতে হয়েছিল বিষ্ণুপুর রাজাদের, আর পুত্রের শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য কোম্পানির কাছে হাত পাততে হয় রানীকে।[৪২] ইতিহাসের কি নির্মম পরিণতি !

মহিষাদলও বাদ যায়নি। স্বেচ্ছাচারী মন্ত্রী দেওয়ান রামনারায়ণের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমার জন্য লছমনপ্রসাদ কলুটোলা নিবাসী মতিলাল শীলের পরিবারের কাছে জমিদারি 'প্রতিভূস্বরূপ' রেখে 'উইলপত্র' দ্বারা ঋণ গ্রহণ করেন। ১২৬১ সালে মতিলাল তনয় হীরালাল সেই ঋণপত্রের বলে আদালতের সাহায্যে রাজবাড়ি ক্রোক করাতে সমর্থ হন।[৪৩] কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে যে ব্যাপক তোলপাড় হয় সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় তার প্রমাণ রয়েছে।

১২৬১ বঙ্গাব্দের ১১ ভাদ্র (ইং আগস্ট, ১৮৫৮) তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—'মহিষাদলের রাজা কলুটোলা নিবাসী প্রয়াত মতিলাল শীলের স্ত্রী আনন্দময়ী দাসীর

●

সমস্ত দেশীয় শক্তি, আঞ্চলিক শক্তিই তখন অবক্ষয়ের পথে। কলকাতার 'বানিয়া', 'ফড়ে'রা টাকা ধার দিয়ে সঙ্কটকালে এদের জমিদারি, প্রভাব-প্রতিপত্তি ধরে রাখার উদ্যোগকে (যা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হত) মদত দিত, পরে ধার শোধ না করতে পারলে তাদের সর্বস্বান্ত করত। শহর কলকাতার নব্যধনীরা এভাবেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর সময় থেকে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হয়

●

নিকট ১ লক্ষ টাকা কর্জ নেন। শীল মহাশয়রা রাজার বিষয়াদির তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত হইয়া রাজাকে সর্বস্বান্ত করেন।...... ম্যাজিস্ট্রেটের সহায়তায় শীলবাবুরা রাজপুরীতে প্রবেশলাভ করিতে পারেন।'[৪৪] একই দিনে ওই পত্রিকার সম্পাদকীয়তে আরও লেখা হয়েছে—'রানী শিবিকারোহণে কান্দিতে কান্দিতে পূর্বতন দেওয়ান রামনারায়ণ গিরির উদ্যানে গমন করিলে সরিফ পদাতিকদিগের লুট আরম্ভ হইল, রাজনিকেতন হইতে কোন্ ব্যক্তি কি দ্রব্য লইল তাহার নিরূপণ নাই—হে পাঠকবর্গ, এই সুপ্রীম কোর্টের বিচার !........রানীর কাতরোক্তিতে পাষাণ পর্যন্ত বিদীর্ণ হইয়াছিল। আমরা অবগত হইলাম শীলরা এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজকে মহিষাদলাধিপতির সকল জমিদারী ইজারা দিয়াছেন, তিনিই প্রজাদের শাসনপূর্বক খাজনা আদায় করিবেন।......লক্ষ্মণপ্রসাদ ও তাঁর পরিবারের আর কিছুই থাকিল না, দেবোত্তরের প্রতি নির্ভরপূর্বক অতি কষ্টে কাল যাপন করিতে হইবেক।' কি অশুভক্ষণে টাকা ধার নিয়ে মতিলালকে তিনি মুরব্বি ধরেছিলেন সে ব্যাপারেও দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে।[৪৫] ২৫ ভাদ্র তারিখে একই পত্রিকার সম্পাদকীয়তে অবশ্য স্বস্তি প্রকাশ করে লেখা হয়েছিল—লক্ষ্মণপ্রসাদের ২,০০,০০০ টাকার অধিক আয় আছে, তিনি নিয়মিতভাবে 'ব্যয় নির্বাহপূর্বক' ঋণ পরিশোধ করলে দু বছরের মধ্যে ঋণমুক্ত হতে পারবেন। 'মহিষাদলের রাজ পরিবার হতমান হয়েন কোন ব্যক্তিরই এমত প্রার্থনা নহে।'[৪৬]

এ ঘটনা নতুন নয়। বাংলার জমিদারিগুলির অবক্ষয়ের মূল কারণ অনুসন্ধান করতে হবে অনেক গভীরে। আসলে 'জমি'র বাইরে বেশি দূর এরা ভাবতে পারতেন না। তনিকা সরকার লিখছেন—'Landholders themselves were often not interested in exploring profit making ventures'[৪৭] আসলে তাই। চিত্ত পাণ্ডা মহিষাদল রাজ 'এস্টেট'-এর 'কোর্ট অব ওয়ার্ড' নথিপত্র ঘেঁটে দেখিয়েছেন যে, তাদের বাজেটে যে ১৫ শতাংশ উদ্বৃত্ত থাকত তা দিয়ে তারা

ব্যবসা, উৎপাদন বা টাকা ধার দেবার ব্যবসায় বিনিয়োগ করার পরিবর্তে ছোটখাটো এবং ক্ষুয়িষ্ণু জমিদারিগুলি কিনতে বা 'Govt. security' কিনতেই বেশি আগ্রহী ছিল।[৪৯] ১৮৮১-৮২-তে যার সুদ বাবদ রাজাদের আয় ছিল ১৫,৭২৪ টাকা।[৪৯.১] মহিষাদল জমিদারির যে ৩ আনা মন্ত্রী রামকুমার বর্ম একদা দখল করেছিলেন লছমনপ্রসাদের সময় ওই অংশ ও 'তাহার মফস্বল বাকী' তাঁর (রামকুমার) পুত্রবধূর কাছ থেকে এক লক্ষ মুদ্রায় ক্রয় করা হয়েছিল। আবার একই সময়ে জনৈক ঋণী জয়নারায়ণ গিরির উপর 'ডিক্রি' জারি করে তার দু আনা আট পাই জমিদারি, দোর ও নাড়ুয়ামুঠা কেনা হয়। তমলুক পরগনার অর্ধাংশের জমিদার প্রাণনাথ চৌধুরীর কাছে পাঁচ আনা অংশ জমিদারি ক্রয় করে ক্রমে ক্রমে মহিষাদল 'এস্টেট'-এর 'আয় বর্ধিত' করা হয়।[৫০]

রাজ্যপাট আজ আর নেই। রাজা-রানী আছেন, তবে এখন নেহাতই গুরুত্বহীন। ডঃ কনিকা গুহ ১৯৩৯-৪০ খ্রিস্টাব্দে হাতিশালে হাতি খুঁজে পাননি। তবে ঘোড়া ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। থাকবে কি করে ? হাতি তো সাকুল্যে ছিল ২টি, ১৮৭৯-র আগেই তার একটি মারা যায়। আর ঘোড়া ছিল ১৯টি, ১৮৭৯-র সরকারি নথিপত্র অনুযায়ী এর ৮টিই নাকি হয়ে পড়েছিল অক্ষম। বাকি ১১টি ছিল রাজকুমার আর আধিকারিকদের জন্য নির্দিষ্ট। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে থাকা রাজাদের ঘর-বাড়িও আগে থেকেই ধ্বংসের পথে এগোতে শুরু করেছিল। স্রেফ অবহেলায় রথগোড়া বাজারে রাজাদের 'Pleasure-House'টি প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। নাচঘর আর এই সব প্রাসাদ মেরামতিতে মাঝে মধ্যে অর্থব্যয় অবশ্য হয়নি এমন নয়, তবে সামান্যই।[৫০.১]

তবে মহিষাদলের জনমানসে রাজাদের ভাবমূর্তি আজও উজ্জ্বল। এর কারণ তাঁদের জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম। রাজাদের ভক্তি পরিণত হয় এক কিংবদন্তিতে।[৫১] সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দেও 'দেবালয়' বাবদ রাজাদের অনুদান ছিল ৭,০০০ টাকা, পুণ্যাহ, পূজা ও অন্যান্য উৎসবে ৭,০০০ টাকা এবং ব্রাহ্মণের বৃত্তি বাবদ ৩৩৭ টাকা।[৫১.১] শুধু মহিষাদল নয়, রাজারা দান করতেন বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রেও। ভুবনেশ্বর লিঙ্গরাজ মন্দিরের রাজপাণ্ডা গোপালচন্দ্র মহাপাত্রর কাছে মহিষাদল রাজাদের দেওয়া বেশ কিছু দানপত্র প্রত্যক্ষ করেছি।

অন্যদিকে শুধু হাসপাতাল বা বিদ্যালয় স্থাপন নয়, সেচের খাল বা নালা-নিকাশি, পয়ঃপ্রণালীগুলিকে পরিষ্কার রাখতে বা তাদের নাব্যতা বজায় রাখতেও রাজারা অর্থব্যয় করতেন। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সরকারি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল—'In Tumlook subdivision........the Zaminders in Tumlook and Mahishadal cleared the silt from a good number of drainage and irrigation khals.'[৫২] একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। ওই ১৮৮২-তেই দীঘি বা জলাধারগুলি পরিষ্কার করার জন্য ৭২ টাকা, খাল ও বাঁধ বাবদ ২,৯৩৯ টাকা, মহিষাদলের রাস্তাঘাট নির্মাণ বা মেরামতি বাবদ ৯৯৯ টাকা, গেঁওখালি বাজার সংস্কারে ৫৬৪ টাকা রাজপরিবারের পক্ষ থেকে ব্যয় ধার্য করা হয়েছিল। টোল, বিদ্যালয় ও ডিস্পেন্সারিতে ১৮৭৯-তে রাজপরিবারের অনুদান ছিল ৫,৪৪৭ টাকা। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে তা কিছুটা বেড়ে দাঁড়াল ৭,৭০১ টাকা। এতে অবশ্য প্রজাদের চেয়েও বেশি খুশি হয়েছিল ইংরেজরা, কারণ তাদের তো Policy-টাই ছিল 'দেশীয় রাজা-মহারাজা'দের ব্যয়ে 'Public Work' করা। নিজেদের দায়িত্বও তাহলে কিছু কমে।[৫২.১]

বিদেশি শাসকদের প্রতি এঁদের যে আনুগত্য তা সে যুগের প্রায় সব রাজা-মহারাজারই অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু বিপ্লবী সন্ন্যাসী স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর প্রতি রাজা সতীপ্রসাদের
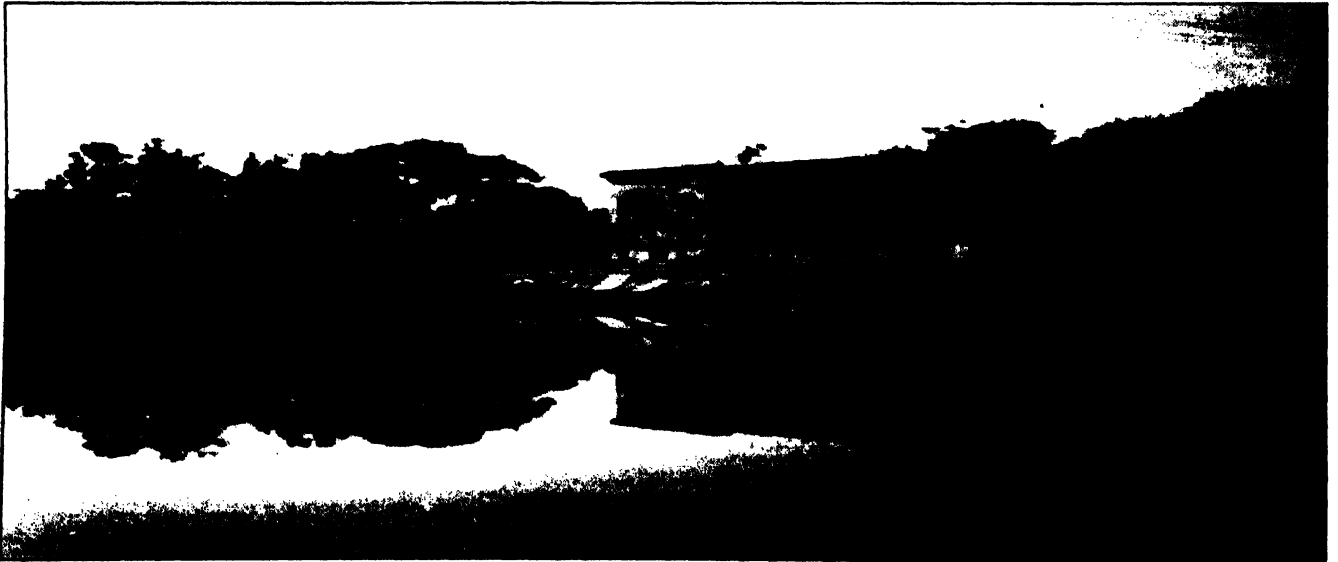
দেওয়ান বাড়ি, মহিষাদল

আনুকূল্য ডঃ সুশীল ধাড়ার কাছে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি লিখেছেন—'বিদেশী শাসককুলের প্রতি এঁদের আনুগত্য যথা নিয়মে ছিল ঠিকই কিন্তু ইংরেজ শাসনের মধ্যলগ্নে বিপ্লবী সন্ন্যাসীটির প্রতি এই আনুকূল্য নিশ্চয় স্মরণযোগ্য।'[৫৩] তবে এর ব্যাখ্যা কেউ এমনও করতে পারেন যে, ইংরেজ শাসনের অন্তিমকাল আসন্ন, জাতীয় আন্দোলনও একটু একটু করে সাফল্য লাভ করছে—এই সব ভেবে রাজারা তখন সেই 'transition period'-এ ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে মদত দেন ; এও হয়তো জনমানসে ভাবমূর্তি বজায় রাখবার একটি মাধ্যম বা 'tool' হতে পারে।

রাজার আমলে প্রজারা কেমন ছিলেন ? কেমন ছিল দুপক্ষের সম্পর্ক ? জনমানসে রাজাদের ভাবমূর্তিই বা কেমন ছিল ? মনে হয় প্রজাদের উপর অত্যাচার করে খাজনা বৃদ্ধির ঘটনা ঘটেনি, একমাত্র ব্যতিক্রম দুর্যোধন উপাধ্যায়—

দুর্য্যোধনের কপট পাশায় গেল ভুই ভাড়া।
খাজানা দায়ে প্রজা লোক হ'ল দেশ ছাড়া।[৫৪]

এই ছড়াটিতেই বোঝা যাচ্ছে দুর্যোধন ছিলেন সার্থকনামা। ছড়ার আর কোনও জায়গায় প্রজাশোষণের কথা আসেনি। বরঞ্চ কোনও কোনও রাজাকে তো রামায়ণের রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনাও করা হয়েছে—

রামের মত প্রজা পালে রাজা রাজারাম।
সুখের হাসি প্রজার মুখে ফুটে অবিরাম।[৫৫]

সরকারি প্রতিবেদন বলছে 'মাহিষ্য' সম্প্রদায়ের যৌথ প্রতিরোধই খাজনা বাড়ানোর প্রয়াসকে রুখে দিয়েছিল।— 'They have developed a decided capasity for combined action, the latest instance of which is the combination among the tenants of Mahishadal Raj to oppose the latter's attempt to get enhancement of rent.....'[৫৫.১]

পরবর্তীকালে অবশ্য প্রজাকল্যাণের এই ঐতিহ্য অটুট ছিল কিনা সে ব্যাপারে প্রশ্ন রয়েই যায়, কারণ ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ৫ আগস্ট তারিখের 'মেদিনীবান্ধব' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে, অজন্মাহেতু মহিষাদলের অবস্থা সঙ্কটজনক এবং মানুষ প্রায় না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। একথা ঠিক যে, রাজাদের 'সেই' দিন তখন আর ছিল না। তবু কোনওরকম সাহায্যও তাঁরা করেছিলেন কিনা তা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণার অবকাশ রয়েছে।[৫৫.ক] বিনয় ঘোষ লিখেছেন রাজা ভবানীপ্রসাদ গর্গের সময় শাস্তি হিসাবে অনেক সময় প্রজাদের ভবানীতলায় নিয়ে গিয়ে নরবলি দেওয়া হত—'ভবানীতলা মে লে যাও'।[৫৫.২] এই ঘটনায় অতিরঞ্জন থাকলেও ভবানীপ্রসাদের যে সুনাম ছিল না সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই, আর তার কারণও ছিল।

১৯৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় ২৯ সেপ্টেম্বর বিপ্লবী জনতা মহিষাদল থানা দখলে উদ্যত হলে এই ভবানীপ্রসাদ তাঁর দেহরক্ষী জ্বি সাহেব ও রাজবাড়ির অন্যান্য

মহিষাদলের রথ, সৌজন্যে : মহিষাদল রাজকলেজ সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা

'ফোর্স' রাইফেল ও বুলেট নিয়ে এসে পুলিশকে সাহায্য করেন বলে যদুপতি মাইতি লিখেছেন।[৫৫.৩] তিনি অবশ্য বলেছেন রাজাবাহাদুর ও তাঁর ভাইয়েরা এই ঘটনায় যুক্ত ছিলেন। যাই হোক, তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের গোপন মুখপত্র 'বিপ্লবী'তেও কেবল ভবানীপ্রসাদের কথাই বলা হয়েছে—'মহিষাদল থানার বিভিন্ন দিক হইতে প্রায় পনেরো হাজার নরনারী শোভাযাত্রা সহকারে থানার দিকে অগ্রসর হয়। অহিংস জনতা থানার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে মহিষাদল রাজকুমার প্রদত্ত প্রহরীরা অহিংস জনতার উপর বেপরোয়াভাবে গুলি চালাইতে থাকে। এই সময় রাজকুমারের দেহরক্ষী ক্ষিপ্ত কুকুরের মতো দৌড়াদৌড়ি করিয়া চতুর্দিকে গুলি চালাইতে থাকে। ......রাজকুমার পুলিশকে সাহায্য না করিলে কোনো লোকই হতাহত হইত না। দুঃখী প্রজাদের অন্নে পুষ্ট, নিষ্ঠুর, শয়তান দেশদ্রোহী পশু নৃশংস রাজকুমারদের এই অত্যাচারের প্রতিশোধ তাহার নিজ প্রজাগণ লইবে না কি ? চিরদিন কি তাহারা জমিদারদের এইরূপ অত্যাচার চোখ বুজিয়া সহ্য করিবে ?'[৫৫.৪] এই ভবানীপ্রসাদ বা দুর্যোধনদের কথা পড়লে মনে হয়—

'কিছু ভালো কিছু খল,
দুয়ে মিলে মহিষাদল'

এ জাতীয় প্রবাদ বা ছড়ার সৃষ্টি সম্ভবত এদের কারণেই।[৫৫.খ]

জনরোষে আতঙ্কিত মহিষাদলাধিপতি একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে ক্ষমাভিক্ষা করলেও[৫৫.৫] জাতীয় সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি, বরঞ্চ তারা প্রজাদের খাজনা বন্ধ করার আবেদন জানায়।[৫৫.৬] ভবানীপ্রসাদকে খামখেয়ালি ও অত্যাচারীরূপে চিহ্নিত করে ডঃ সুশীল ধাড়া লিখেছেন এক

কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর, প্রতিষ্ঠাতা : মহিষাদল রাজ কলেজ
সৌজন্যে : মহিষাদল রাজ কলেজ সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা

ভাইয়ের জন্য সমগ্র রাজপরিবারের উপর দেশপ্রেমিক থানা, মহকুমা ও দেশবাসী ক্ষুব্ধ হল—দুদিন পরে ওদের ১৩টি কাছারিবাড়ি একবারেই পুড়িয়ে ছাই করে ছিল দেশবাসী, 'বিদ্যুৎবাহিনী'র নেতৃত্বে।[৫৫.৭] তবে সামগ্রিকভাবে রাজারা জনপ্রিয় ছিলেন বলেই মনে হয়। কলকাতার শীলরা যখন মহিষাদলের দখল নিতে যায়, তখন 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছিল—সুপ্রিম কোর্টের বিচারে জয়ী 'শীলবাবুরা মহিষাদল পরগনা অধিকার করিতে যাইলে প্রজারা দুর্গদ্বার রুদ্ধ করে।'[৫৬] শেষ অবধি অবশ্য শীলরা দখল নিতে সমর্থ হয়েছিল, সে কথা আলাদা।

তবে শেষ হয়নি মহিষাদলের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। দীনেন্দ্রকুমারের লেখায় যা বারবার এসেছে। দীনেন্দ্রকুমার চলে যাবার তিন বছর পর এই মহিষাদলেই ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হিন্দিভাষার বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী (নিরালা)। এঁদের আদি নিবাস উত্তরপ্রদেশের উন্নাও জেলার গাধাকলা গ্রাম। তাঁর পিতা পণ্ডিত রামসহায় ত্রিপাঠী ছিলেন রাজপরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।[৫৬.১] আবার প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার ঐতিহ্য থেকেও মহিষাদল বঞ্চিত নয়। সেই কবে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দেই এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'অস্পৃশ্যতা বর্জন ও বিধবা বিবাহ সঙ্গীত'-এর মতো পুস্তিকা। লেখক সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্র লিখেছেন—

> 'বিপত্নীক যদি বহু বিবাহেতে
> অসৎ অধর্মী নাহি হয় তাতে,
> তবে সতী বিধবা কোন্ বিচারেতে,
> বিবাহ করিলে অসতী হয় ?'[৫৬.২]

সে সব অন্য প্রসঙ্গ। আবার ফিরে যাই আগের কথায়। মহিষাদলের সবচেয়ে বড় উৎসব 'রথযাত্রা'। ১২৮৫ বঙ্গাব্দে রথের চাকার নীচে পড়ে সাতজন নিহত হলে রথের উচ্চতা হ্রাস করা হয়েছিল।[৫৭] রথকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্যও জমে উঠত। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে হান্টার মহিষাদলের রথকে চিহ্নিত করেছেন—'religious-trading festival' হিসাবে।[৫৮] ও'ম্যালীর গেজেটিয়ারেও একই বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।[৫৯] ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বেন্টলে-র 'Fairs and Festivals in Bengal'-এ দেখছি সাতদিনব্যাপী মহিষাদলে 'রথযাত্রা মেলা'য় ১০,০০০ লোকের সমাগম হত, আর রামবাগে যে রথটি চলত (এখনও চলে), সেটি একদিনের, ১৪০০ মানুষের সমাগম হত সেখানে।[৬০] এর কুড়ি বছর পর পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ'-এও রথযাত্রা উপলক্ষে লোকসমাগমের কথা বলা হয়েছে।[৬১] আসলে এই রথের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যও যুক্ত ছিল।

'হিজলী টাইডাল ক্যানাল' তৈরি হল ১৮৬৮—১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, রূপনারায়ণ ও হুগলির সঙ্গম থেকে হলদি নদীর মধ্যে বা বলা যেতে পারে গেঁওখালি থেকে ইটামগরা পর্যন্ত।[৬২] এ পথে ব্যবসা-বাণিজ্য রীতিমতো সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল, এই পথেই দীনেন্দ্রকুমার এসেছিলেন মহিষাদলে।[৬৩]

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে Sub-Deputy Collector ও Circle Officer হয়ে মহিষাদলে এসেছিলেন সুধন্যকুমার গুহ মহাশয়।[৬৪] তাঁর কন্যা ডঃ কণিকা বসুর 'রোমন্থন' রচনাটি ঔপনিবেশিক যুগের অন্তিম লগ্নে বাংলার একটি প্রাচীন জনপদের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদান। লেখাটির মূল্যায়নের ক্ষমতা আমার নেই, শুধু বলব, 'অসাধারণ' বা 'চমৎকার'—এই সবের কোনও বিশেষণই যথেষ্ট নয়। ডঃ কণিকা বসুর লেখায় রথের দিনগুলিতে যাত্রা, নাটক, পুতুলনাচের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক। এ ছাড়াও ঘুরেফিরে এসেছে গাজন, বাঁটঝাঁপ, সাপুড়ে আর 'কাগমারী' সম্প্রদায়ের কথা, এক অন্য মহিষাদলের কথা—যখন খালে গুণ টেনে যাত্রীসাধারণের নৌকা যেত, যে মহিষাদলে তখন কৃষি প্রদর্শনী হত, বা বড়ে গুলাম, ফৈয়াজ খাঁর গান হত, গোপালজির মন্দিরের চূড়ায় সোনার কলসে ভোরের আলো ঝিক্‌মিক্ করত, আর বড় বড় লোকের সমাগম ঘটত।[৬৫] এ মহিষাদল আমার অজানা, অচেনা, তবু যেটুকু দেখি তাও কম সমৃদ্ধ নয়। পুরনো

তিনটি রাজবাড়ি, মন্দির, রথ উৎসব, সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত অনুভূতি। সামাজিক ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে অনুভব করি, অনুমান করি, ধরবার চেষ্টা করি সংস্কৃতিকে ও তার উৎসকে। 'উত্তর আধুনিক' এই কালে দীনেন্দ্রকুমার বা কণিকা বসুর স্মৃতিকে ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়।

॥ ৩ ॥

রানী ভিক্টোরিয়ার 'জুবিলি'র বছরে 'এনট্রান্স' পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে আনুমানিক ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ অবিভক্ত বাংলার নদিয়া জেলার মেহেরপুর থেকে দীনেন্দ্রকুমার রায় এই মহিষাদলেই এসেছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কৃষ্ণনগর মহাবিদ্যালয়ে পড়তে চলে যান। এরপর ১৮৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দে চলে এলেন কলকাতায়, সেখান থেকে আবার চলে গেলেন মহিষাদল, এবার চাকরি সূত্রে। সেখানে বছর দুয়েক কাটিয়ে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজশাহী জেলাজজ আদালতে যোগ দেন। এরপর আমরা তাঁর নিজের রচনা থেকেই বিস্তারিত শুনব—[৬৭.১]

'জুবিলির বৎসরে এনট্রান্স ফেল হওয়ায়, বিশেষত ইংরাজি সাহিত্যে অকৃতকার্য হইয়াছি শুনিয়া অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইলাম। মেহেরপুর স্কুলের প্রতি বিরাগ জন্মিল। যে স্কুল হইতে পরীক্ষা দিয়া ছয়জনের মধ্যে ছয়জনেই ইংরাজি সাহিত্যে অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করে—সেই স্কুলে পুনঃপ্রবেশ করিয়া মা সরস্বতী বন্দনা করিতে প্রবৃত্তি হইল না।'

আমার কাকা তখন মহিষাদল রাজ এস্টেটের ম্যানেজার। মহিষাদলের প্রধান ম্যানেজার উমেশচন্দ্র মিত্র (স্বর্গীয় বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের দাদা) মহাশয়ের মৃত্যুর কিছুদিন পরে আমার কাকা এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি মহিষাদল-রাজের এনট্রান্স স্কুলের প্রধান মুরুব্বী ও স্কুল কমিটির 'প্রেসিডেন্ট' ছিলেন। কাকা আমাকে মহিষাদলে লইয়া গিয়া সেই স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন।

এই সময় ২৪ বৎসরের যে যুবক শিক্ষক মহিষাদল স্কুলের হেড মাষ্টার পদে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার প্রতিভার আকর্ষণ, চরিত্রের প্রভাবে, শিক্ষাদানের প্রণালী আমি জীবনে বিস্মৃত হইব না। তাঁহার নাম অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ; তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের এম এ, সুবিখ্যাত টনি সাহেবের প্রিয় ছাত্র ; পাকা ইংরাজিওয়ালা। আমার কাকা তাঁহাকে আমার পরিচয় দিয়া বলিলেন, 'মাষ্টার মশায়, এই বাঁদরটা গতবার জুবিলির বছরেও ইংরেজিতে ফেল হয়েছে।' অমৃতবাবু আমাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া বলিলেন, 'ছোকরা intelligent আছে—কিন্তু ইংরেজিটা ভারী neglected হয়েছে ; দেখা যাক চেষ্টা করে।' তাহার পর তাঁহার চেষ্টা আরম্ভ হইল ; ওরে বাপ্ রে ! সে কি ভীষণ চেষ্টা। যাহাকে বলে, 'বেঁধে মার !'—তাহাই।

মহিষাদলের রাজবাড়ির পশ্চিম দেউড়ির উপর দোতলায় চারিটি কক্ষ ছিল ; তাহারই একটি কক্ষে অমৃতবাবুর ও আমার বাসস্থান হইল। আমি অমৃতবাবুর সহবাসী হইলাম। দিবারাত্রি মাষ্টার মহাশয়ের সহিত একত্র বাস ; আর তাঁহার কি কঠোর শাসন ! আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার স্নেহমধুর ব্যবহার জীবনে ভুলিতে পারিব না। অমৃতবাবুকে দীর্ঘকাল এই স্কুলে হেডমাষ্টারি করিতে হয় নাই। অল্পদিন পরে তিনি ডেপুটি ম্যজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি যখন রানাঘাটের সাব-ডিভিসনাল অফিসার হইলেন, তখন আমার আশা হইল, তিনি নদিয়ায় আসিয়াছেন, হয় ত তাঁহাকে মেহেরপুরে বদলি হইতে দেখিব ; কোন দিন তিনি মেহেরপুর উপবিভাগের ভার পাইতেও পারেন ; কিন্তু আমার এই আশা পূর্ণ হয় নাই। তিনি আমাকে না ভুলিলেও গুরুশিষ্যে আর কখন সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি যোগ্যতাবলে অল্পদিনেই উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহের কথা স্মরণ হইলে এখনও চক্ষু অশ্রুভারে ঝাপসা হইয়া উঠে আর মনে হয়, সেকালের আর একালের শিক্ষক ও ছাত্রে কি বিশাল ব্যবধান !—জানি না, এ কালে অমৃতবাবুর ন্যায় এ দেশে কয়জন আছেন।

সে আজ ৪৫ বছরের কথা, ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে, মহারানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলির পর বছর আমরা এন্ট্রেস পরীক্ষার গোষ্পদ পার হইলাম। কাকা হেডমাষ্টার অমৃতবাবুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে অমৃতবাবু বলিলেন, 'না মশায়, আমি খুশি হ'তে পারি নি, যদি একটা স্কলারসিপ আদায় করে দিতে পারতাম, তা হলে আমার পরিশ্রমটা সার্থক হত। কিন্তু গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করার কথা শোনা যায় মানুষ করা যায়—এ কথা শুনি নি'—অযোগ্য ছাত্র হইলেও আমি কোনও দিন তাঁহার স্নেহে বঞ্চিত হই নাই—যদিও কোনও দিন তাঁহার মৌখিক স্নেহের কোনও পরিচয় পাই নাই। তাঁহার সহাস্য প্রসন্ন মুখ, তাঁহার কোমল দৃষ্টি তাঁহার উদার হৃদয়ের গভীর স্নেহ পরিব্যক্ত করিত। তিনি বলিতেন, 'মুখের কথায় নয়, কার্যে তোমার সামর্থ্যের পরিচয় দাও।'—তিনি রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়া আজীবন এই নীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

সে সময় বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ নির্মিত হয় নাই ; বেলিয়াঘাটা স্টেশনেরও তখন অস্তিত্ব ছিল না। আমরা শিয়ালদহ স্টেশনে সকালে সাড়ে সাতটার সময় ট্রেনে চাপিয়া বেলা দশটার সময় ডায়মণ্ডহারবার স্টেশনে নামিতাম, তাহার পর সেখানে স্টিমারে চাপিয়া বেলা বারোটার সময় গেঁওখালি স্টেশনের জেটিতে নামিতে হইত। তাহার পর কিছু দূর ঘুরিয়া গেঁওখালির খালের ভিতর বোটের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। এই খালটি 'হিজলি খাল' নামে অভিহিত ; সে কালে যাহারা তীর্থভ্রমণে উড়িষ্যা যাইত, তাহাদিগকে এই খাল দিয়াই স্টিমারযোগে গমনাগমন করিতে হইত। এই খাল মহিষাদলকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে, এক অংশে রাজবাড়ি, অন্য অংশে বাজার, স্কুল বোর্ডিং থানা, পোস্ট অফিস, সাবরেজিস্ট্রি অফিস

ভাগীরথী তীরবর্তী গেঁওখালির দৃশ্য, ১৯৮৬ শিল্পী : টমাস ও উইলিয়াম ড্যানিয়াল
সৌজন্যে : তারাপদ সাঁতরা রচিত 'ইতিহাসের রূপরেখা : গ্রাম-জনপদ'

যে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন তাহা স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উপদেশেই প্রদত্ত হইয়াছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় মহিষাদল রাজপরিবারের হিতৈষী সুহৃদ ছিলেন, তাঁহার দাদা মাধবচন্দ্র সার্বভৌম মহাশয় মহিষাদলেই বাস করিতেন এবং রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। সার্বভৌম মহাশয়ের ন্যায় উদারচেতা, অমায়িক, সরল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এ কালে আর একজনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাকে দেখিয়া নবদ্বীপের সুবিখ্যাত 'বুনো রামনাথ'কে মনে পড়িত। তিনি অপুত্রক ছিলেন, এ জন্য ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় মহিমানাথকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহিমানাথ কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়া সরকারের অহিফেন বিভাগে চাকরি লইয়াছিলেন এবং পরে দায়িত্বপূর্ণ উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় ইডেন হিন্দু হস্টেলের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বর্গীয় রায় সাহেব কুঞ্জবিহারী বসু ; তিনি পূর্বে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের সহকারি ছিলেন।

এখন মহিষাদলে যাইতে হইলে বি এন রেলপথের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় ; শুনিয়াছি এখন আর ডায়মণ্ডহারবারের পথে যাওয়া যায় না। বোধ হয়, তাহার প্রয়োজনও হয় না। মহিষাদলে উষায় ও সন্ধ্যায় প্রতি গৃহস্থ-গৃহে শঙ্খধ্বনি হইত। একসঙ্গে শত শত শঙ্খ বাজিয়া উঠিত। কথিত আছে, পুরীতে জগন্নাথমন্দিরে আরতির সময় যে শঙ্খধ্বনি হইত তাহা দূরবর্তী গ্রামের মহিলাবর্গের কর্ণগোচর হইত, তাঁহারা তখন একযোগে শঙ্খ বাজাইতেন, সেই ধ্বনি দূর হইতে দূরান্তরে ও গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে মহিষাদলের গৃহস্থ মহিলাবর্গের কর্ণগোচর হইত, তাঁহারা তখন একযোগে শঙ্খধ্বনি করিতেন। এই জনশ্রুতি কতদূর সত্য, জানি না ; এবং এই প্রথা এখনও প্রচলিত আছে কি না, তাহাও আমার অজ্ঞাত ; কিন্তু মেদিনীপুরের কাঁথিপ্রান্তের সহিত ওড়িশার নিকট সম্বন্ধ। মহিষাদলের রথই এই সম্বন্ধের অন্যতর প্রমাণ ; মহিষাদলের রথ ওই অঞ্চলের একটি প্রধান উৎসব। কাঠের রথখানি যেরূপ বৃহৎ সেইরূপ সুশোভন ইহা বহু মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল। মহিষাদল-রাজের পারিবারিক বিগ্রহ গোপালজী রথে আরোহণ করিয়া এক মাইল দূরবর্তী মাসী-বাড়িতে গিয়া অষ্টাহকাল সেখানে বিশ্রাম করেন ; সেই সময় দেবগৃহ-প্রাঙ্গণে যাত্রা, গান প্রভৃতি নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হইত। আমি যখন মহিষাদলে ছিলাম, সে সময় নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাগায়ক স্বর্গীয় মতিলাল রায় কয়েক দিন সেই আসরে যাত্রাগান করিয়াছিলেন ; সাত দিন সেখানে নানাপ্রকার আমাদের অনুষ্ঠান হইত।

প্রভৃতি অবস্থিত। একটি সুপ্রশস্ত ও সমুন্নত সেতু দ্বারা এই উভয় অংশ সংযুক্ত। সেতুর পার্শ্বস্থিত খিলানের তলা দিয়া পথিকদের যাতায়াতের পথ আছে।

গেঁওখালিতে যে স্থানে খাল আরম্ভ হইয়াছে—সেই স্থানে লোহার দেউড়ি আছে, উহা বন্ধ থাকে। উহা খুলিয়া খালে জোয়ারের জল লওয়া হয় ; ভাটার সময় দেউড়ির বাহিরে জল অল্প থাকে, ডবল দেউড়ির সাহায্যে জল সমতল করিয়া নৌকা, স্টিমার প্রভৃতি খালে প্রবিষ্ট হয় এবং খাল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। খালের মুখেই টোল কালেক্টরের অফিস, তিনি নৌকাদি কৃত করিয়া শুল্ক আদায় করেন। রাজবাড়ির নৌকা খালের ভিতর থাকিত, এ জন্য আমাদিগকে স্টিমার হইতে নামিয়া খালের ধারে ধারে কিছু দূর হাঁটিয়া গিয়া রাজবাড়ির বোটে উঠিতে হইত। প্রতিদিন সেই বোটে রাজবাড়ির বাজার মহিষাদলে প্রেরিত হইত। একজন আরদলি প্রত্যহ কলিকাতা হইতে বাজারের জিনিষপত্র কিনিয়া আনিয়া সেই বোটের সাহায্যে রাজবাড়িতে পৌঁছিয়া দিত। এই বোটে আমরা বেলা একটা দেড়টার সময় মহিষাদল পৌঁছিতাম ; বোটে চারি পাঁচ মাইল যাইতে হইত। সম্ভ্রান্ত কর্মচারিগণ মহিষাদল হইতে পাল্কিযোগে গেঁওখালি আসিয়া স্টিমার ধরিতেন, রাজা বা রাজপরিবারস্থ মহিলাগণ কলিকাতায় আসিবার সময় মহিষাদলে রাজার নিজের স্টিমারে চাপিয়া নদীপথে আসিতেন। মহিষাদলে সেতুর নিকটেই বাজার ; স্টিমার ও ভাউলিয়া নঙ্গরে আবদ্ধ থাকিত। মহিষাদলের রাজগণ পূর্বে সরকার কর্তৃক 'বাবু' নামে অভিহিত হইতেন ; কলিকাতার ইডেন হস্টেলের গৃহনির্মাণের জন্য অনেক টাকা দান করায় এবং নানা সৎকার্যে মুক্তহস্তে অর্থদান করিয়া তাঁহারা সরকারের নিকট 'রাজা' খেতাব লাভ করেন। কলিকাতার ইডেন হস্টেলের দোতলা নির্মাণে তাঁহারা

আমাদের ন্যায় দরিদ্রের পরিবারে ভাগ্য-বিপর্যয়ের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বিস্ময়ের কারণ নেই; আমরা দু'বেলা উদর পুরিয়া খাইতে পাই না, অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করিতে বাধ্য হই, বছরের মধ্যে সাড়ে এগার মাস রোগে শয্যাগত থাকি, তাহার পর সুচিকিৎসার অভাবে নিরন্ন, অনাথ পরিজনবর্গকে শোকের ও দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া দিয়া কোটরাগত দীপ্তিহীন চক্ষু চিরমুদিত করি। ইহাই আমাদের শোচনীয় দারিদ্র্যের ইতিহাস। গল্পে, গানে ইহারই এক এক টুকরো ভাসিয়া আসিয়া কিছুকালের জন্য সাহিত্যে স্থান লাভ করে। কিন্তু কমলার রত্নাঞ্চলের ছায়ায় প্রতিপালিত এই মহিষাদলে ছিলাম, তখন রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গ সুস্থকায় বলবান্ যুবক। তাঁহার কোনও পুত্র-কন্যা ছিল না, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ গর্গের দুই পুত্র ও কন্যা বর্তমান ছিলেন। সোনার সংসার; বালক-বালিকাগণের কলহাস্যে রাজবাড়ি প্রতিধ্বনিত হইত; রানিজীদের জীবনযাত্রার আড়ম্বর কি বিলাসপূর্ণ। শিশু রাজকুমারদ্বয় ও তাঁহাদের কনিষ্ঠা ভগিনী শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন স্বাস্থ্যে, রূপে লাবণ্যে পূর্ণতা লাভ করিতেছিলেন। কুমার সতীপ্রসাদ ও কুমার গোপালপ্রসাদ রাজপরিবারের অলঙ্কার ছিলেন। সুখ, ঐশ্বর্য, বিলাসে মহিষাদলের রাজপ্রাসাদ কানায় কানায় পূর্ণ। আর কয়েক বৎসর পূর্বে সংবাদ পাইলাম—কেহ নাই; মহিষাদল রাজ-পরিবার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, শোকের তিমিরাবরণে সমগ্র প্রাসাদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিছু দিন পূর্বে সংবাদ পাইয়াছি—সেই সুখের সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল অতীত না হইতেই রাজমাতা, রাজকুমারী, সতীপ্রসাদ, গোপালপ্রসাদ সকলেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। জমিদারি এখন কোর্ট অফ ওয়ার্ডের অধীন। বাংলার অধিকাংশ জমিদার-বংশেই কি বিধাতার অভিসম্পাত আছে?"

আগেই বলা হয়েছে প্রবেশিকা পাশ করে দীনেন্দ্রকুমার কৃষ্ণনগর কলেজে পড়তে চলে যান। সেখান থেকে দু'বছর পরে এলেন কলকাতায়। কিন্তু সমস্যা হল অন্য জায়গায়। তিনি লিখছেন—"কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া সাহিত্যালোচনা বাড়িয়া গেল, পড়াশুনার সুবিধা হইল না; তখন মহিষাদলে গিয়া স্কুলের মাষ্টারি কার্যে লিপ্ত থাকিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়াই স্থির হইল। সুতরাং মহিষাদলে উপস্থিত হইয়া পুনর্মূষিক হইলাম। সেখানে একটু কৌশল করিয়া সাহিত্য-জীবনের একজন হিতৈষী সঙ্গী সংগ্রহ করিলাম; তিনি আমার 'মাষ্টার মশায়' এবং বহু যুবকের 'জলদা'।—ইনিই এখন সাহিত্য-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, 'ভারতবর্ষ'—সম্পাদক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন।

মহিষাদল স্কুলে মাষ্টারি করিয়া এল এ পরীক্ষা দিব বলিয়া মহিষাদলের কাকার বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কিন্তু এবার আর রাজবাড়ির পশ্চিম দেউড়িতে বাসা ছিল না; খালের অপর পারে রাজা বাহাদুরের একটি বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা ম্যানেজারের বাসের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। বাসার এক দিকে হিজলি খাল; অন্য দিকে হাটতলা, সোম-শুক্রবারে সেখানে হাট বসিত।

মহিষাদল স্কুলে তখন তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি ছিল। শিক্ষকের জন্য কোনও কোনও ইংরাজি কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। কাকাই স্কুলের কর্তা; আমি তাঁহাকে বলিলাম, তৃতীয় শিক্ষকের গণিতে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন; জলধরবাবু গণিতে বিশেষজ্ঞ। আমি তাঁহাকে জানি, আপনারা ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেতনে তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর শিক্ষক পাইবেন না; এতদ্ভিন্ন আমি মাষ্টারি করিয়া এল এ দিব, অথচ আমি গণিতে এত কাঁচা যে, কোনও গণিতজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্য ভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। জলধরবাবু যদি দয়া করিয়া আমাদের বাসায় থাকেন, তাহা হইলে আমি এ বিষয়ে সর্বদাই তাঁহার সাহায্য পাইতে পারি; তিনি চেষ্টা করিলে হয়তো গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করিতে পারিবেন।

কাকা শুনিলেন, জলধরবাবু তাঁহার বন্ধু—বঙ্গের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের সহকারী (অধুনা স্বর্গীয়) বাবু কুঞ্জবিহারী বসুর জামাতার দাদা। কাকা জলধরবাবুকে ওই পদে নিযুক্ত করিতে সম্মত হইয়া চাকরির জন্য তাঁহাকে আবেদন করিতে বলিলে আমি অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম। আমার চেষ্টা সফল হইল। জলধরবাবু মহিষাদল স্কুলে চাকরি করিতে আসিলেন। ম্যানেজারের বাসের অট্টালিকার কয়েক গজ পশ্চিমে মৃৎ-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত একখানি খড়ের ঘর ছিল; সেই ঘরে আমি ও জলধরবাবু একত্র বাস করিতাম। আমি তাঁহার নিকট গণিতবিদ্যা শিখিতাম। সেই হইতে তিনি আমার 'মাষ্টার মশায়'। আমি তাঁহার নিকট গণিতবিদ্যা শিখিতাম বটে, কিন্তু সে সময় আমাদের সাহিত্যালোচনারও বিরাম ছিল না। এই সময় স্বর্গীয় ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহিষাদলের রাজবাড়ির ডাক্তারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ললিতবাবু সুচিকিৎসক ছিলেন; তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের নীরব সাধক ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই জলধরবাবুর সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল। ললিতবাবু মহিষাদলেই বাড়ি-ঘর নির্মাণ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানে বাস করিয়াছেন। তিনি পরদুঃখকাতর, সহৃদয়, স্পষ্টবাদী ও তেজস্বী লোক ছিলেন। মহিষাদলের সর্বসাধারণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তিনি আমাকে সাহিত্য-সেবায় উৎসাহিত করিতেন।

বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি কাকার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী চন্দ্রশেখর কর এই সময় তমলুকের সাব-ডিভিসনাল অফিসার ছিলেন; মহিষাদল তমলুক সাব-ডিভিসনের এলাকাভুক্ত বলিয়া চন্দ্রশেখরবাবু পরিদর্শন উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে মহিষাদলে আসিতেন। চন্দ্রশেখরবাবু কৃষ্ণনগরের অধিবাসী, আমরাও নদিয়াবাসী। এ জন্য চন্দ্রশেখরবাবুর সহিত আমাদের আত্মীয়তা হইয়াছিল। চন্দ্রশেখরবাবু কাকার বৈঠকখানায় আসিলে যেন আনন্দের

বাজার বসিত। জলধরবাবুও সেই মজলিসে যোগদান করিতেন। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় সে সময় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ; তিনি তখন 'সেটেল্‌মেন্ট' বিভাগে কাজ করিতেন এবং মেদিনীপুরের কিয়দংশের জরিপ-সংক্রান্ত কার্যের ভার তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। একবার তিনি তাঁহার কার্যস্থানে সুজামুটা পরগনায় যাইতেছিলেন ; সেই সময় আমার কাকা তাঁহাকে নিমন্ত্রিত করিয়া তাঁহার বজরা হইতে আমাদের বাসায় ধরিয়া আনিয়াছিলেন। রাত্রিতে কাকার বৈঠকখানায় যে মজলিস হইয়াছিল, সেই মজলিসে দ্বিজেন্দ্রবাবু তাঁহার স্বরচিত অনেকগুলি হাসির গান গাহিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সুপ্রসিদ্ধ হাসির গান। 'পারো ত' জোম্মো না ভাই বিষ্যুৎবারে বারবেলায়' তাঁহারই মধুর কণ্ঠে সেই প্রথম শুনি। এতদ্ভিন্ন—সেই গানটি—'তার রং যে বড্ড ফরসা, তারে পাবো হয় না ভরসা।—' তিনি হাত ও চোখ-মুখের এরূপ ভঙ্গির সঙ্গে গাহিয়াছিলেন যে, শ্রোতার দল হাসির চোটে বেসামাল হইয়া পড়িয়াছিলেন।—সেই মজলিসে জলধরবাবুও অনুরুদ্ধ হইয়া দুই তিনটি গান গাহিয়াছিলেন, কাঙালের রচিত দেহতত্ত্বের গান ভিন্ন তিনি দাশরথির রচিত একটি গান গাহিয়াছিলেন, তাহা বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছিল,—

"হৃদি-বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি।
আমার দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী।।"

জলধরবাবু সুকণ্ঠ গায়ক নহেন ; কিন্তু তিনি প্রাণের সকল আগ্রহ ঢালিয়া এরূপ আন্তরিকতার সহিত গানটি গাহিয়াছিলেন যে, তাঁহার গান শুনিয়া ডি এল রায়ের সেই হাসির গানের শ্রোতার দল বিপুল হাস্যোচ্ছ্বাসের পর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। অনেকেরই চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। কিছুদিনের মধ্যেই সংসারনির্লিপ্ত উদাসী জলধরবাবু আমাদের পরিবারেরই একজন হইয়াছিলেন। কাকার দশ বছরের ছেলে সুরেনকে তিনি হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। কাকার তিনটি মেয়ে মুহূর্তের জন্য তাঁহার সঙ্গ-ছাড়া হইত না।

এই সময়ে পূজনীয়া 'ভারতী' সম্পাদিকার চেষ্টায় 'সখী-সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হইলে, আমি জলধরবাবুকে ও ডাক্তার ললিতবাবুকে সঙ্গে লইয়া 'সখী-সমিতির' চাঁদার জন্য মহিষাদলের পল্লী-অঞ্চলে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলাম। চাঁদা কিছু কিছু সংগৃহীত হইয়াছিল।

মহিষাদলে আমাদের দিনগুলি বেশ সুখেই কাটিয়াছিল। সেই সময় কৈলাসবাবু নামক একজন হেডমাষ্টার আসিয়াছিলেন ; তিনি ইংরাজি ডিটেকটিভ নভেলের পরম ভক্ত ছিলেন, এ জন্য স্কুল-লাইব্রেরির অনেকগুলি ডিটেক্‌টিভ নভেল আনাইয়াছিলেন ; আমি মধ্যে মধ্যে তাহা লাইব্রেরি হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতাম। স্কুলের শিক্ষকদের নামের তালিকায় আমার নাম ছিল, কিন্তু ওই পর্যন্ত। জলধরবাবু শিক্ষকতা-কার্যে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, স্কুলের ছেলেরা অল্পদিনেই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়াছিল, তিনি কোনও ছাত্রকে কখনও কঠিন কথা বলিতেন না, কিন্তু ছেলেরা তাঁহাকে যথেষ্ট ভয় ও ভক্তি করিত। কাকাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন ; কিন্তু তিনি বক্তৃতায় লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারেন—এ কথা কেহই জানিত না। তিনি সর্বদাই যেন অন্যমনস্ক, গম্ভীর ; দুই চারিজন বন্ধুবান্ধব, স্কুলের শিক্ষক, সাব-রেজিস্ট্রার কালীবাবু, পোস্টমাষ্টার নীলমণি গাঙ্গুলি প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত বড় মিশিতেন না। মহিষাদলের রাজ-অমাত্যগণের মধ্যে মিশিবার মত শিক্ষিত লোক অধিক ছিলেন না। ডাক্তার ললিতবাবুর কথা পূর্বেই বলিয়াছি, তিনিই জলধরবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

আমাদের মেহেরপুর স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন বাবু শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শরৎবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মহিষাদল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ খালি হইলে হেমবাবু সেই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাধানাথ মাইতি নামক একজন উকিল রাজকুমারদের গৃহশিক্ষক ছিলেন ; পরে তিনি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, ইহার কারণ জানিতে পারি নাই। পোস্টমাষ্টার নীলমণিবাবু মজলিসী লোক ছিলেন। সন্ধ্যাকালে কাকার বাসায় ইহাদের খেলার আড্ডা বসিত। মাষ্টার মহাশয় সেই আড্ডায় যোগ দিতেন না। এক দিন কাকা 'ভারতী'তে মাষ্টার মহাশয়ের 'ভ্রমণ-কাহিনী' পাঠ করিয়া আমাকে বলিলেন, "মাষ্টারমশায় চমৎকার বাংলা লেখেন, ভারতীতে তাঁর 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' বেরুচ্ছে, দেখেছিস ?"—আমি মাথা চুলকাইয়া বলিলাম, "হাঁ, তা দেখছি ত ; উনি কাঙাল হরিনাথের সাকরেদ, ভাল লিখবেন না ?" আমার ভয় হইয়াছিল—জলধরবাবু হয় ত আমাকে বিপন্ন করিবেন,—বলিবেন, 'মশায়, আপনার ওই লক্ষ্মীছাড়া ভাইপোটাই যত নষ্টের গোড়া।" কিন্তু তিনি দয়া করিয়া আমাকে বিপন্ন করিলেন না, আমি বাঁচিয়া গেলাম। আমার ভয় ছিল, কাকা টের পাইলে হয় ত বলিবেন, "ওরে হতভাগা, এই বুঝি মাষ্টারমশায়ের কাছে তোর অঙ্ক শেখা ?" কিন্তু কাকা কিছুই জানিতে পারিলেন না। সকলেই জানিল, জলধরবাবু চমৎকার লেখেন।

বাবু নীলমণি মণ্ডল মহিষাদল এস্টেটের সাব-ম্যানেজার ছিলেন ; রাজার আমলাদের মধ্যে তাঁহার আর্থিক অবস্থা সর্বাপেক্ষা অধিক সচ্ছল ছিল। তিনি প্রথম-যৌবনে অতি সামান্য বেতনে জমিদারি সেরেস্তায় চাকরি আরম্ভ করিয়াছিলেন, সাব-ম্যানেজার হইয়া তিনি মাসিক এক শত পঁচিশ টাকা বেতন পাইতেন, তিনি বাংলানবিশ কর্মচারি হইলেও জমিদারি কার্যে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। কাকা তাঁহার এই অভিজ্ঞ সহকারির সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনও কাজ করিতেন না। রাজ এস্টেটের তহবিলে লাট খাজনার টাকার অভাব হইলে নীলমণিবাবু কখনও কখনও নিজ তহবিল হইতে ২০/২৫ হাজার টাকা কর্জ্জ দিয়া লাট রক্ষা করিতেন ; শুনিয়াছি—তাঁহার হরিখালি হাটের আয় ছিল বার্ষিক বারো হাজার টাকা। তিনি যে সামান্য বেতনে সাব-ম্যানেজারি কেন করিতেন—তাহা বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু জমিদারিতে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তির সীমা

ছিল না। তাঁহার হৃদয় উদার ছিল ; তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কাকাকে যখন ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়, তখন নীলমণিবাবুই কাকার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এ কালে শিক্ষার কদর বাড়িতেছে, কিন্তু নীলমণিবাবুর ন্যায় উদারপ্রকৃতি লোকের অভাব হইতেছে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেক সাধারণ প্রতিষ্ঠানেও দেখিতেছি—অনেক শিক্ষিত লোক স্বার্থের অনুরোধে অযোগ্য ব্যক্তির ধামা ধরিয়া জনসাধারণের ক্ষতি করিতেছে।

বলিয়াছি, পোস্টমাষ্টারটি বড় মজলিসী লোক ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল।—তিনি দেবী সুরেশ্বরীর বড় ভক্ত ছিলেন, বোতল ভিন্ন তাঁহার চলিত না ; এ অবস্থায় মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে তিনি কিরূপে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবেন ? সুতরাং তাঁহাকে সরকারি তহবিলের টাকা 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ' দেখিতে হইত। সেই সময় একজন ইংরাজ মেদিনীপুর ডিভিসনের পোস্টাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। তিনি মহিষাদলের ডাকঘর পরিদর্শন করিতে আসিবার পূর্বে পোস্টারমাষ্টার কাকার কাছে আসিয়া ধরনা দিতেন এবং দুই এক দিনের জন্য তাঁহার নিকট হইতে দুই তিন শত টাকা ধার করিতেন। কাকা কোনও দিন তাঁহাকে ওইভাবে টাকা দিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পোস্ট অফিসের তহবিল দেখিয়া প্রস্থান করিলে পোস্টমাস্টার কাকাকে টাকাগুলি ফেরত দিয়া যাইতেন। পোস্টমাস্টার কি উদ্দেশ্যে দুই এক দিনের জন্য টাকা ধার লইতেন—তাহা কাকা জানিতেন না বা তাঁহাকে ইহার কারণও জিজ্ঞাসা করিতেন না। তবে পোস্টাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মহিষাদলে আসিবার অব্যবহিত পূর্বেই পোস্টমাস্টারের টাকার প্রয়োজন হইত,—কাকা ইহার কারণ অনুমান করিতে পারিতেন না বলিয়া মনে হয় না। কাকা পান পর্যন্ত খাইতেন না, আর পোস্টমাস্টার 'ভাটী' পর্যন্ত নিঃশেষে পান করিতে পারিতেন ! তথাপি কাকা কোনও দিন তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করেন নাই। তিনি কাকাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার অনুগত ছিলেন ; লোকটির সদ্‌গুণ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ওই এক দোষেই বেচারার সর্বনাশ হইল। একবার কাকা জমিদারি পরিদর্শন উপলক্ষে মফস্বলের কাছারিতে গিয়াছিলেন। সেই সময় পোস্টাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মহিষাদলে উপস্থিত।—পোস্টমাস্টার পূর্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন ; তাঁহার তহবিলে তিন শত টাকার অনটন ছিল। তিনি টাকা ধার করিতে ব্যস্তভাবে আমাদের বাসায় আসিলেন। কাকা বাসায় নাই, কে তাঁহাকে টাকা ধার দিবে ? দুই দশ টাকা নয়, তিন শত টাকা ! পোস্টমাস্টার টাকা সংগ্রহের জন্য ধনাঢ্য বন্ধুগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিলেন ; কিন্তু কেহই তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিলেন না। যথাসময়ে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সরকারি তহবিল পরীক্ষা করিয়া, তহবিল ঘাটতি দেখিয়া তাঁহাকে ফৌজদারি-সোপর্দ্দ করিলেন। তমলুকে তাঁহার অপরাধের বিচার হইল ; কাকার বন্ধু স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ই বোধ হয় তখন তমলুকের ডেপুটি ছিলেন। তিনি কাকার খেলার আড্ডায় পোস্টমাষ্টারকে দেখিয়াছিলেন, পোস্টমাষ্টার কাকার কিরূপ অনুগত ছিলেন, তাহাও তিনি জানিতেন ; কিন্তু সরকারের তহবিল তছরূপের বিচারে আসামিকে দণ্ডদান করিতে তিনি বাধ্য ; তবে তিনি দয়া করিয়া যথাসম্ভব লঘুদণ্ডই দিয়াছিলেন। তিনি যে টাকা ভাঙিয়াছিলেন, তত টাকা তাঁহার জরিমানা এবং ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল। পোস্টমাস্টারের দুইটি কন্যা ও স্ত্রী ভিন্ন তাঁহার বাসায় পুরুষ অভিভাবক কেহই ছিল না। পোস্টমাস্টারের কারাদণ্ডের সংবাদ শুনিয়া তাহাদের কি হৃদয়ভেদী ক্রন্দন। পোস্টমাস্টারের কোনও আত্মীয় তাঁহার বাসায় না আসা পর্যন্ত কাকা এই দুস্থ পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়াছিলেন। পরে শুনিয়াছিলাম—পোস্টমাষ্টারকে আর কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিতে হয় নাই, কারাগারেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

কিছুদিন পরে ডায়মন্ডহারবারের সন্নিহিত উস্তিতে জলধরবাবুর বিবাহের প্রস্তাব চলিতে লাগিল। জলধরবাবু তরুণ যুবক, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, তিনি সর্বাংশে সুপাত্র। জলধরবাবু এই বয়সে বিপত্নীক হইয়া ব্রহ্মচর্য্য করিবেন, সমস্ত জীবন পড়িয়া আছে—অথচ তিনি সংসারধর্ম করিবেন না—ইহা সকলেই অসঙ্গত মনে করিলেন। উস্তির দত্তরা সম্ভ্রান্ত পরিবার, এই বংশের একজন স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী বসুর জামাতা ছিলেন ; আর এক জামাতা জলধরবাবুর কনিষ্ঠ শশধরবাবু ; সুতরাং দত্ত-পরিবারে জলধরবাবুর বিবাহে কোনও বাধা উপস্থিত হইল না, কাকা সানন্দচিত্তে এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। জলধরবাবু তখনও মাথা নাড়িতে লাগিলেন ; তাঁহার হৃদয় বড় কোমল, অতীত জীবনের সাংসারিক সুখদুঃখের স্মৃতি তাঁহার কোমল হৃদয় বেদনাতুর করিয়া তুলিল। তাঁহার বিবাহ হইবে শুনিয়া আমার এতই উৎসাহ হইল যে, আমি এক কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম। তখন বিবাহ উপলক্ষে কবিতা লেখা একালের মত ফ্যাসানে পরিণত হয় নাই।

কিন্তু মাস্টারমশায়ের বিরাগ-ভয়ে এ কবিতা ছাপাইতে পারি নাই। কাকিকে লুকাইয়া শুনাইয়াছিলাম, সুতরাং কাকা তাহা জানিতে পারিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, "কি ছেলেমানুষি কচ্ছিস ? একেই ত ভদ্রলোক বিয়ে করতে রাজি নয়, অনেক কষ্টে রাজি করা গিয়েছে, তোদের অত্যাচারে শেষে হয় ত কোন দিন লোটা-কম্বল নিয়ে আবার কোন দিকে সরে পড়বেন।"—কাজেই আমার সাধের কবিতাটি মাঠে মারা গেল।

কেবল মহিষাদলে কিছুদিন বাস করিবার পরই যে জলধরবাবুর সহিত আমার সকল সম্বন্ধে বিলুপ্ত হইয়াছিল, এরূপও নহে ; কার্যক্ষেত্রেও আমরা একযোগে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়াছিলাম। জীবনের অনেক সুখ-দুঃখ একত্র ভোগ করিয়াছি ; প্রবন্ধান্তরে সে সকল কথার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। সহায়-সম্পদ-হীন, সংসারে বীতস্পৃহ, বিপত্নীক যুবক জলধরবাবুকে, আমার কাকাই তাঁহার মহিষাদলের বাসা

হইতে উদ্যোগ-আয়োজন করিয়া তাঁহার ঘোর অনিচ্ছার মধ্যেই বিবাহ দিয়া আনিলেন,—

"সে আজিকে হ'ল কত কাল
তবু মনে হয় যেন সে দিন সকাল।"

বিবাহের পর জলধরবাবু মহিষাদলে স্বতন্ত্র বাসা করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী দীর্ঘকাল পরে সংসারী হইলেন দেখিয়া আমি রাজসাহীতে চাকরি করিতে চলিলাম। সে বোধ হয় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের অর্থাৎ ৪০/৪১ বছর পূর্বের কথা।"

পাদটীকা

১। জন ক্রমফিল্ড, Mostly about Bengal, নয়াদিল্লি ১৯৮২, পৃ. ২৫০, ২৫৬

২। অনিরুদ্ধ রায়, মধ্যযুগের ভারতীয় শহর, কলি. ১৯৯৯, পৃ. ১১

৩। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, Bengal : Rethinking History.........., নয়াদিল্লি ২০০১, পৃ. ১৩

৪। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, তৃতীয় দে'জ সংস্করণ, কলি. ২০০১, পৃ. ২৮১-৩১৫

৫। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কন চণ্ডী (বিজিত দত্ত সম্পাদিত), বসুমতী সংস্করণ, কলি. ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৬-৭২

৬। ভারতচন্দ্র রচনা সমগ্র, ভৌমিক অ্যান্ড সন্স সংস্করণ, কলি. ১৯৭৪, পৃ. ১৮৮

৭। দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত, ১৯০৪ খ্রিঃ. প্রজ্ঞা সংস্করণ, কলি. ১৯৯০, পৃ. ৩৩, ৪৪, ৪৭, ৫৯ ইত্যাদি।

৮। নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত), যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী রচিত তাঁহার ভ্রমণের রোজ নামচা, কলি. ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

৯। দীনেন্দ্রকুমার রায়, সেকালের স্মৃতি, আনন্দ পাবলিশার্স সংস্করণ, কলি. ১৩৯৫, পৃ. ৭২-৭৬, ৮৮-৮৯, ৯১-৯৩, ৯৭-১০২, ১৪১-১৪৩

১০। ডঃ কণিকা বসু, রোমন্থন, মহিষাদল রাজ কলেজ সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা, মহিষাদল ১৯৯৭, পৃ. ১০৮

*১০ ক। জলধর সেন, আত্মজীবনী ও স্মৃতি-তর্পণ (ডঃ বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত), কলি., ১৯৯১, পৃ. ২০৭-৮

১১। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, কলি., ১৯৮৮, পৃ. ১৭২ ও ২০৭

১২। রজতকান্ত রায়, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, কলি., ১৯৯৪, পৃ. ১১৪

১৩। রায় মনমোহন চক্রবর্তী বাহাদুর, A Summary of the Changes in the jurisdiction of Districts in Bengal, 1757-1916, কলি. ১৯১৮, পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ, কলি. ১৯৯৯, পৃ ১৭ ও ৩৯

১৪। ডব্লু ডব্লু হান্টার, A statistical Account of Bengal, তৃতীয় খণ্ড, লন্ডন, ১৮৭৬, ভারতীয় মুদ্রণ কলি., ১৯৯৭, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃ. ২০৪

*১৪.১ ক। সুরেন্দ্রমোহন বসু, ভারত-গৌরব, প্রথম খণ্ড, কলি. ১৯১৬, পৃ. ৪৪৩

১৫। ভগবতীচরণ প্রধান, মহিষাদল রাজবংশ, দেভোগ ১৮৯৭, বাকপ্রতিমা সংস্করণ, মহিষাদল ১৯৯৭, পৃ. ১৮-২৮

১৬। তমোলুক পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, তমলুক, বৈশাখ, ১২৮২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৫

১৭। ভগবতী প্রধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪ ও রাসবিহারী রায়, মেদিনীবাণী, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৪৬

১৮। বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলি., ১৯৫৭, পৃ. ৪৩৯

১৯। এল এস এস ও'ম্যালি, Bengal District Gazetteers, Midnapore, কলি. ১৯১১, পুর্নমুদ্রণ, কলি. ১৯৯৫, পৃ. ২৫০-৫১

*১৯.১। তারাপদ সাঁতরা, ইতিহাসের রূপরেখা : গ্রাম-জনপদ, সাঁত্রাগাছি, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭

*২০। ও'ম্যালি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫০-৫১

২১। Proceedings of the Board of Revenue, No. 21, 6th April, 1804, West Bengal State Achieves.

২২। ভগবতী প্রধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০-৩২

২৩। ঐ, পৃ. ৩৪-৩৭

২৪। সমাচার দর্পণ, ১৬ জুলাই, ১৮২৫, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলি. ১৩৪৪, পৃ. ২৫৬

২৫। ভগবতী প্রধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

২৬। ও'ম্যালি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭

২৭। তমোলুক পত্রিকা, পূর্বোক্ত, পৃ ২৬-২৭

২৮। তদেব

২৯। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, Report on the Tols of Bengal, Bihar and Orissa, কলি. ১৮৯২, P. IV

৩০। ঐ, পৃ. ১৯

৩০.১। Report on Wards' and Attached Estates in the Lower Provinces for the year 1877-78, কলি. ১৮৭৯, পৃ. ১৬

৩১। ভগবতী প্রধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০ ও Proceedings of the Revenue Department. Salt Branch, File ID/20, No. B. 160-163, December, 1895, and File No. 111/12 No. B. 164-65, October, 1900, West Bengal State Achieves.

৩২। ভগবতী প্রধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

৩৩। ও'ম্যালি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬

৩৪। দীনেন্দ্রকুমার রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

৩৫। ডঃ সুশীল ধাড়া মহিষাদল রাজপরিবার ও কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ, পূর্বোক্ত সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা, পৃ. ৯৪

৩৬। বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪২-৪৩

৩৭। বিশ্বময় পতি ও মার্ক হ্যারিসন, Health, Medicine and Empire ; Perspectives on colonial India, নয়াদিল্লি ২০০১, পৃ. ৫

৩৮। ভগবতী প্রধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬-৫৮

৩৯। দীনেন্দ্রকুমার রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

৪০। সাক্ষাৎকার, ডঃ কনিকা বসু, ২২শে জুন, ২০০২

৪১। শ্রীপান্থ, ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক, কলি. ২০০২, পৃ. ১৮১

৪২। Petition of Rani Shiromoni, 14th March, 1809, West Bengal District Records, Bankura District, Letters Issued, 1802-69, কলি. ১৯৮৯, পৃ. ৬১

৪৩। ভগবতী প্রধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩-৪৫

৪৪। সংবাদ প্রভাকর, ১১ ভাদ্র, ১২৬১ বঙ্গাব্দ, বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড, কলি. ১৯৬২, পৃ. ১৫১

৪৫। ঐ, পৃ. ২০৮-৯

৪৬। ঐ, ২৫শে ভাদ্র, পৃ. ২১১

৪৭। অমরেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাদিত), শাক্ত পদাবলী (চয়ন), কলি. ১৯৭১, নং ১৫৭

৪৮। তনিকা সরকার, Hindu Wife, Hindu Nation, Community, Religion and cultural Nationalism, নয়াদিল্লি ২০০১ পৃ. ৯

৪৯। চিত্ত পাণ্ডা, The Decline of the Bengal Zamindars; Midnapore, 1870-1920, দিল্লি ১৯৯৬, পৃ. ৪৬-৪৭

৪৯.১। Report on Wards' and................ (পূর্বোক্ত), for the year 1881-82 কলি. ১৮৮২, পৃ. ১৫

৫০। ভগবতী প্রধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯, ৫১

৫০.১। Report on Wards' and.............. (পূর্বোক্ত), For the year 1877-78, পৃ. ১৬-১৭ ও for the year 1881-82, পৃ. ১৬

৫১। এ কে জেমসন, Final Report on the Survey and Settlement operations in the District of Midnapur, 1911-17, কলি. ১৯১৮, পৃ. ১৬৯

৫১.১। Report on Wards' and.................. (পূর্বোক্ত), For the year 1877-78, পৃ. ১৮

৫২। এফ ডব্লু এ ডেফাবেক, Report of the Sanitary Commissioner for Bengal for the year 1882, কলি. ১৮৮৩, Appendix-V. P. ivi
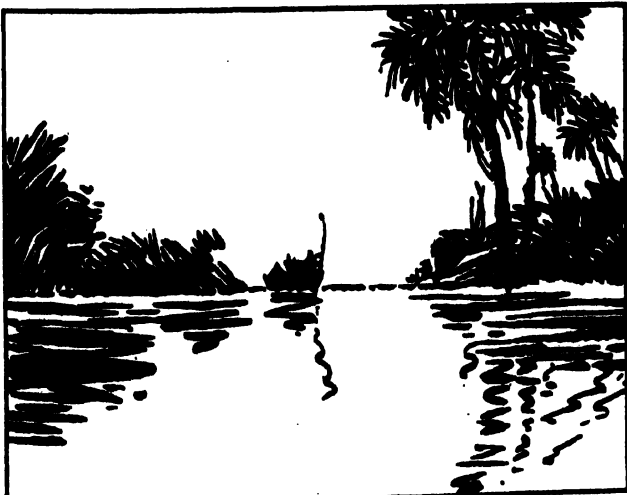
শিল্পীর তুলিতে তাম্রলিপ্ত

৫২.১। Report on Wards' and .... (পূর্বোক্ত), for the year 1877-78, পৃ. ১৮ for the year 1881-82, পৃ. ১৬

৫৩। ডঃ সুশীল ধাড়া, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ৯৫

৫৪। ভগবতী প্রধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৫৫। তদেব

৫৫.১। জেমসন, পূর্বোক্ত, Note by Nikhil Nath Roy. A. D. M., Epilogue, পৃ. ২

৫৫.১ ক। Report on Native Papers in Bengal for the week ending the 15th August, 1903, পৃ. ৭২৪

৫৫.২। বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (পূর্বোক্ত), পৃ. ৪৪০

৫৫.৩। সাক্ষাৎকার, শ্রীনৃপতি মাইতি, গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ভারত ছাড়ো আন্দোলন বিপ্লবীদের মুখোমুখি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলি. ২০০২, পৃ. ৭০

৫৫.৪। 'বিপ্লবী', শহিদ সংখ্যা, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

*৫৫.খ। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ছড়ায় স্থান-বিবরণ, কলি. ১৯৮৬, পৃ. ৩৩

৫৫.৫। জেলার সরকারি কর্তৃপক্ষের গোপন প্রতিবেদন (August 1942-March 1943, Home Department Govt. of Bengal), পৃ. ২৬

৫৫.৬। তদেব

৫৫.৭। ডঃ সুশীল ধাড়া, পূর্বোক্ত, প্রবন্ধ, পৃ. ৯৭

৫৬। সংবাদ প্রভাকর (পূর্বোক্ত), পৃ. ১৫১

৫৬.১। এস পি সেন, Dictionary of National Biography, চতুর্থ খণ্ড (S-Z), কলি. ১৯৭৪, পৃ. ৩৫৯-৬০

*৫৬.২। সম্ভবতঃ ১৯২৬ খ্রি. মহিষাদল-বরদা থেকে বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। পৃ. ২৫

৫৭। ভগবতী প্রধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

৫৮। হান্টার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬

৫৯। ও'ম্যালী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫

৬০। সি এ বেন্টালে, Fairs and Festivals in Bengal, কলি. ১৯২১, পৃ. ৩৫

৬১। অমিয় বসু (সম্পাদিত), বাংলায় ভ্রমণ, প্রচার বিভাগ, পূর্ববঙ্গ রেলপথ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৪০, অখণ্ড শৈব্যা সংস্করণ, কলি. ১৯৯৭, পৃ. ৩৪৬

৬২। ও'ম্যালি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩ ও Proceedings of the Revenue Department (L. R.) No. 253-54 September, 1872, West Bengal State Archives

৬৩। দীনেন্দ্রকুমার রায় পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

৬৪। ডঃ কণিকা বসু, পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকার

৬৫। ডঃ কণিকা বসু, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ

৬৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, কলি. ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৯৪

৬৭। শাশ্বতী মিত্র, মহিষাদল, তোমাকে (কবিতা), পূর্বোক্ত সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা, পৃ. ১৫৯

৬৭.১। পাদটীকা নং ৯ দ্রষ্টব্য

লেখক : অধ্যাপক, মহিষাদল রাজ কলেজ, ইতিহাস বিভাগ

অমরাবতী লেক, দীঘা

দীঘার সমুদ্রে অস্তগামী সূর্যের রশ্মি

ছবি : দেবাশিস ব্যানার্জি
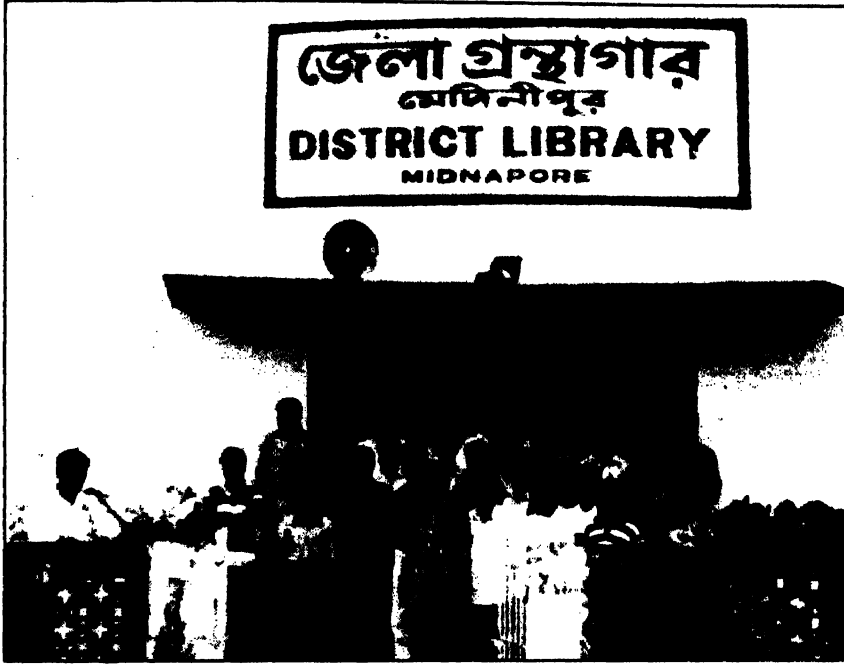
মেদিনীপুর জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন : প্রেক্ষাপট

সন্তোষকুমার দাস ও সুবলকুমার বারুই

গ্রন্থাগার আন্দোলন একটি সামাজিক আন্দোলন। আপামর জনসাধারণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মানোন্নয়নের মাধ্যমে সমাজ সচেতন সুস্থ নাগরিক গড়ে তোলাই গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। এই ধরনের একটি ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন শুধুমাত্র বেতনভুক কর্মীদের দ্বারা সংগঠিত হতে পারে না। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী, সংগঠক, কর্মী, বৃহত্তর জনসমাজ এবং রাষ্ট্রশক্তি এরা সকলেই গ্রন্থাগার আন্দোলনের সক্রিয় শরিক হলেই তবেই তা সার্থক গ্রন্থাগার আন্দোলনে রূপান্তরিত হবে। আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি (তাদের পরিষেবার ক্ষেত্র যতই সীমিত হোক না কেন) গড়ে তোলার পেছনে আছে স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের অপরিসীম নিষ্ঠা ও ত্যাগ। প্রধানত তাদের উদ্যোগেই আধুনিক ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। অবিভক্ত বঙ্গদেশে এবং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের একটি ব্যাপক গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুসংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত করে আসছে জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ।

আমি এখানে মেদিনীপুর জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলন নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করছি। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুর। এখানে একটু মেদিনীপুরের ভৌগোলিক পরিবেশ বলে নেওয়া ভালো।

মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে অবস্থিত এই রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ জেলা। মেদিনীপুর শহরের নামানুসারেই এই জেলার নামকরণ হয়েছে বলে কথিত আছে। অন্যমতে রাজা প্রাণকরের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মেদিনীকোষ অভিধান প্রণেতা মেদিনীকর কর্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয় বলে নাম হয় মেদিনীপুর। আইন-ই-আকবরিতে একটি সুবৃহৎ নগর বলে এর উল্লেখ আছে। এই জেলা উত্তর দক্ষিণে ২১°৩৬'৩৫'' থেকে ২২°৫৭'১০'' অক্ষাংশের মধ্যে এবং পূর্ব পশ্চিমে ৮৮°৩৩'৫০'' থেকে ৮৮°১১'৪০'' দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। জেলার আয়তন ১৪০৮১ বর্গকিলোমিটার, ৭টি মহকুমা, জনসংখ্যা ৯৬,৩৮,৪৭৩ (আদমসুমারি ২০০১ অনুসারে)। মেদিনীপুর শহর কংসাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। ১৭৮৩ সালে ব্রিটিশ আমলে এই শহরে জেলার সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়। উত্তরে বাঁকুড়া জেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূল রেখা, পূর্বে হুগলি, হাওড়া ও ২৪ পরগনা জেলা, পশ্চিমে বিহারের ময়ূরভঞ্জ জেলা, দক্ষিণ-পশ্চিমে ওড়িশার বালেশ্বর জেলা এবং উত্তর-পশ্চিম কোণে পুরুলিয়া জেলা। বর্তমানে মেদিনীপুর জেলাটি পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুর ২টি জেলায় বিভক্ত।

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা রাজনীতি, সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের পথিকৃৎ বললে অত্যুক্তি হয় না। সব আন্দোলনের অন্যতম হিসাবে সেদিন ১৮৫১ সালে ভারতীয় গ্রন্থাগার ইতিহাসে নতুন পাতার সংযোজন হয়েছিল। আজ থেকে দুশত বিয়াল্লিশ বছর আগে মেদিনীপুর শহরে অলিগঞ্জ মহল্লার তৎকালীন জেলা কালেক্টর মিঃ হেনরি ভিনসেন্ট বেলি ও রাজনারায়ণ বসুর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় স্থাপিত হয়েছিল এক সাধারণ গ্রন্থাগার। ভিনসেন্ট বেলির সম্মানার্থে এই সাধারণ গ্রন্থাগারের নাম দেওয়া হয় 'বেলি হল পাবলিক লাইব্রেরি।'

মিঃ বেলি ছিলেন মেদিনীপুর জেলার অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁর সহযোগিতায় মেদিনীপুর জেলার ইতিহাস ও একটি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় এবং জেলার জমিদার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উৎসাহে ও অর্থ সাহায্যে এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন সম্ভব হয়েছিল ভারতের জাতীয়তাবাদের পিতামহ রাজনারায়ণ বসুর আন্তরিক প্রচেষ্টায়। রাজনারায়ণ বসু জন্মগ্রহণ করেন ২৪ পরগনা জেলার বোড়াল গ্রামে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষকতা ছেড়ে তিনি ১৮৫১ সালে মেদিনীপুর জেলা স্কুলে প্রধানশিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। মেদিনীপুরের সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারে রাজনারায়ণ বসু তাঁর জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন। ভিনসেন্ট বেলি প্রতিষ্ঠিত এই 'বেলি হল পাবলিক লাইব্রেরি'র তিনি ছিলেন সম্পাদক। গ্রন্থাগার নির্মাণের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁরা হলেন মিঃ বেলি স্বয়ং, মিঃ কককবার্ন, রাজনারায়ণ বসু, টাকাজি হোলকার, রাধানাথ গাঙ্গুলি প্রমুখ। সাম্রাজ্যবাদী শাসনকালে বিদেশি শাসককুল স্বাভাবিক কারণেই যে কোন ধরনের আন্দোলনকে সুনজরে দেখেনি। ওই সময়ে গ্রন্থাগার সংগঠক ও কর্মী জনসাধারণের ঐকান্তিক আগ্রহ ও উদ্যোগের মাধ্যমে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল, পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। ১৯৭৯ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন হওয়ায় গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য রাজ্য বাজেটে বিপুল পরিমাণ ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন ১৯৫২ সালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত সরকার সারা দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপায়ণ ও সম্প্রসারণের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও, ১৯৫৩-৫৪ সালে এর প্রকৃত রূপায়ণ শুরু হয়। প্রতি রাজ্যে একটি করে রাজ্যকেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগার, রাজ্যের প্রতি জেলায় জেলাগ্রন্থাগার, মহকুমাগ্রন্থাগার, শহরগ্রন্থাগার, গ্রামীণগ্রন্থাগার, আঞ্চলিকগ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। মেদিনীপুর জেলায় দুটি জেলাগ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। একটি তমলুকে অপরটি মেদিনীপুর সদরে।

মেদিনীপুরের মানুষের জীবনে গ্রন্থাগার ব্রিটিশ শাসনের অনস্বীকার্য অবদান। ইংরাজ আমলে পেশাগত কারণে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল ; এবং সেই সূত্রেই কোথাও ব্যক্তিগত উদ্যোগে, কোথাও বা জমিদার, রাজানুগ্রহে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল, কখনোসখনো গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যায় না।

দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখবন্ধে জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য নীতি স্থির হয়েছিল Reduction of poverty, Reduction of Inequality ইত্যাদি। সেখানে Total Removal-এর কোন স্বপ্নই ছিল না। ফলে বাস্তব চেহারাটা যা দাঁড়িয়েছে বলার নয়। ভারতবর্ষের জাতীয় উন্নয়নের আজকের রূপরেখাটা একটা পিরামিডের মত। ওপরতলার ৫-১০ শতাংশ মানুষ বাস করছেন 'সবপেয়েছি'র দেশে। মাঝে ২০-২৫ শতাংশ মানুষ উর্ধ্ব ও নিম্ন চাপে 'স্যান্ডউইচ' হয়ে যাওয়া মধ্যবিত্ত, আর সবার নিচে সত্তর শতাংশ 'হাড় হা-ভাতের' দল, 'রোটি-কাপড়া-মকান' নয় শুধুমাত্র ভোটাধিকারের নিরিখে এরাও ভারতবাসী। হ্যাঁ এতগুলো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরেও এই হল আমাদের দেশ। এই যেখানে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা, সেখানে দেশের গ্রন্থাগারগুলোর হাল-হকিকৎ কী হতে পারে তা বুঝতে বেশি বুদ্ধি খাটানোর দরকার নেই। সারা দেশ, সারা রাজ্যের সঙ্গে জেলার গ্রন্থাগারগুলোও চলছিল ধুঁকে ধুঁকে, যাকে বলে নামমাত্র।

দেশের অন্য রাজ্যের তুলনায় এ রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন পাশ হতে ২৭/২৮ বছর অপেক্ষা করতে হল স্বাধীনতার পর। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য গ্রন্থপ্রেমী ও গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়িত হল। প্রবর্তিত হল পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন (১৯৭৯)। কুমার মনীন্দ্র
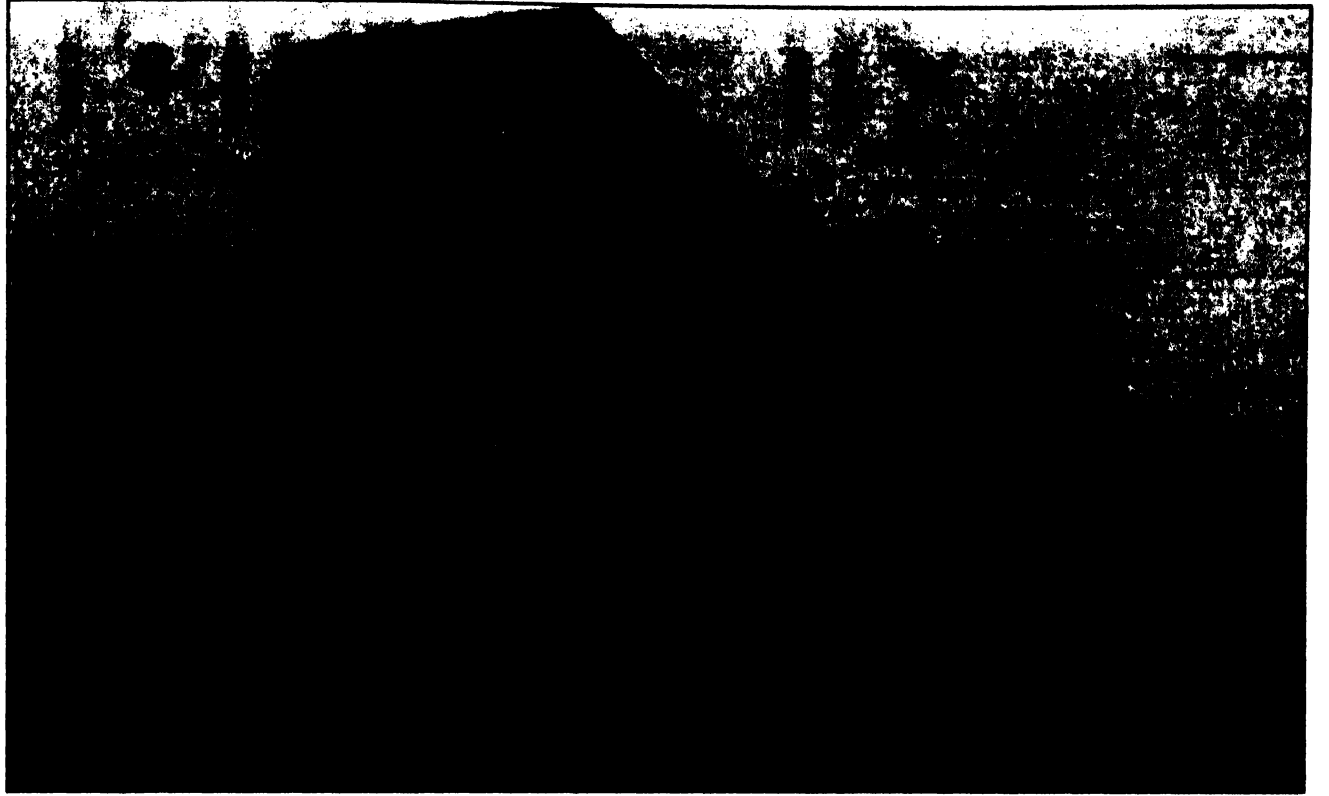
রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার

দেবরায়ের স্বপ্ন সার্থক হল এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি সহ পশ্চিম বাংলার। ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বেলি হল পাবলিক লাইব্রেরি' ১০০ বছর পর নামকরণ করা হল 'রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার'। মেদিনীপুরে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল পটভূমি তৈরি করেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের অপরিহার্য চাহিদা। ব্রিটিশ অপশাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অখন্ড বাংলার যুব সম্প্রদায় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতিক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তুলেছিল 'বেলি হল পাবলিক লাইব্রেবি', 'ঘাটালের অমরপুর মৃগেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার' প্রভৃতি। বিশেষত সশস্ত্র বিপ্লবীরা যে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর সমিতি তৈরি করেছিল, তার সঙ্গে গড়ে তুলেছিল একটি করে গ্রন্থাগার। ১৯০৫ সালের ৫ আগস্ট বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে এই 'বেলি হল পাবলিক গ্রন্থাগারে' মেদিনীপুরের নাগরিকবৃন্দ মিলিত হয়ে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে বিদেশি জিনিস বিনা দ্বিধায় পরিত্যাগ করবেন। ১৯৩১ সালে পেডি হত্যাকারী বিখ্যাত বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত এই গ্রন্থাগারে লুকিয়ে রাত কাটান। স্বদেশি যুগে এই গ্রন্থাগারে অ্যানি বেসান্ত, সিস্টার নিবেদিতা, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ অনেকেই সভা-সমিতি করেছেন এবং গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে গেছেন।

যাই হোক বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময়ে বহু গ্রন্থাগার ধ্বংস হয়ে গেছে। সামান্য কিছু গ্রন্থাগার নাম পরিবর্তন করে নতুন মহিমায় জেগে উঠেছে। এখানে কয়েকটি গ্রন্থাগারের নাম বলছি যে গ্রন্থাগারগুলি আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার (তমলুক), কন্টাই ক্লাব সাবডিভিশন লাইব্রেরি, রামনগর ইউনিয়ন সাধারণ পাঠাগার, খড়্গপুর মিলন মন্দির, পানিহাটি সাধারণ গ্রন্থাগার, মহেশপুর প্রবর্তক সংঘ, বৈতা তরুণ সংঘ, রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার, হলদিয়া টাউন লাইব্রেরি, অমরপুর মৃগেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, ঘাটাল টাউন লাইব্রেরি, চন্দ্রকোণা রুরাল লাইব্রেরী প্রভৃতি (উপরোক্ত গ্রন্থাগারগুলির প্রতিষ্ঠাকাল না দেওয়ার জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি)। যাই হোক গ্রন্থাগার আইন পাশ হওয়ার পর বর্তমানে জেলায় ২টি জেলা গ্রন্থাগার, ২৪টি সাবডিভিসন ও শহর গ্রন্থাগার, ২৪৪টি রুরাল, পাবলিক, এরিয়া লাইব্রেরি আছে। এছাড়াও ৩৮টি মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ১টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১২১টি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল যাদের প্রত্যেকটিতে গ্রন্থাগার থাকার কথা, এবং আরো আছে ১টি আই আই টি ১৫টি টেকনিক্যাল স্কুল গ্রন্থাগার।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার (১৯৭৮-এর পরে) রূপান্তর :

পশ্চিমবাংলায় ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গ্রন্থাগার পরিষেবার মানোন্নয়ন ও সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংগঠনের চিন্তাভাবনা করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বুদ্ধিজীবী,

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান চেতনা জাগরণকারী বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার, গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী, বিশেষজ্ঞ, গ্রন্থাগার দরদি মানুষজনের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন ১৯৭৯ সালে ১২ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় পাশ করেন এবং এর ফলস্বরূপ গঠিত হয় পৃথক গ্রন্থাগার ডাইরেক্টরেট, গঠিত হয় রাজ্যস্তরে রাজ্য গ্রন্থাগার কৃত্যক (State Library Council), জেলায় জেলায় গঠিত হয় জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক (Local Library Authority) এবং এদের তত্ত্বাবধানে গ্রন্থাগার পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নতুন নতুন রূপরেখা। মেদিনীপুর জেলাও এই অগ্রণী ভূমিকায় ও রূপায়ণে পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলে।

মেদিনীপুর জেলার গ্রন্থাগার পরিষেবার চিত্র :

১) স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ছাড়া ও সর্বসাধারণের জন্য স্বাধীনতার পূর্বের সামন্ততান্ত্রিক যুগের ঘরোয়া গ্রন্থাগারগুলি বা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আখড়া হিসাবে পরিগণিত কিছু সংগঠিত গ্রন্থাগার স্বাধীনতা আন্দোলনের লেলিহান শিখার উন্মাদনার বিরুদ্ধে বৃটিশের রোষে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। স্বাধীনতার পরে ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৫৫ সালের পরে মেদিনীপুর জেলায় গঠিত হয় সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার ৭৪টি ও একটি দীঘায় সরকারি গ্রন্থাগার, এগুলি ছিল নিম্নরূপ :

জেলা গ্রন্থাগার-২, মফঃ/শহর গ্রন্থাগার ৫টি এরিয়া বা আঞ্চলিক গ্রন্থাগার-১ ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার ৬৭টি। এগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটিতে ইংরেজ রোষে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া কিছু কিছু পুস্তক সম্ভার নিয়ে পুনরায় স্থাপিত হয়। তবে এগুলির পরিষেবার খুব একটা বিস্তৃতি ছিল না। পরিষেবার মান ছিল সীমাবদ্ধ।

গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষ

আপামর জনসাধারণের গ্রন্থাগার প্রেমের জোয়ারে সারা পশ্চিমবাংলার সাথে সাথে মেদিনীপুর জেলার জনগণও পশ্চিমবাংলায় ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গ্রন্থাগার পরিষেবার মানোন্নয়ন ও সাধারণের জন্য সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গঠনের জন্য চিন্তাভাবনা করেন। তার সাথে এই বিশাল কর্মকাণ্ডে এগিয়ে আসেন প্রগতিশীল গ্রন্থাগারকর্মী, গ্রন্থাগারপ্রেমী গণসংগঠনগুলি। মানুষকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করার ব্রত যেন গ্রন্থাগার পরিষেবার মাধ্যমে সরকারের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে। এর সুফল হিসাবে যা পাওয়া যায় :

১) গ্রন্থাগার আইন অনুসারে রাজ্যস্তরে রাজ্য গ্রন্থাগার কৃত্যক (State Library Council) গঠন ও সভাপতি হিসেবে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সাথে মেদিনীপুর জেলায় গঠিত হয়েছে District Advisory Council পরে সংশোধিত আইনের বলে (Local Library Authority) তিন বছরের মেয়াদে এবং পৃথক Directorate-এর অধীনে পৃথক জেলা গ্রন্থাগার দপ্তর এবং অধীনস্থ জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক-এর দপ্তর, যিনি হলেন জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক (Local Library Authority)-এর সম্পাদক বা কর্মসচিব। বর্তমানে DLO উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে কাজ করে আসছেন এবং DM-এর সভাপতিত্বে গ্রন্থাগারকর্মী, সংস্থাগুলির প্রতিনিধি, জেলার সভাধিপতির প্রতিনিধি, শিক্ষা ও তথ্য বিভাগের অফিসার, জেলা শিক্ষা সংস্কৃতি, সাক্ষরতা, বিজ্ঞান আন্দোলনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা গ্রন্থাগার আইন অনুসারে গঠিত LLA-তে প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

২) ১৯৮১ ও ১৯৮২ সালে সারা পশ্চিমবাংলায় সুনির্দিষ্ট নিয়মে গ্রন্থাগার চালু হওয়ার সাথে সাথে নতুন করে মেদিনীপুরে যথাক্রমে প্রথমে ১২০ ও পরে ৭০টি নতুন গ্রন্থাগার অনুমোদিত হয়। বর্তমানে পুরাতন ও নতুন সংযোজিত গ্রন্থাগার অনুমোদনের পর সামগ্রিক চিত্র নিম্নরূপ : ক) জেলা গ্রন্থাগার-২ (মেদিনীপুর ও তমলুক), খ) শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার-১০, গ) ১৯৮৬ সালে রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ১৫টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার LLA অনুমোদনের পর বিভাগীয় অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়ে শহর গ্রন্থাগারে উন্নীত হয় এবং তারা বিল্ডিং গ্রান্ট ৩৫,০০০ টাকা এবং এক বছরের Maintanance grant পেয়ে আসছে। এখন অবশ্য প্রতিবছর শহর গ্রন্থাগারের হারে Maintanance grant পেয়ে আসছে। এদের মধ্যে ৫টিতে ২ জন করে স্টাফ বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। ঘ) গ্রামীণ/প্রাইমারী

ইউনিট গ্রন্থাগার ২৪৩ এবং ১৯৮৬ সালে ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ১৪টি নতুন গ্রামীণ গ্রন্থাগার LLA অনুমোদিত অবস্থায় আছে। এর মধ্যে ৬টির সমস্ত কাগজপত্র দপ্তরে জমা দিয়ে তার অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বাকিদের এখনও সবরকম কাগজপত্র জমার অভাবে অনুমোদন অথৈ জলে বলে জেলা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগে জানা গেছে। ৬) এছাড়াও এই জেলার দীঘায় পর্যটন স্থানে একটি সরকারি গ্রন্থাগার রয়েছে। তার সেবার মান বৃদ্ধির জন্য স্থানান্তরিত করে নতুন ভবনে পরিচালনার জন্য সরকার ব্যবস্থা করছেন।

৩। এই জেলার ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী লোকসংখ্যা ৮৩,৪৯,৮৯০ জন। এ পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারপোষিত গ্রন্থাগার স্থাপনের সংখ্যার ভিত্তিতে প্রায় ৩১,০০০ লোকের জন্য একটি গ্রন্থাগার পরিষেবা দিয়ে আসছে। গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠকের বাড়িতে পড়ার জন্য দৈনিক পুস্তক লেনদেন গ্রন্থাগার পিছু উর্ধ্বসংখ্যা ৭৫/৮০ আবার নিম্নসংখ্যা ২/৩ও আছে। কিন্তু গ্রন্থাগারে বসে পড়াশোনার পাঠকের সংখ্যা সে তুলনায় দেখা যায় আগের তুলনায় বেড়েছে। বর্তমানে যাতে আরও বেশি বেশি করে পাঠককে গ্রন্থাগারমুখী করা যায় তার যথেষ্ট ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে। এর জন্য সরকারের সাথে সাথে গ্রন্থাগার কর্মিগণেরও ভাবনাচিন্তার সময় হয়েছে। গ্রন্থাগার পরিষেবাকে গতানুগতিক অবসর বিনোদনের স্তর থেকে উন্নীত করে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে তথ্য সন্ধানের তথ্যভাণ্ডাররূপে রূপান্তরের প্রচেষ্টা চলছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপযুক্ত Carrier গঠনের সাহায্যকারী হিসেবে জেলা গ্রন্থাগারগুলিতে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সম্ভারে সমৃদ্ধ আলাদা কক্ষে সাধারণ পাঠকদের সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও পৃথক Carrier Advancement Centre খোলার সরকারি নির্দেশ এসেছে এবং আমাদের মেদিনীপুর জেলায় মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারে এর যথাশীঘ্র রূপায়ণের জন্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিতে শুরু করেছেন। অবশ্য এর পূর্বে ছোট আকারের এই বিভাগের একটি পরিষেবা এই বৎসর চালু করা হয়েছে।

৪। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের পর মেদিনীপুর জেলার গ্রন্থাগার কৃত্যক (LLA) দ্বারা যথার্থ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগারগুলি পরিচালিত হচ্ছে এবং গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনার জন্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম চালু হয়েছে। বর্তমানে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক ছাড়াও জেলার গ্রন্থাগার কৃত্যকের সদস্যগণের মধ্যে দুটি জোনে (মেদিনীপুর ও তমলুক) বিভক্ত হয়ে গ্রন্থাগারগুলির পরিদর্শন ও মানোন্নয়নের জন্য LLA সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৫) গ্রন্থাগার স্থাপনের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহর সর্বত্রই বিবেচনায় আনা হয়েছে।

৬) গ্রন্থাগারগুলির পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি ও পাঠক পরিষেবা বৃদ্ধির জন্য ১৬ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকাদের বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

৭) বয়সের সীমারেখা না রেখে সব বয়সের নবসাক্ষর পাঠকদের বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগারের সদস্যপদ গ্রহণ ও পড়াশোনার সুযোগ করা হয়েছে।

৮) পুস্তক, পত্র-পত্রিকা খাতে নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। এছাড়া আসবাব, বই বাঁধাইও অন্যান্য খরচের নির্দিষ্ট অনুদানের ব্যবস্থা এবং বিল্ডিং বা শৌচাগার খাতেও টাকা অনুমোদিত হয়েছে যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্য খরচের বরাদ্দ আগের তুলনায় অপ্রতুল। গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্য খরচের বরাদ্দ আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে জেলা গ্রন্থাগারের জন্য মোট ৭০,০০০.০০, মহঃ/শহর গ্রন্থাগার ১৩,৫০০.০০ ও গ্রামীণ/প্রাইমারি ইউনিট গ্রন্থাগারের জন্য ৬০০০ টাকা। গত (১৯৯৭-৯৮) বৎসর পুস্তক ক্রয়ের খাতে কিছু বেশি অর্থ বরাদ্দ হয়েছে।

৯) কর্মিগণের বেতন ও পদমর্যাদা যথেষ্ট বেড়েছে, সরকারি কর্মচারিদের ন্যায় বেতন ও ভাতাদি, অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা সার্ভিস রুল প্রভৃতি চালু রয়েছে। যদিও বেতন প্রদানের পদ্ধতি কিছুটা সহজ হয়েছে, তবু মাস পয়লা বেতনদানের পদ্ধতিগত ত্রুটির ফলে মাস পয়লা বেতন পাওয়া যায় না। সরকারি সমস্তরকম সুযোগ-সুবিধা এখনও সম্পূর্ণভাবে সম্প্রসারিত নয়।

১০) কর্মিগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতি চালু হয়েছে এবং কর্মিগণ জেলার LLA-র কর্মি হিসাবে স্বীকৃত।

১১) পুস্তক ক্রয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট পুস্তক ক্রয় নীতি চালু হয়েছে এবং জনসাধারণকে পুস্তকমনা করার জন্য সংগঠিত হচ্ছে সরকারি উদ্যোগ LLA পরিচালিত জেলা পুস্তক মেলা। এই মেলা মধ্যে মধ্যে অনিয়মিত হলেও বর্তমানে জেলার বিভিন্ন শহরে স্বাধীন মেলা হিসেবে বছরে বছরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

১২) রাজ্য পুস্তক মেলার বরাদ্দ অর্থের ক্রীত বইও এই জেলায় প্রতি বৎসর দেওয়া হয় এবং রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন থেকে বই ও Matching grant হিসেবে গৃহ সংস্কার ও নির্মাণের জন্য এবং আসবাব ক্রয় ও Mobile Section খোলার জন্য গ্রান্টও এই জেলার গ্রন্থাগারগুলিকে পরিষেবার প্রসারে সাহায্য করছে।

১৩) যদিও গ্রন্থযানের সমস্যা আছে তবু এই জেলার জেলা গ্রন্থাগারের ভ্রাম্যমাণ বিভাগ চালু রাখার বিকল্প পদ্ধতির কথা চিন্তা করছে।

জেলার গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থ সংগ্রহের তথ্য :

মেদিনীপুর জেলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত ও সরকারি গ্রন্থাগারগুলি (গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর, পঃবঃ) তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। ১) জেলা গ্রন্থাগার, ২) মহকুমা বা শহর

গ্রন্থাগার, ৩) গ্রামীণ বা প্রাইমারি ইউনিট গ্রন্থাগার। এই গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে ১৫টি বর্তমানে উন্নীত হয়ে শহর গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়েছে। স্তরভেদে গ্রন্থাগারগুলির পুস্তকসংখ্যা দেখা যায় (নথিভুক্ত অনুযায়ী) :

জেলা গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর—৪০,০০০ (এর মধ্যে ৫০০-র অধিক পুস্তক নবগঠিত বৃত্তিসহায়ক পাঠকেন্দ্রে পৃথকভাবে রক্ষিত আছে)। এছাড়া রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের দান করা প্রায় ২০০০ হিন্দি ও কিছু ইংরেজি ভাষার পুস্তক এখনও নথিভুক্ত করার কাজ চলছে।

জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক—৩২,০০০-এর মধ্যে কিছু বৃত্তি সহায়ক পাঠকেন্দ্রে পৃথক রক্ষিত, এবং বেশ কিছু পুস্তক নথিভুক্ত করার কাজ চলছে।

মহকুমা বা শহর গ্রন্থাগার (১০টি)—এগুলির মধ্যে ৫টি ১৯৮১-র পূর্বে এবং ১৯৮১-র পরে ৫টি স্থাপিত/পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত হয়। এগুলিতে পূর্বের ৫টি মহকুমা বা শহর গ্রন্থাগারে ১৩,০০০/১৫,০০০ পুস্তক পাঠক পরিষেবার জন্য সজ্জিত আছে এবং এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৯৮১-র পরের গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক ভাণ্ডার খুবই আশাপ্রদ না হলেও ৫,৫০০-র নিম্নে নয়। কোনটির আবার ১০,০০০ অতিক্রম করার পথে।

শহর গ্রন্থাগার (উন্নীত)—১৫টিতে পুস্তক সংখ্যা ৬,০০০ থেকে ৯,০০০ পর্যন্ত পাঠক পরিষেবার জন্য নথিভুক্ত করা আছে। তবে এই সকল গ্রন্থাগার কেবলমাত্র ১৯৯২-এর পর থেকে শহর গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্রয়ের অনুদানের হারে পুস্তক ক্রয় করার পর পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ্রামীণ/প্রাইমারি ইউনিট গ্রন্থাগার : মেদিনীপুর জেলায় যে সমস্ত গ্রামীণ গ্রন্থাগার ১৯৮১-র পূর্বে স্থাপিত বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিতভাবে স্বীকৃত সেগুলির পুস্তক সংখ্যা কোনটিতে ৫,৫০০-র কম নয়। কোনটায় আবার ১০/১২ হাজারও দেখা যায়। কিন্তু ১৯৮১-র পরের গ্রন্থাগারগুলিতে বেশির ভাগ ৩,৫০০ থেকে ৫,৫০০ পর্যন্ত। ২/৪টির পুস্তক সংখ্যা ব্যতিক্রম হিসেবে ৩,৫০০-র নিম্নে দেখা যায়।

আবার ১৯৯৯ সালে নতুনভাবে ৯টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে, সেগুলির বর্তমান সংখ্যা ১,৫০০-র বেশি নয়। পরিবেশগত সমীক্ষা অনুসারে পুস্তক সংখ্যার তথ্য দেওয়ার পর পত্র-পত্রিকার তথ্য দেওয়া যেতে পারে। পত্র-পত্রিকা :

জেলা গ্রন্থাগারগুলিতে দৈনিক সংবাদপত্র (ইংরেজি ও বাংলা) যেগুলি জাতীয় সংবাদপত্র স্বীকৃত সেগুলির (আনন্দবাজার, আজকাল, বর্তমান, প্রতিদিন, গণশক্তি প্রভৃতি এবং Telegraph, Hindusthan Standard, Amrita Bazar প্রভৃতি) মোট সংখ্যা কমপক্ষে ৮টির বেশি এবং সমস্ত স্থানীয় পত্রিকা পাঠক পরিষেবার জন্য রাখা হয়েছে এবং মাসিক/ত্রৈমাসিক/পাক্ষিক পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় ৩০/৪০টির কম নয়। এগুলির কিছু সরকারি ও কিছু বেসরকারি।

মহকুমা বা শহর গ্রন্থাগারগুলিতে দৈনিক সংবাদপত্র কোথাও ২টি আবার কোথাও ৫টি দেখা যায়। পত্র-পত্রিকা (মাসিক/পাক্ষিক/ত্রৈমাসিক) ১০/২০টি দেখা যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকের উপযোগী গ্রন্থাগারগুলি পত্রিকা ভাণ্ডারসমৃদ্ধ। আর গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে সাধারণ অনুদান কম থাকায় দৈনিক সংবাদপত্র ১/২ থাকে। পত্রিকা স্থানীয় মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী ৭/১০টি দেখা যায়। শহর ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে স্থানীয় সংবাদপত্র/পত্রিকা রাখার প্রবণতা রয়েছে।

কাঁথি মহকুমা এবং পাশের হলদিয়া/তমলুকের কিয়দংশে তীরভূমি, দৈনিক চেতনা পত্রিকা বহুল সংরক্ষিত। তমলুক মহকুমার সিগন্যাল, প্রদীপ প্রভৃতি দেখা যায় আবার মেদিনীপুরে সব্যসাচী, মেদিনীপুর টাইমস, ছাপা খবর প্রভৃতি পত্রিকা মহকুমার গ্রন্থাগারগুলিতে প্রায়ই সংরক্ষিত রয়েছে।

তবে গ্রন্থাগারগুলিতে নিজস্ব কোনো পত্র/পত্রিকা প্রকাশনা দেখা যায় না। প্রকাশিত হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের স্মরণিকা বা বার্ষিক বিবরণী যা জেলার গ্রন্থাগার পরিষেবাগত তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে।

জেলার একমাত্র সরকারি গ্রন্থাগার 'দীঘা সরকারি গ্রন্থাগার' বর্তমানে ভগ্নদশা গৃহ থেকে জনবহুল স্থানে স্থানান্তরিত করার কাজ চলছে। এটি একটি শহর মহকুমার সমপর্যায়ের মর্যাদাসম্পন্ন। এতে পুস্তক সংখ্যা ও পত্র-পত্রিকা সংখ্যা অন্যান্য শহর গ্রন্থাগারের সমপর্যায়। এটা সম্পূর্ণ সরকারি নিয়মে পরিচালিত হয়। এই গ্রন্থাগার স্থানীয় মানুষজন সহ দীঘা ভ্রমণকারীদের একমাত্র পাঠক পরিষেবা দেয়। এবং এটা একটি Non Lending Library কেবলমাত্র পাঠকক্ষে পড়ার সুযোগ রয়েছে।

জেলার তিনস্তরের গ্রন্থাগারগুলির কয়েকটির পরিষেবাগত বিবরণী :

জেলা গ্রন্থাগার মেদিনীপুর :

এই জেলা গ্রন্থাগারটি জেলার সর্বোচ্চ স্তরের গ্রন্থাগার। এটা একটি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত গ্রন্থাগার জেলা শহরের মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগর রোডের উপর অবস্থিত। এটা তৎকালীন বিদ্যোৎসাহী সরকারি অফিসার ও স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী জনের ঐকান্তিক চেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালে। প্রথমে এটা District Library Book Centre নামে চালু হয়। পরবর্তীকালে এটা পূর্ণাঙ্গ জেলা গ্রন্থাগাররূপে বর্তমান গৃহে তৎকালীন পঃবঃ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ১০ অক্টোবর, ১৯৬১ সালে উদ্বোধনে স্থানান্তরিত হয়। এই জেলা গ্রন্থাগারের বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ৪০,০০০-এর অধিক। যদিও এর পরিষেবাগত মান দীর্ঘদিন কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। বর্তমানে কিন্তু এটি যথেষ্ট উন্নতির দাবি রাখে। বর্তমানে এই জেলা

গৌরা গ্রন্থাগার　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　সৌজন্যে : দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থাগারে ৭/৮টি জাতীয় সংবাদপত্র এবং প্রায় সবগুলি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা ও প্রায় বেসরকারি ও সরকারি প্রকাশিত ২৫/৩০টি সাময়িক পত্রিকা সংবলিত পূর্ণাঙ্গ পাঠকক্ষ পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এখানে ১৯৯৯ সাল থেকে বর্তমান পঃবঃ সরকারের নতুন গ্রন্থাগার পরিষেবাগত নির্দেশ অনুযায়ী একটি পৃথক কক্ষে বৃত্তিসহায়ক পাঠকেন্দ্র (Career Guidence Centre) খোলা হয়েছে। এবং সেখানে গ্রন্থাগারে এই জাতীয় সহায়ক সম্ভার ছাড়াও ৪০,০০০ টাকার বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পরীক্ষার্থীর উপযোগী সমস্ত বিষয়ের পুস্তক মুক্ততাক মঞ্চের সজ্জা অনুসারে পাঠকক্ষের পরিষেবা দেওয়ার কাজ চলছে। এছাড়া ওই বিভাগ দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা Counsilling-ও করা হয় যদিও পূর্বে District Library Association বা Adminstration বা Adhoc Committee দ্বারা এই গ্রন্থাগার পরিচালিত হতো কিন্তু বর্তমানে ১৯৯৯ সাল থেকে পঃবঃ সরকারের গ্রন্থাগার আইন অনুসারে কার্যকরী সমিতি (Managing Committee) গঠিত হয়েছে ও সরকারি নিয়ম অনুসারে গ্রন্থাগারিকই সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করেন এবং এই কমিটি কয়েকটি উপসমিতি করে তার সাহায্যে গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নয়ন অব্যাহত রেখেছেন। বর্তমানে গড়ে দৈনিক পুস্তক লেনদেনের সংখ্যা ৬০/৬৫ হলেও পাঠকক্ষ ও বিভিন্ন বিভাগ মিলিয়ে তিন শতাধিক পাঠক/পাঠিকা পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এবং সদস্যসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিশু ও বয়স্ক নবসাক্ষরদের বিনা খরচে সদস্যপদ পাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। Career Guidence Centre-এ বিনা খরচে পাঠক নথিভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে Lending বিভাগে সাধারণ সদস্যসংখ্যা ১১০০ এবং শিশুসদস্য ২৫০ এবং Career Guidence Centre-এ ৪৫০ নিয়মিতভাবে গৃহসংস্কার ও বাহ্যিক পরিবেশ পাঠক/পাঠিকা আকর্ষণের উপযোগী করার পর আভ্যন্তরীণ পরিষেবাগত উন্নতি জন্য Computerised Catalouge তৈরির প্রথম ধাপ হিসাবে Stock Verification-এর কাজ চলছে। খুব শীঘ্রই Computerised Service দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সবথেকে যা উল্লেখযোগ্য পাঠক পরিষেবার স্বার্থে এখানে নিয়মিত পাঠকসভা আহ্বান এবং পাঠকের পরামর্শ নেওয়া হয়। কর্মী অপ্রতুলতা থাকলেও গ্রন্থাগার পরিষেবার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক

এটি মেদিনীপুর জেলার একটি অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার। জেলার ঐতিহাসিক শহর তমলুকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পাশেই অবস্থিত ১৯৫৬ সাল থেকে এই গ্রন্থাগার পরিষেবা দিয়ে

দিয়সাল গ্রন্থাগার সৌজন্যে : দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

আসছে। এই জেলা গ্রন্থাগারও প্রথমে District Library Book Centre নামে পরিষেবা শুরু হয়। পরে ১৯৬২ সাল থেকে নবনির্মিত গৃহে পূর্ণাঙ্গ পরিষেবার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এই গ্রন্থাগারে বর্তমান সদস্যসংখ্যা নথিভুক্ত ২,৪০০ আজ পর্যন্ত নথিভুক্ত। তবে প্রকৃত নবীকৃত সদস্য পাঁচশতাধিক। শিশু সদস্যরা এখানেও বিনা খরচে পুস্তক লেনদেনের সুযোগ পেতে পারে। পঃবঃ সরকার পোষিত জেলা গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগের পরিষেবার সঙ্গে সঙ্গে এখানে বৃত্তি সহায়ক পাঠকেন্দ্র খোলা হয়েছে। যদিও এই ধরনের পাঠকের সংখ্যা এখানে এখনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়নি তবে মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে। দৈনিক গড়ে প্রায় ৩০/৪০ জন Lending Section-এ পুস্তক লেনদেন করেন। এছাড়া পাঠকক্ষেও খবরের কাগজ পড়ার ভিড় যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এই জেলা গ্রন্থাগারের নথিভুক্ত পুস্তক সংখ্যা ৩২,০০০ হলেও এখনও কিছু সংখ্যক পুস্তক নথিভুক্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষমাণ। গ্রন্থাগারটি ১৯৯৫ সাল থেকে গ্রন্থাগার আইন অনুযায়ী Managing Committee দ্বারা পরিচালিত ও পঃবঃ সরকারের আইন অনুযায়ী গ্রন্থাগারিক সম্পাদকের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। বর্তমানে গ্রন্থাগারটি ত্রিতল গৃহে রূপান্তরিত হয়েছে। গৃহের (হলঘরে) গ্রন্থাগারের প্রয়োজনে এবং সামান্য অর্থের বিনিময়ে স্থানীয় জনসাধারণ বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার সুযোগ পান।

রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার : (শহর গ্রন্থাগার)

এই গ্রন্থাগারটি ভারতের সর্বপেক্ষা প্রাচীন সাধারণ গ্রন্থাগার। মেদিনীপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র ঋষি রাজনারায়ণ বসু দ্বারা স্থাপিত। এককালে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আখড়া ও শিক্ষার স্থান ছিল। গ্রন্থাগারটি ১৮৫১ সালে স্থাপিত হলেও স্বাধীনতার পরে ১৯৬১ সালে পঃবঃ সরকার পোষিত হয়। এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ১৫০ বৎসর জন্মদিবস পূর্তি উপলক্ষে ১৯৮৬ সালে উন্নীত শহর গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয় এবং ১৯৯২ সাল থেকে শহর গ্রন্থাগারের জন্য দেয় সরকারি অনুদান পেয়ে বর্ধিত পরিষেবা দিয়ে আসছে। বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ১২,৭৫০ ও নথিভুক্ত সদস্যসংখ্যা ২০৩০ হলেও নিয়মিতকরণ বা নবীকৃত সদস্য ৪০০-র বেশি নয়। এই গ্রন্থাগারে পাঠক পরিষেবার জন্য ১২,৭৫০টি পুস্তক সহ দৈনিক বর্তমানে ৭টি খবরের কাগজ ও ৭/৮টি পত্র-পত্রিকা সংগ্রহে রাখা হয়। এবং দৈনিক গড় ৬০/৭০ জন পাঠক/পাঠিকার ভিড় দেখা যায়। পুস্তক লেনদেন সংখ্যা ২২/২৫। এই গ্রন্থাগারে ২৬৭টি Rare Book বা দুষ্প্রাপ্য পুস্তক আছে এবং ২৩টি পাণ্ডুলিপি গচ্ছিত রয়েছে। এই গ্রন্থাগারে রাজনারায়ণ বসুর জন্মদিন প্রতিপালিত হয়। বর্তমানে গৃহ সংস্কারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

কুয়াই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরি (শহর গ্রন্থাগার)

এই গ্রন্থাগারটি ১.১.১৯৫৫ সালে নেড়াদেউলের সংলগ্ন কুয়াই গ্রামে স্থাপিত হলেও পরে এটি ১৯৮৬ সালে গ্রামীণ গ্রন্থাগার থেকে শহর গ্রন্থাগারে উন্নীত হয়। বর্তমানে পুস্তক সংখ্যা ৬০০০-এর অধিক। পাঠক পরিষেবার জন্য এখানে ২টি দৈনিক সংবাদপত্র ও ১০/১২টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। দৈনন্দিন প্রায় ৪০/৪৫ জন পাঠকের ভিড় দেখা যায় এবং প্রায় পুস্তক লেনদেন সংখ্যা গড়ে ২৫ এবং সদস্যসংখ্যা ৫১২। এই গ্রন্থাগারে সাক্ষরতার বাহক হিসাবে বিদ্যাসাগর জনচেতনা কেন্দ্র পরিচালিত হয়। গ্রন্থাগারটি শিশু ও অনুলয় বিভাগ দ্বারা পরিপুষ্ট এবং যাত্রা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এটা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউণ্ডেশন দ্বারা আর্থিক অনুদানে দ্বিতল গৃহে রূপান্তরিত হয়েছে।

এই জেলার শহর গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কাঁথি ক্লাব মহকুমা গ্রন্থাগার, ঝাড়গ্রামে আলাপনী গ্রন্থাগার, মহিষাদলে প্রজ্ঞানন্দ স্মৃতি পাঠাগার, ক্ষীরপাইতে হালওয়াশিয়া শহর গ্রন্থাগার, ঘাটালে ঘাটাল শহর গ্রন্থাগার, এগরায় এগরা সাধারণ পাঠাগার (শহর গ্রন্থাগার) পরিষেবার দিক থেকে ও পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকা ভাণ্ডারে খুবই উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কয়েকটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পরিষেবা দেওয়া গেল।

বালিচকে ক্লাব রুর‍্যাল লাইব্রেরি

এটা বালিচক বাজারে ১৯৫৬ সালে স্থাপিত হয়, পরে ১৯৬১ সালে পঃবঃ সরকার পোষিত হয়। পুস্তক ভাণ্ডারে ৫৪০০-র অধিক পুস্তক রয়েছে। প্রায় ৮৫০০ পত্র-পত্রিকা রয়েছে। প্রতিদিন নিয়মিত ৩টি খবরের কাগজ ও ৪টি সাময়িক পত্র-পত্রিকা থাকে। বর্তমান সদস্যসংখ্যা প্রায় ৫০০ এবং দৈনিক ৪০/৪৫টি পুস্তক লেনদেন হয়। এই গ্রন্থাগারে ৩০/৪০টি দুষ্প্রাপ্য পুস্তক আছে। এটা কার্যকরী সমিতি দ্বারা পরিচালিত। যদিও এখানে নবসাক্ষর শিশুপাঠের সুযোগ-সুবিধা হয়েছে। গ্রন্থাগার দুটি এখনও কাঁচা বাড়ি।

সাতপাটি শীতলা পাঠাগার

এটা মেদিনীপুর (সদর) মহকুমার সাতপাটি গ্রামে (শালবনী ব্লকে) ১৯৫৫ সালে স্থাপিত হলেও ১৯৮১ সালে পঃবঃ সরকার পোষিত গ্রন্থাগাররূপে অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে পুস্তক সংখ্যা প্রায় ২৬০০ এবং ১টি খবরের কাগজ ও ৫টি সাময়িক পত্র/পত্রিকা রাখা হয়। যদিও নথিভুক্ত সদস্য ২৫০০, কিন্তু বর্তমান নবীকৃত সদস্য মাত্র ১৫০। কার্যকরী সমিতি দ্বারা পরিচালিত। দৈনিক ১৫/২০টি পুস্তক লেনদেন হলেও নিয়মিত পাঠক প্রায় ৩০ জন। গ্রন্থাগারটি পাকা গৃহ।

প্রোগ্রেসিভ স্টাডি সেন্টার ঝাড়গ্রাম

এটা একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সমতুল ঝাড়গ্রাম পৌরসভা এলাকায় প্রাথমিক একক (Primary Unit) গ্রন্থাগার। যদিও গ্রন্থাগারটি ১৯৭৮ সালে স্থাপিত। দীর্ঘদিন পরে ১৯৮১ সালে পঃবঃ সরকার পোষিত গ্রন্থাগাররূপে অনুমোদিত হয়। পুস্তক সংখ্যা বর্তমানে ৩৩০০। এখানে ১টি দৈনিক খবরের কাগজ ও ৮টি সাময়িক পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। গ্রন্থাগারটি শহরের অভ্যন্তরে আঞ্চলিক ভিত্তিতে গ্রন্থাগার পরিষেবা দিয়ে আসছে। বর্তমানে পরিচালক সমিতি দ্বারা পরিচালিত এবং গ্রন্থাগারের উদ্যোগ বছরে ৫/৬টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জনসাধারণের প্রতি গ্রন্থাগার পরিষেবা আকৃষ্ট করে।

নমুনা হিসাবে ২টি জেলা গ্রন্থাগার, ২টি শহর গ্রন্থাগার, ২টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও সমতুল একটি প্রাইমারি ইউনিট গ্রন্থাগারের পরিষেবার বিবরণী দিলেও বহু খ্যাতনামা ও পরিষেবাগত উন্নত গ্রন্থাগারের বিবরণী দেওয়া গেল না, যারা মেদিনীপুর জেলার রাঙামাটির দেশ থেকে সাগর সৈকত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে সাধারণের শিক্ষায় ধারক ও বাহকরূপে নিজ নিজ এলাকায় খ্যাতির সঙ্গে পাঠক পরিষেবা অব্যাহত রেখেছে।

তথ্যসূত্র :

১। যোগেশচন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১৩৪১।
২। বঙ্গ সাহিত্য পরিষদ, ভারতকোষ, খণ্ড-২, ১৩৭১।
৩। তরুণদেব ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ দর্শন, ১৯৭৯।
৪। বসন্তকুমার দাস, স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, ১৯৮০।
৫। হরিসাধন দাস, রিসোর্স অফ্ মেদিনীপুর, ১৯৮৮।
৬। District Gazatter, Midnapore, Govt. of W.B. 1984.
৭। মেদিনীপুর জেলা পরিষদ।
৮। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, মেদিনীপুর।
৯। Bureau of Applied Economic & Statistics, Key to the Statistics of District Midnapore. District Statistical Officer, Midnapore. 1991.
১০। The 'Chetana' Daily News Paper published from Contai.
১১। The 'Ankush' Daily News paper published from Egra.
১২। মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থমেলা স্মরণিকা, ১৯৯২-৯৩।
১৩। ধনঞ্জয় দাস, ব্রেখটের কবিতা, ১৯৮২।

সহায়ক গ্রন্থ :

১ মেদিনীপুর : ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন / বিনোদশংকর দাস
২ পশ্চিমবঙ্গ : বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা
৩ বিষয় : সাধারণের গ্রন্থাগার / নির্মলচন্দ্র চৌধুরী
৪ গ্রন্থাগার : বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৫, ১৩৮১
৫ গ্রন্থাগার : বর্ষ ৩১, সংখ্যা ৩-৪, ১৩৮৮
৬ Census of India 2001 Series 20 W.B.
৭ সাধারণের গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে / শিবানন্দ পাল

লেখক : প্রথম জন— জেলা গ্রন্থাগারিক
দ্বিতীয় জন—যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক
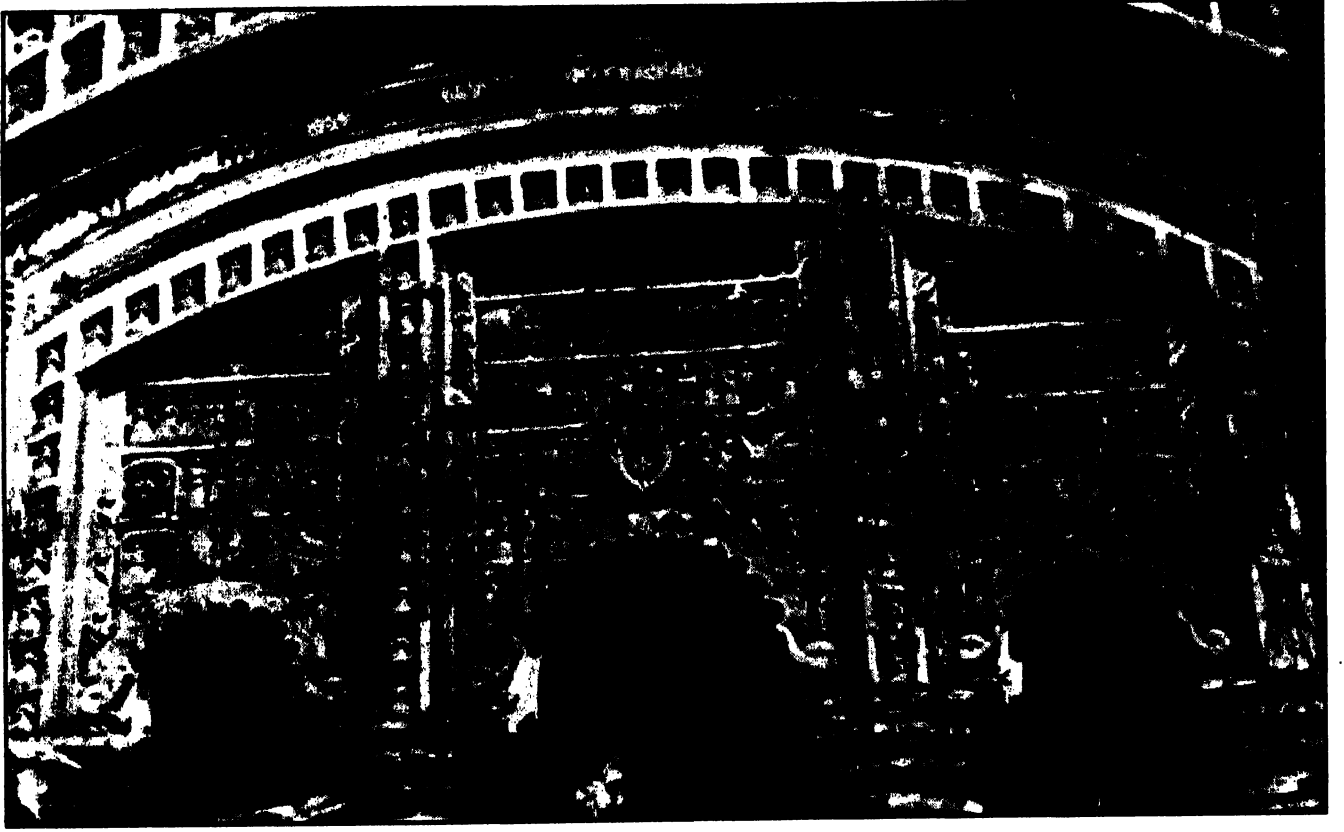
১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে দাসপুরের খ্যাতনামা সূত্রধর শিল্পী ঠাকুরদাস শীল নির্মিত রাসবিহারী চক্রবর্তীর দধিবামনজীউয়ের পঞ্চরত্ন ইটের মন্দির, দেওয়ালে টেরাকোটা অলঙ্করণ

ছবি : ত্রিপুরা বসু

সীতারাম জীউ মন্দির সূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন দৃশ্য, আমোদপুর

ছবি : তারাপদ সাঁতরা
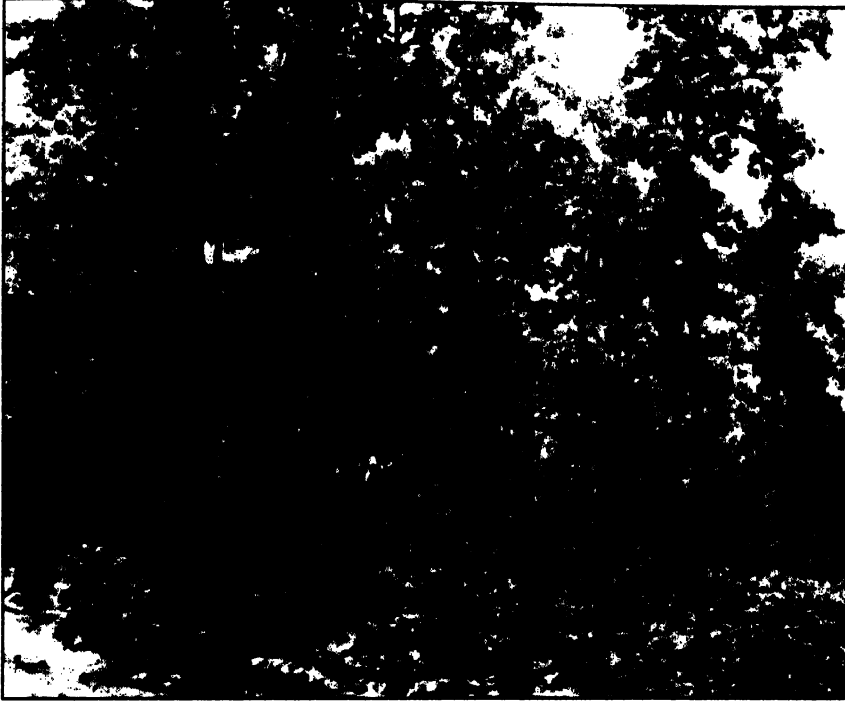
বনসৃজন, শালগাছের বন

মেদিনীপুর জেলার ভূ-প্রকৃতি

মদনমোহন পাল

পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুর। ২১°৩৬ থেকে ২২°৫৭ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৬°৩৩ থেকে ৮৮°১১ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে এই জেলার ভৌগোলিক অবস্থান। আয়তনে ১৪,০৮১ বর্গকিলোমিটার, যা সারা পশ্চিমবঙ্গের আয়তনের ১৫.৮৬ শতাংশ। আকৃতিগত দিক থেকে অনেকটা আয়তক্ষেত্রের মত। উত্তর-পশ্চিম দক্ষিণ-পূর্বে লম্বা। বৈচিত্র্যময় জেলার ভূ-প্রকৃতি।

ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও তারতম্যের দিক থেকে জেলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশ ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্ব কিনারায় অবস্থিত এবং কঠিন 'ল্যাটেরাইট' শিলার আস্তরণে ঢাকা। নবীন পলি দিয়ে গঠিত জেলার পূর্বাংশ। দক্ষিণাংশ সমুদ্র উপকূলের বালুকাময় সমভূমির অন্তর্ভুক্ত। যে চারটি প্রধান নদী দিয়ে জেলার নদী বিন্যাস তারা হল হুগলি, কাসাই, রূপনারায়ণ এবং সুবর্ণরেখা। যেহেতু জেলার সাধারণ ভূমি-ঢাল উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে, নদীগুলির গতি প্রবাহ তাই দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখী।

কোনও অঞ্চল বা স্থানের ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতই সর্বাগ্রে যা আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে তা হল সেই অঞ্চল বা স্থানের ভূ-তাত্ত্বিক চরিত্র অর্থাৎ কিরূপ শিলা দিয়ে তৈরি তার ভূ-ত্বক। কারণ এই ভূ-তাত্ত্বিক কাঠামো-কে ভিত্তি করেই বিভিন্ন ভূমিরূপের সৃষ্টি। সে দিক থেকে মেদিনীপুর জেলার ভূ-তাত্ত্বিক চরিত্র পর্যালোচনা করলে জানা যায় এই জেলার অবস্থানকারী শিলা-

লালমাটির অঞ্চল, মেদিনীপুর ছবি : কৌশিক সেনগুপ্ত
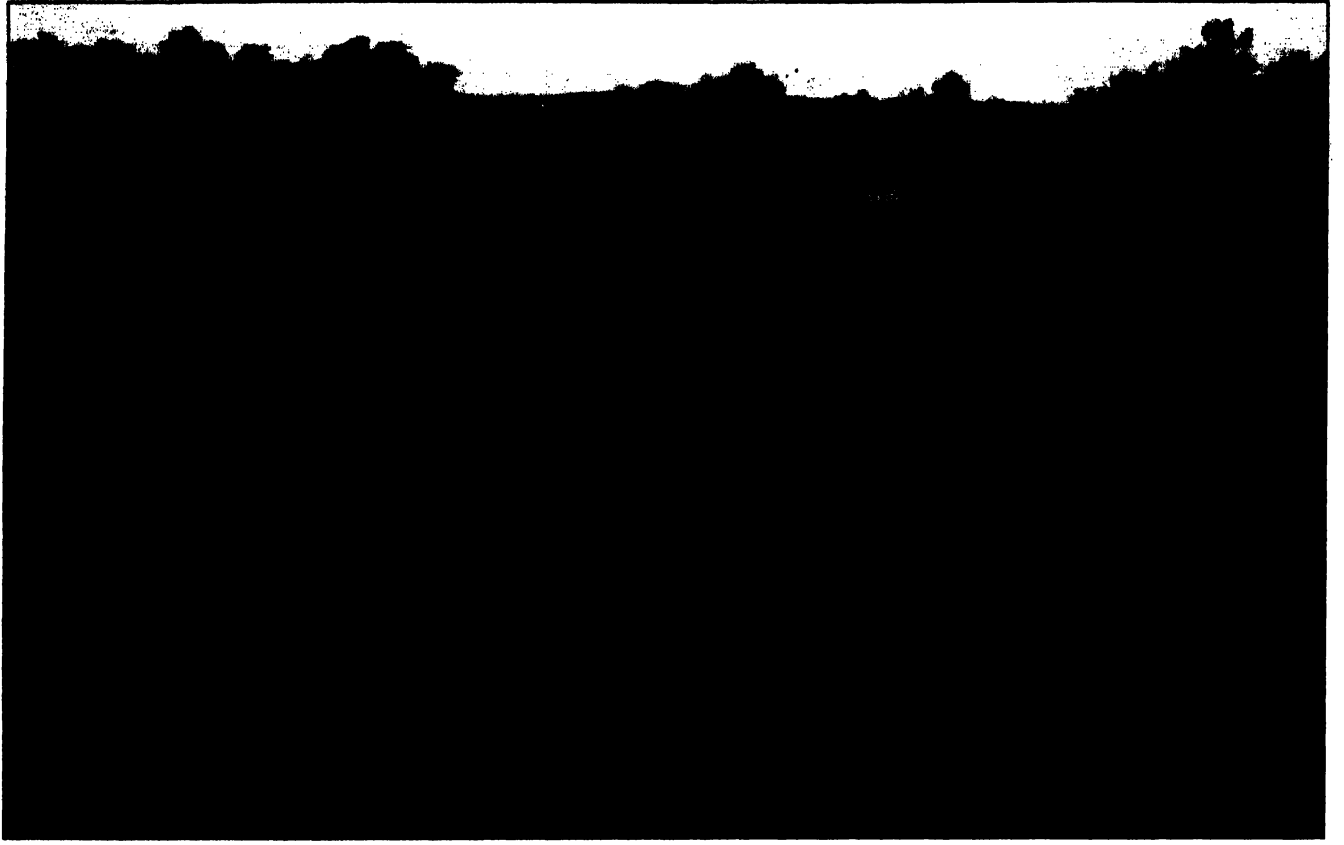
সমূহের গঠনের ইতিহাস 'রিসেন্ট' (হোলোসিন), 'প্লিস্টোসিন', 'প্লায়োসিন', 'মায়োসিন', প্রভৃতি ভূ-তাত্ত্বিক সময়কালের মধ্যে। সাধারণভাবে সমগ্র জেলার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ স্থান জুড়ে রয়েছে 'রিসেন্ট এলুভিয়াম'। তারপরই স্থান 'ল্যাটারাইটের। অন্যান্য শিলাসমূহ হল 'কংলোমারেট', 'এপিডায়োরাইট' এবং 'নিস'। জেলার পশ্চিমাংশে এদের অবস্থান। শিলাগুলি বয়সে অতি প্রাচীন। শক্ত ও পাথুরে। চাষের সম্পূর্ণ অনুপোযোগী। প্রথম মানচিত্রটিতে জেলার ভূ-তাত্ত্বিক গঠন এবং প্রধান নদীগুলির অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে।

উত্তরে গড়বেতা থেকে মেদিনীপুর, খড়্গপুর হয়ে দক্ষিণে দাঁতন পর্যন্ত যে রাজ্যসড়কটি অথবা এরই সমান্তরাল রেলপথটি বিদ্যমান তাকেই জেলার দু'টি প্রধান ভূমিরূপের বিভাজন রেখা হিসেবে ধরা যেতে পারে। এই রেখার পূর্বদিকে জেলার যে ভূমিভাগ তা সমতল ও পলিগঠিত, জমি উর্বর ও কৃষিযোগ্য। অপরদিকে রেখার পশ্চিমের ভূ-প্রকৃতি ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমির অংশ এবং তরঙ্গায়িত উচ্চভূমি যা ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলেরই সম্প্রসারণ। উঁচু পাহাড়ি জমি ধাপে ধাপে প্রায় নেমে গেছে পূর্বদিকে।

মেদিনীপুর জেলার ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে সমতল এলাকা ও তরঙ্গায়িত উচ্চভূমির মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও জেলার ভূ-তত্ত্ব, মৃত্তিকা, স্থানীয় ভূ-বৈচিত্র্য, জলবায়ু এবং স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের অবস্থানের ভিত্তিতে সমগ্র জেলাটিকে পাঁচটি পৃথক ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—(১) শিলাই সমভূমি, (২) নিম্ন কাসাই সমভূমি, (৩) মেদিনীপুর উচ্চভূমি, (৪) কাঁথি সমভূমি এবং (৫) দীঘা উপকূল সমভূমি। দ্বিতীয় মানচিত্রে এই ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগগুলি সুস্পষ্টভাবে দেখান হয়েছে।

(১) শিলাই সমভূমি

জেলার উত্তরাংশে বাঁকুড়া জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা এই সমভূমির অন্তর্গত। উত্তরে শিলাই ও দক্ষিণে কাসাই নদীর মধ্যবর্তী অধিকাংশ স্থান জুড়ে এই অঞ্চল। ল্যাটেরাইট শিলা দিয়ে তৈরি ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্ব প্রান্তভাগের এটি একটি অংশ। প্রায় ২৫২৮.৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে এই সমভূমির বিস্তার। মৃদু তরঙ্গায়িত নিম্ন উচ্চতার ছোট ছোট কয়েকটি পাহাড়শ্রেণী এখানকার ভূমিরূপের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতার তারতম্য ৩৫.৯ মিটার থেকে ৪১.৮ মিটারের মধ্যে। শিলাই এলাকার প্রধান নদী। পুরুলিয়া জেলা থেকে আগত শিলাই বাঁকুড়া জেলা হয়ে মেদিনীপুরের গড়বেতা ২নং ব্লকে প্রবেশ করেছে। কিছু দূর পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হওয়ার পর শিলাই দক্ষিণ-পূর্বদিকে বাঁক নিয়ে চন্দ্রকোণা ১নং ও ২নং ব্লক, ঘাটাল ও দাসপুর ১নং ব্লকের সীমানা ধরে

পুনরায় পূর্বাভিমুখী হয়ে ঘাটাল শহরের ৫ কিলোমিটার পূর্বে রূপনারায়ণ নদে মিশেছে। নিম্নগতিতে শিলাই-এর তলদেশ ক্রমাগত পলি জমার ফলে উঁচু হতে থাকায় এবং বর্ষাকালে জলধারণের ক্ষমতা হারানোয় দাসপুর ১নং ব্লকের ও ঘাটাল ব্লকের কিয়দংশ প্রায়ই বন্যাকবলিত হয়ে পড়ে। অঞ্চলটি স্থায়ীভাবে ভূ-প্রাকৃতিক দিক থেকে অবনমিত স্থান (ডিপ্রেশান) হিসেবে পরিচিত হয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এ অঞ্চলের গড় উচ্চতা মাত্র ৯ মিটারের মধ্যে। শিলাই সমভূমির উত্তরাংশের উচ্চভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা অগভীর কৃষ্ণ, বাদামী এবং লাল বালুকাময়। পলি ও বাদামী রঙের মৃত্তিকা দেখা যায় এই সমভূমি অঞ্চলের দক্ষিণাংশে। উত্তরের উচ্চভূমি অঞ্চলে ঘন গুল্মভূমি ও বামনজাতীয় শালবৃক্ষের জঙ্গল দেখা যায়। গড়বেতা ১নং ও ২নং ব্লক, বিনপুর ১নং ব্লকের কিছু অংশ, চন্দ্রকোণা ১নং ও ২নং ব্লক, ঘাটাল, দাসপুর ১নং ব্লকের কিয়দংশ এই প্রাকৃতিক অঞ্চলটির মধ্যে অবস্থিত। এই অংশে আরও বেশ কিছু নদী-নালার অবস্থান পরিলক্ষিত হয় এবং তারা অঞ্চলের স্থানীয় ভূমিভাগকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। বেতাল, পুরন্দর, কুবাই, তানুগাই প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর নাম উল্লেখযোগ্য।

(২) নিম্ন কাসাই সমভূমি

বৈচিত্র্যময় নিম্ন কাসাই সমভূমির ভূ-প্রকৃতি। এই ভূ-ভাগটি কাসাই নদীর প্রবাহকে কেন্দ্র করে নদীর উভয়তীর ব্যাপী বিস্তৃত। কিছু অংশ জেলার পূর্বদিকের প্রাকৃতিক সীমারেখা রূপনারায়ণ নদের ডানতীর নিয়ে গঠিত। এই অঞ্চলের পূর্বদিকের রূপনারায়ণ নদ এবং হুগলি নদী তীরবর্তী অংশে পূর্ণমাত্রায় 'ব-দ্বীপ সমভূমির' বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এই অংশে জোয়ার-ভাঁটার প্রভাব বেশ সক্রিয়। অঞ্চলটি একটি লম্বাকৃতি অবনমিত স্থান। সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অঞ্চলটির পূর্বদিক একটি ত্রি-কোণ ভূমির আকার ধারণ করেছে, যার ভূমিরেখা রূপনারায়ণ নদ তমলুক থেকে উত্তরে ঘাটাল এবং দক্ষিণে মহিষাদল পর্যন্ত অবস্থান করছে এবং অগ্রভাগ একটি সংকীর্ণ এলাকা, যা মেদিনীপুর শহরের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। ত্রিভূজাকার এই অবনমিত স্থানটি কাসাই ও শিলাই-এর মিলিত ব-দ্বীপ সমভূমি দিয়ে গঠিত। অঞ্চলটি আরও অনেক নদী-নালা দিয়ে খণ্ডিত। হলদিয়া মহকুমার সীমানায় মহিষাদল ১নং ব্লকের পশ্চিম প্রান্তে কাসাই-এর ডানতীরে এসে মিলেছে কালিঘাই নদী। এই স্থান থেকে কাসাই-এর নিম্নগতি হলদি নদী নামে পরিচিত। কাসাই নদীর তলদেশে ক্রমাগত পলি সঞ্চয়ের ফলে নদীর নাব্যতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়েছে এবং কাসাই ও কালিঘাই নদীর সংযোগস্থলের পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম অংশে এক বিশাল অবনমিত স্থানের বা 'ডিপ্রেশানে'র সৃষ্টি হয়েছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল বর্ষাকালে জলমগ্ন হয়ে পড়ে। অঞ্চলটি 'ময়না অববাহিকা বা বেসিন' নামে অধিক পরিচিত। কাসাই-এর বিসর্প গতি এর অন্যতম কারণও। এই অঞ্চলের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাংশ নবীন পলি মৃত্তিকা দিয়ে গঠিত। অপরদিকে, উত্তর-পশ্চিমের অংশ ল্যাটেরাইট দিয়ে তৈরি। এখানে ভূমিভাগ কিছুটা তরঙ্গায়িত। সন্নিহিত পলি গঠিত সমভূমি থেকে বেশ কিছুটা উঁচুও। বিনপুর ও ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের কিছু কিছু স্থানে, যেখানে কাসাই নদী বেশ সর্পিল গতিতে প্রবাহিত, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উচ্চতার তারতম্য ৪৫ মিটার থেকে ৯৪ মিটারের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। নিম্ন কাসাই সমভূমি আয়তনে প্রায় ৩৬৭০.৪ বর্গকিলোমিটার। বিনপুর, ঝাড়গ্রাম, শালবনী, মেদিনীপুর, খড়্গপুর, কেশপুর, ঘাটাল, দাসপুর, পাঁশকুড়া, ময়না, ডেবরা, ভগবানপুর, পিংলা, নন্দীগ্রাম, তমলুক, সুতাহাটা, দুর্গাচক, হলদিয়া প্রভৃতি অঞ্চল এই সমভূমির অন্তর্গত। কাঁথি সমভূমির পরই জনসংখ্যার বসতির দিক থেকে এই অঞ্চল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জনসংখ্যা অধ্যুষিত অঞ্চল।

(৩) মেদিনীপুর উচ্চভূমি

বিহার ও ওড়িশা সংলগ্ন মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে ২০২৯ বর্গকিলোমিটার স্থান নিয়ে এই উচ্চভূমি গঠিত। তরঙ্গায়িত ভূমিরূপ এখানকার বৈশিষ্ট্য। কোনও কোনও স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়-শিরা এবং 'ডিপ্রেশান' বা অবনমিত স্থানও বিদ্যমান। এটি শক্ত ল্যাটেরাইট শিলা আবৃত ছোটনাগপুর মালভূমির অংশবিশেষ। এই অংশের একেবারে উত্তরে রয়েছে কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড়, যাদের উচ্চতা ৮২ মিটার থেকে ২২৩ মিটারের মধ্যে। সাধারণ ভূমি-ঢাল উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে। শক্ত পাথুরে ভূমির উপর বেশ কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী-নালা অবস্থিত। তাদের কোনও কোনও নদী উত্তরে কাসাই নদীতে এসে পড়েছে এবং কোনও কোনও নদী দক্ষিণে সুবর্ণরেখায় মিলেছে। এদের মধ্যে সুবর্ণরেখার ডানতীরের প্রধান নদী হল ডুলুং। উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত। বীনপুর অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে সাঁকরেল ব্লকে সুবর্ণরেখায় পড়েছে। নদী অবস্থানের দিক থেকে সুবর্ণরেখাই এই উচ্চভূমির ভূমিরূপকে পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। বিহার থেকে আগত সুবর্ণরেখা জেলার গোপীবল্লভপুর ১নং ব্লকে প্রবেশ করে প্রথমে পূর্বে, পরে দক্ষিণ-পূর্বে বাঁক নিয়ে দাঁতন ১নং ব্লকের পশ্চিম সীমানায় পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার মধ্যে প্রাকৃতিক সীমারেখা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সুবর্ণরেখার এই প্রবাহ অংশে নদীর পাড় খুবই উঁচু, তলদেশ শিলা ও বালুকাময় এবং স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে। এই উচ্চভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা নবীন পলি ও বালি দিয়ে গঠিত। উত্তর-পশ্চিম অংশের মৃত্তিকা শুষ্ক, অনুর্বর, বসবাস ও কৃষিকাজের অনুপোযোগী। নিচু পাহাড়ময় স্থানে গুল্ম জাতীয় এবং 'ডোয়ার্ফ' বা বামনাকৃতি শাল জঙ্গল দেখা যায়। বীনপুর ১নং ও ২নং, ঝাড়গ্রাম, সাঁকরেল, জামবনি, গোপীবল্লভপুর

মেদিনীপুরে আদিবাসী অধ্যুষিত একটি গ্রামের দৃশ্য

১নং ও ২নং, কেশিয়াড়ী, দাঁতন ১নং প্রভৃতি ব্লকগুলি সামগ্রিক বা আংশিকভাবে এই উচ্চভূমির অন্তর্গত।

(৪) কাঁথি সমভূমি

জেলার মধ্য ও দক্ষিণ অংশ নিয়ে গঠিত কাঁথি সমভূমি পাঁচটি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের মধ্যে এটিই বৃহত্তম। আয়তনে প্রায় ৫,৪৬৯ বর্গকিলোমিটার। এই অঞ্চলের ভূমি-ভাগ প্রায় সম্পূর্ণ সমতল। তবে উত্তর-পশ্চিম দিকের কিয়দংশে মৃদু তরঙ্গায়িত ভূমি দেখা যায়। সমুদ্রোপকূল থেকে দশ-বারো কিলোমিটার উত্তরে রসুলপুর নদী ও সুবর্ণরেখা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে একপ্রকার সুউচ্চ বালির টিবি বর্তমান। এই টিবিগুলি 'কাঁথি বালিয়াড়ী' নামে পরিচিত। জমির ঢাল দক্ষিণে অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে। অঞ্চলের গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫ মিটার উর্ধ্বে। উত্তর পশ্চিম অংশে ল্যাটেরাইট নুড়ি ও বালি জাতীয় মৃত্তিকা দেখা যায়, অপর অংশের মৃত্তিকা সাধারণত নবীন ও পুরাতন পলি ও উপকূলীয় পলি দিয়ে তৈরি। এখানেও বেশকিছু ছোট-বড়ো নদী-নালা বর্তমান। রসুলপুর কালিঘাই, কপালেশ্বরী প্রভৃতি নদীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডেবরা, পিংলা, ময়না, সবং, নন্দীগ্রাম ২নং ও ৩নং, খেজুরী, কাঁথি, পটাশপুর, এগরা, দাঁতন, নয়াগ্রাম, মোহনপুর, বেলদা, কেশিয়াড়ী, খড়্গপুর ১নং ও ২নং, সাঁকরেল, নয়াগ্রাম, রামনগর ২নং প্রভৃতি ব্লক পুরোপুরি বা আংশিকভাবে এই সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

(৫) দীঘা উপকূল সমভূমি

বঙ্গোপসাগরের মাথায় এটি একটি বেলাভূমি বা উপকূলের বালুকাময় সমভূমি। উপকূল অঞ্চলের নবীন পলি ও বালি দিয়ে এটি গঠিত। রসুলপুর নদীর উত্তরাংশ থেকে পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত যে 'কাঁথি বালিয়াড়ীর' উল্লেখ আগেই করা হয়েছে তা উপকূলের এই বেলাঞ্চলকে মেদিনীপুরের মূলভূমি থেকে প্রায় পৃথক করে রেখেছে। উত্তর-দক্ষিণে এই সমভূমি ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার চওড়া এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৫০ কিলোমিটারের অধিক লম্বা। আয়তনে প্রায় ৩.৮৪ বর্গকিলোমিটার। এই অঞ্চলেও সমুদ্র উপকূলের সমান্তরাল নবীন বালিয়াড়ীর সৃষ্টি হচ্ছে। সর্ব উত্তরের বালিয়াড়ীগুলি বয়সে প্রাচীন ও বেশ শক্ত। গাছপালা আবৃত।
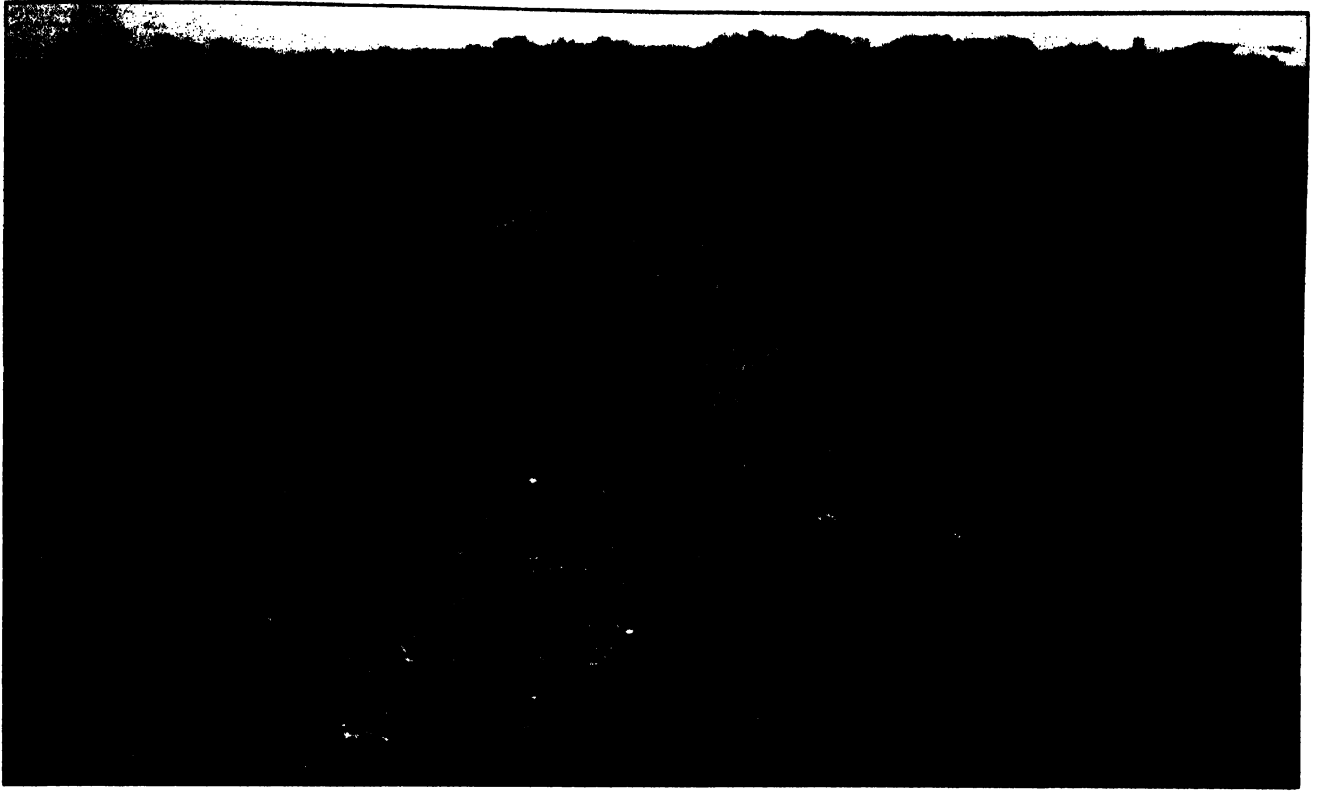
মেদিনীপুর জেলার কোনও কোনও অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি বৈশিষ্ট্য

দীঘা, কাঁথি ও জুনপুট অঞ্চলেও বেশ কয়েকটি বালিয়াড়ী দেখা যায়। এরা উচ্চতায় প্রায় ১০-১২ মিটার। এদের একদিক বেশ খাড়াই এবং অন্যদিকে ঢাল আস্তে আস্তে নেমে গেছে এবং সূক্ষ্ম বালি দিয়ে গঠিত। উপকূলে প্রবাহিত শক্তিশালী দক্ষিণাবায়ুই এইসব বালিয়াড়ী গঠনের মূল কারণ। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা বালিমিশ্রিত পলি দিয়ে গড়া। সমুদ্র জোয়ারের প্রভাবে এই অঞ্চল থাকায় মৃত্তিকায় লবণের আধিক্য সবচেয়ে বেশি। ফলে চাষের জমির উৎকর্ষতা বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত। রামনগর ১নং, খেজুরী ২নং, কাঁথি ১নং ও ২নং ব্লক এবং দীঘা এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলেও কয়েকটি ছোট ছোট নদী-নালা বর্তমান এবং তারা সরাসরি বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

বন্ধুরতা ও ঢাল

জেলার ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলির পৃথক পৃথক বিবরণের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এখনকার ভূমির বন্ধুরতা ও ঢাল সম্পর্কে একটি পরিসংখ্যান ভিত্তিক আলোচনারও যথেষ্ট অবকাশ আছে। কারণ এ ধরনের ব্যাখ্যা ও সংশ্লিষ্ট মানচিত্র জেলার ভূমি ব্যবহার ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি অতি প্রয়োজনীয় সূচক। 'সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'র 'টোপোগ্রাফিক্যাল' বা 'ভূ-বৈচিত্র্য' মানচিত্রের ভিত্তিতে সমগ্র জেলায় ভূমির বন্ধুরতা ও ঢালের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ৩নং মানচিত্রটি তারই প্রকাশ। বন্ধুরতার দিক থেকে সমগ্র জেলাটিকে পাঁচটি উচ্চতা অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। অঞ্চলগুলি হল ০-১০ মিটার, ১০-৫০ মিটার, ৫০-১০০ মিটার, ১০০-১৫০ মিটার এবং ১৫০ মিটারের অধিক উচ্চতা। এরা যথাক্রমে জেলার ভৌগোলিক এলাকার ৩৯.৬৫, ৩০.৫০, ২৪.৭০, ৩.১০ এবং ২.০৫ শতাংশ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। শেষোক্ত তিনটি উচ্চতা অঞ্চল ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্বাংশ। বাকী অঞ্চল দুটি নবীন পলি গঠিত সমভূমি অঞ্চল। উচ্চতা অঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে জেলার ভূমির সাধারণ ঢালেরও একটি পরিমাপ করা হয়েছে। জেলাটিকে দুটি বৃহৎ ঢাল অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। একটি অঞ্চলের ভূমি-ঢাল এক শতাংশের নীচে, অর্থাৎ প্রতি এক কিলোমিটার দূরত্বে, ১০ মিটার উচ্চতারও কম। জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাংশে এই ঢাল প্রতি কিলোমিটারে ১০ মিটার-এরও কম। অপর একটি ঢাল অঞ্চল এক থেকে দুই শতাংশের মধ্যে, অর্থাৎ ভূমি-ঢাল প্রতি এক কিলোমিটারে ১০ থেকে ২০ মিটারের মধ্যে। এই অংশটি কেবলমাত্র জেলার পশ্চিমাংশে বীনপুর ২নং ব্লক এলাকায় অবস্থিত। জেলার বাকী বৃহত্তর অংশ প্রথমোক্ত ঢাল অঞ্চলের অন্তর্গত। ঢাল অঞ্চলের পরিসংখ্যানভিত্তিক চিত্র স্পষ্টতই নির্দেশ করে যে মেদিনীপুর জেলা সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের একটি সমতল অঞ্চল।

লেখক : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, বৈজ্ঞানিক আধিকারিক ন্যাশনাল অ্যাটলাস অ্যাণ্ড থিমেটিক ম্যাপিং অর্গানাইজেশন, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগ, ভারত সরকার
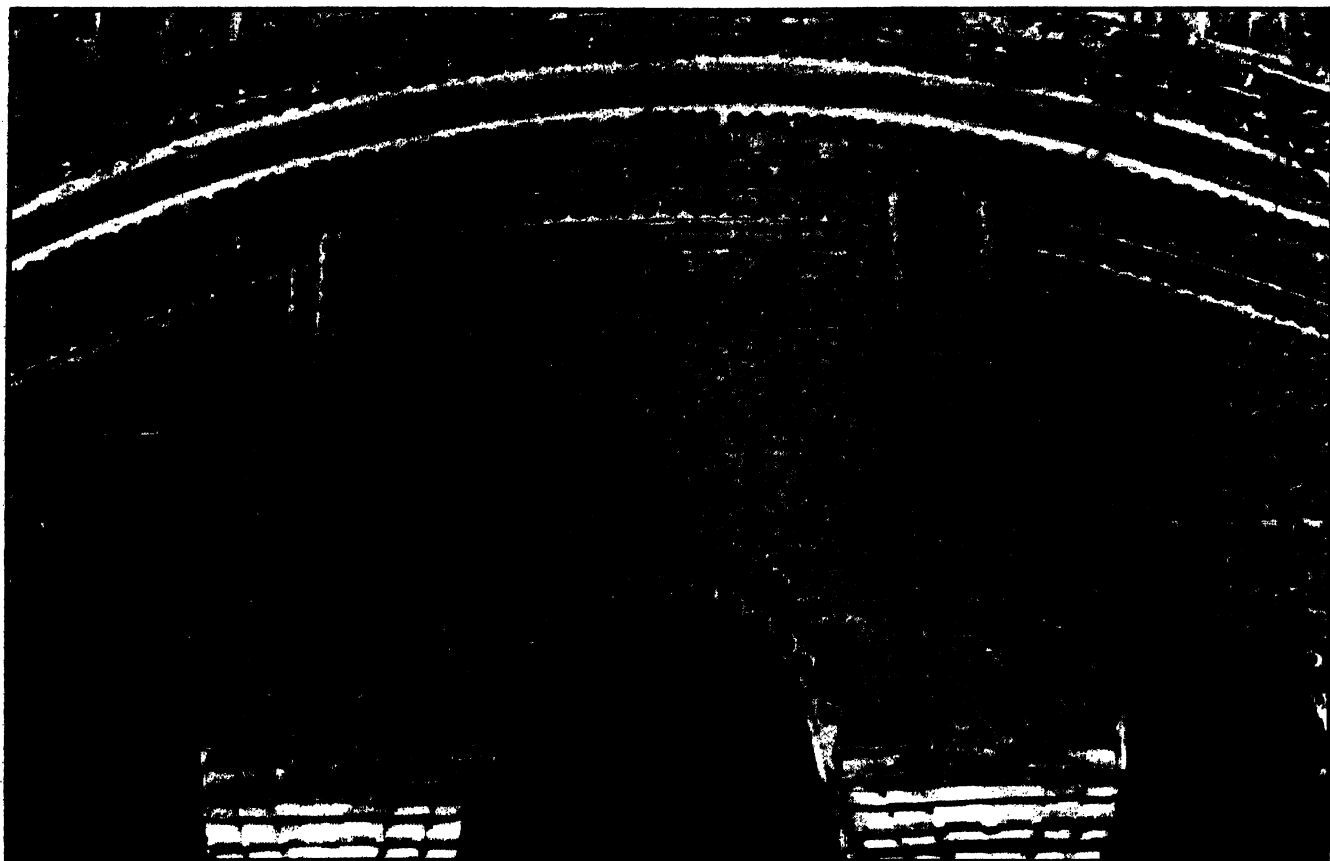
টেরাকোটা মন্দির, রাধাদামোদর জীউ মন্দির, ক্ষীরপাই

ছবি : প্রশান্ত প্রামাণিক
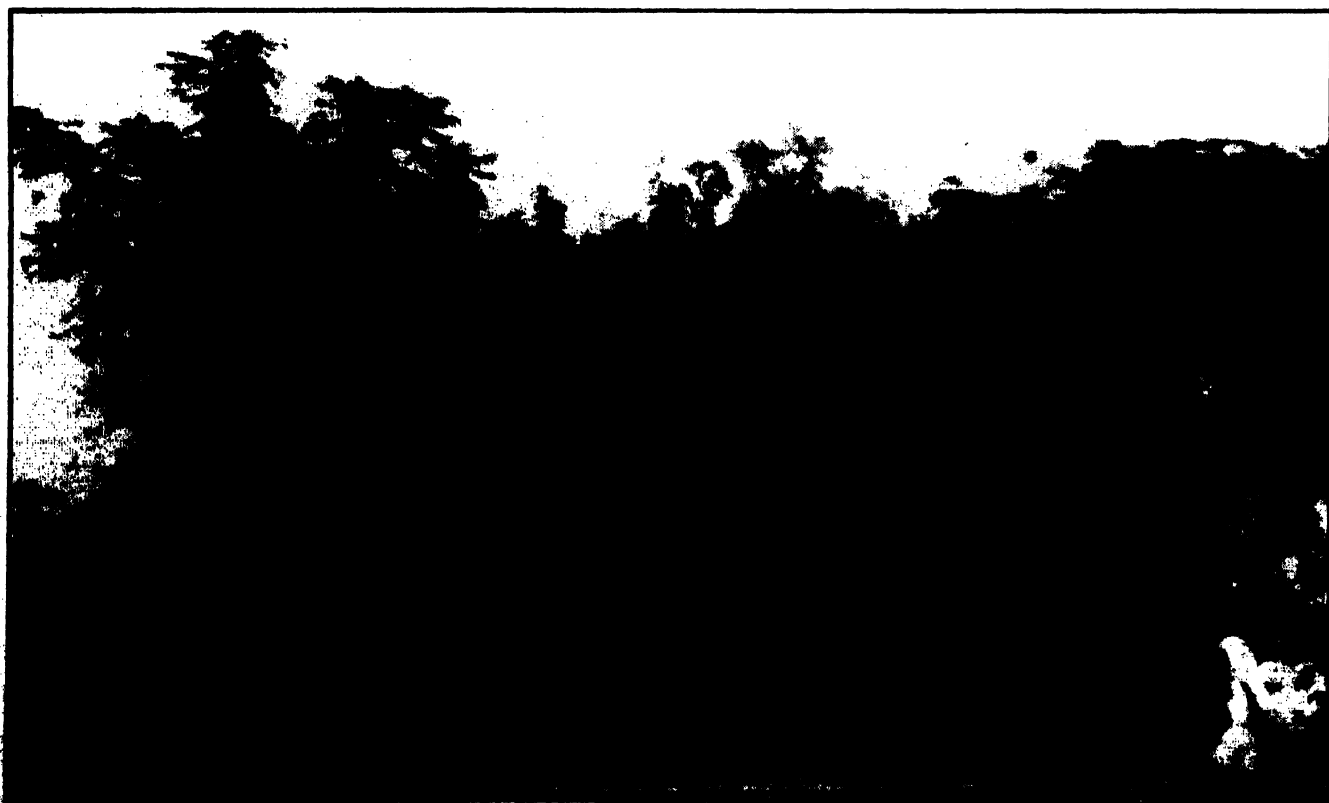
বালিহাটি-জিনসহর গ্রামে ১১শ শতকে নির্মিত প্রাচীনতম পাথরের জৈন মন্দির

ছবি : ত্রিপুরা বসু
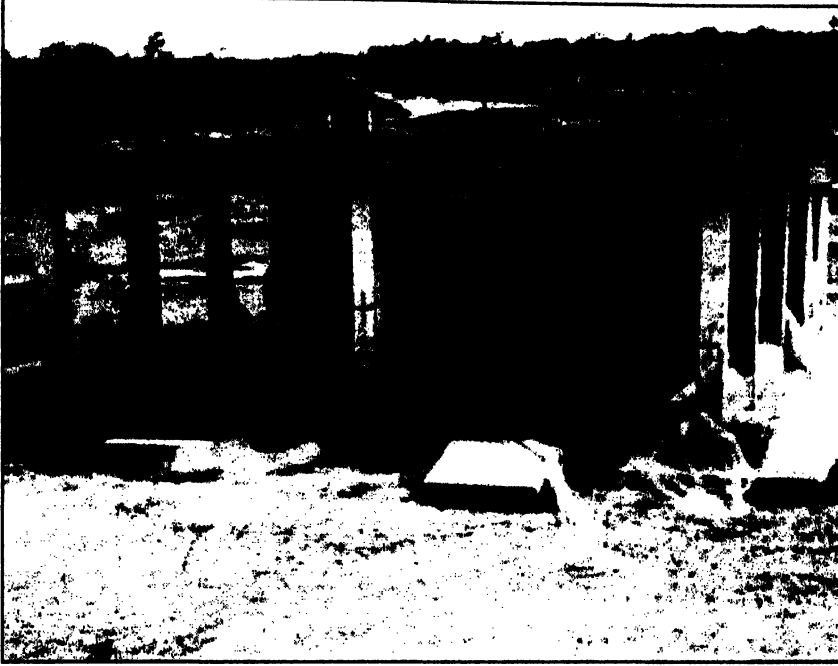
পূর্ব মেদিনীপুরের মৎস্য বিপণন কেন্দ্র

মেদিনীপুর জেলায় আর্থসামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের নূতন ধারা

শঙ্কর মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গের সবথেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ জেলা মেদিনীপুর। দক্ষিণে বিস্তীর্ণ সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল। পশ্চিমে লাল কাঁকুরে মাটি, উঁচুনিচু মালভূমি ও বনাঞ্চল আর পূর্বে পলিমাটি সমৃদ্ধ অঞ্চল। ভৌগোলিক এলাকা ও জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের অনেক রাজ্য থেকে বড় এই জেলা। আজ থেকে মাত্র ১০০ বছর আগেও জেলার এই বিশাল জনসংখ্যা ছিল জেলার এক পরম সম্পদ। "The decade (1891-1901) has been a prosperous one, ... the birth rate was unusually high—a circumtance attributed by the Magistrate to the prosperity of the people"* এই লেখার ৩৬ বছর পর আমরা স্বাধীন হই। আর স্বাধীন হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই জনসংখ্যা যা উন্নয়নের সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হতো তাকে আমাদের কাছে তুলে ধরা হলো উন্নয়নের মূল বাধা হিসাবে। মানুষের উন্নয়নে মানুষের সংখ্যাকেই বাধা হিসাবে দেখানোর ফলে অনুন্নয়নের আসল কারণগুলি অর্থাৎ আর্থসামাজিক কারণগুলি আড়ালে পড়ে গেল।

অতীতের অবস্থা :

জেলাতে জনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। ১৮০২ সালে তৎকালীন ইংরেজ শাসকদের ধারণায় জেলাতে ১৫ লক্ষের মতো লোকের বাস ছিল। ১৮৩৭ সালে

---

* L. S. S. O'Malley, Bengal District Gazetteers, Midnapore, (1911) Govt. of West Bengal. First Reprint 1995. pages—58-59.

তা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১৩.৬ লক্ষে। ১৮৫২ সালে হয় ১৫.৪ লক্ষ। প্রথম জনগণনা হয় ১৮৭২ সালে এবং তাতে জেলার জনসংখ্যা হয় ২৫.৪ লক্ষ। ১০০ বছর পরে ১৯৭১-এর জনগণনায় জেলার জনসংখ্যা হয় ৫৫ লক্ষের সামান্য বেশি। আর একবিংশ শতাব্দীর প্রথম বছরে জনসংখ্যা হয়েছে ৯৬.৪ লক্ষ। ১৮৭২ সালে প্রতি বর্গকিলোমিটার এলাকায় জনসংখ্যা ছিল ২০৩ জন। ২০০১ সালে তা প্রায় সাড়ে তিনগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮৫ জন। মাথাপিছু চাষের জমির পরিমাণ ১৮৭২ সালের ১.০৮ একর থেকে কমে ২০০১ সালে হয়েছে ০.২৩ একর। জনসংখ্যা যতগুণ বেড়েছে তার চেয়ে মাথাপিছু চাষের জমির পরিমাণ বেশিগুণ কমেছে কারণ নীট কর্ষিত জমির পরিমাণ অনেক কমেছে অর্থাৎ বেশ কিছু চাষের জমি রূপান্তরিত হয়েছে বসত জমিতে। কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো আজ থেকে ১০০ বছর আগে জেলার যে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল তাতে মাথাপিছু জমির পরিমাণ মানুষদের আর্থিক অবস্থার কোনও সূচক হতে পারে না।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু হওয়ার পর দেশের অন্যান্য এলাকার সঙ্গে মেদিনীপুর জেলাতেও ভূমির অধিকারের ক্ষেত্রে তৈরি হলো মধ্যস্বত্ব অধিকারীর দল। ১৮৭২ সালে জেলার যে চৌহদ্দি ছিল তাতে জেলার আয়তন ছিল ১২৫২৫ বর্গ কিলোমিটার। আর এই বিশাল পরিমাণ জমির বেশিরভাগটাই ছিল নানান ধরনের মধ্যস্বত্ব অধিকারীদের হাতে। জমিদার (পুরুষ—৯৮৮, মহিলা—৩৮১), ইজারাদার (পুরুষ—৩৩৭, মহিলা—২), তালুকদার (পুরুষ—২২২৫, মহিলা—১৩৪), পত্তনীদার (পুরুষ—১৪৪, মহিলা—১১) ও জোতদার (৪০২) মিলিয়ে এদের সংখ্যা ছিল ৪৬১৩। ভূমিস্বত্বের অধিকারী চাষী পরিবার ছিল মাত্র ১৫৭৪টি। এই হাজার ছয়েক পরিবারই জেলার প্রায় সবজমির অধিকারী ছিল। জেলার ৪.৫৮ লক্ষ সাধারণ চাষী পরিবারগুলির প্রায় ২৩-২৪ লক্ষ লোক এদেরই প্রজা। চাষবাস হতো ভালোই। নীট কর্ষিত জমির পরিমাণ ছিল প্রায় এগারো হাজার হেক্টর। এর ৭৭ শতাংশ জমিতে হতো ধানসহ অন্য দানাশস্যের চাষ। ধানের ফলন ছিল একরে প্রায় ৩৬ মন বা ১৩.৫০ কুইন্টাল মতো, অর্থকরী ফসল হতো ২৩ শতাংশ জমিতে যার মধ্যে আখ হতো ৬.৫৫ শতাংশে, পাট হতো ৭.৫৫ শতাংশ জমিতে। এছাড়া ছিল নীল, তৈলবীজ, তামাক, তুলো, ডাল ও সব্জির চাষ।

জলসম্পদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মাছের উৎপাদন

মেদিনীপুর জেলার সাধারণ মানুষদের প্রয়োজন ছিল সামান্য। জেলার একাংশ ছিল জঙ্গল-মহাল। এই জঙ্গল থেকে স্বাভাবিকভাবে যা পাওয়া যেত তা নিয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকতো। জঙ্গলে পশু চরিয়ে জীবিকা অর্জন করা বা জঙ্গলকে আয়ের উৎস হিসাবে দেখা কোনোটাই অতীতে ছিল না, এমন কি আজ থেকে ১০০ বছর আগে সরকারের জঙ্গল থেকে আয় সৃষ্টির কোনো ব্যাপার ছিল না। ১৮৫০ সালেও জেলার জঙ্গলে বাঘ, চিতা, হায়না, ভালুক, হরিণ, মহিষ, বনশূকর ইত্যাদি জানোয়ার ভালো পরিমাণে ছিল। উনবিংশ শতকের শেষের দিকেও এইসব জানোয়ার মারলে শিকারীদেরকে সরকারের তরফ থেকে পুরস্কার দেওয়ার বন্দোবস্ত ছিল।

অতীতে মেদিনীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ছিলো জেলার নদীগুলি। সেচের জন্য নয় নদীগুলিই ছিল যাতায়াতের প্রধান পথ। আজ থেকে ১০০ বছর আগেও নদীগুলিকে জলপথ হিসাবে ব্যবহার করা হতো। তারও আগে জানা যায় যে কলকাতা থেকে ইংরেজরা নদীপথেই মেদিনীপুর শহরে এসেছিল বা জব চার্নকের সময় কলকাতা থেকে হিজলী পরগনায় যাতায়াত হতো সম্পূর্ণ নদীপথে। ১৮৬৬ সালে মেদিনীপুর হাই লেভেল ক্যানেল তৈরির পরিকল্পনা ছিল মূলত জলপথ তৈরির। এরই সঙ্গে মেদিনীপুর ক্যানেল থেকে আমনচাষে ১.৬ লক্ষ একর জমিতে জীবনদায়ী সেচের মাধ্যমে ফসল সুনিশ্চিত করা এবং রাজস্ব বৃদ্ধির পরিকল্পনাও ছিল ব্রিটিশ সরকারের। বিগত ১০০ বছরেই জেলার জলপথ ব্যবস্থা কার্যত ধ্বংস হয়ে গেছে। অথচ ১৮৭২ সালে জেলাতে মাঝি-মাল্লাদের সংখ্যা ছিল ৬৫০৯ জন। পরবর্তী সময়ে জোর দেওয়া শুরু হয়েছে পুঁজি নিবিড় ভূতল পরিবহন ব্যবস্থার ওপর। কিন্তু পরিবহন ব্যবস্থায় জলপথ ব্যবস্থাই সবথেকে কম খরচের ব্যবস্থা। খাল কাটতে তো খরচ শুধুই শ্রমের। আর এই শ্রমের প্রাচুর্য তো আমাদের জেলায় ছিলই। জলসম্পদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মাছের উৎপাদন। অতীতে মাছের উৎপাদন কেমন ছিল তা বোঝার মতো কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। প্রথম জনগণনার সময় জেলাতে মৎস্যজীবীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২ হাজার বা মোট জনসংখ্যার ০.৪৭ শতাংশ। যেটা উল্লেখযোগ্য তা হলো এরা ছাড়া গ্রামের প্রায় সব গরিব লোকেরাই নিজেদের প্রয়োজনে কিছু না কিছু মাছ ধরতো নদী, খাল, বিল ইত্যাদি থেকে। বর্ষার সময় চাষের জমিতে যে মাছ হতো এবং জমিদারী মালিকানায় যে সমস্ত জলা বা বড় বড় বাঁধ, দীঘি ইত্যাদি ছিল তা থেকে মাছ ধরার অধিকার ছিল গ্রামের সাধারণ মানুষদের। আজ এইসব জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য সম্পদের (common property) পরিমাণ তলানিতে এসে ঠেকেছে।

সব থেকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে গৃহপালিত প্রাণীসম্পদের ক্ষেত্র। ১৮৭২ সালে জেলায় গবাদি পশুর সংখ্যা ছিল প্রতি বর্গ কিমিতে ৫.৫টি। শেষ পাওয়া পরিসংখ্যান

গৃহপালিত প্রাণীসম্পদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে

অনুযায়ী ১৯৯৪ সালে এটা দাঁড়িয়েছে ২২৩টিতে অর্থাৎ ৪০ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ভেড়া ও ছাগলের সংখ্যাও প্রতি কিমিতে ৬.৮ থেকে ১০০টিতে পৌঁচেছে। আরও বেশি বেড়েছে হাঁস-মুরগীর সংখ্যা। অর্থাৎ জনসংখ্যার চেয়ে প্রাণীসম্পদ বেড়েছে সহস্রগুণ।

এতো উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও জেলার সাধারণ চাষী পরিবারগুলির অবস্থা ভালো ছিল না। উৎপাদনের সিংহভাগই নিয়ম এবং নিয়মবর্হির্ভূত প্রথায় চলে যেত জমির মধ্যস্বত্ব অধিকারী, ইংরেজ ব্যবসায়ী এবং ব্রিটিশ সরকারের হাতে। এর ওপর ছিল উপস্বত্ব অধিকারী মণ্ডল, নায়েব ইত্যাদিসহ মহাজনদের ভাগ। ফলে সাধারণ চাষীরা তাদের শ্রম দিয়ে জমিতে যা ফসল ফলাতো তা ইংরেজ প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থা ও আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হতো। জেলার গরিব পরিবারগুলিকে অনেক ক্ষেত্রেই জীবিকার সন্ধানে জেলা ছেড়ে স্থায়ীভাবে চলে যেতে হয়েছে আসাম, সিলেট, কাছাড় ইত্যাদি চা-বাগান অধ্যুষিত এলাকায়। সরকারি নথিতেই এই জেলা ছেড়ে এইসব পরিবারের চলে যাওয়ার হিসাবটা এরকম—১৮৬৪ সালে ৯৭৩ জন, ১৮৬৫ সালে ১০৪৭ জন, ১৮৬৬ সালে ৪৫৪২ জন ইত্যাদি।

জনসাধারণই পারে উন্নয়নের বাধা দূর করতে :

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো সমস্ত সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত করার তখন জাতীয় নেতৃত্বের একাংশ বুঝেছিলেন যে এইসব সাধারণ মানুষদেরকে তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থেই যে স্বাধীনতার প্রয়োজন তা বোঝাতে হবে। উৎপাদন করা সত্ত্বেও তারা তা ভোগ করতে পারছে না কারণ ব্রিটিশ এবং তাদের সহযোগী মধ্যস্বত্বাধিকারীদের অর্থনৈতিক স্বার্থেই পরাধীন দেশের সমস্ত আইন-কানুন কাজ করে। এই ধারণাটা যেখানে যত ভালোভাবে সাধারণ মানুষ বুঝেছে সেখানেই

স্বাধীনতা আন্দোলন ততো তীব্র হয়েছে। মেদিনীপুরের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে বেশ ভালো অংশ বহুযুগ ধরে লবণ উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত ছিল। ব্রিটিশের ভূমি-আইন ও লবণ-আইন এইসব মানুষদের জীবিকাই ধ্বংস করেছিল সরাসরি। তাদের জীবিকার ওপর এই সরাসরি আঘাত তাদের মধ্যে স্বাধীনতার মাধ্যমে জীবিকার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে জোরদার করেছিল।

জনসংখ্যাকে বাধা হিসাবে তুলে ধরা হলো :

স্বাধীনতা পাওয়ার পর চেষ্টা শুরু হয়েছিল জমির এবং জমির উৎপাদনের ওপর সাধারণ মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার। মধ্যস্বত্ব প্রথা বিলোপ, জমির উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া এবং উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন আইনগুলির মধ্য দিয়ে সাধারণ চাষী পরিবারগুলির অর্থনৈতিক ভিত শক্ত করার কাজ কিন্তু খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারল না সাধারণ মানুষদের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনগুলি সঠিকভাবে কার্যকর করা গেল না। মেদিনীপুরের পূর্বতন জমিদার, তালুকদার ইত্যাদি মধ্যস্বত্ব অধিকারীরা নানা কৌশলে জমিগুলিকে নিজেদের হাতে রেখে দিতে সমর্থ হলো। এই লুকানো জমিগুলি চাষ হতো ভাড়া করা কৃষিমজুর দিয়ে বা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গোপনে তাদেরই পূর্বতন প্রজাদের দিয়ে ভাগচাষ প্রথায়। গরিব সাধারণ পূর্বতন প্রজাদের সাহস এবং অবস্থা ছিল না যে এগুলো স্বাধীন দেশের সরকারকে জানিয়ে বিধিব্যবস্থা করার। ফলে নয়াগ্রাম, চিল্কিগড়, ঝাড়গ্রাম, বেলেবেড়্যা, বগড়ী, গড়বেতা, রামগড়, চন্দ্রকোনা, নাড়াজোল, আনন্দপুর, কাঁথি, তমলুক, মহিষাদল ইত্যাদি অঞ্চলে খাতায় কলমে না হলেও কার্যত সেই পূর্বতন জমিদারই বৃহৎ জোতের মালিক হয়ে রইলো। তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের যে আশায় সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে এসেছিল সেই আশা তাদের পূরণ হলো না। অন্যদিকে বড় বড় পরিকল্পনা এবং প্রকল্পের কাজ শুরু করা হলো এবং আশা দেওয়া হলো যে এর ফলেই ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে। ঠিক এই সময় থেকেই বোঝানো শুরু হলো যে আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক নয় উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে পুঁজি এবং আমাদের দেশের জনসংখ্যা এই পুঁজি সৃষ্টিতে বাধা। সুতরাং জনসংখ্যাই হলো উন্নয়নের পথে মূল বাধা। ষাট দশকের মাঝামাঝি থেকে কৃষিক্ষেত্রে ও প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তনের বদলে পুঁজি নিবিড় প্রযুক্তির প্রয়োগের দ্বারা উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু হলো। ফলে গ্রামীণ জনসংখ্যাকে আরও বেশি দায়ী করা হতে থাকলো দেশের অনুন্নয়নের জন্য। উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটলো কিন্তু সাধারণ মানুষদের অবস্থা আরও বেশি খারাপ হতে থাকলো। ১৯৫১ সালে গ্রামীণ জনসংখ্যার ৪৭.৩৭ শতাংশ

ভূমিসংস্কার শুধু স্বত্ব সংক্রান্ত সংস্কার নয়, জমিতে কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠাই মূল লক্ষ্য

দারিদ্র্যসীমার নীচে ছিল। আর ১৯৬৬-৬৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ালো ৬৪.৩০ শতাংশে। আর ১৯৭৩-৭৪ সালে তা দাঁড়ালো ৭৩.২ শতাংশে।

জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থায় নূতন ধারা :.

অর্থনীতির এই অবক্ষয় সাধারণ মানুষদেরকে বাধ্য করলো আবার আন্দোলন সংগ্রামে নামতে। মেদিনীপুর জেলাতে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করল। জেলার কোথাও

●

যে বাম দলগুলির নেতৃত্বে গ্রামের গরিব মানুষেরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেছিলো তারাই ১৯৭৭ সালে রাজ্য বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হওয়ায় গরিব মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময় থেকেই নিজেদের উন্নয়নের কাজ নিজেরা করার দায়িত্ব নিতে শুরু করল মেদিনীপুর জেলার গ্রামের সাধারণ মানুষ।

●

কোথাও এগুলি জঙ্গী আন্দোলনের রূপ নিল। যে বাম দলগুলির নেতৃত্বে গ্রামের গরিব মানুষেরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেছিলো তারাই ১৯৭৭ সালে রাজ্য বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হওয়ায় গরিব মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময় থেকেই নিজেদের উন্নয়নের কাজ নিজেরা করার দায়িত্ব নিতে শুরু করল মেদিনীপুর জেলার গ্রামের সাধারণ মানুষ। গ্রামের অধিকাংশ মানুষকে উৎপাদনের মূল উপাদান জমির স্বত্ব ও তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ তারা নিজেরাই (সরকারি কর্মচারিদের সহায়তায়) করল। ১৯৭৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার ৭.৪১ লক্ষ ভূমিহীন ক্ষেতমজুর পরিবার আজ কিছুটা জমির অধিকার পেয়ে প্রান্তিক চাষী হয়েছে। জেলার কৃষি পরিবারগুলির ৯৫ শতাংশই আজ প্রান্তিক ও ছোট চাষী। আর তারা চাষ করছে জেলার কৃষি জমির প্রায় ৮২ শতাংশ জমি। জেলার ২.৯১ লক্ষ ভাগচাষী আজ বর্গা রেকর্ডিং-এর ফলে তার চাষ করার ও ফসলের ন্যায্য ভাগ পাওয়ার অধিকার পেয়েছে। ভূমি সংস্কার শুধু স্বত্ব সংক্রান্ত সংস্কার নয়। জমিতে অধিকার প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য মানুষদের আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে জমিকে ব্যবহার করে তার থেকে জীবিকার সংস্থান করা, ভূমিস্বত্ব সংস্কারের পাশাপাশি তাই জমিকে ব্যবহার করার জন্য

ভূমিহীন ক্ষেতমজুর জমির অধিকার পেয়ে প্রান্তিক চাষী হয়েছে

অন্য আনুষঙ্গিক দিকগুলোরও সংস্কার চলেছে মেদিনীপুরের গ্রামে গ্রামে। এক্ষেত্রে যেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এই সমস্ত ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষকে কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলেছে। যে সাধারণ মানুষকে উন্নয়নের আঙিনা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিলো স্বাধীনতা পাওয়ার পরেই, যাদের সংখ্যাকে প্রতিপন্ন করা হচ্ছিল উন্নয়নের প্রধান বাধা হিসাবে তাদেরকেই উন্নয়নের স্তম্ভ হিসাবে গড়ে তোলার কাজ চলেছে মেদিনীপুর জেলায়।

ভূমিসংস্কারের সাফল্য জেলার মানুষদেরকে নিজেদের উন্নয়নের দায়িত্ব নিজেরা করার প্রক্রিয়ায় নিয়ে এসেছে। আর পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে এই উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে স্থায়ী করার কাজ চলেছে জেলায়। ১৯৭৯ সালে মেদিনীপুর জেলায় শুরু হয় গ্রামের মানুষের তৈরি করা গ্রামপরিকল্পনার কাজ এবং সেই অনুযায়ী উন্নয়নের কাজ করা। এই গ্রামভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পদ্ধতির মূল কথাই হলো গ্রামের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষদেরকে নিজেদের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করার অবস্থায় নিয়ে যাওয়া এবং তার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও পরিকাঠামো তৈরি করা। এই পদ্ধতিতে গ্রামের এই পিছিয়ে পড়া অংশের লোকেরা নিজেরাই বসছে আলোচনা সভায় আর ঠিক করছে তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা সমস্যাগুলি এবং গ্রামের বা তাদের পাড়ার যৌথ সমস্যাগুলি। তারাই খুঁজে বের করছে নিজেরাই এ সব সমস্যার কতোটা সমাধান করতে পারে, আর সরকারি দপ্তর, ব্যাঙ্ক এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তাদের সমস্যা সমাধানে কতোটা কি করতে পারে। আর এইভাবে কাজ করার মধ্যে দিয়েই গ্রামের মানুষেরা নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাটা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারার সুযোগ পাচ্ছে। এই বিকল্প উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত ও মজবুত করার কাজে

২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিকল্পনা ভবন উদ্বোধন করে ভাষণরত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছবি : অমিত ধর

জেলার প্রতিটি অঞ্চলেই প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। অতীতের চণ্ডীমণ্ডপ বা শীতলা মণ্ডপ আজ আর নেই। কোনো প্রয়োজনে গ্রামের লোকেদের নিয়ে আলোচনায় বসতে হলে কিছু বছর আগেও বসতে হতো বটতলায় বা অশথতলায়। ঝড় জলের দিনে তো বসার কথা ভাবাই যেত না। আর আজ জেলার ৫১৪টি গ্রামপঞ্চায়েতেই গড়ে উঠেছে গ্রামপঞ্চায়েত অফিস আর সংলগ্ন কমিউনিটি হল যেখানে ২০০-৩০০ জন লোক একসঙ্গে বসে তাদের সমস্যা ও সেগুলি সমাধানের পথ নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতে পারে। উন্নয়নের কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে জেলা শহর বা কলকাতায় যেতে হচ্ছে না এখন। ব্লক বা পঞ্চায়েত সমিতি স্তরেই প্রশিক্ষণ শিবির করার মতো পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে ৫৪টি পঞ্চায়েত সমিতিতে। প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতিতেই আজ আছে সুসজ্জিত আলোচনাকক্ষ। জেলার সদর শহর সহ, ঝাড়গ্রাম, তমলুক, হলদিয়া, ঘাটাল, কাঁথি, দীঘা, দাসপুর, শালবনী, ডেবরা ইত্যাদি জায়গায় গড়ে উঠেছে আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। আর এ সবের ফলেই জেলার উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ঘটেছে ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণ। মহিলা পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের ঘরবাড়ি ছেড়ে ৪-৫ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ নেওয়াই হতো না। আজ বাড়ির কাছেই এইসব প্রশিক্ষণের পরিকাঠামো গড়ে ওঠায় সব মহিলা প্রতিনিধিরাই প্রশিক্ষণ নিতে পারছেন। গ্রামের মানুষের এই বিকল্প উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবেই জেলায় চলেছে সাক্ষরতা ও রোগ প্রতিষেধকের অভিযান। সাক্ষরতার আন্দোলন গ্রামের মানুষদের নিরক্ষরতা কত শতাংশ কমিয়েছে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো মেদিনীপুর জেলায় এই আন্দোলন গ্রামের মানুষদের মধ্যে বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া অঞ্চল ও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে
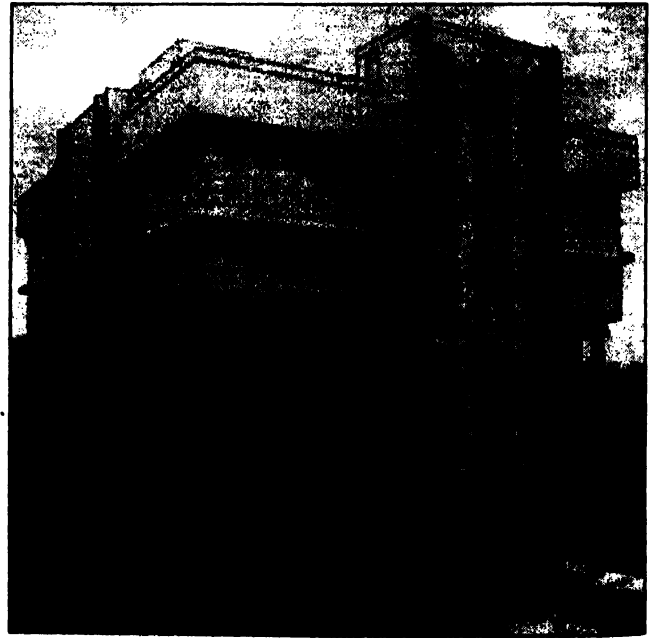
মেদিনীপুর জেলা পরিকল্পনা ভবন

সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং তাদের একটা জায়গায় নিয়মিতভাবে মিলবার পরিবেশ ও পরিকাঠামো তৈরি করেছে। আজ মেদিনীপুর জেলার প্রতিটি গ্রামসংসদ এলাকাতেই এই পিছিয়ে পড়া অংশের লোকদের বসার, আলোচনা করার ও নানা বিষয় জানার একটা স্থায়ী ঠিকানা হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র-জনচেতনা-কেন্দ্রগুলি। গ্রামের লোকদের উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত সরকারি দপ্তরগুলিও আস্তে আস্তে তাদের কাজগুলিকে সঠিকভাবে গ্রামের মানুষদের স্বার্থে রূপায়িত করার জন্য আজ এইসব ঈশ্বরচন্দ্র-জনচেতনাকেন্দ্রগুলিতে আসতে শুরু করেছে।

উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই বিকল্প পথে হাঁটার ফলে মেদিনীপুর জেলার মানুষদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন আসছে সম্পূর্ণ নূতন এক ধারায়। এই নূতন ধারা দেখা যাচ্ছে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভূমিস্বত্ব সংস্কারের কাজে, নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগের ধরনে, সেচব্যবস্থা সৃষ্টি ও তা ব্যবহারের ধরনে, বন-সম্পদ সৃষ্টি ও তা এলাকার মানুষদের জীবিকা সংস্থানের কাজে, প্রাণীসম্পদ বিকাশের কাজে, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নসহ উন্নয়নের নানাদিকে। আর এই ধারাটা হল যাদের উন্নয়ন তারা নিজেরাই এগিয়ে এসেছেন নিজেদের উন্নয়নের পরিকল্পনা তৈরি, তা রূপায়ণ ও তদারকির কাজে।

ভূমিস্বত্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে অপারেশন বর্গা এবং উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধার ও পাট্টা বিতরণের কাজে সরকারি আইন-কানুন কার্যকরি করা ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারিদের সঙ্গে গ্রামের মানুষেরা সংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিয়ে জেলায় এক অভূতপূর্ব নজির গড়েছে যার ফলে ভূমিস্বত্ব এবং ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে জেলার কৃষি পরিবারগুলির প্রায় ৯৫ শতাংশ লোকের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই সব মানুষদের জমিকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করার পরিবেশ ও পরিকাঠামো তৈরির কাজ চলেছে পুরোদমে যাতে করে সম্পদের ওপর প্রতিষ্ঠিত অধিকারকে ভিত্তি করে গ্রামের মানুষেরা তাদের জীবিকা ও আয়ের সংস্থান করতে পারে। জেলার সরকারি বিভাগগুলি ও পঞ্চায়েতের সঙ্গে সঙ্গেই একাজে এগিয়ে এসেছে কৃষকদের সংগঠন ও এলাকার নানান গণসংগঠনগুলি। জেলা, ব্লক ও গ্রামস্তরে এরাই আলোচনা করছে তাদের এলাকার কৃষি সমস্যাগুলি এবং সেগুলির সমাধানের পথ। এগিয়ে এসেছেন জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, বিজ্ঞানমঞ্চ ও নানান বিজ্ঞান বিষয়ক সংগঠনগুলি এবং তাদের মাধ্যমেই এ কাজে যুক্ত হচ্ছেন জেলার নানা প্রান্তে উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা। সেচব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ঘটেছে এই গরিব মানুষমুখীপরিবর্তন। শুধুমাত্র মাটির তলার জল বা নদীর জল নয়, বৃষ্টির জল এলাকাতেই ধরে রাখার জন্য নানান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ হচ্ছে। জোর দেওয়া হচ্ছে পুরোনো জমিদারি বাঁধ, জোড়বাঁধ ইত্যাদি জলাধারগুলিকে সংস্কারের মধ্য দিয়ে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ওপর। গরিব প্রান্তিক ও ছোট চাষী পরিবারদের জমিতে ছোট ছোট ডোবা খুঁড়ে জল ধরে রাখার ব্যাপক কর্মসূচি মেদিনীপুর জেলাপরিষদ নেওয়ার ফল জেলাতে আজ ৭, ৮, ১০ ডেসিমেলের হাজার হাজার ডোবার মালিক হয়েছে গরিব চাষী পরিবারগুলি। এই ডোবাগুলির বেশ কিছুটা কাঁকুরে লালমাটির অঞ্চলে হওয়ায় সেগুলি মরশুমি। কিন্তু তাতেও বর্ষার সময় চারামাছ ছাড়লে মার্চের মধ্যে মাছের তিন-চারটে ফসল থেকে তাদের আয়ের সুযোগ ঘটেছে। আরও যেটা উল্লেখযোগ্য সেটা হল এই অসংখ্য ছোট ছোট ডোবাতে এলাকার বৃষ্টির জল এলাকাতেই বাঁধা থাকার ফলে মাটির উপরিভাগের ভাল অংশটুকু বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে নদীতে গিয়ে নদী ভরাট করার সম্ভাবনা কমাচ্ছে। আর একই সঙ্গে তলার জলের স্তরকে সুরক্ষিত করছে এবং সংলগ্ন এলাকাকে সরস রাখছে। ফলে মাটির উপরিভাগে সবুজের আচ্ছাদন পড়ছে এই ডোবাগুলির চারধারে। ডোবার পাড়ে কলা, পেঁপে ইত্যাদির গাছ আর ডোবার জল থেকে সংলগ্ন ৩-৪ ডেসিমেল জায়গায় কিচেন গার্ডেনও কোথাও কোথাও শুরু হয়েছে। ভূমিক্ষয় রোধ, জলসেচ আর জমির সদ্ব্যবহারের এ এক অপূর্ব নিদর্শন গড়ে উঠেছে এলাকার গরিব মানুষদেরই প্রচেষ্টায়।

সরকারে ন্যস্ত উদ্বৃত্ত জমির বেশ ভাল একটা অংশ নিকৃষ্ট ধরনের জমি এবং অনেক ক্ষেত্রে এই সব জমিতে আগে কোনো চাষই হত না। এইসব জমির পাট্টা যারা পেল তারা একক এবং যৌথভাবে নতুন ধরনের জমি ব্যবহারে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে এই জেলায়। এইসব পাট্টা পাওয়া জমিতে আম, লেবু ইত্যাদি ফলের বাগান তৈরি হচ্ছে কোনো কোনো জায়গায়। কোথাও বা উন্নত জাতের ঘাসের চাষ শুরু করেছে তারা। সংখ্যার দিক থেকে এই ধরনের উদ্যোগ এখনও সেরকম উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু সংখ্যায় কম হলেও তাদের সাফল্যের প্রভাবে জেলার সর্বত্রই এই ধরনের প্রয়াসকে আকর্ষণীয় এবং গতিশীল করে তুলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই গরিব সম্প্রদায়ের পরিবারগুলির মধ্যে প্রাণীপালন বৃদ্ধির সম্প্রসারণ অভিযান। এর জন্য গ্রামপঞ্চায়েতস্তর অবধি পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে জেলায়। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় এখনও তা যথেষ্ট নয় তবে এক্ষেত্রেও এই অভিযানের গতিশীলতা খুবই আশাব্যঞ্জক। ৫১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতেই গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক কৃত্রিম প্রজনন পরিকাঠামো। এর মাধ্যমে ফ্রোজেন সিমেন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গবাদি পশুর সংকরায়ণের কাজ শুরু হয়েছে জেলার গ্রামগুলিতে। সরকারি দপ্তর, পঞ্চায়েত এবং নানা স্বেচ্ছাসেবী ও বিজ্ঞান সংগঠনের উদ্যোগে গ্রামেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি।

মানুষের উন্নয়নে মানুষের এই এগিয়ে যাওয়ার পথ ধরেই মেদিনীপুরের গ্রামের মানুষেরা এগিয়ে এসেছেন বনসৃজন ও বনসম্পদ রক্ষার কাজে। মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল সংলগ্ন গ্রামের লোকেরাই সরকারি বনদপ্তরের সহায়তায় নিজেদের দিয়েই তৈরি করেছে বনসংরক্ষণ কমিটি। আর এর মধ্যে দিয়েই জেলার বিস্তীর্ণ ক্ষয়িষ্ণু বন এলাকাকে অতি মূল্যবান সম্পদে পরিণত করেছে এলাকার লোকেরা। আর এই বর্ধিত বনসম্পদই

ক্ষয়িষ্ণু বন এলাকাকে অতিমূল্যবান বনসম্পদে পরিণত করেছে গ্রামের লোকেরাই

তাদের কাছে জীবিকা সংস্থানের মূলধন হয়েছে—নিয়ম মাফিক গ্রামের মানুষেরা সংগ্রহ করেছে জ্বালানি কাঠ, নানারকমের বনজ উৎপন্ন, এরই সঙ্গে পাচ্ছে বনসৃজন ও রক্ষণাবেক্ষণের সূত্রে নানা রকমের কর্মসংস্থান। মেয়াদ শেষে বনদপ্তর থেকে কাঠ বিক্রির একটা অংশও গ্রামের লোকেরা পাচ্ছে।

মেয়েদের মধ্যে সঞ্চয় করার যে স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে, তাকে ভিত্তি করেই স্থানীয় সচেতন মানুষ, পঞ্চায়েত আর সরকারি সহায়তায় জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতেও গড়ে উঠেছে মেয়েদের স্ব-সহায়ক দল। ২০০১-০২ সালের মধ্যে প্রায় ২২০০০ স্ব-সহায়ক দল গড়ে উঠেছে এই জেলায়। এই দলগুলির ২ লক্ষ ২০ হাজার সদস্যা আর তাদের পরিবারগুলি পেয়েছে নতুন এক জীবনের স্বাদ। প্রতি সপ্তাহে এক বা দু-টাকা করে সঞ্চয় করে তাদের নিজস্ব তহবিলই এখন কয়েক কোটি টাকা। গরিব মানুষ সংগঠিত হলে তার শক্তি যে কি হতে পারে তার একটু সামান্য নমুনা দেখা দিয়েছে মেদিনীপুর জেলার এই স্ব-সহায়ক দল গড়ার অভিযানের মধ্য দিয়ে।

জেলার আর্থিক ও পার্থিব সম্পদগুলির মালিকানা পরিবর্তন ও তাদের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে আয় সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এই নতুন ধারার পরিবর্তনই মেদিনীপুর জেলার বেশির ভাগ মানুষদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। ১৯৭৩ সালে যেখানে গ্রামীণ জনসংখ্যার ৭৩.২ শতাংশ ছিল দারিদ্রসীমার নিচে। ১৯৯৪ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৮.৭ শতাংশ।

অন্যদিকে ১৯৭৯ সালে 'গ্রামবাসীদের তৈরি গ্রাম পরিকল্পনা' তৈরির যে পরীক্ষা মেদিনীপুর জেলায় শুরু হয়েছিল তার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ঘটেছে জেলার গ্রামসংসদ, গ্রামপঞ্চায়েত আর পঞ্চায়েত সমিতিগুলিতে। ১৯৯৯-২০০০ সালে জেলার শালবনী পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিটি গ্রামসংসদে শুরু হয় গ্রাম পরিকল্পনা তৈরির এই কাজ। যা আজ সারা রাজ্যে, দেশে এবং দেশের বাইরেও পরিচিতি লাভ করেছে 'শালবনী মডেল' হিসেবে। আর এর পরের বছরেই জেলার সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতিতেই কাজ শুরু হয় এই প্রক্রিয়ায়। আজ এই জেলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই আছে তার নিজস্ব 'বার্ষিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা'-এর দলিল(বই) যা তৈরি করেছে ওই গ্রামপঞ্চায়েতের গ্রামসংসদগুলিতে বসবাসকারী সচেতন গ্রামবাসীরা। গ্রামে কি সম্পদ কি অবস্থায় আছে, কিভাবে সেগুলি ব্যবহার হচ্ছে, কি করলে আরও ভালোভাবে গ্রামের লোকেরাই তা ব্যবহার করতে পারবে তা তারাই ভালো বোঝে। আর এই কাজে সহায়তা করছেন গ্রামপঞ্চায়েত স্তরে নিযুক্ত নানান সরকারি, পঞ্চায়েত এবং সমাজসচেতন কর্মিরা। গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নের সমস্ত কাজই এখন এই জেলায় হচ্ছে 'বার্ষিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা'-এর এই দলিল অনুসারে। মেদিনীপুর জেলার মানুষের উন্নয়নের ইতিহাসে এ এক নয়া অধ্যায়। জেলার উন্নয়নের এই নতুন বিষয় দেখতে আসছেন দেশের অন্য রাজ্যগুলি থেকে তো বটেই ; আসছে অন্য দেশগুলি থেকেও। প্রচেষ্টা চলেছে সারা রাজ্যেই এই নতুন ধারা নিয়ে আসার। গরিব জনসাধারণের উন্নয়নের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেওয়ার যে গতিশীল প্রক্রিয়া জেলায় শুরু হয়েছে তাকে আরও বেশি বেশি করে প্রয়োগের মধ্য দিয়েই সম্ভব হবে বেশীর ভাগ মানুষের স্থায়ী উন্নয়ন। যে সাধারণ মানুষদেরকে উন্নয়নের বাধা হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছিল আজ তারাই উন্নয়নের স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি :

১। A Statistical Account of Bengal, Vol-III by W.W. Hunter (1876) First Reprint in India 1973 by D. K. Publishing House, New Delhi.

২। Bengal District Gazatteers, Midnapore by L. S. S. O'Malley (1911). First Reprint in 1995 by Govt. of West Bengal.

৩। পশ্চিমবঙ্গ দর্পন, মেদিনীপুর, তরুণদেব ভট্টাচার্য-(১৯৭৯) ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৪। বিভিন্ন সালের জনগণনা।

৫। গ্রামভিত্তিক জেলা পরিকল্পনা পদ্ধতি, মেদিনীপুর জেলা পরিষদ, ১৯৮৫

৬। District Statistical Hand Book, Midnapore, Different Years.

৭। Gram Panchayet Planning under Convergent Community Action–A Report to UNICEF, Midnapore Planning and Development Society, 2000.

৮। Methodological I Muss in village Bared Deenlvalised District Planning by Sankar Majumder, Indian Institution of Advanced study, Shimla, 2002.

লেখক : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক
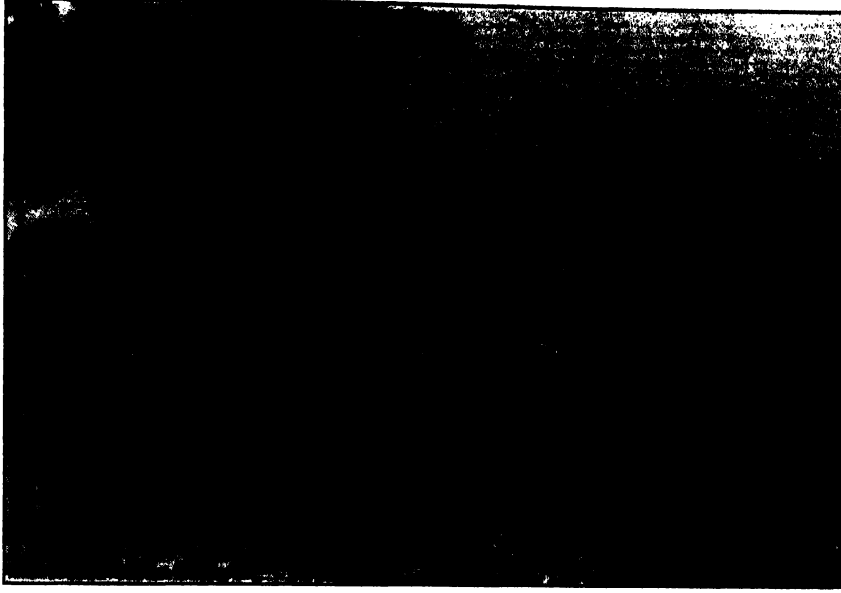
ধানের চারা রোপণে মহিলা শ্রমজীবী

মেদিনীপুর জেলার কৃষি অগ্রগতি ও পরবর্তী পরিকল্পনা

কমল রায়চৌধুরী

মেদিনীপুর পূর্ব ও পশ্চিম এক সময় পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা ছিল। রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত। এর অবস্থিতি ২১° ৩৬´ ৩৫´´ থেকে ২২° ৫৭´ ১০´´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮৩৩° ৫০´´ থেকে ৮৮° ১১´ ৪০´´ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে পড়ে। জেলায় উত্তরাংশ ও উত্তর-পশ্চিমাংশ ছোটনাগপুর পাহাড়ের ছোঁয়ায় থাকায় এই জেলার ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু বৈচিত্র্যময়। রাজ্যের ৪টি অঞ্চলই কাঁকুরে লালমাটি, বিন্ধ্যপলিমাটি, গাঙ্গেয় পলিমাটি, উপকূলবর্তী নোনামাটি কৃষিতে বৈচিত্র্য এনেছে। গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫০০ মি মি থেকে ১৬০০ মি মি। তাপমাত্রা ৭.৫° সে থেকে ৪৪° সে এবং আর্দ্রতা ১৯ থেকে ১০০ ভাগের মধ্যে থাকে। পলিসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতে বৈচিত্র্যময় ফসল ফলে। সেচসেবিত এই অঞ্চলে গভীর ও অগভীর নলকূপ, নদী, খাল, বিল, জলে সারা বছর চাষ আবাদ করা যায়। বহু ফসল চাষের ফলে জমির অতিরিক্ত ব্যবহার ও ভূগর্ভস্থ জলসেচের অতিব্যবহার সংক্রান্ত সমস্যা ক্রমবর্ধমান। এ ছাড়া সমুদ্র নিকটস্থ লবণাক্ত এলাকা উন্নত কৃষির প্রতিবন্ধক, তার উপর দুকুলপ্লাবিত সমুদ্র জলোচ্ছ্বাস অতিরিক্ত সমস্যা সৃষ্টি করে। এই সব অঞ্চলে ধানই প্রধান ফসল। মিষ্টিজলের অপ্রতুলতায় শস্যবৈচিত্র্যে এই এলাকার ভূমিকা কম। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে লাল কাঁকুরে মাটি
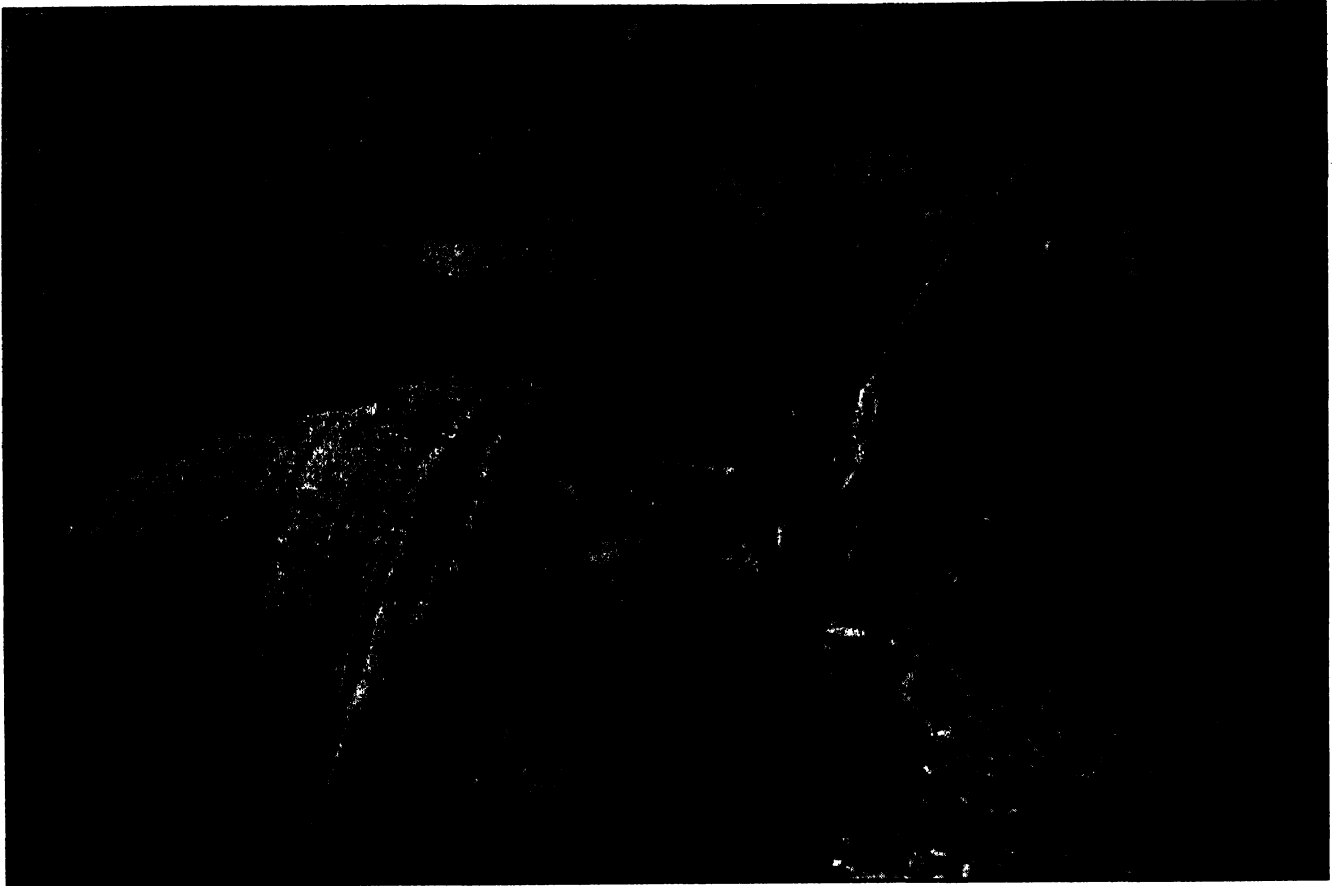
ও শুষ্ক আবহাওয়ার দরুন উন্নত কৃষিকাজ করা ও অধিক ফলন উৎপাদনও প্রতিকূল। শেষ বর্ষার সুযোগ নিয়ে খানিকটা শস্যবৈচিত্র্য আনা সম্ভব, রাজস্থান মডেল অনুযায়ী জমিতে জল ধরে রাখতে পারলে কৃষি উৎপাদনের সম্ভাবনা প্রচুর। অতএব দেখা যাচ্ছে, ভৌগোলিক অসামঞ্জস্য কৃষির উৎপাদনশীলতা অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে।

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার লোকসংখ্যা ২০০১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ৯৭,৫১,২৪৬ জন। রাজ্যের লোকসংখ্যার প্রায় ১২ শতাংশ। ২০০০-২০০১ সালের হিসাব অনুযায়ী দুই মিলিত জেলার মোট জমির পরিমাণ ১৩,২৩,৮৮০ হেঃ-এর মধ্যে ৮,৭৪,২৪২ হেঃ জমিতে চাষ হয়েছে। এটা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ১৫.৫ শতাংশ। এই জেলার গড় নিবিড়তা ১৬৮ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গের গড় নিবিড়তার থেকে সামান্য কম। মিলিত জেলার কৃষক-পরিবারের সংখ্যা আনুমানিক ৯ লক্ষ ৮১ হাজার।

ধান ও আলু এই জেলার মুখ্য কৃষিপণ্য। এই দুই শস্যের উৎপাদন এই জেলার সাফল্য প্রশ্নাতীত। অতিরিক্ত উৎপাদনে দাম কমে যাওয়াটা সমস্যা আকারে দেখা দিচ্ছে। সাফল্য ও নতুন নতুন সমস্যা এই দুয়ের সমন্বয় করে কৃষিতে বৈচিত্র্য আনতে হবে। নতুবা কৃষিকে বর্তমান অর্থনীতির সামনে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে।

এখন দেখা যাক কৃষিতে অগ্রগতি কিরূপ :

১৯৬৩-৬৮	উৎপাদিত	চালের	পরিমাণ	৯.৫৫ লক্ষ টন
১৯৬৮-৭৩	”	”	”	১১.২২ লক্ষ টন
১৯৭৩-৭৮	”	”	”	১১.৭৯ লক্ষ টন
১৯৭৮-৮৪	”	”	”	১১.৬৯ লক্ষ টন
১৯৮৫-৯০	”	”	”	১৬.৭৭ লক্ষ টন
১৯৯০-৯৭	”	”	”	২৭.৬৩ লক্ষ টন
১৯৯৯-২০০০	”	”	”	২৪.১৯ লক্ষ টন
২০০০-২০০১	”	”	”	২৫.৮৪ লক্ষ টন
২০০১-২০০২	”	”	”	২৭.১১ লক্ষ টন

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে দানা শস্য হিসাবে এই জেলায় গমের এলাকা ও উৎপাদন আশানুরূপ নয়। যদিও বিভিন্ন পলিমাটি এলাকায় এর সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আবহাওয়া অনুকূল না থাকায় গমের এলাকা ও উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি ঘটেনি। গমের উৎপাদন ভাল হয় যদি শীত দীর্ঘস্থায়ী থাকে ও সময়ে (নভেম্বর মাসে) লাগাতে পারা যায়।

বিগত ৩ বছরে গমের জমির এলাকা ও উৎপাদন নিম্নরূপ :

বছর	জমি	উৎপাদন
১৯৯৯ - ২০০০ -	৯৮৯২ হেঃ	১৮৩২৩ মেঃ টন
২০০০ - ২০০১ -	১৩৫৬৭ হেঃ	৩১১৫০ মেঃ টন
২০০১ - ২০০২ -	১৭০২৫ হেঃ	৩৫০৮৪ মেঃ টন
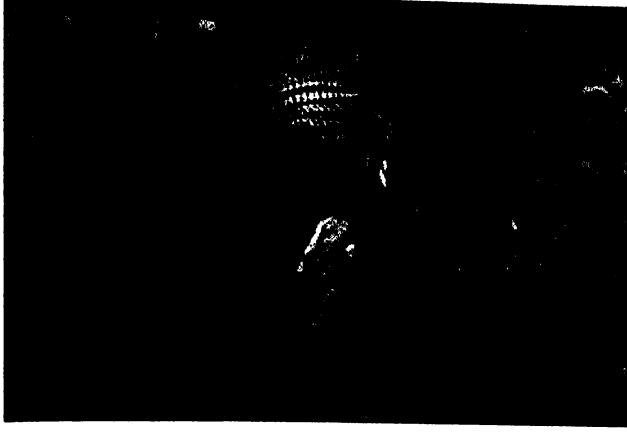
আলুর ক্ষেতে চাষীর একাগ্রতা

ডাল শস্যের চাষ এই দুই জেলাতে নামমাত্র হয়। চাহিদার ১৫ শতাংশ ডাল মিলিত জেলায় উৎপন্ন হয়। যদিও গাঙ্গেয়পলি অঞ্চলে ও লবণাক্ত অঞ্চলে পয়রা শস্য হিসাবে খেসারী চাষের সম্ভাবনা প্রচুর। এ ছাড়া প্রাক্ খরিফ মরসুমে মুগ ও কলাইয়ের লাভজনক চাষ হতে পারে। তেমনই লাল কাঁকুরে মাটি অঞ্চলে খরিফ খন্দে স্বল্পমেয়াদী জাতের অরহর চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান। শস্যবৈচিত্র্যে ডাল চাষে সম্ভাবনা বৃদ্ধি নিয়ে কৃষি বিভাগে সর্বস্তরে সমীক্ষা ও আলোচনা শুরু হয়েছে।

বিগত ৩ বছরে ডাল শস্যের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

বছর	জমি	উৎপাদন
১৯৯৯-২০০০	১৩২৪০ হেঃ	১০২৬৪ মেঃ টন
২০০০-২০০১	২০৭৯২ হেঃ	২০০৭৭ মেঃ টন
২০০১-২০০২	১৫২৩০ হেঃ	১৪৪২৬ মেঃ টন

ফসলের অপর দিকে তৈলবীজ চাষে নতুন নতুন চাষের ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পূর্ব মেদিনীপুরে সূর্যমুখী ও বাদাম এলাকা বৃদ্ধির মুখে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় সরিষার এলাকা বৃদ্ধি উৎসাহজনক। আলুর জমিতে তিল চাষের এলাকা বৃদ্ধিও লক্ষ্য করার মতো। তা সত্ত্বেও জেলায় প্রয়োজনের ৪০ শতাংশ মতো উৎপাদন হচ্ছে। ৬০ শতাংশ কম আছে। বিগত ৩ বছরে তৈলবীজ শস্যের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ।

বছর	জমি	উৎপাদন
১৯৯৯-২০০০	৬৩০৮২ হেঃ	৫৬০৩৫ টন
২০০০-২০০১	৭২৫০৫ হেঃ	৮২৮৯০ টন
২০০১-২০০২	৮০৬৩০ হেঃ	৪৮৩৭৮ টন (খরার জন্য ফলন অত্যধিক কম হয়েছে)

সবজি এ জেলার এক গুরুত্বপূর্ণ ফসল। সাধারণত নির্দিষ্ট জমিতে সবজি চাষ হয়ে থাকে। আলু বাদে তার পরিমাণ ৩৫-৪০ হাজার হেক্টর। আলু মূলত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ফসল। মিলিত জেলায় আনুমানিক ৮০ হাজার হেক্টর জমিতে গত বছর (২০০২-২০০৩) চাষ হয়েছিল। উৎপাদনে সবজি (আলুসহ) এই সমগ্র জেলায় উদ্বৃত্ত। কেবলমাত্র অর্ধেক পরিমাণ উৎপন্ন আলু ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করা চাষীদের কাছে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন দেখা যাক চাল, ডাল, তৈলবীজ, সবজিতে এই সমগ্র জেলার চাহিদা ও গড় উৎপাদন কিরূপ। ২০০১ জনসংখ্যার ওপর ভিত্তি করে ও তার উপর ২.২ শতাংশ বাৎসরিক বৃদ্ধি করে।

প্রতিদিন একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের চাহিদার হিসাবে প্রয়োজন :

পূর্ণবয়স্ক লোকের চাহিদা	প্রয়োজন	গড় উৎপাদন (গত ৩ বছরে)
চাল ৪৫০ গ্রাম	১৬.৭২ লক্ষ টন	২৫.৭১ লক্ষ টন
ডাল ৩৫ গ্রাম	১.৩০ লক্ষ টন	০.২৮ লক্ষ টন
তৈলবীজ ৪৫ গ্রাম	১.৬৭ লক্ষ টন	০.৬২ লক্ষ টন
সবজি ২৮০ গ্রাম	১০.৫০ লক্ষ টন	২৮.০০ লক্ষ টন

উপরোক্ত তথ্য নির্দেশ দিচ্ছে আগামীদিনের কৃষি পরিকল্পনাতে সর্বস্তরে ডালশস্য ও তৈলবীজ এলাকা ও উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দিতে হবে। সেই সঙ্গে ধান চাষে চালের মান বৃদ্ধির উপর (বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী) জোর দিতে হবে। এটা সম্ভব হবে নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। প্রশিক্ষণ গ্রামস্তর পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে পঞ্চায়েতকে এগিয়ে আসতে হবে।

জমি প্রস্তুত, বীজ বপণের অপেক্ষায়

এ ছাড়া আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল রয়েছে, তার মধ্যে পান, কাজু বাদাম, ফুল, মাদুরকাটি ও সাবুই ঘাসের চাষ উল্লেখযোগ্য। পান ও কাজু চাষে এই দুই জেলার স্থান রাজ্যের সর্বাগ্রে। পান ও কাজু দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এমনকি ভারতের বাইরেও রপ্তানি হচ্ছে। আর ফুল দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যাচ্ছে। মেদিনীপুরের মাদুর পূর্ব ভারতে প্রসিদ্ধ। বাণিজ্যিক কদর থাকা সত্ত্বেও এদের উন্নয়ন গুরুত্ব পায়নি। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি গবেষণা এ নিয়ে কিছু পদক্ষেপ নিলে এই সব চাষের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি সম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে পান ও ফুলের সংরক্ষণ ও বিপণনের ওপর জোর দেওয়া দরকার, যাতে কৃষকরা ন্যায্যমূল্য পায়। ফুল থেকে সুগন্ধি শিল্প গড়ে তোলারও প্রয়োজন রয়েছে। জেলার উপকূলবর্তী এলাকায় তরমুজ এক সম্ভাবনাময় ফসল। স্বাস্থ্যকর পানীয়শিল্প গড়ে তুলতে পারলে তরমুজের চাষ যথেষ্ট বাড়তে পারে। ইতিমধ্যে রাজ্যে উদ্যান বিভাগ ও খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ বিভাগ স্বতন্ত্রভাবে কাজ করছে। আশা করা যায়, এগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিপণন বৃদ্ধির ওপর জোর দেবেন।
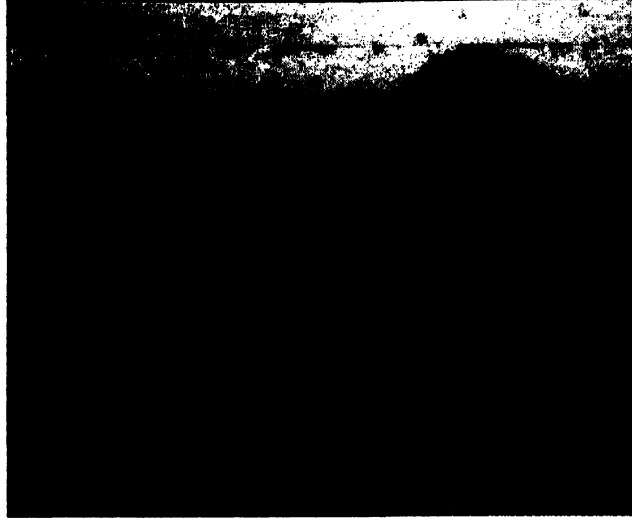
প্রাক্ খরিফ মরসুমের চাষ

চাষের মূল কথা হল মাটি। মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য রয়েছে পরীক্ষাগার। সেটি মেদিনীপুর শহরে অবস্থিত। মাটি পরীক্ষাগার পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। একটি পরীক্ষাগার হওয়ার জন্য চাষী ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে দূরত্ব রয়ে গেছে।

তেমনই সার ও কীটনাশক পরীক্ষাগার এই জেলায় অবস্থিত। গুণগত মান নিয়মিত পরীক্ষা হচ্ছে।

বীজ চাষের মূল উপকরণ। উন্নতমানের বীজ ২৬ শতাংশ ফসল বাড়াতে সাহায্য করে। কিন্তু সংশিত বীজ ব্যবহার চাষীদের কাছে দুরাশায় পরিণত হয়েছে। নানা কারণে জেলায় কুড়িটি কৃষি খামারে উন্নতমানের সংশিত বীজ উৎপাদন করা যাচ্ছে না। বর্তমানে সরকার এদিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন। কি করে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন করা যায় তার জন্য যথাযোগ্য পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছেন। উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে সর্বস্তরে উন্নতমানের ও জাতের, সংশিত বীজ অন্তত ১০ শতাংশ চাষীদের ব্যবহার করতে হবে।

চাষের আর এক উপকরণ সার। ৫৬ শতাংশ ফলন বৃদ্ধি সম্ভব এই সার ব্যবহার করে। কিন্তু কেবলমাত্র নাঃ, ফঃ ও পঃ সার যা রাসায়নিক সার হিসাবে খ্যাত তার ব্যবহার করে উপযুক্ত মানের ফসল বৃদ্ধি সম্ভব নয়। তাই কম্পোস্ট, সবুজ সার, ব্যাকটেরিয়াঘটিত সার, কেঁচো সার, গোবর সারের ব্যবহার যতটা সম্ভব বাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে। Problem Soil.-এর পুনরুদ্ধারের জন্য চুন, রকফেট্ বেসিকস্ল্যাগ, ডলোমাইট ইত্যাদির ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে। Micro nutrient বা অণুখাদ্যের ব্যবহার রাসায়নিক সারের সঙ্গে করতে হবে। সমগ্র এই জেলায় দস্তা, বোরনের মতো অণুখাদ্যের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ৩ বছর অন্তর ব্যবহার করতে পারলে ফলনের আশানুরূপ বৃদ্ধি সম্ভব।

ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্পষ্টকথায় বলা যেতে পারে যে, চাষীভাইরা যতটা সম্ভব কম ওষুধ ব্যবহার করেন ততই পরিবেশ, স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গল। কেবলমাত্র বীজশোধন বাধ্যতামূলক করতে হবে। রাসায়নিক ওষুধের পরিবর্তে নিমজাতীয় জৈব ওষুধ ব্যবহার বাড়াতে হবে এবং চাষীভাইদের উৎসাহিত করতে হবে।

সামগ্রিকভাবে জেলায় ৫০ শতাংশের মতো এলাকা সেচের আওতায় রয়েছে। মাটি থেকে জল তোলার প্রবণতা কমিয়ে মাঠনালা, পাকানালার সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা করতে পারলে জলের অপচয় রোধ সম্ভব। মাটির রসকে যতটা সম্ভব কাজে লাগাতে হবে। বিনা সেচে গম, সরিষা, ডালশস্য মাটির রসের সাহায্যে চাষ করা যায়। কংসাবতী জলাধার থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বর্ষার মরশুমে ৭০-৮০ হাজার হেক্টর জমি উপকৃত হয়। যদিও বেশির ভাগ পরিমাণ জল নানা কারণে অপচয় হয়। সুনির্দিষ্ট পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী নিশ্চিত জল সরবরাহের আশ্বাস পেলে চাষীভাইরা জলের সদ্ব্যবহার বাড়াতে পারবেন।

পরিশেষে জেলার কৃষি অগ্রগতিতে সকল স্তরের পঞ্চায়েত, কৃষির সঙ্গে যুক্ত সরকারি বিভাগ, বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র, আই আই টি-র গ্রাম উন্নয়ন বিভাগ-সহ সর্বস্তরের কৃষিকর্মীগণ যদি হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেন তা হলে এই জেলা প্রয়োজনীয় সাহায্যের অভাব পূরণে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারে।

লেখক : যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা, মেদিনীপুর মণ্ডল
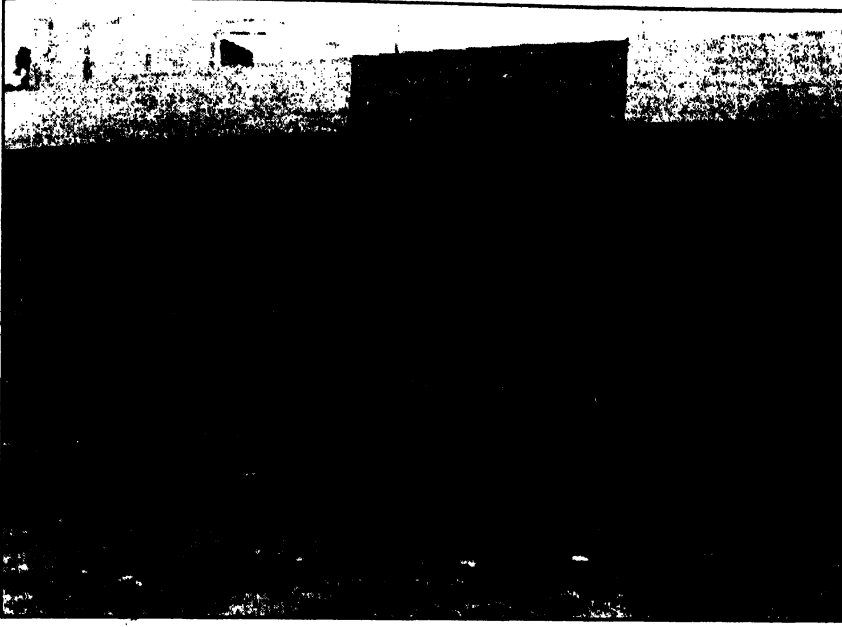
খাদ্য ভাণ্ডার, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ। রাঙামাটি, পশ্চিম-মেদিনীপুর

মেদিনীপুর জেলার কৃষি উন্নয়ন

রাধাগোবিন্দ মাইতি

পশ্চিম বাংলার বৃহত্তম জেলা (অবিভক্ত) মেদিনীপুর ১৪,০৮,১০০ হেক্টর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। রাজ্যের অন্যান্য জেলার মত এই জেলার অর্থনীতিও মূলত কৃষিনির্ভর। তাই কৃষির উন্নয়নের মধ্যেই নিহিত আছে অধিবাসীদের জীয়নকাঠি-মরণকাঠি। বর্তমান নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হল—এই জেলায় কৃষির বর্তমান অবস্থা, সমস্যা ও সমাধানের পথনির্দেশ।

জেলার মোট এলাকার ৫২ শতাংশ জমি তৈরি পলিমাটি দিয়ে ; ৩০ শতাংশ লাল কাঁকুরে জমি আর ১৮ শতাংশ প্রধানত বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী লবণাক্ত অঞ্চল। ফসল ফলে মোট ৮,৭০,০০০ হেক্টরে। তার মধ্যে সিংহভাগ (৮৮ শতাংশ) অধিকার করে আছে ধান—উচ্চফলনশীল এবং চিরাচরিত জাত—দুয়ে মিলে। গম, পাট, তৈলবীজ, ডালশস্য নামমাত্র (৬ শতাংশ)। আলু এবং সবজির এলাকা বাড়ছে। এদের আওতায় আছে কম-বেশি প্রায় এক লক্ষ হেক্টর। আর আছে পান। তার এলাকা ৩২০০ হেক্টর। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক (১৯৯০-৯৫) যোজনায় মেদিনীপুর জেলার জন্য যে উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া তৈরি হয়েছিল, এসব তথ্য তার থেকে নেওয়া। এর চেয়ে আধুনিক তথ্য লেখকের হাতে নেই। তবে, তাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। কারণ, গুণীজন জানেন—শুধু মেদিনীপুর বা পশ্চিমবাংলা নয়, সারা ভারতবর্ষের সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য ঘড়ির দোদুল্যমান পেন্ডুলামের অবস্থানের মতোই নির্ভরযোগ্য।
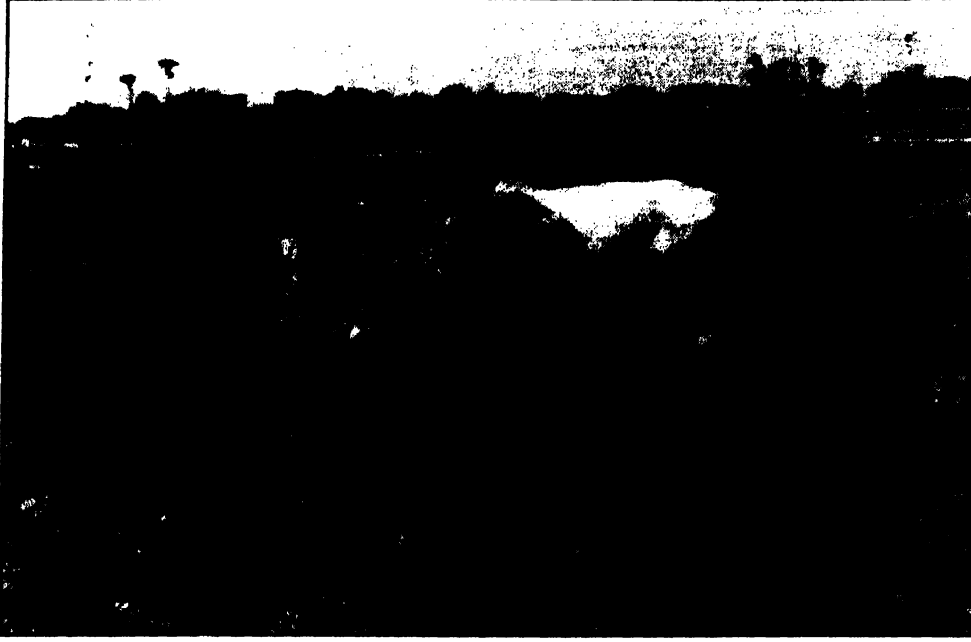
মেদিনীপুরে উচ্চফলনশীল ধানচাষের এলাকা বেড়ে চলেছে

আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার তাঁর নির্বাচনী সভায় গর্বভরে বলতেন—'আমি চাষির ছেলে' (I am a farmer's son)। আমাদের কোন রাজনীতিবিদকে মুক্তমঞ্চে একথা বলতে শোনা যায়নি। অতদূরে দৃষ্টি না নিয়ে গিয়ে আমাদের দেশের রাজ্য পাঞ্জাবের দিকে তাকানো যাক। সেখানকার চাষিদের মধ্যে বি. এ, এম. এ পাশ লোকের অভাব নেই। অনেক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারেরও খোঁজ পাওয়া যাবে। অবসর নেওয়ার পর বহু কর্নেল, মেজর, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট চাষ করছেন। নির্বাচন কমিশনের পুরোধা গিল সাহেবের নিজের কৃষি ফার্ম আছে। তিনি নিয়মিত সেখানে গিয়ে দেখাশোনা করেন। পাঞ্জাবের কৃষি ও কৃষক উন্নত। কৃষিজাত সম্পদে ঐ রাজ্যে গড়ে উঠেছে কল-কারখানা, শিল্পসম্ভার। তাই পাঞ্জাব আজ একটি উন্নত প্রদেশ। একই চিত্র মহারাষ্ট্রে। সেখানকার কলা, আঙুর, কমলালেবু, পেঁয়াজ পশ্চিমবাংলাসহ অন্যান্য রাজ্যের বাজার ভরে দিচ্ছে। তেলের যোগান দিচ্ছে মহারাষ্ট্রের চিনাবাদাম। এসব ফসল তৈরি হচ্ছে উন্নত পদ্ধতিতে। তবে, আজকাল হাওয়া বদলাচ্ছে। এখন এ রাজ্যেও লেখাপড়া জানা যুবকেরা চাষে নামছে। কিন্তু সেটা কৃষিকে ভালবেসে নয়, চাকরি না পাওয়ায় জীবিকার বিকল্প উপায় হিসাবে। এটা মন্দের ভাল।

মেদিনীপুরে চাষের উন্নত পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে প্রধানত উচ্চফলনশীল জাতের ধান চাষে ; এবং কিছুটা আলু ও পানে। যেখানে সেচের জল সহজলভ্য, সেখানে উচ্চফলনশীল ধানের এলাকা বেড়ে চলেছে ; একই জমিতে বছরে তিনটা ধানের ফসল নেওয়া হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে এটা আনন্দের হলেও এই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হবে না, উন্মার্গগামী হাউইয়ের মত শীঘ্রই অধোগামী হবে।

কারণ, যে কোন ফসলের তুলনায় উচ্চফলনশীল ধানচাষে জল লাগে অনেক বেশি। ফসল যতদিন মাঠে থাকে, তার বেশিরভাগ সময় জমিতে জল ধরে রাখতে হয় সেচ দিয়ে। সেচের জলের প্রধান উৎস মাটির নিচে। কিন্তু সেখানে জলের পরিমাণ সীমিত। যতই উচ্চফলনশীল ধানের চাষ বাড়ছে, ততই ভূগর্ভের জলস্তর নামছে। আগে গাঁ-গঞ্জে অল্প আয়াসে চাপাকলে জল উঠত। আজকাল গরমের দিনে অধিকাংশ

যাই হোক, এই খসড়ায় গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, শুয়োর, হাঁস-মুরগির সংখ্যা আছে, এমন কি সংকর গাই বা তিনবছরের বেশি বয়সের গরুর সংখ্যা আছে, মাছ চাষের এলাকা আছে, বছরে কতটা অন্তর্দেশীয় মাছ আর কতটা সামুদ্রিক মাছ ধরা পড়ে—তার পরিমাণ আছে ; কিন্তু ফল বা ফুল চাষের এলাকার উল্লেখ নেই।

অথচ সবাই জানি—মেদিনীপুরে ফলচাষ হয়। ঝাড়গ্রাম এলাকায় বড় বড় পেয়ারা বাগান আছে ; প্রত্যেক বাস্তুভিটা, পুকুর পাড় আর ডাঙ্গা জমিতে আম, জাম, পেয়ারা, বাতাবি লেবু, পাতিলেবু, কাঁঠাল, কলা, কাজু, পেঁপে এবং অল্প-বিস্তর সপেদা, নারকেল, কামরাঙা, জামরুল, গোলাপজাম, আনারস, আতা, কুল, বেল, ডালিম, তাল, খেজুর, আমড়ার গাছ আছে। পাঁশকুড়া-কোলাঘাট অঞ্চলে মাঠ জুড়ে গোলাপ, বেল, জুঁই, গাঁদা, রজনীগন্ধা প্রভৃতি কয়েকডজন ফুলের চাষ হয়।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মেদিনীপুরকে অগ্রসর জেলা বলা যায় না। কারণ, এ জেলার কৃষি পদ্ধতি আজও উন্নতমানে পৌঁছতে পারেনি। এর অন্যতম কারণ হল—জীবিকার সভায় কৃষি আজও সম্মানজনক আসন পায়নি। ফলে, লেখাপড়া শিখে ছেলেমেয়েরা চাকরি করছে; প্রতিভাবানেরা কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। যাদের হাতে পয়সা আছে, তারা লেগে যাচ্ছে ব্যবসায়ে। কৃষি নিয়ে পড়ে আছে অশিক্ষিত, অল্প-শিক্ষিত এবং আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল লোকেরা। এরাই জেলার জনসংখ্যার চারভাগের তিনভাগ। এদের অবস্থা উন্নত নয় বলে জেলা অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল।

চাপাকলে আর জল উঠছে না। অগভীর নলকূপেও একই অবস্থা। মিনি-ডীপ টিউবওয়েল মাটির আরও গভীর স্তর থেকে জল টেনে তুলতে পারে। এটা বসাতে খরচ অনেক বেশি। যাদের টাকা আছে, তারা বসাচ্ছে। কিন্তু মাটির তলায় জলের ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়। একদিন ওটাও কমবে। তখন পিপাসা মেটানোর জলে টান পড়বে। তার আগেই সে জলে আর্সেনিক দূষণ শুরু হয়ে গেছে।

মাটির তলার ভাণ্ডারে জল জমে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে। যখন বন-জঙ্গল ছিল, বৃষ্টির জলের অনেকটাই তলায় বিছান পাতায় ধরা পড়ত। সেখান থেকে ধীরে ধীরে নিচে নেমে যেত। এখন বন-জঙ্গল কেটে সাফ। চারদিক ধূ-ধূ। এখন নামেই কেবল জঙ্গল-মহাল ; গাছ নেই বললেই চলে। নামেই তালপুকুর, কিন্তু ঘটি ডোবে না।

গাছ নেই বলে বৃষ্টির জল আর ঝরা পাতায় আটকায় না ; বাধাবন্ধহারা ধারায় নিচের দিকে গড়িয়ে যায় ; নদীতে ঢল নামে ; বন্যায় ঘর-বাড়ি, চাষবাস ভেসে যায়। জলধারার সঙ্গে ওপরের উর্বর মাটি ধুয়ে গিয়ে জলাধার, নদীতল ভরিয়ে দেয়। দিনে দিনে বন্যার প্রকোপ বাড়ে ; উর্বরা মাটি বন্ধ্যা হতে থাকে। কিন্তু ভূগর্ভের জলাধারে অভাব পূরণ হয় না। এখনই সাবধান না হলে অদূর ভবিষ্যতে উচ্চফলনশীল ধানের চাষ বন্ধ হয়ে যাবে ; চাষীদের মুখের হাসি শুকিয়ে যাবে।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে গ্রামের মানুষ কলের লাঙল দেখেনি। এখন যত্রতত্র ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ঘুরে বেড়ায়। একই জমিতে বছরে তিন-চারটে ফসল নিতে হলে জমি তৈরির কাজ তড়িঘড়ি সারতে হবে। বলদের লাঙলে সেটা সম্ভব নয়। বলদের জোর কম। তারা কেবল দিনের বেলায় কাজ করতে পারে। হেড লাইট জ্বালিয়ে যন্ত্র কাজ করে রাতেও। সুতরাং বলদের সংখ্যা কমছে। সেই সঙ্গে দুষ্প্রাপ্য হচ্ছে গোবরসার। যেটুকু গোবর এখন পাওয়া যায়, গাছপালা কমে যাওয়ায় জ্বালানীর অভাবে তাও পুড়ে যাচ্ছে। জৈবসার মাটির প্রাণ। অতীতে গোবরসার সেই প্রাণ রক্ষা করেছে। এখন গোবর সারের অভাবে কেবল রাসায়নিক সার দিয়ে ফসল ফলান হচ্ছে। শুরুতে ফলন ভালই হয়েছে। এখন আর রাসায়নিক সারে তেমন কাজ হচ্ছে না ; বাড়ছে অনুখাদ্যের অভাব আর রোগের প্রাদুর্ভাব। যতই দিন যাবে ক্রমাগত রাসায়নিক সার ব্যবহারে ততই জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমবে। জমি বন্ধ্যা হয়ে যাবে। অনাগত প্রজন্মের জন্য আমরা মরুভূমি রেখে যাব। এ বিপদ ঠেকাতে হলে জমিতে জৈবসার দিতেই হবে। গোবর সারের বিকল্প হিসাবে ঘাস, পাতা, খড়, কচুরিপানা পচিয়ে জৈবসার তৈরি করতে হবে, সবুজ সারের চাষ করতে হবে।

বোরোতে উচ্চফলনশীল ধানের চাষ কমিয়ে বিকল্প লাভজনক ফসলের খোঁজ করতে হবে। পেঁয়াজ এরকম একটি ফসল। পূর্ব মেদিনীপুরে, দক্ষিণের লোনা জমিতে ভাল পেঁয়াজ হবে। অথচ আমরা পেঁয়াজের জন্য মহারাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী। প্রয়োজনে ২৫/৩০ টাকা কেজিতে পেঁয়াজ কিনছি। কেউ কেউ পেঁয়াজ চাষ করেন। ভুল পদ্ধতির জন্য ফলন বেশি হয় না, পচে যায়। পেঁয়াজের চারা বসাতে হবে নভেম্বরের শুরুতে। যে জমি ওই সময় শুকিয়ে যায়, সে জমিতে তো পেঁয়াজ হবেই, যেখানে কিছুটা জল জমে থাকে সেখানেও চারা বসান যাবে। সঠিক পদ্ধতিতে চাষ করলে জমি থেকে তোলার পর সহজেই ১০-১২ সপ্তাহ ধরে পেঁয়াজকে ঘরে রাখা যায়। ওই সময়ের ভিতর লাভজনক দামে ফসল বিক্রি হয়ে যাবে। কারণ পশ্চিমবাংলার চাহিদা মেটাতে প্রচুর পেঁয়াজ লাগে।

বছর ত্রিশেক আগেও এ রাজ্যের চাহিদা মেটাতে ভিন্ রাজ্য থেকে প্রচুর আলু আমদানি করা হত। উন্নত পদ্ধতি অনুসরণের ফলে এখন উৎপাদন এত বেড়ে গেছে যে পশ্চিমবাংলার চাহিদা মিটিয়ে এ রাজ্যের আলু বাইরে চালান যাচ্ছে। এই উন্নত পদ্ধতি চালু করার জন্য সরকারি তরফে যে প্রচেষ্টা চালান হয়, তা প্রশংসার যোগ্য। একই ব্যবস্থা নিলে মেদিনীপুরের পেঁয়াজও স্থানীয় অভাব মিটিয়ে অন্যত্র চালান যাবে।

পেঁয়াজ ছাড়া চাষ করা যেতে পারে শীত ও গ্রীষ্মের শাক সবজি বোরো ধানের বিকল্প হিসাবে। কলকাতা পূর্বভারতে সবচেয়ে বড় সবজির বাজার। এর চাহিদা মেটাতে রাজ্যের বাইরে থেকে অজস্র শাক-সবজি আসে। মেদিনীপুর সহজেই এই বাজারের সুবিধা নিতে পারে। সুখের কথা জেলার অনেক জায়গায় এ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে—বিশেষত পূর্ব মেদিনীপুরে। সবজির এলাকা আরও বাড়াতে হবে।

সবজিকে টাটকা অবস্থায় পাঠাতে না পারলে বাজারে ভাল দাম পাওয়া যায় না। এজন্য উপযুক্তভাবে প্যাকিং করতে হবে। বর্তমানে যেভাবে প্যাকিং করা হয়, তা মোটেই উন্নত নয়। একটি চওড়া বাঁশের ঝুড়ির মুখে জাল বেঁধে বেগুন, পটল, বরবটি, করলা প্রভৃতি সবজি ঠেসে ভরে দেওয়া হয়। এ রকম একঝুড়ি সবজির ওজন ৫০-৬০ কিলোগ্রাম। এ ধরনের প্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে নিচের সবজির ওপর খুব চাপ পড়ে। বাজারের পথে লরি বা বাসের ঝাঁকানিতে সেগুলো থেঁতলে যায়। বাইরে থেকে প্রথমে এই ক্ষতি নজরে নাও আসতে পারে। কিন্তু দু-একদিন দোকানে বা বাড়িতে রাখার পর ওই সবজিগুলি পচে যায়। এই ক্ষতি বন্ধ করতে হলে উপযুক্ত পদ্ধতিতে প্যাকিং করতে হবে। প্যাকিংয়ের উন্নত পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে ভঙ্গুর ডিম কর্নাটকের মত দূরের রাজ্য থেকে কোটি কোটি সংখ্যায় প্রায় অক্ষত অবস্থায় পশ্চিমবাংলায় আসছে। উন্নত প্যাকিং ব্যবস্থার ফলে আমরা সুদুর অন্ধ্রপ্রদেশের মাছ তাজা অবস্থায় বাজারে পাচ্ছি।

সবজির তাজা ভাব বজায় রাখার জন্য জমি থেকে তোলার পর সেগুলোকে তাড়াতাড়ি বাজারে পাঠাতে হবে। এজন্য চাই ভাল রাস্তাঘাট। মেদিনীপুরে এটার বড় অভাব। রাস্তা তৈরির ওপর বেশি নজর দিতে হবে। শুধু কৃষির স্বার্থেই

আলুখেতে জল সিঞ্চন

নয়, অন্যান্য ব্যবসাবাণিজ্য ও জীবিকার স্বার্থে ভাল রাস্তাঘাট চাই।

এবার ফলের কথায় আসা যাক। গত ১০-১২ বছরে বাঙালিদের ফল খাওয়ার অভ্যাস যে বেশ বেড়েছে, তা গাঁ-গঞ্জের বাজারে কলা, আম, পেয়ারা, কমলালেবু, মোসাম্বী, আপেল, আঙুর, আনারস, বেদানা প্রভৃতি ফলের বিক্রির বহর দেখলেই বোঝা যায়। আগেকার লোকের ধারণা ছিল—ফল লাগে পূজায় আর রোগীর পথ্যে। ফল যে শরীর রক্ষায় অতি প্রয়োজন, সে জ্ঞান হয়েছে আমাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। যেসব ফলের নাম বলা হল, এদের বেশির ভাগই আসছে অন্য রাজ্য থেকে। অথচ আঙুর এবং আপেল ছাড়া বাকিগুলি মেদিনীপুর জেলার মাটি ও জলবায়ুতে লাভজনকভাবে উৎপাদন করা যায়।

সবার বাড়িতেই কম-বেশি ফলগাছ আছে। অযত্নেই সেগুলি ফল দেয়। তাই ফলকে যে যত্ন সহকারে চাষ করতে হয়—এ ধারণা আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। অতীতে চাহিদার অভাবও ফলকে ফসলের মর্যাদা দেওয়ার পথে বাধাস্বরূপ ছিল। এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। ঠিকমত চাষ করতে পারলে ধান তো বটেই, অধিকাংশ সবজির চেয়ে ফলচাষে লাভ বেশি, ঝক্কি-ঝামেলা কম। ধান বা সবজি চাষে প্রত্যেক মরশুমে নতুন করে জমি তৈরি করে বীজ বুনতে হয় বা চারা লাগাতে হয়। অধিকাংশ ফলের ক্ষেত্রে একবার এ ঝামেলা পোহাতে পারলে বহু বছর নিশ্চিন্ত থাকা যায়। তা ছাড়া, এমন জমি আছে যেখানে ধান হয় না, সবজিও ভাল ফলে না ; কিন্তু ফলচাষ করা যায়। ফলচাষে রোগ ও পোকার আক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম।

ফলচাষে কিছু বিশেষত্ব আছে। ফলের জন্য চাই উঁচু জমি। ব্যবসাভিত্তিক চাষ করতে হলে জমির পরিমাণও বেশি হওয়া দরকার। তবে, আমাদের বাড়ির আশেপাশে যে ফলগাছ আছে, ঠিকমত যত্ন পেলে তার ফলন অনেক বেড়ে যাবে। তখন বাড়ির চাহিদা মিটিয়ে বাকিটা বাজারে পাঠালে দু'পয়সা হাতে আসবে। অনেকে ভাবেন—গাছ লাগানোর পর ফলের জন্য বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়। গরিব লোকের পক্ষে অতদিন বিনা আয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। এ কথা কিন্তু ঠিক নয়। যতদিন না গাছে ফল ধরে, ততদিন গাছ ছোট থাকে। সেই সময় দুটি গাছের মাঝখানে যে জমি খালি পড়ে থাকে, সেখানে শাক-সবজি আলু প্রভৃতি চাষ করা যায়। গাছ বড় হয়ে জমি ঢেকে ফেললেও আদা, হলুদ, আনারস প্রভৃতি ছায়া-সহনশীল ফসল নিচে লাগান যায়। নারকেল, সুপারি প্রভৃতি গাছের গায়ে গোলমরিচের লতা চড়িয়ে দিলে ডবল আয় হয়। মেদিনীপুর
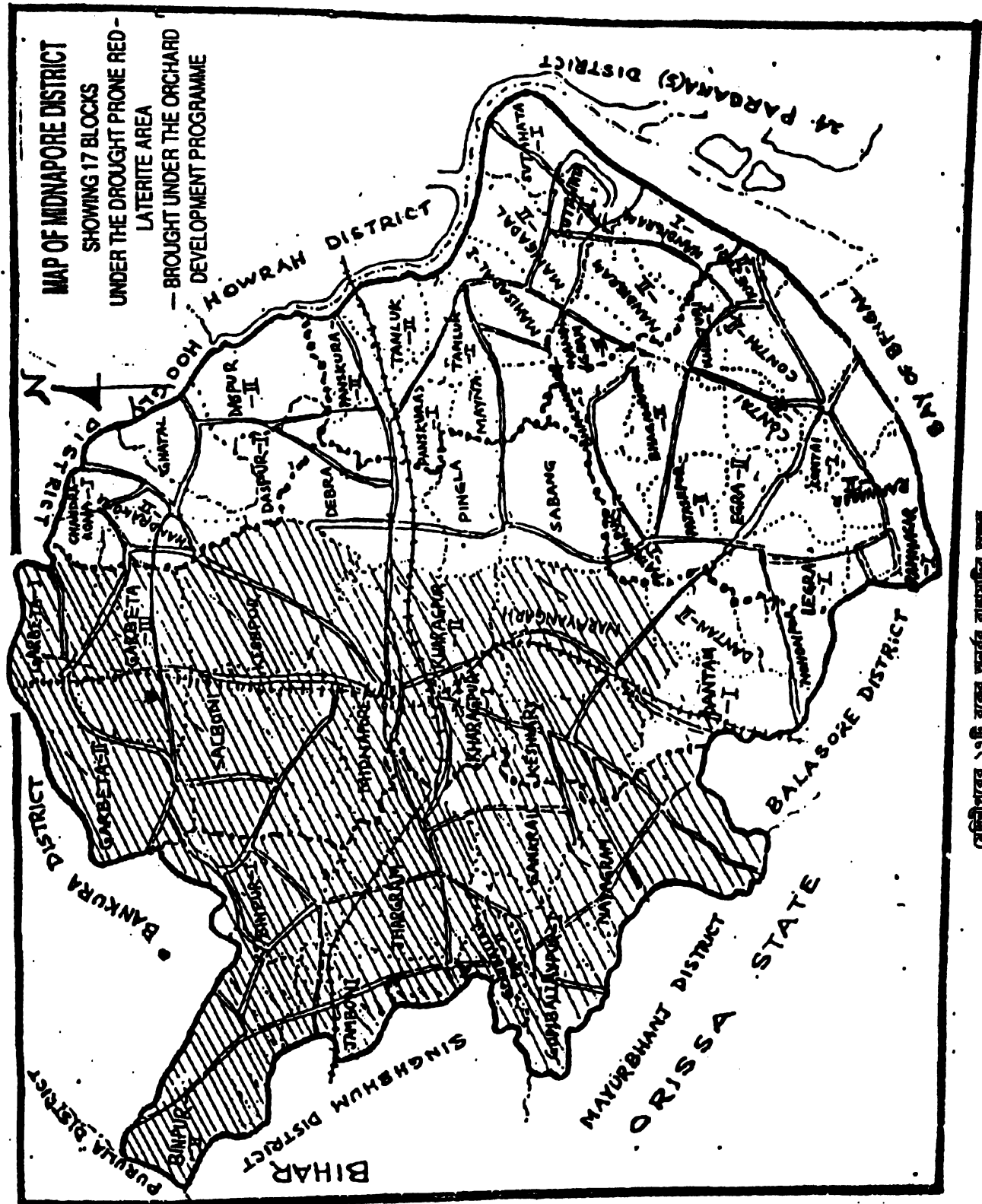
জেলার পূর্বাঞ্চলের আবহাওয়া এ ধরনের মিশ্র চাষের উপযোগী।

ব্যবসাভিত্তিক চাষের জন্য ফলগাছ বাছতে হবে মাটি এবং আবহাওয়া অনুসারে। গড়বেতা-১ এবং গড়বেতা-২, এই ব্লক দুটিকে পশ্চিমে রেখে মেদিনীপুরের মানচিত্রের উত্তর সীমা থেকে দক্ষিণে মোহনপুর পর্যন্ত মোটামুটি একটা সরলরেখা টানলে জেলাকে দুভাগে ভাগ করা যায়। পশ্চিমভাগ থেকে দাঁতন-১ এবং দাঁতন-২ ব্লককে বাদ দিলে আর যে সতেরটি ব্লক আছে, সেগুলি খরাপ্রবণ এলাকা (চিত্র-১)। এখানে জমি ঢালু বলে বৃষ্টির জল দাঁড়ায় না ; অল্প কিছুদিন বৃষ্টি না হলেই ফসলে জলটান পড়ে। অনেক সময় বৃষ্টির অভাবে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এই এলাকার অধিকাংশ জায়গার মাটি কাঁকুরে এবং লাল। তাই একে রাঙ্গামাটি অঞ্চল বলে। উর্বরতা কম বলে এ অঞ্চলে ধান, গম, শাক-সবজি প্রভৃতি ভাল হয় না। সেচ ব্যবস্থাও অপ্রতুল। এখানকার অধিবাসী জেলার পূর্ব ভাগের তুলনায় বেশি আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত। লাভজনক ফসল হিসাবে ফলগাছ এ অঞ্চলে কার্যকরী হবে—সরকারি ও বেসরকারি পরীক্ষায় এটা প্রমাণিত হয়েছে। তবে সবরকম ফল এ পরিবেশের উপযোগী নয়। অবস্থা যেখানে খুবই খারাপ, অর্থাৎ মাটি প্রায় পাথুরে এবং জলের অভাব—সেখানে উপযুক্ত ফলগাছ হিসাবে বেছে নিতে হবে তেঁতুল, আমলকী, কালোজাম, বেল, কয়েতবেল এবং আতা। পরিস্থিতি এর চেয়ে একটু ভাল হলে (মাটি কাঁকুরে কিন্তু খানিকটা গভীর এবং জল একেবারে অমিল নয়) সেখানে কুল, পেয়ারা, বেদানা, ফলসা, করমচা, কাজু, চালতা প্রভৃতি লাগান যাবে। যেখানে মাটির পাঁচ-ছ' ফুট নিচে পাথর এবং মাটির গঠন কাঁকর, বালি ও কাদায় মেশামেশি, সেচের মোটামুটি ভাল ব্যবস্থা আছে, সেখানে হবে পাতিলেবু, মোসাম্বী, কমলালেবু, আম, কাঁঠাল এবং পেঁপে।

রেখার পূর্বদিকের জমি উর্বর, মাটি বেলে-দোয়াঁশ, দোয়াঁশ কিংবা এঁটেল ; সেচের জল পাওয়া যায়। রাঙামাটি অঞ্চলের বেদানা, মোসাম্বী, কমলালেবু ছাড়া অন্যান্য ফলগুলি তো এখানে হবেই, তাছাড়া হবে নারকেল, সুপারি, কলা, আনারস, লিচু, সপেদা, কামরাঙ্গা, জামরুল, গোলাপজাম প্রভৃতি ; কাঁথির দিকের মাটিতে কম-বেশি লবণ আছে। নারকেল, সুপারি, জামরুল, সপেদার পক্ষে এ এলাকা বিশেষ উপযোগী। রামনগর, দিঘা প্রভৃতি জায়গার কোথাও কোথাও বালি আছে। এখানে কাজুবাদাম খুব ভাল হতে পারে উপযুক্ত জাত ও যত্ন পেলে। অন্যান্য ফলও হবে।

শুধু ফল নির্বাচন করলেই হবে না, ওই ফলের উপযুক্ত জাতও নির্বাচন করতে হবে। অন্তত গুরুত্বপূর্ণ ফলগুলির ক্ষেত্রে। আমের উপযুক্ত জাত হল গোলাপখাস, সফদার পসন্দ, গোপালভোগ, বোম্বাই, হিমসাগর, ল্যাংড়া, দশহরী এবং আম্রপালী। পেয়ারার ক্ষেত্রে লক্ষ্ণৌ-৪৯ এবং হরিঝা ; কাজুবাদামে ঝাড়গ্রাম-১, বি. এল. এ ৩৯-৪ ; কমলালেবুর ক্ষেত্রে নাগপুরী এবং কিন্নো ; কুলের ক্ষেত্রে গোলা, কৈথালি, উমরাঁও, বেনারসী ; বেদানার ক্ষেত্রে ঢোলকা, কান্দাহারী, গণেশ ; আমলকীতে কৃষ্ণা, বেনারসী ; পেঁপের ক্ষেত্রে রাঁচী, হানিডিউ, পুসা ডেলিশাস, কো-১, কো-২ ; সুপারির ক্ষেত্রে মোহিতনগর ; কলার ক্ষেত্রে জায়ান্ট গভর্ণর রোবাস্টা, মর্তমান, কাঁচকলা ; আনারসে জায়ান্ট কিউ, লিচুতে বোম্বাই, বেদানা, চায়না এবং সপেদাতে ক্রিকেটবল। নারকেলের ক্ষেত্রে স্থানীয় জাতের চারাইভাল। দক্ষিণ ভারতীয় জাতগুলির ফলনক্ষমতা বেশি হলেও মেদিনীপুরের আবহাওয়ায় সেগুলি সুবিধা করতে পারবে না ; রোগগ্রস্ত হবে। কামরাঙ্গা দু'রকমের টক এবং মিষ্টি। টকের চেয়ে মিষ্টি জাতের চাহিদা বেশি। জামরুলের দু'টি উপযুক্ত জাত—সাদা এবং গোলাপী ; দুটো জাতই সমান পানসে।

ফলের পর আসে ফুলের কথা। পাঁশকুড়া-কোলাঘাট অঞ্চলে অর্থকরী ফুলচাষের ঐতিহ্য প্রাচীন। বর্তমানে এখানে প্রায় চল্লিশ রকম ফুলের চাষ হয়। এদের মধ্যে প্রধান হল—রজনীগন্ধা, গাঁদা, বেল, জুঁই, গোলাপ ও নানারকমের মরশুমি ফুল। ফুলচাষে অন্য ফসলের তুলনায় লাভ বেশি বলে ফুলের এলাকা বাড়ছে। ফলে, বেশি আমদানির জন্য মাঝে মাঝে বাজারে দাম খুব কমে যায়। অনেক সময় অবিক্রীত ফুল ফেলে দিতে হয়। বাজারে হিমঘরের ব্যবস্থা করে এই ক্ষতি কমান যায়। ফুলের প্যাকিং ব্যবস্থাও অত্যন্ত নিচুমানের।

অ্যান্থুরিয়াম, জারবেরা, কার্নেশন, অর্কিড, লিলি, অ্যালস্ট্রোমেরিয়া, লিয়াট্রিস প্রভৃতি কিছু কিছু স্বল্প পরিচিত ফুল সম্প্রতি চাষের তালিকায় আসছে। বাজারে এসব ফুলের দাম বেশি। একটা কার্নেশন বা জারবেরার দাম চার-পাঁচ টাকা, একটা অ্যান্থুরিয়াম ১৬ থেকে ১৮ টাকা, একছড়া সিম্বিডিয়ামজাতীয় অর্কিডের দাম ১০০ থেকে ১২৫ টাকা। কিন্তু এদের চাষে ঝক্কি-ঝামেলা বেশি। উন্নতমানের ফুল পেতে হলে এদের চাষ করতে হয় পলিথিন দিয়ে ঢাকা ঘরের ভেতর। এ ধরনের ঘরকে গ্রীন-হাউস বলে। অনেক ফুলের ক্ষেত্রে গ্রীন-হাউসে আলো, তাপ এবং আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখতে হয়। এজন্য প্রচুর খরচ। তবে ঠিকমত উৎপাদন হলে এক একর গ্রীনহাউস থেকে বছরে দু-তিন লাখ টাকা লাভ করা কঠিন নয়। পশ্চিমবাংলায় এ ধরনের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। মেদিনীপুরের প্রগতিশীল ফুলচাষিদের এ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে হবে।

দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশের বাজারেও আমাদের ফুলের যাওয়া শুরু হয়েছে। উন্নত উৎপাদন ও উপযুক্ত বিপণনের ব্যবস্থা থাকলে ফুলের বৈদেশিক বাণিজ্যে লাখ লাখ টাকা আয় হয়। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার সম্প্রতি এ বিষয়ে খুব আগ্রহী হয়েছেন। যাঁরা বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ফুলচাষ করবেন, তাঁদের জন্য আর্থিক অনুদান, সহজ শর্তে ঋণদান ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।
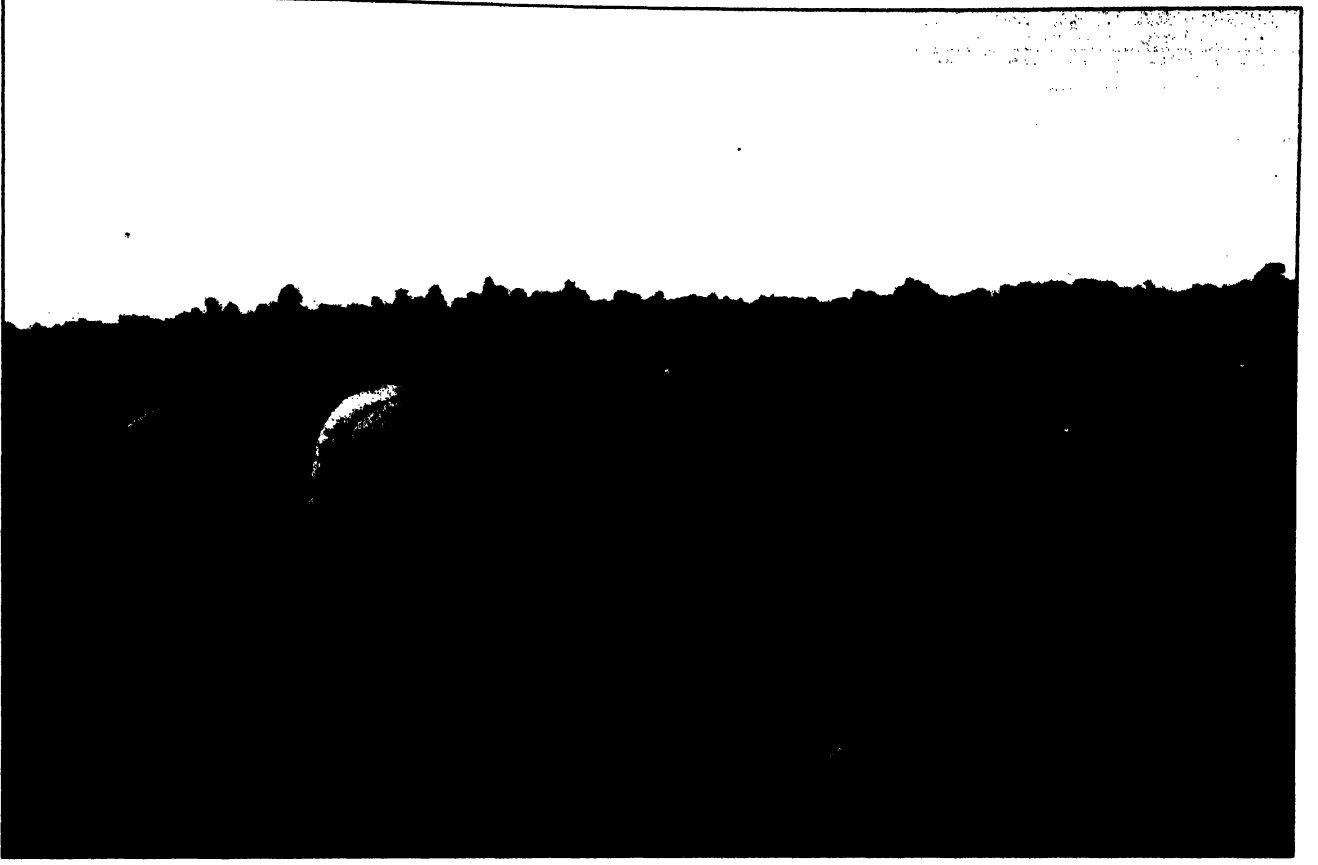
কর্মরত কৃষি-শ্রমজীবী নারী

আজকাল বিশ্বব্যাপী উদ্ভিদজাত ওষুধের চাহিদা বাড়ছে। মেদিনীপুর জেলায় নানারকম ভেষজ উদ্ভিদের চাষ করা যায়। এদের মধ্যে নয়নতারা, অশ্বগন্ধা, সর্পগন্ধা, আয়াপান, পুদিনা, কুলেখাড়া, বাসক, ইসবগুল, শতমূলি, ক্যালেন্ডুলা, উলটকম্বল, তুলসী, অশোক, আমলকি, হরীতকী, বহেড়া, অনন্তমূল, কালমেঘ, ইসেরমূল প্রভৃতি প্রধান।

মেদিনীপুরে নানারকম মশলা চাষেরও সম্ভাবনা আছে। রবিশস্য হিসাবে ধনে, মৌরি, মেথি এবং কালোজিরা চাষ করা যায়। এ জেলায় ভাল আদা ও হলুদ ফলতে পারে। কাঁকুরে এলাকায় জিরা চাষেরও সম্ভাবনা আছে। মেদিনীপুর জেলার পূর্বাংশে পান একটি লাভজনক ফসল। দক্ষিণের লোনামাটিতেও ভাল পান হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে গাছ থেকে তোলার পর পানের জীবনীশক্তি বেশ কয়েকদিন বাড়িয়ে দেওয়া যায়। এর ফলে বিপণনের এলাকা বিস্তৃত হতে পারে।

এ রাজ্যের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা ও গবেষণার সুবাদে সংগৃহীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে মেদিনীপুরে শ্বেতচন্দনের চাষ করা যায়। সবচেয়ে নামী কাঠ এই শ্বেতচন্দন। এ গাছ চেহারায় ছোট, ১০/১২ ফুটের বেশি উঁচু হয় না। কাঠে ঠিকমত সুগন্ধ তৈরি হতে ৪০ থেকে ৫০ বছর লাগে। তখন একটি গাছের দাম বর্তমান দরে লক্ষাধিক টাকা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এ এক দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয় প্রকল্প। মাত্র ১৫ ফুট দূরে দূরে শ্বেতচন্দনের গাছ লাগানো যায়। জেলার পশ্চিমভাগের মাটি ও আবহাওয়া উন্নতমানের চন্দনকাঠ উৎপাদনের উপযোগী।

পরিবেশের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণে অরণ্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জঙ্গল শুধু আবহাওয়ার উন্নতি ঘটিয়ে আমাদের জীবনীশক্তি বাড়ায় না, কাঠ, গঁদ, ওষধি প্রভৃতির মাধ্যমে আমাদের সম্পদ বাড়ায়, ভূমি সংরক্ষণ করে। আগে যে সব এলাকা জুড়ে জঙ্গল ছিল আজ তার বেশিরভাগ অংশে বন কেটে বসত হয়েছে। যে অংশ এখনও খালি আছে, সেখানে অরণ্য সৃষ্টি করে সম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য এমন গাছ লাগাতে হবে, যার তলায় গরু, ছাগল, মোষের চরার উপযোগী তৃণভূমির সৃষ্টি হতে পারে।

আজ থেকে ৫০/৬০ বছর আগে চাষ পদ্ধতি ছিল সহজ, সরল। উৎপাদনের হারও ছিল কম। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বাড়ানোর প্রয়োজন দেখা দিল। এল অধিক উৎপাদনশীল জাত, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক ওষুধপত্র, অনুখাদ্য প্রভৃতি। এসব জিনিষকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক প্রকৌশল। সেই প্রকৌশল আয়ত্ত

করার জন্য চাই উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। ধান, গম, পাট, তৈলবীজ, ডালশস্য এবং সবজি চাষে কৃষকের অভিজ্ঞতা অপেক্ষাকৃত বেশি। কারণ, পঞ্চাশের দশক থেকে প্রদর্শনী ক্ষেত্র তৈরির মাধ্যমে কৃষকের কাছে উন্নত পদ্ধতি পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলে আসছে। সেই সঙ্গে কৃষক প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আজও বহাল আছে।

ফল ও ফুলের ক্ষেত্রে প্রদর্শন ক্ষেত্র নাই ; প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নামমাত্র। মেদিনীপুর জেলার অনুন্নত রাঙামাটি অঞ্চলের মানুষদের উন্নতির জন্য ১৯৯৩ সালে আম চাষের একটি বড় পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে হাত দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনা যথাযথ রূপায়িত হলে ওই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা পাঁচ-সাত বছরে অনেক উন্নত হতে পারত। কিন্তু এই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হলে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দরকার, কর্তৃপক্ষের তা ছিল না। আন্তরিকতারও যে অভাব ছিল না—এ কথা হলপ করে বলা যায় না। সর্বোপরি, আম্রপালীর মত একটি উন্নত প্রজাতির আমের চাষ সম্বন্ধে কৃষকেরাও ছিল অজ্ঞ। ফলে, এত বড় একটি সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল। পরোক্ষ ক্ষতি আরও বড়। এই পরিকল্পনার ব্যর্থতা ভবিষ্যতের প্রচেষ্টারও পথ বন্ধ করে দিল।

তাই উন্নত পদ্ধতির চাষের জন্য চাই উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। সরকারি ও বেসরকারি তরফে এ বিষয়ে কিছু কিছু প্রচেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু সে প্রচেষ্টা ত্রুটিমুক্ত নয়। আজকাল এ বিষয়ে কিছু কিছু পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান (consultancy firm) গড়ে উঠেছে। প্রশিক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে এদের সাহায্য নিতে হবে। ফসল লাগানোর পর মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে ভুল-ত্রুটি শুধরে দিতে হবে ; কোনও সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধান বলে দিতে হবে। এ কাজের ভারও পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠানের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত।

উন্নত ফলনের জন্য চাই উন্নত প্রজাতি। পশ্চিমবাংলায় কয়েক হাজার নার্সারি থাকলেও ফুল বা ফলের সঠিক জাত পাওয়া সহজ নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষককে প্রতারিত হতে হয়। এ সব নার্সারিকে সরকারিভাবে নথিভুক্ত না করার ফলে এদের দায়বদ্ধতা কম। উন্নত জাতের বীজ বা চারা পেতে হলে কোনও বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নার্সারি তৈরির কাজে উৎসাহ ও সাহায্য দিতে হবে। প্রাথমিকভাবে সরকার থেকে উন্নতমানের জাত সরবরাহ করে এই সব নার্সারির ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। নার্সারিগুলির ওপর সরকারি নজরদারির ব্যবস্থা থাকা চাই। ঝাড়গ্রাম মহকুমার কাপগাড়িতে 'সেবাভারতী' নামে একটি ভাল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞরা ১৯৯২ সালে মেদিনীপুরের খরা পীড়িত রাঙামাটি অঞ্চলে ফলবাগান তৈরির ওপর যে পরিকল্পনা রচনা করেন, তার মধ্যে এইরকম নার্সারির জন্য সুন্দর রূপরেখা ছিল। ওই পরিকল্পনার একটি দুর্বল দিক ছিল—এটি রূপায়ণের ভার ছিল সরকারের হাতে। তাই এটি কার্যকর অবস্থায় পৌঁছতে পারেনি। এই নার্সারি পরিকল্পনাটি যদি বেসরকারিভাবে আজও রূপায়ণের চেষ্টা করা হয়, তবে ওই অনুন্নত অঞ্চল উপকৃত হবে।

উৎপাদনের সঙ্গে বিপণন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। উপযুক্ত বিপণনের ব্যবস্থা না থাকলে ভাল উৎপাদনও লাভজনক হয় না। অধিকাংশ কৃষকের পক্ষে তাদের উৎপাদন দূরের বাজারে পাঠান অসুবিধাজনক—সে উৎপাদন ফল, ফুল, সবজি—যাই হোক না কেন। তাই স্থানীয়ভাবে বাজার গড়ে তুলতে হবে। কোনও অঞ্চলে প্রচুর উৎপাদন হলে তবেই এটা সম্ভব। বহুল উৎপাদনের স্বার্থে এক এক এলাকায় এক এক ধরনের ফসল বিস্তৃত এলাকা জুড়ে চাষ করতে হবে—যেমন হুগলি এবং বর্ধমানে চাষ হয় আলু, বারুইপুরে পেঁয়ারা, মালদহে আম, শিলিগুড়িতে আনারস, সাগরদ্বীপে তরমুজ, তমলুক অঞ্চলে পান, পাঁশকুড়া-কোলাঘাট অঞ্চলে ফুল। যে এলাকায় বেশি পরিমাণে ফল বা শাক-সবজি উৎপন্ন হবে, ভবিষ্যতে সেখানে প্রক্রিয়াকরণ শিল্পও গড়ে উঠতে পারে। এমনকী বিদেশে টাটকা ফল ও সবজি পাঠানোর জন্য যে শিল্প বিন্যাস দরকার, তাও গড়ে তোলা যাবে।

মেদিনীপুরের কৃষি উন্নয়নে পরিবহন ও প্রশিক্ষণের গুরুত্বের উপর আগেই আলোকপাত করা হয়েছে। এবার আসা যাক আর্থিক বিনিয়োগ বিষয়ে। উন্নত কৃষি পদ্ধতি কাজে লাগাতে হলে চাই অধিক অর্থ বিনিয়োগ। খোলা মাঠে শাক-সবজি বা ফুলচাষ করতে হলে বর্তমানে প্রতি একরে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫/৩০ হাজার টাকা। কৃষকের নিজস্ব শ্রম এবং দেখাশোনার খরচও এর অন্তর্ভুক্ত। পলিথিনের ঘরের ভেতর চাষ করতে হলে প্রাথমিক বিনিয়োগের পরিমাণ একরে নয় থেকে দশ লাখ টাকা। এই ঘরে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখতে গেলে লাগবে এর দু থেকে তিনগুণ। একজন কৃষকের পক্ষে এই আর্থিক গুরুভার বহন করা কঠিন। তাই সহজ শর্তে ঋণদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কোনও চাষ বড় মাপে হাতে নিতে হলে সমবায় সমিতি বা কোম্পানী গঠনের প্রয়োজন আছে।

প্রাকৃতিক অবস্থার ওপর কৃষির সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে, পরিকাঠামো ভেঙে পড়তে পারে। সেজন্য ইনসিওরেন্সের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সবশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উল্লেখ দরকার। অদূরদর্শী রাজনীতিক কার্যকলাপ দেশের উন্নতিকে সর্বস্তরে বাধাগ্রস্ত করেছে। এই কুদৃষ্টি থেকে কৃষিকে বাঁচানর আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে দেশ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে। তা হলেই কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীদের কাছে সুখের দিন আসবে।

লেখক : প্রাক্তন অধ্যাপক, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
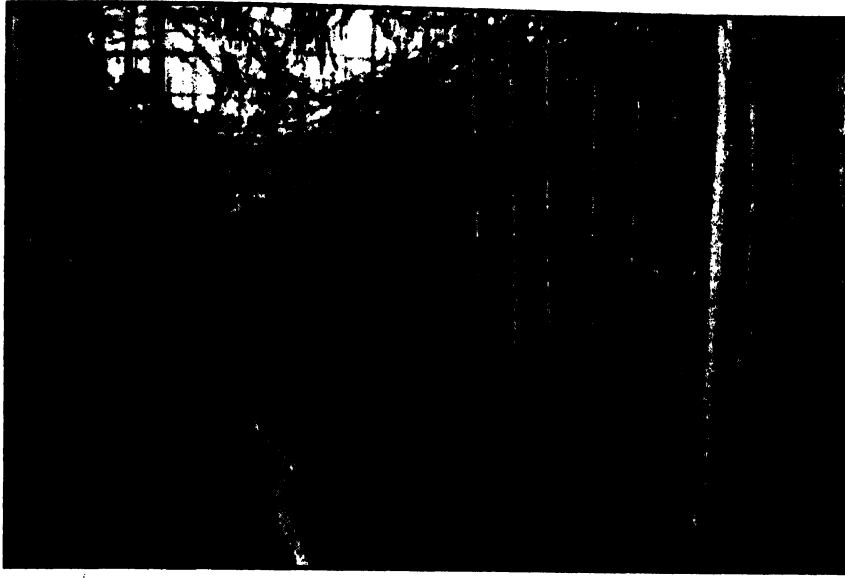
পানের বরজে কর্মরত চাষীরা ছবি : পাপান ঘোষ

পূর্ব মেদিনীপুরের পানচাষ

মৃণালকান্তি মহাপাত্র

পালি ভাষায় রচিত 'মহাভন্ম' গ্রন্থে প্রায় দু'হাজার বছর আগে ভারতীয় সমাজে পান প্রচলনের কথা জানা যায়। বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ও পর্যটক ইবনবতুতার (১৩০৪-১৩৭৮ খ্রিষ্টাব্দ) লেখা থেকে ভারতীয়দের পানচাষ বিষয়ে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা এইরকম—"পান গাছ দেখতে আঙুরের লতার মতো। পানের লতাকে ধারণ করার জন্য চাষীরা মাচান তৈরি করে দেন। আর তা সম্ভব না হলে, নারকেল গাছের পাশেই চাষ করেন, যাতে পানগাছ লতার মতো নারকেল গাছ বেয়ে উঠতে পারে।" প্রসঙ্গত বলা যায় যে—এই বিখ্যাত পর্যটক 'কুতুবুদ্দিন আইবক' থেকে মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকাল পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক এবং সামাজিক চিত্রের খুঁটিনাটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। শাহাজাহানের রাজত্বকালে (১৬৫৮-১৬৬৭) ভারতবর্ষে আসা একজন ফরাসি পর্যটক ও চিকিৎসক বানিয়ের উল্লেখ করেন, "পানে খয়ের সংযুক্তির ফলেই পান সেবনকারীদের ঠোঁট রক্তিম বা লাল হয়ে ওঠে এবং পানসেবীদের মুখ বা শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়।' মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গিরের আমলে ভারতবর্ষে প্রথম তামাকের প্রচলন শুরু হয়। পানে সংযোজন হয় তামাকজাত মসলা, জর্দা, কিমাম্। তারপর থেকেই আজও সেরূপ চলে আসছে। মধ্যযুগে ঐতিহাসিক নিজামউদ্দিন আহম্মেদ উল্লেখ

করেছেন যে, একবার এক পানের দোকানদার এক বিবাহিতা মহিলার উপর তাঁর ভালোবাসা জানিয়ে কেলেঙ্কারির সৃষ্টি করেছিলেন। পান আবার লড়াইয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াতো, এমন নজিরও ইতিহাসে রয়েছে। মধ্যযুগে অনেক প্রেমিক যুবক-যুবতীদের উপর এক বীড়া (গোছা বা বান্ডিল) পান ছুঁড়ে দিয়ে প্রকারান্তরে প্রেম নিবেদন করতেন। পান যে প্রেমের সঞ্চালক তা সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশের জনপ্রিয় লোকগীতি গায়িকার গানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

"যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম / সদরঘাটে
পানের খিলি তারে বানাই খাওয়াইতাম।"

এই গানের reflection আমরা অনেক অতীতেও দেখতে পাই। ইতিহাসের পাতা থেকে আমরা এও পাই যে খ্রিষ্টপূর্ব ৫০৪ সালে এক রাজকন্যা তার ভালোবাসার পাত্রকে পান উপহার দিয়েছিলেন বলে কথিত আছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে ভারতে পুরুষের চেয়ে নারীরাই বেশি পান খান। কারণ এটাই ধরা যায় যে দুই ওষ্ঠাধর রক্তিম করতে তাদের পানের অভ্যাস পুরুষের চেয়ে বেশি। একথা ইবনবতুতা ও মানুচির বক্তব্যে পরিষ্কার। তাঁরা বলেছেন, "ভারতের নারীদের মধ্যে যাঁরা গল্পবাজ, তাঁরা পান না চিবিয়ে থাকতে পারেন না।"

পানের বরজ

বিশেষ পরিচিতি পর্ব (Botanical Identification)

পানের বৈজ্ঞানিক নাম 'পাইপর বিটল' (Piper Bettle) বা 'পাইপার বেথলে' উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা পানকে 'বিটেলভাইন'ও বলে থাকেন। এটি গোলমরিচ গোত্রের একটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। পান রোহিণী (Climbers) জাতীয় দুর্বল কাণ্ডের গাছ। এই প্রকার গাছ কোনও অবলম্বনকে আঁকড়াইয়া উপরে ওঠে। আরোহণ কার্যকর রীতি বা আরোহণ অঙ্গের ভিত্তিতে একে মূলারোহী রোহিণী (Root climbers) লতা বলা হয়। এই প্রকার লতা এদের পর্ব সন্ধি থেকে উৎপন্ন অস্থানিক মূলের সহায়তায় আশ্রয়কে বেষ্টন করে উপরে ওঠে। পানের পত্রফলক তাম্বুলাকার (Cordate), ডিম্বাকারের অনুরূপ, কিন্তু এই ক্ষেত্রে ফলকের নীচের অংশে বৃন্ত যে স্থানে যুক্ত হয় সেখানে একটি খাঁজ থাকে এবং বৃন্তের দুই পাশে ফলকের নীচের অংশটি দুইটি গোল কিনারা বিশিষ্ট খণ্ডে বিভক্ত থাকে। সমগ্র ভারতে ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে বিভিন্ন স্বাদের ও গন্ধের বিভিন্ন প্রকার পান পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে তারা সকলেই Piperaceae ফ্যামিলিভুক্ত। এদের বোটানিক্যাল নাম 'Piper bettle Lizn'।

পানগাছ বহুবর্ষজীবী বিরুৎ ও ভিন্নবাসী একলিঙ্গ উদ্ভিদ। মূলাগ্র থেকে এক ধরনের আঠালো রস নিঃসৃত হয় এবং তার সাহায্যে এই বিরুৎ লতা সরকাঠি বা আশ্রয়কে অবলম্বন করে উপরে আরোহণ করে। কাণ্ডের গায়ে একান্তর পদ্ধতিতে (alternate system) পানের পাতাগুলি সাজানো থাকে। পানের পুষ্প বিন্যাস (Inflorescence) অবৃন্তক একলিঙ্গ পুষ্পগুলি ঝুলন্ত দুর্বল মঞ্জরীদণ্ডের ওপর অবস্থান করে ক্যাট্‌কিন (Catkin) পুষ্পবিন্যাস সৃষ্টি করে। মোটামুটি হিসেব করে জানা গেছে, সমগ্র বিশ্বে প্রায় ১০০টি প্রজাতির পান গাছ বর্তমান। এর মধ্যে পশ্চিমবাংলায় ৩০টি প্রজাতির এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ৪০টি প্রজাতির পান চাষ হয়। ভারতের অধিকাংশ প্রজাতিগুলি প্রধানত বাংলা, মিঠা এবং সাঁচি—এই তিন প্রকার পানের যেকোনও একটির অন্তর্ভুক্ত। পান পাতার রঙ গাঢ় সবুজ। পাতা পুরানো হলে রঙটা সামান্য ফিকে হয়ে যায়। পানের স্ত্রী ও পুরুষ লতা আলাদা।

পুরুষ ও স্ত্রীলতা সনাক্তকরণ পর্ব

পাতার আকার দেখে পান পাতার স্ত্রী ও পুরুষ সহজেই চেনা যায়। স্ত্রী লতার পান পাতা কিছুটা গোলাকার। অনেকটা মানব হৃৎপিণ্ডের মতো। পুরুষ পাতা অনেকটা লম্বাটে ধরনের। কম বেশি ডিম্বাকৃতি। স্ত্রী লতা বরোজের মধ্যে বাড়ে। পুরুষ লতা ফাঁকা জায়গায় লাগালেও বেড়ে ওঠে। পুরুষ লতা স্ত্রী লতার চেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ে। স্ত্রী লতার মঞ্জরি অনেকটা ছোট ও মোটা বা পুরু। পুরুষ লতার মঞ্জরি বেশ লম্বা এবং নীচের দিকে ঝোলা অবস্থায় থাকে। পরাগরেণু আকারে বড় ও ভারী। ফলে কয়েক হাত দূর অবধি সহজেই যেতে পারে। ফলে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে মিলন ঘটে সহজেই। স্ত্রী ফুলের মঞ্জরীর মধ্যে বীজ দেখা যায়। বীজের রঙটা কালো। বীজ পরিণত হলেই, অঙ্কুর বের হয়। প্রায় পনেরো দিন লাগে শেকড় বের হতে। এক বছর পর পানের পাতার আকার দেখে স্ত্রী লতা ও পুরুষলতা চেনা যায়।

মূল প্রসঙ্গ

সারা পৃথিবীতে প্রায় ৮ কোটি বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে পানের চাষ হয়। ভারতবর্ষে প্রায় ৪০,০০০ হেক্টর জমিতে পান চাষ হয় এবং ২৫-৩০ লক্ষ পরিবার ও প্রায় দেড় কোটি মানুষ পান চাষের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহ

করে। ভারতের মোট চাহিদার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পানের উৎপাদন হয় কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের ৯,০০০ হেক্টর জমিতে। এ রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গে বিশেষ করে মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, চব্বিশ পরগনা ও নদিয়া জেলায় পানের চাষ ব্যাপক হারে ও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে দেখা যায়। মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার 'মিঠা' ও 'বাংলা' পান খুবই সুস্বাদু ও বিখ্যাত। পূর্ব মেদিনীপুরের চার হাজারেরও বেশী হেক্টর জমিতে প্রায় পনেরো লক্ষের মতো মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে এই চাষের সঙ্গে জড়িত। জমিতে হেক্টর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ৫০০ মোট। একমোটে পান থাকে দশ হাজার। জেলার ২৫টি পান বাজার থেকে ওড়িশা, অসম, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ প্রতিদিনই লক্ষ লক্ষ টাকার পান রপ্তানি করা হয়। এছাড়াও ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যও পানের জন্য মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও কাঁথি সদরের উপরই নির্ভর করে।

পানচাষ ও পূর্ব মেদিনীপুর

পূর্ব মেদিনীপুরের একমাত্র অর্থকরী ফসল পানচাষ। মেদিনীপুর জেলায় একটি ব্যাপক সমীক্ষায় প্রতি দু'মাস অন্তর পান লতার বৃদ্ধির পরিমাপ, পর্ব ও বোঁটার দৈর্ঘ্য, কাণ্ডের ব্যাস, উৎপন্ন পাতার সংখ্যা, পাতার ক্ষেত্রফল, পাতার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত প্রভৃতি পরীক্ষার ফলাফলে জানা গেছে যে, সব জাতের পানচাষের বৃদ্ধি সেপ্টেম্বরে (ভাদ্র) সবচেয়ে বেশী ও মার্চে (ফাল্গুন) সবচেয়ে কম হয়। বিভিন্ন জাতের পান লতার ভিন্ন ভিন্ন রকম। সাধারণ ভাবে বলা যায় যে মিঠা ও সাঁচি পানের চেয়ে বাংলা পানের বৃদ্ধি অনেক বেশী। বাংলা পানের চাহিদা বিহার ও উত্তরপ্রদেশে খুব বেশী। মেদিনীপুরের চাষীরা এই দুই রাজ্যের পানের চাহিদা কিছুটা মেটায়।

রাজ্যের অন্যান্য জেলাতে মিঠা পাতার চাষ হলেও মেদিনীপুর জেলার মেচেদা এবং পাশকুঁড়াতে মিঠা পাতার চাষের এলাকা খুব বেশি। এখানকার মিঠা পাতা দক্ষিণ ভারত সহ উত্তর ভারতের প্রায় সব রাজ্যে ভালো দামে বিক্রি হয়। মিঠাপানের চাষ তমলুক ও মহিষাদল থানায় হয়ে থাকে। এর পাতা লম্বা ও ক্রমশ সরু হয়। লতার বৃদ্ধি খুব ধীরসম্পন্ন। তবে মিঠাপানের লতা বেশ শাখা-প্রশাখাযুক্ত। পত্রবৃন্ত ছোট এবং সরু। পাতা বাংলাপান অপেক্ষা নরম এবং মচ্মচে হয়। কেবলমাত্র দোঁয়াশ জমিতেই এই জাতের পানচাষ ভাল হয়। মিঠাপান খেতে খুবই সুস্বাদু এবং সুগন্ধিযুক্ত হয়। মিষ্টি স্বাদযুক্ত বলেই একে মিঠাপান বা 'মিষ্টিপান' বলে। যাঁরা জর্দা ছাড়া মিষ্টিপান বা সাদাপান খান তাঁরা এই প্রকার পানপাতা বেশিরভাগ পছন্দ করেন। বাংলাপান, মিঠাপান ছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কিছু কিছু অংশে সাঁচিপানের চাষ হয়। বাংলাপান থেকে সাঁচিপানের ফলনও অপেক্ষাকৃতভাবে কম হয়। এই পানের চাহিদাও কম। সে কারণে এই পানের চাষ খুবই কম। পাতার আকৃতি ডিম্বাকার এবং ডগা ক্রমাগত লম্বা ও সুরু। পাতার স্বাদ খুবই ঝাঁঝালো এবং খাওয়ার পর শরীর বেশ গরম হয়। পাতা সাধারণত পাতলা ও নরম হয়। পত্রবৃন্ত সরু ও ছোট। লতার আকার বাংলাপানের মতো তবে বৃদ্ধি বাংলাপানের চেয়ে কম।

পূর্ব মেদিনীপুরে সবচেয়ে বেশী যে পানের চাষ হয় তা হল বাংলাপান। সমস্ত প্রকার মাটিতে এই জাতের পানচাষ হয়। এই পানের স্বাদ স্বাভাবিক, ঝাঁঝালো গন্ধ থাকে না। পত্রবৃন্ত লম্বা ও সুরু হয়। বাংলা জাতের পানের মধ্যে কালীঢল, ঢল, বেনারসী, ভবানী, আয়মাল, চাকুলা, ভাবনা, কড়ে প্রভৃতি পান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে কালীঢল, ঢল, বেনারসী, ভাবনা প্রভৃতি বাংলাপান খুব জনপ্রিয়, খেতে ভাল এবং ফলন বেশী হয়। ভাবনা জাতের পানলতার নীচের দিকের চেয়ে ওপরদিকের কলমে শিকড় কিছুটা বেশি হয়।

বাংলাপানকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে (ক) উত্তম ফলনশীল
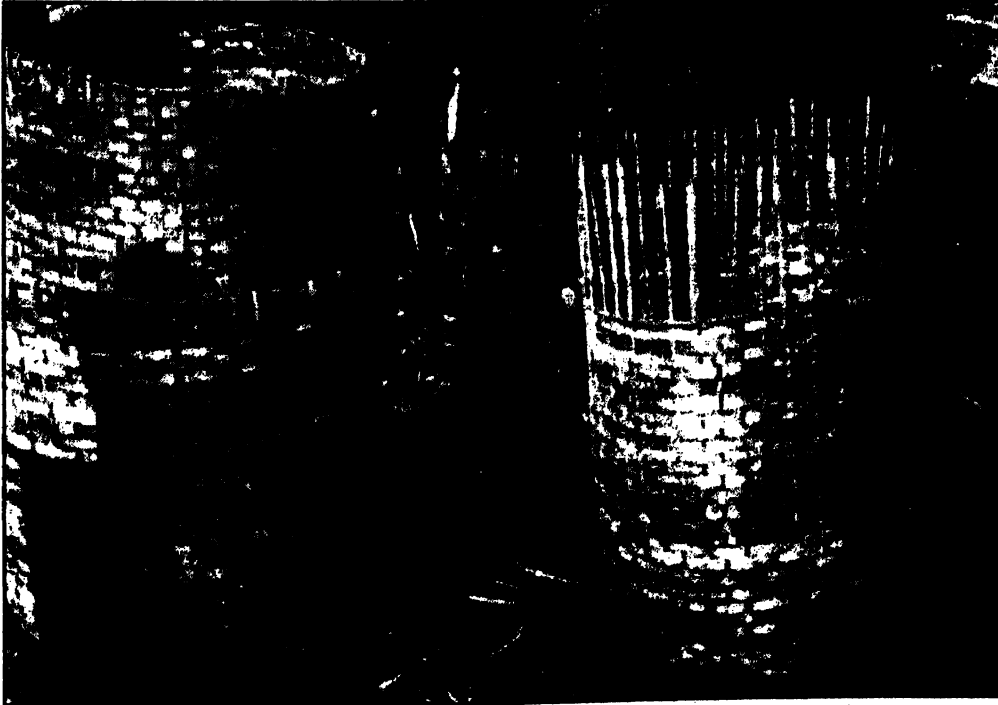
পাঁশকুড়ার সদরঘাটে তৈরি হচ্ছে পানপাতা রাখার ঝুড়ি

ছবি : ভাস্করব্রত পতি

এবং (খ) মধ্যম ফলনশীল। উত্তম ফলনশীল বাংলাপানের মধ্যে আছে বোরঘাই, কালীঢল, ভাবনা, সাদাঢল ও আয়মাল, অন্যদিকে মধ্যম ফলনশীল দলে রয়েছে ভগবানপুর, ভবানী, রামনগর, বেনারসী, বীরকুলি, কড়ি এবং মনগেটে। উত্তম ফলনশীল জাতের মধ্যে লতার বৃদ্ধি, পর্বের দৈর্ঘ্য, পাতার উৎপাদন ও আকার প্রভৃতির বিচারে বোরঘাই হল সবচেয়ে উন্নতমানের পান। বাংলা পানে কোনপ্রকার ঝাঁঝালো গন্ধ নেই।

বরজ তৈরি

(ক) মাটি ☐ লোনা বা ক্ষারমাটি ছাড়া যেকোন মাটিতে পান চাষ করা যেতে পারে। পানচাষের জন্য তাই উচ্চ-জল নিষ্কাশনযুক্ত উর্বর দোঁয়াশ, এঁটেল দোঁয়াশ বা বেলে দোঁয়াশ মাটি সব থেকে ভালো। আশেপাশের জায়গা থেকে মাটি কেটে এনে বরজের জমি চার পাশের জমির তল থেকে কিছুটা উঁচু করে তৈরি করা হয়। ফলে বৃষ্টির জমা জল সহজে বেরিয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে পানবরজের জায়গাটা একটু ঢালু রাখা হয় যাতে নিষ্কাশনী সত্বর ঘটে। বরজ নির্মাণের আগে সব দিক বিবেচনা করে জমি নির্বাচন করতে হয়। বায়ুপ্রবাহ, ঝড়-বৃষ্টি, বন্যা, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পোকা-মাকড়ের পরিবেশকে সহজে প্রতিহত করা যায়—এমন জমি পানচাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত। যদি খুব কম জল নিকাশযুক্ত মাটিতে পান বরজ তৈরি করে পান চাষ করা হয় তাহলে পানের লতা এবং পাতা হলুদ হয়ে যায়। গাছের বৃদ্ধিও এতে ভালো হয় না। এক জায়গায় থমকে থাকে। বরজ নির্মাণের সময় তাই মাটি নির্বাচন ভালো না হলে পানের অর্থনৈতিক জীবনকাল কমে যায়। গ্রীষ্মে প্রখর রোদে মাটি ভালোভাবে কুপিয়ে এক মাস ধরে জমিকে ভালোভাবে রোদ খাইয়ে শোধন করতে হবে। চারা লাগানোর আগে পানের সারি বা পিলিগুলি দড়ি টেনে সোজাসুজি কেটে নিতে হবে এবং ১% বোর্দো মিশ্রণ দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে। তারপর চারাগুলিকে ০.৫% বোর্দো মিশ্রণ + ৫০০ পি পি এম স্ট্রেপটোসাইক্লিন দ্রবণে আধ ঘণ্টা চুবিয়ে নিয়ে শোধন করে লাগাতে হবে। বোর্দো মিশ্রণের পরিবর্তে অন্যান্য তামাঘটিত ঔষধ যেমন ব্লাইটক্র বা ক্যাপটান প্রভৃতি এই শোধনকার্যে ব্যবহার করা যায়।

কাঠামো ☐ পানগাছ ছায়াঘেরা জায়গাতে ভালো হয়। সাধারণত বাঁশ, বাঁশের বাতা (বাখারি), সরকাঠি, টানা দেবা'র জন্য গ্যালভানাইজ্ড তার, উপরে ছাউনির জন্য খেজুরগাছের ডাল খড়, দড়ি প্রভৃতির সাহায্যে বরজ তৈরি করা হয়। বাঁশের খুঁটি সেই ভাবে কাটতে হবে যাতে মাটিতে পোঁতার পরেও ছাদের এক হাত ওপরে থাকে। বরজের ছাদ পাটকাঠি অথবা সরকাঠি যে কোন একটি দিয়ে ছাওয়া হোক না কেন, জমি থেকে ছাদ পাঁচ থেকে ছয় হাত উঁচুতে থাকে। বোরো ধানের শুকনো খড়, সরকাঠি এবং নারকেল গাছের বাল্মা দিয়ে বরজের চারপাশ ঘেরা দেওয়া হয়। বরজের ভেতরে পান লতার চারা বসাবার জায়গা, আসা যাওয়ার পথ, ভেতরের জমা জল বেরিয়ে যাবার নালা সব কিছু এমনভাবে করতে হবে যাতে বেশী সংখ্যক পান লতার চারা বসাতে পারা যায়। চারা বেশি সংখ্যক বসালে ওদের বাড়ার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হবে না এমন ভাবে সারিগুলি মেপে তৈরি করতে হয়। সেচের জল নালার মাধ্যমে প্রতিটি চারা গোড়ার মাটি ভিজে যাবে। কলসিতে কিংবা পাম্পসেটে জল দিতে গেলে, দু-হাতে কলসি নিয়ে যাতে দুই সারির ফাঁকে অনায়াসে ঢোকা যায় কিংবা জলের পাইপ টেনে নেওয়া যায়, সেইমত পরিসর রাখতে হয়। বরজের ভেতরে চারদিকে দেড় হাত চওড়া পথ থাকবে।

পানচারা ☐ বরজের জমিতে একটু ঘন করে যদি লতার কাটিং বা কাণ্ডের অংশ বসানো যায় তাহলে একদিকে যেমন চারার সংখ্যা বেশী হবে তেমনি অপরদিকে ফলনও হবে অনেক বেশী। কম সময়ের মধ্যে যাতে তাড়াতাড়ি বেশি সংখ্যায় পানের পাতা পাওয়া যায় তার জন্য দুই থেকে আড়াই হাত লম্বা পানের লতা অথবা এক থেকে দেড় হাত লম্বা তৈরি চারা সরাসরি জমিতে বসানো দরকার। এই কাজের জন্য পানের লতাকে বরজের এক কোণায় আলাদা জায়গায় প্রায় এক মাস রেখে দেওয়া হয়। এর কারণ হল যাতে লতার গাঁটের নিচের দিকে গোছার আকারে বেশি শেকড় বের হয়। এ ব্যাপারে একটা কথা মনে রাখার দরকার পান লতার ডগার দিকের অংশটাকে যদি চারা তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয় তবে পাতার কোল থেকে চোখ বা মুকুল এবং গাঁটের নিচে থেকে শেকড় তাড়াতাড়ি বের হয়। অপরদিকে লতার গোড়ার অংশ থেকে শেকড় এবং মুকুল অনেক দেরিতে বের হয়। সেই কারণে চাষীরা পান লতার ডগার দিকের অংশ জমিতে বসাতে বেশি আগ্রহী হয়।

চারা রোপণের নিয়ম ☐ পানলতার একটা শেকড় সমেত গাঁটকে মাটি দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয় এবং পরের গাঁটটি থাকে মাটির ওপরে। যে গাঁটটা মাটির নিচে থাকে তার থেকে শেকড় বের হয় এবং যেটা ওপরে থাকে তার থেকে নতুন লতা গজায়। লতা অথবা কাণ্ডের অংশ এমনকি তৈরি করা চারা বসানো হলেও ওপরে হালকাভাবে খড় বিছিয়ে দিতে হয়। গরমের সময় চারা বসানো হলে সকাল এবং বিকেলে সামান্য পরিমাণে জল ছিটিয়ে দেওয়া দরকার। অবশ্য বর্ষাকালে জল ছেটাবার কোন দরকার নেই। তবে জল জমলে সেটা অবশ্যই বের করে দিতে হবে। তৈরি চারা, কাণ্ডের অংশ অথবা লতা রোপণের পর তিন সপ্তাহের ভেতর কাণ্ডের অংশ থেকে শেকড় বের হতে শুরু করে। মুকুল থেকে বের হয় নতুন লতা। এর পর দিন দশেকের মধ্যে প্রথম পাতা গজাতে শুরু করে।

জমি তৈরির সময় প্রাথমিক সার ☐ একর প্রতি পাঁচ কুইন্টাল গুঁড়ো সরষের খোল। চার থেকে পাঁচ টন পচা গোবর, কমপোস্ট সার অথবা ডিপ্ লিটারে পালিত মুরগির মল। পূর্ব মেদিনীপুরে, সরষের খইলই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়। এ

ছাড়া কিছু কিছু এলাকায় অ্যামোনিয়াম সালফেট, ক্যান্ প্রভৃতি পান চাষীরা ব্যবহার করে থাকেন। তবে অ্যামোনিয়াম সালফেট এখন প্রায় সবই চা-বাগান এলাকায় সরবরাহ করার দরুন অনেকে ইউরিয়াও ব্যবহার করছেন।

বাজারে যাওয়ার আগে পান বাছাই পর্ব ছবি : পাপান ঘোষ

যখনি পানে সার দেওয়ার প্রয়োজন, তখনি জৈব এবং অজৈব বা রাসায়নিক সারের মিশ্রণ সবসময় দিতে হবে। চারা লাগাবার আগে জৈব উৎস থেকে ১/১২ অংশ সার মূল সার হিসাবে দিতে হবে।

চারা লাগাবার পর প্রতি এক মাস অন্তর এমনভাবে সার দিতে হবে, যাতে প্রতি 'ভেজের' পর একবার সার দেওয়া যায়।

দ্বিতীয় বছরে প্রতি মাসে মোট সারের ১/১২ অংশ জৈব ও অজৈব বা রাসায়নিক সারের মিশ্রণ দিতে হবে।

পান চাষীর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, মাটির প্রকৃতি, জলবায়ু এবং আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি, উপযুক্ত পরিচর্যা ও পান চাষীর আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী পানের সার ব্যবহার মাত্র বাড়ানো বা কমানো যাবে। তবে ব্যবসাভিত্তিক গ্রামীণ অর্থকরী ফসল পানের ভালোভাবে চাষ করতে হলে পান চাষীকে সব সময় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

সেচ ◻ পান লতা স্যাঁতস্যাঁতে ও ভিজে জায়গা পছন্দ করে। বরজের ভেতর এই পরিবেশ বজায় রাখার জন্য গ্রীষ্মকালে প্রায় প্রতিদিন পান গাছের গোড়া ভিজিয়ে রাখতে হয়। মাটির জলধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী সেচের বিন্যাস পান চাষীকে ঠিক করতে হবে। তবে অতিরিক্ত জলসেচ পান চাষের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। এতে পানের শিকড়ের পচা ও ঢলে পড়া রোগ তাড়াতাড়ি আসে। বর্ষাকালে প্রয়োজনমতো সেচ ব্যবস্থা করতে হবে। বরজে উপযুক্ত জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা অত্যন্ত জুরুরি। শীতকালে বা অন্য সময়ে সাধারণত ৩-৪ দিন অন্তর পরপর সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

ফসল তোলা ◻ নতুন বরজে যদি ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চ মাসে চারা বসানো হয় তবে প্রথম পাতা সংগ্রহ করা যাবে ছয় মাস বাদে। অনেক সময় সাত মাস সময় লাগতে পারে। জুন-জুলাইতে পান লাগালে প্রথম পাতা তোলা শুরু হবে ৫-৬ মাস পরে।

একবার পাতা তোলা শুরু হলে সেটা নিয়মিত চলতে থাকে। বরষার সময় আট থেকে নয় দিন অন্তর পাতা তোলা যায়। আবার শীতকালে কুড়ি-ত্রিশ দিন বাদে পাতা সংগ্রহ করতে হয়। কারণ শীতে পান পাতা ধীর গতিতে বাড়ে। বরজ থেকে বেশি পাতা পাওয়া যায় পাঁচ বছর পর থেকে। তবে দশ বছরের পর ফলন কমে যায়।

একবার পান পাতা তোলা শুরু হলেই বরজে ক্রমাগত প্রায় প্রতিদিনই বাজারের চাহিদা অনুযায়ী এবং পান চাষীদের আর্থিক অবস্থার টান অনুযায়ী কমবেশি ফসল তোলা যায়। তবে বর্ষাকালে ১৫ দিন অন্তর এবং শীতকালে একমাস অন্তর পাতা তোলা মনে হয় সবচেয়ে লাভজনক।

সাধারণত ১০ বছরের পর বরজ আর বিশেষ লাভজনক হয় না। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুব্যবস্থা ও পরিচালনার গুণে ২০-২৫ বছর পর্যন্ত পান বরজ লাভজনক অবস্থায় থাকে।

পানের রোগ পোকা ও তাদের প্রতিকার ◻ আগেই বলা হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরে অর্থকরী ফসলের মধ্যে পান অন্যতম, বরজের ভিতরের আবহাওয়া আর্দ্র, স্যাঁতস্যাঁতে থাকে এবং মাটিতে যথেষ্ট রস থাকে। বর্ষাকালে বেশি বৃষ্টি হলে অনেক সময় জলের পরিমাণও বেশি হয়। এইরূপ পরিবেশে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া ঘটিত জীবাণু খুব সহজেই পানে নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে এবং তা দ্রুত সারা বরজে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাকে তাড়ানো খুবই শক্ত।

রোগ ◻

(ক) গোড়া পচা

(খ) ঢলে পড়া রোগ বা শুকিয়ে যাওয়া রোগ

(গ) পাতায় দাগধরা ও পাতা পচা রোগ অ্যানথ্রকনোজ রোগ

(ঘ) পাতায় গোল দাগ রোগ

(ঙ) ডগা পোড়া রোগ।

গোড়া বা ডাঁটা পচা রোগ

রোগের লক্ষণ ◻ ডাঁটা পচা রোগের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে পান পাতার চক্‌চকে ভাব নষ্ট হয়ে যাওয়া। ফলে সবুজ রঙটা

ক্রমশ হাল্কা হতে শুরু করে, শেষে হলুদ দেখায়। এরপর লতা ঢলে পড়ে। তখন লতা থেকে হলুদ পাতা নীচে খসে পড়ে। রোগের শেষ অবস্থায় লতা একেবারে শুকিয়ে যায়। রোগটির মূল কারণ এক ধরনের ছত্রাক। এরা প্রায় মাটির উপরেই থাকে। প্রথমেই অক্রমণ করে পান লতার গোড়ায়। ফলে কয়েকদিন যাওয়ার পর লতার ডগা অবধি শুকিয়ে যায়। আক্রমণ তীব্র হলে গোড়ার দিকে লতার ওপর তুলোর মতো ছত্রাকের একটা প্রলেপ দেখা যায়। প্রলেপের নীচে থাকে ছোট আকারের কালো রঙের দানা। এই দানাগুলো হচ্ছে রোগ জীবাণুর বাহক। এরা সব সময় মাটির উপর থাকে। মাটির বেশি নিচে যায় না।

প্রতিরোধ ☐ এই প্রকার পচনশীল রোগের কোনও ঔষধ নেই যা আগাম প্রয়োগ করে রোগ প্রতিরোধ করা যাবে। তবে জৈব সার হিসাবে সরষের খোল ব্যবহার করার সময় কিছু পরিমাণে নিম খোল ব্যবহার করলে রোগের আক্রমণের আশংকা কম থাকে।

প্রতিকার ☐ বরজে এই রোগ ছড়িয়ে পড়লে প্রতিকার খুবই দুরূহ হয়ে ওঠে। সে কারণে পচা লতাগুলো পানের সারি থেকে সংগ্রহ করে অনেকটা দূরে জমা করে পুড়িয়ে বা মাটির নীচে পুঁতে দেওয়ার দরকার।

পান পাতা তোলার পর প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম হিসাবে তামা ঘটিত যে কোনও একটা ঔষধ যেমন ব্লাইটক্স, ফাইটোলান বা ব্লু-কপার অথবা বিটেলটোন বা ৭.৫ থেকে ১০ মিলি অরগ্যানিউট্রন ভালোভাবে মিশিয়ে গাছের ডাঁটায় উপর-নীচ স্প্রে করতে হবে। পাতা নামানোর পর মাটিতে শুটিয়ে রাখা লতার উপর একইভাবে ওষুধের স্প্রে করে তার দু-একদিন পরে, সম্ভব হলে কিছুটা শুকনো মাটি চাপা দিতে হবে। বিকল্প হিসাবে যদি সম্ভব হয়, তাহলে চাষীরা কিছুটা কম খরচে বোর্দো মিশ্রণ তৈরি করে নিয়েও মাস দু'বার স্প্রে করতে পারেন।

পাতা পচা রোগের লক্ষণ ☐ রোগের প্রথম দিকে পাতায় বাদামী বা গাঢ় কালো দাগ ধরে। দাগ কিছুটা গোলাকার হতে পারে। ছোট দাগ কয়েক দিনের মধ্যে বড় আকার ধারণ করে। শেষে পান পাতার প্রায় অর্ধেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। বর্ষাকালে যখন বেশি কয়েকদিন একনাগাড়ে বৃষ্টি-বাদলা চলতে থাকে ও আবহাওয়া খুবই আর্দ্র থাকে, তখন পানের পাতা পচা রোগ বেশি দেখা যায়।

প্রতিকার ☐ বর্ষার আগে প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম হিসাবে তামা ঘটিত যে কোনও একটি ঔষধ যেমন ব্লাইটক্স, ফাইটোলান বা ব্লু কপার ইত্যাদি গাছের পাতা ও কাণ্ডে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। প্রথমবার ওষুধ দেওয়ার পনের দিন বাদে আবার একইভাবে ওষুধ দিতে হবে।

দরকার মতো এইভাবে আরও দুই-তিনবার ওষুধ প্রয়োগ করা ভালো।

পাতায় কালো অথবা বাদামী দাগ রোগ ☐ পাতায় দাগ প্রথমে লতার গোড়ার দিকে থাকে। কয়েকদিন বাদে লতার উপরের দিকে পাতায় দেখতে পাওয়া যায়। যদি বাতাসে জলকণা বেশি থাকে তখন বরজের ভেতর স্যাঁতস্যাঁতে ভাব বেশি হয়। তখন লতা ও কাণ্ডে দাগ পড়তে শুরু করে। কাণ্ডের সবুজ ছালের নিচেই কালো দাগ বেশ বুঝতে পারা যায়। এই দাগ কিছুটা গোলাকার হয়। তবে বাতাসে যদি জলকণার ভাগ কমে অর্থাৎ শুকনো হয় তখন দাগ আর বাড়ে না। এর বিপরীত হলে দাগ ধীরে ধীরে বড় হয়ে যায়। দাগের জায়গাটা শুকিয়ে যেতে শুরু করে।

প্রতিকার ☐ কুমান এল প্রতি লিটার জলেতে তিন মিলি লিটার মিশিয়ে পান লতায় ছিটিয়ে দিতে হবে। অথবা ফাইটোলান আড়াই গ্রাম এক লিটার জলে মিশিয়ে লতায় এবং পাতায় ছিটালে রোগ দমন করা যাবে। প্রথমবার ওষুধ ছেটোবার পর কুড়িদিন বাদে আবার ওষুধ প্রয়োগ করা দরকার।

শিরায় কালো দাগ ও পাতা পচা রোগ ☐ প্রথমে পাতার রঙ হালকা সবুজ হয় এবং পরে হলুদ হয়ে যায়। এরপর পাতার উপর ছোট আকারে বাদামী অথবা কালো দাগ ধরে। দাগগুলো গোল অথবা যে কোনও আকারের হতে পারে। শেষে পাতার শিরাগুলো কালো হতে থাকে। যদি ভিজে এবং স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া হয়, তাহলে কালো দাগগুলোর জায়গাটা পচে যায়।

প্রতিকার ☐ বোর্দো মিশ্রণ এই রোগ প্রতিকারে বিশেষ কাজ দেয়। রোগ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে। বোর্দো মিশ্রণ লতার সব জায়গায় ভালোভাবে ছেটানো দরকার, প্রথমবার ওষুধ ছেটোবার পর আবার কুড়িদিন বাদে মিশ্রণ প্রয়োগ করা দরকার।

পোকামাকড় ☐

(১) সাদা ও কালো মাছি (White and Black fly Dialeurodes Pallida)

(২) চিরুনী পোকা বা চোষী পোকা (Thrips-Thrips tabaci)

(৩) মাকড় (Mites)

(ক) হলুদ মাকড় (Yellow mites-Hemitersonemus)

(খ) লাল মাকড় (Red mites-Teranychus spp)

(৪) জাবপোকা (Aphid-Aphis gossypil)

(৫) দয়ে পোকা

কালো মাছি ও সাদা মাছি ☐ সাদা মাছির পরী (nymph) এবং প্রাপ্তবয়স্ক (adult) দুটো অবস্থাতে ক্ষতিকর। এর পাতার রস শুষে খেয়ে নেয় এবং পরে পাতাগুলি বাদামী রঙের হয়ে গাছের বৃদ্ধি রহিত হয়। পাতার গায়ে মধুর ন্যায়

বিন্দু বিন্দু রস (honey dew) দেখা যায়। এর থেকে shooty mould দেখা দেয়। এই shooty mould হলুদ মোজাইক রোগের (Yellow mosaic) বাহক (Vector) এবং গাছের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর।

দমন বা প্রতিকার □ সাদা মাছি দমনের জন্য ম্যালাথিওন ৫০% প্রতি লিটার জলে ২ মিলি হিসাবে একর প্রতি ৩০০ লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হয়। এছাড়া নুভান বা ভেপোনা প্রতি লিটার জলে ১ মিলি হিসাবে গুলে ছড়ালে ভালো ফল দেবে। নিমতেল, গুলঞ্চ বা তামাক প্যাতা সেদ্ধ জল স্প্রে করেও পোকা দমন করা যাবে।

চোষী পোকা বা চিরুনী পোকা □ এই প্রকার পোকা ও তাদের পরী পাতার উপরের কোষগুলি ভেদ করে রস চুষে খায়। আক্রমণ মারাত্মক হলে পাতাগুলি এবং আক্রান্ত গাছ ফ্যাকাশে দেখাবে এবং গাছ শুকিয়ে যাবে।

দমন বা প্রতিকার □ এদের দমনের জন্য নুভান বা ভেপোনা প্রতি লিটার জলে ২ মিলি লিটার হিসাবে গুলে স্প্রে করুন বা নিমতেল, তামাকপাতা সেদ্ধ জল স্প্রে করলেও ভালো কাজ দেয়।

জাব পোকা □ জাব পোকা দেখতে খুব ছোট ছোট হয়। এরা দলবদ্ধভাবে পাতা ও ডাঁটার উপর বসে রস চুষে খায়। এদের উপস্থিতিতে পিঁপড়ে ঘোরাফেরা করে।

দমন বা প্রতিকার □ লিটার প্রতি জলে ২ মিলি হারে ম্যালথিওন ৫০% মিশিয়ে ভালো করে স্প্রে করুন। প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে গাছের দুরত্ব কমানো, উপযুক্ত আলো বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা করা সীমিত সার ও জলের ব্যবস্থা, পটাশঘটিত সারের ব্যবহার বিধি করা, নিমতেল বা তামাক পাতা সেদ্ধ জল স্প্রে করা প্রয়োজন।

হলুদ ও লাল মাকড় □ এরা খুবই সুক্ষ্ম হয়। ডগার দিকের পাতার নীচে এরা দল বেঁধে থাকে। এরা পাতার রস চুষে চুষে খায়। ফলে পাতাগুলো কুঁকড়ে সাদাটে হয়ে যায় এবং ঝরে পড়ে।

দমন বা প্রতিকার □ লাল মাকড় দমনে প্রতি লিটার জলে ২ মিলি নুভান বা ভেপোনা মিশিয়ে পাতার নীচে ভাল করে স্প্রে করতে হবে। তামাক পাতা সেদ্ধ জল স্প্রে করলে ভালো কাজ দেবে। কিন্তু হলুদ মাকড়ের জন্য সাদা মাছির মতো ব্যবস্থা নিতে হয়। ম্যালাওথন ৫০ ইসি মাত্র ১ মিলি লিটার মেশানো দরকার। এটা পান লতায় ছেটালে পোকা মাকড় মরে যাবে।

সামগ্রিকভাবে পোকামাকড় দমনের জন্য যা-যা করার দরকার

(১) পানের সারিতে গোড়ায় মাটি উঁচু করে দিয়েও অনেক অবাঞ্ছিত পোকা ও রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

(২) বরজে জল জমতে দেওয়া কখনই চলবে না।

(৩) উপযুক্ত জাত নির্বাচন করা উচিত।

(৪) বরজের চারপাশের ঘেরা বেড়াতে নিয়মিত ওষুধ স্প্রে।

(৫) বরজ সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন, আগাছা কোথাও জন্মাতে দেওয়া চলবে না।

(৬) বরজের চারপাশে গভীর নালা কেটে দেওয়া দরকার। এতে বর্ষাকালে অতিরিক্ত জল গড়িয়ে নালায় চলে আসবে ও বরজ স্যাঁতস্যাঁতে কম হবে।

(৭) সারি থেকে সারির দূরত্ব সমান রাখার দরকার।

(৮) গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করার দরকার নতুবা পোকা তথা রোগের প্রকোপ বাড়বে।

(৯) কিছু উপকারী মাকড়সা, পোকা প্রভৃতির সাহায্যে অনিষ্টকারী পোকা দমন করা যেতে পারে। তাই মাকড়সার দমন কখনও করা উচিত হবে না।

(১০) বর্ষাকালে চারপাশে বেড়া একটু হাল্কা করার দরকার। ফলে স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ কিছুটা কমবে এবং পোকা-মাকড়ের আক্রমণ অনেকটা কমবে।

মাটির নিচে কৃমি □ এরা পান লতার শেকড়ে ক্ষতি করে। যে মাটিতে বালির ভাগ বেশি সেখানে কৃমির আক্রমণ বেশি ঘটে। এদের আক্রমণে শেকড় বাড়তে পারে না। কৃমিগুলো শেকড় থেকে রস শুষে খায়। এদের আক্রমণে পান লতার বাড় কমে যায়। পাতা হলুদ হয়।

প্রতিকার □ সার প্রয়োগ করে এদের দমন করা যায়। এক একর জমিতে ৬০ কেজি নাইট্রোজেন, ২০ কেজি পটাশ এবং ৪০ কেজি ফসফরাস একসঙ্গে মেশাতে হবে। তারপর ওই রাসায়নিক সারে মেশাতে হবে দুই কুইন্টাল নিম খোল এবং ১০ কেজি ফুরাডান ৩ জি। এটা জমিতে প্রয়োগ করলে কৃমি দমন করা যায়।

পান চাষে সরকারি ব্যবস্থা :

(ক) পান চাষের উন্নতির জন্য কৃষি কারিগরী উপসমিতি।

(খ) পান চাষীদের উন্নত চাষ পদ্ধতি / প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

(গ) ১০ শতক জমিতে পান বরজের প্রদর্শনী স্থাপন।

(ঘ) সরকারি ঋণের ব্যবস্থা, যদিও তার পরিমাণ খুবই স্বল্প। কাঠা প্রতি মাত্র ১০০ টাকা। যে কোন পান চাষী সর্বোচ্চ ১৫৩০ টাকা ঋণ পেতে পারেন।

(ঙ) বিপনন ও পরিসংখ্যান উপ-সমিতি—পান বিক্রির সুব্যবস্থা, পানের বাজার গবেষণা ও বিভিন্ন তথ্য ইত্যাদির দেখভাল করার সুবিধার্থে।

(চ) ভরতুকিতে পান চাষের বিবিধ যন্ত্রপাতি বিতরণ ব্যবস্থা।

(ছ) সরকারি খামারে আদর্শ পান বরজ স্থাপন এবং বিভিন্ন প্রজাতির উন্নত জাতের পানের চারা বা কাটিং বিতরণ ব্যবস্থা।

(জ) সরকারি খামারে আদর্শ পান বোরোজ স্থাপন এবং বিভিন্ন প্রজাতির উন্নত জাতের পানের চারা বা কাটিং বিতরণ ব্যবস্থা।

পান চাষের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক ও বিভিন্ন কাজ □ যে কোনও শ্রমিক পান-বরজে কাজ করতে পারে না। পান তোলা, পান গোছানো—বা বাজারজাত করা, বরজ নামানো, পান গাছে ওষুধ স্প্রে করা, পানের সারিতে মাটি দেওয়া, মাটি ঠেলা, পানের বরজে জল দেওয়া। লতা বাঁধা, বরজের ছাউনি কাজ—প্রত্যেকটি কাজ নিখুঁতভাবে করার দরকার। বোরোজের কাজের জন্য—বিশেষ দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায় রামনগরের (পূর্ব মেদিনীপুর) বিভিন্ন গ্রামে। পশ্চিম করঞ্জি, পূর্ব করঞ্জি, দক্ষিণ করঞ্জি, উত্তর করঞ্জি, তলকাঁটালিয়া, সটিলাপুর, উত্তর কচুয়া, শ্যামপুর, বাগুলিপাট, কানপুর, থিয়ার, কিসমৎ থিয়ার, মান্দার, কুলবুটি, ভুইএলাজি বাড়, বোধড়ি, পদ্মেশ্বরী, তাজপুর, নরকুলি প্রভৃতি গ্রামগুলিতে পান অধিক পরিমাণে চাষ হওয়ায় এই এলাকার মানুষ পান চাষে দক্ষ হয়ে উঠেছে। এইসব গ্রামগুলির ভেতর মোরাম দেওয়া লালমাটির রাস্তা ধরে পান চাষকে কেন্দ্র করে ভ্যান রিক্সার চলাচল আগের চেয়ে বেড়েছে। ফলে বাড়তি জীবিকার জন্য এলাকার সাধারণ মানুষ ভ্যান চালানোকে উপায় হিসাবে বেছে নিয়েছে।

তবে, বর্তমান শ্রমমূল্য, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, বেকারত্বের জন্য অধিক সংখ্যক পান বরজের জন্ম, পান ব্যবসায় অধিক প্রতিযোগিতা, পান পরাগের প্রচলন, ক্যান্সার ভীতি, পান ছাড়া অন্যান্য মাদকের প্রতি যুব সমাজের আগ্রহ পান চাষকে অনেক সীমায়িত করে ফেলেছে। তবু পান যেন হৃদয়ের কথা বলে প্রাণের আরতি যেন পান পাতায় লেখা।

প্রবন্ধ শেষ করি পানের উপকারিতা দিয়ে। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় পানের বিচিত্র ব্যবহার আছে। প্রচীনকাল থেকে পান যেমন ভারতীয় সাহিত্যি-সংস্কৃতিতে মিশে আছে তেমনি রোগ প্রতিকারে এর ব্যবহার বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে পান নিয়ে গবেষণা কম হয়নি। নিচে রোগ নিরাময়ে পানের ব্যবহারের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

রোগ প্রতিকারে পানের ব্যবহার :

(ক) শ্লেষ্মাপ্রধান রোগে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকগণ ওষুধের সহপানে পানের রস ব্যবহার করে থাকেন তার কারণ এই প্রকার রোগে পানের (তাম্বুল) প্রভাব প্রভূত।

(খ) ঝাল পানের পাতার রস মাথায় মাখলে উকুনের বংশ নির্বংশ করা যায়।

(গ) পানের রস গরম করে সহ্যমতো অবস্থায় কানে ২ / ১ ফোঁটা দিলে কানের পুঁজ চলে যায়।

(ঘ) গর্ভ নিরোধের ওষুধ হিসাবে পানের শিকড় বাটা খাওয়ানো হয়। (Glossary of Indian Medicinal Plants-এ উল্লেখ আছে)।

(ঙ) দাঁতের মাড়িতে পুঁজ জমতে থাকলে পানের রসের সঙ্গে অল্প জল মিশিয়ে কুলকুচি করলে, মাড়িতে পুঁজ জমা বন্ধ হয়। দাঁতের মাড়িতে কোন দূষিত ক্ষত থাকলেও ক্রমশ সেই ক্ষত শুকিয়ে যায়।

(চ) পায়ে-হাতে হাজায়, অল্প গরম পানের রস রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে লাগালে, উপশম হয়।

(ছ) পুরাতন দাদ ও চাপড়া চুলকানিতে পানের রস খুবই উপকারী।

(জ) পানের পাতার সোজা পিঠে পুরানো ঘি মাখিয়ে, ফোঁড়ার উপর বসিয়ে দিলে ফোঁড়া পাকে ও ফাটে।

(ঝ) পানের পাতার উল্টোপিটে পুরানো ঘি মাখিয়ে ফোঁড়ার উপর বসালে ওটা পুঁজ টেনে বার করে শুকিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে অবশ্য পান পাতাটিকে ঘি লাগিয়ে একটু গরম করে নিতে হয়।

(ঞ) পানের রস গরম করে দিনে ৩ / ৪ বার নখের কোণে দিলে ব্যথা থেকে রেহাই হয়।

(চ) পান পেটের গোলমাল নিরাময়ে সহায়ক এবং বায়ুরোগ নাশক (Carminative)।

(ছ) ফুসফুসের রোগে ও ডিপথেরিয়া রোগে পান খুবই উপকারী।

(জ) দুধের সঙ্গে পানের রস মিশিয়ে হিস্টিরিয়া রোগীকে দিলে রোগ কিছুটা উপশম হয়।

(ঝ) পানের রস মধুসহ সেবন করলে কাশি কমে।

(ঞ) পানের রস চোখের পীড়া ও পিপাসা নিবারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। চোখ ওঠা (Conjunctivitis) এবং দিনকানা (nemaralopia) রোগে পানের টাটকা রস খুবই উপকারী।

(ট) পানের তেল ১ : ০০০ অনুপাতে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করলে কলেরা জীবাণুর বৃদ্ধি বন্ধ করতে পারে।

(ঠ) ১ : ৩০০ অনুপাতে ব্যবহার করলে ডায়েরিয়া ও টাইফয়েড রোগের জীবাণুকে ধ্বংস করে।

(ড) ১ : ৫০০০ অনুপাতে পানের তেল ব্যবহারে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু ধ্বংস করা যায়।

লেখক : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক

ছবি : নিত্যগোপাল ঘোষ

মেদিনীপুরে ফুল চাষ : উজ্জ্বল সম্ভাবনা

গৌতম চক্রবর্তী

সমগ্র ভারতে ফুল উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান তৃতীয়। কর্নাটক ও তামিলনাড়ুর পরেই পশ্চিমবঙ্গ। বিশ্বের বাজারে পশ্চিমবঙ্গের ফুল ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। রজনীগন্ধা, গোলাপ, মোরগফুল, গ্লাডিওলাস, চন্দ্রমল্লিকা জারবেরা ইত্যাদির চাহিদা বিদেশের বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণের। জাপান, আমেরিকা, নেদারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, হংকং, সৌদি আরব, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে পশ্চিমবঙ্গের ফুল রপ্তানি হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বিদেশে ফুল রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এজন্য বিদেশে পাঠানোর উপযোগী ফুল উৎপাদনের জন্য চাষীদের নিয়ে সেমিনার ও প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজনও করা হচ্ছে। গত ২০০১-২০০২ সালে সারা পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৩৫০২ হেক্টর জমিতে ফুল চাষ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, নদিয়া এবং হাওড়া।

মেদিনীপুরে ফুল চাষ

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরেই ২০০২ সালে ৬৪৬৩ হেক্টর জমিতে ২৬.৯৬৮ কোটি টন বিভিন্ন ফুলের কুঁড়ি এবং ১৬০৮৩.৩ মেট্রিক টন ঝুরো ফুল উৎপাদিত হয়েছে। এই সময় সারা পশ্চিমবঙ্গে ফুলের উৎপাদন ছিল ৬৭.৭১২ কোটি টন বিভিন্ন ফুলের কুঁড়ি এবং ৩১২৬৭ মেট্রিক টন ঝুরো ফুল।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার জানাবাড়, উত্তর পলসা, নস্করদিঘি, সাঁকটিকরি, কাঁটামুনি, তিলন্দপুর গ্রামগুলিতে মোরগফুল ব্যাপক হারে চাষ হয়।

মরশুমি ফুলের বাজার

কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি বা সি আই আই পাঁশকুড়ার ফুলকে পূর্বাঞ্চলের বিশিষ্ট শিল্পপতি বিনিয়োগকারীদের কাছে তুলে ধরতে উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ফুল চাষ ও রপ্তানির সুযোগ-সুবিধা ও সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখার জন্য সরেজমিনে প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছে গ্রামাঞ্চলে। ২০০২-০৩ সালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ১২৪২ হেক্টর জমিতে খারিফ সময়ে ফুল চাষ ও উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯৩৩৬ মেট্রিক টন। শীতকালে ২১৮৫ হেক্টর জমিতে ১৭ হাজার ৪৮০ মেট্রিক টন ফুল উৎপাদন হয়েছিল। গ্রীষ্মকালে ১৩১০ হেক্টর জমিতে ফুল উৎপাদিত হয়েছে ১০ হাজার ২৮০ মেট্রিক টন।

জেলাশাসকের কথায় জানা যায় বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুরের ফুল রাজ্যের ও দেশের সীমা ছাড়িয়ে ভিন দেশে রপ্তানি হচ্ছে, মূলত মুম্বাই হয়ে ফুল চলে যাচ্ছে আরব দেশে। এছাড়া পাঁশকুড়া ও দেউলিয়া বাজার থেকে দিল্লিতে প্রতিদিন ২০ হাজার গোলাপ পাঠানো হয়। রাঁচির বাজারে বিভিন্ন রকমের ২৫-৩০ কুইন্টাল ফুল রাঁচির বাজারে যায়। ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশাতেও পাঁশকুড়ার ফুল নিয়মিত যাচ্ছে। তবে সি আই আই প্রতিনিধিদের কাছে ফুল ব্যবসায়ী ও চাষীদের অভিযোগ পাঁশকুড়ার কেশাপাট, মাইশরা, গোবিন্দনগর, হাউর, ঘোষপুর, প্রতাপপুর, রঘুনাথবাড়ি, পুলশিটা, সিদ্ধা, গোপালনগর, কোলা, খন্যাডিহি, বৈষ্ণবচক, সাগড়বাড় প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক ফুল চাষ হলেও বিপণন ও সংরক্ষণের অভাবে চাষীরা আর্থিক দিক থেকে লাভবান হয় না।

এছাড়া পূর্ব মেদিনীপুরে যেখানে যেখানে ফুলের বাজার বসে সেখানে কোনও আচ্ছাদন নেই, কোনও শৌচাগার নেই। ব্যবসায়ীদের স্বার্থে তা প্রয়োজন। সরকারের কাছে ফুল চাষীদের কম দামে বীজ সরবরাহ করার দাবিও বহুদিনের।

চাষী ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে সি আই আই প্রতিনিধিরা বলেন, আমরা মনে করি প্যাকেজিং, মার্কেটিং-এর সমস্যা মেটাতে পারলে পাঁশকুড়ার ফুলচাষ লগ্নিকারীদের কাছে আকর্ষণীয় হবে। সে কারণে সি আই আই লগ্নি টানতে যথাযথ চেষ্টা চালাবে। প্রয়োজনে দামি মেসিনপত্র ও উন্নত প্রযুক্তি ফুল চাষীদের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে। পশ্চিমবঙ্গে ফুল উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে লগ্নির উজ্জ্বল সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠছে একথা আই সি আই আই প্রতিনিধিদের আর সন্দেহ নেই।

২০০২ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০০৩ সালের জুলাই পর্যন্ত এই সাত মাসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিশ্বের বাজারে ১১ লক্ষ ৭১ হাজার ১৫৭ টাকার ফুল রপ্তানি হয়েছে। যে পাঁচটি দেশ যে পরিমাণ ফুল কিনছে তার একটা চিত্র দেওয়া হল :

ক্রেতা দেশ	২০০২ ডিসেম্বর থেকে ২০০৩ জুলাই পর্যন্ত রপ্তানির হিসেব
সংযুক্ত আরব আমীর শাহী	৬ লক্ষ ৮১ হাজার ৫৯০ টাকা
লন্ডন	৮২ হাজার ৯১৭ টাকা
নেদারল্যান্ডস	৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ১৫০ টাকা
মায়ানমার	১৫ হাজার টাকা
সিঙ্গাপুর	১৪ হাজার ৫০০ টাকা

রাজ্যের ফুল চাষীদের উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে মল্লিকঘাটে একটি উন্নত অত্যাধুনিক ফুলবাজার স্থাপন করেছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়াতেও একটি ফ্লাওয়ার কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ। এখানে বিদ্যুৎব্যবস্থা যুক্ত হলেই ফুলের বাজার চালু হয়ে যাবে। পাঁশকুড়া ফুলচাষী উন্নয়ন সমিতি এই ফ্লাওয়ার কমপ্লেক্সকে ঘিরে যথেষ্ট আশাবাদী। এটি চালু হলে পাঁশকুড়া, কোলাঘাট, ডেবরা, তমলুক, দাসপুর, নন্দনপুর, সবং, পিংলা ও ময়নার কয়েক হাজার ফুলচাষী উপকৃত হবেন।

তথ্য সূত্র ও সৌজন্যে : গণশক্তি, কালান্তর ও বর্তমান

লেখক : তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের কর্মী

মেদিনীপুরের নদ-নদী : ঐতিহাসিক সমীক্ষা

দেবামাল্য খুঁটিয়া

'পদ্মার বুকে নৌকা ভাসিয়ে যে বাংলাদেশকে দেখেনি, সে এদেশ দেখেনি।'—

নদ-নদী যে বাংলার এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, দীর্ঘ কয়েক দশক আগে লিখে যাওয়া রবীন্দ্রনাথের ওই উদ্ধৃতিতেই স্পষ্ট। এমনকী বাংলার কোনও অংশকেই নদ-নদী বাদ দিয়ে যে কল্পনা করা যায় না তা আজকের এই বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যুগেও স্বীকার্য। প্রাচীন কাব্যে মনসার ভাসান অথবা চাঁদ সওদাগরের নদীপথে বাণিজ্যযাত্রার ছবি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ের নানা ছড়া, কাব্য, গান, কিংবদন্তি ইত্যাদিতে বাঙালির মনে নদ-নদীর ছবি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে— মেদিনীপুর জেলার নদ-নদীও তাই এই আলোচনার বাইরে নয়। সুতরাং বাংলার মতো মেদিনীপুরের ইতিহাস জানতে হলে এর নদ-নদীর সঙ্গে সম্যক পরিচয় একান্ত দরকার।

বাংলার শেষ নবাবের সময়ে সুবর্ণরেখা নদী ওড়িশার উত্তরসীমা হিসেবে চিহ্নিত হত। সে সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ সুবর্ণরেখা নদী পর্যন্ত ভূখণ্ডকে ওড়িশার অন্তর্গত হিসেবে অধিকারে রেখেছিল ; কিন্তু সুবর্ণরেখা ও রূপনারায়ণের মধ্যবর্তী 'মেদিনীপুর' প্রদেশটি তখনও কাগজে-কলমে ওড়িশা হিসেবে পরিচিত ছিল'। সরকারি রিপোর্টেও বলা হয়েছে—"In the last century Orissa included the tract of century between the river Rupnarayana and Subarnarekha."[২] যাই হোক,

কোলাঘাট, রূপনারায়ণ নদী

মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে রূপনারায়ণ ও সুবর্ণরেখার মধ্যবর্তী প্রদেশটি নিয়েই আজকের 'মেদিনীপুর' জেলা।

বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি মেদিনীপুর জেলার অবস্থান হওয়ায়, এখানে নদী-নালার সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার চাইতে স্বাভাবিকভাবেই বেশি ; এই নিদর্শন আবার জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ হল 'হুগলি' নদী। হুগলি পয়েন্টের বিপরীতে, যেখানে 'রূপনারায়ণ' এই নদীতে এসে পড়েছে, সেখান থেকে পূর্ব সীমানা বরাবর প্রবাহিত হয়ে এটি বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। যদিও জেলার ভেতর এর অনুপ্রবেশ ঘটেনি, তবুও এর উপনদী ও শাখা-প্রশাখা দ্বারা জেলার অনেকাংশই বিধৌত। নিচের তালিকা থেকে মোটামুটি আন্দাজ সম্ভব।

মেদিনীপুরের ইতিহাস লিখতে গিয়ে তরুণদেব ভট্টাচার্য লিখেছেন যে, 'হুগলি' নদীর তীরে একসময় গুরুত্বপূর্ণ ছিল খেজরি (বর্তমান খেজুরী), সেখানে বড় বড় বাণিজ্যপোত এসে নোঙর করত (১৮৬১-৬২ পর্যন্ত)। সাগরদ্বীপের পশ্চিমাংশ ঘেঁষে হুগলির সাগর অভিমুখে যাত্রা। মোহনামুখে সমুদ্রের মতোই এর বিশাল বিস্তার। পলি জমে ছোট ছোট দ্বীপ গড়ে উঠেছে সেখানে।[৪] খেজরি ছাড়া আর যে সব স্থান এ জেলার ভেতর 'হুগলি' নদীর তীরে অবস্থিত তার মধ্যে কাউখালির বাতিঘর, হুগলি ফ্ল্যাট ও হিজলি মন্দির উল্লেখযোগ্য।[৫] অর্থাৎ মেদিনীপুরের নদ-নদীর সঙ্গে হুগলি নদীর সম্পর্ক চিরস্বীকৃত। Bengal District Gazetteers (Midnapore)-এ বলা হয়েছে—"The river system of Midnapore consists of the Hooghly, of its idal tributaries, the Rupnarayan and Rasulpur, and of their sub-tributaries."[৬]

মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়ে যে কয়েকটি নদী প্রবাহিত হয়েছে, তার মধ্যে পাঁচটি প্রধান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই পাঁচটি নদীরই বিভিন্ন শাখা এই জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে স্ব-স্ব কূলসন্নিহিত অঞ্চলগুলিকে শস্যশালী করেছে।

শিলাবতী বা শিলাই

বুড়ি, গোপা, পুরন্দর ও কুবাই নদী মিলিত হয়ে 'শিলাবতী' নাম গ্রহণ করেছে। এই নদীটি রামগড় পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বগড়ি পরগনা হয়ে ঘাটালমধ্যে 'দ্বারকেশ্বর' নদীর সঙ্গে মিশেছে। পরে এই দ্বারকেশ্বর ও শিলাবতী নদী নিজেদের নাম পরিত্যাগ করে 'রূপনারায়ণ' নদী নাম গ্রহণ করেছে এবং তমলুক মহকুমার অন্তর্গত হুগলি পয়েন্টের উলটোদিকে গেঁয়োখালিতে হুগলি নদীর সঙ্গে মিশেছে, এই স্থানে নদীর মোহনামুখ প্রায় ৩ মাইল চওড়া। নদীটি নাব্য হওয়ায় সারা বছর জলে পরিপূর্ণ থাকে।

কংসাবতী বা কাঁসাই

'কংসাবতী' বা 'কাঁসাই' নদীটি ছোটনাগপুরের পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে

মেদিনীপুর জেলার নদী-বিন্যাস*

হুগলি

পশ্চিম দিক থেকে এসে পড়েছে

রূপনারায়ণ

এসে পড়েছে

শিলাই বা শিলাবতী
পশ্চিম তীরে

এসে পড়েছে

বুড়ি, পশ্চিম তীরে
গোপা, পূর্ব তীরে
পুরন্দর, পূর্ব তীরে

হুগলি

এসে পড়েছে

কাঁসাই
উত্তর তীরে

এসে পড়েছে

কালিকুণ্ড, উত্তর তীরে

রসুলপুর
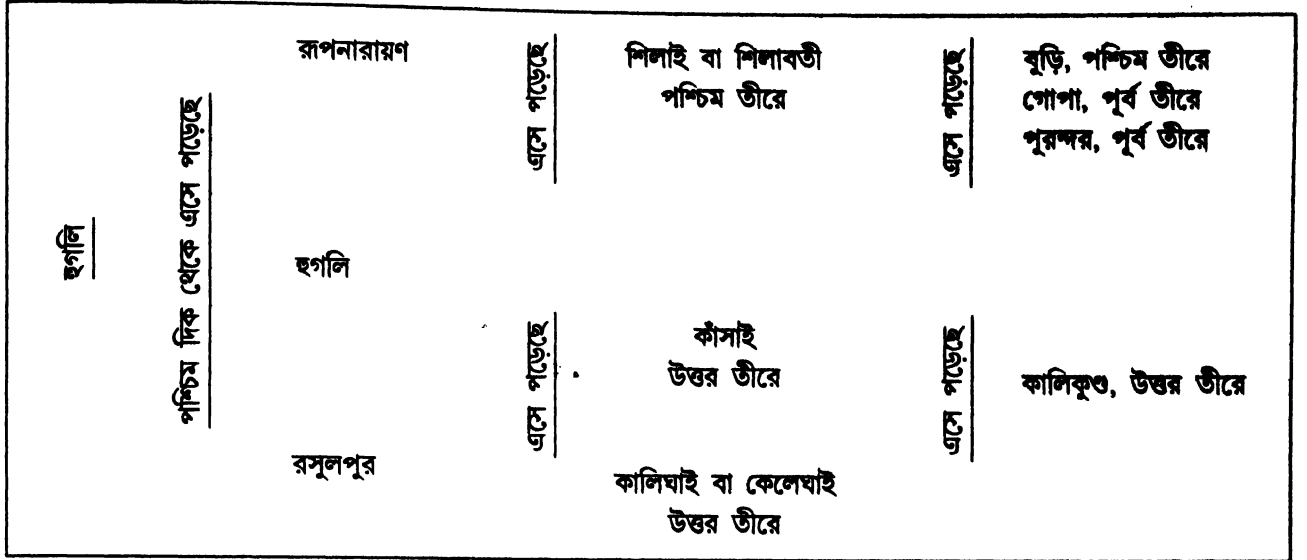
কালিঘাই বা কেলেঘাই
উত্তর তীরে

রামগড় পরগনায় পড়েছে। পরে মেদিনীপুর শহরের নিম্নভাগ দিয়ে খানিকটা পূর্বদিকে গিয়ে আবার দক্ষিণ অভিমুখে প্রবাহিত হয়ে 'কেলেঘাই' নদীর সঙ্গে মিশেছে। মেদিনীপুর শহরের উপকণ্ঠে এই 'কাঁসাই' নদী কিন্তু ততটা নাব্য না হওয়ায় সারা বছর তেমন জল থাকে না।

কেলেঘাই বা কালিঘাই

'কেলেঘাই' বা 'কালিঘাই' নদী মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম প্রান্তে জন্ম নিয়ে নারায়ণগড়, সবং, ময়না এবং দক্ষিণে খট্‌নগর, পটাশপুর, অমর্শি প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এরপর ট্যাংরাখালিতে 'কাঁসাই' নদীতে পড়ে 'কাঁসাই' ও 'কেলেঘাই' নদীর মিলিত স্রোত 'হলদি' নদীর সৃষ্টি করেছে। এখান থেকে 'হলদি' নদী দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এই নদীরই তীরে গড়ে উঠেছে বন্দর নগরী হলদিয়া। মোহনার কাছে 'হলদি'র আকার বিশাল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাঝে মাঝে বালির চর থাকায় জলযানের পক্ষে বিপজ্জনক। তবু সারা বছর নাব্য—বেগবান স্রোত।[৭]

বাগদা রসুলপুর

'বাগদা' নদীটি মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে উৎপন্ন হয়েছে। এরপর পূর্বদিকে খানিকটা অগ্রসর হয়ে কালিনগরে 'বোরেজ' (বর্তমানে 'সদর খাল' নামে পরিচিত) নদীর সঙ্গে মিশেছে এবং 'রসলপুর' নদী নাম গ্রহণ করেছে। এই 'রসলপুর' নদী কাউখালি বাতিঘরের নিচে 'হুগলি' নদীতে পড়েছে।

সুবর্ণরেখা

'সুবর্ণরেখা' নদী পশ্চিমে ধলভূমি প্রদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে নয়াবসান পরগনার পশ্চিম প্রান্ত বরাবর অগ্রসর হয়েছে। এরপর দাঁতনের দক্ষিণ দিক দিয়ে ওড়িশার বালেশ্বরের দিকে গেছে এবং বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

নদ-নদীর গতি পরিবর্তন

বাংলার বিভিন্ন নদীগুলোর মতো মেদিনীপুরের নদীগুলির খাত ও প্রবাহ চিরকাল একইভাবে থাকেনি—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। কারণ বাংলার যে ভূ-প্রকৃতি, তাতে নদীর খাত যুগে-যুগে পরিবর্তিত হবে, পুরনো নদী ভরাট হয়ে নতুন নদী সৃষ্টি হবে—এটাই স্বাভাবিক। ষোড়শ শতক থেকে শুরু করে উনবিংশ শতকের শেষ—এই চার শতাব্দীর মধ্যে বাংলা তথা মেদিনীপুরের ছোট-বড় কত নদ-নদী যে কতবার তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে, কত পুরনো নদী বন্ধ হয়ে নতুন নদীর সৃষ্টি করেছে, তার প্রমাণ আমরা সমসাময়িক কিছু ভূমি-নকশা বা মানচিত্রে দেখতে পাই। ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতকের মধ্যে Jao de Barros (1550), Gastaldi (1561), Hondivs (1614), Cantelli da Vignolla (1683), Van den Broucke (1660), G. Delisle (1720-40), Izzak Tirion (1730), F. de Wit (1726), Rennel (1764-76) প্রমুখ পোর্তুগিজ, ডাচ ও ইংরেজ বণিক, রাজকর্মচারী ও পণ্ডিতেরা তৎকালীন বাংলা ও ভারতবর্ষের বহু মানচিত্র বা নকশা এঁকেছিলেন, যাতে মধ্যযুগে বাংলার নদ-নদী ও জনপদগুলির ক্রমপরিবর্তনশীল আকৃতি, পুরনো নদীর মৃত্যু, নতুন নদীর জন্ম ইত্যাদি বিষয় ধরতে পারা যায়। তা ছাড়া ইবনবতুতা (1326-54), বারনি (চতুর্দশ শতক), রালফ ফিচ
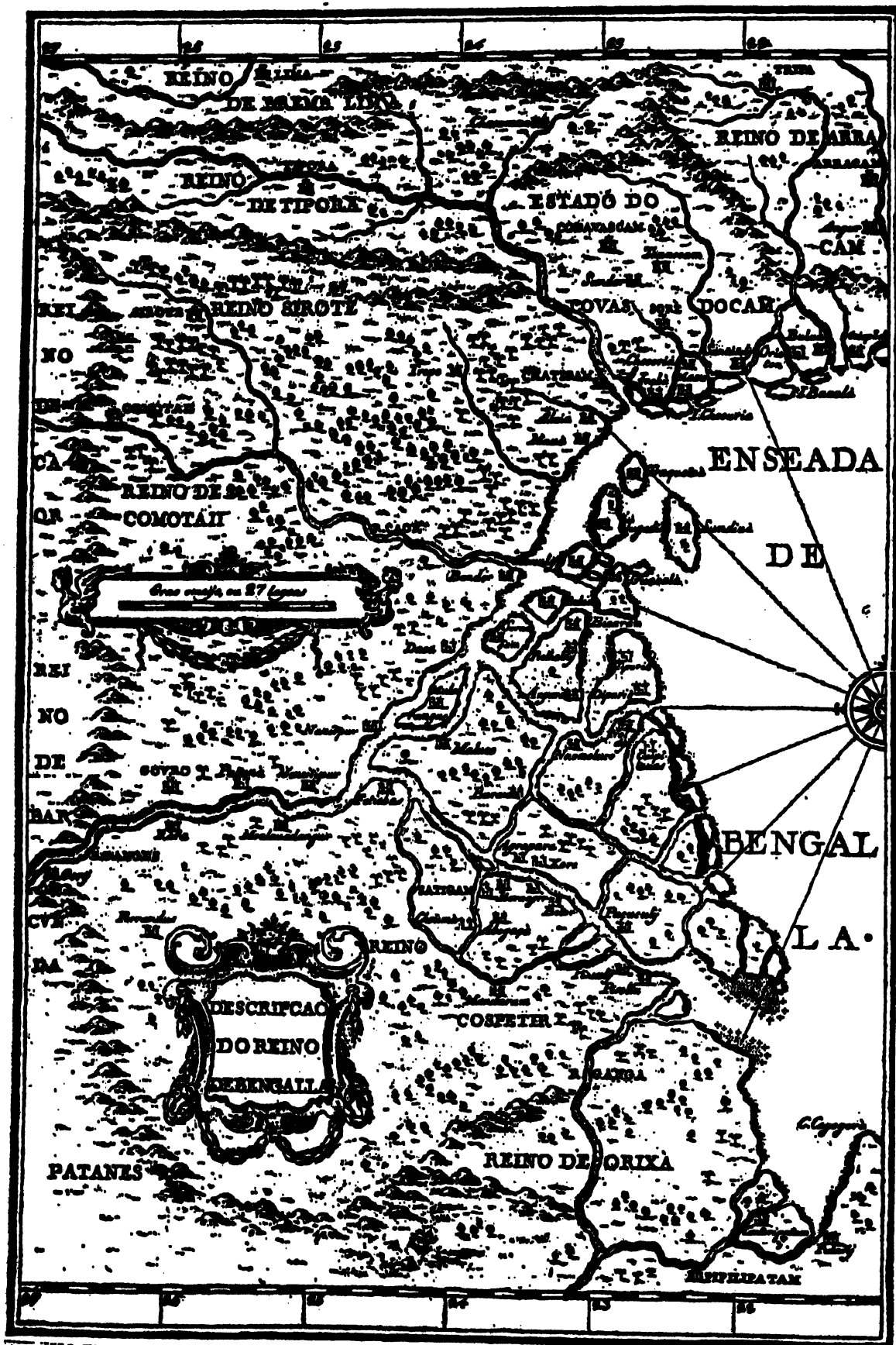
জাও ডি ব্যারোসের নকসা, ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ

(1583-91), Fernandes (1598), Fonseca (1599) প্রমুখ পর্যটকের বিবরণী, বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল', মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল', বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল', কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', গোবিন্দদাসের কড়চা, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থ ইত্যাদি এবং সমসাময়িক মুসলমান লেখকদের ইতিহাস থেকেও এই পরিবর্তনের ছাপ স্পষ্ট বোঝা যায়। সাম্প্রতিক কালে নদীমাতৃক বাংলার ক্রমপরিবর্তনশীল আকৃতি-প্রকৃতি বিষয়েও বিভিন্ন আলোচনা ও লেখালেখি যথেষ্ট হচ্ছে। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন যে, ষোড়শ শতকের আগেও বাংলার প্রধান নদ-নদীগুলি যুগে যুগে এই ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। কারণ প্রাচীন সাহিত্যে, লিপিমালায়, টলেমির নকশায় যে বাংলার দু-চারটি নদীর প্রবাহপথ সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা বর্তমান প্রবাহপথ তো নয়ই, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রবাহপথের সঙ্গেও তার মিল নেই।[৮]

মেদিনীপুর জেলা গঙ্গার মোহনায় সমুদ্রতীরে অবস্থিত হওয়ায় এবং এই জেলার সমস্ত নদী উত্তর ও পশ্চিমদিক থেকে এসে বঙ্গোপসাগরে পড়ায় দক্ষিণ ও পূর্বদিকে বেশি পরিবর্তন ঘটেছে। খ্রিস্টীয় ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপীয় বণিকদের আঁকা বাংলার মানচিত্রে দেখা যায় যে, এই কয়েক শতাব্দীর মধ্যেও মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের নদীগুলির গতিপথের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আঁকা Rennel-এর মানচিত্রে 'রূপনারায়ণ' নদীর নাম আছে ; কিন্তু তার আগে এই নদী বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। Gastaldi-র ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দের মানচিত্রে এবং ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে আঁকা Jao de Barros-র মানচিত্রে এই নদী 'গঙ্গা' নামে পরিচিত হয়েছে।[৯] আবার ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে আঁকা Van den Broucke-র মানচিত্রে 'ভাগীরথী'র পশ্চিমদিকের কোনও নদীর নামোল্লেখ নেই। এই সমস্ত নদী পর্যায়ক্রমে '১ম', '২য়', '৩য়', '৪র্থ' ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত আছে। সেই নির্দেশমত 'রূপনারায়ণ' ও 'সুবর্ণরেখা' নদী '৩য়' ও '৪র্থ' নদী হিসাবে চিহ্নিত। এরপর 'রূপনারায়ণ' নদীটি ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে আঁকা Vallentin-র মানচিত্রে 'পাথরঘাটা', ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দের বাউরীর মানচিত্রে 'তমালী' এবং ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে আঁকা বণিকের মানচিত্রে 'তাম্বলী', 'তাম্বরলী', 'তাম্বরলীন' প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ', Vallentin-র মানচিত্রে দেখা যায় যে, সে সময়ে 'দামোদর' নদীর দুটি শাখার একটি তমলুকের দক্ষিণে 'রূপনারায়ণ' নদীর সঙ্গে মিলিত ছিল এবং অন্যটি পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে কালনার কাছে 'ভাগীরথী'র সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। তাই অনুমান করা হয়, এই সংযোগের জন্য বিদেশি নাবিকদের কাছে সেই সময়ে এই নদীটি 'ভাগীরথী'র শাখানদী হিসেবে মনে হওয়ায় একে 'গঙ্গা' নামেও অভিহিত করা হয়েছে। পরবর্তীকালে নাবিকেরা এই নদীর তীরবর্তী 'তাম্রলিপ্ত' বা 'তমলুক' শহরের নামানুসারে 'তমালী', 'তাম্বলী' প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন। আর Rennel-ই সর্বপ্রথম তাঁর মানচিত্রে 'রূপনারায়ণ' নামটি উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন নাবিকেরা যে এই নদীকে ভুলবশত 'পুরাতন গঙ্গা' নামে উল্লেখ করেছিলেন, সেকথা Rennel নিজেই বলেছেন।[১০]

Jao de Barros ও Gastaldi-র মানচিত্রে দেখা যায় যে, ষোড়শ শতকে 'রূপনারায়ণ' নদী দুটিও প্রশস্ত শাখায় বিভক্ত হয়ে 'ভাগীরথী'তে মিশে ছিল। এই দুটি শাখার মধ্যবর্তী ভূভাগ একটি দ্বীপের আকার নেয়। পরবর্তীকালে Vallentin ও বাউরীর মানচিত্রে পশ্চিম-দক্ষিণাংশটির অস্তিত্ব নেই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর Rennel-র মানচিত্রে তমলুক থেকে টেঙ্গারাখালী পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হতে দেখা যায়। বর্তমান 'হলদি' নদী এই টেঙ্গারাখালী থেকে শুরু হয়ে 'হুগলি' নদীর সঙ্গে মিশেছে। সে সময়ে এর যে অংশটি তমলুক থেকে টেঙ্গারাখালী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, পরবর্তীকালে তা বিস্তৃত হয়ে যাওয়ায় পূর্বোক্ত দ্বীপটি মেদিনীপুর জেলার ভূখণ্ডের সঙ্গে মিশে গেছে। এই দ্বীপটি বর্তমান 'সুতাহাটা' ও 'মহিষাদল' থানা।[১১]

সুতাহাটা ও মহিষাদল থানার মতো 'খেজরি' থানারও নৈসর্গিক সীমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। Jao de Barros-র ষোড়শ শতাব্দীর মানচিত্রে 'ভাগীরথী'র মোহনায় একটি নতুন দ্বীপ গড়ে উঠেছিল দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর Vallentin-র মানচিত্রে সেই স্থানে দুটি দ্বীপ আঁকা আছে। এই দুটি দ্বীপ হল— 'খাজুরী' (বর্তমান নাম 'খেজুরি') ও 'হিজলি' দ্বীপ। এই দুটি দ্বীপের কথা কোম্পানির সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বহু রিপোর্টেও উল্লেখ আছে। সেই সময়ে এই দুটি দ্বীপের মধ্য দিয়ে 'কাউখালি' নদী নামে একটি নদী প্রবাহিত ছিল, বর্তমানে এর কোনও অস্তিত্ব নেই। এই নদীটি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় 'খাজুরি' ও 'হিজলী' দ্বীপ দুটি একসঙ্গে মিশে গিয়ে বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেছে। "In Rennel's Atlas (Plates VII and XIX) the islands no longer appear, presumably because they had been joined to the mainland in the same way as the Kukrahati—Tamluk island above mentioned."[১২]

জনজীবনে নদ-নদীর প্রভাব

বস্তুত এদেশের অধিকাংশ ভূ-ভাগ নদ-নদীর দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ প্রবাহবাহিত পলিমাটির স্তরে স্তরে অবক্ষেপই এই ভূ-ভাগকে সমুদ্র থেকে গেঁথে তুলেছে।[১৩] উত্তরে হিমালয় থেকে শুরু করে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সুন্দরবন অঞ্চল পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় ভূ-বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন— দু-তিন হাজার ফুট গভীরতা পর্যন্ত শুধুই স্তরে স্তরে বালুকা আর নানাশ্রেণীর মৃত্তিকা পরপর সাজানো রয়েছে নিচের আদিম প্রস্তরের ভিত্তির ওপর। এই স্তরীভূত বালি আর মাটিগুলো যে নদ-নদীর প্রবাহে বাহিত হয়েই এসেছে আর যুগ যুগ ধরে সমুদ্রগর্ভে জমা হয়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব-দ্বীপ সৃষ্টি করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমগ্র বাংলার ভূ-ভাগই
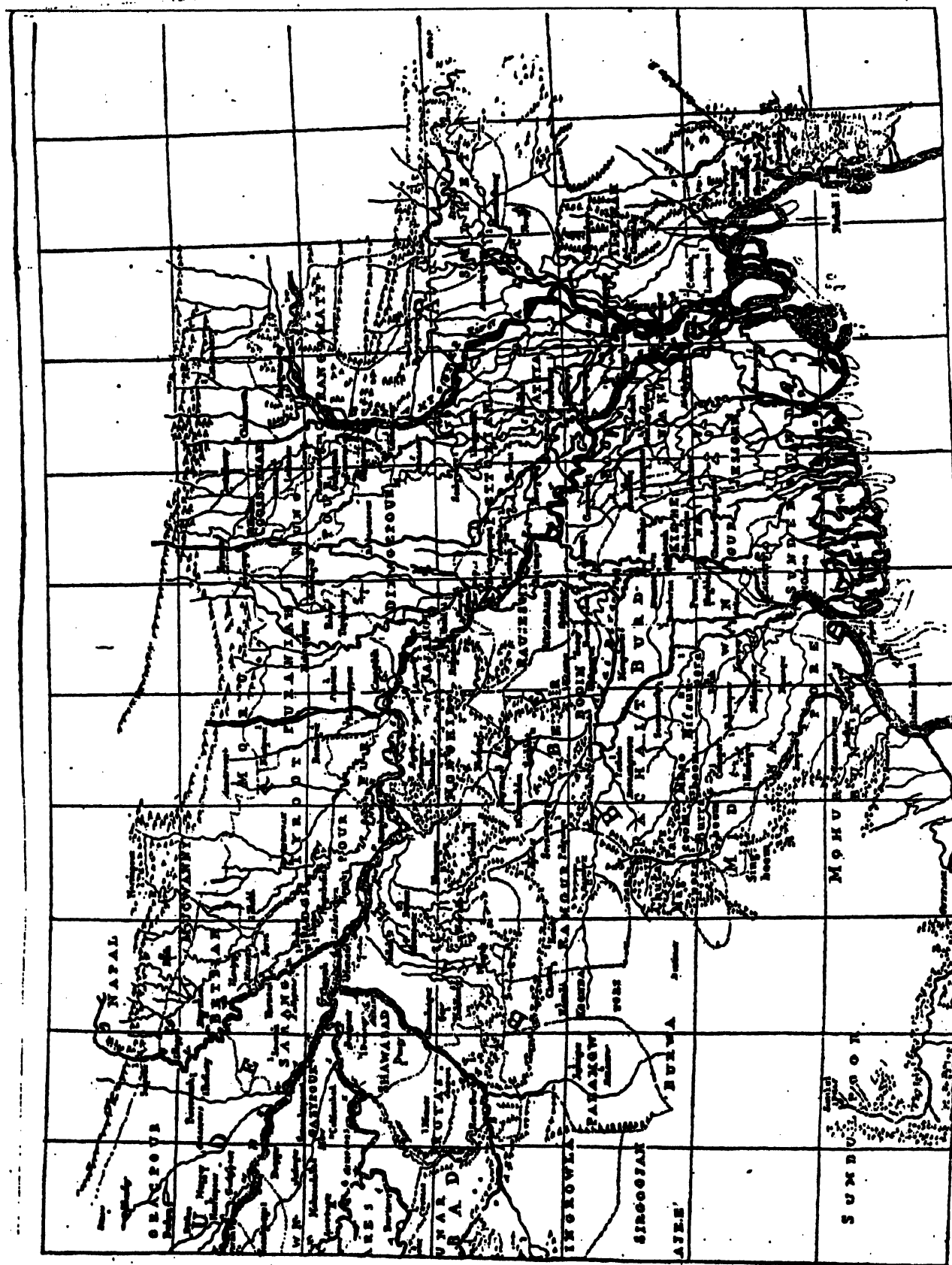
রেনেলের নকশা, ১৭৬৪-৭৩ খ্রিস্টাব্দ

নদ-নদীবাহিত পলির দ্বারা সৃষ্টি, তা নয়। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার একটি বিরাট অংশের ভূ-ভাগ বৃষ্টি, বায়ু ও হিমবাহ দ্বারা বাহিত মাটিতে তৈরি। সুতরাং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মতো মেদিনীপুরের নদ-নদীতেই যে তার প্রাণশক্তি নিহিত আছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গঙ্গা ও পদ্মাকে মেরুদণ্ড করে যে সব নদ-নদী বাংলাতে প্রবাহিত, বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের নানা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—উপনদী ও শাখানদী। পশ্চিমবঙ্গে উপনদীগুলি গঙ্গার শাখা ভাগীরথী—হুগলি নদীতে মিশেছে; এদের উৎস ছোটনাগপুর—সাঁওতাল পরগনার পার্বত্য উপত্যকায়। এই উপনদীগুলির মধ্যে অন্যতম মেদিনীপুরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত রূপনারায়ণ, কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা। মেদিনীপুরের এই প্রধান উপনদীগুলির আবার বহু শাখা-প্রশাখা আছে। আজকের সময়ে এই নদীগুলির সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয় আবশ্যক। কারণ এই নদীগুলিই প্রধানত বর্ষাকালে প্রচুর জল বহন করে, যদিও বছরের অন্যান্য সময়ে প্রায় শুষ্ক থাকে।

বেশ কয়েক দশক ধরে নদী উপত্যকা পরিকল্পনা অনুযায়ী নদীর জলশক্তির একটি অংশকে কার্যত বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত করে নদীকে বহুমুখী কল্যাণকার্যে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন নদীর শুষ্কতার সুযোগে তাদের প্রবাহের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জলবিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা যেমন সম্ভব, তেমনই নদীর নাব্যতা নিয়ন্ত্রিত করে স্থায়ী জলপথের সৃষ্টি করাও সম্ভব। প্রয়োজনে ওই জল সেচের কাজে ব্যবহারও করা যেতে পারে। কৃষিনির্ভর মেদিনীপুরের বহু মানুষ এই সেচের ওপর নির্ভরশীল। আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে মেদিনীপুরের নদ-নদীগুলি আরও কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। যেমন এই সমস্ত নদীগুলি উচ্চতর ভূমি থেকে প্রচুর পলি বহন করে এনে বিভিন্ন নিম্নভূমি গড়েছে। ভূ-তাত্ত্বিক মতে এই নবসৃষ্ট ভূমি (New alluvium) অত্যন্ত কোমল ও কমনীয়। নদীবাহিত এই উর্বর মাটি কৃষিতে এনেছে এক নতুন মাত্রা। তা ছাড়া স্থলপথের পাশাপাশি জলপথও আজকের দিনে পরিবহনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে—হলদি নদীর তীরে হলদিয়া বন্দর তো আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিচিত।

তবে এই নদ-নদীগুলি মেদিনীপুরবাসীর কাছে যেমন আশীর্বাদ, তেমনই অনেক সময় প্রকৃতির তাড়নায়, মানুষের অবহেলায় অভিশাপও হয়ে দাঁড়ায়। কিছু বৃহত্তর ও সামগ্রিক অবস্থার ভিত্তিতে জনজীবনে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নদ-নদীর গুরুত্বকে খাটো করে দেখা সম্ভব নয়—মেদিনীপুরবাসীর কাছে তো নয়ই। এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় সুন্দর ও যথার্থ একটি বক্তব্য রেখেছেন—"বাংলার শস্যসম্পদ একান্তই এখানকার নদীগুলোর দান। উচ্ছ্বলিত উচ্ছ্বসিত উদ্দাম বন্যায় মানুবের ঘরবাড়ি ভাঙিয়া যায়, মানুষ গৃহহীন, পশুহীন হয়, আবার এই বন্যাই তাহার মাঠে মাঠে সোনা ফলায় পলি ছড়াইয়া; এই পলিই সোনার
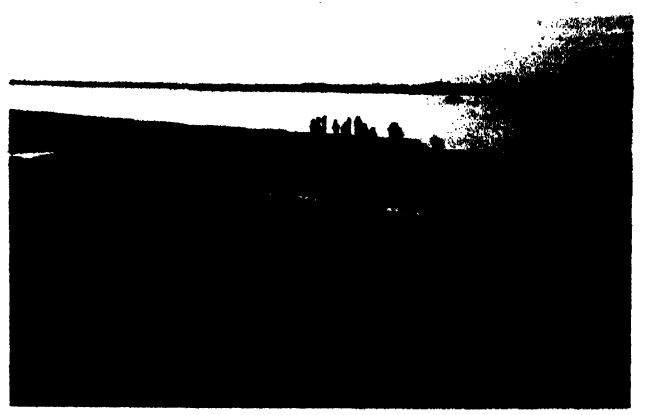
গেঁয়োখালি, হুগলি নদী

সারমাটি। বাঙালি তাই এই নদীগুলিকে ভয়-ভক্তি যেমন করিয়াছে; ভালও তেমনই বাসিয়াছে; রাক্ষসী কীর্তিনাশা বলিয়া গাল যেমন দিয়াছে, তেমনই ভালবাসিয়া নাম দিয়াছে—ইচ্ছামতী, ময়ূরাক্ষী, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, মধুমতী, কৌশিকী, অজয়, সুরমা, ত্রিস্রোতা, মহানন্দা, মেঘনা, লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) ইত্যাদি। বস্তুত বাংলার শুধু বাংলারই বা কেন, ভারতবর্ষের নদ-নদীগুলির নাম কী সুন্দর অর্থ ও ব্যঞ্জনাময়।"[১৫] তাই কেবল মেদিনীপুরবাসী নয়, একজন বাঙালি, এমনকী ভারতীয় হিসেবেও নদ-নদীকে সবসময় গুরুত্ব দিতে হবে—'নদী মোদের প্রাণ' মনে করে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

সূত্রচয়ন

১। বসু, যোগেশচন্দ্র—মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১৯৩৯, পৃ. ২৯
২। Bengal Administration Report (1872-73) P. 40
৩। Hunter, W.W.—A Statistical Account of Bengal, Vol-III, Delhi, 1973
৪। ভট্টাচার্য, তরুণদেব—পশ্চিমবঙ্গ দর্শন ও মেদিনীপুর, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ৮
৫। District Census Hand Book, Midnapore-1961; Ed, B. Roy, W.B.C.S (1968)
৬। Malley, O.L.S.S.—Bengal District Gazetteers (Midnapore), Govt. of West Bengal, Calcutta, P. 5
৭। Mitra, A. (I.C.S-1953)—District Hand Books, Midnapore
৮। রায়, নীহাররঞ্জন—বাংলার নদ-নদী, কলকাতা, বাং-১৩৫৪, পৃ ৮
৯। Malley, O.L.S.S—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, P. 9
১০। বসু, যোগেশচন্দ্র—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. ৩০-৩১
১১। Malley, O.L.S.S.—পূর্বোক্ত গ্রন্থ P. 10
১২। ওই P.11
১৩। ভট্টাচার্য, কপিল—বাংলাদেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা, কলকাতা, ১৯৫৯ ২য় সংস্করণ, পৃ. ১
১৪। ওই, পৃ. ২
১৫। রায়, নীহাররঞ্জন—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. ৬-৭

মানচিত্র-সূত্র: বাংলার নদ-নদী, নীহাররঞ্জন রায়।

লেখক: অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ
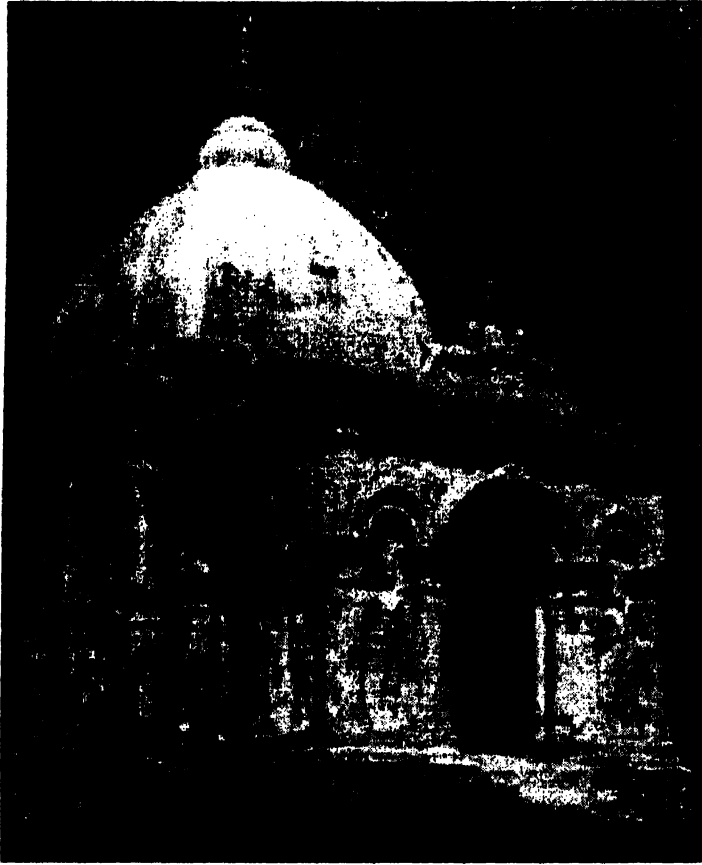
বাশুলি মন্দির, কুরুল
ছবি : তারাপদ সাঁতরা

ঝগড়েশ্বর শিবমন্দির, শ্রীরামপুর
ছবি : তারাপদ সাঁতরা
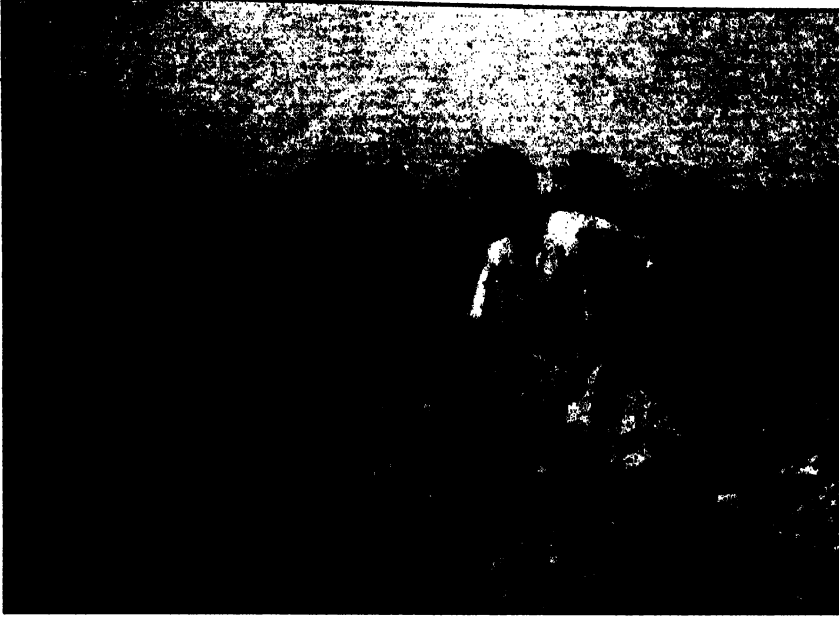
সেচের প্রধান উৎস মাটির ওপরের জল

মেদিনীপুর জেলায় সেচ ও নদীশাসন

ওমর আলি

সেচ ও নদীশাসনের বিবরটি একটি বহু ব্যাপক বিষয়। কিন্তু এখানে আমাদের আলোচ্য মেদিনীপুর জেলা, এই জেলার সেচ ও নদীশাসন ব্যবস্থা। সেচের প্রধান উৎস মাটির ওপরের প্রাপ্তজল। মাটির নীচে সঞ্চিত জল সেচের অপর উৎস। এখানে আমাদের আলোচ্য মাটির ওপরে প্রাপ্ত জলের সাহায্যে গড়ে ওঠা সেচ ব্যবস্থা। সেচের কাজও চলে দু'ভাবে, মাঠ ভাসিয়ে সেচ বা গ্র্যাভিটি ইরিগেশন (Gravity Irrigation) এবং পাম্পের সাহায্যে জল তুলে সেচ বা পাম্প ইরিগেশন অথবা লিফট ইরিগেশন (Pump or Lift Irrigation)। সেচের দুটি উৎসকে কাজে লাগিয়ে এবং দ্বিবিধ সেচ প্রণালি অনুসরণ করে আমাদের জেলার সেচ ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। জেলার সেচপ্রাপ্ত এলাকা শতকরা ৪১ ভাগ, যেখানে রাজ্যের গড় শতকরা ৫২ ভাগ এবং সর্বভারতীয় গড় শতকরা ৪৩ ভাগের কাছাকাছি।

শুধু রাজ্যের নয়, সারা দেশের বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুর। এই জেলা বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তীও বটে। আয়তন ১৪,০৮১ বর্গ কিলোমিটার। বর্তমান জনসংখ্যা ৯০ লক্ষের মত। চাষ যোগ্য জমির পরিমাণ ৮৬৮৭২১ হেক্টর। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ১৬০০ মিমি। ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য নানা বৈচিত্র্যে ভরা এই জেলা। উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাংশ ছোটনাগপুর মালভূমির প্রলম্বিত অংশের জন্য অসমতল এবং কাঁকুরে মাটির দ্বারা গঠিত। জেলার পূর্বাংশ গঙ্গা ও তার

নিকাশি খাল এখন সেচ খাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে

দক্ষিণাংশ জোয়ার-ভাটা খেলা সমুদ্রতীরবর্তী এলাকা। বাঁকুড়া-রাণীগঞ্জ সড়ক এই জেলাকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। সড়কের পূর্বাংশ পলিমাটি গঠিত, সুতরাং সমতল, উর্বর ও কৃষি সমৃদ্ধ। পশ্চিমাংশ উঁচু নীচু ঢেউখেলানো, কাঁকুরে মাটির আধিক্য, সুতরাং অনেকাংশে অনুর্বর। পূর্বাংশে সেচের সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি, পশ্চিমাংশে অনেক কম। এই অংশ বন্যা প্রবণও বটে। এই অংশে আছে বিশাল গামলার মত আকৃতির নীচু এলাকা, আছে দুবদা ঝিল, বারচৌকা বিল এবং ময়না বেসিনের মত এলাকা।

●

বাঁকুড়া-রাণীগঞ্জ সড়ক এই জেলাকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। সড়কের পূর্বাংশ পলিমাটি গঠিত, সুতরাং সমতল, উর্বর ও কৃষি সমৃদ্ধ। পশ্চিমাংশ উঁচু নীচু ঢেউখেলানো, কাঁকুরে মাটির আধিক্য, সুতরাং অনেকাংশে অনুর্বর। পূর্বাংশে সেচের সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি, পশ্চিমাংশে অনেক কম। এই অংশ বন্যা প্রবণও বটে।

●

জেলায় বেশ কিছু সেচ খাল আছে। তার মধ্যে মেদিনীপুর মেন ক্যানেলই প্রধান। এই খাল বহু পুরানো। জেলার দক্ষিণ পূর্বাংশ এর আওতাভুক্ত। কংসাবতী জলাধার প্রকল্পের পর আরও কয়েকটি খাল কাটা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান হল লেফট ব্যাংক ও রাইট ব্যাংক ক্যানেল। এরদ্বারা উপকৃত জেলার উত্তর পশ্চিমাংশ। বামফ্রন্ট শাসন কালে পঞ্চায়েতের উদ্যোগে অনেকগুলি খাল কাটা হয়েছে, নির্মিত হয়েছে ২৬৪সারফেস ফ্লো ইরিগেশন প্রকল্প। মেদিনীপুর মেন ক্যানেল সহ বড় বড় বেশির ভাগ খালই কংসাবতী নদীর জলে পরিপুষ্ট। খালের জলে সরাসরি সেচ প্রাপ্ত জমির পরিমাণ ১৩৬৪৪৫ হেক্টর।

সেচের এলাকা বাড়ানোর চাহিদায় নিকাশি খালগুলিকেও এখন সেচ খাল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে দেখা দিচ্ছে নতুন কিছু সমস্যা। একটা সময় ছিল যখন প্রধান প্রধান সব নদীতে সারা বছর জলের প্রবাহ বজায় থাকত। তখন কিন্তু খরিফ মরশুমের চাষই ছিল প্রধান। রবিচাষ হত কম এবং বোরো চাষ সীমাবদ্ধ ছিল ঘাটাল মহকুমার সামান্য কিছু এলাকায়। এখন রবি ও বোরো চাষের রমরমা। উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ, রাসায়নিক সার ও কৃষিপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং সর্বোপরি সেচের সুযোগ বৃদ্ধির ফলে এটা হয়েছে। জনসংখ্যা বেড়েছে, বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্য-শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়েছে।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রাথমিক শর্ত হল সেচ। সেচের প্রধান উৎস নদীর জল। মেদিনীপুর জেলার বুক চিরে প্রবাহিত নদ-নদীর সংখ্যাও কম নয়। এর মধ্যে প্রধান হলো হুগলি,

পাম্পের সাহায্যে জল তুলে সেচের কাজ চলছে

রূপনারায়ণ, হলদি, রসুলপুর। এর সবগুলিই উপনদী সমৃদ্ধ। জেলার আর একটি প্রধান নদী সুবর্ণরেখা, যা বিহারের মানভূম থেকে এসে ওড়িশার বালেশ্বরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করেছে এবং সরাসরি বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। হুগলির একটি উপনদী রূপনারায়ণ। রূপনারায়ণের প্রধান উপনদী শিলাবতী। শিলাবতী সমৃদ্ধ হয় চন্দুর, কুবাই এবং বুড়ি নদীর দ্বারা। শিলাবতীর অন্য উপনদীগুলি কেঠিয়া, পারাং, তমাল প্রভৃতি। হুগলির আর এক প্রধান উপনদী হলদি। হলদির প্রধান উপনদী কাঁসাই বা কংসাবতী। মেদিনীপুরের ২০ কিলো মিটার নীচে কংসাবতী বিভক্ত হয়েছে দুটি ভাগে। একটি ভাগ (পুরাতন কাঁসাই) দাসপুর হয়ে মিশেছে রূপনারায়ণে। হলদির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপনদী কেলেঘাই। কেলেঘাই এর উপনদী চাড়িয়া, কপালেশ্বরী এবং বাঘাই। হুগলির শেষ উপনদী রসুলপুর। ইটাবেড়িয়া, মুগবেড়িয়া, সরপাই ও কেলেঘাই খালের জলে রসুলপুর পরিপুষ্ট। প্রধানত এই সব নদ-নদী এবং খাল-নালার সাহায্যেই গড়ে উঠেছে মেদিনীপুর জেলার সেচ ব্যবস্থা।

সেচের প্রধান উৎস যেমন নদী তেমনি বন্যার প্রধান উৎসও সেই নদীই। তবে সব নদী বন্যাপ্রবণ নয়, এটাই বাঁচোয়া। মেদিনীপুর জেলার বন্যাপ্রবণ নদীগুলি হল শিলাবতী, দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী, রূপনারায়ণ, সুবর্ণরেখা, কেলেঘাই ও কপালেশ্বরী। বন্যাপ্রবণ এলাকা ঘাটাল, দাসপুর, কেশপুর, ময়না, পাঁশকুড়া, সবং, পিংলা, ভগবানপুর, পটাশপুর, নন্দীগ্রাম, কাঁথি, তমলুক, খড়্গপুর, ডেবরা প্রভৃতি অঞ্চল।

সেচের প্রয়োজনে নদীশাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। নদীশাসন হল রিভার ট্রেনিং, নদীর গতি-প্রকৃতি বুঝে মানব কল্যাণে তাকে কাজে লাগানো। অন্যথায় নদী বিগড়ে যেতে পারে। তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি। পাহাড়ি নদী ও সমতলের নদীর চরিত্র এক নয়। তেমনি এক নয় বরফ গলা জলে পরিপুষ্ট নদী এবং বৃষ্টির জলে পরিপুষ্ট নদীর চরিত্র। জোয়ার-ভাটা খেলে এমন নদীর সঙ্গে জোয়ার-ভাটা খেলে না এমন নদীর পার্থক্যও বিচার্য। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প এবং দামোদর উপত্যকা প্রকল্প এক নয়। তিস্তায় যা খাটে, দামোদরে তা খাটে না। একটা উপকারি অন্যটা ক্ষতিকর।
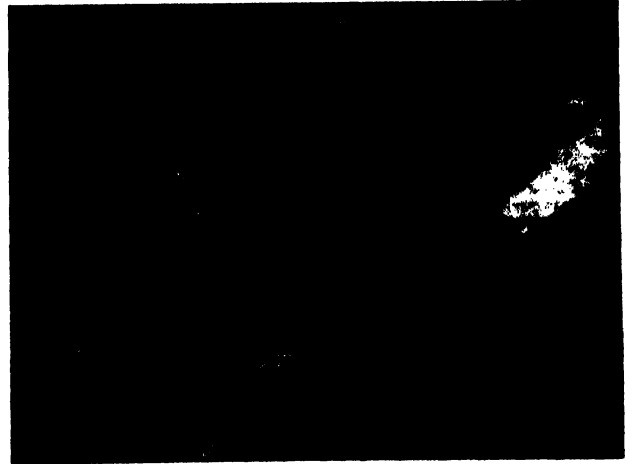
রাজ্যে বাদাম চাষ বাড়ছে। বাদাম তুলতে ব্যস্ত জনৈক কৃষক।
ছবি : দিলীপ ভৌমিক

উচ্চ উপত্যকায় বাঁধ বেঁধে এবং অন্য ক্ষেত্রে নদী-নালায় আড়ি বাঁধ দিয়ে সেচের প্রসার ঘটানো এক প্রাচীন পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে দেশের ও রাজ্যের বহু স্থানে। মেদিনীপুর জেলাও এর ব্যতিক্রম নয়। শুধু বৃষ্টির ওপর নির্ভর না করে

রূপনারায়ণ, কোলাঘাট   সেচের প্রয়োজনে নদী শাসনব্যবস্থা জরুরি

বিকল্প উপায়ে সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই প্রয়োজন। কংসাবতী জলাধার প্রকল্পের মাধ্যমে ৮ লক্ষ একর জমিতে সেচ সম্ভাবনা তৈরি করা গেছে। মেদিনীপুর জেলার ক্ষেত্রে এর অবদান অনস্বীকার্য। কংসাবতী আধুনিকীকরণ প্রকল্প এবং সুবর্ণরেখা জলাধার প্রকল্প কার্যকরী হলে জেলার সেচপ্রাপ্ত এলাকা আরও বাড়বে।

স্থায়ি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের সঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও জরুরি। তা না হলে লাভের গুড় পিঁপড়েতে খেয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। ইদানীং কালে আমাদের দেশে নদ-নদী পরিকল্পনা ও সেচ ব্যবস্থা একটা অভিনব গুরুত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ভ্রান্ত নদ-নদী পরিকল্পনা দেশের প্রভূত

●

আমাদের দেশের অনেক নদী পরিকল্পনাই সঠিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আপাত লাভের জন্য বহুমুখী নদী পরিকল্পনা তাই নানাবিধ সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। নদী পরিকল্পনার সঙ্গে সঠিক নদীশাসন পদ্ধতি অনুসৃত না হওয়ার ফলে অনেক নদীই মজে যাচ্ছে এবং নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে দ্রুত গতিতে। এরই ফলশ্রুতিতে দেখা দিচ্ছে ভয়াবহ বন্যা ও প্লাবন।

●

ক্ষতি সাধনও করতে পারে। সেচ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে যদি সুষ্ঠু জল নিকাশি ব্যবস্থা না থাকে এবং নদীর জল প্রবাহ সেচের কাজে ব্যবহারের পর যদি নদীশাসন পদ্ধতিতে তার জল নিকাশি ক্ষমতা পর্যাপ্ত ভাবে বজায় রাখা না হয় তাহলে উপকারের চাইতে অপকারই বেশি হবে। আমরা প্রায় প্রতি বছর এটা টের পাচ্ছি।

অপর দিকে সব কিছু ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করতে গেলে একটা জেলার মধ্যে তা সীমাবদ্ধ রাখা যায় না, ভাবতে হয় একটা রাজ্য এবং দেশের প্রেক্ষাপটে। নদ-নদীর উৎপত্তিস্থল কোনও এক রাজ্যে হলেও তা প্রবাহিত হয় অন্য রাজ্যে এবং কখনও কখনও অন্যদেশেও। সুতরাং প্রয়োজন হয় জাতীয় নীতির এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সহযোগিতার। নদীশাসন ব্যবস্থার বিপুল ব্যয় ভার বহন করাও অনেক সময় একটা রাজ্যের সাধ্যে কুলায় না। সেখানে কেন্দ্রীয় স্তরে তার ব্যবস্থা করতে হয়। এর সব কিছুতেই আছে ঘাটতি। তাই সমস্যা বেড়েই চলে, সমাধান হয় না।

আমাদের দেশের অনেক নদী পরিকল্পনাই সঠিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আপাত লাভের জন্য বহুমুখী নদী পরিকল্পনা তাই নানাবিধ সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। নদী পরিকল্পনার সঙ্গে সঠিক নদীশাসন পদ্ধতি অনুসৃত না হওয়ার ফলে অনেক নদীই মজে যাচ্ছে এবং নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে দ্রুত গতিতে। এরই ফলশ্রুতিতে দেখা দিচ্ছে ভয়াবহ বন্যা ও প্লাবন। লাভের গুড় পিঁপড়েতে খেয়ে-যাচ্ছে এই ভাবে। আর দেরি না করে এইদিকে আমাদের নজর দেওয়া প্রয়োজন।

লেখক : প্রাক্তন মন্ত্রী, জলসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ

দীঘায় চিংড়িমাছ গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করছে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু পাশে মৎস্যমন্ত্রী কিরণময় নন্দ

মেদিনীপুর জেলার মৎস্য সম্পদ—এক উজ্জ্বল অধ্যায়

বিমল রায়

ভারতীয় সংবিধানের ৪৮ নং ধারা বলছে—"The state shall endeavour to organise agriculture, animal husbandry on scientific lines and shall, in particular take steps for preserving and improving the breeds." কৃষি, প্রাণী সম্পদ তথা মৎস্য সম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে এবং গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে বিষয়টি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

জলসম্পদের ক্ষেত্রে মৎস্যচাষের বিশেষ গুরুত্ব অনুভূত হয় এই কারণে যে মৎস্য চাষ প্রথম শ্রেণীর সহজপাচ্য প্রোটিন খাদ্যের ক্ষেত্রে, গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রয়োজনে, কর্মবিনিয়োগের ক্ষেত্রে এবং প্রতি একক এলাকায় অল্প সময়ে অধিক লাভ এনে দেবার একটি বলিষ্ঠ ধারাকে বহন করার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। আজ একটা বিষয় আমাদের অনুধাবন করার প্রয়োজন যে প্রতি ইউনিট এলাকায় প্রোটিনের উৎপাদন কৃষি বা প্রাণী সম্পদের অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা জলজ সম্পদের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাবে বেশি। সুতরাং দেশের প্রোটিন খাদ্যের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জলসম্পদের উৎপাদনের প্রশ্নে বেশি গুরুত্ব দেওয়া একান্ত জরুরি।

ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুর। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ভরা জেলার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ছোট- ছোট ডুংরিং পাহাড়—শাল মহুলের সমারোহে বিস্তৃত বনভূমি—লাল কাঁকুরে উত্তল ভূমির বিস্তার—ডুলুং-পারাং ছোট

রূপোলী মাছের পসরা

ছোট নদীর গতিপথ, পূর্বে কাঁসাই-শিলাবতী-রূপনারায়ণ-হলদি নদীর পললমৃত্তিকা গঠিত উপকূল ভূমি, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের বিস্তৃত তটরেখা, নিম্নগতি সুবর্ণরেখা-কেলেঘাই-রূপনারায়ণের সাগর সঙ্গম। মোহনার বুকে সঞ্চিত পলল নিয়ে গড়ে ওঠা ছোট ছোট দ্বীপমালা, ঢেউয়ের তালে ভেসে আসা রূপালি ফসল—মাছেদের অসংখ্য মিছিল—এ এক সম্ভাবনাময়. প্রাকৃতিক নষ্টালজিয়া।

পরিসংখ্যানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় জেলায় চাষযোগ্য মিষ্টি জলের পরিমান ৩৭,১৯৯ হেক্টর। ৩০০০ হেঃ চাষযোগ্য লোনাজল এলাকা, ৬৪ কিঃমিঃ সুদীর্ঘ সামুদ্রিক তটরেখা, ২১,৯৪৪ হেঃ খাল, বিল, নদীর আয়তন মৎস্যচাষ ও মৎস্য উৎপাদনের এক বলিষ্ঠ জলসম্ভার যা জেলার প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষের প্রোটিন খাদ্য জোগানের এক উজ্জ্বল দিক্‌দর্শন—যা প্রায় ১ লক্ষ মৎস্যজীবীর জীবনজীবিকার এক কর্মময় মাধ্যম রচনা করেছে। পাশাপাশি বিপণন, সংরক্ষণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ জেলায় মাছ চাষের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য বাতাবরণের সৃষ্টি করেছে।

জেলায় মাছের চাহিদা ৭৮,৩০০ মেঃ টন। উৎপাদনের ধারাবাহিকতায় ৯৯-২০০০ সালে মিষ্টিজলের উৎপাদন ৪১,৩৪২ মেঃ টন, লোনাজলে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন ২৯৬০ মেঃ টন, সমুদ্র থেকে আহৃত ৫০,৮৩৪ মেঃ টন খাদ্যোপযোগী এবং ৩২,০০০ মেঃ টন অন্যান্য কাজে ব্যবহার উপযোগী মাছের উৎপাদন হয়েছে। ডিমপোনা-চারাপোনা উৎপাদনে জেলা স্ব-নির্ভরতা অর্জন করেছে। উৎপাদনের মাত্রা ১৫৮.৫ কোটি—যা লক্ষ্যমাত্রাকে স্বাভাবিক ভাবেই অতিক্রম করেছে। আগামি দিনে উৎপাদনের মাত্রাকে আরও বৃদ্ধি করার তাগিদে এবং জেলায় ফিসারিকে পুরোপুরি ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উৎপাদন ও পরিকাঠামো উন্নয়নের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা আগামি দিনের পথনির্দেশনায় যুক্ত করেছে এক বলিষ্ঠ প্রত্যয়। এক ইতিবাচক বাতাবরণ।

জনমুখী প্রকল্পসমূহ

রাজ্যের মৎস্যদপ্তর পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের দিকেই দৃষ্টি দিয়েছে তা নয়, মানব সম্পদকেও যাতে যথার্থভাবে কাজে লাগানো যায় সেদিকেও অত্যন্ত তৎপর। মানুষের কর্মদক্ষতা, এগিয়ে আসার প্রবৃত্তি, অংশগ্রহণের প্রয়াস এবং অন্তর্নিহিত গুণাবলীকে বিকাশ সাধনের মধ্য দিয়ে বিকেন্দ্রীভূত জনমুখী পরিকল্পনা যাতে যথার্থ রূপ পায়, দপ্তর সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছে।

সামাজিক মৎস্যচাষ প্রকল্প : সামাজিক মৎস্যচাষের উদ্দেশ্য হল কোনও সংস্থা, মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী, সমবায় সমিতি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির অধিকারে থাকা জলাশয়ের উন্নতিসাধন। পাশাপাশি কর্মসংস্থান, আয়বৃদ্ধি, প্রযুক্তি-জ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটানো ও উৎপাদন বৃদ্ধি। জেলায় এই প্রকল্পে মৎস্যচাষী ও যুব সমাজকে উদ্যোগী করে তোলা হচ্ছে। ৯৯-২০০০ সালে এই প্রকল্পে ১০,৯৬,৭৫৬ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উৎপাদনের কাজ চলছে।

মিনিকিট বিতরণ : জেলার গ্রামে গঞ্জে যে সকল মৎস্যচাষী দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করেন এবং মূলধনের অভাবে মাছচাষ করতে অক্ষম, তাদের জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের জন্য প্রতিবছর বিনামূল্যে মিনিকিট বিতরণ করা হয়ে থাকে।

প্রণোদিত প্রজনন ও হ্যাচারিতে মৎস্যবীজ উৎপাদন : উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার একটি বাস্তবসম্মত প্রয়োগ হল প্রণোদিত প্রজনন ও হ্যাচারিতে মৎস্যবীজ উৎপাদন। গতানুগতিক পদ্ধতির বাইরে হ্যাচারির ব্যবহার জেলার মৎস্যবীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রগতিশীল উৎসাহী মৎস্যচাষীবৃন্দ, মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী, সমবায় সমিতিগুলি এগিয়ে এসেছেন এবং মৎস্যবীজ উৎপাদনের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এই জেলায়।

সুসংহত মৎস্যচাষ প্রকল্প : দরিদ্র মৎস্যজীবীদের জীবন জীবিকার মানোন্নয়নের স্বার্থে জেলায় সুসংহত মৎস্যচাষ প্রকল্প রূপায়িত হয়ে চলেছে। উদ্দেশ্য মাছচাষের সঙ্গে হাঁস ও শুকরের চাষ। এর মাধ্যমে মৎস্যচাষীরা অধিক উৎপাদন ও আর্থিক দিক থেকে বেশি লাভবান হতে পারবেন। ৯৯-২০০০ সালে এই প্রকল্পে ৩,৭২,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং প্রকল্পগুলি রূপায়িত হয়ে চলেছে সার্থকভাবে।

প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন : হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দান ও উৎপাদনের লক্ষ্যে পোনা মাছ ও মাগুর মাছের প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জেলায়। বিভিন্ন সার প্রয়োগের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক মাছচাষের প্রক্রিয়াগুলি অন্যান্য মাছচাষীদের মধ্যেও যাতে বিস্তার লাভ করে সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পে ৯৯-২০০০ সালে ১,৬৯,৮২৯ টাকা

বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রকল্পগুলি রূপায়িত হয়ে চলেছে।

মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী-গঠন : মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী হল মৎস্যচাষীদের এক সম্মিলিত সংস্থা—যার সদস্যসংখ্যা ৮ থেকে ২০-র মধ্যে। উদ্দেশ্য হল প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় গৃহীত জলাশয়গুলিতে অধিক মৎস্য উৎপাদন করা, স্বনির্ভর হওয়া এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মাছচাষীদের মাছচাষে উৎসাহিত করা ও মাছচাষে সার্বিক সহযোগিতা করা। মেদিনীপুর জেলায় ২১০টি মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে, যার সদস্যসংখ্যা ২৪৮০ জন মৎস্যচাষী। উৎপাদক গোষ্ঠীগুলি উৎপাদন, প্রজনন, রোগ নিবারণ ইত্যাদি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে।

কাঁথিতে মৎস্যজীবীদের "সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্প" অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মৎস্যমন্ত্রী কিরণময় নন্দ

মৎস্যজীবী সমিতি : জলসম্ভারের সার্বিক উন্নতি, মৎস্যজীবীদের জীবনজীবিকার প্রয়োজনে, প্রোটিন খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদির তাগিদে জেলায় জেলায় সমিতিসমূহ গঠিত হয়েছে। সমবায় সমিতিগুলির পরিচালনা, বিকল্প রূপায়ণ, উৎপাদন, আর্থিক সঙ্গতিবৃদ্ধি, কারিগরি সহযোগিতা, নবীকরণ, রেজিস্ট্রেশন, নতুন সমিতি স্থাপন, আইনগত সাহায্য, জলাশয়-গুলির উন্নতি সাধন, অধিগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে দপ্তর পরামর্শ ও সহযোগিতা করে চলেছে। সমবায় ও বিজ্ঞানভিত্তিক মাছচাষ সম্পর্কে সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। জেলায় ৩টি কেন্দ্রিয়, ৭০টি মিষ্টিজলের এবং ৬৬টি সামুদ্রিক প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমিতি কাজ করে চলেছে।

উপজাতি মৎস্যজীবী কল্যাণ প্রকল্প : মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাঞ্চল উপজাতি-অধ্যুষিত। উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত পশ্চাদপদ শ্রেণীর মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটানোর প্রয়াসে নানারূপ কল্যাণকর প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন পুষ্করিণীতে মাছচাষ, মাছচাষ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, জাল ও সরঞ্জাম সরবরাহ, মিনিকিট বিতরণ, মাছ চাষের সঙ্গে শুকর ও হাঁস পালনের সুসংহত প্রকল্প, পুষ্করিণী সংস্কার ইত্যাদি। এ ছাড়া আবাসগৃহ নির্মাণ, কূপখনন, নলকূপ স্থাপন, মৎস্যজীবী গ্রামে মোরাম রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রম রূপায়িত হয়ে চলেছে। ৯৯-২০০০ সালে উপজাতি কল্যাণ প্রকল্পে ১৪.৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা : উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ বা পতিত জলাশয়গুলির সংস্কার সাধনের প্রধান অন্তরায় অর্থাভাব। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে মেদিনীপুর মৎস্যচাষী উন্নয়নসংস্থা বিভিন্ন বাস্তবমুখী প্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে মৎস্যচাষ উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে জেলায় উন্নত প্রথায় মৎস্যচাষ, জলাশয় সংস্কার, মৌখিক ইজারার মাধ্যমে গৃহীত পুষ্করিণীগুলিতে মাছচাষ, মৎস্যচাষীদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি রূপায়ণ করে চলেছে। এ পর্যন্ত জেলায় ১৪,৬০৭ হেঃ জলাশয়কে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

কল্যাণকর প্রকল্পসমূহ

জেলায় মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে মিষ্টিজল, লোনাজল ও সামুদ্রিক এলাকায় বিভিন্ন কল্যাণকর প্রকল্প রূপায়িত হয়ে চলেছে।

দুর্ঘটনাজনিত গোষ্ঠী-বীমা প্রকল্প : মৎস্য উৎপাদনে রত থাকাকালীন জীবনহানি ঘটলে বা সম্পূর্ণ অক্ষম হলে মৎস্যজীবী ও তার পরিবারের অর্থনৈতিক সুরক্ষার স্বার্থে এই প্রকল্পটি ১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে রূপায়িত হয়ে চলেছে। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণে ৩৫,০০০ টাকা এ ছাড়া মৎস্যজীবীদের স্বার্থে বাৎসরিক বিমার প্রিমিয়াম ১২ টাকা হারে সরকার থেকে বহন করা হয়ে থাকে।

মৎস্যজীবীদের পরিচয়পত্র প্রদান : প্রকৃত মৎস্যজীবীদের চিহ্নিতকরণের প্রশ্নে এবং বিভিন্ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ ও কর্মপরিচালনার লক্ষ্যে জেলার সমস্ত পঞ্চায়েত এলাকা, লোনা জল এলাকা ও সামুদ্রিক এলাকাগুলিতে ১৯৯১-৯২ আর্থিক বছর থেকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়ে চলেছে। এ পর্যন্ত জেলায় প্রায় ৭৫০০ জন মৎস্যজীবীকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে
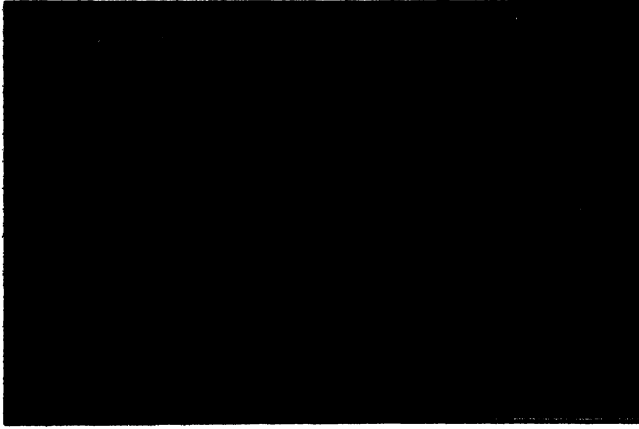
জুনপুট ফিস টেকনোলজিক্যাল স্টেশন-এর অফিস পরিদর্শন করছেন মৎস্যমন্ত্রী

এবং আগামী বছরগুলিতেও পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

আর্থিক সাহায্য প্রকল্প : সমুদ্রগামী মৎস্যজীবীদের অর্থনৈতিক সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে জেলায়। এই প্রকল্পে মাসিক ৪৫ টাকা হারে ৮ মাসে মোট ৩৬০ টাকা জমা দিলে মৎস্যজীবীদের ৪ মাস কর্মহীন সময়কালে পশ্চিমবঙ্গ সামুদ্রিক মৎস্য শিকার আইন ১৯৯৩, ১৯৯৫ এবং সংশোধনী আইন ১৯৯৮ বলে প্রতিমাসে ২৭০ টাকা হিসাবে অর্থ ফেরত পেয়ে থাকেন। মেদিনীপুর জেলায় এই প্রকল্পে ইতিমধ্যে ৩৪০০ জন সমুদ্রগামী মৎস্যজীবী উপকৃত হয়েছেন।

মৎস্যজীবীদের বার্ধক্য ভাতা : আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পশ্চাদপদ অধিকাংশ মৎস্যজীবী দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন। বৃদ্ধ, অক্ষম মৎস্যজীবীদের আর্থিক দুরবস্থায় কথা বিবেচনা করে ১৯৯০-৯১ সাল থেকে জেলায় বার্ধক্যভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২০০ জন মৎস্যজীবীকে প্রতিমাসে এই ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

গৃহনির্মাণ প্রকল্প : ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে জেলায় গৃহনির্মাণ প্রকল্প শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ইন্দিরা আবাস যোজনা প্রকল্পে আবাসগৃহ নির্মাণ করে গৃহহীন মৎস্যজীবী পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বর্তমান পর্যায়ে মৎস্যজীবীদের জন্য জাতীয় কল্যাণ তহবিলের মাধ্যমে আদর্শ গ্রাম নির্মাণ প্রকল্প শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত জেলায় ৫টি আদর্শ মৎস্যজীবী গ্রাম গড়ে তোলা হয়েছে যার মাধ্যমে ২০০টি দরিদ্র মৎস্যজীবী পরিবার নিজগৃহে স্থায়ীভাবে বাস করার অধিকার পেয়েছেন।

মৎস্যচাষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম : মেদিনীপুর জেলা মৎস্যদপ্তর সচেতনতা, উৎপাদনবৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষ ও মৎস্যবিষয়ক প্রশিক্ষণের সুযোগ উন্মুক্ত করেছে। তৃণমূল, জেলাস্তর ও রাজ্যস্তরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা যেমন আছে, পাশাপাশি মিষ্টিজল, লোনাজল ও সামুদ্রিক মৎস্যচাষ এবং মৎস্য শিকার সংক্রান্ত কার্যক্রম পৃথকভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যম হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে জেলায় তৃণমূল পর্যায়ে ১৮৮০ জন, জেলা পর্যায়ে ১২০ জন এবং রাজ্যস্তরে ২৫ জন মৎস্যচাষীকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে মিষ্টিজলে মাছচাষকে ভিত্তি করে। জেলায় নোনাজলে মাছচাষ প্রশিক্ষণের পৃথক ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলার চাহিদা ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে চিংড়ি চাষ প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জেলায় সামুদ্রিক মৎস্য সংক্রান্ত বিষয়েও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নৌকা তৈরি, জাল তৈরি, সমুদ্রগামী নৌকায় ইঞ্জিন সংক্রান্ত বিষয়েও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া মুক্তোচাষ প্রশিক্ষণ, মহিলাদের জালবুনন ইত্যাদি বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণগুলি পরিচালনার জন্য কাজলাগড়, কাঁথি, জুনপুট, বামনগরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। শিক্ষা ও সচেতনতার ক্ষেত্রে জেলায় এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এক বিশেষ মাত্রা সংযোজন করেছে।

নোনাজলে মৎস্য চাষ প্রকল্প

দেশের সর্ববৃহৎ চাষযোগ্য লোনাজল এলাকা পশ্চিমবঙ্গে। এর একটা বড় অংশ মেদিনীপুর জেলায়। নোনাজল এলাকায় জলজ সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলায় "নোনাজল মৎস্যচাষ উন্নয়ন সংস্থা" গঠিত হয়েছে। বাগদার একক ও মিশ্রচাষ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগে পরিচালিত হয়ে চলেছে ব্যাপকভাবে ভারতের মৎস্যচাষ উন্নয়ন নিগমের নির্দেশাবলী মেনেই। স্বল্প নোনাজল এলাকায় গলদার চাষও জেলার সরকারি

হলদিয়ার কাছে মীনদ্বীপ পরিদর্শন করছে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু
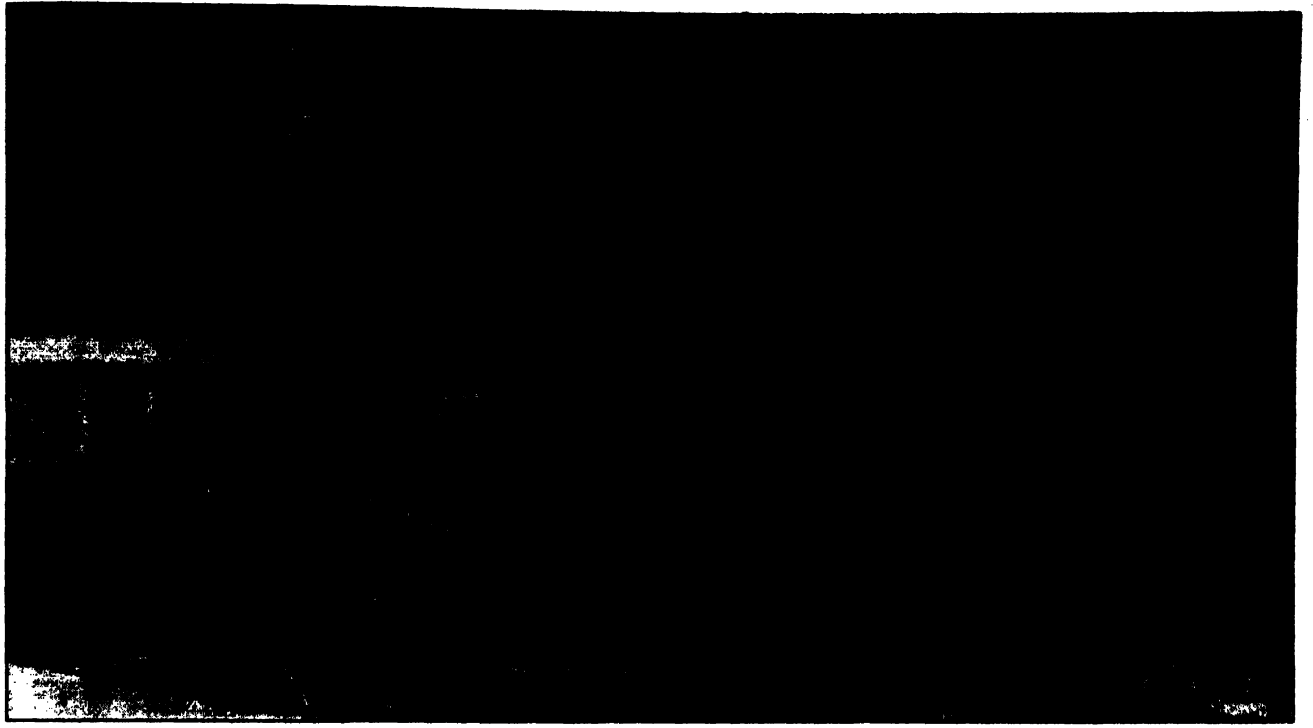
জেলার একমাত্র মৎস্য বন্দর শংকরপুর

খামার ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর পুরোপুরি নির্ভর না করে উন্নতমানের চিংড়ি বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে জেলায় দীঘাতে গলদার বীজ উৎপাদনের জন্য একটি উর্চ্চমানের হ্যাচারি তৈরি করা হয়েছে। এখানে বীজ উৎপাদন হয়ে চলেছে সন্তোষজনকভাবে। জেলায় নোনাজলে মাছচাষের জন্য মৎস্যচাষীদের বিভিন্ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ করানো হয়েছে এবং নোনাজলে মাছচাষ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মীনদ্বীপ : জেলায় চিংড়ি উৎপাদনের নিরিখে 'মীনদ্বীপ' এক বলিষ্ঠ অধ্যায়। প্রায় ২৫০ হেঃ এলাকায় সমবায়ভিত্তিক চিংড়িচাষের লক্ষ্যে উন্নয়ন করা হয়েছে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগমের আর্থিক সহায়তায়। আরও বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য আছে। প্রকল্পটি পুরোপুরি সমাপ্ত হলে এটিই দেশের সবথেকে বৃহৎ চিংড়ি উৎপাদন খামার হিসেবে পরিগণিত হবে।

বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় চিংড়ি প্রকল্প : মেদিনীপুর জেলার দীঘা ও দাদনপাত্রবাড়ে চিংড়ির অধিক উৎপাদন লক্ষ্যে ২৮৭ হেঃ জলাশয়ের উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায়। লক্ষ্যমাত্রা হেঃ প্রতি ২ মেঃ টন। উৎপাদন চলছে। পুনরায় জলাশয় খনন ও সংস্কার, হ্যাচারি স্থাপন, বরফকল তৈরি ইত্যাদি উন্নয়নের কাজ চলছে। প্রকল্পটি সার্বিকভাবে সমাপ্ত হলে চিংড়ি উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ আরও সুগম হয়ে উঠবে। মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটি একটি সফলতম প্রয়াস।

সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন ও পরিকাঠামো উন্নয়ন

মেদিনীপুর জেলার ৬৪ কিমি তটরেখা বরাবর সামুদ্রিক এলাকা মৎস্য শিকারের দিক থেকে অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। নদীগুলির বিস্তীর্ণ তটভূমি বিধৌত খনিজ লবন ও জৈব-অজৈব উপাদান মিশ্রিত পলি মোহনার গতিপথ দিয়ে সমুদ্র বিধৌত হয়। স্বভাবতই ওই এলাকার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীকণার আধিক্য দেখা যায় এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই ওই এলাকায় বিভিন্ন প্রকার মাছের অবস্থানও বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘদিন জেলার সামুদ্রিক মৎস্যজীবীরা সাধারণ মানের নৌকা ও জালের ওপর নির্ভর করে, জীবন বিপন্ন করে মৎস্য শিকারে ব্যাপৃত থাকতেন। বর্তমানে উন্নতমানের আধুনিক যন্ত্রচালিত নৌকা, জাল ও অন্যান্য পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস্য শিকারে স্বাভাবিকতা এসেছে এবং বিপণন ব্যবস্থা গতিশীল হয়েছে। ফলত মৎস্যজীবীদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

মৎস্য বন্দর : জেলার একমাত্র মৎস্য বন্দর শংকরপুর। বিভিন্ন পরিকাঠামো সমন্বিত বন্দরটিতে উৎপাদন, বিপণন, সংরক্ষণ, ও ইঞ্জিনচালিত সমুদ্রগামী নৌকা এবং ট্রলারগুলির আগমন ও নিষ্ক্রমণের ফলস্বরূপ এক গতিশীল উৎপাদনমুখী বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। বন্দরটিতে ১৫০টি জলযান থাকার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মৎস্য শিকারের প্রয়োজনে প্রায় ৫০০টির মতো যন্ত্রচালিত নৌকার ভার বহন করতে হচ্ছে। বন্দরের এই চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে পুনরায় ২৫০টি জলযান চলাচলের উপযোগী বন্দরের ২য় পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে। ফলত ইতিমধ্যেই উৎপাদন, বিপণন ও কর্মবিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফিস টেকনোলজি স্টেশনের সরকারি বাংলো, জুনপুট

ওয়ার্কশপ - গ্রুপমিটিং- প্রদর্শনী-পুস্তক প্রণয়ন

মৎস্যচাষীদের মধ্যে মাছচাষে সচেতনতা বৃদ্ধি, গ্রুপগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন, সমবায়সমিতিগুলির মধ্যে পরস্পর টেকনিক্যাল সহযোগিতা এবং ঈশ্বরচন্দ্র জনচেতনা কেন্দ্র তথা গ্রাম সংসদগুলির মধ্যে কারিগরি আলোচনা এবং মত বিনিময়ের জন্যে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, গ্রুপ মিটিং করা হয়ে থাকে পর্যায়ক্রমে। এ ছাড়া মৎস্যদপ্তর জেলার বিভিন্ন প্রদর্শনী ও আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করে থাকে। জেলাস্তর রাজ্যস্তর থেকে প্রকাশিত রোগ নিরাময়, মিশ্রচাষ, কৃত্রিম প্রজনন, মৎস্য শিকার আইন, মাটি ও জল সম্পর্কিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, পুস্তিকা প্রচার ও প্রয়োগের প্রয়োজনে বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া জেলার পরীক্ষাগারে জল-মাটি ইত্যাদি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে পরীক্ষাগার স্থাপনের মাধ্যমে। জেলাস্তর ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি থেকে মৎস্যচাষীদের সার্বিক কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়ে চলেছে।

বন্দরে স্থাপিত অক্শন হল, হিমঘর, বরফকল, জাল তৈরি কেন্দ্র, নৌকা তৈরির ব্যবস্থাপনা, ডিজেল পাম্প, ইঞ্জিন মেরামতি ব্যবস্থাপনা, থাকার উপযোগী লজ ইত্যাদি পরিকাঠামো উৎপাদন, বিপণন ও কর্মবিনিয়োগের ক্ষেত্রে এক ইতিবাচক বাতাবরনের সৃষ্টি করেছে।

মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের উন্নয়ন : জেলার সমুদ্র তটরেখা বরাবর ৩০টি মৎস্য অবতরণ উপযোগী কেন্দ্র আছে। যেগুলিকে ফিস্ ল্যান্ডর ফেটার বা 'খোটি' বলা হয়ে থাকে। বিপণনের ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রগুলির উপযোগিতা ও উন্নয়ন জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রগুলির উন্নয়নের স্বার্থে অধিকাংশ কেন্দ্রে সিমেন্টের তৈরি জেটি তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়া মাছের শোধন, বরফ দেবার ব্যবস্থা, শেড, কম্যুনিটি হল এবং নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ফলে মৎস্যজীবীরা অত্যন্ত উপকৃত হয়েছেন।

এ ছাড়া মৎস্য শিকারে সমুদ্রগামী যানগুলির দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নির্দেশক আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সামুদ্রিক মৎস্য শিকার আইনগুলি কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে জেলার সমুদ্রগামী মৎস্যজীবীদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে।

পরিকাঠামো উন্নয়ন : জেলায় সামুদ্রিক এলাকায় যেমন মৎস্যবন্দর স্থাপন, মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও তার উন্নয়ন, ডিজেলে ভর্তুকিসহ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে, পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় মোরাম রাস্তা, জাল ও নৌকা তৈরি ও মেরামত, বরফ কল, কংক্রিট পুল নির্মাণ, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, মিলন কেন্দ্র, জালবোনার শেড ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে যা মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। চলতি আর্থিক বছরে আরও নতুন নতুন পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে জেলার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে।

পরিশেষ : মেদিনীপুর দেশের বৃহত্তম জেলা। স্বাধীনতা-সংগ্রামের বহু শহিদের রক্তে রাঙা সিক্ত মাটির উপর বয়ে গেছে বহু সমস্যার ঝড়। এসেছে মোঘল-পাঠান, এসেছে ইংরেজ—সর্বোপরি স্বাধীনতার যুদ্ধ। এর মধ্য থেকেই জেলার মানুষ রুটিরুজির প্রশ্নে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সঙ্গে যেমন বন্ধ্যা ক্ষেতকে সবুজে ভরে দিতে পেরেছে, তেমন নদী, নালা, খাল, বিল, সমুদ্রের বুক থেকে তুলে আনতে পেরেছে রুপালি ফসল—মাছ। আজ বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উৎপাদনের কোরাস—গতিসঞ্চার হয়েছে বিজ্ঞানভিত্তিক উৎপাদন মানসিকতার।

বর্তমানে জেলায় জলাশয় আছে—জল আছে—প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মৎস্যচাষীবৃন্দ আছেন—মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠীগুলির সক্রিয় ভূমিকা আছে—পরিকাঠামো আছে—পরিবহন ব্যবস্থা আছে—জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা আছে—জেলার অবস্থা ও অবস্থানের নিরিখে উৎপাদনমুখী চেতনায় আরও নতুন মাত্রা সংযোজিত হবে—এই অঙ্গীকার আজ মাছচাষীদের মননে উজ্জ্বল। আমরা মেদিনীপুর জেলা মৎস্যদপ্তর এই অঙ্গীকারবদ্ধ প্রত্যয়ের প্রতি শ্রদ্ধা রাখছি।

লেখক : উপমৎস্যঅধিকর্তা, পশ্চিমাঞ্চল, মেদিনীপুর

নদীতে মীনসংগ্রাহকদের সমাবেশ

মেদিনীপুর ও চিংড়ি চাষ

শুভময় দাস

পা ধুইয়ে দিচ্ছে মিষ্টিজল-নোনাজল। মাথায় বইছে গন্‌গনে গরম কাঁকুরে বায়ুস্রোত। একদিকে ইলিশের ঝটপট অন্যদিকে চিংড়ির লাফঝাঁপ। একজনের হাতে বিদ্রোহের লাল মশাল অন্যের চোখে সেবার, সাহায্যের ফল্গুধারা। এ সমস্ত বৈপরীত্যই যখন মেদিনীপুরের বৈশিষ্ট্য তখন এ জেলা স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে অন্যদের থেকে। অন্যদের হৃদয়ে হাত রেখেও অনুভব করে নিজের হৃদ্‌ধ্বনি নিজের মতো করে। রমণীয় রুচিতে-শিল্পে, মায়বিষ্ট মননে, চুলচেরা চিন্তনে, সম্পন্ন সংস্কৃতিতে, বিপন্ন বিশ্বাসে ভাবনার ভাষায়, লৌকিক লোকাচারে, ক্ষুধার খাদ্যে, হৃদয়ের উচ্চারণে, বিদ্রোহে বিপ্লবে, অবিনাশী আবেগে প্রতিটি পদক্ষেপে মেদিনীপুর স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র ভেতরে বাহিরে। স্বতন্ত্র মজ্জায়-মূলে। মেদিনীপুরের সংজ্ঞা তাই মেদিনীপুর। দীর্ঘদিন বাড়িছাড়া দুই ছাত্রের পরস্পর হঠাৎ দেখা রেলগাড়িতে। দুজনেই এক নাড়িতে বাঁধা। হাতড়ানো শুরু স্মৃতির হাতবাক্সে হাত রেখে। সময় খুলে দিল শহুরে ভাষার কাঁটাতার। একটু পরে ছেলেবেলার নস্টালজিয়া, আঞ্চলিক ভাষার স্মৃতি লক্‌লক্ করে জিহ্বায়। "চুমুড় মাছের টক্ রসা কত দিন খাইনি ক ত।" (চিংড়ি মাছের টক তরকারি কত দিন খাইনি বল তো)। এই একটা বাক্যই বুঝিয়ে দেয় মেদিনীপুর কতটা ভাষা, রুচি, খাদ্যে ও হৃদয়ে পৃথক অন্য সকলের থেকে। তাই এ জেলায় চিংড়ি চাষ অন্যদের থেকে পৃথক হবেই হবে। এ জেলার মাছ অনেক জেলা

পেরিয়ে এলেও নিজের জেলায় যেন বেশি সপ্রতিভ। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণের এ জেলায় চিংড়ি মাছ কেমন ছিল, কেমন আছে বা আগামী দিনে কেমন থাকবে তার জলছবি আঁকার একটা চেষ্টামাত্র এ প্রবন্ধে।

মেদিনীপুরের চিংড়ি চেনা

মেদিনীপুরে চিংড়ি মাছের ডাকনাম 'চুমুড়ু' বা 'চুমড়ু' বা 'চুমড়ি মছ'। বড়ো আকারের হলে 'চিংড়া'। যে যার নিজের মতো করে নাম করেছে। আপন আপন খেয়ালে। চিংড়ির অবশ্য কোনও আসে-যায় না। তবে একটা ডাকনাম থাকলে একটু বেশি কাছের করে নেওয়া যায় বইকী ! মেদিনীপুর সেটা পেরেছে। যতই কাছের করুক না কেন, বিজ্ঞান কিন্তু সর্বত্র একই। তাই প্রধানত চিংড়িকে পিনিড ও নন-পিনিড এই দুই ভাগে ভাগ কার যায়। এদের সহজে চিনতে হলে নীচের সারণিতে চোখ রাখা যাক।

২। উদরখণ্ডকের সংযোগস্থলে ঘন বেল্টের আকারে দাগ।
৩। শিরোবক্ষের অগ্রভাগে লম্বা ধারালো ছোটো রস্ট্রাম বা খাঁড়ায় অবস্থান—একটি উল্লেখযোগ্য শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

পরিণত গলদা চিংড়ির লক্ষণ বা শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য

১। উদরখণ্ডকের সংযোগস্থলে ঘন বেল্টের আকারে দাগ সুস্পষ্ট।
২। শিরোবক্ষের অগ্রভাগে অবস্থিত রস্ট্রাম বা খাঁড়ার অঙ্কদেশে ১১টি বা ততোধিক কাঁটা বর্তমান। রস্ট্রাম লম্বাটে এবং বাঁকানো।
৩। রস্ট্রাম বা খাঁড়ার উপরিভাগে ৯টি কাঁটার অবস্থান পরিণত গলদা চিংড়ির উল্লেখযোগ্য লক্ষণ বা শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য।

গলদা চিংড়ির স্বভাব ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

১। গলদা চিংড়ি আকারে বড়ো ও দেখতে খুবই সুন্দর অর্থাৎ দৃষ্টিনন্দন।

পিনিড ও নন-পিনিড চিংড়ির পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	পিনিড	নন-পিনিড
১। বহিঃকঙ্কালের দ্বিতীয় উদর-খণ্ডকের প্লুরা	তৃতীয় উদরখণ্ডকের প্লুরাকে আংশিকভাবে আবৃত করে রাখে।	প্রথম ও তৃতীয় উদরখণ্ডকের প্লুরাকে আংশিকভাবে আবৃত করে রাখে।
২। বক্ষদেশের উপাঙ্গ	প্রথম তিনটি উপাঙ্গ চিলেট প্রকৃতির অর্থাৎ দাঁড়ার ন্যায়।	প্রথম দুটিই কেবল চিলেট।
৩। শুক্রাণু স্থানান্তরিত করার অঙ্গ	পুরুষদের পেটাস্‌মা (Chelte) রয়েছে।	পেটাস্‌মা অনুপস্থিত।
৪। ডিম্বাণু নির্গমন অঙ্গ	স্ত্রী চিংড়িতে থেলিকাম অঙ্গ উপস্থিত।	এরূপ কোনও অঙ্গ অনুপস্থিত।
৫। ডিম্ব বহন পদ্ধতি	স্ত্রী-প্রজাতি প্রতিটি ডিম্ব পৃথক পৃথকভাবে জলে নিক্ষেপ করে।	স্ত্রী-প্রজাতি প্লিওপোডসমূহের মধ্যবর্তী অঞ্চলে গুচ্ছাকারে ডিম্ব বহন করে।
৬। অ্যান্টিনিউল (প্রথম অ্যান্টেনা)	দুটি ফ্ল্যাজেলা উপস্থিত থাকে।	তিনটি ফ্ল্যাজেলা উপস্থিত থাকে। এর মধ্যে পৃষ্ঠভাগেরটি চেরা।

মেদিনীপুরের প্রধান কয়েকটি চিংড়ির গঠন-বৈশিষ্ট্য ও শনাক্তকরণ

চিংড়ির পৈতে হল ওই পিনিড নন-পিনিড। বামুন আর অ-বামুন তো চিনে ফেলা গেল। কিন্তু দাস, জানা, পাত্র, মাইতি, পণ্ডা, পাহাড়ি, মিশ্র, মহাপাত্র কেমন চিনব, অর্থাৎ মেদিনীপুরে যত ধরনের চিংড়ি আছে ওদের হাল-হকিকত জানার আগে কেমন করে বিভিন্ন প্রকার চিংড়ি চেনা যাবে তার একটা কাজ চলা গোছের চেষ্টা করা যাক :

গলদা চিংড়ি : বৈজ্ঞানিক নাম : *Marcrobrachium rosenburgi* (ম্যাক্রোব্রাকিয়াম রোজেনবারগি)

বাচ্চা গলদা চিংড়ির লক্ষণ বা শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য

১। ক্যারাপেস বা শিরোবক্ষের খোলসটিতে লম্বালম্বি কয়েকটি রেখা বর্তমান।

২। সাগর ও গভীর জলে থাকে। আমিষ, নিরামিষ সব রকম খাবারই খায়।
৩। পরিণত স্ত্রী গলদা চিংড়ি ডিসেম্বর-জুলাই মাস পর্যন্ত হুগলি নদীর মোহনায় নোনাজলে ডিম ছাড়ে।
৪। মে থেকে জুলাই পর্যন্ত রূপনারায়ণ ও হুগলি নদীর চাকদা অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যায় গলদা চিংড়ির চারা পাওয়া যায়।

বাগদা চিংড়ি : বৈজ্ঞানিক নাম : *Penaeus monodon* (পিনিয়াস মনোডন)

বাচ্চা বাগদা চিংড়ির লক্ষণ

১। ৬-১৫ মিলিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়।
২। ষষ্ঠ উদরখণ্ডকের অঙ্কীয়ভাগে ১৪-১৯টি লালচে খয়েরি রঙের বিন্দু বর্তমান।
৩। সমগ্র উদরের অঙ্কীয়ভাগে লাল দাগ থাকে।

৪। খাঁড়া বা রস্ট্রামটি শুঁড় ছাড়িয়ে সামান্য বিস্তৃত।

৫। ১৫ মিলিমিটারের বড়ো আকারের বাগদা চিংড়িতে অঙ্কীয়-ভাগের লালচে দাগটি প্রথমে গোলাপি এবং পরে সবুজ হয়ে যায়।

স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য : ছোটো চারা বাগদা জলপূর্ণ পাত্রের ধার বরাবর সারিবদ্ধভাবে সাঁতার কাটে এবং কোনও জলজ উদ্ভিদের পাতা বা ডালকে আশ্রয় করে একজায়গায় জড়ো হয়।

পরিণত বাগদা চিংড়ির লক্ষণ

১। পরিণত বাগদা চিংড়ির দেহের রং কালচে বাদামি এবং দেহ বেশ সুঠাম ও পুষ্ট হয়।

২। দেহে বাঘের দেহের মতো ডোরা কাটা কালো দাগ থাকে আর তাই ইংরেজিতে এদের টাইগার স্রিম্প বলে।

৩। রস্ট্রাম বা খাঁড়ার পৃষ্ঠদেশে ৪টি এবং অঙ্কদেশে ৩টি দাঁত বা কাঁটা থাকে।

স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য

১। পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গানদীর মোহনা অঞ্চলে নোনাজলে বাগদা চিংড়ি মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। লোনাজলে ডিম ছাড়লেও অল্প লোনাজলের পুকুরেও চাষ করা যায়। ২৪-পরগনায় সুন্দরবন অঞ্চলে, ধানখেতে বাগদা চিংড়ি চাষের যথেষ্ট প্রচলন হলেও মেদিনীপুরে হয় না।

৩। প্রতি বছরই ভারত বিদেশে বাগদা চিংড়ি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে যার পেছনে মেদিনীপুরের অবদান বিরাট।

হন্যে চিংড়ি : বৈজ্ঞানিক নাম : *Metapenaeus monoceros* (মেটাপিনিয়াস মনোসেরস)

বাচ্চা হন্যে চিংড়ির লক্ষণ

১। রস্ট্রাম বা করাত বা খাঁড়াটি বেশ ছোটো এবং অগ্রভাগ বেশ ছুঁচালো।

২। খয়েরি রঙের দেহের লেজটি ঘন খয়েরি।

৩। রস্ট্রামের গোড়ায় একটি বড়ো ও একটি ছোটো দাঁত অর্থাৎ বড়োটি অ্যান্টিন্যাল স্পাইন ও ছোটোটি হেপাটিক স্পাইন বর্তমান।

৪। উদরের অঙ্কদেশের পশ্চাতে 'M' অক্ষরের মত 'নীলচে কালো দাগ' বর্তমান।

৫। দেহের দৈর্ঘ ৩.৫-৪.০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়।

পরিণত হন্যে চিংড়ির লক্ষণ

১। হন্যে চিংড়ি আকারে ছোটো এবং দেহের রং খয়েরি।

২। রস্ট্রাম বা করাত বা খাঁড়ার পৃষ্ঠদেশে ৯-১২টি দাঁত থাকে এবং এটি ছোটো ও অসংখ্য দাগে ভরা।

স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য

১। হুগলি ও মাতলা নদীর মোহনা অঞ্চলে বছরের প্রায় অধিকাংশ সময়ই হন্যে চিংড়ি পাওয়া যায়।

২। জল থেকে তোলার পরও বেশ কিছু সময়ে হন্যে চিংড়ি বেঁচে থাকে।

চামনে চিংড়ি : বৈজ্ঞানিক নাম : *Metapenaeus brevicornis* (মেটাপিনিয়াস ব্রেভিকরনিস)

বাচ্চা চামনে চিংড়ির লক্ষণ :

১। দৈর্ঘে ৩.০-৩.৫ মিলিমিটারের মতো হয়।

২। ছোট রস্ট্রামযুক্ত দেহের রং খয়েরি।

৩। মাথায় খোলকের বা ক্যারাপেসের দুপাশে ও মধ্যভাগে খয়েরি দাগ বর্তমান।

৪। সামান্য বড়ো আকৃতির চামনে চিংড়ির মাথায় খোলক বা ক্যারাপেসের রং হলদে হয়।

পরিণত চামনে চিংড়ির লক্ষণ

১। পরিণত চামনে চিংড়ির দেহের রং হলদে এবং অসংখ্য দাগবিশিষ্ট।

২। মাথার সামনের করাত বা খাঁড়া বা রস্ট্রাম ছোটো এবং ছুঁচালো। রস্ট্রামের পৃষ্ঠদেশে ৭টি দাঁত আছে।

স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য

১। চামনে চিংড়ি মিঠাজলে বাস করতে সক্ষম।

২। প্রায় সারা বছরই সুন্দরবনের মোহনা অঞ্চলে চামনে চিংড়ির বীজ পাওয়া যায়।

৩। জল থেকে তোলার পর চামনে চিংড়ি অল্প সময় বেঁচে থাকে।

চাপড়া চিংড়ি : বৈজ্ঞানিক নাম : *Metapenaeus indicus* (মেটাপিনিয়াস ইনডিকাস)

বাচ্চা চাপড়া চিংড়ির লক্ষণ

১। দেহের রং স্বচ্ছ সাদা এবং রস্ট্রাম বা করাতের অগ্রভাগ গোলাপি রঙের।

২। লেজের ডগা বা টেলশনের অগ্রভাগ গোলাপি রঙের হয়।

৩। রস্ট্রামটি একটি দাঁতবিশিষ্ট।

৪। হালকা হলদে রঙের পুচ্ছাক্ষীদণ্ড।

৫। ক্যারাপেসের মধ্যভাগে কয়েকটি হালকা হলুদ ও বাদামি দাগ বর্তমান।

৬। পুচ্ছ পাখনায় কতকগুলি কালচে ঘন বাদামি দাগ থাকে।

স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য

চাপড়া চিংড়ির চারাগুলি জলে দ্রুত সাঁতার দিয়ে বেড়ায়।

পরিণত চাপড়া চিংড়ির লক্ষণ

১। পরিণত চাপড়া চিংড়ির দেহের রং স্বচ্ছ সাদা বলে ইংরেজিতে এদের "ইন্ডিয়ান হোয়াইট শ্রিম্প" বলে। তবে রস্ট্রাম ও টেলশনের অগ্রভাগ লাল রঙের বা গোলাপি রঙের হয়ে থাকে।

২। রস্ট্রাম চক্ষু থেকে সামান্য অগ্রভাগে বর্ধিত থাকে।

স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য

চাপড়া চিংড়ি নোনা জল পছন্দ করে।

রস্‌না চিংড়ি : বৈজ্ঞানিক নাম : *Palaemon styliferus* **(প্যালিমন স্টাইলিফেরাস)**

বাচ্চা রস্‌না চিংড়ির লক্ষণ

১। গোলগাল ও মোটা ধরনের দেহ।

২। মাথা দেহের অন্য অংশ অপেক্ষা বড়ো।

৩। রস্ট্রামের পৃষ্ঠভাগে ৫-৭টি এবং অঙ্কীয়ভাগে ৬-১০টি দাঁত থাকে।

৪। দুইজোড়া পা চিমটার ন্যায় ক্ষুদ্র ও ঊর্ধ্বভাগ বাঁকানো।

পরিণত রস্‌না চিংড়ির লক্ষণ

১। দেহটি গোলাকার মোটা ও বেঁটে।

২। রস্ট্রাম বা করাতের অগ্রভাগ ছুঁচালো ও লম্বা এবং দুইজোড়া সাঁড়াশির মতো মোটা মোটা পা বর্তমান।

স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য

১। পশ্চিমবঙ্গে নোনা অঞ্চলে রস্‌না চিংড়ি 'ভেড়ি লক্ষ্মী' নামে পরিচিত।

২। আগস্ট থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত হুগলি, মাতলা, রূপনারায়ণ নদীর মোহনা অঞ্চলে এবং চিল্কা হ্রদে রস্‌না চিংড়ির বীজ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

মেদিনীপুর জেলার নোনাজলে চিংড়ি চাষ

পশ্চিমবঙ্গে তিনটি জেলা প্রকৃতির বিশেষ কৃপাপুষ্ট। এরা যথাক্রমে পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪-পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪-পরগনা। পশ্চিম এ কৃপা থেকে বঞ্চিত। পূর্ব মেদিনীপুরের প্রান্তভাগের প্রায় সমস্তটাই নোনা জলের স্পর্শ পায় দিনে-রাতে, ভয়ে-ভালোবাসায়, গ্রীষ্মে-বর্ষায়, রাগে-অনুরাগে। নোনাজল ছুঁয়ে যায় মেদিনীকে। জল দিয়ে যায় তার প্রাণসম্পদকে। মেদিনী প্রবল মমতায় আগলে রাখে, বাড়িয়ে তোলে যত্নে আর প্রাণ দেয় সৃষ্টিসুখের উল্লাসে। নেই নেই করেও পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে সমুদ্র তার নোনাজলের বিনুনিকে ঢুকিয়ে দিয়েছে বেশ কয়েক কিলোমিটার। এ জলবেণীর স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ এবং প্রাণপ্রাচুর্য পরিবর্তিত হয় স্থানে স্থানে। রং, রূপ ও আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষণীয়। বঙ্গোপসাগর স্বয়ং রয়েছেন দীঘায়। ওই সীমানা ছেড়ে জুনপুট, দাদনপাত্রবাড়, রামনগর হয়ে কাঁথি থেকে হলদিয়া পর্যন্ত নোনাজল রয়েছে বিভিন্ন মাত্রায়।

মেদিনীপুরের নোনাজলের চিংড়ি-প্রজাতি

"আপনাকে এই জানা আমার ফুরাল না ।
সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমার চেনা "—

সত্যিই তাই। কেউ আজ পর্যন্ত একজনও বলে উঠতে পারলেন না কত প্রজাতির চিংড়ি মেলে এই মেদিনীপুরে ! কী তার জীব বৈচিত্র্য ? কী তার প্রাণসম্ভার এবং প্রাণসম্ভাবনা ?
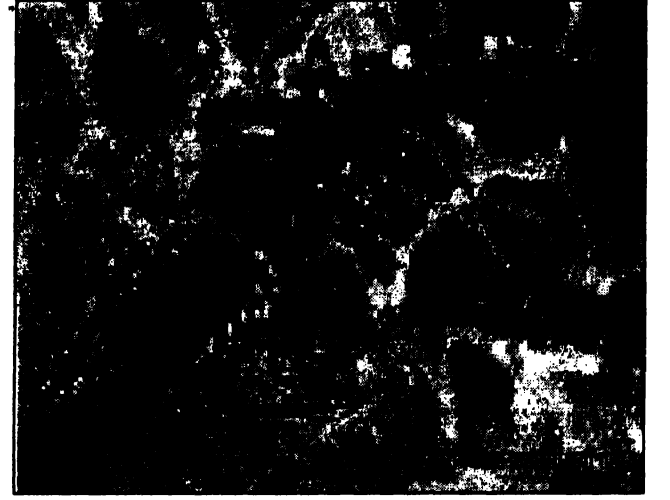
ভারতের প্রাণী সর্বেক্ষণ এ পর্যন্ত যে রিপোর্ট দিয়েছে সেটি অসম্পূর্ণ। দিনে দিনে পালটাচ্ছে তথ্য। মেদিনীপুর জেলা ছেড়ে দেওয়া যাক, কেবলমাত্র পর্যটন-সুন্দরী দীঘার সমুদ্রে কত প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায় সে তথ্যও দুষ্প্রাপ্য। বিজ্ঞানী বাদল ভারতীর মতে আজ থেকে দশ বছর আগে পর্যন্ত দেখা মিলত ২১ প্রজাতির পিনিড চিংড়ি।[১] কিন্তু ২০০২ সালের চন্দ এবং ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন ওই প্রজাতির সংখ্যা খুব বেশি হলে হবে সতেরো।[২] তাহলে বাকি চার বা পাঁচ প্রজাতি ? সম্ভবত "হারাধনের দশটি ছেলের" মতো হারিয়ে যাচ্ছে। লুপ্ত হচ্ছে নচেৎ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে দূষণজর্জরিত দীঘা থেকে। আবার যে সতেরোটি প্রজাতি মিলল তার মধ্যে ভারতী প্রমুখের সঙ্গে বর্তমানের অমিল বেশ কয়েকটি। আবার নতুন কয়েকটির সন্ধানও মিলল যারা আগে এখানে আসত না। এদিকে তিন তিনটি নতুন প্রজাতির আবিষ্কার ঘটল, পৃথিবীর বুকে এই দীঘায়।[৩] সমগ্র পৃথিবী জানল এদের অস্তিত্বকে। তাই বড়ো 'বেকুবের মতো' মানুষ আজ প্রকৃতির সঙ্গে অসম সখ্যতা করছে। এমত অবস্থায় মেদিনীপুরের প্রধান প্রধান নোনাজলের চিংড়িগুলো হল—[৪]

(১) বাগদা চিংড়ি — *Penaeus monodon*
(২) হন্যে চিংড়ি — *Metapenaeus monoceros*
(৩) চাপড়া চিংড়ি — *Penaeus indicus*
(৪) রস্‌না চিংড়ি — *Palaemon styliferus*
(৫) চামনে চিংড়ি — *Metapenaeus brevicornis*

এ তো গেল বইয়ের ভাষা। বাগদা মেদিনীপুরে সাধারণভাবে বাগদা নামেই পরিচিত হলেও সকলে 'চিংড়া' বলতে বিশেষ ভালোবাসে। অন্যদেরও বিশেষ স্থানীয় নাম রয়েছে মেদিনীপুরে। 'চাপড়া চিংড়ি' পোশাকি নাম হলেও এর বাজারে বা জেলে মহলে বা ক্রেতা বিক্রেতার কাছে ডাকনাম বড়ো আদরের 'বঁথড়' চিংড়ি। সম্ভবত ভোঁতা থেকে বোঁথা তথা 'বঁথড়' নামের সৃষ্টি। কারণ এর রস্ট্রামটি সংক্ষিপ্ত। চোখ পেরিয়ে অতি সামান্যই বেরিয়ে থাকে রস্ট্রামটি ।

আবার 'চামনে' চিংড়ির নাম মেদিনীপুরে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। 'চ' অক্ষরটি আদরের গুঁতোয় কিংবা বহুল ব্যবহারের ফলে 'ছ'-এ পরিণত হয়ে 'ছামনে তে' পরিণত। এর লেজের দিকটা খুব মোটা। যেন পচে ঢোল হয়ে গেছে। তাই এর স্থানীয় নাম 'ঢোলা চিংড়ি'।

নোনা জল ঢোকানোর জন্য ফিডার ক্যানাল তৈরি হচ্ছে

এ ছাড়াও আরও এক অসাধারণ অভিজ্ঞতায় পুষ্ট দীঘা—শংকরপুর বা মোহনা অঞ্চল। গোগো চিংড়ি। কেউ বা বলেন ধুসা চিংড়ি। খুব ছোটো ছোটো এবং একেবারে সাদা। এ চিংড়ি এতই ছোট যে ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে খাবার মতো নয়।

সরাসরি উনুনে তেঁতুল সহযোগে চালান করা যায় অম্বলের জন্য। যাঁদের এ অভিজ্ঞতা আছে তাঁরাই কেবল বুঝবেন। যখন গোগো চিংড়ি জালে ওঠে তখন কেবল গোগো-ই থাকবে। একটা পোকা, শামুক, মাছ এমনকী নোংরা পাতা কেউ কেউই ত্রিসীমানায় থাকতে পারবে না। জালের পর জাল—সাদা আর সাদা। ট্রাকের পর ট্রাকে শুধুই গোগো। জেলেরা টেনে তুলতে পারে না। এক একটা জালে এক কুইন্টাল পর্যন্ত ধরা পড়ে। যখন গোগো আসে তখন বেশ কয়েকদিন ধরেই শুধুই গোগো উৎসব। অসংখ্য কোটি কোটি গুঁড়ি গুঁড়ি সাদা সাদা গোগো আর গোগো। জেলেরা নিরুপায়। বাজার-মূল্য কম। মানুষ কতই বা আর খাবে ? ঝুড়িতে রাখলে এক ঝুড়ি সাদা গোবর বলেই মনে হবে। অতঃপর বালিতে বিছিয়ে শুকনো করা। পোলট্রি খাদ্য বা মাছের খাদ্যের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হলে গোগো নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করে।

মেদিনীপুরে নোনাজলে চিংড়ি চাষ পদ্ধতি

যে জেলা শিক্ষা, সংস্কৃতি ভাষা, সভ্যতা, আন্দোলন, খাদ্য, রুচি প্রত্যেকটি বিষয়ে স্বতন্ত্র, সে জেলাতে চিংড়ি চাষে স্বতন্ত্রতা বজায় থাকবে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। নোনাজল বলতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বেশ অনেকটাই। প্রধানত এর মধ্যে পড়ে কাঁথি ১নং, ২নং, ৩নং ; খেজুরি ১নং, ২নং ; রামনগর ১নং, ২নং। এদের মধ্যে দীঘা, শংকরপুর, রামনগর, মোহনা, রসলপুর, জুনপুট, দাদনপাত্রবাড় সরাসরি সমুদ্রের সঙ্গে মাখামাখি করে থাকে। সমুদ্রের সঙ্গে এদের সখ্যতা বড় নিবিড়।

এই জেলায় নোনাজলে চিংড়ি চাষ বহুদিনের। অন্তত বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তাই এর সমগ্র চাষ পদ্ধতিকে দুভাগে ভাগ করে নেওয়া যায় :

১। চিরাচরিত অর্থাৎ পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে গোত্রের পদ্ধতি,

২। বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ ছক্কা নয় অঙ্কা গোত্রের পদ্ধতি।

মেদিনীপুরের নোনাজলের অঞ্চল

পূর্ব মেদিনীপুরে সমুদ্রের তটরেখা ৬৫ কিমি। ব্র্যাকিশ ওয়াটার বা ঈষৎ নোনাজল ৩৫,০০০ হেক্টর। সমগ্র অঞ্চলে যে জলা ভূমি আছে তার শতকরা ৬০ শতাংশ ব্যবহার করা হয়েছে। ৪০ শতাংশ এখনও বাকি। পূর্ব মেদিনীপুরে ২৫টি ব্লক। এর মধ্যে ১৫টি ব্লকে নোনাজলের সন্ধান মেলে। নীচের তালিকাই তার প্রমাণ দেয়।

মেদিনীপুর ব্লকওয়ারি জলাশয় এলাকা গ্রাম পঞ্চায়েত সংখ্যা এবং গ্রামের সংখ্যা*

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	বিভাগ	গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	চাষযোগ্য জলা (হেক্টর)
১।	মেদিনীপুর সদর	মেদিনীপুর সদর (উঃ)	৮	২৬৯	২৭৫.১১
২।	গড়বেতা ১	”	১২	৩০৪	২২৩.৭৬

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	বিভাগ	গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	চাষযোগ্য জলা (হেক্টর)
৩।	গড়বেতা ২	মেদিনীপুর সদর (উঃ)	১০	২৫৯	২৫২.৯৮
৪।	গড়বেতা ৩	”	৮	১৯৩	৭০.৭১
৫।	শালবনি	”	১০	৩৯৫	৩২৫.৪০
৬।	কেশপুর	”	১৫	৫১৪	১০৩৪.৮৯
৭।	ডেবরা	”	১৪	৩৪০	১৩১৯.৫৭
৮।	খড়গপুর-১	মেদিনীপুর সদর (দঃ)	৭	২৬৮	২৬২.১০
৯।	খড়গপুর-২	”	৯	৩২৪	৩৩০.১৪
১০।	নারায়ণগড়	”	১৬	৪৫৪	১৪৫২.৭৬
১১।	কেশিয়াড়ি	”	৯	২২০	৭০৫.৫০
১২।	দাঁতন-১	”	৯	১৭৮	৯২৬.৮৬
১৩।	দাঁতন-২	”	১০	১১৮	৬৬৬.৭৯
১৪।	মোহনপুর	”	৫	১০৫	৬১৯.৯৮
১৫।	পিংলা	”	১০	১৬৮	৪২০.১৭
১৬।	সবং	”	১৩	২২৫	১০৪৪.৭৭
১৭।	ঘাটাল	ঘাটাল	১২	১৪৯	১৯০৯.২১
১৮।	চন্দ্রকোনা-১	”	৬	১৪২	৭৪৮.৯১
১৯।	চন্দ্রকোনা-২	”	৬	১৩১	৫৮৭.৩৮
২০।	দাসপুর-১	”	১০	১৬২	৭৯০.৯২
২১।	দাসপুর-২	”	১৪	৮৭	৭৭৬.৫৬
২২।	ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম	১৩	৬২৯	৩১৬.৮৩
২৩।	বিনপুর-১	”	১০	৪১৬	৬৩.৪৯
২৪।	বিনপুর-২	”	১০	৪৭০	২৯২.৫৫
২৫।	সাঁকরাইল	”	১০	২৮৬	৬৫৬.১৯
২৬।	গোপীবল্লভপুর-১	”	৭	১৯৮	৫০৬.১১
২৭।	গোপীবল্লভপুর-২	”	৬	১৭৬	১২৪.১৪
২৮।	জামবনি	”	১০	১৮৭	৩৪৯.৮৬
২৯।	নয়াগ্রাম	”	১২	২৯৭	১২০০.০৫
৩০।	কাঁথি-১*	কাঁথি	৮	২২৬	৬০২.৮৩
৩১।	কাঁথি-২*	”	৮	১৬৪	৬৬৭.০২
৩২।	কাঁথি-৩*	”	৮	১৬৩	৬৬৭.০২
৩৩।	এগরা-১	”	৯	১৪৮	৭৯৭.৮৮
৩৪।	এগরা-২	”	৮	১১৮	৬৬৮.৪৯
৩৫।	রামনগর-১*	”	৯	১৫০	৫১৭.৯৩
৩৬।	রামনগর-২*	”	৮	২৩৭	৬১২.৭২
৩৭।	ভগবানপুর-১	”	১০	১৫৭	৬৪১.৩১
৩৮।	ভগবানপুর-২	”	৯	১৭৪	৬২৩.৪৫
৩৯।	পটাশপুর-১	”	৯	১৩৫	৬৮৫.৫৪
৪০।	পটাশপুর-২	”	৭	১৪৩	৬২৬.৫৪
৪১।	খেজুরি-১*	”	৬	১১০	৭৮৫.০২
৪২।	খেজুরি-২*	”	৫	৯৫	৮০০.৭০

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	বিভাগ	গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	চাষযোগ্য জলা (হেক্টর)
৪৩।	তমলুক-১*	তমলুক	১২	১২১	৬৯০.৪৭
৪৪।	তমলুক-২*	”	১০	৮৪	৫১৯.৪৯
৪৫।	পাঁশকুড়া-১	”	১৫	২৪৮	১০৭৬.৩৯
৪৬।	পাঁশকুড়া-২	”	১৩	১১০	৬৪৫.৫২
৪৭।	ময়না*	”	১১	৮৫	৮৭৮.৭৮
৪৮।	মহিষাদল-১*	”	১২	১০০	৯০৬.৬৫
৪৯।	মহিষাদল-২*	”	১১	৮৮৩	৪২৩.৪৫
৫০।	সুতাহাটা-১	”	৬	৮৬	৬০০.২০
৫১।	সুতাহাটা-২	”	৭	৪৬	৭৬৭.৩২
৫২।	নন্দীগ্রাম-১*	”	১০	৯৯	১০৭৬.৫৭
৫৩।	নন্দীগ্রাম-২*	”	৭	৩৯	৬৩৭.৬২
৫৪।	নন্দীগ্রাম-৩	”	১০	১১৪	৭৭৯.৮৭

*** মার্ক চিহ্নিত ব্লকগুলি ব্র্যাকিশ ওয়াটারসম্পন্ন।**

পূর্ব মেদিনীপুরে বাগদার চাষ পনেরোটি ব্র্যাকিশ ওয়াটার অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হলেও প্রধান স্থান হল দীঘা, জুনপুট, রামনগর, রসলপুর, শৌলা, ভোগরান, মাদারমনি, দাদনপাত্রবাড়, জলদা, সোনামুখি। হাল আমলে খেজুরি, হেঁড়িয়া, নন্দকুমার, নন্দীগ্রাম, নাচিন্দা, মারিশদা, কালীনগরেও চাষ হচ্ছে নোনাজলের চিংড়ির।

চিরাচরিত পদ্ধতি

ইতিহাস ঃ ভারতের যে কয়েকটি স্থানে চিরাচরিত পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ হয়ে আসছিল, মেদিনীপুর সেখানে উল্লেখযোগ্য স্থানই পায়। সমগ্র পশ্চিমবাংলায় সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক কম, প্রায় ১০০ কিমি-র মতো।[৬] এর মধ্যে মেদিনীপুরের প্রায় ৮০ হাজার হেক্টর জমি নোনাজল অধ্যুষিত। পশ্চিমবঙ্গে মোট নোনাজল অধ্যুষিত এলাকা প্রায় দুই লক্ষ দশ হাজার হেক্টর।[৭] এ জেলায় নোনাজলের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে রুজি-রুটির সংস্থান বহুদিনের। দীঘা জুনপুটের ইতিহাস ভারী মজার। সরাসরি সমুদ্রকে কাছে পাওয়ায় সমুদ্রের জল সরাসরি মাঠে আসত বিভিন্ন খাল-নালার মধ্যে দিয়ে। এত তীব্র নোনা যে—মাটি কৃষিচাষের পক্ষে ষোলো আনা অচল, বন্ধ্যা। প্রকৃতি বন্ধ্যা ? অসম্ভব। পরিবেশ ভারসাম্যে চলে অনবরত। তাই উদ্ভিদ না থাকলেও প্রাণসম্পদে শূন্য নয়। অর্থ সম্পদে তো শূন্য নয় মোটেই। গ্রীষ্মকালে মাঠের পর মাঠ এলাকার পর এলাকা তৈরি হত নুন। নিশ্চয়ই গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহের কথা মনে আছে সবার। গ্রীষ্মকালে মাঠ তৈরি করা হত অত্যন্ত যত্নে। ঢোকানো হত জোয়ারের জল। এক ফুট বড়োজোর। দু-তিন দিন কড়া রোদ। সূর্যদেব শুষে নিল বিশুদ্ধ জল। পড়ে রইল নুন আর নুন। যেন জলের ওপর সাদা বরফ, ছেয়ে গেছে সারা মাঠ। ব্যাস। নুন তৈরি পদ্ধতি চোখে দেখা এ প্রজন্মের কাছে বিরল অভিজ্ঞতা। এখনও কয়েকটা জায়গায় প্রাকৃতিক উপায়ে লবণ তৈরি হয়ে থাকে—রামনগরে, জুনপুটে, পূর্ব মেদিনীপুরে। এ তো গেল গ্রীষ্মকালে। কিন্তু বর্ষায় ? মাঠে জল থাকে অনেক, জলের লবণাক্ততাও অনেক কম। এ জলে নুন তৈরি করে পোষায় না। তাই আর এক বিকল্প—ভেড়িতে মাছ চাষ, প্রধানত চিংড়ি, ভেটকি, ভাঙন, তপসের। এই ভেড়ি চাষ সুন্দরবনের থেকে, দক্ষিণ ভারতের থেকে কিছুটা পৃথক। এবার আসা যাক মেদিনীপুরের ভেড়ি প্রসঙ্গে।

ভারতের অন্যান্য জায়গার মতো মেদিনীপুরের ভেড়ি চাষ শতাব্দী প্রাচীন।[৮] তবে প্রধান পার্থক্য হল, সুন্দরবন বা চব্বিশ পরগনা বা দক্ষিণ ভারতে, ভেড়িতে মাছ চাষের সঙ্গে সঙ্গে চলত ধান চাষ। ধান চাষ শেষ হয়ে গেলে পড়ে থাকত ধানের গোড়া। (স্থানীয় ভাষায় 'নাড়া' বা 'লাড়া')। ওই জমিতে নোনা-জল ঢুকিয়ে মাছ চাষ চলত। কেরলে এ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের একটা বিশেষ নাম পর্যন্ত আছে—'পক্কালি'। কেরলের ভাইকম, সারটলই, কোচিন, কন্যান্নুর, মুকুন্দপুরম এবং পাবুর অঞ্চলে পক্কালি চিংড়ির চাষ চলে। আসলে ওই সব অঞ্চলে ওই নোনা মাটিতে ও জলে যে প্রজাতির ধানের চাষ হত তার নাম ছিল পক্কালি।[৯] তা থেকে পক্কালি চিংড়ি চাষের উদ্ভব। কিন্তু মেদিনীপুরের একেবারে মোহনা বা সমুদ্র নিকটবর্তী মাঠে ধান চাষের প্রচলন ছিল না। এর ফলে ধানের গোড়া পচে যে প্রাকৃতিক খাবার তৈরি হবে সে সম্ভাবনা না থাকায় চিংড়ি উৎপাদনও হত বেশ কম পরিমাণে।[১০] কেরলের এই ভেড়িতে ধান ও মাছ চাষ করে উৎপাদন কত হত তার বিশেষ হিসেব থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে কোন বছর কোন অঞ্চলে কত

মাছ বা চিংড়ি উৎপাদন হত বা হয় তার কোনও তথ্যই নেই।[১১, ১২, ১৩, ১৪] মেদিনীপুরে এ ধরনের চাষ চলত বড়োজোর ৩-৪ মাস। কেরলে চলত ২-৩ মাস।[১৫]

মাঠ তৈরি : (ক) বাঁধ তৈরি—গ্রীষ্মকালে জল ঢুকিয়ে চলে নুন তৈরি। জ্যৈষ্ঠ শেষে আষাঢ় আসে। এ মাসের মাঝামাঝি নামে বর্ষা। ঠিক ওই সময় ভেড়ির মাঠ এবং বাঁধ তৈরির পালা। প্রত্যেকটা ভেড়ি আয়তনে ১-১০ হেক্টরের মতো। কেউ কেউ আবার নিজে চাষ করত না। তারা চাষিকে লীজে জমি দিত নির্দিষ্ট চুক্তির ভিত্তিতে। ভেড়ির কাছ দিয়ে বয়ে যেত ফিডার ক্যানেল। মজে গেলে সংস্কার করা হত। কারণ ওই নালা বেয়ে আসবে প্রাণের বীজ 'মীন'। ওরা নোনাজলের বাসিন্দা। সাগর উজিয়ে ওদের নালায় এনে ভেড়িতে ঢোকাবার ব্যবস্থা। এ সময়ে বাঁধের গোড়ার মাটি কোদাল দিয়ে তুলে দেওয়া হত বাঁধের নিচু অঞ্চলে, ফাটলে। স্থানীয় ভাষায় 'ভিতা মারা'। অর্থাৎ বাঁধের ভিত বা ভিত্তি ঠিক রাখা। তারপর বাঁশ বা কাঠ দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে ফাটল বন্ধ করে সমতল করা হত বাঁধের পাড়। সমুদ্রের জলে আসে কাঁকড়া। এরা এবং ধেড়ে ইঁদুর আগেভাগে গর্ত খুঁড়ে রাখত বাঁধে। ওই গর্ত মেরামতির জন্য বালি বা ছাই দিয়ে তৎক্ষণাৎ মেরামত করার ব্যবস্থা থাকত। বাঁধের বাইরের দিকেও ক্যানেলের দিকে জলের চাপ এবং অবিরাম স্রোতের হাত থেকে বাঁধ বাঁচাবার জন্য লাগানো হত বনতুলসী। মেদিনীপুরে যার আঞ্চলিক নাম 'চুড়চুড়ি' (*Croton sp.*)। তবে কেরলের মতো গ্রানাইট বা ল্যাটেরাইট পাথর দেবার রীতি ছিল না।[১৬] এমনকী খুব বেশি মটর, নারকেল, তালগাছের চারা রোপণের রীতি ছিল না।[১৭] তবে ১৯৬০-র শেষের দিকে খেসারির বীজ ছড়িয়ে দেবার প্রবণতা ছিল।

(খ) স্লুইস গেট

এই ভেড়িতে জোয়ারের জল নিয়মিত ঢোকানো হত আবার বের করাও হত। আর তার দরজা বা প্রবেশ-প্রস্থান হত স্লুইস গেটের মাধ্যমে। মাঝারি মাপের ভেড়িতে একটিই স্লুইস থাকত। এর গঠন আধুনিক স্লুইসের মতো নয়। এর অবস্থান থাকত জমির নীচের দিকে, যেখানে গভীরতা বেশি, যাতে জল সহজে বেরোতে এবং ঢুকতে পারে। স্লুইসের অবস্থানটা কোথায় হবে তার ওপরেই ভেড়ির সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করত। ফিডার ক্যানেলের দিকেই আসলে স্লুইস থাকত যাতে জলের তোড়ে ভেঙে না যায়। দুদিকে ইট দিয়ে গেঁথে পিলার করা হত। ওই পিলারে উলম্ব খাঁজ থাকত। ওই খাঁজে সমান্তরালভাবে একের ওপর অন্য কাঠের পাটা বা তক্তা ফেলে ফেলে স্লুইস হত। কতটা জল রাখা হবে তা কাঠের তক্তা ফেলে ঠিক করা হত। কাঠের মাঝখান দিয়ে যাতে জল না বেরিয়ে যায় তার জন্য খড় বা কাপড়ের প্যাকিং দেওয়া হত। প্রধানত শাল কাঠের তক্তা (মজবুত হওয়ায়) ব্যবহার করা হত। কেউ কেউ অবশ্য তাল কাঠও ব্যবহার করতেন। বাঁশের পাটা ব্যবহার করা হত জলের আবর্জনা রুখবার জন্য। ভরা জোয়ারের সময় জলের চাপে কাঠের পাটাতন যাতে না ভেসে যায় তার জন্য ওপরের পাটাতনে ভারি ওজন চাপানো হত।
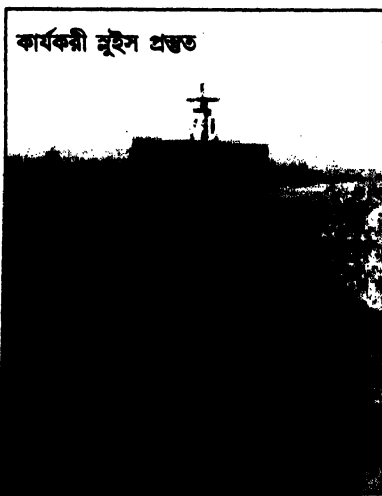
কার্যকরী স্লুইস প্রস্তুত

(গ) জলের প্রবেশ

বাঁধ মেরামতি শেষ হলে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ভরা কোটালের সময় ভরা জোয়ারের জল স্লুইস দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে আসত প্রচুর চিংড়ির চারা। সাধারণত দিনের বেলায় নয় রাত্রিবেলা জল ঢোকানো হত। স্লুইসের বাইরের মুখে কেরোসিন ল্যাম্প জ্বেলে রাখা হত চিংড়িকে আকৃষ্ট করবার জন্য। ভরা জোয়ারে চিংড়ি চারা ঢোকা শেষ হলে স্লুইসের মুখ পাটা ফেলে বন্ধ করা হত।

দীঘার চিংড়ি ফার্মে আধুনিক স্লুইস

(ঘ) মাছ ধরা

এভাবে প্রায় পনেরো দিন চিংড়ির চারা ঢোকানোর পরে মাছ ধরা চলত একাদশীর চারদিন আগে থেকে, তখন মরা কোটাল। মরা কোটাল ৬-৭ দিন থাকে। চৌকো বাঁশের ফ্রেমে ছোটো ফাঁসের শঙ্কু আকৃতির জাল বাঁধা থাকত। ফ্রেম স্লুইসের মুখে লাগানো থাকে। স্লুইসের ভেতরের দিকে কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বালা থাকত। জালের শেষ সরু প্রান্ত দড়ি দিয়ে এমনভাবে বাঁধা থাকত যাতে মাটিতে না লুটোয়। মাটিতে লুটোলে নিশ্চিতভাবে, কাঁকড়া জাল কেটে দিয়ে মাছ ধরা দফারফা করত। এভাবে ভেড়ি থেকে জল বের করে মাছ ধরা চলত। সাধারণত জল ঢোকানোর সময় বাঁশের একমুখী 'আড়ন

পাটা' দেওয়া থাকত যাতে মাছ ঢুকতে পারে, কিন্তু বোরোতে পারে না। এর পর ২ মাস মাছ ধরা হত না। তারপর প্রতি পনেরো দিন অন্তর মাছ ধরা হত। মাছ পড়ত চিংড়ি, ভেটকি, ভাঙন, খোলসে, কুনকুনি (কাঠ্‌কই)। একেবারে শীতের শেষে চূড়ান্তভাবে মাছ ধরা হত। ড্রেগনেট, স্কুপনেট, খ্যাপলা জাল, ছাঁকনি জাল এমনকী হাতেও মাছ ধরা চলত কম জলে। বড়ো চিংড়ি ধরা পড়ত ওই শেষবার জাল দেবার সময়। ওই সময় দুপুরের গরম জল ভেড়িতে প্রবেশ করিয়ে দিলে বড়ো চিংড়ি আপনা থেকেই বেরিয়ে আসত।

(ঙ) চিংড়ির পরিমাণ

একটা মরশুম মোহনার খুব কাছের দিকের ভেড়িতে ৫০০-৮০০ কিগ্রা/হে. মাছ ধরা পড়ত ভেতরের ভেড়িগুলোতে উৎপাদন কমত ধীরে ধীরে।

(চ) মাছ ধরার ওপর তিথি, গণ ও অন্যান্য প্রভাব

মেদিনীপুরের ভেড়িতে কখন বেশি মাছ ওঠে সে প্রসঙ্গে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন মতামত পোষণ করেন। যেমন কেউ কেউ বলেন পূর্ণিমা এবং প্রতিপদ তিথিতে সবচেয়ে বেশি মাছ ওঠে।[১৮, ১৯] কেউ কেউ বিশ্বাস করেন অমাবস্যায়, আবার জর্জ প্রমুখ বিশ্বাস করেন যে শুক্লপক্ষের মধ্যে বেশি চিংড়ি ধরা
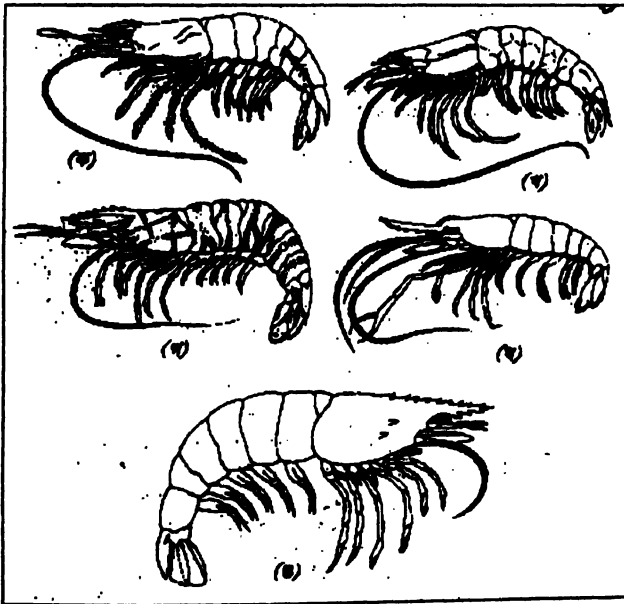
(ক) মেটাপিনিয়াস মনোসেরাস (খ) পিনিয়াস ইন্ডিকাস (গ) পিনিয়াস মনোডন (ঘ) প্যালিমন স্টাইলিফেরাস (ঙ) মেটাপিনিয়াস ডবসোনি

সম্ভব।[২০] যাই হোক শেষের মতাবলম্বীরা প্রমাণ করেছেন তীব্রতর জোয়ার এবং বিভিন্ন চিংড়ির প্রজাতি এই দুটি বিষয়ের ওপর উৎপাদন ভিন্ন হতে বাধ্য। যদিও তাপমাত্রা এবং লবণাক্ততার মাত্রা প্রভাব ফেলে না তেমনভাবে তবুও *মেটাপিনিয়াস মনোসেরস* অর্থাৎ হন্যে চিংড়ির বেলায় লবণাক্ততা বাড়লে উৎপাদনশীলতা কমে। আবার *পিনিয়াস ইন্ডিকাস* (P. indicus) অর্থাৎ চাপড়া চিংড়ির ক্ষেত্রে লবণাক্ততা বাড়লে ধরা পড়ার পরিমাণ বাড়ে। স্লুইস গেটের আকার এবং সংখ্যা এ ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার ওপর তেমন প্রভাব ফেলে না। তবুও স্লুইস গেটের আয়তনের ওপর চিংড়ির উৎপাদনশীলতা ৫ শতাংশ নির্ভরশীল।[২১] তবুও এটা ঠিক যে প্রথম কয়েক বছর উৎপাদন কম হলেও পাঁচ-ছয় বছর পরে ধীরে ধীরে উৎপাদন বাড়তে থাকত।

এই ভেড়ি চাষে না দেওয়া হত পরিপূরক খাবার না সুযোগ থাকত অত্যধিক হারে বাগদা পোনা সঞ্চয়ের। এর ফলে রোগভোগ বা পরিবেশ দূষণের প্রশ্ন প্রায়ই থাকত না। চাষিভাইদের লাভের পরিমাণ গগনচুম্বী না হলেও চলে যেত মোটামুটি। আর এই চলে যাওয়াটা প্রায় একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে ঘটেছে।

মেদিনীপুরে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বাগদার চাষ

(ক) ইতিহাস

মেদিনীপুরে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাগদা চাষের ইতিহাস মাত্র দশ বছরের পুরোনো। একে কতটা ইতিহাস বলা যাবে—আর কতটা সাম্প্রতিক ঘটনা বলা যাবে সেটি ঠিক করতে হলে ঘটনায় প্রবেশ জরুরি। যদিও মাত্র দশ বছরের ঘটনা তবুও প্রতিটি দিন প্রতিটি ঘণ্টা এক একটি রুদ্ধশ্বাস নাটকের সাক্ষী। দশ বছরে যেন দশ দেশ জয় হয়েছে, দশ সমুদ্রের জল গড়িয়ে গেছে। দশ নগরীর পতন হয়ে আবার দশ নগরীর পত্তন হয়েছে। ঘটনার সাসপেন্সে ভরপুর দশ বছরের মেদিনীপুরের বাগদা চাষ।

১৯৯৩ সালের আগে চিরাচরিত ভেড়ি প্রথায় চাষ হত মেদিনীপুরে। ১৯৯৩-এর সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে থাইল্যান্ডের কোম্পানি সি পি ভারতে আসে। আসে মেদিনীপুর ও ২৪-পরগনায়। রামনগরের কাছে বাঁকশাল। ওই বাঁকশালে প্রথম সি পি-র কারিগরি প্রযুক্তির সহায়তায় বাগদার চাষ হল বিজ্ঞানসম্মতভাবে। এলাকা তেমন বড়ো ছিল না। ৩১ হেক্টর জমি। প্রথম ফসল চমকে দেয় সবাইকে। বাপ-কাকাদের চিরাচরিত চিংড়ি চাষ যদি রুপো এনে দিত এই সি পি কোং-এর সেমি-ইনটেনসিভ বাগদা চাষ পদ্ধতি সোনা-হিরে-জহরত এনে দিল। লাভ, লাভ শুধু লাভ। এতো গুণ লাভ করা সম্ভব ! শুধু চিংড়ি চাষ থেকে ! মানুষের মাথা ঘুরে গেল। যে চাষি চাষ করেছিল সে বাস কিনল, ট্রাক কিনল। রাতারাতি লক্ষপতি। সি পি-র কর্মপ্রসার ঘটল। সি পি এবং আই এফ বি জোট বেঁধে ২৪-পরগনার কানমারিতেও চাষ শুরু করল। বাজারে ওয়াটারবেস, শ্যাম্প্রো ফিসারি, সি পি প্রভৃতি নানা কোম্পানি ছেয়ে গেল চিংড়ির খাবার নিয়ে। ১৯৯৪ সালে আই এফ বি, বেঙ্গল অ্যাকুয়াটিকস্, শ্যাম্প্রো ফিসারি নিজস্ব ফার্ম খুলল দীঘা-জুনপুটে। চাষ শুরু করল ব্যাপকভাবে। তখন পেছন ফিরবার ফুরসত কোথায় ? লোকের চোখে শুধু বাগদা, স্বপ্নে
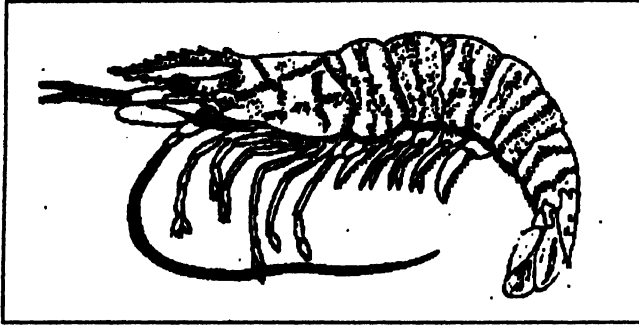
নোনা জলের রানী বাগদা

বাগদা। বাসে-রিকশায়-পুকুরঘাটে-বিয়ের বাসরে সবসময় বাগদার-আলোচনা। দীঘা, দাদনপাত্রবাড়, মাদারমনি, শৌলা, ভোগরান, জলদা, সোনামুখি অর্থাৎ দীঘা-রামনগর থেকে জুনপুট পর্যন্ত ছেয়ে গেল বাগদায়। দেশীয় ভেড়িগুলো উঠে গেল। মালিকরা লিজ দিয়ে দিল বড়ো বড়ো কোম্পানিকে। কলকাতা, বিহার, দার্জিলিং থেকে দেশীয় অন্তর্দেশীয় ছোটো-বড়ো বহু কোম্পানি এসে বসল দীঘায়। সি পি এবং

●

কে আসেনি মেদিনীপুরে ! চাষের জন্য এগিয়ে এসেছে ভারতের বড়ো কোম্পানি আই এফ বি অ্যাগ্রো, এসেছে মধুমিতা, এম এম সি, সুন্দরবন অ্যাকুয়াটিক্স, হিন্দুস্থান লিভার, ব্রিটানিয়া, সাহারা ইন্ডিয়া। কে ছিল না সে যাত্রায় ! সবাই হুমড়ি খেল চিংড়ি চাষে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিসারি পড়ার সে কি ক্রেজ। 'কিছু না হলে তো চিংড়ি ফার্ম তো আছে।

●

আই এফ বি এবং ওয়াটারবেস কোং দিতে থাকল কারিগরি ও প্রযুক্তি সহায়তা। কে আসেনি মেদিনীপুরে ! চাষের জন্য এগিয়ে এসেছে ভারতের বড়ো কোম্পানি আই এফ বি অ্যাগ্রো, এসেছে মধুমিতা, এম এম সি, সুন্দরবন অ্যাকুয়াটিক্স, হিন্দুস্থান লিভার, ব্রিটানিয়া, সাহারা ইন্ডিয়া। কে ছিল না সে যাত্রায় ! সবাই হুমড়ি খেল চিংড়ি চাষে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিসারি পড়ার সে কি ক্রেজ। 'কিছু না হলে তো চিংড়ি ফার্ম তো আছে। লোন নিয়ে বসে পড়া যাবে ব্যবসায়। তা না হলে নিদেনপক্ষে একটা চাকরি তো জুটবে..........'। পাড়ায় পাড়ায় হইহই করে বাগদার চাষ শুরু হল। লাভ, লাভ আরও লাভ। একটু জায়গাও বাকি থাকল না। দীঘা থেকে রসলপুর মোহনা পর্যন্ত যার যতটুকু জায়গা ছিল—যতটুকু সম্বল ছিল নিঃশেষে নিংড়ে দিয়ে শুরু করল বাগদা চাষ। এ যেন সুপার-লোটো। প্রতিদিন খেলা। খেললেই কোটিপতি। চিংড়ির খাবার নিয়ে বাজারে এল সি পি, ওয়াটারবেস, হিপাসিমারা, অবন্তী প্রভৃতি ৭ থেকে ৮টি আন্তর্জাতিক কোম্পানি। সরকার লোন দিল দুহাত তুলে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এল। সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কও লোন দিল যার যতটা দরকার। কারণ এতে তো কোনও ঝুঁকি নেই। এ বছর লোন তো পরের ছ'মাসে শোধ। আবার লোন। আবার.....। এত বাগদার মীন আসবে কোথা থেকে ? মীন সংগ্রহে নেমে পড়ল ছেলে, বুড়ো, বাচ্চা, বউ, বউমা।[২৩] মোহনা থেকে মহিষাদল ছাঁকনি জাল হাতে বাগদা মীন শিকারি। আসতে লাগল মীন। কিন্তু কত দেবে, চাহিদা তার থেকে অনেক অনেক বেশি। অন্ধ্র থেকে বিমানে করে নামল বাগদার চারা। এখানেও চারা তৈরি হতে শুরু হল হ্যাচারিতে। সব মিলিয়ে জমজমাট বর্তমান। আরও এক জমজমাট ভবিষ্যতের আশায়। আরও বেশি লাভের আশায় বাগদা মীনের ঘনত্ব বাড়ানো হল। স্টকিং, ডেনসিটি প্রতি বর্গমিটারে ১৫ থেকে ২০ যেখানে হবার কথা—
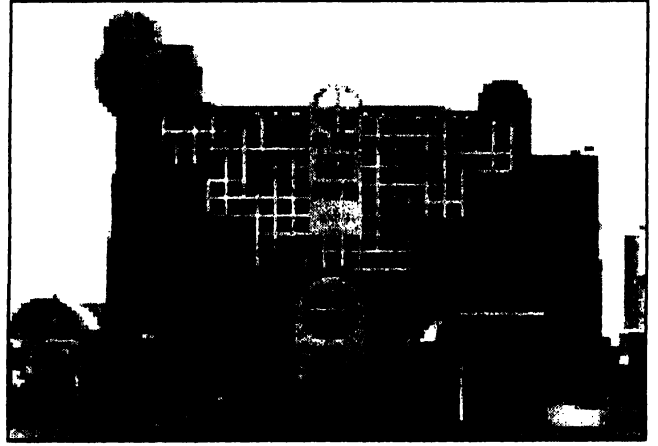
আই এফ বি অ্যাগ্রো

পরের চাষে হল ২৫ তারপর ৩০, তারপর ৪০-৪৫ পর্যন্ত বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল। লাভ লাভ আরও লাভ। বেপরোয়াভাবে লাভের আশায় বেপরোয়া চিংড়ির ঘনত্ব বাড়ানো হল। এক কথায় মেদিনীকে ধর্ষণ করতে থাকল—বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলো। টাকা লুটতে লাগল। মাটি, জল ও পরিবেশের মান, মর্যাদা, ইজ্জত সবই লুটতে লাগল। সব হারিয়ে মেদিনী-পরিবেশ-প্রকৃতি যখন দেউলিয়া ঠিক তখনই ঘুরে দাঁড়াল মেদিনীপুর। সালটা ১৯৯৫। প্রথমেই ছোবল। তারপর বুঝে উঠবার আগে আরও তীব্র ছোবল—আরও তীব্র—আরও তীব্র। ফোঁস সে করেনি। ১৯৯৫তেই ছোবলের পর ছোবলে ঢেলে দেওয়া তীব্র বিষে কয়েকদিনে কয়েক মাসে সর্বস্বান্ত করে দিল লক্ষপতি-কোটিপতিদের। লোভের জিভ বিষে পুড়ে ছারখার। লাটে উঠল বহুজাতিক কোম্পানি, যারা বড়ো কোম্পানি তারা লিজ নিয়েছিল বহু বড়ো বড়ো এলাকা। ক্ষতির পরিমাণ তাদের সবচেয়ে বেশি। ছোবল বসিয়েছিল কালান্তক বাগদার রোগ এম ই, এম ভি ভি বা হোয়াইট স্পট ডিজিজ বা সাদা ছোপ রোগ। ওই এক রোগেই ঘোড়া

একেবারেই মরল। অত্যধিক ঘনত্বে ভাইরাস এল। কেউ বলল বীজের মধ্য দিয়ে, কেউ বলল বিদেশি খাদ্যে। বিদেশি খাদ্য কোম্পানি বলল তারা নির্দোষ। অন্ধ্রের বাগদা মীন কোম্পানি প্রমাণ করবার চেষ্টা করল ওরাও নির্দোষ। তবে ভাইরাস এল কোথা থেকে ? পরস্পর দোষারোপের পালা। কেউ দোষ দেয় ভগবানের। কেউ দেয় আবহাওয়াকে। চাষিরা ভাগ্যকে। কেউ দেয় মেদিনীপুরের জলকে —। ওই জলে সংগৃহীত প্রাকৃতিক মীনের মাধ্যমে নাকি ভাইরাস এসেছে। মীনজীবীদের ভাতে টান পড়ল। দেশিয় মীন কেউ কিনল না। এদিকে রোগ তো সারে না। কেউ স্বীকার করতে চায় না—মানুষের গগনচুম্বী লোভই এই মারনব্যাধির জন্ম দিয়েছে। যাক্, সমস্ত ফার্ম শ্মশান হল। গমগমে নাট্যশালা নিস্তব্ধ শ্মশানপুরী। ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হল। বিদেশি দেশি মালিকেরা হাতগুটিয়ে ঘটিবাটি বেচে প্রাণ নিয়ে পালাল। সে এক মারাত্মক সকাল। সে সকাল রাতের চেয়েও অন্ধকার। অবশ্য সি পি কোং জানত এমনটা ঘটবেই। কারণ তার আগেই ১৯৯৩-তে থাইল্যান্ডে নিজের দেশে ওই একই কাণ্ড ঘটেছে। তবুও ব্যবসার খাতিরে নীরব ছিল সি পি কোম্পানি।

যে মারণবীজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে গেল বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলো সেগুলোই ঘুরেফিরে মড়ক ঘটায় যখন-তখন। আই এফ বি নতুন 'সিস্টেম ডেভেলপ' করবার চেষ্টা করে। ছোটো চাষিদের ১৯৯৬ খ্রিঃ আবার দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখায়। দীঘার পাশাপাশি চন্দনেশ্বরকেও সঙ্গে নিয়ে নতুন চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করে। ১৯৯৭-এ সাফল্য আসে, ওরা 'প্রো-বায়োটিক' নামের বিশেষ উপকারী ব্যাকটেরিয়া দিয়ে মাটির গুণাগুণ ঠিক করবার চেষ্টা করে। শুধু মাটি নয় খাবার, মাছ প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রো-বায়োটিক দেবার চেষ্টা করে। তার আগে আই এফ বি ব্লিচিং ব্যবহার করেছিল। তার সুফল এবং কুফল দুটোই ভোগ করতে হয়েছে মেদিনীপুরকে। ১৯৯৭-৯৮-এ বড়ো বড়ো ফার্ম বন্ধ হল একেবারেই। ২০০১-এ আবার নতুন করে বাগদার চাষ শুরু হয়েছে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েছে মানুষ। এবার আর সেই একই ভুল নয়। চিংড়ির ঘনত্ব আর বাড়ানো নয়। নির্দিষ্ট স্টকিং ডেনসিটি মেনে চলা হচ্ছে। একেবারেই বড়ো বড়ো প্লট নয়। ছোটো ছোটো প্লটে চাষ করা হচ্ছে। বড়ো বড়ো কোম্পানি নয়—স্থানীয় মানুষ চাষ করছেন। সমস্ত ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে মেদিনীপুর। ২০০৩ সালের মেদিনীপুর।

(খ) বাগদার জীবনচক্র

মেদিনীপুরে বাগদা চাষ পদ্ধতি জানতে গেলে বাগদা চিংড়ির জীবনচক্র সংক্ষেপে জেনে ফেলা দরকার। বাগদা আলালের ঘরের দুলাল। প্রজননকালে নিম্নলিখিতভাবে পুং ও স্ত্রী বাগদা চেনা যাবে।

বাগদা পুরুষ চিংড়ি প্রজননকালে শুক্রাণু বা স্পার্মাটোফোরকে স্ত্রী চিংড়ির থেলিকামের মধ্যে জমা করে রাখে। এর পর উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটে।[২০] এ ঘটনা ঘটে উপকূল থেকে দূরে। সমুদ্রের মধ্যে নিষেক হয়। ডিম ফুটে বাচ্চা। বাচ্চা সোনার চামচ মুখে করে জন্মায়। দিনে দিনে সাজ-পোশাক বদল করে। খোলস ছাড়ে। এক রূপ থেকে অন্য রূপ। প্রথমে নপলিয়াস দশা। ছয়বার ছয়টি দশা। তারপর তিনটি প্রোটোজুইয়া—তারপর আবার জামা বদল। মাইসিস দশা তিনটি। তারপর পোস্ট লার্ভা, জুভেনাইল তরুণ এবং পরিণত। পরিণত হবার আগে ২২বার খোলস ছাড়ে। রূপান্তর ঘটে ২২বার। সত্যি বড়োলোকের বাচ্চা বটে।[২১,২২,২৩,২৪]

(গ) পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়ির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য[২৫]

পুরুষ চিংড়ি	স্ত্রী চিংড়ি
১। পুরুষ চিংড়ির দ্বিতীয় জোড়া প্লিওপডে সরু কাঁটার মতো অ্যাপেন্ডিক্স ম্যাসকি উলনা থাকে।	১। স্ত্রী চিংড়ির দ্বিতীয় জোড়া প্লিওপডে অ্যাপেন্ডিক্স ম্যাসকিউলিনা থাকে না।
২। পুরুষ চিংড়ির প্রত্যেক পঞ্চম পদের গোড়ায় চাকতিসহ একটি করে মোট দুটি পুংজনন ছিদ্র বর্তমান।	২। স্ত্রী চিংড়ির প্রত্যেক তৃতীয় পদের গোড়ায় একটি করে মোট দুটি স্ত্রী জননছিদ্র বর্তমান।
৩। পুরুষ চিংড়ির দ্বিতীয় পদ বেশ শক্তিশালী এবং বহু কাঁটাযুক্ত।	৩। স্ত্রী চিংড়ির দ্বিতীয় পদ সাধারণভাবে গঠিত।
৪। পুরুষ চিংড়ির উদরদেশ সরু হয়ে থাকে।	৪। স্ত্রী চিংড়ির উদরদেশ বেশ প্রশস্ত থাকে।
৫। পুরুষ চিংড়ির পদগুলি কাছাকাছি থাকে।	৫। স্ত্রী চিংড়ির পদগুলি ব্যবধানে অবস্থিত।
৬। সাধারণত একই বয়সের পুরুষ চিংড়ি ও স্ত্রী চিংড়ির মধ্যে পুরুষ চিংড়ি আকারে বড়ো হয়ে থাকে।	৬। সাধারণত একই বয়সের স্ত্রী চিংড়ি ও পুরুষ চিংড়ির মধ্যে স্ত্রী চিংড়ি আকারে ছোটো হয়ে থাকে।
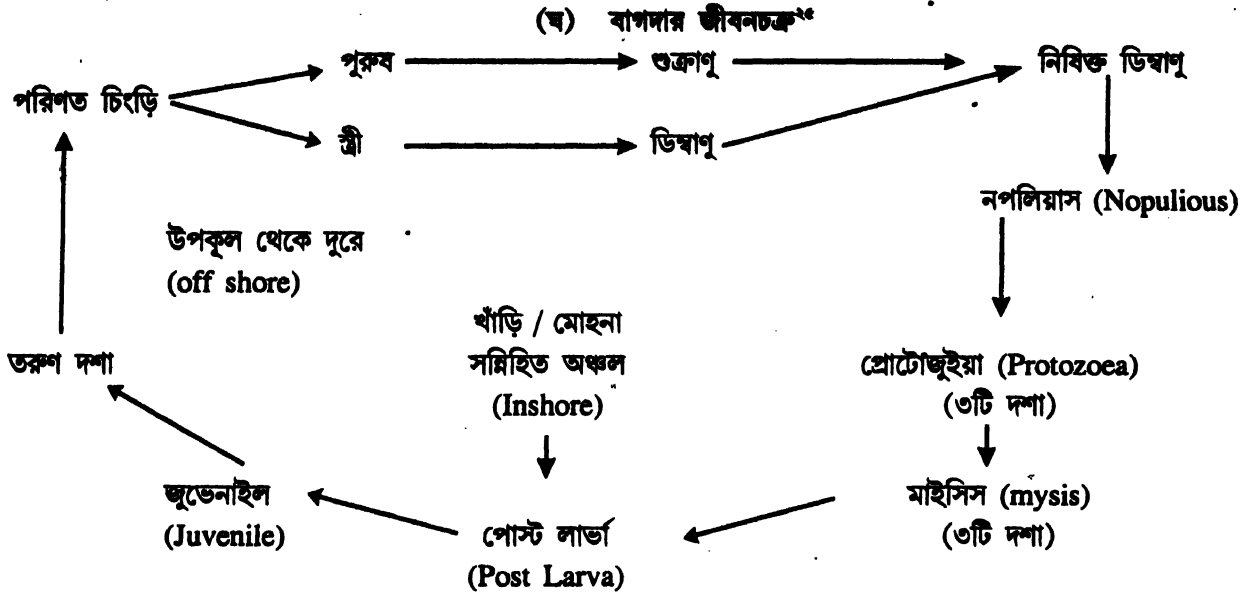
(ঙ) মেদিনীপুরে বাগদার চাষ পদ্ধতি[২৬, ২৭]

মেদিনীপুরে ১৯৯৩ থেকে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে চার পর্যায়ে চাষ হতে থাকে। চারটে পদ্ধতি নিম্নরূপ।

(১) ব্যাপক প্রথায় চাষ (Extensive culture)**ঃ** চিরায়ত পদ্ধতির তুলনায় এটি একটু উন্নত ধরনের।

নির্বাচিত প্রজাতির চারা পূর্ব-নির্ধারিত সংখ্যায় ছাড়া হয়। আগের থেকে সঠিকভাবে প্রস্তুত খামারে রাসায়নিক সার ও কৃত্রিম পরিপূরক খাদ্য একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ব্যবহার করা হয়। মাত্র ১০% জলের (খামার) পরিবর্তন করা হয়।

(২) প্রাক্-নিবিড় প্রথায় চাষ (Semi-intensive culture)**ঃ** হ্যাচারিতে পালিত লার্ভা—পরবর্তী দশা, নির্দিষ্ট সংখ্যায় খামারে মজুত করা হয় (হেক্টরপিছু ১-২ লক্ষ)। বায়ু-সঞ্চালক যন্ত্র দ্বারা জলে বায়ু প্রদান করা হয়। জোয়ারের জল প্রত্যহ ১০-১২ শতাংশ পরিমাণ পুকুরে প্রবেশ করানো হয়। উৎপাদনের হার ৫ টন পর্যন্ত, ফসলপিছু প্রতি হেক্টর।

(৩) নিবিড় প্রথায় চাষ (Intensive culture)**ঃ** হ্যাচারিতে পালিত লার্ভা—পরবর্তী দশা বা চারা পুকুরে অধিক সংখ্যায় মজুত করা হয়। জোয়ারের জল ঘন ঘন পরিবর্তন করতে হয়। জলের আবর্তন অবিরাম প্রয়োজন। বায়ুসঞ্চালক যন্ত্রের দ্বারা অতিরিক্ত বায়ু বাইরে থেকে প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হয়। পুরো চাষের সময় বাইরের পরিপূরক খাদ্য প্রয়োগ প্রয়োজন। উৎপাদনের হার প্রতি হেক্টরে ৫ টনের ওপর।

(৪) অধিকতর মাত্রায় নিবিড় প্রথায় চাষ (Super Intensive culture)**ঃ** হ্যাচারিতে পালিত লার্ভা পরবর্তী দশা বা চারা ব্যবহার করা হয় এবং অধিক পরিমাণে মজুত করা হয়। প্রত্যহ জল পরিবর্তন করতে হয়। যন্ত্রের সাহায্যে অবিরাম অক্সিজেন প্রদান করা হয়। বাইরে থেকে পরিপূরক খাদ্য পেলেট (Pellet) অর্থাৎ বড়ি হিসেবে দেওয়া হয়। এ পদ্ধতি ব্যবহার করার আগেই মেদিনীপুরে মড়ক লাগে বাগদার।

(চ) মেদিনীপুরে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাগদা চাষের বিভিন্ন পর্যায় ঃ

বিজ্ঞানসম্মতভাবে চিংড়ি চাষ পাঁচটি পর্যায়ে হয়।

(১) পুকুরের বা খামারের স্থান নির্বাচন ও নকশা তৈরি।
(২) পুকুর গঠন।
(৩) দ্রুত বৃদ্ধিহারসম্পন্ন চিংড়িদের নির্বাচনমূলক মজুতকরণ।
(৪) পরিপূরক খাদ্য প্রয়োগ ও জলের গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ।
(৫) আহরণ ও বিপণন।

(১) মেদিনীপুরে খামারের স্থান নির্বাচন

(ক) স্থান সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত ও জোয়ারের জলের উচ্চতা ঃ জোয়ারের জলের উচ্চতা অবশ্যই ১.৫ মিটারের কাছাকাছি থাকতে হবে। খামারের তলদেশ এমন হওয়া উচিত যাতে ভাটার সময় প্রয়োজন হলে সমস্ত খামার শুকিয়ে ফেলা যায়। আবার জোয়ারের সময় খামার জলপূর্ণ হয়। আদর্শ খামারের স্থান নির্বাচনের সময় লক্ষ রাখতে হবে যে স্থানটি যেন নদীর মুখ থেকে বেশ কিছুটা দূরে খাড়ি সন্নিহিত অঞ্চল হয় এবং জোয়ারের সময় জলে প্লাবিত হয়, ভাটায় অনাবৃত থাকে। খামারের তলদেশে যেন অসমান না হয় তাহলে জল নির্গমন ও চিংড়ি আহরণের কাজে অসুবিধা হবে।

(খ) মৃত্তিকা ঃ বালি ৫০-৬০%, পলি ১০-২০% ও কাদা ৩০-৪০% উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। জৈব পদার্থের প্রাচুর্যে পূর্ণ কর্দমাক্ত মৃত্তিকা তলদেশের শৈবাল উৎপাদনের

সহায়ক। এ ছাড়াও আরও কিছু সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক কণিকাও জন্মায়, যেগুলি অধিকাংশই নোনাজলের প্রাণীকুলের প্রধান খাদ্য। মাটির আদর্শ pH ৬.৫-৭.৫।

(গ) **জল :** চিংড়ির মীন ১০-৩৫ গ্রাম প্রতি লিটার লবণাক্ততায় বাঁচতে সক্ষম। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন পরিমাণ অন্তত ৩.৫ মিলিলিটার / লিটার থাকা উচিত, তার কম নয়।

(ঘ) **বৃষ্টিপাত :** মেদিনীপুরে যে সব অঞ্চলে সারা বছর ধরে বৃষ্টিপাত হয় এবং শুখা মরশুমের স্থায়িত্ব কম সেখানে সারা বছর ধরেই বাগদা চিংড়ি চাষ করা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে ছয় মাস চাষ হত।

(ঙ) **দূষণ :** খামার স্থাপনের নির্ধারিত স্থানে যেন কখনওই কোনও শিল্পজাত বা পয়ঃপ্রণালিবাহিত বর্জ্যদ্রব্য, কৃষিজাত কীটনাশক পদার্থ, চাষ ক্ষেত্রের জলে না পৌঁছায়। মেদিনীপুরে এমনটির উল্লেখ নেই।

(চ) **উদ্ভিদ ও প্রাণী :** খামার স্থাপনের পূর্বেই খামার সন্নিহিত অঞ্চলের সকল প্রকার শুণ্ডবীজী উদ্ভিদ মূলসহ পরিষ্কার করতে হত। সেই সঙ্গে চিংড়িভুক শিকারি ও ক্ষতিকারক প্রাণীদেরও ধ্বংস করতে হত।

আদর্শ খামার স্বচ্ছ জল চলছে এ্যারেটার বায়ুর কল

(ছ) **মীন প্রাপ্তিস্থান :** যদি প্রাকৃতিক উৎস থেকে মীন সংগ্রহ করে খামারে মজুত করতে হত, তাহলে নিকবর্তী মীন প্রাপ্তিস্থান সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

(জ) **চাহিদা :** বাজারের সুবিধা, খামার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রাপ্তির সুবিধা বা অন্যান্য ক্ষেত্রের সুবিধা, যেমন—রাস্তাঘাট, ইলেকট্রিসিটি ইত্যাদি আছে কি না দেখে নেওয়া হত।

(ঝ) **আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা :** বছরের বিভিন্ন সময়ে খামারে শ্রমিকের অপ্রতুলতা হবে কিনা, মজুরির হার কী রকম, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক পাওয়া যাবে কি না—এই সকল ব্যাপারে সুনিশ্চিত হয়ে খামার তৈরি হত।
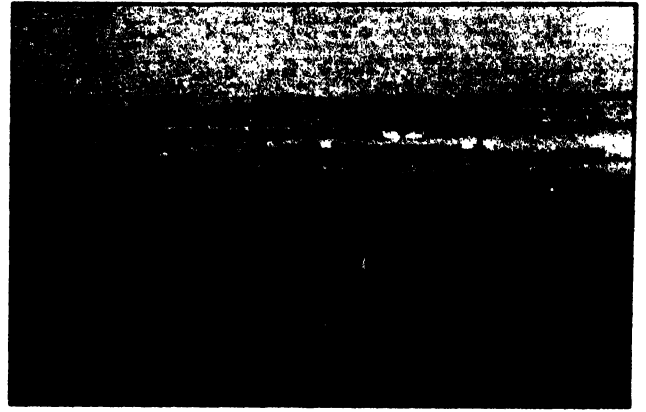
বড় মাপের এ্যারেটার খামার গড়তে খুব দরকার

(২) খামার গঠন ও পুকুর তৈরি :

খামার গঠন : নিম্নের ব্যবস্থাগুলো মেদিনীপুরে মেনে চলা হত।

(ক) একটি সুন্দরভাবে বিন্যস্ত ও পরিকল্পিত খামারে অবশ্যই আঁতুড় পুকুর, মজুত পুকুর, সরবরাহকারী নালা, নির্গমন নাবাল প্রভৃতি থাকবে। (খ) সমস্ত খামার খাঁড়ি / মোহনা নদী থেকে একটি সুগঠিত বাঁধ দ্বারা পৃথক থাকবে। (গ) বন্যার সর্বোচ্চ সৃষ্ট জলতল থেকে কমপক্ষে ১ মিটার বেশি উঁচু হবে প্রধান বাঁধ। (ঘ) সাধারণত বাঁধের উপরিতল ততটাই চওড়া হবে যতটা হবে বাঁধের উচ্চতা। (ঙ) বাঁধ তৈরির মাটিতে কোনও রকম উদ্ভিদের মূল বা কাণ্ডের অংশ থাকা উচিত নয়, কারণ পরবর্তীকালে ওইগুলিতে পচন ধরে বাঁধে ছিদ্রের সৃষ্টি করতে পারে।

চিংড়ি মীন মজুত করার জন্য পুকুর তৈরি :

(ক) আঁতুড় পুকুর হত অগভীর, ৫০-৬০ সেমি এবং আয়তন ৫০০ বর্গ মিটার।

(খ) মজুত পুকুর আয়তাকার হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যের অনুপাত ১ : ৪। আয়তন ১০,০০০ বর্গ মিটারের মতো এবং গভীরতা ১ মিটারের মতো।

(গ) মজুত পুকুরের বাঁধও যথেষ্ট চওড়া করা হয় যাতে জোয়ারের জলের সৃষ্ট চাপ সহ্য করতে পারে।

(ঘ) মজুত পুকুরের মাঝখানে কোনাকুনিভাবে ২৫ সেমি গভীর একটি খাল কেটে দিলে, সেটি প্রচণ্ড উষ্ণতার সময় আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করবে।

(ঙ) পুকুর প্রস্তুতির সময় লক্ষ রাখতে হবে যাতে পুকুরটি নির্গমন নালার দিকে ঢালু থাকে।

(চ) প্রধান সরবরাহকারী নালার তলদেশ যাতে পলি পড়ে অসমান না হয়, সেই কারণে তলদেশটি ইট-সিমেন্ট দিয়ে পাকা করে রাখলে পলি বাড়লে তা শুধু কোদাল-বেলচা দিয়ে পরিষ্কার করে ফেললেই পূর্বের ন্যায় নির্ধারিত তলদেশটি ফিরে পাওয়া যাবে।

(ছ) স্লুইস গেটটি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে অল্প সময়ের মধ্যেই খামারের জন্য প্রয়োজনীয় জল প্রবেশ করানো সম্ভব হবে।

মীন বা ডিমপোনা সংগ্রহ, সনাক্তকরণ, পৃথকীকরণ ও পরিবহন ঃ[২৮, ২৯, ৩০]

নোনাজলের চিংড়ি খামার গঠনের প্রথম ও প্রধান উপাদানই হল উপযুক্ত গুণসম্পন্ন নোনাজলের চিংড়ির মীন। মেদিনীপুরে যে সকল খাঁড়ি বা নদীর মোহনাতে নোনাজলে চাষোপযোগী চিংড়ির মীন পাওয়া যায় সেগুলি হল ঃ

স্থান	আহরণ সময়
(ক) উলুবেড়িয়া, নুরপুর, ডায়মন্ডহারবারের বিস্তৃত গঙ্গা	সর্বোচ্চ পরিমাণে— মে-জুন মাসে।
(খ) হলদিয়া-সাগর-কুলপি-কাকদ্বীপ বিস্তৃত গঙ্গা	সর্বোচ্চ পরিমাণে— এপ্রিল ও মে মাসে।
(গ) কাঁথি-দীঘা উপকূল বরাবর	সর্ব্বোচ্চ পরিমাণে— জানুয়ারি-আগস্ট মাসে।

চিংড়ির বীজ বা মীন সনাক্তকরণ প্রণালি ঃ

(ক) বাগদা ঃ ঘন বাদামি বা লাল দাগ দেখা যায় মীনের পেটের দিকের অর্থাৎ অঙ্কীয় অঞ্চলের সমস্ত দেহরেখা বরাবর। যে পাত্রে রাখা হয়, সেই পাত্রের ধার ঘেঁষে সোজা চলাচল করবে। কোনও স্থির বস্তুতে ধাক্কা খেলে কুঁচকে যাবে।
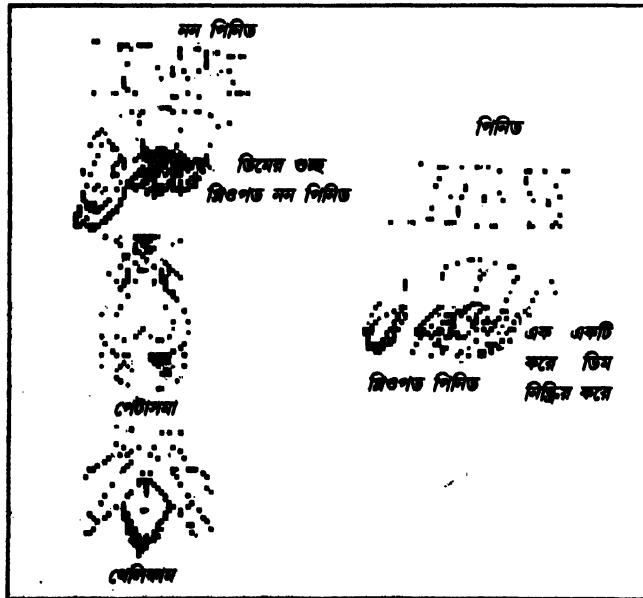
অপিনিড ও পিনিডের রেখাচিত্র

(খ) সাদা বা চাপড়া চিংড়ি ঃ দেখতে স্বচ্ছ সাদা হয়। করাতের ডগার দিকে দাঁতের রং লাল অথবা গোলাপি। সাঁতারের সময় দেহের মাঝবরাবর মাঝে মাঝে কুঁচকে যাবার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় উদরের অঙ্কীয় তলে ৫ থেকে ৭টি লালচে খয়েরি এবং হলুদ ছোপ দেখা যায়।

মেদিনীপুরে নোনা চিংড়ির বীজ পরিবহন

সাধারণত বীজ আহরণকারীরা মাটির বা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে বীজ পরিবহন করেন। এর ফলে অসংখ্য বীজ মরে যায়। বিজ্ঞানভিত্তিক পরিবহন ব্যবস্থার সাহায্যে এই মৃত্যুহার অনেকাংশেই কমানো যায়।

বিজ্ঞানভিত্তিক অক্সিজেন প্যাকিং

(ক) চিংড়ির মীনগুলিকে (প্রতি লিটার জলে ৬০০-২৫০০) ১০-১২ মিমি পলিথিন ব্যাগে রাখতে হবে।

(খ) এই পলিথিন ব্যাগের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ জলে পূর্ণ করে রাখতে হবে।

(গ) এরপর এই ব্যাগে অক্সিজেন প্রবেশ করাতে হবে।

মাটির আঁতুড় পুকুর[৩৪]

মেদিনীপুরে নীচের পদ্ধতিতে চাষ করা হয় ঃ

(১) সম্পূর্ণভাবে জল বের করে দিয়ে পুকুরটিকে সূর্যালোকে উন্মুক্ত রাখা হয়। (২) এরপর ওই জমিতে ২০০ কেজি/হেক্টর চুন প্রয়োগ করা হয়। (৩) উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৩৫০ কেজি/হেক্টর পোলট্রি সার (লিটার) প্রয়োগ করা হয়। (৪) সার প্রয়োগের পর স্লুইস গেট দিয়ে ৪-৫ সেমি জল ঢোকানো হয়। সাতদিন পর আবার ওইভাবে সমপরিমাণ জল প্রবেশ করিয়ে জলস্তর ১০-১৫ সেমি করা হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহে পুনরায় সমহারে সার প্রয়োগ করা হয় এবং জলস্তরটিকে ৩০-৪০ সেমি তোলা হয়। (৫) এরপর লার্ভা-পরবর্তী দশাগুলির পছন্দমতো খাদ্য (পেরিফাইটন) উৎপাদনের জন্য তালপাতা বা খেজুর পাতা ডুবিয়ে রাখা হয় যার ওপর খাদ্য জন্মায়। এই ধরনের আঁতুড় পুকুরে মজুতের হার ৩-৫ লক্ষ/হেক্টর। (৬) বাইরে থেকে অতিরিক্ত খাদ্য দেওয়া হয় চিংড়ি মীনের দেহের মোট ওজনের ৪০-৫০ ভাগ। এই খাদ্যটি আবার দুবারে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়।

আঁতুড় পুকুরের পরিচর্যা ঃ বড়ো মজুত পুকুরের লার্ভা-পরবর্তী দশাগুলিকে মজুত করার আগে কিছু প্রাথমিক পরিচর্যার প্রয়োজন। কারণ প্রাকৃতিক উৎস বা হ্যাচারি থেকে সংগৃহীত মীন বা লার্ভাগুলিকে সরাসরি মজুত পুকুরে ছাড়লে মৃত্যুর হার অনেক বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদনের হার কমে যায়। সেইজন্য মীনগুলিকে প্রথমে আঁতুড় পুকুরে রেখে তাদের পরিচর্যা করা হয়।

জলের পরিচর্যা ঃ পুকুরের জল আবদ্ধ থাকলে লার্ভাদের ওপর একটি অনিষ্টকর প্রভাব পড়ে। এই জন্য জোয়ারের জল মাঝে মাঝেই পরিবর্তন করা দরকার।

ধাতস্থ অর্থাৎ সহনশীল করে তোলা (Acclaimatization) ঃ আঁতুড় পুকুর থেকে মজুত পুকুরে স্থানান্তরিত করার

সময় লার্ভাগুলি যাতে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজিত হতে পারে সেই কারণে আঁতুড় পুকুরে জল ও মজুত পুকুরের জলের মধ্যে ধাপে ধাপে একটি সংমিশ্রণ দরকার।

মজুত পুকুর প্রস্তুতিকরণ ও তার পরিচালন ব্যবস্থা (Grow-out/stocking pond management):

পরিচালন ব্যবস্থা: মজুত চিংড়ি প্রজাতির দ্রুত বৃদ্ধি ও মৃত্যুহার হ্রাসের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রয়োজন। সেই কারণে পরবর্তী ব্যবস্থাগুলিকে গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য।

(১) **পুকুরের তলদেশ বিশুদ্ধীকরণ:** এই বিশুদ্ধীকরণের ফলে সৃষ্ট পুষ্টিকর খনিজ লবণগুলির সহায়তায় অধিকতর উদ্ভিদকণা উৎপন্ন হয়, উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে এই বিশুদ্ধীকরণ প্রক্রিয়া অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতিকারক পদার্থগুলির এবং হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের উৎপাদন হ্রাস করে।

(২) **মাটির অম্লতা নিয়ন্ত্রণ:** জল ও মাটির অম্লতা নিয়ন্ত্রণের জন্য চুন ব্যবহার করা হয়। চুন প্রয়োগের পরিমাণ পুকুরের তলদেশের মাটির অম্লতার ওপর নির্ভর করে।

(৩) **অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক প্রজাতির বিতাড়ন ও ধ্বংসীকরণ:** পুকুরের তলদেশ বিশুদ্ধীকরণই অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক প্রজাতিগুলির (মাছের ডিম / লার্ভা বা পরিণত দশা, বিভিন্ন পতঙ্গসমূহ ইত্যাদি) বিতাড়ন ও ধ্বংস করার সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় ও কম ব্যয়সাপেক্ষ।

কখনও কখনও পুকুরের জল সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে ফেলা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা ভালো ফল পাওয়া যায় .৫ সেমি গভীর প্রতি বর্গ মিটার জলের আয়তনের পাঁচ ভাগ পাথুরে চুন ও এক ভাগ অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করে।

আয়তন	চুন	গোবর সার	পোলট্রি লিটার	ইউরিয়া (অজৈব)	সুপার ফসফেট
১ হেক্টর	২০০ কেজি	৫০০০ কেজি	৫০০ কেজি	১০০ কেজি	১০০ কেজি

গোবর সার ও পোলট্রি লিটার এই দুটির মধ্যে যে কোনও একটি ব্যবহার করা উচিত।

পরবর্তী প্রয়োগ মাত্রা

আয়তন	জৈব সার (গোবর)	পোলট্রি লিটার	ইউরিয়া (অজৈব)	সুপার ফসফেট
১ হেক্টর	১৫০০ কেজি	২৫০ কেজি	২৫ কেজি	২৫ কেজি

জল পরিচর্যা: বিবিধ প্রকার সার প্রয়োগের পর স্লুইস গেট খুলে পুকুরে ৩০ সেমি উচ্চতা পর্যন্ত জল প্রবেশ করানো দরকার। এই অবস্থায় ১০ দিন রাখলে সবুজ শ্যাওলার সৃষ্টি হয়। এরপর পুনরায় একইভাবে জোয়ারের জলের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে মজুত পুকুরের জলস্তর ১ মিটার করা হয়। চিংড়ির উত্তর-লার্ভা মজুতকরণের পূর্বে জলের পুষ্টিগুণ পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

চাষ চলাকালীন জলের চিংড়ির ভৌত-রাসায়নিক চাহিদা[৩৫]**:**

(ক) **উচ্চতা:** চাষের পুরো সময়টা খামারে ০.৭৫-১ মিটার জল থাকা বাঞ্ছনীয়।

(খ) **ঘোলাটে ভাব:** ভাসমান কর্দম ও পলির জন্য জল যদি ঘোলাটে হয় তাহলে আলোক প্রবেশে বাধা পায়।

(গ) **উষ্ণতা:** উপযুক্ত ও উত্তম বৃদ্ধির জন্য ২৪° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা চিংড়ি খামারের পক্ষে আদর্শ।

(ঘ) **দ্রবীভূত অক্সিজেন:** দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা ৩-৫ মিলি/লিটারের কম হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

(ঙ) **লবণাক্ত:** চিংড়ি খামারের পক্ষে আদর্শ লবণাক্ততা হল ১৮-২৪ পিপিটি (মিলিগ্রাম/লিটার)।

(চ) **পি এইচ:** চিংড়ির ভালোভাবে বৃদ্ধির জন্য এর মাত্রা ৮.০-৮.৫-এর মতো থাকা উচিত। আদর্শ ৭.০-৮.৫।

(ছ) **নাইট্রোজেনঘটিত উপাদান:** নাইট্রেট—২০০ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার, বৃদ্ধির কোনও ক্ষতি করে না। নাইট্রেট—৬/৪ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার, বৃদ্ধিতে কোনও প্রভাব ফেলে না। অ্যামোনিয়া—০.৪৫ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার, বৃদ্ধিতে কোনও ক্ষতি হয় না।

(জ) **হাইড্রোজেন সালফাইড:** ঘনত্ব যদি ৪ মিলিগ্রাম/লিটার বা তার বেশি হয় তাহলে চিংড়ির মৃত্যু ঘটতে পারে।

(ঝ) **দ্রবীভূত পুষ্টিকর উপাদান:** উদ্ভিদকণা ও প্রাণী-কণাসমূহের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, ক্লোরাইড প্রভৃতি উপাদানগুলির প্রয়োজন।

চিংড়ির নির্বাচনমূলক মজুতকরণ

Penaues monodon (বাগদা) একক চাষের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে ৬০,০০০। মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে *P. monodon* প্রতি হেক্টর ৩০,০০০ এবং *P. indicus* (সাদা চিংড়ি) প্রতি হেক্টরে ২০,০০০।

মজুত মাছের সঠিক হিসেব রাখা: প্রতি পনেরো দিন অন্তর খ্যাপলা জাল ফেলে চিংড়ি ধরে তাদের মৃত্যুহার ও বৃদ্ধিহারের হিসেব রাখতে হয়।[৩৬]

Survival (জীবিতের সংখ্যা) = [{(TNOS ÷ NOT) ÷ AOCN } × TPA]

TNOS = খ্যাপলা জাল ফেলে মোট যতগুলি চিংড়ি ধরা হয়েছে।

NOT = খ্যাপলা জাল মোট কতবার ফেলা হয়েছিল।

AOCN = খ্যাপলা জালের আয়তন।

TPA = পুকুরের মোট আয়তন।

কৃত্রিম পরিপূরক খাদ্য প্রয়োগ

সাধারণত প্রথম দশদিন কোনও খাদ্য প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। এরপর নিম্নলিখিত হারে খাদ্য প্রয়োগ করা হয়।

(১) দশদিন পর প্রথম সপ্তাহে প্রতিদিন দেহের ওজনের ১০ শতাংশ।

(২) দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রতিদিন দেহের ওজনের ১৮ শতাংশ।

(৩) তৃতীয় সপ্তাহে প্রতিদিন দেহের ওজনের ১৬ শতাংশ।

এইভাবে খাদ্য প্রদান প্রতি সপ্তাহে ২ ভাগ করে কমতে কমতে যখন দেহের ওজনের ৫ শতাংশ পৌঁছাবে তখন আর কমানো হয় না।

কখন খাদ্য প্রয়োগ করা হবে : ব্যাপক (Extensive) প্রথায় চাষের ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার জন্য আবহাওয়া ও জোয়ারের জলের স্বাভাবিক খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় তখন খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

কেমনভাবে খাদ্য প্রয়োগ করা হবে : দশটি ফিডিং ট্রেতে করে সামান্য পরিমাণ খাদ্য (১০ শতাংশ মতো) পুকুরের মধ্যে চারদিকে সমদূরত্বে রাখতে হবে। এইভাবে ট্রেতে করে খাদ্য প্রয়োগের দুঘণ্টা পরে লক্ষ রাখতে হবে চিংড়ি কতটা পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করেছে।

কোথায় খাদ্য দিতে হবে : যেহেতু চিংড়ি খাদ্য গ্রহণের জন্য পাড় বা বাঁধের দিকে যায় সেইজন্য ফিডিং ট্রেগুলি বাঁধের কাছে রাখতে হবে, বাঁধের থেকে ৩ মিটার দূরে।

খাদ্যের হার ও পরিমাণ : চাষের প্রথম মাসে মোট চিংড়ির দেহের ওজনের ১০ শতাংশ, দ্বিতীয় মাসে ৪ শতাংশ, তৃতীয় মাসে ৫ শতাংশ ও চতুর্থ মাসে ৩ শতাংশ হারে।

এখানে মেদিনীপুরে কতকগুলি খাদ্য (পেলেট হিসেবে প্রদত্ত) ও তাদের উপাদানসমূহের উল্লেখ করা হল[৩৭]। যদিও চাষিরা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের খাবার কিনত, ওঁরা তেমনভাবে কিছুই জানতেন না।

ফর্মুলা—১

চালের কুঁড়ো	—	২০%
সয়াবিন পাউডার	—	২০%
মাছের গুঁড়ো	—	২০%
নারকেল শাঁস	—	১৭%
গমের আটা	—	২০%
অ্যাকোয়ামিক্স	—	২%
মাছের তেল	—	১%
মোট	—	১০০%

ফর্মুলা—২

কম মূল্যের মাছের গুঁড়ো	—	৪০%
ফিস্ মিল	—	১০%
চিংড়ির মাথা ও অবশিষ্টাংশ	—	৮%
সয়াবিন পাউডার	—	১৬%
চালের তুষ	—	১২%
চালের কুঁড়ো	—	১০%
ইপিল-ইপিল পাতা	—	৩.৩%
ভিটামিন B_{12}	—	০.৫%
ভিটামিন C	—	০.২%
মোট	—	১০০%

ফর্মুলা—৩

ফিস মিল	—	২৭%
সয়াবিন	—	১৫%
বাদাম খোল	—	৫%
নারকেল খোল	—	১০%
লিফ মোল (Leaf Mole)	—	৫%
ট্যাপিওকা	—	৮%
ঝিনুকের মাংস ও হাড়ের গুঁড়ো	—	১০%
তিলের খোল	—	৫%
ভুট্টা	—	৪%
চালের তুষ	—	১০%
ভিটামিন B_{12}	—	১%
মোট	—	১০০%

আহরণ

৩-৫ মাস পরিচর্যার পর চিংড়িগুলি বিক্রয়যোগ্য অবস্থায় এলে তখন আহরণের (Harvesting) ব্যবস্থা করা হয়।

চিংড়িগুলি দিনের বেলায় আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে পুকুরের তলদেশে কর্দম-বালির নীচে নিজেদের প্রোথিত করে রাখে। রাত্রে খাদ্যের সন্ধানে সক্রিয়ভাবে পুকুরে ঘুরে বেড়ায়। জলস্রোতে চিংড়িগুলি সক্রিয় হয় এবং স্বভাববশত আলোর দিকে আকৃষ্ট হয়। এই কারণে চিংড়ি আহরণের উপযুক্ত সময় হল রাত্রি এবং প্রত্যুষকালে। তিন থেকে পাঁচদিন ধরে টানা জাল ব্যবহার করে মজুত চিংড়ি প্রায় ৭০-৮০ ভাগ আহরণ করা সম্ভব হয়। বাঁধ থেকে পুকুরের জলে শক্তিশালী উজ্জ্বল আলো ফেলে এবং সেখানে খ্যাপলা জাল ব্যবহার করে খুব সহজেই ফলপ্রসূভাবে চিংড়ি আহরণ করা সম্ভব হয়। তবে যে কোনও পদ্ধতি বা পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা হোক না কেন, ৮০% এর বেশি আহরণ করা কোনওভাবেই সম্ভব হয় না। সম্পূর্ণ জল বের করে দিয়ে অবশিষ্টাংশ হাত দিয়ে আহরণ করতে হয়।

সংরক্ষণ

বরফ ছাড়াও দীর্ঘ সময় সংরক্ষণের জন্য (রপ্তানির ক্ষেত্রে যেটি অবশ্য প্রয়োজন) অন্য দুটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, যথা : (১) সামগ্রিক বিশুষ্কীকরণ (Total drying) এবং (২) অর্ধবিশুষ্কীকরণ (Semi-drying)।

(১) **সামগ্রিক বিশুষ্কীকরণ :** সমগ্র চিংড়িটিকে (খোলকসহ অথবা খোলকবিহীন) সূর্যের আলোয় বেশ কয়েকদিন ধরে ভালো করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। কোথাও কোথাও আবার শুকিয়ে নেওয়ার আগে চিংড়িগুলিকে জলে ভালো করে ফুটিয়ে নেওয়া হয়। খোলক থাকলে খোলকটি ছাড়িয়ে ফেলা হয়। পরিশেষে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সেগুলিকে পলিথিন থলিতে ভর্তি করা হয়।

(২) **অর্ধবিশুষ্কীকরণ :** এই পদ্ধতিতে চিংড়িগুলিকে ৬% সমুদ্রের জলে মিনিট দুয়েকের মতো ফুটিয়ে নেওয়া হয়। এরপর খোল ছাড়িয়ে সেগুলিকে সম্পৃক্ত লবণজলে আধঘণ্টার জন্য স্থানান্তরিত করা হয়। তারপর চিংড়িগুলিকে শুকিয়ে নেওয়া হয়।

মেদিনীপুরে বাগদা চিংড়ির রোগ ও তার প্রতিকার

রোগ ও লক্ষণ	রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু / অন্য কারণ	প্রতিকার
(১) **সাদা দাগঘটিত চিংড়ির রোগ :** ক্যারাপেসের উপর ০.৫-৩ মি.মি. ব্যাসের সাদা সাদা দাগ দেখা যায় পরে যা শরীরের অধিকাংশ স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।	হোয়াইট স্পট ব্যাকিউলো ভাইরাস	ভাইরাস রোগের সঠিক প্রতিকার এখনও জানা নেই। ফর্মালিন-৭০ পি পি এম হারে অথবা ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইটের-১ পি পি এম হারে প্রয়োগ কিছুটা কার্যকর।
(২) **চিংড়ির হলুদ মাথা ঘটিত রোগ :** চিংড়ির গা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। শিরোবক্ষ হলুদ হয়ে যায়। ফুলকা ও হেপাটোপ্যাংক্রিয়াসের রং ফ্যাকাসে হলুদ হয়ে যায়।	ইয়েলো হেড ভাইরাস	কোনও প্রতিকার নেই। উন্নত পরিচালন ব্যবস্থায় রোগের প্রকোপ এড়ানো সম্ভব।
(৩) **চিংড়ির লাল রোগ :** এই রোগে চিংড়ির সমস্ত শরীর লালবর্ণ ধারণ করে।	সঠিক কারণ জানা যায়নি। তবে ভিব্রিও জাতীয় ব্যাকটেরিয়াকে প্রধানত দায়ি করা হয়। খাদ্যের ছত্রাকঘটিত সংক্রমণও দায়ি।	উন্নতমানের খাদ্য পরিবেশ ও পরিবেশের উন্নতিসাধন অতি প্রয়োজনীয়।
(৪) **ভিব্রিওসিস :** এই রোগের লক্ষণগুলি হল পুকুরের ওপরে অলসভাবে চিংড়ির ভেসে বেড়ানো, পাড়ে চলে আসা, খাওয়ায় অনীহা, স্বাভাবিক রংয়ের পরিবর্তে লালচে হয়ে যাওয়া। অনেক সময় রাত্রে চিংড়ির শরীরে অথবা পুকুরের জল আন্দোলিত করলে আলোর বিচ্ছুরণ দেখা যায়।	ভিব্রিও জাতীয় ব্যাকটেরিয়া।	অক্সিটেট্রাসাইক্লিন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক ১.৫ গ্রাম প্রতি কেজি এরিথ্রোমাইসিন ০.৫-১.৩ পি পি এম হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ১০০০ লিটার জলে ১০-১৫ গ্রাম EDTA গুলে আক্রান্ত চিংড়িকে ১২ ঘণ্টা ধরে ডুবিয়ে রেখে পুকুরে ছাড়তে হবে।
(৫) **ব্যাকটেরিয়াঘটিত চিংড়ির রোগ :** (ক) খোলসের রোগ (খ) বাদামি অথবা কালো দাগঘটিত রোগ, (গ) উপাঙ্গক্ষয়ী রোগ।	ভিব্রিও, সিউডোমোনাস, এরোমোনাস, ফ্ল্যাভোব্যাকটেরিয়াম জাতীয় ব্যাকটেরিয়া।	
(৬) **চিংড়ির ফুলকাঘটিত রোগ :** ফুলকোয় কালো দাগ দেখা যায়।	ফিউজোরিয়াম জাতীয় ছত্রাক।	আগের মতো অ্যান্টিবায়োটিক যুক্ত খাবার দিতে হবে। প্রতি ১০০০ লিটার জলে গুলে আক্রান্ত চিংড়িকে ১ ঘণ্টা ডুবিয়ে রেখে পুকুরে ছাড়তে হবে। পরিবেশের উন্নতিসাধন করতে হবে।
(৭) **চিংড়ির শ্যাওলাপড়া রোগ :** এই রোগে আক্রান্ত চিংড়ির ফুলকা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও দেহখোলসের ওপর শ্যাওলার মতো আবরণ পড়ে। ফলে চিংড়ি শ্বাসকষ্ট ও চলাফেরায় অসুবিধা অনুভব করে।	ক্লাইনেট গোষ্ঠীর বহিঃপরজীবী যেমন—জুথাম নিয়াম, এপিস্টাইলিস, ভর্টিসেলা ইত্যাদি।	প্রতিকার আগের মতো।

রোগ ও লক্ষণ	রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু / অন্য কারণ	প্রতিকার
(৮) চিংড়ির কটন শ্রিম্প বা মিল্ক শ্রিম্প রোগ : এতে চিংড়ি সাদাটে হয়ে যায়।	মাইক্রোস্পোরিডিয়ান জাতীয় প্রোটোজোয়া যেমন আগমাসোমা প্লিস্টোফোরা।	১৫-২৫ পি পি এম হারে ফর্মালিন পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হবে। চায়ের বীজ থেকে প্রস্তুত খোল দিতে হবে কারণ এটা চিংড়ির খোলস ত্যাগে সাহায্য করে। আক্রান্ত চিংড়িকে তুলে ফেলাই জরুরি।

মেদিনীপুরে বাগদা চাষে সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের কারণ

উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা এবং মেদিনীপুর এই তিন জেলায় বাগদার চাষ হলেও ১৯৯৫ সালে কেবলমাত্র মেদিনীপুর একেবারে ভিখিরিতে পরিণত হয়েছিল, কারণ হোওয়াইট স্পট ডিজিজ। এখন প্রশ্ন, কেন শুধু মেদিনীপুর সর্বস্বান্ত হল ? উত্তর আগেই বলা হয়েছে। মানুষের অত্যধিক লোভ। তার ফলে বেশি স্টকিং ডেনসিটি। ১০টি বাগদা প্রতি বর্গ মিটারে যেখানে চাষ করার কথা সেখানে ৫০টি করলে যা হবার তাই হয়েছে। এ ছাড়াও বড়ো বড়ো ফার্মের সাধারণ সমস্যা বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে যা হয়ে থাকে—অর্থাৎ দুর্বল পরিচালন ব্যবস্থা। এর ফলে অস্বাস্থ্যকর জলীয় পরিবেশ, উপযুক্ত খাদ্য ও সারের অভাবই মেদিনীপুরে বাগদার বিপর্যয়ের কারণ। কিন্তু দুই চব্বিশ পরগনা বিপর্যয় এড়াতে পেরেছে তাদের শতাব্দী প্রাচীন ভেড়ি কালচার ধরে রেখে। ওখানেও বিপর্যয় হয়েছে। তবে ভেড়ি বা প্রথাগত চাষ থাকায় বিপর্যয় তেমন থাবা মারেনি।

●

**অস্বাস্থ্যকর জলীয় পরিবেশ,
উপযুক্ত খাদ্য ও সারের
অভাবই মেদিনীপুরে বাগদার বিপর্যয়ের কারণ।
কিন্তু দুই চব্বিশ পরগনা বিপর্যয়
এড়াতে পেরেছে তাদের শতাব্দী প্রাচীন ভেড়ি
কালচার ধরে রেখে। ওখানেও বিপর্যয়
হয়েছে। তবে ভেড়ি বা
প্রথাগত চাষ থাকায় বিপর্যয়
তেমন থাবা মারেনি।**

●

বর্তমান ২০০৩-এ মেদিনীপুরে বাগদা চাষের অবস্থা

এটা সত্যি ঘটনা যে

(ক) মেদিনীপুরেই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাগদার চাষ শুরু হয়।

(খ) মেদিনীপুর জেলাতেই প্রথম বিপর্যয় আসে—সর্বনাশ ঘটে বাগদা চাষের, পরিবেশের ও সাধারণ মানুষের। আবার এটাও সত্যি যে ২০০৩-এ আবার ধীরে ধীরে অতীত থেকে শিক্ষা নিচ্ছে মেদিনীপুর। আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। গত আট কিংবা দশ বছরের তুলনায় বর্তমানের মেদিনীপুরের প্রধান পার্থক্য চোখে পড়ার মতো।

(ক) বড়ো বড়ো প্লটে চাষ আর নয়, খুব ছোটো ছোটো প্লটে[৩৯]

- (১) ০.৫-১.৫ হেক্টর কেবল বাগদার ক্ষেত্রে।
- (২) ০.৫-১.৫ হেক্টর বাগদা ও পার্শে-ভাঙনের।
- (৩) ০.১-০.৫ হেক্টর বাগদার একক ক্ষেত্রে।
- (৪) ০.১-০.৫ হেক্টর বাগদার মিশ্র চাষে।

(খ) বড়ো কোম্পানি আর নয় কেবলমাত্র স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মধ্যমানের চাষিরাই চাষ করবে। এতে পরিচালন ব্যবস্থা ভালো থাকে। বৃহৎ ক্ষতি এড়ানো যায়।

(গ) অতিরিক্ত লোভ আর নয়। স্টকিং ডেনসিটি কমিয়ে ফেলা।

(ঘ) মৎস্য দপ্তরের কাছে নথিভুক্ত করানো এবং বীমা করা (যাতে প্রাকৃতিক বা অন্য বিপর্যয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়)।

মেদিনীপুরে চিংড়ি চাষে ব্যাপক অনুদান

চরমভাবে হতাশাব্যাঞ্জক এ ছবি, মেদিনীপুরে। একসময় বহু ব্যাঙ্ক-অনুদান ছিল। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই অনুদান শোধ করা হয়নি। যে পরিমাণ শোধ হয়েছে তা নগণ্য। তাই এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়া, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ইউ বি আই প্রভৃতি প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ফিসারির অনুদান থেকে।[৪০] তারপর গোদের ওপর বিষফোড়া চিংড়ির বিপর্যয়। বহু নামী নামী সংস্থার কোটি কোটি টাকা

অপরিশোধ্য থেকে গেছে। ব্যাঙ্ক-আমানতকারী সংস্থার কেবল ক্ষতি আর ক্ষতি। ওরা পথে বসেছে, যে ক্ষতি হয়েছে, যে অবিশ্বাস তা আজও সামলে ওঠা সম্ভব হয়নি।

ধরা যাক মহিষাদল ব্লকের কথা, যেখানে এক সময় সমস্ত ব্যাঙ্ক হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল লোন দেবার জন্য, আজ একটা ব্যাঙ্ক এক পয়সা লোন দেবে না। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বা সংস্থা হালে অনুদান দিতে সম্মত হয়েছে। তাও আবার ওই কো-অপারেটিভের সদস্য হলে এবং ওই এলাকার বাসিন্দা হলে। কারণ তবেই না কান ধরে পয়সা আদায় করা যাবে। সমগ্র মহিষাদল ব্লকে কেবলমাত্র অমৃতবেড়িয়া ও কেশবপুর জলপাই কো-অপারেটিভ দু-এক জনকে লোন দিচ্ছে। গলদা চিংড়ি সহ মিশ্র চাষের জন্য প্রতি শতক সর্বোচ্চ সরকারি অনুদান ১১,৮২৪.০০ (সাধারণ) ও ১৪,৭৮০.০০ তপশিলি।[৪০]

এত হতাশার মধ্যে আশার কথা শোনালেন পূর্ব মেদিনীপুরের সহমৎস্যঅধিকর্তা ডঃ সিদ্ধার্থ সরকার। ২০০৩-এর জুন মাসে এস বি আই, ইউ বি আই, পি এন বি, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, জেলা সভাধিপতি সকলে মিলে একটা বিশ্বাসের জায়গায় আসতে চেষ্টা করছেন। আপ্রাণ চেষ্টা চলছে হৃত গৌরব যাতে ফেরে ; আবার ব্যাঙ্ক অনুদান যাতে পাওয়া যায়। সরকারও চেষ্টা করছেন যাতে আরও ছাড়ের ব্যবস্থা করা যায়। একটা বিপর্যস্ত জেলাকে তুলে ধরার যথাসাধ্য চেষ্টা চলছেই সরকারি মহল থেকে। এর থেকে আশার কথা আর কী-ই বা আছে।

বাগদা চাষে মেদিনীপুরের সমস্যা

(১) মীনের অপ্রতুলতা

(২) যথেচ্ছ লাভের আশা

(৩) স্বাদু চাষের জমিকে বাগদা চাষে নিয়োজিত করা—এ এক আরও প্রকট ভয়ঙ্কর বিপদবার্তা। বেশি লাভের জন্য হেঁড়িয়া, বাজকুল, নন্দকুমার, কালীনগর এমনকী রামনগরের প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে নোনাজলের প্রাকৃতিক উৎস একেবারেই নেই, সেখানে ধানজমি নষ্ট করে, পুকুর তৈরি করে, ১-২ কিমি দীর্ঘ ডেলিভারি পাইপ বসিয়ে, খালের নোনাজল ঢুকিয়ে দিনের আলোয়[৪১] আইনকে কলা দেখিয়ে বাগদা চাষ শুরু হয়েছে। সরকারি মহলের অজানা নয়। খবর বাড়ছে দিনে দিনে। মানুষ কুড়ুল মারছে আবার। ধানের বা সবজির জমি নষ্ট তো হলই। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের খেতে নোনাজল লেগে মাটিও প্রায় বন্ধ্যার পথে। মানুষ তাৎক্ষণিক লাভের আশায় আবার ভুল করছে। সরকারের কাছে খবর থাকলেও নিরূপায়। লাইসেন্স ? ও সব কাগুজে ব্যাপার। সরকারি বাধা ? 'দিয়ে দেখুক না পুঁতে ফেলব আমাদের ফার্মেই'—এ রকমই মনোভাব চাষিদের। এ আবার এক আগুন নিয়ে খেলা !

(৪) ব্যাঙ্ক লোন না পাওয়া

(৫) বীমা না করা

(৬) প্রকৃত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এখনও সকলের মধ্যে না থাকা।

বাগদা চাষ ও মেদিনীপুরের মীন সংগ্রাহক

মেদিনীপুর জেলায় দীঘা থেকে হলদিয়া পর্যন্ত, আবার হলদিয়া থেকে রূপনারায়ণ হয়ে কাঁসাই শীলাবতী নদীর তীরে কত শত-সহস্র মীন সংগ্রাহক আছে তার হিসেব আজ পর্যন্ত কেউ রাখেনি। সত্যিকারের সার্ভে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় হলেও মেদিনীপুরে এ তথ্য একেবারেই নেই। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, বউ, বাচ্চা, যুবা সারা দিন রাত একবুক জলে জাল টানছেন। মীন ধরছেন। যাঁদের পরণে কাপড় জুটত না—তাঁরা সোনার গয়না পরছেন, হাতে বালা, নাকে নথ—ঠিকই। কিন্তু প্রাণও যাচ্ছে কুমিরের পেটে। আক্রান্ত হচ্ছেন দুরারোগ্য চর্মরোগে। সমুদ্রের জলের অতিরিক্ত ফসফরাসে মেয়েদের জননদ্বারে দুরারোগ্য চর্মরোগ ঘাঁটি গেড়ে বসছে। প্রজনন ক্ষমতা হারাচ্ছে মেয়েরা। এও দেখা গেছে—স্কুলে পরীক্ষা। মাস্টারমশাই আছেন। দুশোজন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে জনা পাঁচেক উপস্থিত। বাকি ৯৮ শতাংশ অনুপস্থিত। জানা গেল মীন ধরতে গেছে। গন (জোয়ার) চলছে যে। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। এর সঙ্গে আছে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়া, দীর্ঘদিন হাজারে হাজারে মীনজীবী নদীর পাড়ে হাঁটাচলার ফলে পাড়ের ক্ষয় হচ্ছে। আরও ভয়ঙ্কর কথা হল প্রয়োজনীয় চিংড়ির মীনের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অন্যান্য মাছের চারা, জীববৈচিত্র্যে ভরা আঁতুড় ঘরের সদস্য—শামুক, প্রোটোজোয়া, অঙ্গুরীমাল, কণ্টকত্বকী, সন্ধীপদীর প্রাণ যাচ্ছে। ওদের বাঁচিয়ে রাখা উচিত[৪৩]। দীর্ঘদিন চললে প্রকৃতি আবার প্রতিশোধ নেবেই নেবে।

এত ঘটনা সত্ত্বেও মেদিনীপুরের মীনজীবীরা সুখে নেই। দশ বছর আগে মীন সংগ্রাহকরা মীন ধরে নিজের জেলাতেই বেচত। দাম পেত ৬০-৭০ পয়সা। মড়ক লাগল। সন্দেহ হল মীন মারফত ভাইরাস আসছে। ওদের দ্বার বন্ধ হল নিজের জেলায়। এই সুযোগে কম দামে চব্বিশ পরগনা আর বাংলাদেশে চালান হল মীন। মীনের জন্য সংগ্রাহকরা জলে ডুবে ডুবে পেত মীনপিছু ১.৫০ টা থেকে ৭০ পয়সা। কিন্তু মাঝখান থেকে দালাল-ফড়েরা লাভের গুড় খেত। বাংলাদেশে বিকাত ৫-৬ টাকা প্রতি মীন। এপ্রিল-মে মাসে রূপনারায়ণে লক্ষ-নৌকার বহর দেখলে বোঝা যায় কত কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হয়ে যায়। সরকার কর পায় না। সংগ্রাহক দাম পায় না। জেলা মাছ পায় না। মাটি-মেদিনী শুধু কাঁদে আর আছড়ায়। তাও একরকম চলত বীজ সংগ্রাহকদের। ২০০২-২০০৩ সালে হঠাৎ করে চিত্র বদলে গেছে। মীনের দাম পড়ে গেছে, ৪০ পয়সায়ও চাহিদা নেই। কী হল হঠাৎ। দিশে উত্তর,

বাংলাদেশে আর মীন যাচ্ছে না। কেন ?—ইতিমধ্যে বাংলাদেশে অনেক অনেক সিড ফার্ম হয়ে গেছে। নিজেদের বীজ নিজেরাই তৈরি করছে। এখন প্রশ্ন, কী হবে ? মেদিনীপুরের মীন সংগ্রাহকদের অদূর ভবিষ্যৎ কী ? সরকার থেকে একটা উদ্যোগ নিয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, 'ওরা মীন সংগ্রহ ছেড়ে দিক। সরকার কিছু টাকা দেবে। বিনিময়ে অন্ধ্র থেকে আসা নপলিয়াসকে বেশ কিছুদিন বাড়িয়ে চাষিদের কাছে বিক্রি করুক। উভয়েরই লাভ'। না, এ প্রস্তাব কার্যকরি হয়নি। ভবিষ্যৎ ? বলবে সময়।

মেদিনীপুরে বাগদা চিংড়ির চাষ এবং পরিবেশ দূষণ[৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮]

উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাগদা-চিংড়ির চাষ বর্তমানে এক লোভনীয় লাভজনক ব্যবসা। ধনী শিল্পগোষ্ঠী এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলি কোটি কোটি টাকার রপ্তানি-বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। এর জন্য বেশি দামে কৃষিজমি কিনে নিচ্ছে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি। সেই সঙ্গে সংলগ্ন এলাকাগুলিতে তৈরি হচ্ছে জেটি, অফিস গুদাম, বরফকল ইত্যাদি। একদা—সবুজ কৃষিক্ষেত্রগুলি বর্তমানে বাগদা চাষের বড় বড়ো ফার্মে পরিণত হয়েছে। ফার্মের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এইভাবে চাষের জমি মৎস্য চাষের খামারে পরিণত হওয়ায় চাষের জমি বিনষ্ট হচ্ছে ও সঙ্গে সঙ্গে কৃষি উৎপাদনও হ্রাস পাচ্ছে।

সমুদ্র জল সংগৃহীত হয় সমুদ্র থেকে পাম্পের মাধ্যমে। স্বাদু জল নেওয়া হয় ভূগর্ভ থেকে নলকূপের মাধ্যমে। সাধারণত সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় স্বাদু জলের সমস্যা থাকেই। তার উপর অগভীর এবং গভীর নলকূপের মাধ্যমে মাটির নীচের জল চিংড়ি চাষের জন্য টেনে নেওয়ার ফলে ভূগর্ভের জলস্তরগুলি হয় শুকিয়ে যায় নয়তো জলের স্বাদ লবণাক্ত হয়ে যেতে থাকে। যার ফলে সংলগ্ন এলাকার পানীয় জলের এবং চাষের উপযুক্ত জলের সংকট দেখা দেয়। ওই পুকুরগুলিতে কৃত্রিম খাদ্য রাসায়নিক সার এবং প্রচুর অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। পুকুরের জল পরবর্তী চাষের উপযোগী না হলে, তাকে শোধন না করে সমস্ত জল পাশাপাশি জমিতে তুলে ফেলে দেওয়া হয় এবং আবার নতুন সমুদ্র জল এবং স্বাদু জল পুকুরে আনা হয়। এইভাবে সংলগ্ন ভূগর্ভে স্বাদু জলের ভাণ্ডার কমে গিয়ে লবণাক্ত জলের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই জলের সঙ্গে জমিতে মিশে যাচ্ছে নানান রাসায়নিক পদার্থ, অ্যান্টিবায়োটিক, জীবাণু এবং লবণ। জমিতে এবং সেখান থেকে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে এই দূষিত পদার্থ মিশে গিয়ে কলেরা, ম্যালেরিয়া, জনডিস এবং নানান রকম চোখের অসুখ দেখা দিচ্ছে।

বহুদিন ধরে এইভাবে কাজ চললে উর্বর কৃষিক্ষেত্রগুলি তাদের উর্বরতা হারায় এবং মরুভূমির মতো হয়ে পড়ে। ক্রমান্বয়ে বাগদা চাষের ফার্ম গজিয়ে ওঠার ফলে স্থানীয় দরিদ্র মৎস্যজীবীদের জীবিকা নিয়েও সমস্যা দেখা দেয়। সমুদ্র এবং নিকটবর্তী গ্রামগুলির মাঝখানে বাগদা ফার্মগুলি অবস্থিত হওয়ায় মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাতায়াতের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। আবার ফার্মের দূষিত জল অনেক সময় সরাসরি সমুদ্রে ফেলার জন্য সেই অঞ্চলে সামুদ্রিক মাছের আনাগোনা কমে যায় ফলে মৎস্যজীবীদের মাছ শিকারের পরিমাণও কমে যায়। সামগ্রিকভাবে এই দুই অসুবিধার ফলে মৎস্যজীবীদের রোজগার কমে যায়।

ব্যাপকভাবে বাগদা চাষের ফলে উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে পরিবেশের ভারসাম্য ভয়ংকরভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং তার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে জীবমণ্ডল এবং এর সুদূর-প্রসারী প্রতিক্রিয়াও মারাত্মক। ব্যাপক চিংড়ি চাষের ফলে উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে কৃষি উৎপাদনের হ্রাস, ভূমিক্ষয় ও জলদূষণের সঙ্গে সঙ্গে উপকূলবর্তী অরণ্য অঞ্চলেরও ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী এলাকায় বাগদা চাষের অঞ্চলগুলির সংলগ্ন গ্রামগুলির সুপারি, নারকেলের গাছগুলি মরে যাচ্ছে। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে।

উপকূল এলাকায় পরিবেশ রক্ষার জন্য ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ভরা-জোয়ার রেখার এক কিলোমিটারের মধ্যে পরিবেশ দূষণ সৃষ্টিকারী সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। এ পৃথিবীকে জীবের বাসযোগ্য রাখতে হলে আজ সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন পরিবেশ রক্ষার; যার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রতিটি মানুষের পরিবেশ-সচেতনতা।

বাগদা চাষ—মেদিনীপুরের কৃতিত্ব ও সম্ভাবনা

নেই নেই করেও উঠে দাঁড়াল মেদিনীপুর। শঙ্করপুরের মৎস্যবন্দর ১ ও ২ পর্যায় তৈরি হয়েছে।[৪৯] আগামী কয়েক বছরে পূর্ব মেদিনীপুরে আরও মৎস্যবন্দর ও মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র হবে।[৫০] পূর্ব মেদিনীপুরে বেনফিস ও এন সি ডি সি-র অর্থানুকূল্যে ৯,৬২,০৩,০০০ টাকা ব্যয়ে সামুদ্রিক মৎস্য
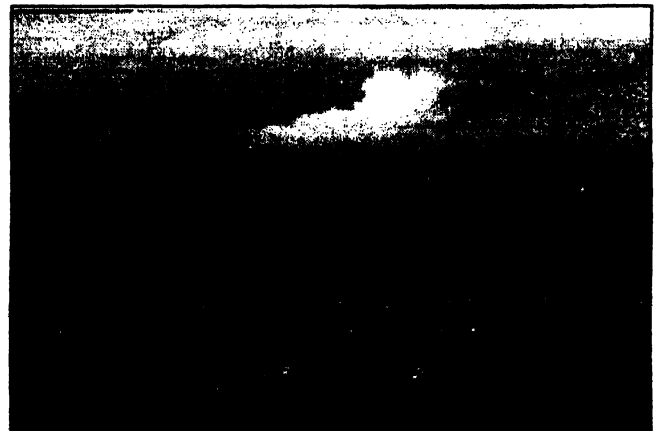
শংকরপুরের সমুদ্র

উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে।[৫১] পূর্ব মেদিনীপুরে দীঘা ও দাদানপাত্রবাড়ে বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থানুকূল্যে ৪৫১.৩৩ হেক্টর জলাশয়ে চিংড়ি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।[৫২]

পূর্ব মেদিনীপুরের বি এফ ডি এ কাজ শুরু করেছে। রাজ্যে ছোটো চিংড়ির উৎপাদন বাড়াতে বেনফিস নয়াচর (মীন) দ্বীপে এন সি ডি সি-র সহায়তায় সুসংহত নোনাজল প্রকল্প চালু করছে।[৫৩] এর জন্য ৩১৬টি জলাশয় খনন হয়েছে। জুনপুটে ফিশ টেকনোলজিক্যাল স্টেশন স্থাপিত হচ্ছে।[৫৪] শংকরপুরে জোয়ার, মৎস্যগন্ধা, কিনারা, দীঘায় মীনাক্ষী, মীনালয়, হলদিয়ায় মীনদ্বীপে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে যে সার্বিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে তাতে বাগদা চাষের পরোক্ষ লাভ তো আছেই।[৫৫]

মেদিনীপুরে মিষ্টিজলে চিংড়ি চাষ

জলে প্রাণ সঞ্চারের সূত্রপাতের কিছুটা পরেই কবচি বা ক্রাস্টাসিয়া শ্রেণীর আবির্ভাব। আর সেই সময় থেকেই চিংড়িরা এসেছে পৃথিবীতে। প্রায় ততটা সময় ধরেই মেদিনীপুর জেলাতে চিংড়ির বাস। বহু লক্ষ বছর পরে মানুষ এল, তখনও খাদ্য- খাদক সম্পর্ক হয়নি। তখনও চিংড়ি ডিম পাড়ে, বড়ো হয়, মারা যায়। পঞ্চাশ বছর আগেও কেউ ভাবেনি মিষ্টিজলে চিংড়ি মাছের চাষ করব, প্রতিপালন করব। বড়োজোর ধরব খাব-ব্যস ওই পর্যন্ত। চিংড়ি, জলের পোকা, ওকে চাষ করবার দরকার পড়ল, খাদ্যাভাবে কিংবা মূল্য বুঝে। কত প্রকার স্বাদু জলের চিংড়ি আছে তার খবরই বা কে রাখে ? মোটামুটি মেদিনীপুরে স্বাদু জলে অর্থাৎ পুকুর, ডোবা, খাল, বিল, ঝিল নদীতে যে প্রধান কয়েকপ্রকার চিংড়ি পাওয়া যায় তার নাম ঃ

Macrobrachium rosenbergi (গলদা)
M. rude
M. Idella
M. mirabilae
M. villosimanus
M. malcomsoni ইত্যাদি।

মেদিনীপুরে মিষ্টিজলের চিংড়ির নাম

বাগদাকে যেমনভাবে মেদিনীপুরের লোকেরা 'চিংড়া' বলে ঠিক তেমনই গলদার এক বিশেষ স্থানীয় নাম আছে—"কালিয়াখাড়ি"। এর রং কখনও কখনও ঘন নীল বা কালো রঙের হওয়ায় সম্ভবত এ রকম নাম। বাকি সমস্ত চিংড়ির বিশেষ স্থানীয় নাম যেমন নেই তেমনই আশ্চর্যের—বাংলা নামও নেই। সাধারণভাবে পুকুরের চিংড়ি নামেই পরিচিত। চিংড়ি চাষে আমরা কতটা পিছিয়ে আছি তার প্রমাণ বোধ হয় এই নামসচেতনতা থেকেই অনেকটা স্পষ্ট।

শনাক্তকরণ[৫৬]

নীচে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা গলদা চিংড়িকে শনাক্ত করা যায়।

(১) ব্র্যাঙ্কিওস্টিগেল কণ্টক অনুপস্থিত। হেপাটিক কণ্টক উপস্থিত।
(২) ক্যারাপেসের সম্মুখে একটি ঢেউ খেলানো দীর্ঘ রস্ট্রাম বা দাড়া আছে।
(৩) রস্ট্রামের মূলদেশে একটি উচ্চ চূড়া থাকে।
(৪) রস্ট্রামের রং হাল্কা গোলাপি।
(৫) রস্ট্রামের ওপরে এবং নীচে সারিবদ্ধ দাঁত আছে। ওপরে (পৃষ্ঠদেশে) দাঁতের সংখ্যা ১৩ এবং নীচে (অঙ্কদেশে) ১১।
(৬) শিরোবক্ষের পাঁচজোড়া উপাঙ্গের মধ্যে দ্বিতীয় জোড়াটি বৃহত্তম এবং শেষেরটি সাঁড়াশির মতো।
(৭) প্রতিটি উদরখণ্ডকের সন্ধিস্থলে পিঠের দিকে কালো রঙের দাগ দেখা যায়।
(৮) পরিণত পুরুষ চিংড়ি স্ত্রী চিংড়ির তুলনায় বেশ বড়ো।
(৯) পুং চিংড়ির দ্বিতীয় গমন উপাঙ্গজোড়া তুলনামূলকভাবে বড়ো ও মোটা।
(১০) পুং চিংড়ির উদরদেশ স্ত্রী চিংড়ির তুলনায় সরু।
(১১) পুং চিংড়ির জননছিদ্রটি পঞ্চম পদের গোড়ায় থাকে। স্ত্রী চিংড়ির জননছিদ্রটি তৃতীয় পদের গোড়ায় অবস্থিত।
(১২) অন্যান্য প্রজাতির তুলনায় এরা আকারে বেশ বড়ো হয় (৩০-৩২ সেমি পর্যন্ত)।
(১৩) টেলসনের অগ্রভাগটি দীর্ঘ পশ্চাদবর্তী কণ্টকটির অগ্রভাগ অতিক্রম করে প্রসারিত।

স্বভাব, খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস[৫৭]

এরা জলের তলদেশের সন্নিকটে বিচরণ করে এবং সেখানে বিশ্রাম করে। এরা রাত্রিকালেই বেশি সক্রিয় থাকে এবং সেই সময় খাদ্যগ্রহণ করে। তীব্র আলোক সহ্য করতে পারে না। গলদা চিংড়ি সর্বভুক। জীবিত প্রাণী, উদ্ভিদ ও মৃত জৈব বস্তু—সবকিছুই এরা খাদ্যবস্তু হিসেবে গ্রহণ করে। জু-প্ল্যাঙ্কটন এবং ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনও এদের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ পতঙ্গ, বিভিন্ন প্রকার ক্রাস্টেসিয়া, গেঁড়ি-গুগলি, পলিকিট প্রাণী, শৈবাল, ডায়াটম, সামুদ্রিক আগাছার মতো উদ্ভিদাংশ এদের প্রিয় খাদ্য। প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত হলে এরা স্বজাতিভুকও হয়ে যেতে পারে। এরা অ্যান্টেনার সাহায্যে খাদ্যবস্তুর অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন হয়। ম্যান্ডিবিলিপেড এই খাদ্যবস্তুগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত করে চোয়ালে স্থানান্তরিত করে। চোয়াল খণ্ডীকৃত খাদ্যবস্তুকে আরও ক্ষুদ্রাংশে বিভাজিত করে খাদ্যনালীতে পৌঁছে দেয়। প্রজনন ঋতুতে গলদা

চিংড়ি ঈষৎ নোনাজলে পরিযান করে এবং সেখানে ডিম পাড়ে। উত্তর-লার্ভদশাগুলি পুনরায় স্বাদু জলে অথবা কম লবণাক্ত জলে ফিরে আসে। পুরুষ ও স্ত্রী গলদার পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ

পুরুষ গলদা	স্ত্রী গলদা
(১) সমবয়সী চিংড়ি আকারে বড়ো।	(১) আকারে ছোটো।
(২) নিম্নোদর বা পেট সরু।	(২) চওড়া এবং খোলসযুক্ত।
(৩) ভ্রমণপদগুলি কাছাকাছি থাকে।	(৩) সামান্য দূরে অবস্থান করে।
(৪) শিরোবক্ষ চওড়া ও বড়ো।	(৪) শিরোবক্ষ সরু ও ছোটো।
(৫) ২য় ভ্রমণপদ বড়ো, দাঁড়া-বিশিষ্ট। সাঁড়াশি অংশ উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ রোমশ এবং কাঁটাযুক্ত।	(৫) ছোট, সরু ও কাঁটাবিহীন।
(৬) পুংজনন কেন্দ্র ৫ নং ভ্রমণপদের গোড়াতে অবস্থিত।	(৬) স্ত্রীজনন কেন্দ্র ৩ নং ভ্রমণপদের মধ্যে অবস্থিত।

গলদা চিংড়ির জীবনচক্র[৫৮, ৫৯]

একটি পরিণত স্ত্রী চিংড়িতে তার ক্যারাপেসের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত একগুচ্ছ ডিম সহ গোলাপি রঙের ডিম্বাশয়টি দেখা যায়। উদরখণ্ডকের প্লুরাগুলি বাইরের দিকে প্রসারিত হয়ে ডিমগুলিকে ধারণ করার জন্য খানিকটা জায়গা তৈরি করে। এই স্থানটিকে 'ব্রুড পাউচ' বলে। একই উদ্দেশ্যে প্রথম চারজোড়া প্লিওপডের মূলদেশের ভেতরের দিকে 'ওভিজেরাস সিটির' উদ্ভব ঘটে। যৌন মিলনের ঠিক আগেই স্ত্রী চিংড়িটি খোলস ত্যাগ করে। এটিকে প্রাক্-মিলন খোলস ত্যাগ বা নির্মোচন বলে। এরপর পরিণত পুং চিংড়িটি তার অঙ্কদেশ স্ত্রী চিংড়িটির অঙ্গদেশের ওপরে স্থাপন করে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ
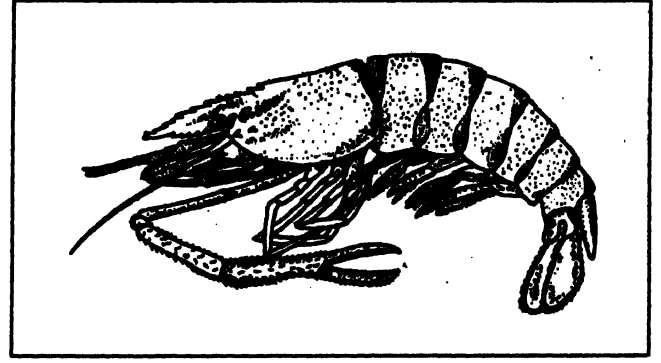
মিষ্টি জলের রাজা গলদা

হয়। পুং চিংড়িটির বক্ষদেশে পদউপাঙ্গগুলির মধ্যস্থানে একটি আঠালো পিণ্ড হিসেবে শুক্র নিঃসরণ করে। মিলনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্ত্রী চিংড়ি ডিম নিঃসরণ করে। ডিমগুলি সংলগ্ন শুক্রে অবস্থিত শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত ডিমগুলি ব্রুড পাউচে স্থানান্তরিত হয়। ডিম থেকে লার্ভা নির্গত হতে ২৬° থেকে ২৮° সেঃ উষ্ণতায় ১৮-২৩ দিন সময় লাগে। বছরে তিন চারবার একটি চিংড়ির প্রজনন হতে পারে।

চাষ পদ্ধতি

স্থান নির্বাচন ঃ

স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে নীচের বিষয়গুলি মেদিনীপুরে বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়।

(১) নিকটবর্তী জলের উৎস থেকে উচ্চমানের দূষণমুক্ত টাটকা জল প্রাপ্তির সুবিধা থাকা অবশ্য প্রয়োজন।

(২) বাঞ্ছনীয়—জলের পি এইচ ৭.১-৮.৪ ; উষ্ণতা ২৫°সি.-৩০°সি ; দ্রবীভূত অক্সিজেন ৪.৮-৫.২ মিগ্রা/লিটার।

(৩) পুকুরের মাটি, বেলে-দোআঁশ প্রকৃতির হলে ভালো।

(৪) অঞ্চলটি সর্বদা জলমগ্ন থাকলে বালিমাটি অথবা নুড়ি এবং বালির মিশ্রণ ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত।

(৫) পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

পুকুর গঠন

(১) কৃত্রিম জলাধারের বদলে মাটির পুকুরই ব্যবহার করা হয়।

(২) পরিচালনার সুবিধার জন্য পুকুরের আয়তন ছোটো হওয়া দরকার (.৫-.৮ হেক্টর)।

(৩) পুকুরটি আয়তাকার হওয়া উচিত এবং জল প্রবেশ-নির্গমনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(৪) সম্পূর্ণ জল নিকাশের জন্য পুকুরের তলদেশ বাঁধের দিক থেকে নির্গমন মুখের দিকে ঢালু রাখা দরকার। ঢালের অনুপাত ৩ : ১ হওয়া উচিত।

(৫) বাঁধটি মজবুত করে গঠন করা উচিত।

(৬) জল নিকাশের জন্য প্রবেশ মুখ থেকে নির্গমন মুখ থেকে কোনাকুনিভাবে প্রায় ৫ মিটার চওড়া ৩৩০ সেমি গভীর একটি খাল কাটা প্রয়োজন।

(৭) চাষের আগে পুকুরটিকে সম্পূর্ণ জলশূন্য করে তলদেশ শুষ্ক করে ফেলতে হবে। এই অবস্থায় পুকুরটিকে সাতদিনের মতো ফেলে রাখতে হবে। ফলে শিকারিজীবী ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত প্রাণীর মৃত্যু ঘটবে।

(৮) মাটির গর্তের মধ্যে যে সকল প্রাণী বাস করে, যেমন—কাঁকড়া, কয়েক প্রকার কম্বোজ প্রাণী ইত্যাদি। এরা তলদেশ শুষ্কীকরণের ফলে মরে না। এদেরকে মেরে ফেলার জন্য মহুয়া খোল পরিমাণমতো ব্যবহার করা হয়।

(৯) জলের ভৌত-রাসায়নিক এককগুলিও একটি নির্দিষ্ট সহনশীল মাত্রার মধ্যে রাখা হয়।

(ক) উষ্ণতা ঃ ২২-৩৫° সি.

(খ) দ্রবীভূত অক্সিজেন ঃ ৪-৭ পি পি এম।

(গ) খরতা ঃ ২০-২০০ পি পি এম (ক্যালসিয়াম-কার্বনেট)

(ঘ) পি এইচ—৭.০-৮.০

(ঙ) শৈবাল উৎপাদনের প্রতি নজর রাখতে হবে।

(চ) সর্বাধিক অ-আয়নিত অ্যামোনিয়ার সহনশীলতার মাত্রা ০.১ পি পি এম অ্যামোনিয়া-নাইট্রোজেন।

(ছ) নাইট্রাইট ০.১ পি পি এম-এর অধিক বাঞ্ছনীয় নয়।

(জ) হাইড্রোজেন সালফাইডের বিষময়তা চিংড়িদের ক্ষতি করে।

(ঝ) রাসায়নিক ও নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ অধঃক্ষেপণের ফলে ফুলকা গহ্বরটি কালো হয়ে যায়।

সার প্রয়োগ

পুকুরের উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। জৈব সার হিসেবে গোবর ও মুরগি-খামারের বর্জ্য পদার্থ ব্যবহার করা হয় ৪০০-৬০০ কেজি/হেক্টর এবং ২০০-৩০০ কেজি/হেক্টর যথাক্রমে। অজৈব সার হিসেবে ইউরিয়া ও সুপারফসফেট যথাক্রমে ২০-২৫ কেজি/হেক্টর এবং ৫০-৬০ কেজি/হেক্টর ব্যবহার করা হয়। সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিনের মধ্যেই প্রচুর প্ল্যাঙ্কটন উৎপন্ন হয়।

এই সময় কিছু খেজুর বা নারকেল গাছের পাতা জলের নীচে ডুবিয়ে দিতে হয়। এগুলি চিংড়ির খাদ্য শৈবাল উৎপাদনের সহায়ক হয়। এছাড়াও নাইলনের জাল, রাবারের টায়ার, কাঠের ফ্রেম, প্লাস্টিক পাইপের টুকরো জলের তলদেশে রেখে দেওয়া হয় যাতে খোলস ছাড়ার সময় চিংড়িরা আশ্রয় নিতে পারে।

মেদিনীপুরে গলদা চিংড়ির বীজ সংগ্রহ

বৈজ্ঞানিক প্রথায় চিংড়ি চাষ শুরু হওয়ার পূর্বে প্রাকৃতিক উৎস থেকেই বীজ সংগ্রহ করা হত। এই প্রথা অবশ্য এখনও সম্পূর্ণ বর্জিত হয়নি। বর্তমানে হ্যাচারি থেকেই সুস্থ সবল চারাগুলি সংগ্রহ করে আঁতুড় পুকুরে মজুত করা হয়।

মেদিনীপুরের পূর্বাঞ্চলে—ভগবানপুর থানার কেলেঘাই নদীর পাড়ে গুড়গ্রাম, বুড়াবাড়ি, যদুপুর, উত্তরবাড়, সারেঙ্গাপুর, বেদিয়া, মোবারকপুর, পড়িয়ালচক, ঠেউদি ইত্যাদি স্থানে মে থেকে জুন মাসের মধ্যে ২ সেন্টিমিটার আকারের এবং জুলাই থেকে অক্টোবরের মধ্যে ৪-৬ সেন্টিমিটার আকারে গলদার চারা পাওয়া যায়।

বড় এ্যারেটার, অক্সিজেন বাড়াবার আজব কল

কাঁথি মহকুমায়—পটাশপুর থানার বড়চক খালের ধারে কাশিমপুর, বাগুই আড়ি, প্রতাপদিঘি, খড়ি পাটুয়া, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে রসলপুর নদীর পাড়ে খেজুরিতে, কালীনগর নদীর ধারে কালীনগরে একই সময়ে একই আকারের চারা পাওয়া যায়।

মেদিনীপুরের উত্তরে ঘাটাল মহকুমাতে — শিলাবতী নদীর ধারে ঘাটাল ; দাশপুর থানায় মুর্শিনগর, সীতাকুণ্ডু, রঘুনাথপুর, নিমতলা ঘাট, পঞ্চাননতলা প্রভৃতি স্থানে মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে ২.৪ সেন্টিমিটার লম্বা চারা পাওয়া যায়।

মেদিনীপুরের মধ্যভাগে ও পশ্চিমদিকে সদর দক্ষিণ মহকুমা কেলেঘাই নদীর পাড়ে সবং, ময়না এবং নারায়ণগড়ে ; সুবর্ণরেখা নদীর পাড়ে দাঁতনে ভালো পরিমাণে জুলাই থেকে অক্টোবরের মধ্যে ৪-৮ সেন্টিমিটার গলদার চারা পাওয়া যায়।

এ ছাড়াও দীঘাতে সরকারি ও বেসরকারি কয়েকটি হ্যাচারিতে গলদার ছোটো চারা পোনা তৈরির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

চারা শনাক্তকরণ

(১) চারাগুলি আকারে ১৮-৯০ মিমি হয়, অন্যান্য প্রজাতির তুলনায় লম্বা ও সরু হয়।

(২) গলদার চারার উপাঙ্গগুলি অন্যান্য প্রজাতির চারাগুলির থেকে বড়ো ও শক্তিশালী হয়।

(৩) শিরোবক্ষের ওপর কতকগুলি লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত কালো রেখা দেখা যায়। ছোটো অবস্থায় রেখার সংখ্যা এক হতে পারে, বড়ো হলে ৫-৯।

(৪) বড়ো হয়ে গেলে (৯০ মিমি বেশি) এই রেখাগুলি ক্রমেই মিলিয়ে যায় এবং প্রতিটি উদরখণ্ডকের সংযোগস্থলে একটি কালো বেল্টের ন্যায় অবিছিন্ন দাগের উদয় হয়। এই দাগগুলি স্থায়ী হয়।

(৫) শিরোবক্ষের সামনে একটি লম্বা রস্ট্রাম থাকে। রস্ট্রামের গোড়ার ওপরের দিকটি উঁচু হয়।

(৬) রস্ট্রামের ওপরে (৯-১৩) এবং নীচে (৮-৯) দাঁত থাকে।

আঁতুড় পুকুর

বর্তমানে অনেকেই চারাগুলিকে হ্যাচারি থেকে সরাসরি মজুত পুকুরে স্থানান্তরিত করেন।

(১) চারাগুলিকে (উত্তর-লার্ভা) আঁতুড় পুকুরে, মজুতু পুকুরের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় মজুত করা যায়। আঁতুড় পুকুরে মৃত্যুর হার যেখানে ৩০ শতাংশ সেখানে মজুত পুকুরের মৃত্যুর হার ৫০ শতাংশ।

(২) উত্তর-দশা লার্ভাগুলিকে শনাক্ত করে কোনগুলি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী আর কোনগুলি নয় এই নির্বাচন সম্ভব হয় না। জুভেনাইল অর্থাৎ তরুণ দশাগুলির ক্ষেত্রে এটি সম্ভব। সুতরাং মজুত পুকুরে স্থানান্তরিত করার আগে অনভিপ্রেত জুভেনাইলগুলিকে আলাদা করা সম্ভব।

(৩) আঁতুড় পুকুর মজুত পুকুরের তুলনায় আয়তনে ছোটো, ১০০-৫০০ বর্গ মিটার এবং ১ মিটার গভীর হয়। স্বল্প কর্দমাক্ত মাটি এই পুকুরের পক্ষে উপযুক্ত।

(৪) পুরনো পুকুরে জল প্রবেশ করানোর আগে আগাছা ও শিকারি প্রাণী সমূলে বিনষ্ট করা হয়। প্রতি হেক্টরে ৫০০-৭০০ কিগ্রা মহুয়া খোল প্রয়োগ করে এই ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা হয়। খাদ্য উৎপাদনের জন্য জৈব সার গোবর হেক্টর প্রতি ২৫০০-৫০০০ কিগ্রা প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এর সঙ্গে ১৫০-২০০ কিগ্রা সুপার ফসফেটও ব্যবহার করা হয়।

(৫) জলের ভৌত-রাসায়নিক গুণমান :
(ক) উষ্ণতা : ২৮°-৩১° সি., (খ) লবণাক্ততার তারতম্য অনেক বেশি সহ্য করতে পারে—১০ পি পি টি-তেও কোন অসুবিধে হয় না, (গ) আদর্শ পি এইচ ৭-৮.৬, অপেক্ষাকৃত অধিক পি এইচ-এও তেমন অসুবিধা বোধ করে না। (ঘ) অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেনের আধিক্য হলেও জুভেনাইলদের সহনশীলতা লক্ষ করা যায়, (ঙ) সর্বোত্তম জলের খরতা ২০-২০০ পি পি এম।

মজুত পুকুর

৩৫-৪৫ মিমি আকারের পোস্ট লার্ভাগুলিকে আঁতুড় পুকুর থেকে মজুত পুকুরে স্থানান্তরিত করা হয়। নিয়মিত জল পরিবর্তন, বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা থাকলে হেক্টর প্রতি ৫০০০০ পোস্ট-লার্ভা ৫-৭ মাসের জন্য মজুত করা যায়।

পরিচালন ব্যবস্থা

(১) পনেরো দিন অন্তর নিয়মিতভাবে জল পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে জলের নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

(২) বাঁধের ক্ষয় হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখা হয়।

(৩) পুকুরে অত্যধিক আগাছা ও ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু সংখ্যায় গ্রাস কার্প ও সিলভার কার্প পালন করা হয়।

(৪) বায়ু সঞ্চালক যন্ত্রের সাহায্যে অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয়। অক্সিজেন ঘাটতি যেহেতু রাত্রিবেলা বেশি থাকে সেই কারণে যান্ত্রিক ব্যবস্থাটি রাত্রিবেলাতেই বেশি সক্রিয় থাকে।

(৫) মেদিনীপুরে বিশেষভাবে গলদার সঙ্গে কাতলা মাছের চাষ করা হচ্ছে। এর ফলে উপরিতলের খাদ্যকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা যায় এবং মাছের মড়ক লাগলে অর্থনৈতিক ক্ষতি সেই পরিমাণ হয় না।

খাদ্য প্রয়োগ

গলদার পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বহু গবেষণা হয়েছে। এই প্রজাতিটি যে সর্বভুক, এনজাইম গবেষণায় সেটি প্রমাণিত হয়েছে। এই সর্বভুক চিংড়িটি সাধারণত জলের পতঙ্গ ও লার্ভা, শৈবাল, বাদাম জাতীয় খাদ্য, শস্য দানা, বীজ, বিভিন্ন প্রকার ফল, ক্ষুদ্র ক্রাস্টেসিয়া জাতীয় প্রাণী, মাছ-মাংস, উচ্ছিষ্ট দ্রব্য, অন্যান্য প্রাণী খাদ্য ভক্ষণ করে। এগুলি সবই প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও প্রয়োজনমতো বিভিন্ন ধরনের পরিপূরক খাদ্য প্রয়োগের ব্যবস্থাও করা হয়।

ফর্মূলা - ১		ফর্মূলা - ২		ফর্মূলা - ৩	
ফিস মিল	২০ শতাংশ	চিংড়ির মাথার গুঁড়ো	৩০ শতাংশ	চিংড়ির মাথার গুঁড়ো	৩০ শতাংশ
সয়াবিন মিল	৯ শতাংশ	সয়াবিন মিল	৪ শতাংশ	সয়াবিন মিল	২০ শতাংশ
চালের ভুষি	৪৫ শতাংশ	চালের ভুষি	৩৫ শতাংশ	ফিস মিল	২০ শতাংশ
নারকেলের খোল	২০ শতাংশ	নারকেলের খোল	২০ শতাংশ	চালের ভুষি	১৫ শতাংশ
টপিয়োকা	৫ শতাংশ	টপিয়োকা	৯ শতাংশ	নারকেলের খোল	১৫ শতাংশ
অন্যান্য উপাদান (ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ)	১ শতাংশ	আগার	১ শতাংশ	টপিওকা	৮ শতাংশ
		অন্যান্য উপাদান	১ শতাংশ	অন্যান্য	২ শতাংশ

ফর্মুলাকৃত খাদ্য

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তৈরি ফর্মুলাকৃত খাদ্য তিন প্রকারের হয় : (ক) স্টার্টার, (খ) গ্রোয়ার (গ) ফিনিশার।

খাদ্য প্রদান ও সময়

কোন সময় কত পরিমাণ খাদ্য প্রদান করা হয় এবং কতবার দেওয়া হয় এগুলি অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন—(ক) চাষ পদ্ধতিটি কী প্রকার, (খ) প্রাকৃতিক উৎস থেকে খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ (গ) চাষের পর্যায় (ঘ) চিংড়ির বয়স ইত্যাদি।

সাধারণত দিনে দুবার খাদ্য দেওয়া হয়। সকালে ৪০ শতাংশ এবং সন্ধ্যায় ৬০ শতাংশ। যেহেতু রাত্রিবেলায় চিংড়িরা বেশি সক্রিয় থাকে ওই সময়ে খাদ্য প্রদান করা যেতে পারে। চাষের সময় অনুযায়ী চিংড়ির দেহের ওজনের অনুপাতে কত শতাংশ খাদ্য প্রদান করা হয় নীচে সেটি উল্লেখ করা হল।

চাষের সময়	দেহের ওজন অনুপাতে শতাংশ খাদ্য প্রদান
৩-৬ সপ্তাহ	২০ শতাংশ
৭-১০ সপ্তাহ	১৫ শতাংশ
১১-১৪ সপ্তাহ	১০ শতাংশ
১৫-১৮ সপ্তাহ	৫ শতাংশ
১৯-২০ সপ্তাহ	৩ শতাংশ

বাণিজ্যিক খাদ্য প্রদানে, খাদ্য দেহাংশে পরিণত হওয়ার অনুপাত ২ : ১ থেকে ৪ : ১ এবং এর ফলে বৃদ্ধির হার গড়ে ১ - ২ সেমি. প্রতি মাসে হয়।

খাদ্য প্রদান পদ্ধতি

খাদ্য কাঠের ট্রেতে স্থাপন করে সেগুলি জলের নীচে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

একক ও মিশ্র চাষ

একক চাষে অর্থাৎ পুকুরে শুধু গলদা চাষ করলে একটি বাস্তুতান্ত্রিক অসাম্য দেখা দেয়। পুকুরে পরিবেশীয় সুযোগ-সুবিধাগুলি ঠিকমতো সদ্ব্যবহার হয় না। পরীক্ষামূলক মিশ্র চাষে প্রমাণিত হয়েছে যে চিংড়ি ও মাছের উদ্বর্তন হার এবং বৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল অর্থাৎ চিংড়ি বা মাছ একে অন্যের ক্ষতি করে না। মিশ্র চাষ লাভজনক বলেই মেদিনীপুরে এর প্রচলন ব্যাপক। মিশ্র চাষে ৫৮০ কেজি / হেক্টর / প্রতি বছর চিংড়ি এবং ২২২৫ কেজি / হেক্টর / প্রতি বছর মাছ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। একক চাষে, নয় মাসে ৩১২৫ কেজি / হেক্টর উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

গলদা চিংড়ির রোগ :

লার্ভা, জুভেনাইল এবং পরিণত চিংড়িদের মধ্যে নানা রকম রোগ শনাক্ত করা হলেও অনেকগুলির কারণ জানা যায়নি। প্রধান রোগ, উপসর্গ এবং তার প্রতিকার মেদিনীপুরে নিম্নলিখিতভাবে করা হয়।

রোগ	উপসর্গ	প্রতিকার
(১) ব্যাক্টেরিয়াঘটিত রোগ	প্রধান আক্রমণ স্থানগুলি হল, ক্যারাপেস, উদর-উপাঙ্গসমূহ, ইউরোপোড, টেলসন। রোগের প্রথম লক্ষণ হল কালো দাগের আবির্ভাব।	২০ শতাংশে সমুদ্র জলে ১৫-২০ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে সুফল পাওয়া যায়।
(২) প্রোটোজোয়াঘটিত রোগ	রস্ট্রামের ভেতরের গাত্রতল, টেলসন, ইউরোপোড, ক্যারাপেস, উদরখণ্ডকসমূহ আক্রান্ত হয়। খোলস নির্মোচন ব্যাহত হয়, মৃত্যুও ঘটতে পারে।	জলের শোধন এবং আধঘণ্টা ২০০ পিপিএম ফর্মালিন দ্রবণে ডুবিয়ে রাখা।
(৩) এঞ্জুভিয়া রোগ	লার্ভা, পোস্ট লার্ভার প্রাথমিক দশাগুলি এই রোগে আক্রান্ত হয়। নির্মোচন করতে পারেনা। মৃত্যু হয়।	উপযুক্ত প্রতিকার ব্যবস্থা জানা নেই।

গলদা চিংড়ি মাছের চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব (এক শতক পুকুরের হিসেব দেওয়া হল—৪ থেকে ৬ মাসের চাষ)

'এ'—ব্যয় তালিকা

ক্রমিক নং	বিষয়	পরিমাণ	হার টাকায়	খরচ টাকায়
১।	জল তোলা ইত্যাদি			৫০-০০ টাকা
২।	চুন	১ কিঃগ্রাঃ	২ টাকা/কিঃগ্রাঃ	৩-০০ টাকা
৩।	মহুয়া খইল (প্রয়োজনে)	১ কিঃগ্রাঃ	৩ টাকা/কিঃগ্রাঃ	৩-০০ টাকা
৪।	ইউরিয়া	১ কিঃগ্রাঃ	৫ টাকা/কিঃগ্রাঃ	৫-০০ টাকা
৫।	সুপারফসফেট	২ কিঃগ্রাঃ	৬ টাকা/কিঃগ্রাঃ	৫-০০ টাকা
৬।	চারামাছ	১০০ টি	২ টাকা প্রতিটি	২০০-০০ টাকা
৭।	পরিপূরক খাদ্য	৫ কিঃগ্রাঃ	১০ টাকা/কিঃগ্রাঃ	৬০-০০ টাকা
৮।	ঔষধ			৫-০০ টাকা
৯।	বীমা			২৫-০০ টাকা
১০।	জাল টানা			৩০-০০ টাকা
১১।	অন্যান্য			২৪-০০ টাকা
			মোট	৪০০-০০ টাকা

'বি'—আয় তালিকা

- ১০০ টি গলদা চিংড়ির চারাপোনা ৮০ শতাংশ বেঁচে থাকে — ৮০টি চিংড়ি মাছ।
- প্রতিটি মাছ গড়ে ১০০ গ্রাম হিসেবে মোট ৮০টি গলদা চিংড়ির ওজন — ৮ কিলোগ্রাম।
- প্রতি কিঃগ্রাঃ চিংড়ির দাম ২৫০ টাকা হিসেবে মোট — ১৬০০ টাকা।
- মোট লাভ — ১২০০ টাকা

মেদিনীপুরে গলদা চিংড়ির বীজ তৈরি

মেদিনীপুরে গলদা চিংড়ি চাষের মূল সমস্যা চারার অভাব। যদিও প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক চারা পাওয়া যায়। তাতে বিশুদ্ধতা থাকে না। তার উপর যে সময় চারা স্থানীয় নদীতে আসে তখন সঠিক চাষের সময় পেরিয়ে যায়, তাই কৃত্রিম গলদা-চারার উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। গলদার চারা তৈরি করা সত্যি কঠিন কাজ। স্ত্রী গলদা ডিম বাইরে নিঃক্ষেপ করে নিষিক্ত করে। তারপর আবার নিষিক্ত ডিমকে দেহে পুরে ফেলে। প্রধান অসুবিধা হল গলদা মিষ্টিজলে থাকলেও মোহনায় ডিম পাড়তে আসে। ক্রমে ক্রমে ভাসতে ভাসতে আবার মিষ্টিজলে বাচ্চারা আসে। তাই সবসময় একটু একটু করে জলের লবণাক্ততা কমাতে হয় হিসেব বুঝে।

ঠিক এই কারণেই গলদার চারা তৈরি মহা সমস্যার। মেদিনীপুরে এত অসুবিধা সত্ত্বেও তিন জায়গায় কৃতিত্বের সঙ্গে গলদার চারা তৈরির কাজ চলছে। এর মধ্যে সরকারি দুটি এবং একটি বেসরকারি। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে দীঘায় 'মীনাক্ষী' নামের ফার্ম আছে। আর তমলুকে আছে অন্য একটি সরকারি সংস্থা, সি এ ডি সি-র উদ্যোগে। এই দুটো সংস্থা থেকে মেদিনীপুর তো বটেই বাঁকুড়া, পুরুলিয়াতেও বীজ সরবরাহ করা হয়।

দুটি রাজ্য সরকারের সংস্থার পাশাপাশি দীঘায় বেসরকারি উদ্যোগে 'বেঙ্গল স্ক্যাম্পি' ফার্মও সৃষ্টি করছে গলদার চারা। পশ্চিম মেদিনীপুরের বাড়ুয়ায় গলদা প্রজনন কেন্দ্র চালু হলেও অল্প কয়েকদিনের মধ্যে পরিচালনগত অসুবিধার ফলে আজ ভাঙা কাঁচ, ভাঁঙা দরজা ও পরিত্যক্ত ঘর নিয়ে ভুতুড়ে বাড়িই সম্বল।

গলদা চাষে মেদিনীপুরের এগিয়ে থাকা ও সম্ভাবনাময় অঞ্চল

পূর্ব মেদিনীপুর যেমন একচেটিয়া বাগদার ভাগীদার, গলদার ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। এক্ষেত্রে পশ্চিম মেদিনীপুরও উৎপাদক। তবুও উৎপাদনের ভিত্তিতে পূর্ব মেদিনীপুর অনেক এগিয়ে। রামনগর-১, রামনগর-২, নন্দীগ্রাম-১, ২, মহিষাদল, সবং, ময়না প্রভৃতি অঞ্চল গলদা চাষে অনেক এগিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় গলদা চাষে মেদিনীপুর অনেক মাইল এগিয়ে আছে। মেদিনীপুরে মারিশদার নীলপুর, পাঁশকুড়া, নরঘাট, এগরা, ভগবানপুর, তমলুকে ২০০০ সাল থেকে নতুন উদ্যমে গলদা চাষ শুরু হয়েছে।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বাগদা ও গলদা উৎপাদনের তুলনামূলক পর্যালোচনা

(১) বিভিন্ন রাজ্যে বাগদা উৎপাদন—৩১.৩.২০০২ পর্যন্ত[৬০]

রাজ্য	এলাকা (হেঃ)	উৎপাদন (মে.ট্র)	উৎপাদনশীলতা (মে.ট./হে./বছর)
তামিলনাড়ু	২৪৮০	৪৭১০০	১.৯
গোয়া	৯৩০	১২০০	১.২৯
গুজরাট	৫৪০	৬৮০	১.২৬
কর্নাটক	৩০৮০	৩৫০০	১.১৪
ওড়িশা	৮১২০	৮৯৬০	১.১
মহারাষ্ট্র	৩০০	৩২০	১.০৭
অন্ধ্রপ্রদেশ	৭৯৬০০	৫১২৩০	০.৬৪
পশ্চিমবঙ্গ	৪৬৭৫০	২৬০০০	০.৫৭
কেরল	১৪৭০০	৫৫৪০	০.৩৮
মোট	১৫৬৫০০	১০২৯৪০	০.৬৬

(২) বিভিন্ন রাজ্যে গলদার উৎপাদন[৬১]

রাজ্য	এলাকা (হেঃ)	উৎপাদন (মে.ট্র)	উৎপাদনশীলতা (মে.ট./হে./বছর)
অন্ধ্রপ্রদেশ	২২৩৪০	২৯৯১০	০.৯৪
তামিলনাড়ু	১৭০	১৪০	০.৮২
কর্ণাটক	১৫০	১০০	০.৬৭
পশ্চিমবঙ্গ	৪০২০	১২৭০	০.৫৬
কেরল	৭৭০	২০০	০.২৬
ওড়িশা	৩১০০	৪০০	০.১৩
গুজরাট	১৯৪০	৭০	০.০৪
মহারাষ্ট্র	৪১৫০	১৪০	০.০৩
মোট	৩৬৬৪০	২৪২৩০	০.৬৬

(৩) বিভিন্ন রাজ্যে গলদা ও বাগদার হ্যাচারি[৬২] ৩১.৩.২০০২ পর্যন্ত

	সংখ্যা এবং উৎপাদন ক্ষমতা (মিলিয়ন প্রতিবছর)					
	বাগদা		গলদা		মোট	
রাজ্য	সংখ্যা	উৎপাদন	সংখ্যা	উৎপাদন	সংখ্যা	উৎপাদন
অন্ধ্র প্রদেশ	১১০	৬৫৮০	২	৯৭১	১৩৭	৭৫৫১
তামিলনাড়ু	৬৭	২৮০২	৭	২৫৫	৭৮	৩০৫৭
কেরল	২১	৪৯০	৮	১৫০	২৯	৩৬০
কর্ণাটক ও গোয়া	১৫	৫৩৮	০	০	১৫	৫৩৮
ওড়িশা	১৩	১৫১	০	০	১৫	৫১৫
মহারাষ্ট্র	৭	৩৫৫	১	৫	৮	৩৬০
পশ্চিমবঙ্গ	২	১০০	৯	৬৬	১১	১৬৬
গুজরাট	২	৪৫	০	০	২	৪৫
মোট	২৩৭	১১,৪২৫	৫৬	১৪৪৭	২৯৩	১১,৫৯২

(৪) পশ্চিমবঙ্গের তিন জেলার মধ্যে মেদিনীপুরে চাষযোগ্য ঈষৎ নোনাজলের পরিমাণ ও চাষ হওয়া জমি[৬৩]—৩১.৩.২০০২ পর্যন্ত

জেলা	চাষযোগ্য জমি (হেঃ)	চাষ হচ্ছে (হেঃ)
উত্তর ২৪-পরগণা	১,১০,০০০	৩৩,০০০
দক্ষিণ ২৪-পরগণা	৭০,০০০	১২,০০০
মেদিনীপুর	৩০,০০০	৩,০০০

চিংড়ি চাষে ভবিষ্যতের মেদিনীপুর—সম্ভাবনা ও সমস্যা

সমগ্র ভারতের কথা বিবেচনা না করে শুধু পশ্চিমবঙ্গের কথাই যদি ভাবি, তাহলে হিসেবমতো দেখা যায় এখানে প্রায় দশ লক্ষ স্বাদু জলের পুকুর রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ স্বাদু জলের পুকুর চিংড়ি চাষের উপযোগী। স্বল্প প্রচেষ্টায় আরও কয়েক লক্ষ হেক্টর পুকুরকে চাষযোগ্য করে তোলা যায়। ঠিক একই চিত্র লক্ষ্য করা যায় মেদিনীপুরের ক্ষেত্রে। মেদিনীপুরে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ প্রচুর। কিন্তু এ পর্যন্ত চাষের পরিমাণ আশাব্যাঞ্জক নয়। নোনাজলের চাষের পরিমাণ কিছুটা ভদ্রস্থ হলেও গলদার চাষ বা মিষ্টিজলে চিংড়ি চাষ অনেক অবহেলিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় চাষিদের বৈজ্ঞানিক সচেতনতার অভাব এবং সরকারি উদাসীনতা অনেকাংশেই দায়ি।

গলদা চিংড়ি আকারে বড়ো, অতি সুস্বাদু এবং এর বৃদ্ধির হারও খুব বেশি। এ ছাড়াও দেশে ও আন্তর্জাতিক বাজারে গলদা চিংড়ির চাহিদা ক্রমবর্ধমান। এই কারণে বর্তমানে মেদিনীপুরের চাষিরা গলদা চাষে যথেষ্ট উৎসাহী। গলদা ৫-৬ মাসেই বিপণন করার মতো আকারে (৪০-৬০ গ্রাম) পৌঁছায়। কাজেই চাষিরা বছরে দুটি করে ফসল তুলতে পারে। কিন্তু মেদিনীপুরে বছরে মাত্র একবার চাষ চলছে, এর ফলে মার খাচ্ছে উৎপাদন। দ্বিতীয় বছরেই শতকরা ১০০ ভাগ লাভ পেতে পারেন চাষি। কিন্তু মেদিনীপুরের চাষিরা ওই সীমায় আজও পৌঁছতে পারেননি।

কিন্তু বড়ো পরিতাপের বিষয় এটাই যে পশ্চিমবঙ্গে কী পরিমাণ জমিতে জেলায় জেলায় ব্লকে ব্লকে, কীভাবে চিংড়ি চাষ করে কতটা উৎপাদন চলছে তার কোনও রকম তথ্য নেই। কোনও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টাও নেই। অথচ করলে প্রতিটি জেলায় কোথায় কবে কতটা জায়গায় কত চিংড়ি উৎপন্ন হল তার কড়ায়-গন্ডায় হিসেব আছে।[৬৪] মেদিনীপুরের ব্লকে বা মীন ভবনে যে তথ্য আছে সেটি প্রকৃত তথ্য নয়। যে কয়েকজন চাষি ঋণের জন্য আবেদন করেন, তাদের ফোলানো- ফাঁপানো একপেশে সম্ভাবনাময় তথ্য কেবল এসে জমা পড়ে মৎস্য দপ্তরে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে সমস্ত চাষ হচ্ছে তার কোনও রকম তথ্যপ্রমাণ নেই মৎস্য দপ্তরের কাছে। এই তথ্যের দিকে নজর দিতে হবে। গলদা চাষে চারাগুলো ওপরের দিকে লাফিয়ে মারা যায়। পরিবর্তিত 'রিসারকুলেশান' পদ্ধতিতে এবং 'মাইক্রোস্প্রিংকলার' পদ্ধতি অনুসরণ করলে হ্যাচারির উৎপাদন বাড়তে পারে।[৬৫] বাগদা চাষে মেদিনীপুর একটা বড়ো ধাক্কা খেয়েছে ১৯৯৫-৯৬তে। কেরলও খেয়েছিল। অন্ধ্রও। কিন্তু তারা খুব তাড়াতাড়ি বিপদ কাটিয়ে উঠলেও মেদিনীপুর পারেনি—কারিগরি দক্ষতা ও পরিচালন ব্যবস্থার অভাবে। আজ পশ্চিমবঙ্গে বা মেদিনীপুরে ভালো ল্যাবোরেটরি নেই ভাইরাস আক্রমণ পরখ করবার জন্য। অন্য রাজ্যে হলেও এ রাজ্যে অন্ধ্র বা অন্য হ্যাচারি থেকে আসা বাগদার চারায় পি সি আর আজও হয়নি। আজ অবধি তার কোনও পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। ওই পি সি আর টেস্ট খুব জরুরি। ঋণ ব্যবস্থা আজও অপ্রতুল। মীন সরবরাহ আজও অপর্যাপ্ত।

তবুও মেদিনীপুর তার অসীম ধৈর্যবলে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। মূল স্রোতে ফিরছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক আবার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। সরকারি মহল থেকে কোনও কিছুরই অভাব রাখা হচ্ছে না। মেদিনীপুরের প্রাকৃতিক সম্পদকে শোষণ না করে, অবিবেচকের মতো ব্যবহার না করলে—অচিরেই আবার প্রথম স্থানে থাকবে মেদিনীপুর।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই জেলা মেদিনীপুরকে। তথ্য সরবরাহ করে ঋণী করেছেন অভিজিৎ বাগ (আই এফ বি—কাঁথি), সিদ্ধার্থ সরকার (এ এফ ও কাঁথি), জগন্নাথ গোস্বামী (মীনভবন, পশ্চিম মেদিনীপুর), গীতালি দাস (অধ্যাপিকা—মহিষাদল রাজ কলেজ), মৎস্য দপ্তর (মহিষাদল, সুতাহাটা, এগরা, হলদিয়া, রামনগর), জয়েন্ট ডাইরেক্টরেট অফ্ ফিসারি, পশ্চিমবঙ্গ ; সোনালি ভৌমিক (শিক্ষিকা, সোদপুর শ্রীমন্ত বিদ্যাপীঠ), মীনভবন (পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর), তাপস জানা (শিক্ষক, রামনগর রাও স্কুল) সব্যসাচী সরকার (আই এফ বি) ও শর্মিষ্ঠা সরকার, রাজীব রায় (এল বি কম্পিউটার)।

তথ্যসূত্র

১। Chanda, A. and Bhattacharya, T. 2002, Penaeoid Shrimp of Digha & adjacent Coast of Midnapur, West Bengal. India. **Vidyasagar University J. of Biological Sciences. 8** : 1-21.

২। ওই

৩। ওই

৪। সরকার, সুবীর। আধুনিক সহজ মৎস্যচাষ ও গলদা চিংড়ি চাষ, ২য় খণ্ড (এন টু জেড)।—ডি আর ডি এ—তমলুক—পৃ ওরাই—২-৮।

৫। Fish Farms Development Agency, Midnapur 1986 - **Inland Fisheries Project** - A. Guide to its execution P. P. 15-16.

৬। নন্দ, কিরণময় ২০০৩ - শুধু মৎস্য উৎপাদনই নয় সার্বিক উন্নয়নে মৎস্য দপ্তরের ভূমিকা। পশ্চিমবঙ্গ ফেব্রুয়ারি - পৃ ৭।

৭। নোনা জলে মাছ চাষ ১৯৯৭ নোনাজলে মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা, কাঁথি, মেদিনীপুর, পৃ ৭।

৮। সর, উৎপল ২০০৩ - পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জুনপুট মৎস্য কারিগরি কেন্দ্র এখন যেরকম - পশ্চিমবঙ্গ - ফেব্রুয়ারি, পৃ ৫৯।
৯। Raman, K. 1974 ; Pokkali Field Fish Culture in Kerala. **Indian J. of Fish. 21** : 140.
১০। ওই
১১। Panikkar, N. K., 1937. The prawn industry of the Malabar Coast. **J. Bombay Nat. His. Soc. 39(2)**, 343-53.
১২। Menon, N. K., 1954. On the paddy field prawn fishery of Travancore, Cochin and on experiment in prawn culture. **Proc. Indo. Pacif. Fish. Coun. 2 : 131-135.**
১৩। Gopinath, K. 1955. Prawn Culture in the rice fields of Travancore, Cochin, India. **Proc. Indo-Pacific. Fish. Coun. 6,** II & III : 419-425.
১৪। Panikkar, N. K. and M. K. Menon, ; 1955. Prawn fisheries of India **Proc. Indo-Pacif, Fish. Coun., 6, II & III** : 328-46.
১৫। Menon, N. K., 1954. On the paddy field prawn fishery of Travancore, Cochin and on experiment in prawn culture. **Proc. Indo. Pacif. Fish. Coun. 2** : 131-135.
১৬। Raman, K, 1974 ; Pokkali Field Fish Culture in Kerala, **Indian J. of Fish. 21** : 140.
১৭। ওই
১৮। Menon, M. K. & K. Raman, ; 1961. Observation on the prawn fishery of the Cochin backwaters with special reference to the Stake net catches. **Indian J. Fish. 8(1)** : 1-23.
১৯। Raman, K. & M. K. Menon, ; 1963. A preliminary note on an experiment in paddy field prawn fishery. **Ibid 19(1A)** : 33-39.
২০। Subrahmanyam, M., 1965. Lunar, diurnal and tidal periodicity in relation to the prawn abundanced and migration in the Godavari estuarine System. **Fish Technol. Ernakulam, 2(1)** : 26-33.
২১। George, M. J., Mohammed K. H. and Pillai, K. N., 1968 - Observation on the paddy field prawn filatration on Kerala, India. **FAO. Fish. Rap. 57(2)** : 427-42.
২২। Raman, K. & M. K. Menon, 1963. A preliminary note on an experiment in paddy field prawn fishery. **Ibid 19(1A)** : 33-39.
২৩। De, D. K. 1998. Status of Commercially important Prawn & fish seed resources in the Hooghly Matla Estuarina System. **Proc. National Symp. & Workshop on Fin Fish and Shell Fish farming**. P.P. 47-48.
২৪। সরকার, সুবীর। আধুনিক সহজ মৎস্যচাষ ও গলদা চিংড়ির চাষ, ২য় খণ্ড—ডি আর ডি এ, তমলুক, পৃ ওয়াই ২ - ৬।
২৫। কামিলা দিব্যেন্দু, ২০০১। চিংড়ি সম্পর্কে কিছু কথা, বিজ্ঞানমেলা, অক্টোবর, পৃ ৯৭।
২৬। Liao, I. Chiu and T. L. Huang, 1972. Experiments on the propagation & culture of prawns in Taiwan. **Coastal Aquaculture in the Indoa-Pacific Region** : 328-54. London : Fishing New Ltd.
২৭। Raje, P. C. and Ranade, M. R. 1972. Larval Development of India Penaid Shrimp. *Metapenaeus monocecros*. **J. Indian. Fish. Ass. 2(2)** : 30-46.
২৮। Shigueno K. 1972. Problems in prawn culture in Japan. **Coastal Aquaculture in the Indo-Pacific Region** : 281-312. London : Fishing News Ltd.
২৯। Mithu, M. S., Pillai, N. N. and George, K. V., 1974. On the spawning and rearing of *Panaeus indicus* in the laboratory with a note on the eggs & larvae **Ind. J. Fish. 21(2)** : 571-74.
৩০। রায় বি, ভট্টাচার্য বি., বসু, বু., রায় বসু প্র.। ২০০২ প্রাণিবিদ্যা-৩, অভিনব প্রকাশন, পৃ ১৩০-১৬০।
৩১। ওই
৩২। নোনাজলে মাছ চাষ, ১৯৯৭। নোনাজল মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা, কাঁথি, মেদিনীপুর, পৃ ৮।
৩৩। সৌরেশ দে, বাগদা গলদার হ্যাচারি ও চাষ, ১৯৯৭।
৩৪। মৎস্য দপ্তর : পশ্চিমবঙ্গ নোনাজল শাখা, ১৯৯৪।
৩৫। ওই
৩৬। রায় বি, ভট্টাচার্য বি., বসু, বু., রায় বসু প্র.। ২০০২ প্রাণিবিদ্যা-৩, অভিনব প্রকাশন, পৃ ১৩০-১৬০।
৩৭। মৎস্য দপ্তর : পশ্চিমবঙ্গ নোনাজল শাখা, ১৯৯৪।
৩৮। রায় বি, ভট্টাচার্য বি., বসু, বু., রায় বসু প্র.। ২০০২ প্রাণিবিদ্যা -৩, অভিনব প্রকাশন, পৃ ১৩০-১৬০।
৩৯। মিত্র কুমারেশ চন্দ্র। ২০০৩ - নোনাজলে চিংড়ি চাষে সফল দুই মৎস্যজীবীর অভিজ্ঞতা - পশ্চিমবঙ্গ - ফেব্রুয়ারি, পৃ ৫৭-৫৮।
৪০। নোনাজলে মাছ চাষ। ১৯৯৭। নোনাজল মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা, কাঁথি, মেদিনীপুর, পৃ ৮।
৪১। জনমুখি প্রকল্প রূপায়ণে মেদিনীপুর জেলা মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা, ১৯৯৪, মীন ভবন, সিপাইবাজার, মেদিনীপুর।
৪২। বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীসাধন। বাগদা চাষ ও পরিবেশ দূষণ—আধুনিক মৎস্যচাষ ও গলদা চিংড়ি চাষ, ডি আর ডি এ, তমলুক পৃ জেড ১-২।
৪৩। নোনাজলে মাছ চাষ, ১৯৯৭। নোনাজল মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা, কাঁথি, মেদিনীপুর, পৃ ১২।
৪৪। Biswas, P. K., 1998, Shrimp Forming - an Ecological & Economical Consideration. **Nat. Symp. & Work. on Fin Fish and Shell Fish Farming (CU & ZSI)**, P. 46-47.
৪৫। Ghosh, A. K., P. K. Pandit and H. C. Karmakar, 1998. Some Perceived Problems and contrains of Estuarine Wetland in West Bengal. **Nat. Symp. & Work. on Fin Fish and Shell Fish. Farming (CU & ZSI)**, P. 43.
৪৬। Ramkrishna, S. and J. Sarkar, 1998. Recent trend of High Yielding Costal Aquaculture inviting Ecodegradation in the Coastal Zone of Midnapore District (West Bengal). **Nat. Symp. & Work. on Fin Fish and Shell Fish. Farming (CU & ZSI)**, P. 40.
৪৭। Saha, S. L., 1998. Fin Fish & Shell Fish Farming Environmental Impact disease & Control. **Nat. Symp. & Work. on Fin Fish and Shell Fish. Farming (CU & ZSI)**, P. 16-17.
৪৮। Dutta, N. C. 1998. Aquaculture as an industry : an overview. **Nat. Symp. & Work. on Fin Fish and Shell Fish. Farming (CU & ZSI)**, P. 23.
৪৯। প্রামাণিক, স্বরজিৎ ২০০৩ - পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য চাষ এবং বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ণ—পশ্চিমবঙ্গ ফেব্রুয়ারি, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ পৃ ১৩-১৯।
৫০। ওই
৫১। ওই
৫২। ওই
৫৩। ওই
৫৪। ওই
৫৫। নন্দ, কিরণময়-২০০৩, শুধু মৎস্য উৎপাদনই নয় সার্বিক উন্নয়নে মৎস্য দপ্তরের ভূমিকা—পশ্চিমবঙ্গ ফেব্রুয়ারি, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ, পৃ ৭ - ১২।
৫৬। রায় বি, ভট্টাচার্য বি., বসু, বু., রায় বসু প্র.। ২০০২ প্রাণিবিদ্যা-৩, অভিনব প্রকাশন, পৃ ১২৩।
৫৭। Bhimachar, B.S., 1965. Life History and behaviour of Indian prawn. **Fish Technol. Ernakulum, 2(1)** : 1-11.
৫৮। Choudhury, P. C. 1970. Complete larval development of Palaeomonid shrimp, Macrobrachiam acanthurus. **Crustaceana, 18 (2)** : 113-32.
৫৯। Fujimura, T. 1974. Notes on development of a mass cluster of M. rosenbergii. Quarterly Progress Report under the Commercial Fisheries Development Act, National Marine Fisheries Services.
৬০। Indian Shrimp Culture Scenario : State wise status : 2002. **Fishing Chimes** : 22(7). 5-28.
৬১। ওই
৬২। ওই
৬৩। ওই
৬৪। ওই
৬৫। Indulkar, S. T., S. G. Belsone & P. C. Raje, 2002. Microsprinklers enhance efficacy of hatchery production of Giant Freshwater Prawn larvae. **Fishing Chimes** : 20(7). 13-15.

লেখক : বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ, পূর্ব মেদিনীপুর
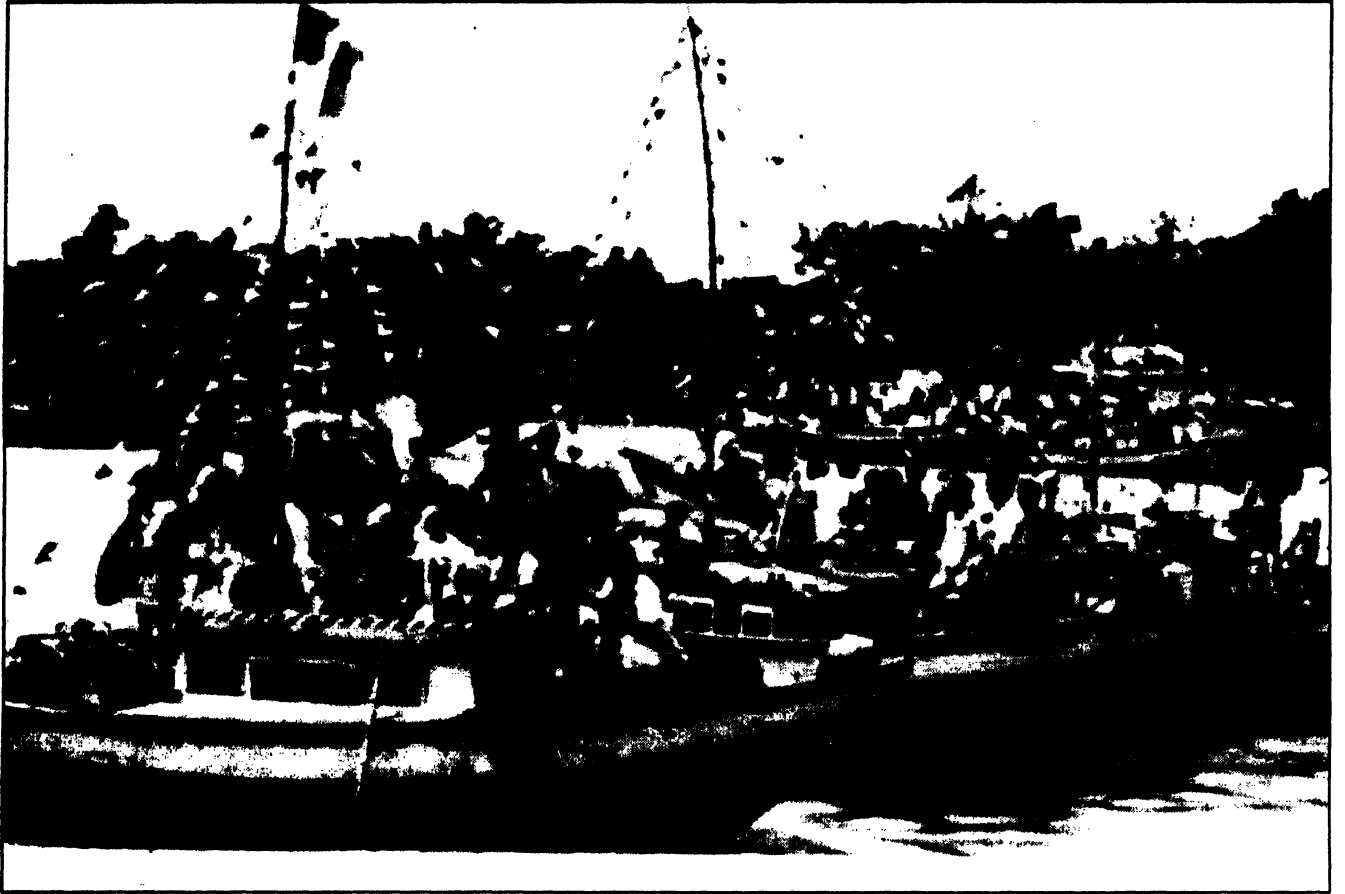
শঙ্করপুরে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার জন্য নৌকো দেওয়া হয়েছে

শঙ্করপুরের সমুদ্রতীর

হলদিয়ায় সাউথ এশিয়ান পেট্রোকেমের উদ্বোধন করছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

মেদিনীপুর জেলার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

সুকুমার মাইতি

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে দেশের অগ্রগতি নানাদিকে নানাভাবে হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানও বেড়েছে। ছাত্রছাত্রী, গবেষক, অধ্যাপক, অধ্যাপিকার সংখ্যা বহুগুণ হয়েছে। বর্তমান প্রজন্ম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে লেখাপড়া, গবেষণা ও শিক্ষণ নিয়ে দারুণ আগ্রহী। বিশেষ করে ইন্‌জিনিয়ারিং ও ডাক্তারি পড়ার দিকে ছাত্রছাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড়। দেশের ছটি আই আই টি-তে ভর্তি হবার জন্য প্রতিযোগিতা এখন তুঙ্গে। তুলনায় ডাক্তারি শিক্ষার দিকে প্রতিযোগিতা একটু কম। তার একটা কারণ মনে হয় আজকাল ডাক্তারদের বিদেশে পাড়ি দেবার সুযোগ কমে যাওয়া।

বিজ্ঞান গবেষণার ঐতিহ্য এদেশে অনেকদিনের। এশিয়ার প্রথম বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্রটি কলকাতায় প্রায় সওয়া একশো বছর আগে স্থাপিত। বিজ্ঞান গবেষণায় ভারত জগৎসভায় বিশেষ কৃতিত্বের দাবি অর্জন করেছে। তুলনায় প্রযুক্তি গবেষণা এখনও সাবালক হয়নি। ইন্‌জিনিয়ারিং শিক্ষায় আজকের তরুণ-তরুণীর প্রবল আগ্রহ দেখা দিলেও প্রযুক্তি-গবেষণায় তাদের আগ্রহ খুবই কম। ডাক্তারি বা জীবনবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে চিত্রটি অবশ্য অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর।

কিছুদিন আগে ভারতীয় বিজ্ঞান অনুশীলন সংস্থায় একটি অভিনব ও কালোপযোগী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়বস্তু : বিজ্ঞান প্রযুক্তি

হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল ওয়ার্কার্স হাসপাতাল

শিক্ষা ও গবেষণার মান স্বাধীনতা-উত্তর কালে বৃদ্ধি পেয়েছে, কি কমেছে। সেমিনারে নানা মুনির নানা মত। কেউ বললেন, আগের চেয়ে শিক্ষা ও গবেষণার মান বেড়েছে সপক্ষে যুক্তি : এফ আর এস বিজ্ঞানীর সংখ্যাবৃদ্ধি। অন্যেরা এ যুক্তকে অস্বীমার করলেন। তাঁদের বক্তব্য : গবেষক এবং বিজ্ঞানীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু গবেষণার মান বাড়েনি। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের আধুনিক গবেষণা বিশ্বের দরবারে আগের মতো স্বীকৃতি ও মর্যাদা পাচ্ছে না। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে তারা জানালেন আজকাল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের মান দারুণ অবনত হয়েছে। এর জন্য তাঁরা দায়ি করলেন ল্যাবরেটরিগুলির নিম্নমানের পরিকাঠামোকে। টাকাপয়সার অভাবে সেগুলিকে যথাযথ ও কালোপযোগীভাবে সজ্জিত করা যাচ্ছে না। আবার কেউ মন্তব্য করলেন : স্যার সি ভি রমন বা মেঘনাদ সাহা বা জগদীশচন্দ্র যেসব ল্যাবরেটরিতে গবের্ষণা করে বিশ্বখ্যাতি পেয়েছিলেন সেগুলি কি তদানীন্তনকালে উচ্চমানের ছিল? আসলে গবেষণার জন্য দরকার মননশীলতা ও উদ্ভাবনী প্রতিভা। যন্ত্রপাতি বা পরিকাঠামো অনুষঙ্গমাত্র। শিক্ষার অধোগতির জন্য শিক্ষক ও অধ্যাপকদের অযোগ্যতা এবং কর্মনিষ্ঠার অভাবই প্রধানত দায়ি। পরিবেশ এবং পরিকাঠামো পরোক্ষে ইন্ধন জোগায়। এর মধ্যে অনেকে আবার শিক্ষাজগতে অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপকে বহুলাংশে দায়ি করলেন। তাঁদের বক্তব্য : স্যার আশুতোষ বা ডঃ ত্রিগুণা সেনের মতো স্বাধীনচেতা, নির্ভীক এবং কৃতবিদ শিক্ষাবিদ আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে আসীন নন, যাঁরা রাজনীতির নেতাদের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অমার্জিত এবং ক্ষতিকর হস্তক্ষেপ প্রতিহত করতে সক্ষম। তাই আজ শিক্ষক এবং অধ্যাপক পদে প্রায়শ যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচিত হয় না। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় আজ অযোগ্যের আখড়ায় পরিণত। এই পরিবেশে আর যাই হোক উচ্চশিক্ষা এবং মৌলিক গবেষণা হয় না।

এই হল সারা দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা এবং গবেষণার সার্বিক চিত্র। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এর ব্যতিক্রম নয়। পরন্তু আরও বেশি মলিন এবং হতাশাপূর্ণ। মেদিনীপুর জেলার চিত্র কিভাবে আর অন্যতর হবে? তবে একটি আশার আলো : এই জেলায় ভারতের প্রথম এবং বৃহৎ আই আই টি বর্তমান। যেখানে এই ডামাডোলের বাজারেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা, শিক্ষণ এবং গবেষণার ধারাটি উজ্জ্বল, সতেজ এবং গতিশীল। এক দশকেরও আগে এই সুবৃহৎ জেলায় প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ রবীন্দ্রনাথের 'বনস্পতি বাঙালি' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ঘটনাটি এই জেলার মানুষের কাছে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু এক দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও এই জেলার বহু মানুষকে, বিশেষত উচ্চশিক্ষিত
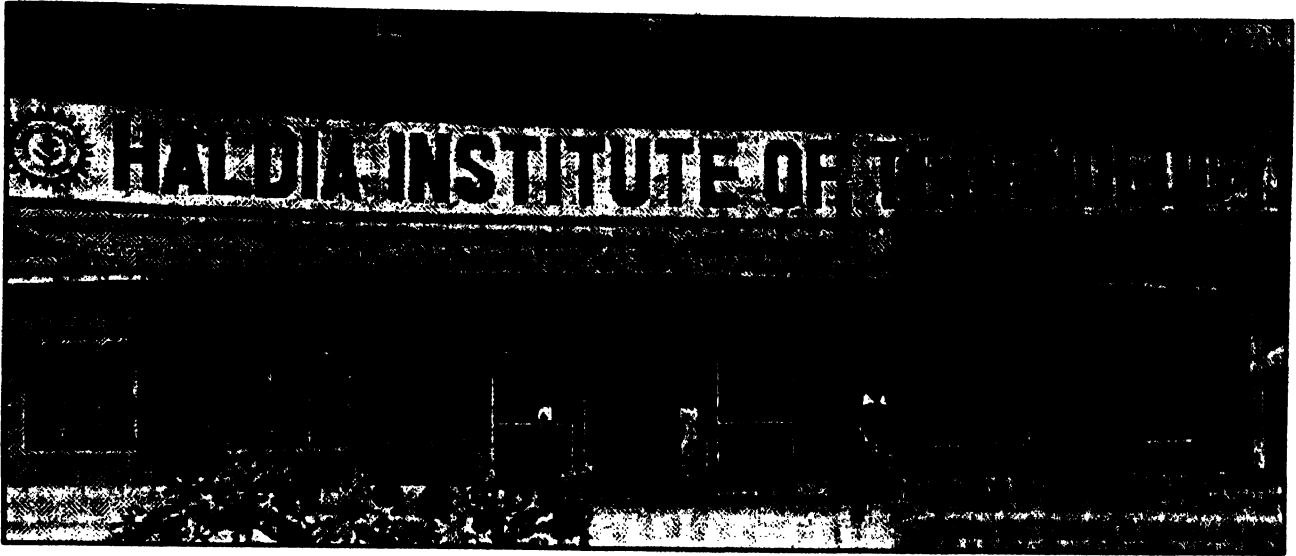
হলদিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

মানুষকে বলতে শুনেছি যে মেদিনীপুর স্বাধীনতা যুদ্ধে সর্বস্বপণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য শিক্ষায় পিছিয়ে পড়েছিল। আবার দ্বিতীয়বার বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে এবং এই জেলার সমস্ত কলেজকে এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তি করে জেলার মানুষ উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে গেল। এই উক্তি কতটা সঠিক, তার প্রকৃত মূল্যায়ন কেউ যথাযথভাবে করেনি। তবে একটা নজির আমরা দেখছি যে এই জেলার প্রকৃত মেধাবী ছেলেমেয়েরা, বিশেষত যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে, আজকাল আর এই জেলার কোনো কলেজে ভর্তি হয় না। ব্যতিক্রম হয়ত আছে, কিন্তু সেটা নিছকই ব্যতিক্রম।

শিল্পের ক্ষেত্রে মেদিনীপুর বেশ পিছিয়ে আছে। হলদিয়া শিল্পনগরী এই জেলার একমাত্র আশার আলো। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস এই শিল্পনগরীর মধ্যমণি। অনেক আশা ও উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখছে এই জেলার মানুষ হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস নিয়ে। ইতিমধ্যে অনেক সেমিনার আলোচনা মিটিং—রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক স্তরে হয়েছে। এদেশে আর কোনো পেট্রোকেমিক্যালস প্রকল্প নিয়ে এত আলোড়ন, হিল্লোল-কল্লোল হয়নি। অধীর আগ্রহে জনসাধারণ, বিশেষ করে শিক্ষিত তরুণ-তরুণী এবং তাদের অভিভাবকবর্গ, অপেক্ষা করছে সোনালি স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য। আমার ভয়, পর্বতের মূষিক প্রসব হবে না তো? ভয় অহেতুক নয়। হলদিয়া শিল্পনগরীর জন্ম-মৃত হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কারখানাটি আমার সেই আশংকায় ইন্ধন জোগায়। দেশের অগ্রগতির জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অবশ্যই দরকার। গ্রাঁ প্রি রেসের মাঠ তৈরিতে তার যেমন প্রয়োজন, তার চেয়ে কম জরুরি নয় মানুষের প্রযুক্তিগত দক্ষতা, শ্রমশীলতা এবং সর্বোপরি কর্মনিষ্ঠা পেট্রোকেমিক্যালসের মতো একটি আধুনিক উচ্চপ্রযুক্তির কারখানা চালু রাখতে। বেশ কয়েক বছর আগে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি সেমিনারে মূল বক্তা হিসেবে বলেছিলাম এইসব কলকারখানাকে বছরে অন্তত আট হাজার ঘণ্টা চালু রাখতে হয়; না হলে সে কারখানা বাঁচে না। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-শ্রমিকদের যে কর্মনিষ্ঠার রেকর্ড তাতে আমার এই আশংকা অমূলক নয়। আরও মনে রাখতে হবে, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস সারা দেশের একমাত্র পেট্রোকেমিক্যালস নয়। তাছাড়া বিশ্বায়নের যুগে একে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে। আর যে দেশে রিলায়েন্স পেট্রোকেমিক্যালসের মতো বিশাল এবং সুদক্ষ খেলোয়াড় আগেই বাজার দখল করে নিয়েছে, সে ক্ষেত্রে ভয় হয় বৈকি?

আমার এই আশংকাকে পাঠক সাধারণ যেন অসূয়াপ্রসূত মনে না করেন। আমি সবার আগে চাই এই জেলা শিক্ষা-দীক্ষায় বিজ্ঞান প্রযুক্তি গবেষণায় শিল্পবাণিজ্যে সকলের সেরা হয়ে উঠুক। হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। কিন্তু সেদিকে আমাদের নজর আছে কি? আমরা কি সেই সম্ভাবনাগুলিকে চিহ্নিত করতে পেরেছি? হয়েছি কি তাদের বাস্তবায়নে সচেষ্ট? এবার সেদিকে একটু দৃষ্টি ফেরাই।

কি সেইসব সম্ভাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যা আমাদের উৎসাহিত করতে পারে? প্রথম এবং প্রধান উপাদান মানবসম্পদ। এ জেলার মানুষ এখনও পরিশ্রমী, কর্তব্য-সচেতন, ফাঁকিবাজিটা তেমন রপ্ত করতে পারেনি। এরা তথাকথিত স্মার্ট না হতে পারে, কিন্তু এদের কর্মনিষ্ঠা ও সাধুতা একেবারে তলানিতে ঠেকেনি। এদের ওপর ভরসা এখনও করা যায়। এ জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের শিক্ষাহীন কুঁড়েঘরে আজও এমন ছেলেমেয়ে জন্মায় যারা মেধায়, বুদ্ধিতে, সৃজনশীলতায়, কর্মনৈপুণ্যে চমক জাগায়। এদের বেশ কয়েক জনের সঙ্গে গবেষণা করার ব্যক্তিগত সৌভাগ্য হয়েছে। এদের বুদ্ধিমত্তা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও উদ্ভাবনীবৃত্তির

প্রমাণ এরা রেখেছে জীবনের বিভিন্ন পথে এবং শিক্ষাক্ষেত্রের প্রায় সব রকমের পরীক্ষায়। এ জেলার ছেলেমেয়েরা জ্ঞানবিজ্ঞান প্রযুক্তি শিক্ষা ও গবেষণার বিভিন্ন দিকে অতি উজ্জ্বল উদাহরণ রেখে চলেছে। এটি অতি মূল্যবান এবং দুর্লভ মূলধন। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বাহন যদি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হয়, তাহলে তার চালক এইসব উজ্জ্বল কর্মনিষ্ঠ সৃজনশীল মেধাবী তরুণতরুণী। মেদিনীপুর এদিক দিয়ে খুবই সৌভাগ্য-বান।
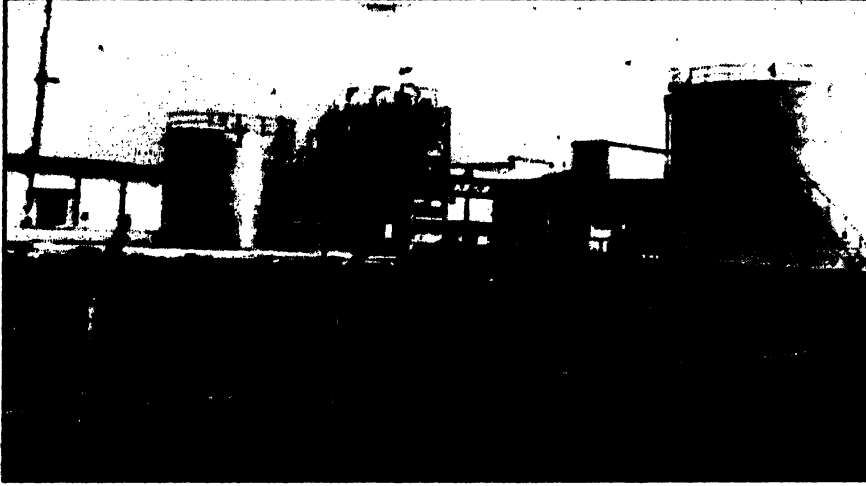
হলদিয়ার ফাইবার প্লান্ট

এ জেলা শুধু পরিসরে বৃহৎ নয়, বৈচিত্র্যেও। দীঘা-শংকরপুরের সমুদ্র-সৈকত থেকে ঝাড়গ্রাম-লোধামুলীর শাল অরণ্য, গড়বেতা-ঘাটালের উর্বর শস্যক্ষেত্র এই জেলাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। রূপনারায়ণ ও সুবর্ণরেখা জলসম্পদের বৈভব দিয়েছে। খনিজ সম্পদের সন্ধান মেলেনি, কিন্তু বনজ ও কৃষিজ ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য আছে। এই বিশাল এবং বিচিত্র সম্পদকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সে নিয়ে সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত সার্বিক কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এ পর্যন্ত করা হয়নি। এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীন কিছু ক্ষুদ্রশিল্প সমস্ত সম্ভাবনাপূর্ণ হয়েও কেবলমাত্র প্রত্যন্ত গ্রামের কুটিরেই কোনোক্রমে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে সেই শিল্পগুলির আধুনিকীকরণের কোনো চেষ্টা এখনও যথাযথভাবে শুরু হয়নি। এটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

দু-একটি উদাহরণে বিশদ হই। সবংয়ের মাদুর শিল্প এ যাবৎ ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প হয়ে কোনোভাবে বেঁচে আছে। অথচ এই শিল্প মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে আংশিকভাবে হলেও গ্রামে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ দিয়েছে এবং দিচ্ছে। এই শিল্পকে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সাহায্যে পরিবর্ধন পরিমার্জন এমন কি উদ্বর্তন যে করা যায় সে নিয়ে একটি স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা প্রশংসনীয় কাজ করছে বিগত কয়েক বছর ধরে। এই শিল্পকে আধুনিক সভ্য মানুষের দরবারে তারা এনেছে এবং সবচেয়ে আশার কথা এটি আর্থিক ও বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জন করেছে। এই শিল্পকে আরও কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা নিয়ে ওই সংস্থাটি সর্বদা সচেষ্ট। এই কাজে তারা খড়্গপুর আই আই টির সহযোগিতা ও পরামর্শ নিতে প্রয়াসী হয়েছে।

আরও একটি সম্ভাবনা উজ্জ্বল হতে চলেছে। খড়্গপুর আই আই টি এই জেলায় চা-গাছের চাষ শুরু করে উৎসাহজনক ফল পেয়েছে। আমি এবার আসামে দেখেছি ক্ষুদ্র মালিকানায়, এমন কি এক-দুএকর জমির মালিকও, ক্ষুদ্র চা-বাগিচা করে আর্থিক সাফল্য পেয়েছে। এখন অসমে এইসব ক্ষুদ্র চা-বাগিচার উৎপাদন দ্রুতগতিতে বাড়ছে। মেদিনীপুরে সেই সাফল্য আসে কিনা দেখা দরকার। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গবেষক-বিজ্ঞানীরা নদিয়া জেলায় এইভাবে চা চাষ করে সফল হয়েছেন।

শিল্প সম্ভাবনা বিকাশের দু-একটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনায় বক্তব্যটি আরও পরিষ্কার হবে। শংকরপুর বা জুনপুটে মৎস্য-ভিত্তিক শিল্প তৈরি করা সম্ভব। শুকনো মাছের গুঁড়ো থেকে যান্ত্রিক উপায়ে নানা ধরনের খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা যায়। পরিত্যক্ত বা বর্জ্য মাছ থেকে হাঁস-মুরগির খাবার ছাড়া নতুন ধরনের সার তৈরি করা যেতে পারে। এ নিয়ে গবেষণার সুযোগ আছে। মাছের চাষ, মাছ ধরা ও মাছ রপ্তানি এবং সংরক্ষণের পাশাপাশি এই নতুন প্রকল্পগুলিকে হাতে নিলে শিল্পোদ্যোগের আর্থিক সাফল্য উজ্জ্বল হতে পারে।

গড়বেতা-চন্দ্রকোনা-ঘাটাল অঞ্চলে আলুর চাষ বিখ্যাত। কিন্তু আলুভিত্তিক শুকনো খাদ্য যেমন চিপস্, আলুর পাঁপড় আলুর ঝুরি, আলুর গুঁড়ো প্রভৃতি নানান খাবার তৈরির কোনো কারখানা ওখানে নেই বা জেলার অন্যত্রও নেই। ফসল তোলার সময় আলু সংরক্ষণের সুবন্দোবস্তের অভাবে কৃষকদের কম দামে আলু বিক্রি করে দিতে হয়। বিদ্যুতের দাম বেশি এবং অভাব হওয়ায় নতুন ঠাণ্ডাঘর তৈরি ব্যয়সাপেক্ষ এবং দরিদ্র চাষীর নাগালের বাইরে। কিন্তু মুম্বাইয়ের ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারে গামা রশ্মির সাহায্যে আলু পেঁয়াজ সাধারণ অবস্থায় অনেকদিন সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। সেই সব উদ্যোগ এই জেলায় চালু করা যায় কিনা ভালভাবে খতিয়ে দেখা দরকার।

আজকাল প্লাস্টিক পণ্য পরিবেশ দূষণ করছে এই নিয়ে নানা স্থানে সংবাদপত্রে শোরগোল উঠেছে। অনেকে প্লাস্টিকের দ্রব্যকে, বিশেষ করে পলিথিন ফিল্মকে সম্পূর্ণ বর্জন করার উদার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশে বলি, এই আহ্বান হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস্ উদ্যোগের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। হলদিয়ায়, তো প্রধানত প্লাস্টিক এবং তার কাঁচামাল তৈরি হবে।
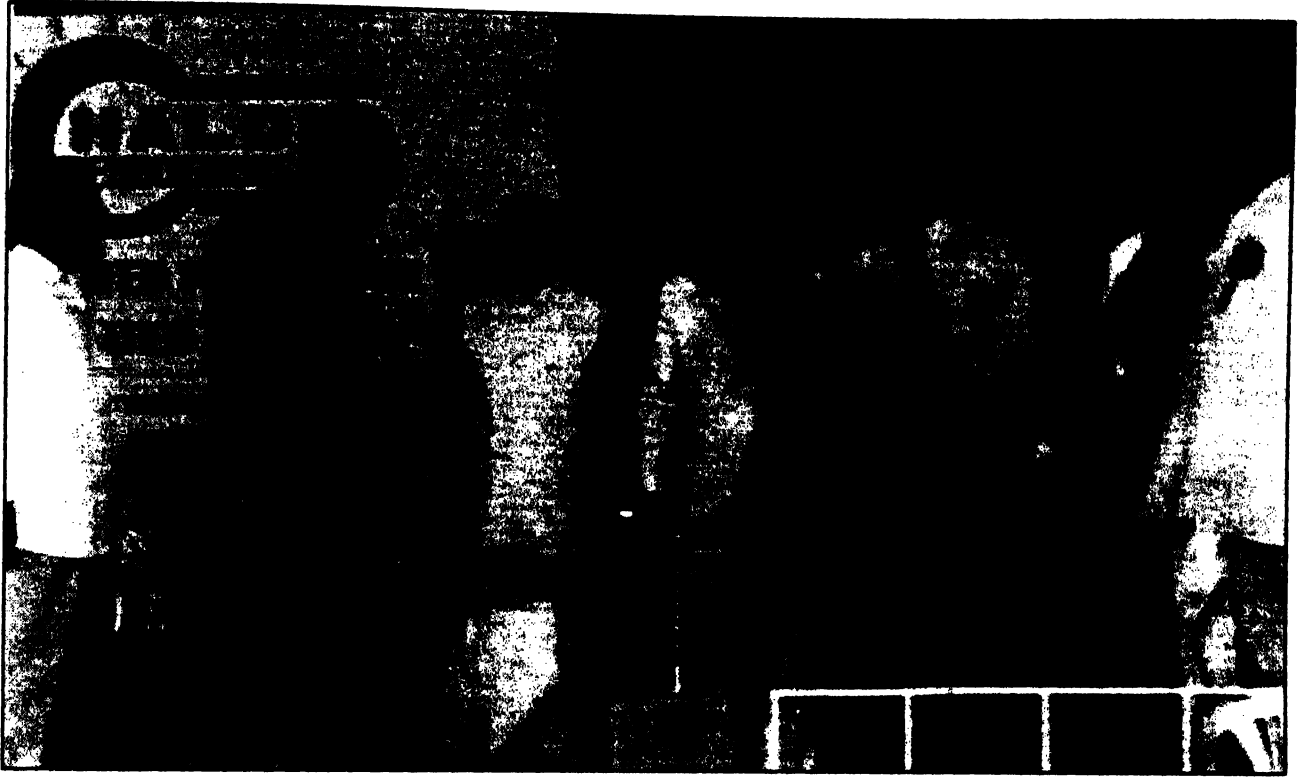
হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি

প্লাস্টিককে বিসর্জনের উদ্যোগ নিলে পেট্রোকেমিক্যালস শিল্পের কবর খোঁড়াই হবে। আসলে যারা প্লাস্টিক বা পলিমার বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অ আ ক খ জানে না তারাই এই বিসর্জনের হাঁকডাক দিচ্ছে। তাদের মনে করিয়ে দিতে চাই প্লাস্টিক যদি দূষণীয় বা বর্জনীয় বস্তু হয় তবে আজ হার্টের রোগীর জন্য প্লাস্টিক হার্ট ভালব্ লাগে কেন ? কানা খোঁড়া বধিরদের জন্য এই প্লাস্টিকের তৈরি কৃত্রিম অঙ্গ-প্রতঙ্গের ব্যবহার কেন সারা বিশ্বে দিনদিন বেড়ে চলেছে ? কেন আজ সর্বত্র সাবেকি ধাতব বস্তুর পরিবর্তে কৃত্রিম প্লাস্টিক ও রাবার ব্যবহৃত হচ্ছে ? আজ যদি প্লাস্টিককে আমাদের সভ্য সমাজ থেকে বিদায় দিতে হয়, তাহলে আমাদের আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতি শুধু থেমে যাবে না, আমরা গুহামানবের সভ্যতার দিকে পিছু হাঁটতে শুরু করব। আর কোথা থেকেই বা প্লাস্টিক রাবারকে বিদায় দেবেন? সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত, শোবার ঘর থেকে রান্নাঘর, বসার ঘর থেকে অফিসঘর, সাইকেল থেকে স্যাটেলাইট, দূরদর্শন থেকে কমপিউটার, টুথব্রাস থেকে টেলিফোন, ম্যাট্রেস থেকে মেডিসিন, বিকিনি থেকে বেনারসী, টাই থেকে ট্রাউজার—কোনটাকে বিসর্জন দেবেন ?

আসল অপরাধী প্লাস্টিক নয়। প্লাস্টিককে আরও শক্ত, আরও স্থায়ী, আরও ষড়ৈশ্বর্যময় করার জন্য প্রযুক্তিবিদ অনেক কৃত্রিম রাসায়নিক-এর সঙ্গে যুক্ত করে। সেই সংযুক্ত রাসায়নিকগুলির মধ্যেই দূষণের ভূত লুকিয়ে আছে। যেমন, অগ্নি-রোধক করার জন্য প্লাস্টিকের সঙ্গে যে সব রাসায়নিক মেশানো হয় সেগুলি বিপজ্জনক ও পরিবেশদূষক। এইসব বিপজ্জনক রাসায়নিকের পরিবর্তে প্রকৃতিজাত সম্পূর্ণ নিরাপদ বস্তু ব্যবহারে সমস্যার সমাধান সম্ভব। আমাদের গবেষণাগারে এটি প্রমাণিত। সেই নিরাপদ দূষণমুক্ত প্রকৃতিদত্ত অগ্নিরোধক বস্তুটি এই জেলার বনজ সম্পদে পাওয়া গেছে। এমনি আরও কিছু প্রকৃতিদত্ত সম্পদের খোঁজ মিলেছে যা কৃত্রিম প্লাস্টিককে সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত করতে সক্ষম। সেই সব অমূল্য গবেষণাকে শিল্প-উদ্যোগে পরিণত করার চেষ্টা অত্যন্ত জরুরি। এইভাবে ল্যাবরেটরির গবেষণাকে শিল্প-উদ্যোগে পরিণত করার জন্য চাই বিজ্ঞানী, প্রযুক্তি-গবেষক এবং শিল্পপতির সমবেত প্রয়াস।

এই সুযোগে জানাই যে পলিথিন ব্যাগ বাজারে কেনাকাটার সময় পাওয়া যায় সেগুলি সহজে বিনষ্ট হয় না এবং পরিবেশ দূষণ করে। খড়্গপুর আই আই টি এবং বরোদার আই পি সি এল-এর যৌথ উদ্যোগে নতুন ধরনের পলিথিন ফিল্ম তৈরি হয়েছে যা সহজেই বিনষ্ট হয়। আগামী দিনে এই ধরনের পলিথিন ফিল্মের বহুল ব্যবহার আশা করা যায়। এই উদাহরণের মতো হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস্ উপজাত পণ্য নিয়ে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী নতুন সামগ্রী তৈরির শিল্প আগামী দিনে গড়ে উঠতে পারে। এই বিষয়ে এখন থেকেই সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন পণ্যের প্রয়োজন বাড়বে। সাবেকি জিনিস দিয়ে হাল আমলের চাহিদা পূরণ অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না। তখন দরকার হবে নতুন গবেষণা নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে।

এই প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে নতুন শিল্প সম্ভাবনার সমূহ উদাহরণ কিংবা বিস্তৃত বিশ্লেষণ বা আলোচনা অসম্ভব। মোট কথা, বিজ্ঞানশিক্ষা, প্রযুক্তি গবেষণা এবং শিল্প সচেতনতা জনসাধারণের মধ্যে বাড়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগে জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা সম্ভব। অশিক্ষা কুসংস্কার দারিদ্র নিরসনের বড় হাতিয়ার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। তারপর চাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিলব্ধ জ্ঞান ও তথ্যকে কিভাবে অর্থলগ্নির মাধ্যমে শিল্পোদ্যোগ গড়ে তুলে অর্থ-উপার্জন করা। এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে সজাগ থাকা জরুরি। শিল্পের আর্থিক সাফল্য নির্ভর করে শিল্পজাত পণ্যের বাজার পাওয়ার ওপর। সে ব্যাপারে শিল্পপতি ও সরকার পরস্পরের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। শিল্পের সমৃদ্ধির জন্য উন্নত পরিকাঠামো—রাস্তা, যানবাহন, টেলিফোন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, জল, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা, ব্যাঙ্ক, বন্দর প্রয়োজন। এই জেলার পরিকাঠামো স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে বিশেষ কিছুই উন্নতি হয়নি। শিল্প-বাণিজ্যে সফল হতে গেলে শ্রমিকদের সহযোগিতা ও শ্রমনিষ্ঠা দরকার। আগেই বলেছি এবং এটা এখন সবাই জানেন, পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-শ্রমিকদের কর্মনিষ্ঠার সুখ্যাতি নেই। তাদের মানসিকতার পরিবর্তন না হলে এ রাজ্যে শিল্প-বিপ্লব অধরা থেকে যাবে। মেদিনীপুর জেলার মানুষ তুলনায় এখনও কর্মনিষ্ঠ আছেন। কিন্তু পুবের কর্মনাশা হাওয়া পশ্চিমের এই জেলায় এসেছে। আর কতদিন এ জেলার মানুষ কর্মনিষ্ঠ থাকবেন সে নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।
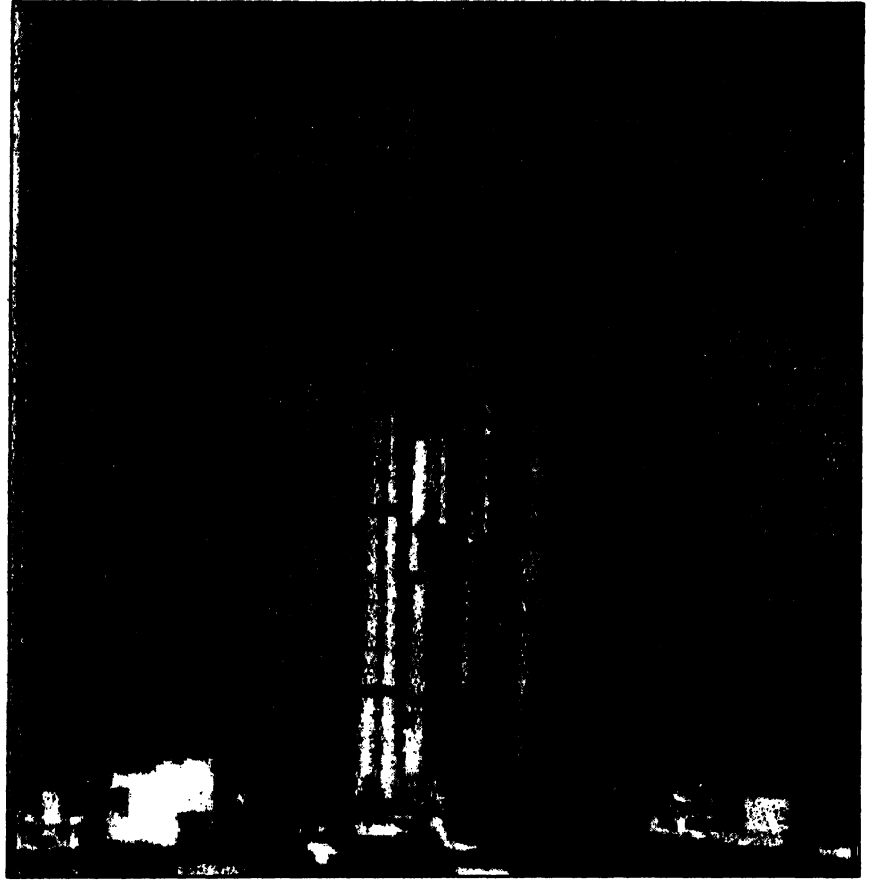
কোলাঘাট থার্মল পাওয়ার স্টেশন

প্রবন্ধের উপসংহারে শিল্পোদ্যোগ ও পরিবেশ দূষণ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলি। যেখানে মনুষ্য বসতি, সেখানে পরিবেশ দূষণ একটু-আধটু হবেই। তেমনি মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্ট কারখানায় পরিবেশের অনাবিলতার একটু দাগ লাগবেই। সম্পূর্ণ পরিবেশ দূষণমুক্ত কারখানা কোথাও নেই। দূষণ যাতে সহ্যসীমা ছাড়িয়ে না যায় তাই দেখতে হবে। এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, আলোচনা, গবেষণা দরকার। দেশের নেতাদের আলোচনায় বসতে হবে বিজ্ঞানী, গবেষক, প্রযুক্তিবিদ এবং শিল্পপতিদের সঙ্গে। কতটা দূষণ রোধ হল প্রযুক্তির সাহায্যে সম্ভব যেটা শিল্পে অর্থনৈতিক বিপর্যয় আনবে না, সেই মাত্রা আবার সহন-সীমানার বাইরে কিনা—এ নিয়ে বিশদ আলোচনা দরকার। শুধু একতরফা আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। আইন জারি করে কলকারখানা সহজেই বন্ধ করা যায়, কিন্তু তাতে পরিবেশ দূষণ যদিও বা রদ হয়, সামাজিক দূষণে যতি টানা যায় না।

খড়্গপুর আই আই টি বিজ্ঞান প্রযুক্তি শিক্ষা ও গবেষণার পীঠস্থান হলেও মেদিনীপুর জেলার মানুষ এই সুযোগ-সুবিধা এ পর্যন্ত যথাযথভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহ দেখায়নি। আই আই টি-র সাহায্য ও পরামর্শে কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে, নতুন নতুন বস্ত্র প্রযুক্তি ও শিল্পে, ইলেকট্রনিক শিল্পের ছোটখাটো যন্ত্রাংশ বা যন্ত্রপাতি উৎপাদনে এ জেলার আগ্রহী হওয়া উচিত। বিক্ষিপ্তভাবে না এগিয়ে একটি সার্বিক আলোচনার ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণে জেলার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের বৃহৎ শিল্পটি যখন উৎপাদনশীল হবে তখন এর উপজাত পণ্যসামগ্রী নিয়ে অনেক ছোট এবং মাঝারি শিল্প গড়ে উঠতে পারে। এ ব্যাপারে জেলা শিল্প কেন্দ্র সংস্থা উদ্যোগী হয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। এইভাবে কৃষিভিত্তিক, রসায়নভিত্তিক এবং বস্ত্রভিত্তিক—এই ত্রিধারা শিল্প সম্ভাবনাকে যদি সকলের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত করা যায়, তখন প্রকৃতপক্ষে এই জেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্থক প্রয়োগশালার একটি নজির স্থাপন করবে।

লেখক : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

কুটির শিল্পে শ্রমজীবী মহিলা

ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প বিকাশে মেদিনীপুর জেলা

শচীনন্দন সাউ

বর্তমান যুগ শিল্পায়নের, বৃহৎ ও আধুনিক শিল্পের। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভর আধুনিক শিল্পায়ন। পাশ্চাত্য কিছু দার্শনিক ও বিশেষজ্ঞ মনে করতেন যে, আধুনিক শিল্পায়নের ফলে প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের দিন শেষ হয়ে যাবে এবং প্রযুক্তি-নির্ভর আধুনিক শিল্প সর্বত্র বিরাজ করবে। কিন্তু ভারত সহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের অভিজ্ঞতা হল যে, ঐতিহ্যবাহী ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্প বহুলভাবে টিকে আছে, এমন কি সেগুলি প্রসার লাভও করছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক এমন কি রাজনৈতিক কারণ এ ঘটনার পিছনে রয়েছে। সংক্ষিপ্ত এই পটভূমিতে বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল, পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতের বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুরের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা।

তথ্যসম্ভার ও তার উৎস

বর্তমান আলোচনা সরকারি তথ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়েছে। মূল আলোচনায় শিল্পগুলিকে মোটামুটি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে দেখানো হয়েছে—(ক) গার্হস্থ্য শিল্প, (খ) গার্হস্থ্য নয় এমন শিল্প। ভারতের লোকগণনা থেকে তথ্য নিয়ে মূলত এই জেলার শিল্পবিকাশ আলোচনার চেষ্টা হয়েছে। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের যুগ্ম সহযোগিতায় পরিচালিত এবং প্রকাশিত অর্থনৈতিক গণনা থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সমীক্ষাও আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য জুগিয়েছে। মেদিনীপুর জেলার বার্ষিক পরিকল্পনা থেকেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

সারণি ১

মেদিনীপুর জেলায় গার্হস্থ্যশিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব

	১৯৭১			১৯৯১			২০০১
	কর্মী সংখ্যা		গার্হস্থ্যশিল্প কর্মীর শতাংশ	কর্মী সংখ্যা		গার্হস্থ্যশিল্প কর্মীর শতাংশ	কর্মী সংখ্যা
	গার্হস্থ্যশিল্প	মোট শিল্প		গার্হস্থ্যশিল্প	মোট শিল্প		গার্হস্থ্যশিল্প
গ্রামীণ	৩১,৬৫৪	৬২,৮৬২	৫০.৩৫	১১৬,২৪৯	২২১,৯০৭	৫৩.৭৪	২৭১,৫২৪
শহর	২,২৩৫	১৪,১৯৯	১৫.১৪	৩,৬২১	৩২,৭৮২	১১.০৫	৭৪২৩
মোট	৩৩,৮৮৯	৭৭,০৬১	৪৩.৯৮	১,২২,৮৭০	২,৫৪,৬৮৯	৪৮.২৪	২,৭৮,৯৪৭

উৎস : ভারতের লোকগণনা, ১৯৭১, ১৯৯১ এবং ২০০১ টীকা : ২০০১ সালে মোট শিল্পকর্মীর সংখ্যা প্রকাশিত নয়

গার্হস্থ্যশিল্পে মেদিনীপুর জেলার গুরুত্ব

গার্হস্থ্যশিল্পে মেদিনীপুর জেলার গুরুত্ব ভারতের লোক-গণনার তথ্য অনুযায়ী চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

(ক) শিল্পে মোট যত কর্মী কাজ করে তার মধ্যে গার্হস্থ্যশিল্পে কর্মী সংখ্যার অনুপাত, (খ) বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজে যত কর্মী কাজ করে তার মধ্যে গার্হস্থ্যশিল্পে কর্মী সংখ্যার অনুপাত, (গ) মেদিনীপুর জেলার শিল্পবিকাশে গ্রামের আপেক্ষিক গুরুত্ব, (ঘ) সারা পশ্চিমবঙ্গে শিল্পবিকাশের পটভূমিতে মেদিনীপুর জেলার আপেক্ষিক গুরুত্ব।

(ক) মেদিনীপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে ১৯৭১ সালে ৬২,৮৬২ জন কর্মী গার্হস্থ্যশিল্পে কাজ করতেন। এঁদের মধ্যে ৩১,৬৫৪ জন কর্মী (৫০ শতাংশের অধিক) নিযুক্ত ছিলেন গার্হস্থ্যশিল্পে। শহরাঞ্চলে অনুরূপ অনুপাত ১৫.৪৩ শতাংশ এবং গ্রাম ও শহর মিলে মোট অনুপাত ৪৩.৯৮ শতাংশ। ১৯৯১ সালে গ্রামাঞ্চলে শিল্পকর্মে ২,২১,৯০৭ জন কর্মী নিযুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে ৫৩.৭৪ শতাংশ গার্হস্থ্যশিল্পে নিযুক্ত ছিলেন। শহরাঞ্চলে অনুরূপ অনুপাত ১১.০৫ শতাংশ এবং গ্রাম ও শহর মিলে ৪৮.২৪ শতাংশ। ১৯৭১-এর তুলনায় ১৯৯১ সালে গার্হস্থ্যশিল্পে কর্মী সংখ্যার অনুপাত ৫০ শতাংশ থেকে বেড়ে প্রায় ৫৪ শতাংশ হয়েছে। যদিও শহরাঞ্চলে গার্হস্থ্যশিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমেছে (১৫ শতাংশ থেকে ১১ শতাংশ), গ্রাম ও শহর মিলে গার্হস্থ্যশিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৪৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৮ শতাংশের ওপর হয়েছে (সারণি ১)।
উল্লিখিত সারণি থেকে এটা স্পষ্ট যে, মেদিনীপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে এবং সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় গার্হস্থ্যশিল্পায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে, অর্থাৎ গার্হস্থ্যশিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৯৭১-এর তুলনায় ২০০১ সালে বেড়েছে। অন্যদিকে, মেদিনীপুর জেলার শহরাঞ্চলে গার্হস্থ্যশিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে, অর্থাৎ গার্হস্থ্যশিল্পে অব-শিল্পায়ন ঘটেছে।

(খ) মেদিনীপুর জেলা মূলত কৃষিপ্রধান জেলা। এর অধিকাংশ কর্মী কৃষিকাজে নিযুক্ত রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য সেবামূলক কাজেও উল্লেখযোগ্য অংশ নিযুক্ত আছে। সামগ্রিকভাবে তাই মোট কর্মীসংখ্যার এক সামান্য অংশ গার্হস্থ্যশিল্পে নিযুক্ত রয়েছে। তবে উল্লেখযোগ্য দিক হল, ১৯৭১-এর তুলনায় ১৯৯১ সালে গার্হস্থ্যশিল্পে কর্মীসংখ্যার অনুপাত সারা জেলা জুড়ে বিশেষ করে জেলার গ্রামাঞ্চলে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে (সারণি ২)।

সারণি ২

গার্হস্থ্যশিল্পকর্মীর শতকরা হার

	১৯৭১	১৯৯১	২০০১
গ্রাম	২.৩২	৫.১৬	৭.৮৬
শহর	২.১৪	১.৬২	২.৮০
মোট	২.৩০	৪.৮৫	৭.৪১

উৎস : ভারতের লোকগণনা, ১৯৭১, ১৯৯১

উল্লিখিত সারণি থেকে এটা স্পষ্ট যে, গ্রামাঞ্চলে ১৯৭১ সালে মোট কর্মীসংখ্যার মাত্র ২.৩২ শতাংশ গার্হস্থ্যশিল্পে কাজ করতো। ২০০১ সালে ওই শতাংশ তিনগুণের ওপর বেড়ে ৭.৮৬ শতাংশ হয়েছে এবং সারা জেলায় উল্লিখিত সময়ে গ্রামীণ শিল্পকর্মীর শতাংশ ২.৩০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭.৪১ শতাংশে পৌঁছেছে। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯১ সালে শহরাঞ্চলে অবশ্য বিপরীত চিত্র চোখে পড়েছে। এখানে গার্হস্থ্যশিল্পে কর্মীর শতকরা হার ২.১৪ থেকে কমে ১.৬২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০০১ সালে উক্ত শতাংশ অবশ্য বেড়ে হয়েছে ২.৮০, যা গ্রামের থেকে কম।

(গ) শিল্পায়নে মেদিনীপুর জেলার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, গ্রামীণ এলাকায় উল্লেখযোগ্যভাবে শিল্পের বিকাশ। এই জেলায় ১৯৭১ সালে গার্হস্থ্যশিল্পে যত লোক কাজ করতেন তার ৯৩ শতাংশই গ্রামাঞ্চলে বাস করেন। ২০০১ সালে এই শতাংশ বেড়ে হয়েছে প্রায় ৯৮। সমস্ত শিল্প মিলে ১৯৭১ সালে প্রায় ৮২ শতাংশ কর্মী গ্রামে বাস করতেন। ১৯৯১ সালে এই শতাংশ ৯০ ছাড়িয়ে গেছে।

(ঘ) গার্হস্থ্যশিল্পে ১৯৭১ সালে সারা পশ্চিমবঙ্গে যত শ্রমিক কাজ করতেন তার ১৪.৯ শতাংশ কাজ করতেন মেদিনীপুর জেলায়। ২০০১ সালে এই শতাংশ কমে হয়েছে ১৩। অন্যদিকে, সারা পশ্চিমবঙ্গের মোট শিল্পকর্মীর ১৩.৮

শতাংশ কাজ করতেন মেদিনীপুর জেলায়, ১৯৯১ সালে এই শতাংশ কমে হয়েছে ৭.৭৫।

শিল্পায়নে মেদিনীপুর জেলার গুরুত্ব আর একভাবেও দেখা যেতে পারে। ১৯৭৭ সাল থেকে সারা ভারতের অর্থনৈতিক সমীক্ষা চলছে। ১৯৮০ ও ১৯৯০ সালে ওই সমীক্ষা হয়েছে। ওই সমীক্ষা অনুযায়ী শিল্প সংস্থাগুলিকে দুটি শ্রেণীতে নয় এমন শিল্প শ্রমিক অন্তত একজন কাজ করে এমন শিল্পসংস্থার মধ্যে মেদিনীপুর জেলার ভাগ ছিল ১০.৬২ শতাংশ। ১৯৯৮ সালে অবশ্য প্রথম শতাংশটি কমে ২৩.২১-এ এবং দ্বিতীয় শতাংশটি বেড়ে ১৯.৫৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মোট শিল্পসংস্থার মধ্যে মেদিনীপুর জেলার অংশও ১৯৯০ সালে ২৫.৩০ থেকে কমে ১৯৯৮ সালে ২২.৫৫-এ হয়েছে।

সারণি ৩

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে মোট শিল্পসংস্থার মধ্যে মেদিনীপুর জেলার অংশ

শিল্পসংস্থার ধরন	মেদিনীপুর জেলা		সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ		মেদিনীপুর জেলার অংশ	
	১৯৯০	১৯৯৮	১৯৯০	১৯৯৮	১৯৯০	১৯৯৮
গার্হস্থ্য শ্রমিক-নির্ভর শিল্পসংস্থা	১১১,৯২৫	১০১,২৯১	৪১০,০৯০	৪৩৬,৩৫৯	২৭.২৯	২৩.২১
গার্হস্থ্য নয় এমন শ্রমিক অন্তত একজন কাজ করে এরূপ শিল্পসংস্থার সংখ্যা	৯,৩৪৯	১৮,৭৮২	৬৮,৬৪৫	৯৬,০৫১	১০.৬১	১৯.৫৫
মোট শিল্পসংস্থার সংখ্যা	১২১,২৭৪	১২০,০৭৩	৪৭৮,৭৩৫	৫৩২,৪১০	২৫.৩০	২২.৫৫

উৎস : অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৯০

ভাগ করা হয়েছে—(১) গার্হস্থ্য শ্রমিক-নির্ভর শিল্প সংস্থা (২) গার্হস্থ্য নয় এমন শ্রমিক অন্তত একজন নিযুক্ত হয়েছে এরূপ শিল্প সংস্থা। দেখা গিয়েছে যে সারা পশ্চিমবঙ্গে গার্হস্থ্য শ্রমিক-নির্ভর যত সংস্থা রয়েছে তার এক-চতুর্থাংশের ওপর রয়েছে মেদিনীপুর জেলায় এবং মোট শিল্প সংস্থারও এক-চতুর্থাংশ মেদিনীপুর জেলায় রয়েছে (সারণি ৩)।

উল্লিখিত সারণি থেকে এটা স্পষ্ট যে, ১৯৯০ সালে গার্হস্থ্য শ্রমিকনির্ভর শিল্পসংস্থায় সারা পশ্চিমবঙ্গে যত সংখ্যক শিল্পসংস্থা ছিল তার মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় ছিল ২৭.২৯ শতাংশ এবং মোট শিল্পসংস্থার ২৫.৩০ শতাংশ। অবশ্য গার্হস্থ্য

গার্হস্থ্যশিল্পে অগ্রগতি

গার্হস্থ্যশিল্পে মেদিনীপুর জেলার অগ্রগতি খুবই উল্লেখযোগ্য। এই জেলার গ্রামাঞ্চলে শহরাঞ্চলের তুলনায় কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বেশি হারে। এটা লক্ষণীয় যে, পুরুষ শিল্পীর সংখ্যা যে হারে বেড়েছে নারী শিল্পীর সংখ্যা বেড়েছে অনেক বেশি হারে। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মোট গার্হস্থ্যশিল্পীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৪ গুণ, যেখানে শহরাঞ্চলে ওই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে দেড় গুণের কিছু বেশি। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে নারী শিল্পীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮ গুণ-এর বেশি।

ঘাটালের 'দিশা' সংস্থার ধূপ তৈরির প্রশিক্ষণ শিবির

গার্হস্থ্যশিল্পে মেদিনীপুর জেলার এই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি গার্হস্থ্য নয় এমন শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত গার্হস্থ্যশিল্পে এই জেলার সংখ্যা বেড়েছে গার্হস্থ্য নয় এমন শিল্পে কর্মী সংখ্যার তুলনায় বেশি হারে। অন্যদিকে ১৯৭১-এর তুলনায় ১৯৯১ সালে গার্হস্থ্য নয় এমন শিল্পে পুরুষ কর্মীসংখ্যা গার্হস্থ্য পুরুষ কর্মীসংখ্যার তুলনা বেশি হারে বেড়েছে এবং নারী কর্মীসংখ্যা বেড়েছে কম হারে। মোট কর্মীসংখ্যা অবশ্য বেড়েছে অধিক হারে গার্হস্থ্য শিল্পেই। ২০০১ সালেও জেলার গ্রাম ও শহরে গার্হস্থ্য শিল্পে কর্মীসংখ্যা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে।

সারণি ৪

মেদিনীপুর জেলার গ্রাম ও শহরাঞ্চলে গার্হস্থ্য ও গার্হস্থ্য নয় এমন শিল্পী সংখ্যার সূচক

	১৯৭১			১৯৮১			১৯৯১			২০০১		
	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
গার্হস্থ্যশিল্প												
গ্রাম	১০০	১০০	১০০	২১৭	৩২৭	২৩৫	২৮২	৮০০	৩৭৭	৩৬৪	৩০৫২	৮৫৮
শহর	১০০	১০০	১০০	২০৮	৩৪৮	২১৫	১২৪	৮৩৪	১৬২	২০২	২৬৪০	৩৩২
মোট	১০০	১০০	১০০	২১৬	৩১৯	২৩৫	২৭০	৮০১	৩৬৩	৩৫৬	৩০৪৫	৮২৪
গার্হস্থ্য নয় এমন শিল্প												
গ্রাম	১০০	১০০	১০০	১৭৩	১১৭	১৬৬	৩৩৪	২৯৫	৩২৯	—	—	—
শহর	১০০	১০০	১০০	২১০	১৯৯	২০৯	২৭৩	২৭২	২৪৪	—	—	—
মোট	১০০	১০০	১০০	১৮৪	১২৬	১৭৮	৩০৭	২৯২	৩০৫	—	—	—

রেজিস্ট্রিকৃত ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে মেদিনীপুর জেলার অগ্রগতি

গার্হস্থ্যশিল্প ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের একটি অংশমাত্র, তাই গার্হস্থ্যশিল্পে অগ্রগতি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিকাশ সূচিত করে না। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অগ্রগতি নিয়ে তাই স্বতন্ত্র আলোচনা করতে হয়। ক্ষুদ্রায়তন যে সকল শিল্প পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ডাইরেক্টরেটে রেজিস্ট্রিকৃত হয় সে সমস্ত শিল্পের সংখ্যা এবং ওই শিল্প সংস্থায় নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা নিয়ে কিছু তথ্য সরকারি সূত্র থেকে পাওয়া যায়। এ সকল তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে রেজিস্ট্রিকৃত সংস্থার সংখ্যা এবং তাতে নিযুক্ত কর্মীসংখ্যা ১৯৮০-র দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ১৯৮০-৮১ সালে মেদিনীপুর জেলায় রেজিস্ট্রিকৃত ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সংস্থার সংখ্যা ছিল ১,২০০, ১৯৯০-৯১ সালে তা তিনগুণেরও অধিক বেড়ে হয়েছে ৩,৬৫৮। এই সংস্থাগুলিকে উল্লিখিত সময়ে কর্মীসংখ্যা দেড়গুণেরও ওপর বেড়ে ১৯৯০-৯১ সালে হয়েছে ১৭,৯১৫। ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হওয়ার পর অবশ্য ইউনিট সংখ্যা ও কর্মীসংখ্যা উভয়ই কমেছে। (সারণি-৫)।

মেদিনীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প

এই জেলার ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থাগুলিকে মোটামুটি ৮টি শ্রেণীতে ভাগ করে দেখানো হয়—কৃষিভিত্তিক, বন বিভাগ, গৃহপালিত পশুভিত্তিক, তন্তুভিত্তিক, রসায়নভিত্তিক, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, গৃহ নির্মাণ সামগ্রী এবং সেরামিকভিত্তিক, অন্যান্য।

কৃষিভিত্তিক শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, মাদুরশিল্প,। এর উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হল সবং, পিংলা, এগরা, রামনগর, নারায়ণগড় এবং পটাশপুর। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কৃষিভিত্তিক শিল্প হল ধানকোটা শিল্প যা মেদিনীপুর জেলার ৫২টি ব্লকেই ছড়িয়ে আছে, চাল মিল যা ডেবরা, মেদিনীপুর এবং সবং এলাকায় কেন্দ্রীভূত রয়েছে। কাজুশিল্প কেন্দ্রায়িত রয়েছে কাঁথি, রামনগর এবং ঝাড়গ্রাম ব্লকে। ফল প্রসেসিং শিল্প কেন্দ্রায়িত রয়েছে ঝাড়গ্রাম এবং কাঁথি ব্লকে। হিমঘর শিল্প কেন্দ্রীভূত রয়েছে গড়বেতা, চন্দ্রকোণা, ঘাটাল এবং পাঁশকুড়া অঞ্চলে। ধানের তুষ থেকে তেল তৈরি শিল্প রয়েছে মেদিনীপুর শহরে। তাছাড়া তেল ঘানি, গম পেষাই, বেকারি, চানাচুর, বিড়ি, চিঁড়া, মশলা ইত্যাদি কৃষিভিত্তিক শিল্প মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

সারণি ৫

মেদিনীপুর জেলায় রেজিস্ট্রিকৃত ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সংস্থা ও তার কর্মীসংখ্যা

	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১	২০০১-০২
ইউনিট সংখ্যা	১,২৩১	২,৮৫৯	৩,৬৫৮	১,৪৫২
কর্মীসংখ্যা	১০,৪৫১	১৭,৮৫০	১৭,৯১৫	১১,৪৩৩

উৎস : পশ্চিমবঙ্গ সরকার : আর্থিক সমীক্ষা

কুটিরশিল্প, শালপাতার থালা তৈরি মেসিন

বনভিত্তিক শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল করাত কল, বাঁশ শিল্প, আসবাবপত্র, শালপাতা থেকে প্লেট তৈরি শিল্প। মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অংশে মূলত বনভিত্তিক শিল্পের কেন্দ্রীভবন দেখা যায়।

গৃহপালিত পশুভিত্তিক শিল্পের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল, মুরগি পালন, চর্মশিল্প এবং চিরুনি শিল্প। চিরুনি শিল্প কোলাঘাট এবং দাশপুর অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। অন্য শিল্পগুলি মেদিনীপুর শহর এবং জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে।

তন্তুভিত্তিক শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল তাঁতশিল্প, যা তমলুক এবং কাঁথি এলাকায় এখনও ভালভাবে চলছে। অন্যান্য তন্তুভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হল, দর্জি শিল্প, হোসিয়ারি শিল্প, মশারি শিল্প ইত্যাদি যা জেলার বিভিন্ন অংশে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

রসায়নভিত্তিক শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, সাবান, আগরবাতি, আইসক্রিম, নাইলন সুতা ইত্যাদি শিল্প যা তমলুক, ঘাটাল, কাঁথি এবং মেদিনীপুর সদর মহকুমার ব্লকগুলিতে রয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল, সাইকেল মেরামত ও পরিষেবা, অটো মেরামত, রেডিও, ঘড়ি মেরামত, বাস, ট্রাক ও ট্যাক্সির বডি তৈরি, অ্যালুমিনিয়ামের বাসন, কাঁসা ও পিতল এবং অন্যান্য সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। এই শিল্পগুলি মুখ্যত শহরকেন্দ্রিক। তবে বিভিন্ন গ্রামেও এই শিল্প প্রসারলাভ করছে।

গৃহনির্মাণ সামগ্রী এবং সেরামিক শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইট ও টালি, স্টোনচিপ, আর সি সি দ্রব্য, মৃৎশিল্প ইত্যাদি। ইট ও টালি শিল্প নদীতীরবর্তী এলাকায় গড়ে উঠছে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হল বই বাঁধাই, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, মিষ্টির দোকান, জেরক্স, ফটোগ্রাফ, সিনেমা, ব্যাগ তৈরি, মৌমাছি পালন, সোলার জিনিসপত্র তৈরি এবং শাঁখা শিল্প। মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশে এইগুলি ছড়িয়ে আছে।

উল্লিখিত শিল্পগুলির ভিত্তি হল স্থানীয় সম্পদ, মানুষের চাহিদা, শ্রমিকের দক্ষতা এবং হলদিয়া, খড়্গপুর এবং ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের বৃহদায়তন শিল্পের চাহিদা। মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা বিস্তার লাভ করছে এবং এর ওপর ভিত্তি করে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কেন্দ্র বিকশিত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কেন্দ্রগুলি হল—হলদিয়া, খড়্গপুর, ঝাড়গ্রাম, কাঁথি, দীঘা, পাঁশকুড়া, কোলাঘাট, তমলুক, মহিষাদল, গড়বেতা, চন্দ্রকোণা রোড, বালিচক, বেলদা, এগরা, ঘাটাল এবং শিলদা।

মেদিনীপুর জেলায় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থা কতগুলি রয়েছে তার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় সম্ভব হয়নি। এই জেলার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দলিল অনুযায়ী এই শিল্পসংস্থার সংখ্যা প্রায় ৪৭,০০০। আশির দশকের শেষভাগে এবং নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় এই কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থার সংখ্যা আরো বেড়েছে। এই জেলায় ১৯৯৫ সালে তাঁতের সংখ্যা ছিল ৬২,০৩৩ এবং সক্রিয় সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১৩৮ যেখানে ৩৫৮৯টি তাঁত সক্রিয় ছিল। ওই সালে সমবায় ক্ষেত্রে বস্ত্র উৎপাদন হয়েছিল ১৩,১৬৩ লক্ষ মিটার।

মুরগি-হাঁস-ছাগল প্রাণি পালনের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা
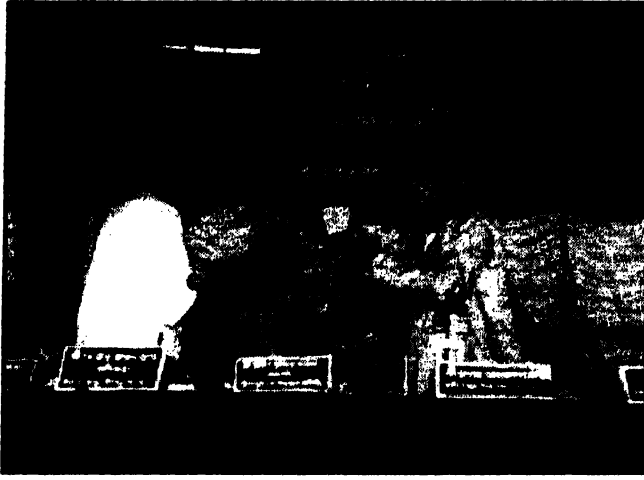
চন্দনপুর তন্তুবায় সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে লভ্যাংশ বাবদ একটি চেক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে

গার্হস্থ্য ও ক্ষুদ্রশিল্পে সমস্যা

গার্হস্থ্য ও ক্ষুদ্রশিল্পে মেদিনীপুর জেলার অগ্রগতি ও বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য হলেও অধিকাংশ শিল্পের বিকাশ বিভিন্ন কারণে ব্যাহত হচ্ছে। এই বাধা বা সমস্যাগুলিকে মোটামুটি কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(ক) অর্থনৈতিক, (খ) সাংগঠনিক (গ) প্রাতিষ্ঠানিক ও (ঘ) প্রাযুক্তিক।

(ক) **অর্থনৈতিক** : গার্হস্থ্য ও ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশের পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা হল অর্থনৈতিক। একদিকে শিল্পীরা অধিকাংশই দারিদ্র্য-পীড়িত। ফলে শিল্পের প্রয়োজনীয় মূলধন তাদের হাতে নেই। অন্যদিকে প্রযুক্তি-নির্ভর মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ওই সকল ক্ষুদ্র ও গার্হস্থ্য শিল্প অনেক ক্ষেত্রে পিছু হঠতে থাকে। কাঁচামালের বিশেষত সুতার অভাব তাঁতশিল্পীদের অকেজো করে। সুতার অত্যধিক দামও তাদের লাভের মাত্রা কমিয়ে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শ্রমের জন্য প্রাপ্য আয়টুকুও তারা সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে শিল্পী ও শিল্পকর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের আয় খুবই সামান্য হয়, দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে।

(খ) **সাংগঠনিক** : শিল্পীদের মধ্যে উপযুক্ত সংগঠনের অভাব, এখনও অনেক শিল্পী মধ্যযুগীয় দাদন প্রথায় কাজকর্ম করতে বাধ্য হয়। মহাজনি শোষণে তারা জর্জরিত। স্বাভাবিক মজুরিও অনেক ক্ষেত্রে তারা শিল্প থেকে পায় না। বিকল্প নিয়োগের অপ্রতুলতায় ও অভাবে ঐতিহ্যবাহী মধ্যস্বত্বভোগী এবং মহাজন কবলিত অনেক শিল্পে কম আয়েও তারা লেগে থাকে। সমবায় সমিতির বিকাশ তাদের অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারত, কিন্তু সমবায় আন্দোলন ও তার বিকাশ মেদিনীপুর জেলায় অত্যন্ত দুর্বল। তাঁতশিল্পে অবশ্য বেশ কিছু সমবায় সমিতি রয়েছে। কিন্তু এর অর্ধেকেরই বেশি মৃত অথবা মুমূর্ষ। যেমন, মেদিনীপুর জেলায় ১৯৯৫ সালে তাঁত সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৩৯৬। কিন্তু তাদের মধ্যে সক্রিয় সমবায় সমিতির সংখ্যা হল ১৫৫ অর্থাৎ ৪০ শতংশেরও নিচে। মেদিনীপুর জেলায় যত তাঁত আছে (৬২,০৩৩) তার মাত্র ১৫ শতাংশ সক্রিয় সমবায় সমিতির আওতায় রয়েছে। অন্যভাবে বললে, শতকরা ৮৫ ভাগ তাঁত সমবায়ের বাইরে রয়েছে। সেখানে মহাজন এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রাধান্য ও দাপট অত্যধিক এবং শিল্পীরা অসহায় ও দরিদ্র। কাঁসা ও পিতল শিল্পের ওপর বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট স্তরে গবেষণা করে দেখা গেছে যে, এই শিল্পেও সমবায় সমিতির সংখ্যা খুবই সামান্য। স্বাধীনভাবে চালান হয় এমন শিল্পের সংখ্যাও সীমিত। মহাজন ও মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর নির্ভরশীলতা এবং তাদের সঙ্গে বন্ধন ও বদ্ধতা শিল্পীর আয়ের উপর প্রভাব ফেলে। দেখা গিয়েছে যে, মহাজন ও মধ্যস্বত্বভোগীদের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের আর্থিক অবস্থা সবচেয়ে দুঃস্থ এবং তাদের অধিকাংশই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। সমবায় সমিতির সঙ্গে যে সব শিল্পীরা যুক্ত রয়েছে তাদের আর্থিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান আপেক্ষিকভাবে ভালো। সবচেয়ে ভালো অবস্থায় রয়েছে স্বাধীন শিল্পী ব্যবসায়ীরা। শিল্প থেকে মুনাফার পুরো অংশটা তারা ভোগ করে এবং তাদের অধিকাংশের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ও উন্নত।

(গ) **প্রাতিষ্ঠানিক** : এই জেলার কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশে আর একটি অন্তরায় হল ঋণের সমস্যা। ঋণ প্রতিষ্ঠানের শাখা সংখ্যা মেদিনীপুর জেলায় যথেষ্ট (২০০২ সালের জুন মাসে ৪৮০ এবং ২০০২ সালের জুন মাসের শেষে ২০,০০০ জন পিছু একটি ব্যাঙ্ক অফিস) হলেও তাদের ঋণদান প্রবণতা, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে কম (ঋণদান-সঞ্চয় সংগ্রহ অনুপাত ২০০২ সালের জুন মাসে ২১.০ শতাংশ) হওয়ায় ক্ষুদ্রশিল্পীরা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ সহজে পায় না, অথবা উপযুক্ত মাত্রায় ঋণ জোটে না। ফলে গ্রাম্য মহাজনের ওপর শিল্পীদের নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে। এখানে সুদের হার অত্যন্ত চড়া হওয়ায় শিল্পীদের অবস্থা করুণ হয়।

(ঘ) **প্রাযুক্তিক** : ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে যে স্থানীয় প্রযুক্তি দেখা যায় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুবই নিম্নমানের। পূর্বপুরুষানুক্রমে শিল্পীরা সাধারণভাবে পুরনো দিনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ খুবই সামান্য। ফলে, মেদিনীপুর জেলায়, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে নিম্নমানের প্রযুক্তির কারণে শিল্পের উৎপাদিকা শক্তি কম হয় এবং শিল্পীদের আয় এবং শিল্পকর্মীদের মজুরিও সামান্য হয়। শিল্পের ভূমিকা নিয়োগ ব্যাপারে অসামান্য হলেও পারিবারিক আয় সৃষ্টিতে এর অবদান সামান্যই রয়ে যায়।

সংক্ষিপ্তসার ও সিদ্ধান্ত

বর্তমান যুগ আধুনিক এবং বৃহৎ শিল্পের যুগ হলেও বহু ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও গার্হস্থ্যশিল্প মেদিনীপুর জেলায় এখনও টিকে আছে এবং প্রসার লাভ করছে। ভারতের লোকগণনা অনুযায়ী

মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন শিল্পে যত লোক কাজ করে তার অধিকাংশই গ্রামীণ শিল্পে নিযুক্ত রয়েছে। আবার গ্রামাঞ্চলে যত শিল্পকর্মী রয়েছে তার অর্ধেকের বেশি নিযুক্ত রয়েছে গার্হস্থ্যশিল্পে। শহরাঞ্চলে অবশ্য গার্হস্থ্য নয় এমন শিল্পের প্রাধান্য। ১৯৭১ সালের তুলনায় ১৯৯১ সালে গ্রামীণ গার্হস্থ্যশিল্পে কর্মীসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গ্রাম ও শহর মিলে গার্হস্থ্যশিল্পে কর্মীসংখ্যার অনুপাতও বেড়েছে। শহরাঞ্চলে অবশ্য গার্হস্থ্যশিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭১-এর তুলনায় ১৯৯১ সালে বিভিন্ন শিল্পে এই জেলায় নিযুক্ত যত কর্মী রয়েছে তাদের মধ্যে গার্হস্থ্যশিল্পে কর্মীর শতকরা হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যায়, ১৯৭১ সালের তুলনায় ১৯৯১ সালে মেদিনীপুর জেলার আপেক্ষিক গুরুত্ব গার্হস্থ্যশিল্পে বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও গার্হস্থ্য নয় এমন শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব ওই সময়ে কমেছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী সারা পশ্চিমবঙ্গের মোট গার্হস্থ্য শ্রমিকনির্ভর শিল্প সংস্থার এক-চতুর্থাংশের বেশি মেদিনীপুর জেলায় রয়েছে। মেদিনীপুর জেলার শিল্পবিকাশে অগ্রগতি বিচার করলে দেখা যায় ১৯৭১ সালের তুলনায় ২০০১ সালে পুরুষ কর্মীর সংখ্যা চার গুণের কাছাকাছি বেড়েছে এবং নারী কর্মীর সংখ্যা বেড়েছে তিরিশগুণের ওপর। গার্হস্থ্য নয় এমন শিল্পেও ১৯৭১—১৯৯১ সালে কর্মীসংখ্যা বেড়ে তিনগুণ হয়েছে। রেজিস্ট্রিকৃত ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে শিল্পসংস্থার সংখ্যা ১৯৮০-র দশকে বৃদ্ধি পেয়ে তিনগুণ হয়েছে। অন্যদিকে কর্মীসংখ্যা বেড়ে দেড়গুণ ছাড়িয়ে গেছে উল্লিখিত সময়ে। অবশ্য ১৯৯০-এর দশকে এই সংখ্যা কমেছে। এর পিছনে অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রভাব রয়েছে।

এই জেলার কৃষিভিত্তিক শিল্প সারা জেলা জুড়ে ছড়িয়ে থাকলেও বিশিষ্ট কয়েকটি শিল্প, যেমন মাদুরশিল্প, কাজুশিল্প, হিমঘর শিল্প এবং ফল প্রসেসিং শিল্প মেদিনীপুর জেলা পূর্ব ও পশ্চিমের কয়েকটি বিশিষ্ট ব্লকে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। বনভিত্তিক শিল্পের কেন্দ্রীভবন ঘটেছে মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অংশে। গৃহপালিত পশুভিত্তিক শিল্পের অধিকাংশই সারা মেদিনীপুর জেলা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। তন্তুভিত্তিক শিল্প সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। রসায়নভিত্তিক শিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মুখ্যত শহরাঞ্চলে এবং গঞ্জ এলাকায় গড়ে উঠেছে। গৃহনির্মাণ সামগ্রী এবং সেরামিক শিল্প সম্পর্কেও একথা বলা যায়। অন্যান্য শিল্প সকল জেলার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে আছে। উল্লিখিত শিল্পগুলি স্থানীয় সম্পদ, মানুষের চাহিদা, শ্রমিকের দক্ষতা এবং নগরাঞ্চলের বৃহদায়তন শিল্পগুলির চাহিদার ওপর গড়ে উঠেছে। জেলার বিভিন্ন অংশে বিশেষত হলদিয়া, খড়্গপুর ও কোলাঘাটে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব না হলেও বিভিন্ন শিল্প সংস্থার সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার

গামছা বয়নরত মহিলা তাঁতশিল্পী

ছাড়িয়ে গেছে। এই জেলায় তাঁতের সংখ্যাও ষাট হাজার অতিক্রম করেছে।

গার্হস্থ্য ও ক্ষুদ্রশিল্পে মেদিনীপুর জেলায় অগ্রগতি হলেও বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সাংগঠনিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত কারণে এই জেলার শিল্প বিকাশ যথেষ্ট ব্যাহত হচ্ছে। শিল্পের বিকাশ যাতে শিল্পী এবং শিল্পকর্মীর স্বার্থে ঘটে সেজন্য সাংগঠনিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশের দিকে নজর দিতে হবে। মহাজন ও মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ থেকে শিল্পীদের রক্ষা করতে গেলে সমবায়ের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুযোগ-সুবিধাও যাতে ক্ষুদ্রশিল্পীরা পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং ন্যায্য সুদে পায় তার দিকেও নজর রাখা দরকার। শিল্পের আয় বাড়ানোর স্বার্থে উপযুক্ত প্রযুক্তিগত উন্নয়নও ক্ষুদ্র শিল্পে ঘটাতে হবে। এ সকল ব্যবস্থা উপযুক্ত মাত্রায় নিতে পারলে মেদিনীপুর জেলার কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে এবং ক্ষুদ্র শিল্পীরা ও শিল্পকর্মীরা উন্নততর জীবনের সন্ধান পাবে।

লেখক : অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

টেরাকোটা, দক্ষিণাকালী মন্দির, খড়গপুর (মালঞ্চ)
ছবি : প্রশান্ত প্রামাণিক

ঝাড়েশ্বরনাথ শিবমন্দিরে উৎকীর্ণ বাদ্যবাদকবৃন্দের ফলক, কানাশোল ছবি : তারাপদ সাঁতরা
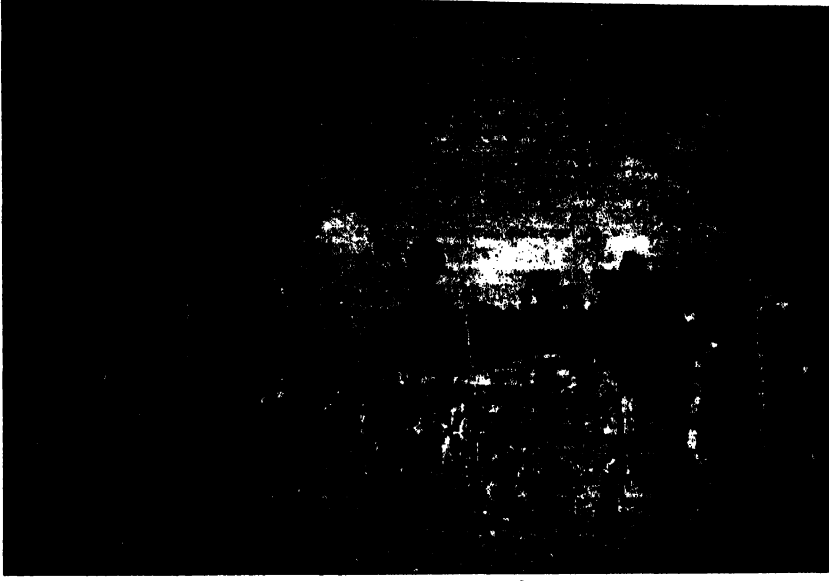
সারবেড়া গ্রাম, গড়বেতা পঞ্চায়েত সমিতি, বিদ্যুৎ পৌঁছিয়েছে আগেই, এখন চলছে রাস্তা নির্মাণের কাজ
ছবি : হরিচরণ পাণ্ডে

বিদ্যুতায়নে মেদিনীপুর

ভজহরি মণ্ডল

ঐতিহ্যে মহান, স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃৎ, সাগরমেখলা, নদী-নালা বিধৃত ও অরণ্য প্রান্তরে বেষ্টিত পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ জেলা আমাদের এই মেদিনীপুর যথার্থভাবেই সারা ভারতের এক শতাংশ। এর আয়তন ১৪০৮৬ বর্গকিলোমিটার। ৭টি মহকুমা, ৪৬টি থানা এবং ৫৪টি ব্লকের লোকসংখ্যা ৮৩,৩১,৯১২ জন, বসবাসযোগ্য মৌজার সংখ্যা ১০,৪৬৮টি।

এতকিছুর মধ্যেও এই মেদিনীপুর জেলা একটা বিষয়ে বেশ পিছিয়ে আছে সেটা হল গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ। মাত্র ৫৪৬৯টি মৌজা খাতা কলমে বিদ্যুতায়িত হয়েছে, অংকের হিসাবে বিদ্যুতায়ন মাত্র ৫২.২৪ শতাংশ, যেখানে এই পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির বিদ্যুতায়নের চিত্র নিম্নরূপ :

ক্রমিক সংখ্যা	জেলার নাম	মোট বসবাসযোগ্য মৌজার সংখ্যা	৩১.০৩.৯৯ পর্যন্ত বিদ্যুতায়িত মৌজার সংখ্যা	শতাংশ
১।	কোচবিহার	১১৩৯	১১১৮	৯৮.১৬
২।	জলপাইগুড়ি	৭৩৬	৭২৫	৯৮.৫১
৩।	দার্জিলিং	৬৫৫	৫১৬	৭৮.১৫
৪।	উত্তর দিনাজপুর	১৫০১	১২৪৫	৮২.৯৫
৫।	দক্ষিণ দিনাজপুর	১৫৩৫	১১৪৭	৭২.৭২
৬।	মালদহ	১৬১৫	১৫৯৬	৯৮.৮২
৭।	মুর্শিদাবাদ	১৯২৭	১১৯২	৯৩.০০
৮।	বীরভূম	২২২৯	২২১৩	৯৯.২৮
৯।	নদিয়া	১২৫৫	১২৫৪	৯৯.৯২
১০।	উত্তর ২৪ পরগনা	১৬১৯	১৫০৬	৯৩.০০
১১।	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	২১১৫	১৭৬৬	৮৩.১০
১২।	হাওড়া	৭৫৫	৭৫৫	১০০
১৩।	হুগলি	১৮৯৯	১৮৯৮	৯৯.৯০
১৪।	বর্ধমান	২৫৭০	২৪৪১	৯৪.৯০
১৫।	পুরুলিয়া	২৪৫২	১৫৬৬	৬৩.৭০
১৬।	বাঁকুড়া	৩৫৪০	২৩৯৫	৬৭.৬৬
১৭।	মেদিনীপুর	১০৪৬৮	৫৪৬০	৫২.২৪

উপরোক্ত সারণি থেকে এই কথাই প্রতীয়মান হয় যে, সর্বাপেক্ষা বড় মেদিনীপুর জেলার বিদ্যুতায়নের হার তুলনামূলকভাবে বেশ কম। যদিও সংখ্যা হিসাবে মেদিনীপুর জেলায় বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। যদি মাথাপিছু বিদ্যুতের উপযোগিতাকে সভ্যতা ও অগ্রগতির সূচক হিসাবে ধরা হয়, তাহলে খুবই দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে কোন কারণেই হোক, মেদিনীপুর জেলা গুরুত্ব অনুসারে সুবিচার পায়নি। সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে ৩১.০৩.৯৯ পর্যন্ত এই জেলায় বিদ্যুতায়িত মৌজার সংখ্যা ৫৪৬৯ দেখান হলেও যথার্থ পক্ষে এবং উপযোগিতার ভিত্তিতে এই সংখ্যা অনেক কম, কারণ :

ক) মৌজাগুলি প্রান্তিকভাবে বিদ্যুতায়িত, গ্রামবাসীগণের সামান্য অংশ বিদ্যুতের সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করছে।

খ) কোথাও কোথাও শুধু খুঁটি পোতামাত্রই বিদ্যুতায়িত বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যদিও বিদ্যুৎ আদৌ সঞ্চালিত হয়নি।

গ) কোথাও বা মাঠে চাষের জন্য পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েই মৌজাটাকে বিদ্যুতায়িত বলে ঘোষণা করা হয়েছে, অথচ গ্রামবাসীরা বিদ্যুতের সুফল থেকে একেবারেই বঞ্চিত।

ঘ) রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, চুরি ইত্যাদি দুষ্কৃতিতে বৈদ্যুতিক পরিকাঠামো ব্যবহারের অনুপযোগী রয়েছে।

এই জেলার থানাভিত্তিক বিদ্যুতায়নের চিত্র নিম্নরূপ :

ক্রমিক সংখ্যা	থানা	গ্রামীণ মৌজার সংখ্যা বসতি	বিদ্যুতায়িত মৌজার সংখ্যা	শতকরা হিসাব	বিদ্যুৎ-বিহীন মৌজার সংখ্যা
১।	বিনপুর	৮১৪	২৩৫	২৮.৮৭	৫৭৯
২।	জামবনী	২৮৩	১১১	৩৯.২২	১৭২
৩।	ঝাড়গ্রাম	৪৮৫	১৫৮	৩২.৫৭	৩২৭
৪।	গোপীবল্লভপুর	৩৭১	১১১	২৯.৯১	২৬০
৫।	সাঁকরাইল	২৪৬	৫৭	২৩.১৭	১৮৯
৬।	নয়াগ্রাম	২৯১	২৩	৭.৯০	২৬৮
৭।	কেশিয়াড়ী	২০০	১২৩	৬১.৫০	৭৭
৮।	দাঁতন	২৩৩	৯৬	৪১.২০	১৩৭
৯।	মোহনপুর	১০৫	৬০	৬০.০০	৫০
১০।	বেলদা	২৮০	১১৮	৪২.১৪	১৬২
১১।	নারায়ণগড়	২৪৯	৮৯	৩৫.৭৪	১৬০
১২।	খড়্গপুর (লোকাল)	৫৫০	২০২	৩৬.৭২	৩৪৮
১৩।	মেদিনীপুর	২২৬	১৭০	৭৫.২২	৫৬
১৪।	ডেবরা	৪৫৮	৩৯৯	৮৭.১১	৫৯
১৫।	কেশপুর	৫৪১	২২৮	৪২.১৪	৩১৩
১৬।	শালবনী	৪০৭	২৭২	৬৬.৮৩	১৩৫
১৭।	গোয়ালতোড়	৩৪৪	১৫৭	৪৫.৬৪	১৮৭
১৮।	গড়বেতা	৩৯৫	৩৬৫	৯২.৪১	৩০
১৯।	এগরা	২৪৮	১৯১	৭৭.০২	৫৭
২০।	সবং	২২৫	১৫৭	৬৯.৭৮	৬৮
২১।	পিংলা	১৭৩	১৪৮	৮৫.৫৫	২৫
২২।	চন্দ্রকোণা	২৪৮	২২৮	৯১.৯৪	২০
২৩।	ঘাটাল	১৩৮	১৩৫	৯৭.৮৩	৩
২৪।	দাশপুর	২৪৩	২৪১	৯৯.১৮	২
২৫।	পাঁশকুড়া	৩৬২	৩১৩	৮৬.৪৬	৪৯
২৬।	ময়না	৮৪	৫৯	৭০.২৩	২৫
২৭।	তমলুক	১৮৮	১৮৭	৯৯.৪৭	১
২৮।	মহিষাদল	১৬৭	১৫১	৯০.৪২	১৬
২৯।	সুতাহাটা	১১৩	১০৭	৯৪.৬৯	৬
৩০।	দুর্গাচক	৮	৪	৫০.০০	৪
৩১।	হলদিয়া	৭	০	০	৭
৩২।	নন্দীগ্রাম	২৫১	৯৭	৩৮.৬৪	১৫৪
৩৩।	খেজুরী	১৩৭	৭০	৫১.০৯	৬৭
৩৪।	ভগবানপুর	৩২৪	৯৮	৩০.২৪	২২৬
৩৫।	কন্টাই	৫৫০	১৬১	২৯.২৭	৩৮৯
৩৬।	রামনগর	২৪৩	১৯৮	৮১.৪৮	৪৫
৩৭।	দীঘা	২৭	২৩	৮৫.১৯	৪
৩৮।	পটাশপুর	২৭৯	১৬৪	৫৮.৭৮	১০৫
	মোট	১০,৪৮৮	৫,৭০৬	৫৪.৪১	৪৭৮২

আজ অগ্রগতির যুগে পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সার্বিক বিদ্যুতায়ন অত্যাবশ্যক। গুণমানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রয়োজন মহকুমা প্রতি অন্তত একটি ১৩২।৩৩-কে ভি উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন সাবস্টেশন ও প্রতিটি ব্লকে কম করে একটি ৩৩। ১১-কে ভি উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন সাব-ট্রান্সমিশন সাবস্টেশন। পরিকাঠামোগত এইসব উচ্চ চাপযুক্ত লাইন ও সাবস্টেশন না করে বৈদ্যুতিকরণের কাজ করা হলে তা হবে অবৈজ্ঞানিক ও গুণগতমানের পরিপন্থী। তাই প্রয়োজন, ১৩২-কে ভি ট্রান্সমিশন লাইন, ১৩২।৩৩-কে ভি সাবস্টেশন ও ৩৩-কে ভি লাইন, ৩৩। ১১-কে ভি সাবস্টেশন সংস্থাপন ও কার্যকর করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের কাজকে একসূত্রে গেঁথে বিকাশের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা।

জেলায় ১৩২।৩৩-কে ভি সাব-স্টেশনগুলির বিন্যাস নিম্নরূপ হওয়া দরকার :

ক্রমিক সংখ্যা	মহকুমা	১৩২।৩৩ কে ভি সাবস্টেশনের নাম	ক্ষমতা এম ভি এ	মন্তব্য
১।	কাঁথি	এগরা	৩ x ১২.৫	আছে
২।	ঐ	বাজকুল/হেঁড়িয়া	২ x ১২.৫	করা দরকার
৩।	খড়্গপুর	হিজলী	২ x ৩১.৫ + ২ x ১০।১২.৫ ট্রাকসান	আছে
৪।	ঐ	বালিচক	১ x ১৫ ট্রাকসান	আছে
৫।	ঐ	পিংলা	২ x ৩১.৫	আছে
৬।	মেদিনীপুর সদর	ধর্মা	২ x ৩১.৫	আছে
৭।	মেদিনীপুর উত্তর	চন্দ্রকোণা রোড	২ x ৩১.৫	আছে
৮।	ঘাটাল	বীরসিংহ	২ x ৩১.৫	প্রস্তাবিত
৯।	তমলুক	কোলাঘাট	২ x ৫০ + ২ x ১২.৫ ট্রাকসান	আছে
১০।	ঐ	তমলুক	১ x ৩১.৫ + ১ x ২০.০০	প্রস্তাবিত
১১।	হলদিয়া	চিরঞ্জীবপুর	২ x ২০	আছে
১২।	ঐ	হলদিয়া	২ x ১৬০ ২ x ৩১.৫	নির্মিয়মান
১৩।	ঝাড়গ্রাম	বেলতলা	২ x ১২.৫	করা দরকার

বিঃ দ্রঃ : 'প্রস্তাবিতগুলিতে' ওয়ার্ক অর্ডার আছে। 'করা-দরকার' একান্তভাবে আমার ব্যক্তিগত মতামত :

জেলার ব্লক ভিত্তিক ৩৩।১১ কে ভি সাব-স্টেশনগুলির বিন্যাস নিম্নরূপ :

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের	সাবস্টেশনের নাম	বর্তমান/ নাম ক্ষমতা এম ভি এ	মন্তব্য প্রস্তাবিত
১।	কাঁথি	১। কাঁথি	৩ x ৩	আছে
		২। রসুলপুর	২ x ৩	করা দরকার
		৩। মারিসদা	২ x ৩	করা দরকার
২।	এগরা	১। এগরা	৩ x ৫	আছে
		২। ভবানীচক	২ x ৩	করা দরকার
৩।	পটাশপুর	১। সিংদা	১ x ৩.১৫	আছে
		২। হটাবেড়িয়া	২ x ৩.১৫	করা দরকার
৪।	ভগবানপুর	১। ভগবানপুর	১ x ৩.০০ + ১ x ১.৬০	আছে
		২। ভূপতিনগর	২ x ৩.১৫	করা দরকার
৫।	খেজুরী	১। হেঁড়িয়া	১ x ৩.০০	আছে
		২। মালদহ	২ x ১.৬	নির্মীয়মাণ
৬।	রামনগর	১। রামনগর	১ x ৩.০০+১ x ৩.১৫	আছে
		২। চাউলখোলা/ পিছাবনী	২ x ৩.১৩+১.১.৬	করা দরকার
৭।	দীঘা	১। দীঘা	২ x ৩.১৫	প্রস্তাবিত
৮।	কেশিয়াড়ী	১। কুকাই	১ x ৩.০০+১.৩.১০	আছে
৯।	নারায়ণগড়	১। নারায়ণগড়	১ x ৩.০০	আছে
		২। দুড়িয়া/ দেহাটি	২ x ৩.১৫	করা দরকার
১০।	বেলদা	১। বেলদা	২ x ৩.১৫	প্রস্তাবিত
১১।	দাঁতন	১। শরশংকা	২ x ৩.১৫	আছে
		খাকুড়দা	২ x ৩.১৫	করা দরকার
১২।	মোহনপুর	১। মোহনপুর	২ x ৩.১৫	
১৩।	সবং	১। সবং	২ x ৩.০০+১ x ৬.৩	আছে
১৪।	পিংলা	১। ডাঙরা	১ x ৬.৩	আছে
১৫।	ডেবরা	১। ডেবরা	২ x ৫+১ x ৩+১ x ১.০	আছে
		২। করন্ডা	১ x ৩+১ x ৩.১০	আছে
১৬।	খড়্গপুর	১। নিমপুরা	২ x ৬.৩	আছে
		১। গোপালী	২ x ৩.১৫	আছে
		১। গোকুলপুর	১ x ১.০০	আছে
	খড়্গপুর টাউন	১। ঝরিয়া	১ x ৬.৩	আছে
		১। হিজলী	২ x ৫.০০	আছে
	খড়্গপুর	২। মাদপুর	২ x ৩.১৫	প্রস্তাবিত
১৭।	মেদিনীপুর সদর	১। রাঙামাটি	১ x ৬.৩+১	আছে
		২। জয়শ্রী	২ x ৩.০০+১ x ৩.১৫	আছে
১৮।	কেশপুর	কেশপুর	২ x ৩.১৫	আছে
১৯।	শালবনী	গাইঘাটা	১ x ৩.০০১ x ৩.১৫	আছে
২০।	গড়বেতা-৩	চন্দ্রকোণা রোড	২ x ৫	আছে
২১।	গড়বেতা-১	গড়বেতা	৩ x ৬.৩	আছে
২২।	গোয়ালতোড়	গোয়ালতোড়	১ x ৬.৩	আছে
২৩।	চন্দ্রকোণা-১	চন্দ্রকোণা টাউন	১ x ৬.৩ + ২ x ৩.০০	আছে
২৪।	চন্দ্রকোণা-২	ক্ষীরপাই	২ x ৩.০০ + ১ x ৩.০০	আছে
		শ্রীনগর	২ x ৩.০০	করা দরকার

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম	সাবস্টেশনের নাম	বর্তমান/ প্রস্তাবিত ক্ষমতা এম ভি এ	মন্তব্য
২৫।	ঘাটাল	নির্মলবাজার	৩ x ৩.৩০ + ১ x ৬.৩০	আছে
২৬।	দাশপুর-১	সুলতাননগর	৩ x ৬.৩ + ১	আছে
২৭।	দাশপুর-২	ভূমিয়াড়া	২ x ৩.১৫	করা দরকার
২৮।	পাঁশকুড়া-১	মোছোগ্রাম	২ x ৫ + ১ x ৬.৩	আছে
২৯।	পাঁশকুড়া-২	কোলাঘাট	২ x ৫	আছে
৩০।	তমলুক	তমলুক	২ x ৫ + ১ x ৩.০০	আছে
	ঐ	ধারিন্দা	২ x ৫	প্রস্তাবিত
৩১।	ময়না	ময়না	১ x ৩.১৫	আছে
৩২।	মহিষাদল-২	গোপালপুর	২ x ৩.০০	আছে
৩৩।	মহিষাদল-১	নন্দকুমার	২ x ৩.১৫	করা দরকার
৩৪।	নন্দীগ্রাম-১	নন্দীগ্রাম	২ x ৩.১৫	করা দরকার
৩৫।	নন্দীগ্রাম-২	রেয়াপাড়া	১ x ৩ + ১ x ১.৫	আছে
৩৬।	নন্দীগ্রাম-৩	চণ্ডীপুর	২ x ৩.১৫	করা দরকার
৩৭।	সুতাহাটা-১	চৈতন্যপুর	২ x ৩.১৫	নির্মীয়মাণ
৩৮।	সুতাহাটা-২	বাড়ঘাসিপুর	২ x ৩.১৫	করা দরকার
৩৯।	হলদিয়া	চিরঞ্জীবপুর	১ x ৫ + ১ x ৬.৩	আছে
		ক্ষুদিরামনগর	২ x ৬.৩	আছে
৪০।	দুর্গাচক	বাসুদেবপুর	১ x ৬.৩ + ১ x ৩.০০	আছে
৪১।	ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম	১ x ৩ + ১ x ৩.১৫ + ১ x ৬.৩	আছে
	বরিয়া	জঙ্গলখাস	১ x ৩.১৫	আছে
		মানিকপাড়া	২ x ৩.১৫	আছে
৪২।	বিনপুর-১	বিনপুর	২ x ১.৫	আছে
৪৩।	বিনপুর-২	বেলপাহাড়ী	২ x ৩.১৫	প্রস্তাবিত
৪৪।	গোপীবল্লভপুর-২	চিংড়া	২ x ৩.১৫	নির্মীয়মাণ
৪৫।	গোপীবল্লভপুর-১	গোপীবল্লভপুর	২ x ৩.১৫	ঐ
৪৬।	জামবনী	পড়িহাটি/গিধনী	২ x ৩.১৫	প্রস্তাবিত
৪৭।	সাঁকরাইল	রাঙ্গাডিহা	২ x ৩.১৫	নির্মীয়মাণ
৪৮।	নয়াগ্রাম	বালিগেড়িয়া/ খড়িকামাথানী	২ x ৩.১৫	প্রস্তাবিত

বিঃ দ্রঃ —প্রস্তাবিত ওয়ার্ক অর্ডার আছে, 'করা দরকার', মন্তব্যগুলি একান্তভাবে আমার নিজস্ব।

এছাড়াও বিশেষ প্রয়োজনে কোথাও কোথাও আরও ৩৩/১১-কে ভি সাবস্টেশন করা প্রয়োজন হতে পারে। যথাযথ সময়োপযোগী রক্ষণাবেক্ষণের কথা নতুন করে বলার দরকার আছে বলে মনে হয়না। উপযুক্ত পরিষেবা দিয়ে যথাযথ অর্থ সংগ্রহ করতে না পারলে 'বেসরকারীকরণ' অবশম্ভাবী।

গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের সুষ্ঠ ও দ্রুত রূপায়ণের জন্য আমাদের সরকার 'গ্রামীণ শক্তি উন্নয়ন নিগম' গঠন করেছেন। এই গ্রামীণ শক্তি উন্নয়ন নিগম প্রাথমিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের ৫টি জেলার মধ্যে 'মেদিনীপুর' জেলাকেও অগ্রাধিকারের তালিকায় রেখেছেন। তাঁদের স্বচ্ছন্দ অগ্রগতি মেদিনীপুরের বিকাশকে ত্বরান্বিত ও সুদূরপ্রসারী করবে এই আশা করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

লেখক : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক
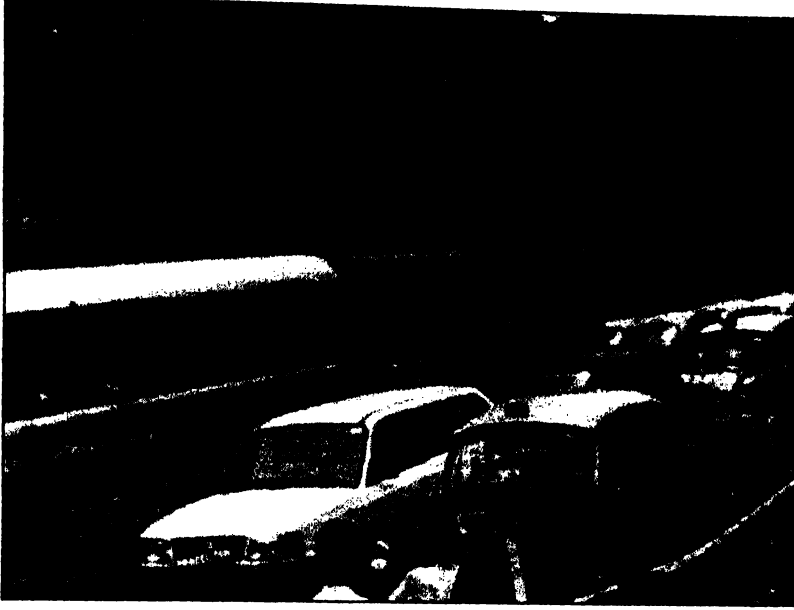
মেদিনীপুর জেলার পরিবহন পরিষেবা

সুশান্ত ঘোষ

মেদিনীপুর অসংখ্য ঐতিহাসিক ও গৌরবময় অধ্যায়ের পীঠস্থান। আমাদের এই জেলা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী জেলা। প্রাক স্বাধীনতা যুগে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য আন্দোলনের স্বাক্ষর এই জেলাতে বর্তমান। বর্তমান ভারতবর্ষে জনসংখ্যার দিক থেকে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা ছিল সর্ববৃহৎ। দেশের মোট জনসংখ্যার ১ ভাগ লোক এই জেলাতে বসবাস করে।

জেলার এই বিশাল সংখ্যক জনসাধারণের যাতায়াত আজ মূলত পথনির্ভর অথচ মানব সভ্যতার প্রথমদিকে যিশুখ্রিস্টের জন্মের পূর্বে জলপথ পরিবহনে সমুদ্রবন্দর রূপে তাম্রলিপ্ত খ্যাতি লাভ করেছিল। চীন, সিংহল ও ভারতবর্ষের পূর্ব অংশের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র কেন্দ্র ছিল প্রাচীন তাম্রলিপ্ত। পঞ্চম শতকে বিখ্যাত পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাঁর স্বদেশ যাত্রা আরম্ভ করেন এখান থেকেই। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাং এর জলপথের পরিবহন ব্যবস্থা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার পথের পরিমাণ অনেক। দীর্ঘ ৫৯৭১ কিমি পথের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ৪১৬১ কিমি মোরামের পথ। এছাড়া প্রধান জাতীয় সড়ক, রাজ্য হাইওয়ে এবং নগর পালিকার পথ প্রায় ১৬০০ কিমি। সুবিস্তৃত এই পথেই মূলত জনসাধারণের যাতায়াত। শহর থেকে জেলা, জেলা থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত ছড়ানো আছে যাত্রী বহনকারী নানাধরনের যানবাহন।
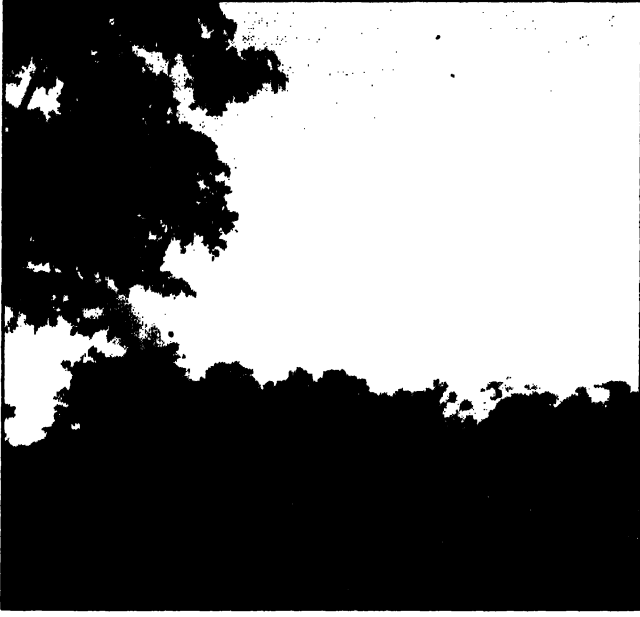
ঝাড়গ্রামের পথে ছবি : অগ্নিমিত্র ঘোষ

এই অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু তথ্য পাঠকের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরা হল।

বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা যাত্রী বহনকারী পথ (স্টেট ক্যারেজ রুটস্) এর সংখ্যা ৩০০ এবং আন্তর্বিভাগ (ইন্টার রিজিওন) রুটের সংখ্যা ১৩০টি মোট ৪৫০টি বাস এই রুটগুলিতে নিয়মিত ছুটে যাচ্ছে এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। এ ছাড়াও রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার (S. B. S. T. C) জন্য নির্দিষ্ট আরও ১০টি রুটে মোট ১৪টি বাস নিয়মিত যাত্রী পরিবহনে ব্যাপৃত।

এই সমস্ত রুটগুলির মধ্যে আবার শহর থেকে শহরে অথবা আধা শহরে মোট ৬০টি মিনিবাস যোগাযোগ ব্যবস্থাকে করে তুলেছে আরও সুন্দর গতিময়।

আমাদের এই জেলায় রেলপথের যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাধীনতার পর থেকে তেমন কোন উন্নতি ঘটেনি। পথ পরিবহনের মাধ্যমে যদিও এই ঘাটতি পূরণ করা দুরুহ কাজ, তথাপি বিগত ২৬ বছরের গ্রামীণ অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলগুলিতে সাধারণ মানুষের শহরের সঙ্গে যোগাযোগের বিশাল ব্যাপক চাহিদার কথা মাথায় রেখে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আরও কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যেমন ট্রেকার এবং অটোরিক্সা। এই মুহূর্তে মোট ৪৫৫টি ট্রেকার ৬টি মহকুমার মধ্যে আঞ্চলিক ভিত্তিতে মাল এবং যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থায় জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন শহরকেন্দ্রিক ১৫৫টি অটোরিক্সার নিয়মিত যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থা। এখানেই থেমে থাকা নয়, পরিকল্পনা যেভাবে এগোচ্ছে তাতে আশা করা যায় আগামী দিনে এই বাস, মিনিবাস, অটোরিক্সার সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

ইতিমধ্যেই এই সম্প্রসারিত পরিবর্তনের ফলে মুল পর্যটনকেন্দ্রসহ গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে কলকাতাসহ অন্যান্য রাজ্যের যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে। জেলার গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল স্থানে সরকারি উদ্যোগে বাসডিপো নির্মাণ করা হয়েছে। নিকট ভবিষ্যতে আরও কয়েকটি নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি বাসস্ট্যান্ড নির্মিত হয়েছে। যেমন, মেদিনীপুর, চন্দ্রকোনা রোড, ঘাটাল, চন্দ্রকোনা টাউন, ঝাড়গ্রাম এবং খড়গপুর। নির্মিয়মাণ বাসস্ট্যান্ডগুলি হল, গড়বেতা, সরাইবাজার (দাঁতন) এবং মীরজাবাজার (সোনাকানিয়া)। সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে যথাসম্ভব পরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করবার প্রয়াস অব্যাহত। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে এত বিশাল পরিবহন কর্মকাণ্ডের মাঝে কিছু ঘাটতি এখনও আছে। নানা সীমাবদ্ধতার বেড়া টপকে এক সর্বাঙ্গীণ সুন্দর পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।

লেখক : রাষ্ট্রমন্ত্রী, শ্রম, কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র ও রাজ্যকর্মচারী বীমা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

খড়্গপুর-দীঘা রাজ্য সড়ক ছবি : কিংশুক আইচ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদৃশ্য প্রবেশপথের তোরণ ছবি : কৌশিক সেনগুপ্ত

উচ্চশিক্ষার অগ্রগতিতে মেদিনীপুর

সন্তোষকুমার ঘোড়ই

শিক্ষার শক্তিই দেশের মানুষকে আলোয় জাগিয়ে তুলতে পারে; মানুষের মনের চেহারা, দেশের চেহারা বদলে দিতে পারে। আমি সব পারি, সব পারব—এই আত্মবিশ্বাসের বাণী দিতে পারে শিক্ষা। এ বাণী থেকে মানুষ আপন ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। এই শ্রদ্ধার দ্বারা মানুষ নির্ভীক হয়, জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে সে জয়ী হয়। না হলে দৈবের দিকে তাকিয়ে থাকে, দৈবপ্রবঞ্চিত হয়। মানুষের সকল সমাধানের শক্তি রাখে শিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে বিশ্বমনা করে; শিক্ষা সাম্প্রদায়িকতা দূর করে; শ্রেণিতে শ্রেণিতে অস্পৃশ্যতা, জাতিবর্ণ বিচার দূর করে। রবীন্দ্রনাথের মতে—আধুনিককালের নতুন বিদ্যার প্রবাহ সর্বজনীন দেশের অভিমুখে বইবে। বৃষ্টির মত শিক্ষার এই অমৃতশক্তির বর্ষণ সারা দেশজুড়ে কাম্য। সারা দেশের কথা ঠিকমত জানি না, কিন্তু মেদিনীপুর জেলা (বর্তমানে পূর্ব ও পশ্চিম জেলা) প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা তথা উচ্চশিক্ষার ধারা-বিধৌত বলতে কোন দ্বিধা নেই।

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা দুটি সাক্ষর জেলা। খাঁচায় বন্দী বাঘ ছাড়া পেলে যেমন চারদিক দাপিয়ে বেড়ায়, তেমনি অশিক্ষার বন্দীত্ব ঘোচার ফলে শিক্ষা চাই, আরও শিক্ষা চাই, আরও স্কুল-কলেজ চাই, প্রথাযুক্ত কিংবা প্রথাবিমুক্ত যেকোন শিক্ষা আহরণের অদম্য ইচ্ছা আজ সঠিকভাবে মেদিনীপুর জেলায় জাগরূক। উচ্চশিক্ষার গতিশীলতা বজায় রাখতে, জীবনকে আধুনিক ও সচল রাখতে, নতুন নতুন জ্ঞানের ভাণ্ডারে অবগাহন করতে,

আচার্য ভৈরব দত্ত পাণ্ডে কর্তৃক বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের শিলান্যাস (১৮ জুলাই ১৯৮৩)

কালস্রোতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উচ্চশিক্ষার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে অখণ্ড মেদিনীপুরে গড়ে তোলা হয়েছে 'বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়'। আই আই টি-র অধ্যাপক (প্রয়াত) অনিলচন্দ্র গায়েন যে স্বপ্নের বীজ বপন করেছিলেন, তাকে সজীব, প্রাণবন্ত সর্বোপরি বাস্তবায়িত করতে যিনি নিরলস চেষ্টা চালিয়েছেন এবং চালাচ্ছেন, তিনি হলেন জননেতা অধ্যাপক দীপক সরকার। সর্বতোভাবে তাঁর সহযোগী ও সহকর্মী হিসেবে কাজ করেছেন সে সময়ের জেলা সভাধিপতি ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র।

১৯৮১ সালে 'বিদ্যাসাগর বিশ্বাবিদ্যালয় এ্যাক্ট' চালু হয়। ১৯৮৩ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর (১২ আশ্বিন) বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথম উপাচার্য হন অধ্যাপক (প্রয়াত) ভূপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত ত্রিশটি কলেজ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসে। আগে এগুলি ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। ১৯৮৫-৮৬ সালে ত্রিশটি কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল পাসকোর্সে ১৬,০০০ (প্রায়) আর অনার্স কোর্সে ৭,০০০ (প্রায়) অর্থাৎ মোট ২৩,০০০ (প্রায়)। ছয়টি স্নাতকোত্তর বিভাগ ওই বছরই চালু হয়। স্নাতকোত্তর শ্রেণীগুলিতে ছাত্র ভর্তি হয় ২০০; স্নাতকোত্তর বিভাগ ও নতুন প্রশাসনিক ভবনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী (প্রয়াত) শম্ভু ঘোষ এবং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু (১৫ জানুয়ারি, ১৯৮৬)। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়— বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনের শিলান্যাস করেছিলেন আচার্য তথা তদানীন্তন রাজ্যপাল ভৈরবদত্ত পাণ্ডে (১৮ জুলাই, ১৯৮৩)।

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। চাহিদার লক্ষ্য পূরণে গড়ে উঠেছে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নতুন বিভাগ; গড়ে উঠেছে নতুন লাইব্রেরি বিল্ডিং; গড়ে উঠেছে ছাত্র ও ছাত্রী নিবাস। বর্তমানে আর্টস, কমার্স, সায়েন্স বিভাগ মিলিয়ে গড়ে উঠেছে পঁচিশটি বিভাগ। গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা উভয়ই হাতে হাত মিলিয়ে দ্রুতলয়ে এগুচ্ছে। এই অগ্রগতি কিন্তু সহজ, নিষ্কণ্টক পথে আসেনি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অসহযোগিতা, আর্থিক অনুদান দিতে অস্বীকৃতি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পথ রুদ্ধ করার অশুভ প্রয়াসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হয়েছে, পথে নামতে হয়েছে। তবেই সাফল্য এসেছে; শিক্ষাক্ষেত্রে মুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে; সমস্যাসংকুল উচ্চশিক্ষার প্রাঙ্গণ বিপদমুক্ত হয়েছে।

ইতিমধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ছাত্রসংখ্যা সামাল দিতে নতুন নতুন মহাবিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। অধিগৃহীত (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে) ত্রিশটি মহাবিদ্যালয়ের উপর নতুন বেশ কয়েকটি মহাবিদ্যালয়ের অনুমোদন দান করল বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজগুলি হল—চন্দ্রকোনা বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয় (১৯৮৫); সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয় (১৯৮৮); হলদিয়া গভর্নমেন্ট কলেজ (১৯৮৮); হিজলী কলেজ (১৯৯৫); খেজুরি কলেজ এবং সেইসঙ্গে গড়ে তোলা হল কয়েকটি আইন ও প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসার সময় ত্রিশটি মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে ষোলটি মহাবিদ্যালয় ইউ জি সি-র লিস্টে ছিল। অর্থাৎ ষোলটি মহাবিদ্যালয় মাত্র ইউ জি সি-র অনুদান লাভ করত। অন্যদিকে দুতিনটি কলেজ 'সিক কলেজ' কিংবা 'প্রতিবন্ধী কলেজ' হিসেবে চিহ্নিত ছিল। এই চোদ্দ বছরের মধ্যে সব সাধারণ কলেজগুলির প্রত্যেকটিই সবল ও স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে উঠেছে। এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় উভয়েরই আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রণিধানযোগ্য। সব কলেজই এখন সর্বভারতীয় ইউ জি সি-র তালিকাভুক্ত।

প্রথম উপাচার্য অধ্যাপক ভূপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
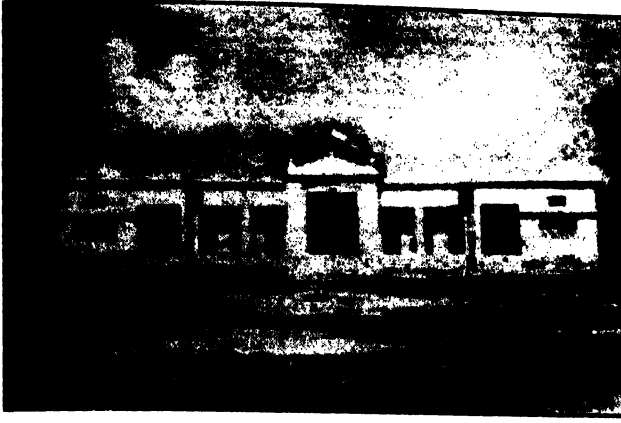
১৯৪৮ সালে মহিষাদল রাজ কলেজ সৌজন্যে : শেখর ভৌমিক

প্রত্যেকেই সবরকম শর্ত পূরণ করার কারণে নবম ও দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছ থেকে আর্থিক অনুদান লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। প্রতিটি মহাবিদ্যালয় কমপক্ষে একটি করে কম্পিউটার সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এমন একটা কলেজ নেই, যেখানে একের বেশি অনার্স খোলা হয়নি। সাধারণ পরিচিত বিষয়ে সাম্মানিক বা অনার্স কোর্স অনুমোদন দেওয়া ছাড়াও আধুনিক প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞানে, মাইক্রোবায়োলজিতে এবং ইলেক্ট্রনিক্সে অনার্স খোলা হয়েছে বেশ কয়েকটি কলেজে। নটিক্যাল সায়েন্স, নিউট্রিশন, এম সি এ, বি সি এ প্রভৃতি প্রফেশনাল কোর্স এখন বেশ কয়েকটি কলেজে পড়ানো হচ্ছে।

সামাজিক প্রয়োজনে একবিংশ শতাব্দীর দিকে তাকিয়ে ছাত্রছাত্রীরা যাতে নিয়োগযোগ্য কিংবা স্ব-নিয়োগযোগ্যভাবে গড়ে উঠতে পারে এজন্য ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ করে কলেজীয় শিক্ষাব্যবস্থায় আনা হল নানা বৈচিত্র্যের 'ভোকেশন্যাল' কোর্সের। মেদিনীপুর জেলাই প্রথম কিংবা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রথম ২২টি মহাবিদ্যালয়ে রাজ্য সরকার এবং ইউ জি সি-র অনুমোদন সাপেক্ষে নীচের সারণিতে উল্লেখিত তেরটি বৈচিত্র্যপূর্ণ বৃত্তিমূলক বিষয় চালু করেছে।

সারণি
উচ্চতর ভোকেশন্যাল বিষয়

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	কলেজ
১।	অটোমোবাইল মেইন্টেন্যান্স	• বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়
২।	অফিস ম্যানেজমেন্ট অ্যাণ্ড সেক্রেটারিয়াল প্র্যাকটিস	• বেলদা কলেজ; এগরা সারদা; শশীভূষণ কলেজ; গড়বেতা কলেজ; পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ; হিজলী কলেজ
৩।	ফাংশন্যাল ইংলিশ	• ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ; ময়না কলেজ
৪।	অ্যাডভার্টাইজিং সেলস প্রমোশন অ্যান্ড সেলস ম্যানেজমেন্ট	• খড়্গপুর কলেজ
৫।	ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি	• মহিষাদল রাজ কলেজ
৬।	এগ্রো-সার্ভিস	• ময়না কলেজ
৭।	ট্যাক্স প্রসিডিওর অ্যান্ড প্র্যাকটিস	• মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়, সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়
৮।	প্রিন্সিপল্স অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস অফ ইন্সিওরেন্স	• পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়
৯।	ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিশ অ্যান্ড ফিশারি	• কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ, সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়, রামনগর কলেজ, সীতানন্দ কলেজ
১০।	সেরিকালচার	• রাজা এন এল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়
১১।	সিড-টেকনোলজি	• সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়
১২।	কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন	• যোগদা সৎসঙ্গ পালপাড়া মহাবিদ্যালয়, চন্দ্রকোনা বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়, হিজলী কলেজ
১৩।	ট্যুরিজম অ্যান্ড ট্রাভেল ম্যানেজমেন্ট	• হলদিয়া গভর্নমেন্ট কলেজ
১৪।	নটিক্যাল সায়েন্স, ম্যানেজমেন্ট প্যারা মেডিক্যাল কোর্স	• হলদিয়া

১৯৮৫ সালে স্নাতক স্তরে মেদিনীপুর জেলায় মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৩,০০০ মতো, এর মধ্যে পাশ কোর্সের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল অনার্স কোর্সে পড়া ছাত্রছাত্রী সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি। ২০০৩ সালে সেক্ষেত্রে মেদিনীপুর জেলায় স্নাতক স্তরে পাঠরত মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫,৫০০; যার মধ্যে অনার্সের ছাত্র প্রায় ৩৭,০০০; পাশ কোর্সের ছাত্রছাত্রীর চেয়ে অনার্সে পড়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মেদিনীপুর জেলায় বেশি—যা রাজ্যের অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিলক্ষিত হয়নি। মেদিনীপুর জেলায় উচ্চশিক্ষার অগ্রগতির যদি কোন সূচক তৈরি করা যায়, এটি তার মধ্যে অন্যতম একটি সূচক।

ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর অ্যাডভ্যান্সমেন্ট অব রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন পরিচালিত হলদিয়া ল কলেজ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং বার কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া কর্তৃক অনুমোদিত.

এন এল খান উইমেনস কলেজ, মেদিনীপুর

সাম্মানিক স্নাতক স্তর অতিক্রম করার পরই আসে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে প্রবেশ করার অধিকার। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নর্মাল কোর্স'-এ সবাইকে গ্রহণ করার ক্ষমতা নেই। 'সবার জন্য উচ্চশিক্ষা'-র দ্বার খোলা নেই এরকম একটা ধারণা যখন দৃঢ়তা অর্জন করেছে সে সময় রাজ্যসরকারের অনুমোদন এবং ইউ জি সি-র অনুদান সাপেক্ষে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেদিনীপুর জেলায় বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রথামুক্ত 'করেসপন্ডেন্স কোর্স' চালু করল (১৯৯৪)। বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কমার্স ইত্যাদিতে রেগুলার কোর্সের পাঠক্রমকে গ্রহণ করেই স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠদান শুরু হয়েছিল 'ডিসট্যান্স এডুকেশন'-এর মাধ্যমে। মেদিনীপুরে অবস্থিত বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হল কয়েকটি বিষয়ে 'ব্রিজ কোর্স' এবং বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর বিষয় বোটানি, ফিজিক্স, জুলজি, পরিবেশ এবং নিউট্রিশনে 'করেসপন্ডেন্স কোর্স' চালু করা হয়েছে। কেবল স্নাতকোত্তর স্তরে প্রথামুক্ত এই মাধ্যমে পনেরো হাজারের বেশি ছাত্র শিক্ষালাভ করতে পারছে। এখন একবিংশ শতাব্দীর এই ২০০৩-র শেষ সময়ে নির্দ্বিধায় বলা যায় মেদিনীপুর জেলায় এমন একটি গ্রাম খুঁজে পাওয়া যাবে না যে গ্রামে একজন স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী নেই। অথচ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়, পঞ্চাশ বছর আগে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই মেদিনীপুর জেলায় সমগ্র থানাতে একজন স্নাতক ডিগ্রিধারী মানুষ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ছিল। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে সর্বভারতীয় পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। আনুপাতিক হারে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বিশ্বাবিদ্যালয়ের তুলনায় বেশ কিছু ক্ষেত্রে এগিয়েই রয়েছে। জেলার জনসংখ্যায় স্নাতক স্নাতকোত্তরের ঘনত্ব দিয়ে যদি উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি প্রকাশ করা যায়, তাহলে মেদিনীপুর জেলা পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির তালিকায় প্রথম স্থান দখল করবে।

মেদিনীপুর জেলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রথাভিত্তিক স্নাতক স্তরে পড়াশুনা যেমন কলেজগুলি নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাচ্ছে, তেমনি সেইসঙ্গে যোগ দিয়েছে নেতাজীমুক্তবিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি পাঠকেন্দ্র (রাজা এন এল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়, তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়, হলদিয়া গভর্নমেন্ট কলেজ, কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ ইত্যাদি) এবং ঐতিহ্যবাহী শতাব্দী অতিক্রান্ত মেদিনীপুর কলেজ পরিচালিত ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্বাবিদ্যালয়ের একটি শাখা। মুক্ত উচ্চশিক্ষা জীবনের অনেকদিক উন্মোচিত করে মূলত মানুষকে যোগ্যতা, তৃপ্তি ও ভালবাসা দিচ্ছে।
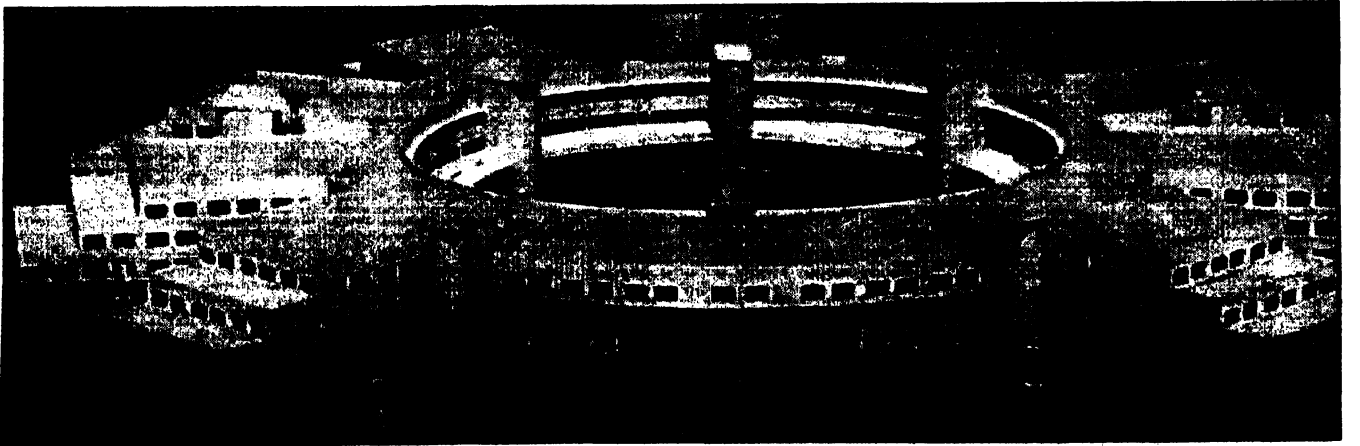
হলদিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

ভাষণরত তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শম্ভু ঘোষ, মঞ্চে উপবিষ্ট মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, উপাচার্য ভূপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ (১৫ জানুয়ারি, ১৯৮৬)

মেদিনীপুর জেলায় ছটি কলেজে বি এড পড়ানোর ব্যবস্থা আছে; এই কোর্সে বছরে ১২০০ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। বি এড পড়ার জন্য ভীষণ চাপ থাকে; ধরাধরি কোথাও শক্তি প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে কিয়দংশ একসময় গায়ের জোরে ভর্তি হত। বিগত দুবছর বিশ্বাবিদ্যালয় থেকেই মেধা ও নিয়মভিত্তিক ভর্তির লিস্ট করে অর্থাৎ 'সেন্ট্রাল সিলেকশন'-এর মাধ্যমে ছটি কলেজে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে—ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভোগান্তি যেমন কমেছে, তেমনি কলেজের অধ্যক্ষের উপর চাপ কমেছে। এই পদ্ধতি এখন রাজ্যের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গ্রহণ করছে। অন্যদিকে অন্য রাজ্যে 'ক্যাপিটেশন ফি' দিয়ে 'বি পি এড' (ব্যাচিলার ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন) পড়তে যেতে হত মেদিনীপুর জেলার অনেক ছাত্রছাত্রীদের। সুন্দর এক জিমন্যাসিয়াম গড়ে ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে সেবাভারতী মহাবিদ্যালয় এবং পাঁশকুড়া কলেজ বি পি-এড পড়ানোর ব্যবস্থা করল।

উচ্চশিক্ষায় পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করায় দীর্ঘ বিলম্বতা ছাত্রছাত্রীদের বিড়ম্বনার কারণ। এই সমস্যা নিরসনে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রথম এই রাজ্যে উচ্চশিক্ষায় 'সেন্ট্রাল ইভাল্যুশন সিস্টেম' চালু করে। সমস্ত পরীক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ডেকে এনে প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষা নিয়ামকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষার খাতা দেখানো হয়। এর ফলে পরীক্ষা শেষ হওয়ার একমাসের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে। সমস্যা এলে তার সমাধান সম্ভব। উচ্চশিক্ষার আঙিনায় সাধারণ যে সব সমস্যা দীর্ঘদিন বিরাজমান ছিল—মেদিনীপুর জেলার উচ্চশিক্ষা সেইসব সমস্যার মধ্যে অনেক সমস্যার নিরসন করতে পেরেছে।

কলেজ স্তরে সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা যেমন বলা হল; তেমনি কারিগরি শিক্ষার কথাও বলা দরকার। প্রগতি, শিল্পায়নের অগ্রগতির প্রয়োজনে চাই ইঞ্জিনীয়ার বা প্রযুক্তিবিদ। জেলার হলদিয়া, বর্তমানে পূর্বাঞ্চলের শিল্পায়নের মুখ। খড়্গপুর অঞ্চলকে ঘিরেও গড়ে উঠছে নানা শিল্প। মেদিনীপুর জেলার হিজলীতে 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি' রয়েছে। ওখানে মেদিনীপুর জেলার ছাত্র-ছাত্রী কত ভর্তি হচ্ছে সেকথাটা বড় নয়, বড় কথা হল এই প্রতিষ্ঠানটির সহযোগিতা মেদিনীপুর জেলার প্রযুক্তির উন্নতি ঘটানোর ক্ষেত্রে একটি বড় 'সুরাহা'। কারিগরি শিক্ষার বিকাশে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করা, যে সব শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে বা গড়ে উঠতে চাইছে তাদের প্রযুক্তিগত কৌশল দান করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে আই আই টি-র অবদান অনস্বীকার্য। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তিনটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ গড়ে উঠেছিল যেগুলি বর্তমানে রাজ্যের কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। ইতিমধ্যেই গড়ে উঠতে চলেছে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ। প্যারা মেডিক্যাল কোর্সের পাঠক্রম মেদিনীপুর ও হলদিয়া শহরে শুরু হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় এসব ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিদ্যাসাগর স্কুল অফ সোস্যাল ওয়ার্কে পড়ানো হয় দুবছরের এম এস ডব্লিউ (মাস্টার অব সোস্যাল ওয়ার্ক) কোর্স।

অনেকেই যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্কৃতি, শিক্ষকদের দায়বদ্ধতার দিকে আঙুল তুলছেন, যখন প্রাইভেট কোচিং বা টিউশনি দুষ্টক্ষত হিসেবে দেখা দিয়েছে—সে সময় বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় তথা অনুমোদিত মহাবিদ্যালয়গুলির অনেক গুলিতে চালু হয়েছে 'রিমেডিয়্যাল কোচিং'। যে সময় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় 'শুনশান' থাকে, নীরব নিশ্চল থাকে, সেসময় (সকাল কিংবা সন্ধ্যা) পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের প্রতিষ্ঠানের কক্ষেই বিশেষ কোচিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা একাংশ শিক্ষকের প্রাইভেট টিউশনির বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রতিবাদ; ছাত্রছাত্রীদের কাছে সুলভ বিকল্প সৃষ্টি করে বেআইনি, ব্যয়-সাপেক্ষ টিউশনি (কর্মরত শিক্ষকদের দ্বারা) রোধ করার এক আন্তরিক প্রয়াস। এর ফলাফলও সন্তোষজনক, আশাব্যঞ্জক। অনেক গরিব, পিছিয়ে পড়া ছাত্র ভাল ফলাফল করে উচ্চতর শিক্ষার জগতে প্রবেশ করছে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

সবার জন্য উচ্চশিক্ষা নয়, কিংবা উচ্চশিক্ষার আঙিনায় 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই' বোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া নয়; 'এসো এসো ভেতরে এসো', (welcome in the field of higher education) উচ্চশিক্ষার সিংহদুয়ার খুলে রাখা হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে যেমন মেদিনীপুর কেবল একটা নাম নয়, একটা আত্মবিশ্বাস, একটা শিহরণ; তেমনি উচ্চশিক্ষার অগ্রগতিতে বর্তমানের মেদিনীপুর দুর্বার—দুরন্ত এর গতি। এই গতি রোখার ক্ষমতা কারুর নেই। তবু আরও অনেক কিছু করার আছে, অনেক আগলবদ্ধ দিগন্ত উন্মোচনের প্রয়োজনীয়তা আছে৷ নিরন্তর উন্নতির সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হবে। ইকবালের কবিতা দিয়ে শেষ করি—

'তুমি হলে পাখি, আকাশ পথে ওড়া তোমার কাজ
আরও আকাশ আছে, তোমার ওড়ারও ক্লান্তি নেই।'

লেখক : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক
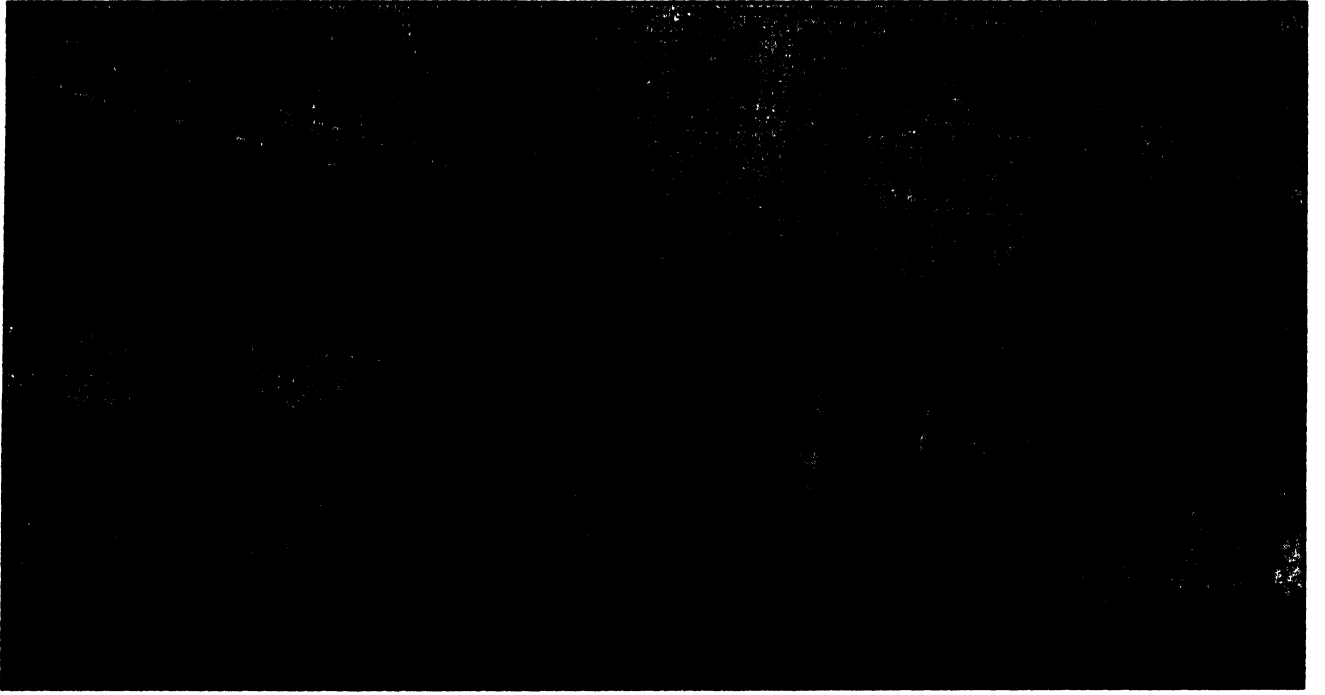
পূর্ব মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুর-নয়াগ্রাম ফেকোঘাট সড়কে কুঠিঘাটে সুবর্ণরেখা নদীর ওপর নির্মিত সিধু-কানু-বীরসা সেতু। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী সম্প্রদায়ের তিন অগ্রগণ্য সৈনিকের নামে সেতুটি নামাঙ্কিত হয়েছে

সৌজন্যে : পূর্ত বিভাগের মুখপত্র 'পূর্তকথা'

খড়গপুর-মেদিনীপুর সড়কে মেদিনীপুর শহরের উপকণ্ঠে কংসাবতী নদীর ওপর নির্মিত দেশপ্রাণ শাসমল সেতু। এই সেতু নির্মাণের ফলে মেদিনীপুর শহরে প্রবেশ সহজতর হয়েছে

সৌজন্যে : পূর্ত বিভাগের মুখপত্র 'পূর্তকথা'

মেদিনীপুর শহরের সিপাইবাজারে মুসলিম ছাত্রীনিবাসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল কে ভি রঘুনাথ রেড্ডি

শিক্ষার অগ্রগতিতে মেদিনীপুর : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক

তুষার পঞ্চানন

কলকাতায় শিক্ষাবিদ মহলে একটি কথা চালু আছে যে পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্তত একজন মেদিনীপুরবাসীকে পাওয়া যাবেই। এই কথা একটু অতিরঞ্জিত হতে পারে কিন্তু একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই মেদিনীপুরবাসীরা ছড়িয়ে রয়েছেন। এটা অবশ্য হতে পারে যে তাদের অনেকেই মেদিনীপুর জেলাতে জন্মগ্রহণ করেননি—পরে এসে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন। ঠিক তেমনি অনেকে জন্মসূত্রে মেদিনীপুরের মানুষ অন্য জেলায় গিয়ে স্থায়িভাবে বসবাস করে চলেছেন। অতীতের গল্প উপন্যাসে হোটেল-মেসের ঠাকুর-চাকর চরিত্র থাকলেই তাদের মেদিনীপুর-এর লোক হিসাবে দেখানো হতো। এতে মেদিনীপুর জেলার অনেকেই ক্ষুব্ধ হতেন। কিন্তু এটা তো অস্বীকার করা যাবে না যে এই জেলার বেশির ভাগ মানুষ তখন নিরক্ষর ছিল এবং তাদেরও বেশিরভাগই ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। কাজেই কাজের সন্ধানে তারা হাওড়া, কলকাতা, ২৪ পরগনায় হাজির হতো। ঠিক যেমন বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিক্ষকমণ্ডলীর একটি ভাল অংশ মেদিনীপুর থেকে এসেছেন। 'কাজের লোক' মাত্রেই মেদিনীপুরের—এটা যেমন দুঃখ দেয় তেমনি এমন কোন কলেজ নেই যেখানে মেদিনীপুরবাসী নেই, এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে মেদিনীপুরের লোক পাওয়া যাবে না—অধ্যক্ষ, উপাচার্য, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কবি, সাহিত্যিক, চিত্রকর, অভিনেতা, পরিচালক, আই এ এস, আই পি এস

নন্দকুমার-এ কন্যাগুরুকুল জুনিয়র গার্লস স্কুল ছবি : সঞ্জীব দোবে

●

১৯৭৭ সালে এই জেলায় ৬৭১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল বর্তমানে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৮৪৫। প্রাথমিক শিক্ষকের সংখ্যা ওই সময়ে ছিল ১৯৫৫৩ এবং বর্তমানে সংখ্যা হল ২৬,০৫০। ইতিমধ্যে ২১৪৫টি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ১৯৭৭ থেকে বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে।

●

এই সব ক্ষেত্রে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত পুরুষ/মহিলা ব্যক্তিত্বের মধ্যে অবশ্যই এই জেলার লোক রয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনেও এই জেলার মানুষের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। স্বাধীনতা-উত্তর কালে এই জেলার মানুষ রাজ্যে ও কেন্দ্রে মন্ত্রী হয়েছেন—মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছেন। কাজেই আনন্দ ও দুঃখ মিলিয়েই এই জেলার শিক্ষার কথা ভাবতে হয়।

এই জেলায় বিশেষ কোন শিল্প ছিল না। লোকে বলতো মেদিনীপুরে স্কুল ইন্ডাস্ট্রি আছে। অর্থাৎ পাড়ায় পাড়ায় স্কুল তৈরি হতো। গ্রামের জোতদার-জমিদারদের রেষারেষিতে পাড়ায় পাড়ায় অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এ নিয়ে গন্ডগোল মারামারি পর্যন্ত হয়েছে—আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। অবশ্য এ জেলায় প্রবাদ আছে যে, ছেলে সাবালক হয়েছে কি না পরীক্ষার জন্য বাপ নাকি ছেলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতো। এসব কিন্তু সমগ্র জেলার চিত্র নয়। প্রধানত কাঁথি এবং তমলুক মহকুমাতেই এসব ঘটতো। অপরদিকে ঝাড়গ্রাম এবং সদর মহকুমার পশ্চিমাংশ শিক্ষা প্রসারের উপযুক্ত ব্যবস্থা পায়নি। এখানে গড়ের অঙ্ক কাজ করবে না। তাছাড়া উপরোক্ত অবহেলিত অঞ্চলে জনসাধারণ যেভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কোথাও দুর্গম এলাকায় বসবাস করেন তাতে শিক্ষা প্রসারের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করলে গণমুখী শিক্ষার স্লোগান ব্যর্থ হতে বাধ্য।

ইতিপূর্বে বড়লোকেরা স্কুল খুলতেন—নিজেদের পরিবারের ছেলে-মেয়ে-বৌদের শিক্ষক হিসাবে ঢোকাতেন—পরিচিত সমমতাবলম্বীদের শিক্ষক/শিক্ষাকর্মী হিসাবে ঢোকাতেন। অনেকের কাছ থেকে আবার টাকাও নেওয়া হতো—তদবির করে (এবং অনেক ক্ষেত্রেই টাকা দিয়ে) স্কুল বোর্ড/ডি আই অফিস থেকে স্কুলের অনুমোদন আদায় করা হতো। এর ফলে যে সব এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার লোক থাকতো না—সেখানে প্রয়োজন থাকলেও স্কুল হতো না। যেমন ঝাড়গ্রামে এবং সদরের পশ্চিমাঞ্চলে প্রয়োজন মতো স্কুল হয়নি।

১৯৭৭-এর পর চিত্র সম্পূর্ণ পালটে গেল। ৩৬ দফার মধ্যে ৮ দফা শিক্ষা সম্পর্কিত কর্মসূচি নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। শুধুমাত্র প্রাথমিক স্তরে সীমাবদ্ধ না থেকে পর্যায়ক্রমে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করে দিল। আগের মত অর্গানাইজিং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদনের আর ব্যবস্থা থাকলো না। যেখানে বিদ্যালয়ের প্রয়োজন সেই এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপনের উপযুক্ত জমি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদকে সেই এলাকার মানুষ রেজিস্ট্রি করে দিলে সংসদ সেখানে বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রার্থীদের নাম আনিয়ে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করে। রাজ্য সরকার, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি

চোরচিতা চোরেশ্বর হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে চলেছে
ছবি : রবীন গোলদার

ইত্যাদি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ভবনের জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থ দিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্ল্যাক বোর্ড অপারেশনের টাকাও অন্তর্ভুক্ত। দ্বিপ্রাহরিক আহার এবং

পোশাক সরবরাহের জন্যও রাজ্য সরকার সীমিতভাবে অর্থ ব্যয় করে চলেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৭৭ সালে এই জেলায় ৬৭১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল বর্তমানে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৮৪৫। প্রাথমিক শিক্ষকের সংখ্যা ওই সময়ে ছিল ১৯৫৫৩ এবং বর্তমানে সংখ্যা হল ২৬,০৫০। ইতিমধ্যে ২১৪৫টি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ১৯৭৭ থেকে বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা ১১,২৭,০০০-র মতো—১৯৮৮ সালে এই সংখ্যা ছিল ৯,৮০,৬২৬। কাজেই ছাত্রসংখ্যা যে হারে বাড়ছে তদনুযায়ী প্রয়োজন মতো প্রাথমিক বিদ্যালয় এখনও নেই। তবে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার অসম বন্টনও আছে। বেশ কিছু বিদ্যালয় আছে যেখানে প্রয়োজনের তুলনায় ছাত্র সংখ্যা অনেক কম। আবার ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষক অনেক কম আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যাও কম নয়। বিভিন্ন মামলার কারণে দীর্ঘদিন শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ থাকায় প্রায় হাজার তিনেক শিক্ষককে নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানা গেছে। জেলার প্রায় ৭৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী এখন ১ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে বিদ্যালয়ে পড়তে পারছে। এটা ১০০ শতাংশ করার লক্ষ্যেই জেলা এগিয়ে চলেছে। ঝাড়গ্রাম মহকুমা এবং খড়্গপুর ও সদর মহকুমার পশ্চিমাংশেই বেশি নতুন বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। তবে শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমেও কিছু প্রাথমিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা চলছে।

১৯৭৭ সালে এই জেলায় ১৪টি মাদ্রাসা, ৩৮০টি জুনিয়ার হাই, ৫২০টি হাই এবং ৯৫টি হায়ার সেকেণ্ডারী অর্থাৎ মোট ১০০৯টি মাধ্যমিক বিদালয় ছিল। আগে কীভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতো তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালের আগে অনুমোদনের জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদে যে আবেদন করেছিল তা বিবেচনা

ঝাড়গ্রাম পৌরসভার উদ্যোগে এলাকার মানুষের স্বেচ্ছাশ্রম দানে তৈরি ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ঘাসজঙ্গল প্রাইমারি স্কুল। ছবি : রজতশুভ্র কর

করাই ১৯৭৭ পরবর্তী কালে প্রথম কাজ হয়ে দাঁড়ালো। মাধ্যমিক বিদ্যালয় জেলা পরিদর্শককে সম্পাদক করে সরকার ও পর্ষদের প্রতিনিধি নিয়ে জেলা পরিদর্শক টিম গঠিত হলো। পর্ষদ ম্যানেজিং কমিটির আবেদনপত্রগুলি সংশ্লিষ্ট জেলায়

বেলপাহাড়ী কেন্দ্রীয় আদিবাসী ছাত্রী নিবাসের দ্বারোদঘাটন

জেলায় পাঠিয়ে দিল। কোন্ এলাকায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রয়োজন তা দেখার দায়িত্ব পরিদর্শক দলের ছিল না। আবেদনকারীদের বিদ্যালয় পরিদর্শনই তাদের প্রধান কাজ ছিল। পরিদর্শকদল সর্বপ্রথম অনগ্রসর এলাকার বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করতে আরম্ভ করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই ওইসব এলাকায় পরিদর্শনের কাজ শেষ হয়। ১৯৭৮-এর বন্যায় জেলার রাস্তাঘাট বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তবু পরিদর্শকদল প্রচণ্ড পরিশ্রম করে ৫৪টি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকাতেই পরিদর্শনের কাজ চালিয়ে যান। ইতিমধ্যে কাঁসাই আর রূপনারায়ণ দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। আবেদনপত্র অনুযায়ী পরিদর্শনের কাজ শেষ হয়েছে। অনেক নতুন বিদ্যালয় অনুমোদনও পেয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের গণমুখী শিক্ষানীতি উপযুক্ত মর্যাদা পেল না। কারণ ওইসব বিদ্যালয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে নয় প্রধানত বড়লোকদের ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সরকার চাইলো প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হোক। জেলা পরিষদ বিদ্যালয়-ভিত্তিক মানচিত্র তৈরি করলো। দেখা গেল অসাম্যের চূড়ান্ত নিদর্শন। বহু গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় হাইস্কুল তো দূরের কথা জুনিয়ার হাইস্কুলও নেই। পরিদর্শক দল প্রস্তাব দিলেন আগে ওইসব এলাকায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হোক তারপর অন্যত্র হবে। যেসব এলাকায় একাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে সেখানে আপাতত নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বন্ধ রাখা হোক। সঙ্গে সঙ্গে পরিদর্শকদল জেলার সব কটি দুই শ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে চতুর্থশ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ে উন্নীত করার প্রস্তাব করলেন। সরকার ওই প্রস্তাব মেনে নিলো এবং বিদ্যালয়হীন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জেলা পরিষদকেই উদ্যোগ নিতে বললো। সেইমত কিছু নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ও অনুমোদিত হল। কিছু মামলার ফলে এই পরিকল্পনার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে বলে জানা গেছে। বর্তমানে এই জেলায় ২৩৬টি উচ্চমাধ্যমিক, ৬৯০টি মাধ্যমিক, ৫৬৩টি নিম্নমাধ্যমিক এবং ৩২টি মাদ্রাসা অর্থাৎ মোট ১৫২১টি

দলবাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোটবাড় গ্রাম পঞ্চায়েত, ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি

বিদ্যালয় অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে জেলায় শিক্ষাদান করে চলেছে। এইসব বিদ্যালয়ে এখন আনুমানিক ১০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করে এবং ১৮,৮৪৩ জন শিক্ষক ও ৪,২৩৯ জন শিক্ষাকর্মী শিক্ষাদান কার্যে যুক্ত আছেন। বর্তমানে বিদ্যালয়গুলিতে বহু শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে যেগুলি স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পূরণ করার কথা।

বিদ্যালয়গুলিতে সরকারি সাহায্যের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে বড় বড় স্কুলগুলি এবং যাদের পরিচিতি বেশি আছে শুধু তারাই সরকারি অর্থ সাহায্য পেত। বামফ্রন্ট সরকার জেলায় জেলায় কমিটি করে পরিদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে লক্ষ লক্ষ টাকা সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করেছে। এই প্রথম প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ জুনিয়ার হাইস্কুল ক্যাপিটাল গ্র্যান্টের টাকা পেল। সমস্ত কাজই সঠিকভাবে হচ্ছে এই দাবি করা ঠিক নয়। তবু দেখা যাচ্ছে শিক্ষা প্রসারে সরকার আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করে চলেছে। সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতা তাকে সব কাজ করতে দিচ্ছে না এটা সত্য হলেও বিনে পয়সায় পাঠ্য পুস্তক সরবরাহের জন্য (প্রাথমিক স্তরে) সরকার এশিয়ার সর্ববৃহৎ প্রকাশকে পরিণত হয়েছে। এত ছাত্রের জন্য বই ছাপিয়ে সময়মত ১৮টি জেলার সমস্ত বিদ্যালয়ে পৌঁছে দেবার কাজ খুব সহজ নয়। পঞ্চায়েত-পৌরসভার সাহায্য নিয়ে সরকার এ কাজ করে চলেছে। আশা করা যায় মেদিনীপুর জেলায় পঞ্চায়েত-পৌরসভার সাহায্য নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এবং শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সরকারের উদ্দেশ্য অবশ্যই সফল হবে। সাধারণ মানুষ আজ তার প্রাপ্য অধিকার সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়েছে। সবাই যদি কর্তব্য সম্বন্ধে সেইমতো সচেতন হন তাহলে শিক্ষা প্রসারে অগ্রগতি ঘটবেই। শুধুমাত্র প্রসার নয় শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্বন্ধে সবাইকে ভাবতে হবে। শিক্ষক সংগঠনগুলিকেও এ সম্বন্ধে উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে—এটাই সমাজের চাহিদা। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি প্রতিটি জেলার মতোই মেদিনীপুরেও ফ্রি কোচিং সেন্টার পরিচালনা করছে। এর সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সমন্বয়ে শিক্ষা প্রসার ও মানোন্নয়ন আন্দোলন এগিয়ে চলুক। সম্পূর্ণ সাক্ষর মেদিনীপুর জেলায় সাক্ষরতা প্রসার আন্দোলনের সঙ্গে ওই আন্দোলন যুক্ত হোক। সাফল্য আসবেই। বলা যায়—

জনসমুদ্রে জেগেছে জোয়ার দুর্নিবার।
সকলের পায়ে পা মিলিয়ে হবো ঘূর্ণীপার।।

লেখক : প্রাক্তন শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক
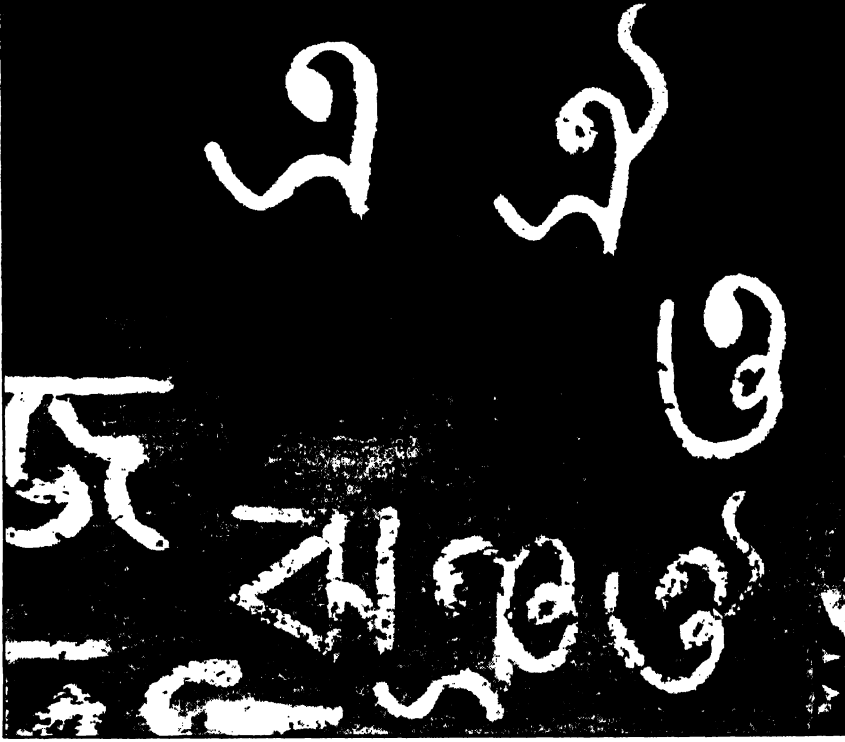
মেদিনীপুর জেলার সাক্ষরতা অভিযান

হরেকৃষ্ণ সামন্ত

মূল পর্যায় :

১৯৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই মেদিনীপুর জেলায় এক ভয়াবহ বন্যা হয়। জেলার অধিকাংশ এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষ বন্যা-কবলিত হয়ে পড়েন। কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়। বহু প্রাণহানি ঘটে। এই বিপর্যয়ে নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যরা কঠিন দায়িত্ব, উৎসাহ আর আন্তরিকতা নিয়ে শুরু করলেন উদ্ধার, ত্রাণ আর পুনর্গঠনের কাজ। তাদের এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হল সরকারি আধিকারিক ও কর্মচারীদের কর্মোদ্যোগ, রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনগুলির কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। মানুষের এই সমবেত প্রচেষ্টায় উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্গঠনের কাজ জেলার অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা এনে দিল। মোকাবিলা করা সহজ হল এক কঠিন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের। মানুষের সমবেত প্রচেষ্টা গুরুতর কঠিন কাজকে কত দ্রুত সহজভাবে সম্পন্ন করতে পারে ১৯৭৮-এর বন্যা মোকাবিলা এক দৃষ্টান্ত হয়ে *আছে। এ সংগ্রাম ছিল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম।*

সমাজের কঠিন সমস্যা মোকাবিলার কোন দৃষ্টান্ত কি আমাদের আছে? আছে। যুগ যুগ ধরে গ্রামের সেইসব শ্রমজীবী মানুষ যারা জমিতে ফসল ফলায় তারা জমির মালিকানার অধিকার, জমি চাষের অধিকার থেকে বঞ্চিত। আইন আছে কিন্তু আইনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে এই গরিব কৃষক সমাজ। ৭৮ সালের পঞ্চায়েত

নির্বাচনের পর এক্ষেত্রেও সমবেত প্রচেষ্টা শুরু হল। পঞ্চায়েত, সরকারি আধিকারিক, কর্মচারী, রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনের কর্মীরা একযোগে ভূমি-সংস্কারের অভিযান পরিচালনা করলেন। বহু বছরে যা করা যায়নি, মাত্র কয়েক বছরের সমবেত প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হল। পঞ্চায়েত, সরকারি আধিকারিক, কর্মচারী, রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনের কর্মীরা একযোগে ভূমি-সংস্কারের অভিযান পরিচালনা করলেন। বহু বছরে যা করা যায়নি, মাত্র কয়েক বছরের সমবেত প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হল। 'অপারেশন বর্গা'-র মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ বর্গাদারের অধিকার সংরক্ষণ এবং বিপুল পরিমাণ খাস জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ সম্ভব হল। এ আমাদের অভিজ্ঞতার দ্বিতীয় সংযোজন।

মেদিনীপুর জেলায় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিকেন্দ্রীকরণের আন্দোলন আর একটি অভিজ্ঞতা। উন্নয়ন ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ হল জনগণকে ক্ষমতা সম্পন্ন করা যাতে তাঁরা পরিকল্পনা প্রণয়ন, রূপায়ণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে পরিকল্পনা বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া পঞ্চায়েত, সরকারি কর্মচারী, গণসংগঠন কর্মীদের যৌথ উদ্যোগে গ্রামস্তর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। কিন্তু এই আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়েই উপলব্ধি করা গেল যাদের হাতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে তাদের এই ক্ষমতা ধারণ এবং তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। আর এর কারণ বিশ্লেষণ করে বোঝা গেল নিরক্ষরতা এর অন্যতম কারণ।

উপরোক্ত অভিজ্ঞতাসমূহে পুষ্ট হয়ে ১৯৯০ সালের প্রথমার্ধে মেদিনীপুর জেলা পরিকল্পনা কমিটিতে আন্দোলনের মাধ্যমে সার্বিক সাক্ষরতা সম্পন্ন করার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবটি মেদিনীপুর জেলা পরিকল্পনা কাউন্সিল সভায় অনুমোদিত হয়। তারপর শুরু হয় প্রস্তুতিপর্ব। নিরক্ষর গণনা এবং চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয় সঙ্গে সঙ্গে।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মেদিনীপুর জেলায় এই সাক্ষরতা অভিযানের যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তখন জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান (Total Literacy Campaign) প্রস্তাব জেলার কাছে ছিল না। পরবর্তী কালে যখন এই প্রস্তাব জেলায় আসে এবং তা জেলার গৃহীত সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলে যায় তখন জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের প্রকল্পের নীতি অনুসারে জেলায় সাক্ষরতা অভিযানের কাজ শুরু হয়।

একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জেলার চিহ্নিত সকল নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করার লক্ষে গঠন করা হয় মেদিনীপুর সাক্ষরতা ও রোগ প্রতিষেধ সমিতি। অভিযানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য জেলাস্তর থেকে গ্রামপঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের কমিটি গড়ে এবং বহুসংখ্যক মানুষকে সংযুক্ত করে একটি সুদৃঢ় পরিচালন পরিকাঠামো গঠন করা হয়। জেলাস্তর কমিটির অর্থাৎ জেলা সাক্ষরতা ও রোগ প্রতিষেধ সমিতির সভাপতি হন জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং কার্যকরী সহসভাপতি হন জেলাশাসক। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, গণসংগঠনের প্রতিনিধি, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই কমিটির সদস্য হন। অনুরূপভাবেই গঠন করা হয় মহকুমা, ব্লক/পৌরসভা, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের কমিটিগুলি। সর্বশেষ কমিটি ছিল গ্রাম স্তরে। সমস্ত রাজনৈতিক দল, গণসংগঠনের প্রতিনিধি ছিল এই কমিটিতে। ছিল এলাকার সমাজসচেতন এবং শিক্ষানুরাগী মানুষজন। প্রতি সপ্তাহে এই কমিটিগুলির সভা করে পরবর্তী কমিটির নিকট রিপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে সমাজের সার্বিক প্রতিনিধিত্বকারী একটি সুসংহত পরিকাঠামো গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক যে দুটি কাজ করার দায়িত্ব সর্বস্তরের কমিটিকে দেওয়া হয় তা হল নিরক্ষরদের সমীক্ষা করা এবং শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবক/স্বেচ্ছাসেবিকা নির্বাচন করা। প্রাথমিক পর্যায়ে উৎসাহ এমন স্তরে ছিল যে প্রায় একমাসের মধ্যে নিরক্ষর-সমীক্ষার কাজ স্বেচ্ছাসেবক/স্বেচ্ছাসেবিকার নির্বাচন এবং নাম নথিভুক্তিকরণের কাজ শেষ হয়।

আন্দোলনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নিবিড় এবং ব্যাপক প্রচার অভিযান পরিচালনা করা। জেলাস্তর থেকে গ্রামস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে এই প্রচার অভিযান সংগঠিত হয়েছে। সর্বস্তরের কমিটিগুলির সদস্যরা এই প্রচার অভিযান সংগঠিত করেছেন এবং সমাজের বৃহৎ অংশের মানুষকে সংযুক্ত করেছেন। সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা, পোস্টার, হ্যান্ডবিল, দেওয়াল লিখন, প্রকাশ্য স্থানে হোর্ডিং, গান, কবিতা, ছোটনাটক, লোকশিল্পীদের বিভিন্ন আঙ্গিকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাক্ষরতা অভিযানের প্রচার শুরু হয়। যাত্রা, কবিগান শিল্পীরা টীম করে এলাকায় এলাকায় বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করা, সাক্ষরতা বিষয়ক গানের ক্যাসেট করে প্রচার করা, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিল করা, বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মীদের শুধু সাক্ষরতা শ্লোগান দিয়ে পাড়ায়-পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে মিছিল করা, দেওয়াল লেখার মাধ্যমে এক বিশাল উন্মাদনা তৈরি হয়। উন্মাদনা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে নির্ধারিত বই ছাড়া, প্রশিক্ষণ ছাড়াই অনেক ক্ষেত্রে বুনিয়াদি সাক্ষরতা কেন্দ্রের কাজ শুরু হয়ে যায়। ব্ল্যাকবোর্ড নেই তো দেওয়ালে কালি দিয়ে বোর্ড তৈরি করল মানুষ। স্থানীয় উদ্যোগে শ্লেট, পেনসিল, খাতাসহ অন্যান্য সরঞ্জাম কত যে সংগৃহীত হয়েছে তার কোনও হিসাব করা যায় না।

দ্রুততার সঙ্গে জেলা সম্পদকর্মীদের প্রশিক্ষণ সংগঠিত করা হয়। জেলা সম্পদকর্মীরা ব্লক/পৌরসভাস্তরে মহা প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়। মহাপ্রশিক্ষকরা জুন-জুলাই, ১৯৯০
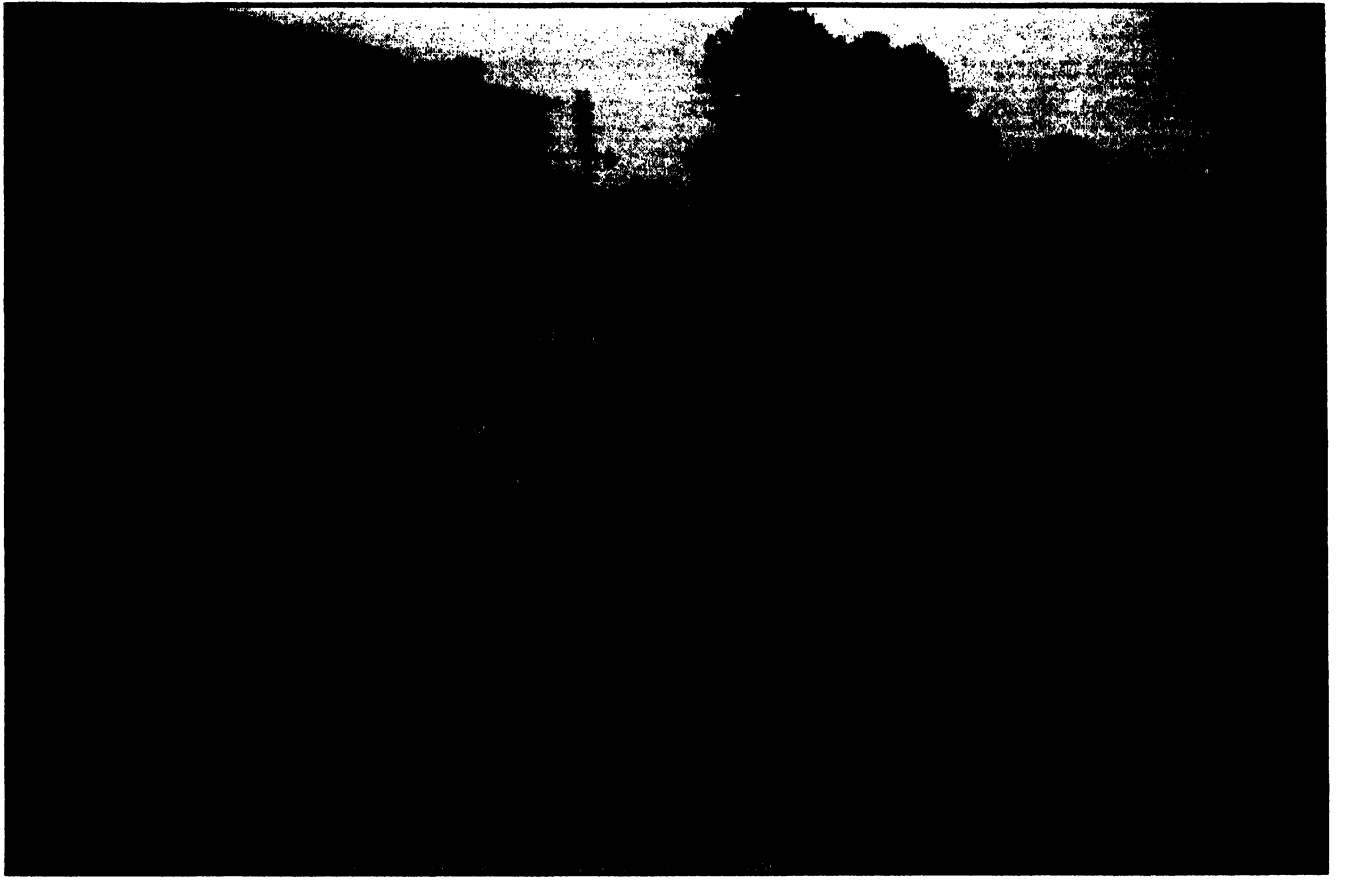
ধারাবাহিক শিক্ষা কর্মসূচি, মেদিনীপুর সাক্ষরতা ও রোগ প্রতিষেধক সমিতির উদ্যোগে মিছিল

মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক/স্বেচ্ছাসেবিকাকে প্রশিক্ষণ দেয়। প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিহ্নিত নিরক্ষরদের নিয়ে সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলি চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১৯৯০ সালের ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে মেদিনীপুর শহরে বিশাল জনসভার মধ্য দিয়ে মেদিনীপুর জেলা সার্বিক সাক্ষরতা ও রোগ প্রতিষেধ অভিযানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। দ্রুতলয়ে শুরু হয়ে যায় সাক্ষরতা অভিযানের বিকাশ কর্মসূচি।

সমীক্ষার মাধ্যমে জেলায় ১৬,৪৬,৭৩০ মানুষকে নিরক্ষর বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৯—১৪ বছরের ২,৭৭,৪২৪ এবং ১৫—৬০ বছর বয়সের ১৩,৬৯,৩০৬ জন। পুরুষের সংখ্যা ৫,৮৩,৫৯২ ও মহিলার সংখ্যা ১৫,৬৩,১৩৮ জন। এই নিরক্ষরদের মধ্যে ছিল তফসিলি সম্প্রদায় ৩,৯৪,৫৬০ এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের ২,১৭,৯১০ জন মানুষ।

১৬,৪৬,৭৩০ মধ্যে প্রায় ১৫,৬৬,৭৮৬ জন নিরক্ষর মানুষ কেন্দ্রে নথিভুক্ত হলেন। ১৪ লক্ষেরও বেশি মানুষকে কেন্দ্রে হাজির করানো সম্ভব হয়েছিল। প্রায় এক লক্ষ দুই হাজার সাক্ষরতা কেন্দ্র চালু হয়। ১,২৭,০০০ স্বেচ্ছাসেবক/স্বেচ্ছাসেবিকা নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জেলার প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছায় এই অভিযানের ঢেউ।

একদিকে চলতে থাকে প্রচার আর একদিকে চলতে থাকে পাড়ায় পাড়ায় সাক্ষরতা কেন্দ্র। দুধরনের পরিদর্শন দল সন্ধ্যায় সব কাজ ছেড়ে সাক্ষরতা কেন্দ্র পরিদর্শন করত। সরকারি কর্মচারী বা অন্যান্য পদাধিকারী বা গণসংগঠনের সদস্যরা কেন্দ্র পরিদর্শন করতেন পড়ুয়াদের উৎসাহ প্রদান এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য। আর সম্পদকর্মী এবং মহাপ্রশিক্ষকরা কেন্দ্র পরিদর্শন করতেন পড়া, লেখা, অংকশেখার অগ্রগতি পরিদর্শনের জন্য এবং প্রশিক্ষণের কোনও ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করার জন্য। এই সাক্ষরতা কেন্দ্র পরিদর্শন আর এক অভিজ্ঞতা। দলমত নির্বিশেষে বহু মানুষ স্বেচ্ছায় এই কাজে এগিয়ে এসেছেন। সরকারি কর্মচারীদের একটি বড় অংশ নিজেদের দায়িত্বের বাইরে স্বেচ্ছায় এই কাজে যুক্ত হয়েছেন। অপর দিকে পড়ুয়ারা সমাজের একটা বড় অংশের মানুষকে এই কাজে যুক্ত হতে দেখে এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের এই স্তরে নেমে আসতে দেখে উৎসাহিত এবং আত্মবিশ্বাসী হয়েছে।

সাক্ষরতা কেন্দ্রে লেখাপড়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের যুক্ত করে এলাকায় শিশুদের রোগ প্রতিষেধক টীকাকরণ, বন্ধ্যাত্বকরণ, মা ও শিশুদের যত্ন , অল্প ব্যয়ে পুষ্টিকর খাবার কীভাবে পাওয়া যাবে, বিভিন্ন রোগের কারণ ও তার প্রতিকারের উপায় নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। স্বল্পমূল্যে বাড়িতে বাড়িতে নিজ নিজ উদ্যোগে শৌচাগার তৈরি প্রকল্পের কাজও শুরু হয়ে যায়।

প্রথম পর্যায়ে সারা জেলায় সাক্ষরতা অভিযানের কাজ চলেছে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে। পঞ্চায়েত ও প্রশাসন তাদের সকল কাজের মধ্যে সাক্ষরতা কাজের গুরুত্ব রেখেছিল এক নম্বরে। সমস্ত সরকারি পরিকাঠামোকে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। প্রায় আড়াই বছর এই অভিযান চলার পরে ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে পড়ুয়াদের বহির্মূল্যায়ন করা হয়। এই মূল্যায়নে জেলার ১১,০৬,০০০ পড়ুয়া অংশ নেয় এবং ৮,৫৮,২৯৬ পড়ুয়া জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের সাক্ষরতার যে মান ছিল তা অর্জন করে। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে মেদিনীপুর জেলাকে সার্বিক সাক্ষর জেলা হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

সাক্ষরোত্তর পর্যায় : মেদিনীপুর জেলা সার্বিক সাক্ষর জেলা হিসাবে ঘোষিত হওয়ার পরও জেলার সাক্ষরতা অভিযান থেমে যায়নি। তার কারণ সাক্ষরতা অভিযান চালানোর সময় যে বিষয়গুলি লক্ষ করা গিয়েছিল—

১) সাক্ষরতা অভিযানের মাধ্যমে যারা নবসাক্ষর হলেন তাদের শিক্ষাকে জীবন ও জীবিকার কাজে প্রয়োগ করে জীবনের মানের পরিবর্তন ঘটাতে চাইলে, শিক্ষার মানটা আরও বাড়ানো প্রয়োজন।

২) সাক্ষরতা অভিযানের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক মানুষকে সাক্ষর করা সম্ভব হলেও সমাজের বহু সংখ্যক মানুষ নিরক্ষর থেকে গিয়েছিলেন। একটা বড় অংশের মানুষ সাক্ষরতা অভিযানে যোগদান করেও বেশি লেখাপড়া চালাতে পারেননি। নানা কারণে মাঝপথে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফলে তারা কিছুটা শিখলেও সম্পূর্ণ সাক্ষর হয়ে উঠতে পারেননি।

৩) সাক্ষরতা অভিযানে অংশগ্রহণে যে পড়ুয়ারা সাক্ষর হলেন তাদের একটা বড় অংশের পড়ুয়া আরও পড়ার জন্য আবেদন জানাতে লাগলেন। অন্যদিকে সাক্ষরতা অভিযানে সামিল হওয়া বহু স্বেচ্ছাসেবক এই অভিযানকে চালিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। তারা এতই উৎসাহিত হয়ে পড়েছিলেন। বললেন, এই অভিযান কোনমতেই বন্ধ করা যাবে না। বরং একে আরও পরিকল্পিত ভাবে চালানো প্রয়োজন।

উপরের যুক্তিগুলি যথার্থভাবে অনুধাবনের পর মেদিনীপুর সাক্ষরতা ও রোগ প্রতিষেধ সমিতি এই অভিযানকে আরও চালানোর পরিকল্পনা নেয়। শুরু হয় সাক্ষরোত্তর পর্ব।

সাক্ষরোত্তর কর্মসূচি পর্যায়ে যারা নিরক্ষর ছিলেন এবং যারা কিছুটা পড়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন তাদের নিয়ে বুনিয়াদি সাক্ষরতার (T L C) কাজ চলতে থাকল। আর যারা
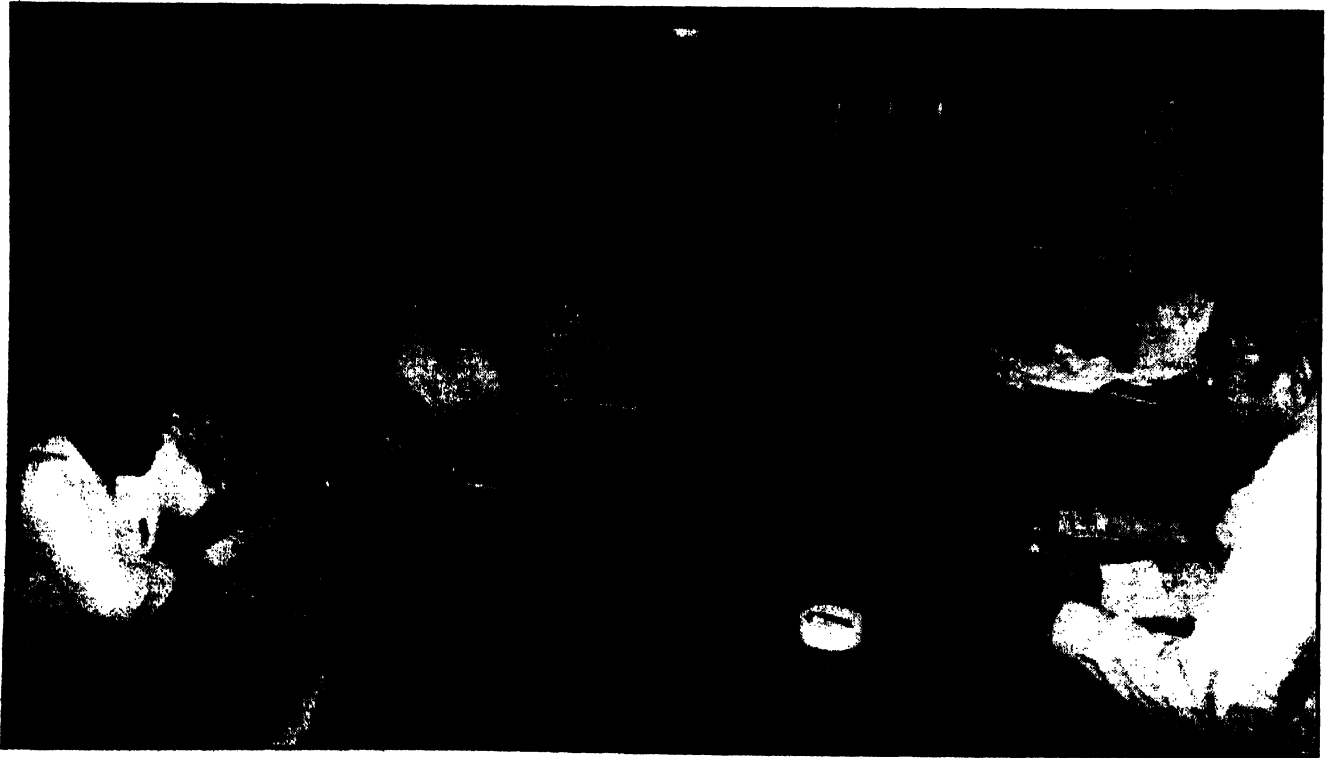
মেদিনীপুর জেলার ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্পের কর্মশালা

নবসাক্ষর হয়েছিলেন তারা তাদের শিক্ষাকে যাতে আরও দৃঢ় করতে পারেন এবং তা জীবন ও জীবিকার কাজে লাগিয়ে জীবনের মানের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন তার পরিকল্পনা নেওয়া হয় এবং কাজ শুরু করা হয়।

সাক্ষরোত্তর কর্মসূচি সঠিক রূপায়ণের লক্ষে এই সময়ে মেদিনীপুর জেলা সাক্ষরতা ও রোগ প্রতিষেধ সমিতি কর্মশালা করে নবসাক্ষরদের উপযোগী বই প্রস্তুত করেছিল। যেমন : (ক) জলের ফসল মাছ (খ) আসুন ভালো থাকি (গ) আয় বাড়ানোর নানা পথ (ঘ) আমরা চাষ করি আনন্দে (ঙ) সবজি ও ফল চাষ (চ) জনকল্যাণ ও পরিবেশ (ছ) আমরা দেশের দেশ আমাদের (জ) গরু-ছাগল-মুরগি চাষ ইত্যাদি। বইগুলির বিষয়বস্তুর লক্ষ ছিল পড়ুয়াদের সাধারণ জ্ঞান বাড়ানো, বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো, উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করানো, পরিবেশ সচেতনতা বাড়ানো, বিভিন্ন বিষয়ে উন্নত কৃৎকৌশলগুলি অত্যন্ত সরল ভাষায় বলা। এই বইগুলি ছিল ২৪-৩২ পাতার মধ্যে বড় হরফের ছোট ছোট বই। সবচেয়ে বড় কথা এই বইগুলি প্রস্তুত করতে খুব বড় বড় মানুষ এগিয়ে এসে সহযোগিতা করেছিলেন।

এই পর্যায়ে উন্নয়ন দপ্তরগুলির আধিকারিকেরা এবং তাদের কর্মীরা সাক্ষরোত্তর কেন্দ্রে গিয়ে পড়ুয়াদের কাছে তাদের দপ্তরে কী কী কাজ আছে এবং কীভাবে এই সুযোগ পাওয়া যেতে পারে তা যাতে আলোচনা করেন সে-বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়। এক একটি দপ্তরের জন্য এক এক পক্ষকাল চিহ্নিত করে জেলার সর্বত্র ওই দপ্তরের সকলে যাতে বিশেষ উদ্যোগ নেন তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এমনকী পুলিশ প্রশাসনের লোকেরাও সাক্ষরোত্তর কেন্দ্রে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের আইনের সংস্থানগুলি কীভাবে কার্যকরী করা হয় তা আলোচনা করেন। এছাড়া জনসাধারণ নিজেরা সংগঠিত উদ্যোগে যৌথভাবে প্রকল্প পরিচালনা কীভাবে করতে পারেন এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে কী ভূমিকা নেবেন এইসব বিষয় সাক্ষরোত্তর কেন্দ্রগুলিতে আলোচনার আয়োজন করা হয়।

তিনটি মূল্যায়নের মাধ্যমে নবসাক্ষরদের পরিসংখ্যান

	পুরুষ	মহিলা	মোট	তপসিলি	আদিবাসী	সংখ্যালঘু
প্রথম মূল্যায়ন মার্চ '৯২	৩,৩৭,২৩০	৫,২১,০৬৬	৮,৫৮,২৯৬	২,৪৯,২৯৭	১,৩৪,০৫০	৯২,২৯৩
দ্বিতীয় মূল্যায়ন জুন '৯৫	১,২০,২৬৯	১,৩৭,৬৯৬	২,৫৭,৯৬৫	৭২,৯৪৯	৪১,৪৩৬	২৮,০৪৫
তৃতীয় মূল্যায়ন মার্চ '৯৬	১,১৯,৬৫১	১,৩১,১১৫	২,৫০,৭৬৬	৭০,২৭৪	৪১,৪২৫	২১,৩৫০
মোট	৫,৭৭,১৫০	৭,৮৯,৪৭৭	১৩,৬৭,০২৭	৩,৯২,৫২০	২,১৬,৯১১	১,৪১,৬৪৪

সাক্ষরোত্তর পর্যায়ে বুনিয়াদি এবং সাক্ষরোত্তর মিলিয়ে প্রায় ১৮-১৯ হাজার কেন্দ্র খোলা হয়। এই পর্যায়ে একবার নবসাক্ষরদের এবং দু'বার বুনিয়াদি পড়ুয়াদের বহির্মূল্যায়ন করা হয়। এর ফলে আরও প্রায় ৫ লক্ষ পড়ুয়া নবসাক্ষরে উন্নীত হন। তখন জেলায় মোট নবসাক্ষরের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩,৬৭,০২৭। ১৯৯৭ সালে নবসাক্ষরদের একটি মূল্যায়ন হয়। এই মূল্যায়নে ৬,৫৯,৪৮৯ জন অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে ৩,৫৪,৪৭৯ জন জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের মান অর্জন করেন অর্থাৎ সাফল্যের হার ৫৪%। কিন্তু তারপর কী? তারপর পড়ুয়ারা কী করবে ? জেলা থেকে এই শিক্ষা ধারাবাহিকভাবে চালানোর দাবি উঠতে থাকে। বিশেষ করে যে স্বেচ্ছাসেবকরা এবং জেলা সম্পদকর্মীরা এই কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে চালানোর জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তারাও একই দাবি জানান। এছাড়া আমাদের জেলায় বিভিন্ন বিষয়ে কিছু সমাজ বিজ্ঞানী সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। তারা আমাদের একটা কথা বললেন যে জেলার সাধারণ মানুষ কিছু কিছু ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলেও সচেতনতার দিকে অনেকটা এগিয়ে। তার অন্যতম কারণ হয়তো সাক্ষরতা অভিযানের সুফল। পঞ্চায়েত এবং প্রশাসনের কাজে যারা মানুষের সঙ্গে যুক্ত আছেন তারা একটা কথা বলতে লাগলেন যে সাক্ষরতা কর্মসূচিকে যদি একটা ধারাবাহিক বা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যায় তবে বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিতে উন্নয়নের কাজ করা আরও সহজ হয়। তাই সাক্ষরতা অভিযানের কাজকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং ধারাবাহিক ভাবে চালানোর প্রকল্প রচনা করা হয়।

জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের এই সময়ে ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্পের কর্মসূচি ছিল না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা থেকেও এই ধারাবাহিক শিক্ষার দাবি উঠতে থাকে। এই সময়ে ১৯৯৪-৯৬ সাল পর্যন্ত বর্ধমান জেলায় 'জনশিক্ষণ নিলয়মে'র ধাঁচে ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্প নামে একটি পাইলট প্রজেক্ট শুরু হয়। মেদিনীপুর জেলা এই কর্মসূচির সঙ্গে একমত ছিল না বলে তা গ্রহণ করেনি। কারণ, 'জনশিক্ষণ নিলয়ম' কর্মসূচিতে প্রতি পাঁচ হাজার নবসাক্ষর পড়ুয়াকে নিয়ে এক একটি কেন্দ্র করার কথা বলা

নবসাক্ষরদের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হচ্ছে

হয়। অর্থাৎ চার-পাঁচটি গ্রামের পড়ুয়াদের নিয়ে একটা কেন্দ্র। যা আমাদের জেলার ভৌগোলিক অবস্থানে সম্ভব নয়। তিন-চার কিলোমিটার পথ পেরিয়ে নবসাক্ষররা পড়তে যাবেন তা বাস্তবসম্মতও নয়। তাই, মেদিনীপুর জেলায় প্রতিটি গ্রাম সংসদে ও ওয়ার্ডে একটি করে সাক্ষরোত্তর কেন্দ্র চালানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই কেন্দ্রগুলিকে *'ঈশ্বরচন্দ্র জনচেতনা কেন্দ্র'* নামে অভিহিত করা হয়। পরবর্তী কালে জাতীয় সাক্ষরতা মিশন ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্প রচনার জন্য জেলায় এক নির্দেশিকা পাঠায়। যা মেদিনীপুর জেলা সাক্ষরতা ও রোগ প্রতিষেধ সমিতির ধারণার সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। এই প্রকল্পের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সামান্য পরিবর্তন করে ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্পের এক প্রস্তাব আগস্ট '৯৭ রাজ্য সরকারের মাধ্যমে জাতীয় সাক্ষরতা মিশনে পাঠান হয়। ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাসে এই প্রস্তাব অনুমোদন লাভ করে এবং ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে জেলায় ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্পের কাজ শুরু হয়।

ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্প : জাতীয় সাক্ষরতা মিশন মেদিনীপুর জেলায় পাঁচ বছরের জন্য ৫,৬৭০টি ধারাবাহিক শিক্ষা কেন্দ্র এবং ৬৩০টি মুখ্য ধারাবাহিক শিক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন দেয়। কিন্তু যেহেতু জেলায় প্রতিটি গ্রাম সংসদে ও ওয়ার্ডে একটি করে ঈশ্বরচন্দ্র জনচেতনা কেন্দ্র অর্থাৎ ধারাবাহিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন উদ্দেশ্য ছিল সেই হেতু জেলায় ৬৩০-এর কিছু বেশি মুখ্য ধারাবাহিক শিক্ষা কেন্দ্র এবং ৬৬৬৭টি ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যগুলি :

(ক) সাক্ষরতা অভিযানের মাধ্যমে যারা নবসাক্ষর হয়েছেন তাঁদের অর্জিত শিক্ষাকে ধরে রাখা এবং ধারাবাহিক চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার মানকে আরও বাড়ানো।

(খ) নবসাক্ষররা অর্জিত শিক্ষাকে যাতে জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে জীবনের গুণগতমানকে আরও বাড়াতে পারেন তার সুযোগ করে দেওয়া।

(গ) সমাজে এখনও যারা স্বল্প সাক্ষর বা নিরক্ষর রয়েছেন তাঁদের অবিলম্বে সাক্ষর করে তোলা।

(ঘ) সরকারি উন্নয়ন বিভাগগুলির সঙ্গে ধারাবাহিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলির সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প-সংক্রান্ত নানা ধরনের তথ্য সমাজের দুর্বলতর অংশে পৌঁছে দেওয়া। যাতে তাঁরা সরকারি উন্নয়ন বিভাগগুলির কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন এবং তার সুযোগ নিতে পারেন।

(ঙ) স্বল্প মেয়াদি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসাধারণের দক্ষতা বাড়ানো। যাতে জীবিকার ক্ষেত্রে এই শিক্ষাকে প্রয়োগ করে তাঁরা নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারেন।

(চ) স্বাস্থ্য, পরিবেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বাড়ানো এবং যুক্তিবাদী মানসিকতার বিকাশ ঘটানো।

(ছ) ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রকে এলাকার উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং খেলাধূলা অভ্যাসের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলে সমাজে একটা সুস্থ সংস্কৃতির বাতাবরণ তৈরি করা।

মোটামুটি এই উদ্দেশ্যগুলি সামনে রেখেই আমরা ১৯৯২ সালে সাক্ষরোত্তর কর্মসূচির কাজ শুরু করেছিলাম। বর্তমানে আরও সুসংগঠিত ভাবে করা হচ্ছে।

ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্পে জেলায় লক্ষ্যদল এরকম : পুরুষ—৭,৯৩,৭০৪, মহিলা—১৪,০১,৬৫, (তফসিলি সম্প্রদায়—৫,৬৭,৬৯৭, আদিবাসী—৩,৬১,৮৩৭) মোট—২১,৯৫,৩৬২।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার যে, সাক্ষরোত্তর প্রকল্পের চেয়ে ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্পে লক্ষ্যদল বড়। তার কারণ এই শিক্ষা প্রকল্পে নবসাক্ষর, স্বল্পসাক্ষর এবং নিরক্ষরদের সঙ্গে বিদ্যালয় ছুট এবং সমাজের অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তি যারা আরও পড়তে চান বা নানা বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে তাদের যুক্ত করা হয়েছে। আবার নবসাক্ষরের সংখ্যা ১৩,৬৭,০২৭ থেকে কমে ১২,০০,৩৮৫ হয়েছে কারণ অনেকেই সাক্ষর হওয়ার পর পরবর্তী কালে ভুলে গেছেন। ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্পের এক বছর শেষ হয়েছে। এই সময়ে জেলায় ৬৬৬৭টি ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্র এবং ৬৩০টির কিছু বেশি মুখ্য ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্র গঠন করা হয়েছে। ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য প্রেরক এবং মুখ্য ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য মুখ্য প্রেরক নির্বাচনও শেষ হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে প্রায় ৪০ প্রকারের বই এবং পঠন-পাঠনের সামগ্রী এবং কেন্দ্র পরিচালনার বেশ কিছু সামগ্রীও পাঠানো হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন বিভাগগুলি যেমন কৃষি, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ প্রভৃতি বিভাগের কর্মীরা ধারাবাহিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে নিজেদের বিভাগের কাজগুলি নিয়ে যাতে আলোচনা করেন তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া জেলায় এখনও বহু মানুষ নিরক্ষর এবং স্বল্পসাক্ষর রয়েছেন। তাদের সাক্ষর করে তোলার জন্য মার্চ, ২০০০ থেকে এক বিশেষ অভিযান গ্রহণ করা হয়েছে। আগস্ট, ২০০০ মধ্যে এই বিশেষ অভিযান শেষ হবে।

লক্ষ্যদল	নবসাক্ষর	অগ্রণী নবসাক্ষর	প্রাথমিক বিদ্যাঃ ছুট	অন্যান্য আগ্রহী পড়ুয়া	নিরক্ষর ও স্বল্পসাক্ষর
২১,৯৫,৩৬২	১২,০০,৩৮৫	১,২৭,৮৮৯	২,৯৭,৮৭৬	১,২২,৮৬৭	৪,৪৬,৩৪৫

ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্পে দ্বিতীয় বছরে সমমান কর্মসূচি এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির কাজ শুরু হবে। সমমান কর্মসূচি হল প্রথা বহির্ভূত পদ্ধতিতে পড়ুয়াদের প্রথাগত শিক্ষার সমতুল করে তোলা আর আয় বৃদ্ধি কর্মসূচি হল এলাকায় যে সম্পদ রয়েছে তা কাজে লাগিয়ে মানুষের আয় যাতে বাড়ে তার ব্যবস্থা করা। এই কর্মসূচির পড়ুয়া চিহ্নিতকরণের কাজ বর্তমানে চলছে।

মেদিনীপুর সাক্ষরতা ও রোগ প্রতিষেধ সমিতির আলোচনা সভা

সাক্ষরতা অভিযানে গ্রামীণ মহিলারা পিছিয়ে নেই

১৯৯০ সালে যে অভিযান শুরু হয়েছিল তা নানা ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে আজ অনেকটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা যদি থাকে, স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমেও যে বিরাট বাধাকে অতিক্রম করা যায়, সমাজে বহুকালের জমা অন্ধকারও দূর করা যায়, এই অভিযান তার বড় প্রমাণ।

সাক্ষরতা অভিযানের দুর্বলতার দিকগুলিও আলোচনা করা দরকার।

প্রথমত এই আন্দোলনে যাঁদের সাহায্য সবচেয়ে ফলপ্রসূ হত সেই শিক্ষকদের এক বড় অংশকে যুক্ত করার ব্যাপারে বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে দুর্বলতা থেকে গেছে। ছাত্রদের অধিকাংশকে এই আন্দোলনে যুক্ত করা যায়নি। কিন্তু, সামাজিক দায়বদ্ধতার মানসিকতা বিকাশ ঘটানোর জন্য এই কর্মসূচিতে যুক্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত সব রাজনৈতিক দলের এই আন্দোলন সম্বন্ধে রাজনৈতিক সদিচ্ছা সমানভাবে প্রতিফলিত হয়নি। কখনও কখনও তা নেতিবাচক রূপও নিয়েছে। সব গণসংগঠনের ভূমিকাও সমান ছিল না। কিন্তু এই কাজে সব রাজনৈতিক দলের সক্রিয় ইতিবাচক ভূমিকা প্রয়োজন। গণসংগঠনের অংশগ্রহণ অত্যন্ত দরদী, সৃজনশীল ও ইতিবাচক হওয়া প্রয়োজন।

তৃতীয়ত সরকারি আধিকারিক এবং পঞ্চায়েত কর্মীদের প্রাথমিক পর্যায়ে যে উৎসাহ ছিল পরবর্তী কালে সেখানে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ফলে অভিযানের ধারাবাহিকতার অভাব ঘটেছে যা আন্দোলনকে মাঝে মধ্যেই থমকে দিয়েছে।

চতুর্থত সাক্ষরতা অভিযান পঞ্চায়েত ও প্রশাসনিক পরিকাঠামোর উপর নির্ভর করে চলেছে। ফলে, প্রশাসনিক কাজে যখন ব্যস্ততা এসেছে যেমন—নির্বাচন, বন্যা বা খরা মোকাবিলা তখন সাক্ষরতা অভিযানের কাজ উপেক্ষিত হয়েছে। দশ বছর ধরে এই অভিযান চললেও বিকল্প পরিকাঠামো এখনও গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি, যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল বলে আজ অনুভব করতে হচ্ছে।

পঞ্চমত সাক্ষরতা অভিযান সম্পর্কে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের এক ধরনের উন্নাসিক মনোভাব থেকেই গেছে। অনেক সময় এই নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু, বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ আরও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন ছিল। এই নিয়ে আরও গবেষণা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন ছিল। এই ঘাটতি এখনও অনুভব করা যায়। কিন্তু সুখের কথা যারা পাঠকেন্দ্রে গিয়েছেন, পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন, মূল্যায়নে অংশ নিয়েছেন তাঁরা পড়ুয়াদের উদ্বুদ্ধ করেছেন, আবার নিজেরা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

ষষ্ঠত জাতীয় সাক্ষরতা মিশন সাক্ষরতা অভিযানের যে প্রকল্প রচনা করেছে, তার মধ্যেও অনেক ফাঁক ছিল এবং অনেক বিষয় ছিল যা বাস্তবসম্মত নয়। যেমন, ২০০ ঘণ্টার মধ্যে নিরক্ষর মানুষকে পূর্ণ সাক্ষর করার পক্ষে যথেষ্ট নয়,

ঈশ্বরচন্দ্র জনচেতনা কেন্দ্রের মিছিল। বল্লভপুর, মেদিনীপুর

বিশেষ করে এই আর্থ-সামাজিক পরিবেশে। আবার সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানের পর কী হবে সে সম্পর্কে মিশনের সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা ছিল না। ফলে, সাক্ষরোত্তর অভিযান শুরু করতে দেরি হয়েছে। একই অবস্থা হয় সাক্ষরোত্তর অভিযানের পর ধারাবাহিক শিক্ষাপ্রকল্প শুরুর ক্ষেত্রে। আবার অনেক সময় এমন নির্দেশ এসেছে যা বাস্তবে প্রয়োগ অসম্ভব। যেমন—পাঁচ হাজার পড়ুয়া নিয়ে একটা কেন্দ্র। প্রকল্প রচনার এই দুর্বলতার জন্য অনেক সময় অভিযানের গতি শিথিল হয়ে পড়েছে, থমকে গেছে। আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি।

এত দুর্বলতা সত্ত্বেও সাক্ষরতা অভিযান স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে বৃহত্তর গণ-অভিযান। লক্ষ লক্ষ মানুষ হাজার হাজার বছরের সামাজিক বঞ্চনার ফলে পুঞ্জিভূত অন্ধকার থেকে আলোর পথের যাত্রী হওয়ার অভিযানে যোগ দিয়েছে এবং সফল হয়েছে। দেড় লক্ষ যুবক-যুবতীর স্বেচ্ছাশ্রম তার সঙ্গে অগণিত মানুষের সহযোগিতায় বর্তমান পণ্য-সর্বস্ব বিকিকিনির যুগে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শত শত কবিতা, গান, নাটক, স্লোগান, ছড়া, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচিত ও পরিবেশিত হয়েছে। এই সকল রচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কত নাম না জানা লেখক ও শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে তার সঠিক পরিসংখ্যান না পেলেও তাঁরা যে জেলার মনোজগতে বিশাল আলোড়ন তুলেছেন তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। লক্ষ লক্ষ বয়স্ক নিরক্ষর মানুষ নিজের নাম লিখতে শিখেছে, পড়তে শিখেছে নিজেকে উপলব্ধি করতে শিখেছে তার হিসাব কীসের মূল্যে করা যাবে.?

পরিশেষে বলব, আমাদের জেলায় সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন গবেষকরা সমীক্ষা চালিয়ে বলেছেন যে, সাক্ষরতা অভিযানের পর সাধারণ মানুষের সচেতনতার একটা ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা তার সঙ্গে একমত। একথা আমাদের কাছে প্রমাণিত সত্য যে সাক্ষরতা অভিযানের কাজ সঠিকভাবে করতে পারলে অন্যান্য উন্নয়নমুখী কাজগুলি করা সহজ হয় এবং অনেক বেশি সাফল্য পাওয়া যায়। তার কারণ, মানুষ সচেতনভাবে ওই কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন। আজ যে সম্মিলিত জনউদ্যোগে সহভাগী পরিকল্পনার কথা বলা হচ্ছে এবং পরিকল্পনা রচনাকে আরও বিকেন্দ্রীকরণ করার চেষ্টা হচ্ছে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের সাফল্য ছাড়া তা কখনও সফল হতে পারে না। ১৯৯০ সাল থেকে জেলায় যে সাক্ষরতা অভিযান চলছে তা আমাদের এই শিক্ষা অন্তত দিয়েছে।

সাক্ষরতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা কখনও কখনও হতাশার ভঙ্গিতে উনিশশো নব্বই-এর উন্মাদনা খুঁজে বেড়ান। আন্দোলন তো একই গতিতে চলে না—অনেক বাঁক মোড় পার হতে হয়। আমাদের অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা এখন প্রশাসনিকভাবে ভাগ হয়ে গেছে। আমরা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এখন ধারাবাহিক শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়সহ এখনও যাঁরা নিরক্ষর আছেন তাদের নির্দিষ্ট অবস্থান ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এ কাজে দ্রুত গতি আনার ক্ষেত্রে একটা বড় সুবিধা হল, যে সাংগঠনিক কাঠামো ১৯৯০ সালে আমরা গড়ে তুলেছিলাম সেই গ্রাম সংসদস্তর থেকে জেলাস্তর পর্যন্ত সাংগঠনিক কাঠামো অটুট আছে। এই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নিরক্ষরতার উৎসমুখ বন্ধ করা। সর্বশিক্ষা অভিযান, শিশুশিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা, ঈশ্বরচন্দ্র জনচেতনা কেন্দ্র পরিচালনা, নিরক্ষরতার হার যেখানে যেখানে বেশি সেখানে সাক্ষরতার বিশেষ কর্মসূচি পালন এবং সমস্ত গরিব মহিলাদের স্ব-সহায়ক দলে সংগঠিত করে তাদের সাক্ষর সক্ষম করার কর্মসূচি সফল করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জেলা সাক্ষরতা আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামোর প্রতিটি স্তরে পঞ্চায়েত, পৌরসভা, প্রশাসন, রাজনৈতিক দল এবং গণসংগঠনগুলির ভূমিকার উপর নির্ভর করছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

লেখক : প্রাক্তন সভাধিপতি : মেদিনীপুর জেলাপরিষদ

পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক-কাঁথি সড়কে হলদি নদীর ওপর নির্মিত মাতঙ্গিনী সেতু। এই সেতু নির্মাণের ফলে দীঘা এখন কলকাতার দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। ৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার নামে সেতুটি উৎসর্গীকৃত। সৌজন্যে : পূর্ত বিভাগের মুখপত্র 'পূর্তকথা'
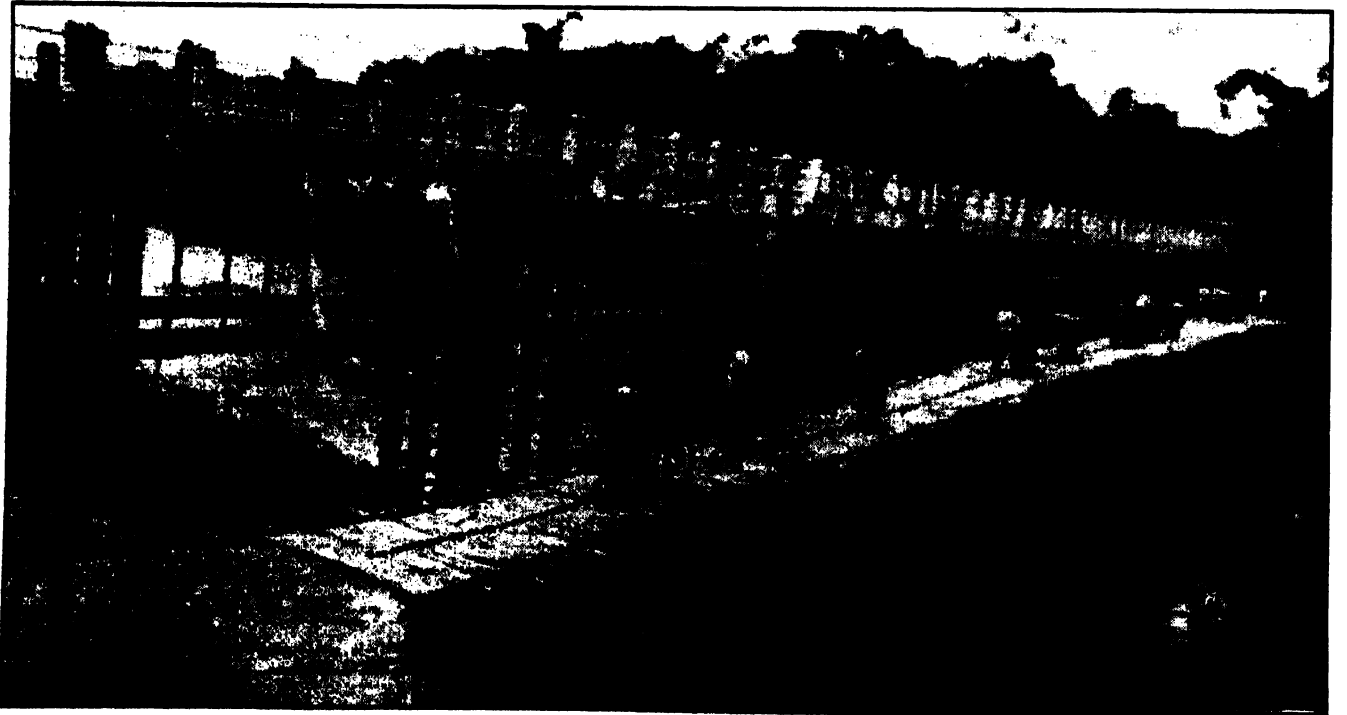
তমলুক (পূর্ব মেদিনীপুর) বাঁশের সেতুর দুর্ভোগ শেষ হতে চলেছে। হরিনারায়ণ চকে কংসাবতীর উপর নবনির্মিত সেতু পাঁশকুড়া, পিংলা, সবং ও ময়নার অধিবাসীদের স্বপ্ন সফল করেছে। সৌজন্যে : গণশক্তি

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় চলমান হাসপাতাল ছবি : ভাস্করব্রত পতি

জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য পরিষেবা : মেদিনীপুর জেলা

মানগোবিন্দ মণ্ডল

পটভূমি

কর্মচঞ্চল ভারতের বৃহত্তম জন-অধ্যুষিত জেলা মেদিনীপুর। ভৌগোলিক ও সামাজিক বৈচিত্র্যে এই জেলার জুড়ি মেলা দুস্কর। এই বৈচিত্র্যের প্রতিটি তরঙ্গ প্রতি মুহূর্তে জেলার জনস্বাস্থ্যের ওপর প্রতিফলিত হচ্ছে। পশ্চিমের বিস্তীর্ণ অনুর্বর, লাল কাঁকরে মাটি ও বনভূমি, স্থানীয় অধিবাসীদের দুর্বল আর্থসামাজিক অবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের অগ্রগতিকে প্রবল প্রতিরোধের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আবার মধ্য ও পূর্বাঞ্চলের উর্বর পাললিক ভূমি ও সেচ ব্যবস্থা, ওই অঞ্চলের সবল আর্থসামাজিক অবস্থা জেলাবাসীদের শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ ও জনস্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি ঘটিয়ে জেলাকে রাজ্যের মানচিত্রে একেবারে ওপরের পংক্তিতে স্থান করে দিয়েছে।

এখানে কংসাবতী, শিলাবতী, রূপনারায়ণ ও সুবর্ণরেখা নদীগুলি যেমন প্রতি বছর বন্যার তাণ্ডবলীলায় মেতে ওঠে, তেমনি বঙ্গোপসাগরের প্রবল ঘূর্ণিঝড় জেলার দক্ষিণাঞ্চলে যখন তখন প্রলয় নাচনে নেচে ওঠে। এদের প্রতিটি ধাক্কা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য বিভাগকেও প্রতিনিয়ত সামলানোর জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। এছাড়া অধিক বোরো চাষের প্রলোভনে মাটির নিচে জলের অবাধ লুণ্ঠনের ফলে গ্রীষ্মের দাবদাহে বহু অঞ্চলে পানীয় জলের তীব্র সঙ্কটের সৃষ্টি ঘটে, যা জেলার বুকে আন্ত্রিকের থাবা বসাতে সাহায্য করে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা হাসপাতাল

বর্তমানে জনশিক্ষা ও সচেতনতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ জনগণের জনস্বাস্থ্যের চাহিদা প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই স্বাস্থ্যকর ক্রমবর্ধমান চাহিদার সামাল দিতে সীমিত পরিকাঠামোর জেলা জনস্বাস্থ্য বিভাগের চেষ্টার কোন ত্রুটি নাই। এগুলি নিম্নবর্ণিত জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলির সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা হয়।

মেদিনীপুর জেলায় চালু জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প কর্মসূচিসমূহ :

১) মাতৃ ও শিশু কল্যাণ এবং রোগ প্রতিষেধক প্রকল্প
২) জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও ভ্রূণ মোচন প্রকল্প
৩) বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর্মসূচি
৪) আই ই সি এবং পরিবার কল্যাণ প্রকল্প—স্বাস্থ্য শিক্ষার জন্য
৫) মাতা ও শিশুর বিভিন্ন পুষ্টিদান প্রকল্প
৬) বিশুদ্ধ পানীয় জল ও পরিবেশ দূষণ রোধ প্রকল্প
৭) অঙ্গনাদি প্রকল্প
৮) অন্যান্য ন্যূনতম প্রয়োজন পরিপূরক প্রকল্প
৯) জন্ম-মৃত্যু নথিকরণ প্রকল্প
১০) খাদ্যে ভেজাল রোধ প্রকল্প
১১) জাতীয় পাল্‌স্ পোলিও প্রকল্প
১২) জাতীয় ক্যানসার প্রতিরোধ ও প্রাথমিক নির্ণয় প্রকল্প
১৩) বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ প্রকল্প, যথা :—
  ক) জাতীয় ম্যালেরিয়া দূরীকরণ প্রকল্প
  খ) জাতীয় ফাইলেরিয়া প্রতিরোধ প্রকল্প
  গ) জাতীয় যক্ষ্মা রোধ প্রকল্প
  ঘ) জাতীয় কুষ্ঠ নিবারণ প্রকল্প
  ঙ) জাতীয় অন্ধত্ব প্রতিরোধ প্রকল্প
  চ) জাতীয় 'ডাইরিয়া' প্রতিরোধ প্রকল্প
  ছ) জাতীয় গলগণ্ড রোধ প্রকল্প
  জ) জাতীয় যৌনরোগ প্রতিরোধ প্রকল্প
  ঝ) জাতীয় হেপাটাইটিস-বি প্রতিরোধ প্রকল্প
  ঞ) জাতীয় শ্বাসরোগ প্রতিরোধ প্রকল্প
  ট) জাতীয় জাপানী এন্‌কেফালাইটিস প্রতিরোধ প্রকল্প
  ঠ) জাতীয় কালাজ্বর প্রতিরোধ প্রকল্প
  ড) জাতীয় 'ট্রাকোমা' রোধ প্রকল্প
  ঢ) জাতীয় এড্‌স প্রতিরোধ প্রকল্প

১৯৭৭ সালে মেদিনীপুর জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো চিত্র

১) প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র—৪৯ (বর্তমানে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র)
২) সাবসিডিয়ারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র—৮২ (বর্তমানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র)
৩) আর পি এইচ সি (রুরাল প্রাইমারী হেলথ কেয়ার)—২৯ (বর্তমানে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে মিলিত)
৪) মহকুমা হাসপাতাল—৪
৫) জেলা হাসপাতাল—১
৬) ডিগ্রি যক্ষ্মা স্যানাটোরিয়াম—১
৭) স্টেট মেডিক্যাল ইউনিট—১
৮) কুষ্ঠ চিকিৎসাকেন্দ্র—৩
৯) পোস্টমর্টম ইউনিট—৫
১০) আরবান ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার—৩
১১) সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক—১
১২) হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ—২ (একটি বেসরকারি)
১৩) জেলা পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র—১
১৪) বেসরকারি নার্সিং হোম—১১
১৫) রেলওয়ে হাসপাতাল—১
১৬) ই এফ আর হাসপাতাল—১
১৭) কলাইকুণ্ডা এয়ার বেস হাসপাতাল—১

বিগত ২৩ বৎসরে এই পরিকাঠামোকে 'মাল্টি পারপাস' তথা বহুমুখী জনস্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য প্রভূত পরিবর্তন ঘটানো হয়। জনস্বাস্থ্যকে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রতি পাঁচ হাজার লোকের জন্য একটি করে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত করা হয়।

এছাড়া আরও অনেক পরিষেবাকেন্দ্র, ট্রেনিং সেন্টার, মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হয় যা পরে উল্লিখিত হয়েছে। ১৯৭৭ সালে জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনচিত্র ছিল এইরকম :

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

ডিস্ট্রিক্ট হেল্‌থ অফিসার—১জন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যালেরিয়া অফিসার—১ জন। ডিস্ট্রিক্ট ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসার-১ জন। ডিস্ট্রিক্ট স্কুল হেল্‌থ অফিসার—১ জন। সহ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক—১ জন। ডিস্ট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসার—১ জন। সাবডিভিশন্যাল মেডিক্যাল অফিসার—৪ জন। সাবডিভিশন্যাল হেল্‌থ অফিসার—৫ জন। ডিস্ট্রিক্ট টি বি অফিসার—১ জন। মেডিক্যাল অফিসার ইনচার্জ (প্রাথমিক ও সাবসিডিয়ারি হেল্‌থ সেন্টার)—১৩১ জন। এস আই (আর পি এইচ সি-এর জন্য)—২৯ জন

জেলার বর্তমান স্বাস্থ্য প্রশাসন চিত্র :

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

জোনাল ম্যালেরিয়া অফিসার—১ জন, উপ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক—৪ জন (১,২,৩,৪), জোনাল লেপ্রসি অফিসার—১ জন, জেলা মাতৃ ও শিশুমঙ্গল অফিসার—১ জন। জেলা টি বি অফিসার—১ জন ও সহকারী টি বি অফিসার—১ জন।

সহ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (এম-এ)—১ জন, সহ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (জনস্বাস্থ্য)—২ জন, সহ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (মহকুমা)—৭ জন।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট—জেলা হাসপাতাল—১ জন, মহকুমা হাসপাতাল—৬ জন, টি বি হাসপাতাল—১ জন ও স্টেট জেনারেল হাসপাতাল—১ জন

২০০০-২০০১ সালে মেদিনীপুর জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

নিম্নোক্ত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো দিয়ে জেলায় জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়িত করা হয়। এই পরিকাঠামো তিন ভাগে বিভক্ত—

ক) জনস্বাস্থ্য পরিষেবা

১। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র—১৩৪৪টি।
২। গ্রামীণ পরিবার কল্যাণকেন্দ্র—৫৩টি।
৩। আরবান পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র-৩টি
৪। পোস্টমর্টেম ইউনিট-৭টি।
৫। কুষ্ঠ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র-৩৩২টি।
৬। মা ও শিশুর পুষ্টির জন্য—অঙ্গনওয়াড়ি ব্লক-৫৪টি।
৭। সি এ ডি পি-২টি।

খ) জনস্বাস্থ্য পরিষেবা ও রোগ চিকিৎসা

১। ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র—৫৪টি। (এর মধ্যে ১৩টি গ্রামীণ হাসপাতাল।)
২। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র—১৩৫টি। ব্লক প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে মোট শয্যা সংখ্যা-১৬১৮।
৩। কুষ্ঠ চিকিৎসাকেন্দ্র-৩১টি। (৫টি এন জি ও)
৪। টি বি চিকিৎসা কেন্দ্র-১৯৬টি।
৫। দন্ত চিকিৎসা কেন্দ্র-২৭টি।
৬। হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা কেন্দ্র-৬৯টি।
৭। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র-২০টি।
৮। ম্যালেরিয়া পরীক্ষা ও চিকিৎসা কেন্দ্র-৬১টি।
৯। চক্ষু পরীক্ষা কেন্দ্র-৬৭টি।
১০। জেলা পরিষদ হোমিওপ্যাথ-ডিসপেন্সারি-১৬টি।

গ) রোগ চিকিৎসা

১। জেলা হাসপাতাল—১টি।
২। মহকুমা হাসপাতাল—৬টি।
৩। স্টেট জেনারেল হাসপাতাল-১টি।
৪। স্টেট মেডিক্যাল ইউনিট—১টি।

[১) ২) ৩) ও ৪) এর মোট শয্যা সংখ্যা-২১২৮]

৫। যক্ষ্মা হাসপাতাল-১টি। শয্যা সংখ্যা-৩৬৬।
৬। ব্লাড ব্যাঙ্ক-৭টি।
৭। প্রাথমিক ক্যানসার নির্ণয় কেন্দ্র-১টি।
৮। টেম্পোরারী হসপিটালাইজেশান ওয়ার্ড-৩টি (শয্যাসংখ্যা—৬০)।
৯। চক্ষু হাসপাতাল-৩টি (বেসরকারি)
১০। নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার-১টি।
১১। হোমিওপ্যাথ মেডিক্যাল কলেজ-২টি।
১২। মেডিক্যাল কলেজ-১টি।
১৩। ই এফ আর হাসপাতাল-১টি।
১৪। জেল হাসপাতাল-১টি।
১৫। পুলিস হাসপাতাল-১টি।
১৬। সিভিল ডিফেন্স হাসপাতাল-১টি।
১৭। রেলওয়ে হাসপাতাল-১টি।
১৮। সি পি টি হাসপাতাল-১টি।
১৯। আই ও সি হাসপাতাল-১টি।
২০। কে টি পি পি হাসপাতাল-১টি
২১। কলাইকুণ্ডা এয়ার বেস হাসপাতাল-১টি
২২। নার্সিং হোম-১৭২টি, শয্যাসংখ্যা-১৭৫০।

বি এম ও এইচ—৫৪ জন, লেপ্রসি আধিকারিক—৩১ জন। এম ও স্টেট মেডিক্যাল ইউনিট—১ জন ও আরবান পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র—৩ জন

স্বাস্থ্য পরিষেবা (২০০০-২০০১)

(১) পরিবার কল্যাণ (মেদিনীপুর ও তমলুক ব্যুরো)

বন্ধ্যাকরণ (স্থায়ী ও অস্থায়ী)—

ভ্যাসেক্টমী	— ৮০
টিউবেক্টমি	— ৪২০৯১
আই ইউ ডি	— ১৫০৭৬
কণ্ডোম ইউজার	— ৪৭০৮৭
ওরাল পিল ইউজার	— ৪২৭৫১

ই পি আই ও এম সি এইচ—

বি সি জি ভ্যাকসিন	— ২২০৪৩৯
ডি পি টি (৩য় ডোজ)	— ১৯৩৯০০
পোলিও ভ্যাকসিন (৩য় ডোজ)	— ১৯৯৬৩৮
হাম ভ্যাকসিন	— ১৮০৮৬৮
টি টি (গর্ভবতী মা) (২য় ডোজ ও বুস্টার)	— ১৯১৬৪৪
ভিটা এ অয়েল (১ম ডোজ)	— ১৮৫৭৩৯
(২য় ডোজ)	— ১৬৮১৫০
ডি টি	— ১৫০৬৮৯
আই এফ এ (মা)	— ১৬৯৩৫০
আই এফ এ (শিশু)	— ২১৪২৯০

পাল্‌স্ পোলিও—

১ম পর্যায় (২৪.৯—২৬.৯.২০০০)	— ১০২৬৪৮৭
২য় পর্যায় (৫.১১—৭.১১.২০০০)	— ১০৪৮৫১৭
৩য় পর্যায় (১০.১২—১২.১২.২০০০)	— ১০৬২৮৭৯
৪র্থ পর্যায় (২১.১—২৩.১.২০০১)	— ১০৭১৪৩৪

কাপ্‌ল প্রোটেক্‌শান রেট—(সি পি আর)—৩১.৩.২০০১

মেদিনীপুর ব্যুরো	— ৫৬.১২
তমলুক ব্যুরো	— ৫২.০০

ডেলিভারি—

হাসপাতালে	— ৫৪৭১৬
অভিজ্ঞ দাই দ্বারা	— ৭৯৭৩৮
অনভিজ্ঞ দাই দ্বারা	— ২৭৩১৪

(২) জেলার বড় হাসপাতালগুলির সম্মিলিত পরিষেবা (২০০১)

মোট শয্যাসংখ্যা	— ১,৭৭৭
মোট আউটডোর রোগী	— ১১,৬৪,০৬৫
মোট ইমার্জেন্সি রোগী	— ২,২৮,৮৫১
মোট রোগী ভর্তি হয়েছে	— ১,১৮,১১৭
মোট ভর্তি রোগীর মধ্যে মৃত্যু	— ৬,১২৮
মোট ডেলিভারি	— ২৬,৪০০
মোট বড় অপারেশনের সংখ্যা	— ১৩,৩১৭
গড় শয্যা ব্যবহারে (বেড অকুপেন্সি রেট)	— ৮১.০৬

(৩) জাতীয় কুষ্ঠ দূরীকরণ প্রকল্প :

১৯৯১ সালে মার্চ মাসে এই জেলায় মাল্টিড্রাগ চিকিৎসা শুরু হয়। তখন থেকে ২০০১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত—

মোট কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসা হয়েছে	— ৯৫,০৩৮
১৯৯১ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রতি ১০০০০ লোকপিছু এই রোগীর সংখ্যা ছিল (পি আর)	— ৩৮.২২
২০০১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতি ১০০০০ লোকপিছু এই রোগীর সংখ্যা (পি আর)	— ৫.২৬

এর মধ্যে তমলুক, হলদিয়া ও
কাঁথি মহকুমাতে (পি আর) — ১.৪২
মেদিনীপুর সদর, খড়্গপুর, ঝাড়গ্রাম
ও ঘাটাল মহকুমাতে (পি আর) — ৭.৭৫

(৪) চক্ষুর ছানি অপারেশন প্রকল্প :

২০০০—২০০১ সাল — মোট অপারেশন — ১৩০৩২
২০০১—২০০২ সাল — মোট অপারেশন — ১৪৩৫৭

(৫) ২০০১ সালে মোট সংক্রামক ব্যাধি চিকিৎসা হয়েছে :

রোগ		আক্রান্ত সংখ্যা	মৃত্যু
ডাইরিয়া জাতীয় রোগ	—	৮৮৫৭৫	৮২
টাইফয়েড	—	১৪৭৯	৬
ভাইরাল হেপাটাইটিস	—	২৭৭	৬
জাপানী এন্‌কেফালাইটিস	—	১০	৩
মেনিঙ্গোকক্কাল মেনিঞ্জাইটিস	—	২০	৫
নিউমোনিয়া	—	৮৫৩৫	১৪
ডিপ্থেরিয়া	—	২৭	০
টিটেনাস নিওনেটাল			
জন্মের ১ মাসে	—	৩৬	৩২
অন্য সময়	—	৭৩	১৮
হুপিং কফ্	—	২৭	১
মিজল্‌স (হাম)	—	৩৫২	০
পোলিও মাইলাইটিস	—	০	০
রেবিজ (জলাতঙ্ক)	—	১৬	১৬
কালাজ্বর	—	০	০
ম্যালেরিয়া	—	২৫৪৩	২
সেক্সুয়াল ডিজিজ	—	১৪০৯	০
টি বি	—	২৫৯৪	৭২

জেলায় গৃহীত নতুন স্বাস্থ্য-উদ্যোগগুলি যথা :

(১) জেলা সদরে আধুনিক মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণ—
১৯৯৬ সালে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশান্ত শূর জেলা হাসপাতালের মাতৃসদন মাঠে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের শিলান্যাস করেন। কলেজ বিল্ডিংয়ের নির্মাণ জরুরি ভিত্তিতে চলছে। এই মেডিক্যাল কলেজ চালু হলে শুধু মেদিনীপুর নয়, দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং সংলগ্ন ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের অঞ্চলসমূহের বিশেষ উপকার হবে।

(২) রোড চন্দ্রকোনাতে ডিগ্রি যক্ষ্মা হাসপাতাল সংলগ্ন মাঠে একটি ফার্মাসিস্ট ট্রেনিং কলেজ অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

(৩) বর্তমানে চালু জেলা সদরের নার্সিং ট্রেনিং স্কুলটিকে উন্নীত করে নার্সিং ট্রেনিং কলেজে রূপান্তরিত করা হচ্ছে।

(৪) জেলার ২১টি হাসপাতালকে বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। জেলা হাসপাতাল, ৬টি মহকুমা হাসপাতাল, একটি স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ও ১৩টি রুরাল হাসপাতালকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামে সুসজ্জিত করা হচ্ছে। প্রতিটি হাসপাতালকে কেন্দ্র করে সারা জেলায় 'রেফারেল সিস্টেম' গড়ে তোলা হচ্ছে। জেলাকে মোট ৮টি জোনে ভাগ করা হয়েছে, যাতে জেলার বড় হাসপাতালে ও কলকাতার মেডিক্যাল কলেজগুলিতে অহেতুক সাধারণ রোগীর ভিড় না বাড়ে। রুরাল বা গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে প্যাথলজি, ই সি জি, ও এক্স-রে, রক্তদান ও অপারেশন ব্যবস্থা থাকছে। প্রতিটি হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স ও ফ্যাক্স মেশিন থাকবে। কোনও জটিল রোগীর ক্ষেত্রে রোগীকে না পাঠিয়ে তার রিপোর্ট শুধু বড় হাসপাতালের বিশেষজ্ঞকে ফ্যাক্স মারফৎ জানিয়ে তার মতামত নিয়ে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা যাবে।

(৫) মডিফায়েড লেপ্রসী এলিমিনেশন ক্যাম্পেন :
জেলা থেকে কুষ্ঠ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সারা জেলায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই ক্যাম্পেন মোট তিনবার করা হয়েছে।
১ম বার (২.৯.১৯৯৮—৮.৯.১৯৯৮)—
মোট রোগী চিহ্নিত ও চিকিৎসিত হয়েছিল—৮১৮১
২য় বার (২৬.১.২০০০—১.২.২০০০)—
মোট রোগী চিহ্নিত ও চিকিৎসিত হয়েছিল—২৫০০
৩য় বার (১.১১.২০০১—৭.১১.২০০১)—
মোট রোগী চিহ্নিত ও চিকিৎসিত হয়েছিল—২১৮৫।
এই ক্যাম্পেনের ফলে যে জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে তাতে সরকার আরও এই জাতীয় ক্যাম্পেন প্রতি বৎসর এই জেলায় করার জন্য উৎসাহিত হচ্ছে।

(৬) এড্‌স্ প্রতিরোধ প্রকল্প :
জেলার সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে সারা জেলায় বিভিন্ন সেমিনার বা আলোচনাসভা এবং ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণকে এই ভয়াবহ রোগ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। জেলার প্রতিটি ব্লাড ব্যাঙ্কে এই রোগের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
জেলা হাসপাতালে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

প্রাইভেটাইজেসনের রক্ত কটাক্ষ ও প্রলোভনকে উপেক্ষা করে আমাদের জেলা যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে সক্ষম হচ্ছে—তা অবশ্যই বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। জেলার সবার আন্তরিক সদিচ্ছায় বর্তমানের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আরও ফলপ্রসূ করে এবং বর্ণিতউদ্যোগগুলিকে সুচারুরূপে বাস্তবায়িত করে জেলাকে অবশ্যই ভারত তথা বিশ্বের দরবারে বিশেষ আসনের দাবীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

লেখক : মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক
পশ্চিম মেদিনীপুর
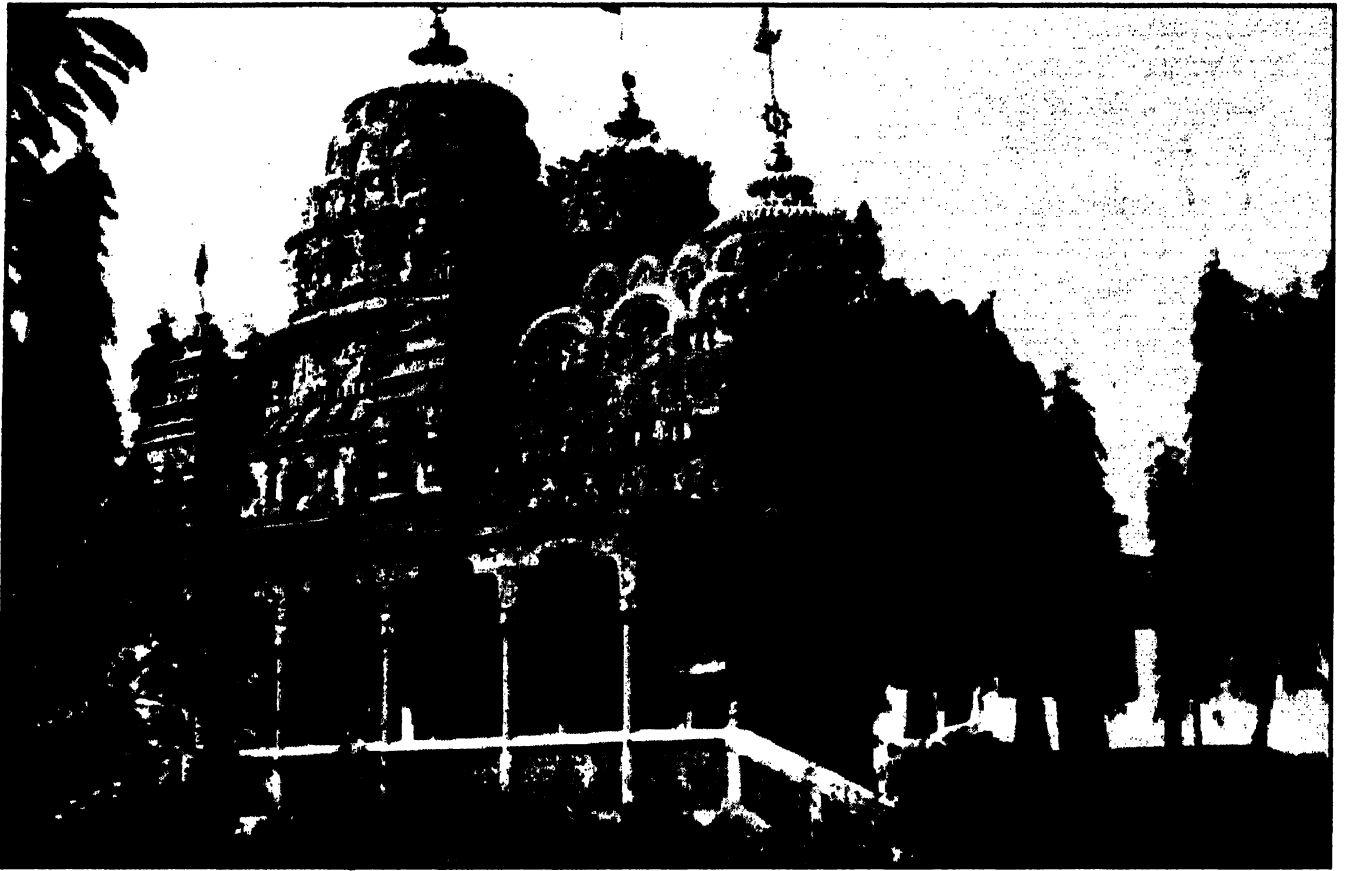
শান্তিধাম, দক্ষিণ চংরাচকের মন্দির, ময়না, তমলুক

ছবি : প্রশান্ত প্রামাণিক
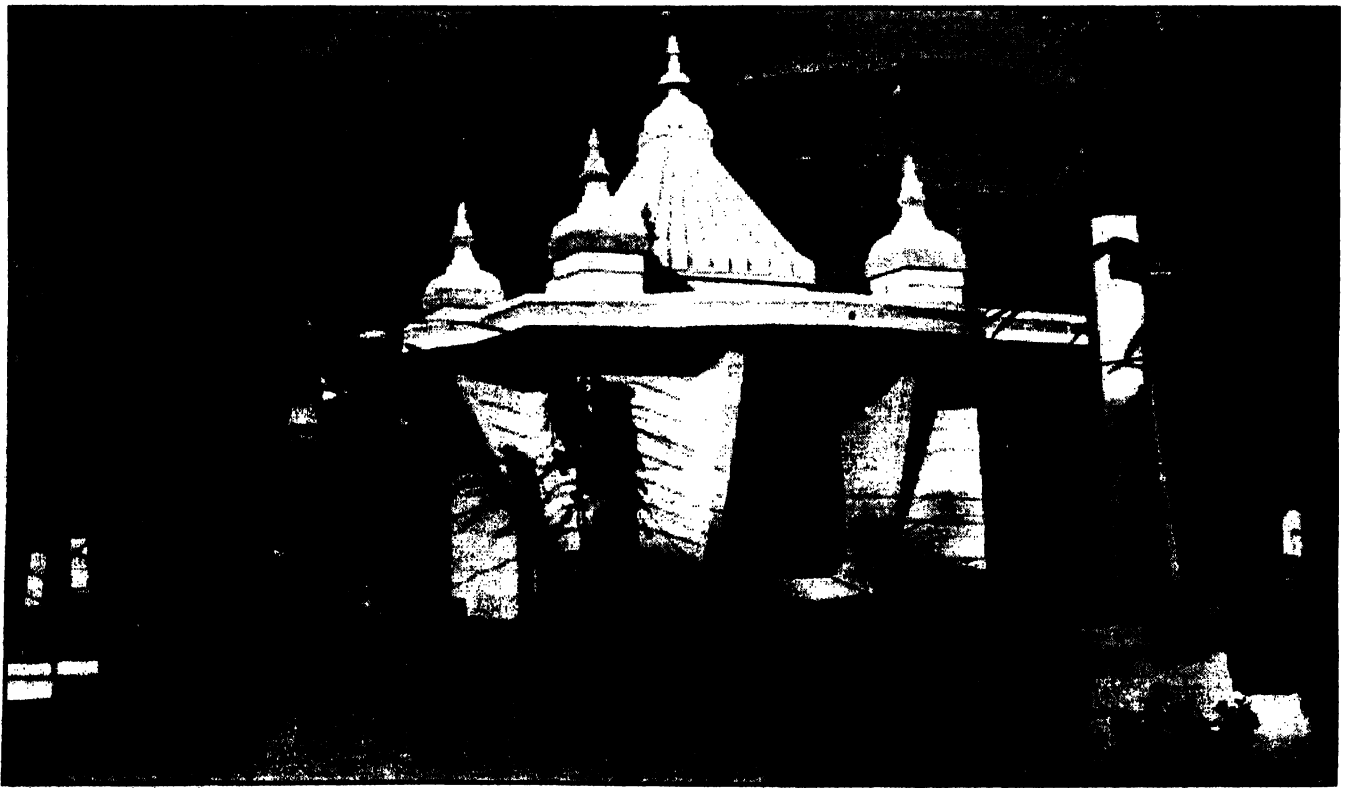
রাসমঞ্চ, ময়না, তমলুক

ছবি : প্রশান্ত প্রামাণিক

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, মালঞ্চ, খড়গপুর — ছবি : লেখক

মেদিনীপুর পর্যটন

প্রশান্ত প্রামাণিক

মেদিনীপুর* এক বিশাল জেলা। লোকসংখ্যায় সারা ভারতে বৃহত্তম এবং আয়তনে দ্বিতীয় বৃহত্তম। বিশাল এই জেলার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ভারতবর্ষেরই অনুরূপ। ভারতের উত্তরে যেমন নগাধিরাজ হিমালয়, দক্ষিণে উর্মিমুখর মহাসাগর, তেমনই মেদিনীপুরের উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে পাহাড় ও অরণ্যময় মালভূমি এবং এর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ভারতের জনসংখ্যার শতকরা একজন মেদিনীপুরের অধিবাসী। প্রতি একশো জন ভারতীয়ের একজন মেদিনীপুরীয়। সব মিলিয়ে মেদিনীপুর জেলা ভারতবর্ষেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ যেন। ভারতবর্ষে খুব কম জেলাই আছে, যার রয়েছে পাহাড় এবং সমুদ্র দুই-ই। এই বিরল বৈশিষ্ট্যই মেদিনীপুরকে দিয়েছে প্রবল পর্যটন সম্ভাবনা। পাহাড়, অরণ্য, সমুদ্র ছাড়াও এখানে রয়েছে তাম্রলিপ্তের সু-প্রাচীন ইতিহাস, হিজলি বন্দরের প্রসিদ্ধি, ধর্মমঙ্গলের কেন্দ্রবিন্দু ময়নাগড়, রূপনারায়ণের তীরে নাটশাল অঞ্চলে অধুনা আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা, কপিশা বা কাঁসাই নদীর ঋগ্বেদীয় প্রাচীনত্ব, ঝাড়গ্রামের তাম্রযুগীয় ঐতিহাসিকতা, কাঁকড়াঝোরের আরণ্যক সৌন্দর্য, পাণ্ডবদের স্মৃতিবিজড়িত বগড়ীরাজ্য গড়বেতা, ভান রাজাদের কীর্তি-কাহিনিমণ্ডিত চন্দ্রকোণা, তমলুকের বিভাস-তীর্থের দেবী বর্গভীমা, গড়বেতার সর্বমঙ্গলা, ঘাটালের অনন্য টেরাকোটাসমৃদ্ধ

* প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ১ জানুয়ারি ২০০২, মেদিনীপুরকে দুটি জেলায় ভাগ করা হয়েছে : পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুর। (—সঃ পঃ)

মন্দিরসমূহ, হিজলির মসনদ-ই-আলা, এগরায় হটনাগর মন্দির, কর্ণগড়ের দণ্ডেশ্বর শিব, বাহিরীয় প্রাচীন বৌদ্ধবিহার, কাঁসাইয়ের কূলে প্রাচীন পাথরা ও জিনশহর, মন্দিরময় মালঞ্চ, দীঘার বিশ্বখ্যাত সমুদ্র-সৈকত, স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা মেদিনীপুরের জ্বলন্ত দেশপ্রেম এবং আরও কত কিছু।

মেদিনীপুর জেলা তাই পর্যটনের খনি। পর্যটনের প্রবল সম্ভাবনাময় এই জেলার পর্যটন নিয়ে বিশাল একটা বই লিখে ফেলা যায়। বর্তমানের সংক্ষিপ্ত পরিসরে মেদিনীপুরের কয়েকটি পর্যটন ক্ষেত্রের কথা বলব, যেগুলির উন্নয়ন ঘটিয়ে মেদিনীপুর জেলায় পর্যটনকে শিল্পের পর্যায়ে উন্নত করা যায় একটু চেষ্টা করলেই। মেদিনীপুরের সেই সব পর্যটনক্ষেত্রের কথায় আসি, যেগুলির পর্যটন সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। দক্ষিণ থেকে শুরু করে উত্তর অবধি এই আলোচনায় আসবে : কাঁথি মহকুমার দীঘা, এগরা, বাহিরী, হিজলি, তমলুক মহকুমার তমলুক ও ময়না, হলদিয়া মহকুমার হলদিয়া ও মহিষাদল, ঘাটাল মহকুমার ক্ষীরপাই ও চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর সদর (দক্ষিণ) মহকুমার মালঞ্চ, মেদিনীপুর সদর (উত্তর) মহকুমার গড়বেতা, কর্ণগড়, মেদিনীপুর, পাথরা এবং আরণ্যক ঝাড়গ্রাম মহকুমার ঝাড়গ্রাম, চিলকিগড় ও কাঁকড়াঝোর।

দীঘা

কল্লোল যুগের কবি বলেছিলেন, 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে'—বলেননি দীঘার কথা; কারণ দীঘার তখনও কৈশোর কাটতেই অনেক দেরি। আজ কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আধুনিক কবির রোমাঞ্চিত চোখে দীঘা 'নারীর শরীর মনে হয়'। তাই 'রায়লজ একটু ছাড়ালে—নিঃশব্দ বালুর স্তূপ স্তনের মতন উঠে গেছে—মসৃণ নিতম্ব নাভি ঝিকমিক করে ওঠে এখানে ওখানে'। শরীরে লেগেছে তার যৌবন জোয়ার, তাই 'এদিকে অজস্র লোক, গিশগিশ ভিড়, হাসাহাসি'। আবার কিছুটা পথ পেরিয়ে উৎকল উপকূলের দিকে পা বাড়ালে চোখের সামনে 'উত্তর রামচরিত'-এর ক্রৌঞ্চাবত পর্বতের অপূর্ব বর্ণনামণ্ডিত অনুপ্রাসমুখর সেই কয়েকটি লাইন : "গুঞ্জতকুঞ্জকুটির কৌশিক ঘটাঘুৎকায়বৎ কীচকস্তম্বাড়ম্বরমূকমৌকুলিকুলঃ ক্রৌঞ্চাবতোহয়ং গিরিঃ...."। না, দীঘায় নেই ক্রৌঞ্চাবতের মতো পর্বত, কিন্তু ছোটো ছোটো পাহাড় আছে বালির। সাদা মেঘ আছে, আছে নীল আকাশ; আর নীল সমুদ্র তার মুখরতায় ভবভূতির ওই বর্ণনার বাকি ঘাটতি পূরণ করে দিয়েছে। ভবভূতির ওই বর্ণনায় যা নেই সেই বেশিটুকু হল ঝাঁকে ঝাঁকে ভাসমান পালতোলা ডিঙি জল-পায়রার মতো অসীমকে সীমা দিতে চাইছে সংগতিহীন ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায়। দীঘা এখন জায়গা করে নিয়েছে বিশ্বপর্যটন মানচিত্রে। পূর্ব ভারতের সমুদ্র সৈকতগুলির অন্যতম হল দীঘা।

১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দের ডি-ব্যারোর মানচিত্রে বর্তমানের 'কসবা হিজলি', জব চার্নকের হিজলি তখন দ্বীপমাত্র। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে স্রেভের মানচিত্রেও তাই। এই মানচিত্রগুলিতে দীঘা বা তৎসন্নিহিত অঞ্চল অনুপস্থিত। কিন্তু কাঁথি মহকুমার একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে বর্তমান কাঁথি শহরের প্রায় চব্বিশ মাইল দূরে সমুদ্র-তরঙ্গ বিধৌত যে জায়গাটার উল্লেখ পাওয়া যায় ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দের ভ্যালেন্টিনের [Valentyn] মানচিত্রে তার নাম 'নরিকুল' [Noricool]। ঠিক একই রকম অবস্থান দেখি ওই নরিকুলের ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দের টমাস বৌরীর [Thomas Bowrey] মানচিত্রে। ১৭০৩ সালের পাইলট মানচিত্রে [Pilot Map] নরিকুল গ্রাম নেই, কিন্তু 'বিটকুল' [Bitecool] নদীর অবস্থান দেখা যায় ওই গ্রামের পাশেই। কিন্তু রেনেলের [Renell] মানচিত্রে নরিকুলের জায়গায় রয়েছে 'বীরকুল' [Beercool]; অর্থাৎ নরিকুল হল বীরকুল। ব্রিটিশ সেটেলমেন্ট রেকর্ডে 'বীরকুল' একটা লবণ পরগনা জলেশ্বর চাকলার অধীনে। পরে হিজলি বিভাগের অধীনস্থ হয় এই পরগনা। এই পরগনার তৎকালীন আয়তন প্রায় পঁয়ত্রিশ বর্গমাইল। বর্তমানের দীঘা গড়ে উঠেছে এই পুরানো বীরকুল পরগনায় বীরকুল গ্রামের পাশেই। অতীতের বীরকুলের সমুদ্র সৈকত বর্তমানের দীঘায় মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।

এই সমুদ্র সৈকতে ছিল প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের গ্রীষ্মাবাস। সিডনি গ্রিয়ার [Sydney Grier] লিখেছেন :

"Birkul [Beercool] was the sanatorium—the Brighton of Calcutta and the newspapers and Council-records mention constantly that so-and-so is gone to the Beercool for his health. Coursing, deer-stalking, hunting and fishing are mentioned as being obtainable in the neighbourhood and in May of this year [1778 A.D.] the 'Bengal Gazette' gives publicity to a scheme for developing the place quite in the modern style. It has already the advantage of a beach which provides perhaps the best road in the world for carriages and is totally free from all noxious animals except crabs and there is a proposal to erect convenient apartments for the reception of nobility and gentry and organise entertainments."

এই পরিকল্পনার খুব সামান্যই কার্যকর হয়েছিল। তার হদিস মেলে ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দের একটি লেখায়। চার্লস চ্যাপম্যান [Charles Chapman] লিখেছেন, "We passed part of the last Hot-season at Beercool to which I believe you and Messrs. Hastings once projected an excursion. The terrace of the Bungalow, intended for you, is still pointed out by the people, but that is all that remains of it. The beach is certainly the finest in the world and the Air is such as to preclude any inconvenience being felt from the heat. Mrs. Chapman found the Bathings agree with

her so well that if here and alive next year, we shall make another trip."

অনেক পরে বেলী [Bayley] ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে আরেক দফা প্রশস্তি করেছেন বীরকুল তথা দীঘার, এখানকার সুন্দর সমুদ্র-বাতাসের কথা বলে। তাছাড়া বলেছেন, পানীয় জলের অভাবের কথা আর সমুদ্রের এগিয়ে এসে বেলাভূমি তথা বালিয়াড়ি গ্রাস করার কাহিনি। তখনও দীঘা কেবল অখ্যাত গ্রাম মাত্র। ১৯২৩ সালে কলকাতায় এক ইংরেজ ব্যবসায়ী পুরানো কাগজ ঘাঁটতে গিয়ে কলকাতার কাছেই যার অবস্থিতি, সহজেই পৌঁছানো যায় এমন একটা সমুদ্র উপকূলবর্তী জায়গা দীঘাকে পুনরাবিষ্কার করলেন। চাপ দিলেন তৎকালীন সরকারকে দীঘার উন্নয়নের জন্য। কিন্তু নিষ্ফল হল তা। ১৯৩৪ সালে তৎকালীন জেলাশাসক দীঘার উন্নতির জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নেন। কিন্তু ফলশ্রুতি প্রায় শূন্যই। অবশেষে স্বাধীনতার পরে পশ্চিম বাংলার নব-রূপকার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ছোঁয়ায় কিশোরী দীঘা উঠল জেগে যৌবনের আঙিনায়। জ্বলে উঠল আলো, দেখা দিল রূপ। সেই থেকে সৌন্দর্যে, লালিত্যে, মাধুর্যে, সেবায়, তিতিক্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার নিরলস সাধনা নিরন্তর চলেছে ভ্রমণার্থীদের মন যোগাতে।

দীঘার আধুনিকীকরণের কাজ প্রথম শুরু হয় ১৯৪৭ সালে বন দপ্তরের মাধ্যমে। শুরু হয় বনসৃজন এবং সৈকত সংরক্ষণের কাজ। অন্যান্য উন্নয়নের কাজ দেওয়া হয় West Bengal Health Resort Co-operative Society-কে। তাদের উদ্যোগে ১৯৫৫ সালে তৈরি হয় 'কাফেটেরিয়া'। ওই বছরই নির্মিত হয় 'পাওয়ার হাউস'। ১৯৫৬ সালে উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দপ্তর দীঘার ভার নেয়। ১১০০ একর জমি অধিগৃহীত হয় দীঘার আধুনিকীকরণের জন্য। দীঘা ধীরে ধীরে পর্যটন ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। বানানো হয় : পুরানো ট্যুরিস্ট কটেজ (১৯৫৮), মার্কেট (১৯৬১), সৈকতাবাস (১৯৬৪), আনন্দম (১৯৬৪), নিরালা আবাস (১৯৭২), নূতন কটেজ (১৯৭৫), বাসস্ট্যান্ড (১৯৭৭)। ইতিমধ্যে পর্যটন উন্নয়ন নিগম বানায় ট্যুরিস্ট লজ (১৯৬৭)। তৈরি হয় সেচ দপ্তর, পূর্ত দপ্তর, বন দপ্তর ইত্যাদি বিভিন্ন সরকারি বিভাগের অনেকগুলি বাংলো। জল সরবরাহ ব্যবস্থা চালু হয় ১৯৭০ সালে। শ্রম দপ্তর বানায় লেবার ওয়েলফেয়ার হলিডে হোম (১৯৭৫)। বিশাল হাসপাতাল তৈরি হয় ১৯৭৮ সালে। এর আগে ছিল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। গড়ে ওঠে প্রায় দেড়শো হোটেল ও লজ, নানা দোকানপাট এবং নিউমার্কেট। যুবকল্যাণ দপ্তর বানিয়েছে এক বিশাল যুব আবাস। তৈরি হয়েছে পুলিশ হলিডে হোম, জনস্বাস্থ্য ও মৎস্য দপ্তরের বাংলো। পুরনো দিনের স্নেইথ সাহেবের বাংলো এখন বিদ্যুৎ বোর্ডের বাংলো। সব মিলিয়ে দীঘায় এখন সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রায় হাজার দেড়েক ভ্রমণার্থী স্বচ্ছন্দে রাত কাটাতে পারেন। আর বেসরকারি হোটেল ও লজে জায়গা হতে পারে প্রায় হাজার ছয়েক ভ্রমণার্থীর।

দীঘায় রেল আসছে হাওড়া থেকে পাঁশকুড়া হয়ে। এখনও অসম্পূর্ণ রেললাইন। মনে হয় একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ট্রেন চলবে। তবে এখানে তৈরি হয়ে গেছে রেল স্টেশন। স্বাভাবিকভাবেই তা অব্যবহৃত। তৈরি হয়েছে এশিয়ার বৃহত্তম 'অ্যাকোয়ারিয়াম'। প্রায় ১০০ একর জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে 'নারিকেল গবেষণা কেন্দ্র ও কাজুবাদাম খামার'। বন দপ্তর বানিয়েছে 'অমরাবতী'। উদ্যান, কৃত্রিম হ্রদ এবং বোটিং ব্যবস্থার সমন্বয়ে অমরাবতী দীঘার এক দর্শনীয় স্থান। আজও বহু প্রশস্তি করা সেই সমুদ্রতীর আছে। শোনা যায়, 'The Beach is certainly the finest in the world' না হলেও বিদগ্ধজনদের মতে এর স্থান নাকি ক্যালিফোর্নিয়ার পরেই ; অর্থাৎ দীঘার সৈকত বিশ্বে দ্বিতীয়। গত ত্রিশ বছরে সেই সৈকত অনেক ভেঙেছে। কিন্তু বেলাভূমি আগের মতই আছে। ১০০ বছর আগের সেই বর্ণনার মতোই। ভাঙন প্রতিরোধের প্রবল প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। ঘূর্ণিবায়ুর তাণ্ডবে নষ্ট হওয়া ঝাউবন প্রায়শই নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছে। দীঘা ক্রমেই হয়ে উঠছে অনন্যা, আকর্ষণীয়া, সুবিন্যস্ত রূপময়তায় রূপসী।

দীঘায় বিদেশি পর্যটকরা খুব কমই আসেন। তবে ভারতবর্ষের নানা কোণ থেকে নামীদামি বহু লোকই প্রতিনিয়ত দীঘায় আসছেন। তবু সংস্কৃতি আদান-প্রদানের গতি এখানে অতি মন্থর। দীঘার ব্যবসায়িক ভিত্তির বনিয়াদ যত দ্রুত বাড়ছে সংস্কৃতি আদান-প্রদানের ভিত্তি ততটা নয়। পর্যটন ক্ষেত্র দীঘাকে কিন্তু একটা আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি বিনিময় ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় উভয় সরকারেরই আন্তরিক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দীঘায় কেনাকাটার জন্য উল্লেখনীয় হল শাঁখ, ঝিনুক ইত্যাদি দিয়ে বানানো শৌখিন জিনিসপত্র, গহনা, গৃহস্থালীর আসবাব। রামনগর অঞ্চলের মাদুর সবংয়ের মতোই বিখ্যাত। সেই মাদুরও কেনা যেতে পারে দীঘায়। আবার কাঁসা-পিতলের শৌখিন কাজ করা স্মারকদ্রব্য, মূর্তি ইত্যাদিও ভ্রমণার্থীরা দীঘা ভ্রমণের স্মারক হিসাবে কিনতে পারেন।

দীঘাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে দীঘার চারপাশের দর্শনীয়গুলিকে দেখানোর একটা ব্যবস্থা রাখা অত্যন্ত জরুরি। এর জন্য একদিনের একটা কনডাক্টেড ট্যুর রাখতে হবে। অক্টোবর থেকে মে অবধি এই আট মাস এমন একটা কনডাক্টেড ট্যুর রমরমিয়ে চলতে পারে দীঘায়। একটা মিনিবাস নিয়েই শুরু করা যায়। সরকারি এবং বেসরকারি যে কোনও ব্যবস্থাপনায় তা চলতে পারে। তবে শুরুতে সরকার নিজে ব্যবস্থা নিলে ভাল হয়। একদিনের এই কনডাক্টেড ট্যুরে যে জায়গাগুলি দেখানো যেতে পারে সেগুলি হল : হিজলির মসনদ-ই-আলা, দরিয়াপুরের লাইট-হাউস, কাঁথির কপালকুণ্ডলা কালীবাড়ি, জুনপুট, বেঙ্গল সল্ট ফ্যাক্টরি, শঙ্করপুর এবং চন্দনেশ্বর শিবমন্দির (ওড়িশা)। সকালে দীঘা থেকে যাত্রা শুরু

করে সন্ধ্যায় আবার দীঘা ফিরে আসা। ভ্রমণসূচির এই জায়গাগুলোর কথায় একটু পরে আসছি।

হোটেল, রেস্তোরাঁ, দোকানপাট, ঘর-গৃহস্থালি, বাংলো, বাগান আর অজস্র আলোর ঝলমলানি নিয়ে আজকের দীঘা একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় তার সর্বাধুনিক সৌন্দর্যসজ্জায় অতুলনীয়া হয়ে উঠবে। হয়ে উঠবে প্রাচ্যের অন্যতম সেরা সৈকতনগরী। আজকের শিশু ঝাউবীথির মর্মরে সেই কথারই কানাকানি, হেমন্তের শ্লথ ঊর্মিমালায় তারই কলধ্বনি। পৌষের চড়ুইভাতির আনন্দ-গানে আগামী দিনের সেই নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি সেই অদূর ভবিষ্যতের কোনও কবি হয়তো বলবেন সে দীঘার কথা তাঁর নিজস্ব ভাষায়। বলবেন, অতুলনীয়া দীঘার কথা, রূপসী দীঘার কথা। সার্থক হবে ডাঃ রায়ের স্বপ্ন, যাঁর সোনার কাঠির ছোঁয়ায় সেই দীঘা—এই দীঘা।

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে দীঘায় বাসপথে দূরত্ব ১৮৮ কিমি। ভোর চারটে থেকে রাত আটটা অবধি এসপ্লানেড থেকে কিংবা হাওড়া স্টেশনের কাছ থেকে আধঘণ্টা অন্তর সরকারি বাস যাচ্ছে দীঘা। এর সঙ্গে বেসরকারি বাস মেলালে গড়ে প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর দীঘায় বাস যায়। এখন গোটা তিনেক বাস কলকাতা থেকে দীঘা যায় 'নাইট সার্ভিস' হিসাবে। সুতরাং প্রায় সারারাত ধরেও বাস যাচ্ছে দীঘায়। বাসে কলকাতা থেকে দীঘা যেতে সময় নেয় পাঁচ-সাড়েপাঁচ ঘণ্টা। ট্রেনপথে দীঘা দুভাবে যাওয়া যায়। তবে পুরোটাই ট্রেনে নয়। হাওড়া থেকে খড়্গপুর অবধি ১১৬ কিমি ট্রেনে এবং খড়্গপুর স্টেশন থেকে দীঘা বাসে ৯৬ কিলোমিটার। এটা ঘুরপথ। হাওড়া থেকে ট্রেনে ৫৯ কিমি এলে মেচেদা এবং মেচেদা থেকে বাসে দীঘা ১০৩ কিলোমিটার। তবে কম সময়ে, কম খরচে কলকাতা থেকে দীঘা আসতে হলে এসপ্লানেড বা হাওড়া স্টেশনের পাশ থেকে দীঘাগামী সরকারি কিংবা বেসরকারি বাস ধরুন। এছাড়া দীঘায় বহু বাস আসছে আসানসোল, বর্ধমান, সিউড়ি, বাঁকুড়া, বহরমপুর, এমনকী বালুরঘাট থেকেও। কাঁথি শহর থেকে দীঘা ৩২ কিমি, মেদিনীপুর শহর থেকে দীঘা ১১২ কিলোমিটার। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে বাস-মিনিবাস-ট্যাক্সি ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় হাজারখানেক গাড়ি দীঘায় আসে। বড়দিনের সময় এবং পৌষ সংক্রান্তির দিন প্রায় এক লাখ লোকের ভিড় হয় দীঘায়। বর্ষার দুমাস বাদ দিয়ে বছরের বাকি দশ মাসই দীঘা ভ্রমণোপযোগী

কী করে দেখবেন

দীঘার মূল আকর্ষণ হল এর সমুদ্র, বেলাভূমি, সৈকত, বালিয়াড়ি, ঝাউবন। সব কিছুতেই ছড়িয়ে আছে বাঁধনহারার গান, 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা'-র সুর। নিজেকে প্রসারিত করে অসীমের সঙ্গে কয়েকদিনের জন্য মিলিয়ে দেবার অপূর্ব সুযোগ এনে দেয় দীঘা। মূল আকর্ষণ ছাড়া দীঘায় দেখার হল : অমরাবতী, অ্যাকোয়ারিয়াম, শিশু-উদ্যান, সর্পোদ্যান (১৯৯৩), সমুদ্রে জেলেদের মাছধরা। দীঘার সমুদ্রে সূর্যোদয় সারা বছরই দেখা সম্ভব আকাশে মেঘ না থাকলে। কিন্তু সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখা যায় ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি। তখন সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দুটোই হয় সমুদ্রের জলে। এগুলি দেখার জন্য পায়ে হাঁটাই ভাল। খুব তাড়া কিংবা অসুবিধা থাকলে রিকশা কিংবা দেশি ভ্যান-রিকশায় চড়তে পারেন।

দীঘার সমুদ্র সৈকত ধরে পূর্বদিকে চার কিলোমিটার হাঁটলে শঙ্করপুর যাওয়া যায়। পথে পড়ে দীঘা মোহনা [Digwa Mohana]। রামনগর ক্যানেল এখানে সমুদ্রে মিশেছে। শীতকালে এবং ভাটার সময় ওখানে জল থাকে না। হেঁটে পার হওয়া যায়। এ পথে অসুবিধা হলে চলুন দীঘা থেকে কাঁথির পথে ১০ কিলোমিটার। বাসে এসে চৌদ্দ মাইল ব্রীজের পাশে নেমে বাসে বা অটোতে বা ভ্যান-রিকশায় যাওয়া যায় শঙ্করপুর। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় মৎস্যবন্দর শঙ্করপুর। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য কোনও কোনও দিক থেকে দীঘার চেয়েও সেরা। আশা করা হচ্ছে শঙ্করপুর একদিন দীঘার চেয়েও জমজমাট হয়ে উঠবে। ব্রিজ থেকে শঙ্করপুর ৮ কিলোমিটার। সুতরাং দীঘা থেকে বাসপথে শঙ্করপুর মোট ১৮ কিলোমিটার। শঙ্করপুরের বাস সংখ্যায় বেশ কম। তাই দীঘা থেকে ট্যাক্সি করে কিংবা বাসে চৌদ্দমাইল ব্রিজ এসে ওখান থেকে অটো বা রিকশায় শঙ্করপুর আসাই যুক্তিযুক্ত। কলকাতা থেকে বাস সরাসরি শঙ্করপুর যাচ্ছে সারাদিনে দুবার। সময় লাগে ৫ ঘণ্টা।

দীঘা থেকে ওড়িশার চন্দনেশ্বর শিবমন্দিরের দূরত্ব ৭ কিলোমিটার। দীঘা বাসস্ট্যান্ড থেকে দু'কিলোমিটার দূরে কিয়াগেড়িয়ায় পশ্চিমবাংলার শেষ এবং ওড়িশার শুরু। কিয়াগেড়িয়া অবধি বহু বাস যাচ্ছে। ওখান থেকে অটোতে যেতে হবে চন্দনেশ্বর। দূরত্ব ৫ কিলোমিটার। দীঘা থেকেও অটো বা ভ্যান-রিকশায় ভাড়া করেও যাওয়া যায় চন্দনেশ্বর। এখানকার শিবমন্দির প্রায় ৩০০ বছরের পুরাতন। শিবের নামেই জায়গার নাম। এ অঞ্চলে জাগ্রত দেবতা হিসাবে চন্দনেশ্বরের প্রবল খ্যাতি। বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে প্রার্থনা জানালে চন্দনেশ্বর নাকি সব মনোবাসনা পূর্ণ করেন। অন্তত এ অঞ্চলের লোকদের তাই-ই বিশ্বাস। এখান থেকে আরও ৫ কিলোমিটার দক্ষিণদিকে গেলে আসে তালসারির সমুদ্র সৈকত। এটিও যথেষ্ট নির্জন, সুন্দর, উপভোগ্য সমুদ্রতীর। এটিও অটো কিংবা ভ্যান-রিকশায় ঘুরে আসা যায় একযাত্রায়। এটিও ওড়িশায়।

দীঘা থেকে কাঁথি যাওয়ার পথে মাঝামাঝি রাস্তায় পড়ে চাউলখোলা বলে একটা জায়গা। এখান থেকে ডানদিকে একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে বেঙ্গল সল্ট ফ্যাক্টরি। ৭ কিলোমিটার গেলে পৌঁছানো যায় ওই ফ্যাক্টরিতে। এ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি লবণ কারখানা আছে প্রাক্-স্বাধীনতা আমল থেকে। ষোড়শ শতাব্দী থেকেই হিজলি তথা কাঁথির লবণ শুধু ভারতেই নয়, সারা

এশিয়া এবং ইউরোপে বিখ্যাত। কয়েকশো বছর ধরে তমলুক, হিজলি তথা কাঁথির সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল লবণ উৎপাদনের জন্য ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছে। সূর্যালোকে লবণ তৈরির সেই পুরাতন পদ্ধতিই অনুসৃত হচ্ছে। মেশিন কেবল পরিষ্কার করছে মাটিমাখা সেই লবণ। পশ্চিমবাংলার লবণ চাহিদার প্রায় ১৫ শতাংশ লবণ তৈরি হয় কাঁথি অঞ্চলের কারখানাগুলি থেকে। চাউলখোলা অবধি বাসে এসে তারপর লবণ কারখানাটিতে যেতে হবে অটোতে কিংবা ভ্যানরিকশায়।

দীঘা থেকে কাঁথি ৩২ কিলোমিটার। কাঁথি থেকে পূর্ব দিকে ৮ কিলোমিটার গেলে জুনপুট। এও সমুদ্র সৈকত। গঙ্গা এখানে মিশেছে সমুদ্রে। সুন্দর বেলাভূমি, ঝাউয়ের বিস্তৃত অরণ্য, নীল সমুদ্র, জেলেদের মাছধরা এখানকার মুখ্য আকর্ষণ। মৎস্য দপ্তরের মাছচাষের বেশ বড়োসড়ো এক সরকারি খামার জুনপুট সৈকতের অন্যতম আকর্ষণ। মৎস্য দপ্তরই উদ্যোগ নিয়ে এটিকে ভ্রমণার্থীদের জন্য আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন। কাঁথি থেকে সারাদিনে বহু বাস যাতায়াত করে জুনপুট।

কাঁথিতেই আছে 'কপালকুণ্ডলা' কালীমন্দির। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'-র কাপালিকের কালীমন্দির সত্যি সত্যিই কোথাও ছিল কিনা তা অজানা। কাপালিকের হয়তো একটা অস্তিত্ব ছিল। তবে তার কোনও মন্দির ছিল কিনা তা অজানা থাকলেও সে মন্দির থাকবে দরিয়াপুর অঞ্চলে, কাঁথিতে নয়। তবু এখানকার লোক বিশ্বাস করে কাঁথি শহরের এই কালীবাড়ি হল বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার মন্দির—কাপালিকের সেই কালীমন্দির, যা এখন নতুন রূপ পেয়েছে। কাঁথি শহরের এই মন্দিরটি পায়ে হেঁটে কিংবা রিকশায় দেখে নেওয়া যায়। দীঘা থেকে সারাক্ষণ বাস আসছে কাঁথি শহরে। ৪০-৪৫ মিনিট লাগে কাঁথি আসতে।

হিজলির মসনদ-ই-আলা ও দরিয়াপুর নিয়ে পরে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। দীঘা থেকে প্রস্তাবিত কনডাক্টেড ট্যুরে যে সাতটি দর্শনীয় স্থান অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছিলাম তার পাঁচটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপরে দেওয়া হল। কনডাক্টেড ট্যুর চালু হলে এগুলি দীঘাকে কেন্দ্র করে দেখে নেওয়া যাবে একদিনেই। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন বাস, অটো, ট্যাক্সি ইত্যাদির সাহায্যেই এইগুলিকে দেখতে হবে দীঘা ভ্রমণার্থীদের। আবার একদিনে যদি এখন সম্ভব না হয়, দুটো দিন খরচ করাও যেতে পারে এদের জন্য। দীঘা বা কাঁথি থেকে একটা ট্যাক্সি ভাড়া নিয়ে এখন একদিনেই এই সাতটি দর্শনীয় স্থান সহজেই দেখা যেতে পারে। তবে দুদিন সময় নিয়ে ঘুরলে কাঁথি মহকুমার অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলিও দেখা সম্ভব হয় কিছুটা ধীরেসুস্থেই।

কোথায় থাকবেন

দীঘাতে সরকারি ব্যবস্থায় থাকার জায়গাগুলি হল : সৈকতাবাস, পুরনো কটেজ, নতুন কটেজ, নিরালা, আনন্দম ইত্যাদি। এগুলি তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট সস্তা। বহু আগে থেকে বুকিং না করলে সিজনে জায়গা পাওয়া মুশকিল হয়ে যায়। এগুলি বিভিন্ন মানের, বিভিন্ন দামের। এছাড়া আছে ট্যুরিস্ট
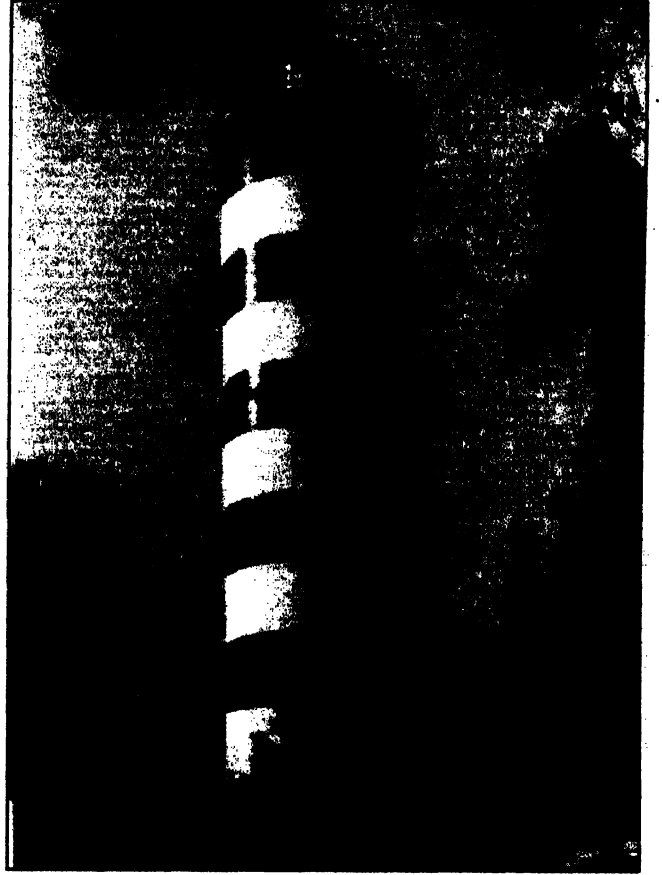
লাইট হাউস, দরিয়াপুর ছবি : লেখক

লজ, যুব আবাস, লেবার ওয়েলফেয়ার হলিডে হোম ইত্যাদি। আর রয়েছে শ-দেড়েক ছোটো-বড়ো নানা মানের প্রাইভেট হোটেল। এদের কয়েকটি হল : সি-হক, ব্লু-ভিউ, ডলফিন, বেলা নিবাস, নীলাচল, সাগরিকা, সি-ভিউ ইত্যাদি।

দীঘা পর্যটন শেষ। এবার আমরা যাব এগরা এবং তার আশপাশ দেখতে। কাঁথি মহকুমায় এগরা মেদিনীপুরের পর্যটন ক্ষেত্রের তালিকায় অনেকটাই উপরে জায়গা করে নিতে পারে। এগরা দীঘা থেকে বাসপথে ৩৪ কিলোমিটার। আসুন দীঘা পরিক্রমা শেষে আমরা এগরা যাই।

এগরা

জীবনানন্দ বাংলার মুখ দেখেছিলেন। তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজতে যেতে হয়নি তাঁকে। আমরা ভ্রমণপিয়াসীরা রূপসী বাংলাকে খুঁজে বেড়াই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসমৃদ্ধ স্থানে কিংবা ইতিহাসজড়িত গ্রামেগঞ্জে-শহরে-নগরে। এর জাম, বট, কাঁঠাল, হিজল, অশ্বত্থের ভিড় জমানো পথে পথে ছড়িয়ে আছে ভ্রমণের হাজারও আকর্ষণ। শহুরে ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেতে চলুন আমরা যাই এগরা পরিক্রমায়। রূপসী বাংলার এক রূপসী গ্রাম। তবে এগরা এখন ঠিক গ্রাম নয়—আধা গ্রাম, আধা শহর। সম্প্রতি এগরা পৌরসভার মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু এর আশপাশে আজও সেই গ্রাম, জীবনানন্দের দেখা গ্রাম। চৈত্রে ধুলোর মেলা, আষাঢ়ে

হটনাগর মন্দির, এগরা, কাঁথি ছবি : লেখক

কাদার স্তূপে ডুবে যায় না। শ্রাবণ মাসে, দূরের নালা থেকে নদী উঠে আসে, মাঠ পথ সব একাকার হয় মাঝে মাঝে। পথ আছে, কিছু পাকা কিছু মোরাম। বিজলিও এসেছে এই সব গ্রামের কিছু কিছুতে।

এগরা এখনও ছোট্ট বর্ধিষ্ণু গঞ্জ। এর বাসস্ট্যান্ডের পাশেই এক বড়োসড়ো দিঘি। নাম 'কৃষ্ণসাগর'। প্রায় ৩০০ বছর আগে ধসুরদাগড়ের জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র স্থানীয় অধিবাসীদের পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে এই বিরাট দিঘি খনন করান। তাঁর নামেই দিঘির নাম 'কৃষ্ণসাগর'। এগরা, কৃষ্ণসাগর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে চাকুরি জীবনের শুরুতে বঙ্কিমচন্দ্র এই এগরার নিকটবর্তী নেঁগুয়াতে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছিলেন। এখানে ছিলেন প্রায় এক বছর।

বাসস্ট্যান্ডের পাশেই বাজার। বাজারের রাস্তা দিয়ে মিনিট পাঁচেক হাঁটলে ডানদিকে পড়ে এই অঞ্চলের অতি বিখ্যাত শিবমন্দির। মন্দিরের নাম 'হটনাগর শিবমন্দির'। দেবতা হলেন 'হটনাগর শিব'। এই দেবতা এগরা এবং তার আশপাশের খড়ুই, অস্তিচক, পাঁচেটগড়, বাথুয়াড়ি, বালিঘাই, পানিপারুল, রামনগর, পাঁচরোল, আলঙ্গিরি, সাউটিয়া, কুদি, পটাশপুর, দাঁতন, ছত্রি, মোহনপুর, দল আলুয়াঁ, আফজলাবাদ, পুরুষোত্তমপুর, জগন্নাথপুর প্রভৃতি গ্রামের মানুষের সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, এমনকী রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। এ অঞ্চলের জনজীবনে হটনাগর শিব তাঁর মাহাত্ম্য নিয়ে গভীরভাবে মিশে গেছেন।

হটনাগর মন্দির পশ্চিমমুখী এবং ইটের তৈরি। উৎকল শৈলীর পীঢ়া জগমোহনযুক্ত সপ্তরথ শিখর-দেউল। নাটমণ্ডপটি একটু অন্য ধরনের। বেশ একটা বিশেষত্ব আছে এটির গঠনশৈলীতে। এটি রাসমঞ্চ নামে প্রসিদ্ধ। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ২১ ফুট (৬.৪ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৫০ ফুট (১৫.২ মিটার) এবং জগমোহনটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ২৩ ফুট (৭ মিটার) ও এর উচ্চতা মোটামুটি ২৭ ফুট (৮.২ মিটার)। দুটিরই ছাদ লহরাযুক্ত চারচালার উপর নির্মিত। জগমোহনের এবং গর্ভগৃহের প্রবেশপথের খিলানগুলিও লহরাযুক্ত। মন্দিরের নির্মাণকাল ও নির্মাতা নিয়ে দু'রকমের জনশ্রুতি আছে। একটা মত বলছে, এটি বানিয়েছিলেন ওড়িশার শেষ হিন্দুরাজা মুকুন্দদেব ১৫৬০ থেকে ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে। অন্য মতে এর নির্মাতা হলেন বিভীষণ মহাপাত্র, যিনি হিজলীরাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী দেখে অনুমান করা হয়, এটি খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে নির্মিত। সম্ভবত মুকুন্দদেবের আদেশে

তাঁর সামন্তরাজা পটাশপুরের প্রতাপ ভঞ্জ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। নির্মাণকার্যের শিল্পীরা ছিলেন সেকালের ওড়িশার বিখ্যাত সব ভাস্করেরা।

মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত বিশাল গৌরীপট্টের মাঝখানে এক গহ্বরের মধ্যে স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গটি অবস্থান করছেন। মন্দিরের দেওয়ালের এক কুলুঙ্গিতে রয়েছে ব্রোঞ্জনির্মিত দণ্ডায়মান এক শিবমূর্তি এবং সঙ্গে আছে চতুর্ভুজা এক দুর্গামূর্তি। মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার কয়েক বছর আগেই কালাপাহাড় ধ্বংস করেছিলেন বহু মন্দির। সম্ভবত সে কারণেই হটনাগর শিবমূর্তি রাখা হয় গৌরীপট্টের গোপন সুড়ঙ্গে। ওপরে রাখা হয় সাধারণ শিবলিঙ্গ। এই সুড়ঙ্গপথের শেষ অংশ নাকি কৃষ্ণসাগর দিঘিতে গিয়ে মিশেছে। শিবচতুর্দশীর আগের দিন মন্দিরে 'পঙ্ক-উদ্ধার' নামের এক ধর্মীয় ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। নিচের আঁধার থেকে হটনাগরকে আনা হয় ওপরে। ফুল-বেলপাতা আর পচা পাঁক পরিষ্কার করা হয়। শিবচতুর্দশীর দিন প্রতি বছর এখানে বিশাল মেলা বসে। গ্রামের মানুষ বেচাকেনা করেন তাঁদের ফল-ফসল, তরি-তরকারি, হাতে বোনা জিনিসপত্র। শিবের উৎপত্তি সম্পর্কে এখানেও সেই অতিবিখ্যাত কাহিনিটি চালু আছে। একদিন দেখা গেল গ্রামের কয়েকটি গোরু জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় নিজেরা গিয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের বাঁট থেকে অঝোরে দুধ ঝরে পড়ে। জায়গাটা খুঁড়তেই বেরিয়ে এল স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ হটনাগর শিব। মন্দিরের প্রবেশপথে একটি ছোট তোরণ। পাশেই রক্ষিত দুটি প্রস্তরস্তম্ভ এবং তার সঙ্গে রয়েছে বিষ্ণু, মকরবাহন গঙ্গা, কার্তিকেয়, গণেশ ও মহাদেবের পাথরের তৈরি মূর্তি। এগুলির গঠনশৈলী পাল-সেন আমলের ভাস্কর্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়। নাটমণ্ডপের কাছেই আছে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী এক বিষ্ণুমূর্তি, হস্তিপৃষ্ঠে আসীন এক দেবীমূর্তি এবং দুটি অজ্ঞাতপরিচয় প্রস্তরমূর্তি। মন্দিরের পাশেই আছে বেশ বড়োসড়ো এক জলাশয় যার নাম কুণ্ড। এটি বাঁধানো। এর ইটের তৈরি সোপানগুলিও বেশ প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। শুধু এখানে নয়, আশপাশের গ্রাম পটাশপুর, কুদি, আলঙ্গিরী, পাঁচরোল ইত্যাদিতে প্রাচীন ইতিহাস ঘুমিয়ে আছে।

এগরা থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে আলঙ্গিরী গ্রাম। এগরা-মোহনপুর রাস্তায়। বাসরাস্তা থেকে নেমে এক কিলোমিটারের মতো হাঁটতে হয়। তবে ভ্যানরিকশা, অটো, ট্যাক্সি সবই যেতে পারে। আলঙ্গিরী সেই চিরাচরিত গ্রাম। আম-জামের সারি, কালকাসুন্দি, পুনর্ণবা, বাঁশ, বাসকের ঝোপঝাড়। আরও কত রকম গাছ। গ্রামের উত্তরে প্রথমে আসে 'রাধাগোকুলানন্দজিউর মন্দির'। পূর্বমুখী একরত্ন মন্দির। মন্দিরটি একরত্ন হলেও এর সংলগ্ন আটচালা রীতির জগমোহনটি বেশ অভিনব। এখানে আছে একটি বৈষ্ণব মঠ। মঠের সেবাইতের মতে স্থানীয় ভূস্বামী নরহরি করমহাপাত্রের আনুকূল্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মন্দিরটি নির্মিত। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে সাড়ে ১৭ ফুট (৫.৩ মিটার), প্রস্থে ১৩ ফুট ১০ ইঞ্চি (৩.২ মিটার), উচ্চতায় প্রায় ২৩ ফুট। মন্দিরের চারদিক আটচালা দিয়ে ঘেরা। মন্দিরের সামনে খোলামেলা সুন্দর বাগান, চারপাশে নানান গাছগাছালি। অনেকটা প্রাচীনকালের আশ্রমের মতো। সামনে মন্দির আকৃতির মঞ্চ। রাসপূর্ণিমার পরে যে কৃষ্ণাষ্টমী তিথি সেটি 'বড়ুয়া' (মতান্তরে পড়ুয়া) অষ্টমী। ওইদিন এখানে মেলা বসে। সাতদিন ধরে চলে এই মেলা। গভীর রাত পর্যন্ত এই মেলা জমজমাট থাকে। মন্দিরের বিগ্রহ তখন এসে বসেন এই মঞ্চে। মানুষের মেলা দেখেন তিনি।

গোকুলানন্দ মন্দির পেরিয়ে কয়েক পা দূরেই এক শিবমন্দির। গ্রামের শিবমন্দির। বয়সে নবীন। আরও মিনিট পাঁচেক হাঁটলে গ্রামের একেবারে মাঝখানে একটি প্রাচীন শিবমন্দির। এটি 'ভৈরবনাথ মন্দির'। মন্দির শিখর দেউল, দক্ষিণমুখী। এটিও পুরাকীর্তি। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে কিংবা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এটি নির্মিত। মন্দির-প্রাঙ্গণে রয়েছে একটি প্রাচীন ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি কষ্টিপাথরের তৈরি। অনেকে মনে করেন এটি বারো-তেরো শতকের প্রাচীন পুরাবস্তু। সম্ভবত আট-নশো বছর আগে এখানে বিষ্ণুমন্দির ছিল এবং পরবর্তীকালে তা রূপান্তরিত হয় শিবমন্দিরে।

গ্রামের মধ্যে আরও একটু এগোলে আসে আলঙ্গিরীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। এটি হল 'দাস-পরিবার'-এর প্রতিষ্ঠিত 'রঘুনাথজিউর মন্দির'। এটা পূর্বমুখী নবরত্ন মন্দির। মন্দিরের প্রবেশপথে রয়েছে অপূর্ব পোড়ামাটির অলঙ্করণ। কমলেকামিনী, কৃষ্ণলীলা এবং লঙ্কাযুদ্ধের বিভিন্ন কাহিনি দৃশ্যায়িত হয়েছে এই টেরাকোটা ভাস্কর্যে। মন্দির দেওয়ালে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায়, মন্দিরটি ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ২৯ ফুট করে এবং এর উচ্চতা ৪০ ফুট (১২.২ মিটার)। মন্দিরের সামনের আটকোনা রাসমঞ্চটিও একান্ত চিত্তাকর্ষক এবং এটির থামগুলিতেও আছে পোড়ামাটি বা টেরাকোটার অলঙ্করণ।

আলঙ্গিরী থেকে দুই কিলোমিটার মোরাম রাস্তায় গেলে আসে পাঁচরোল গ্রাম। আশ্চর্য সুন্দর গ্রাম। ওড়িশার জীবন্ত দেবতা জগন্নাথের আধ্যাত্মিক প্রভাব এই গ্রামে অত্যন্ত প্রকট। পাঁচরোলে একসময় গড়ে উঠেছিল বৈষ্ণবধর্ম শিক্ষাকেন্দ্র। গড়ে উঠেছিল আশ্রম, দেবালয়, মঠ, ছাত্রাবাস, সাধুসন্ন্যাসীদের সাধনালয়। মঠ রয়েছে পাঁচরোলে। বহন করে চলেছে পুরনো দিনের স্মৃতি। মঠের দেওয়ালে এখনও আঁকা আছে দেওয়ালচিত্র, বিভিন্ন দেবদেবী, পশুপাখি। আর রয়েছে কিছু মূর্তি। মঠের বাইরে আছে পুকুর, আমবাগান, সবুজ মাঠ। সুন্দর চড়ুইভাতির জায়গা। পাঁচরোলে রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রাচীন মন্দির। মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম পুরাকীর্তি হল 'রাধাবিনোদ মন্দির'। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা বিভীষণ দাসমহাপাত্রের উত্তরসূরি লক্ষ্মীনারায়ণ দাসমহাপাত্র। এটি জগমোহনযুক্ত শিখরদেউল, যা একটি দালানের উপর স্থাপিত। অভিনব স্থাপত্যরীতি অনুসৃত হয়েছে এখানে। টেরাকোটা নেই, কিন্তু মন্দিরের বিশাল
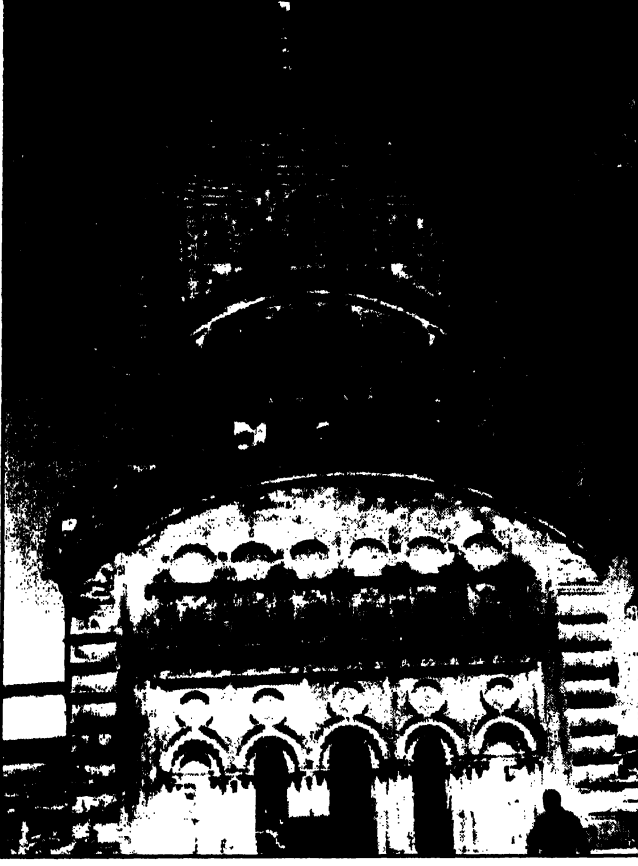
রঘুনাথজীউ মন্দির, আলঙ্গিরি, কাঁথি ছবি : লেখক

নাটমণ্ডপটিতে রয়েছে পঙ্খের (চুনসুরকির) কাজ, নানাবিধ নকশার অলঙ্করণ। মূল মন্দিরের বারান্দার নিচে উত্তর, দক্ষিণ এবং পশ্চিম দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে যথাক্রমে পঙ্খের তৈরি বাতায়নবর্তিনী, নৃসিংহ ও দম্পতির মূর্তি। মন্দিরটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত। এটি দৈর্ঘ্যে ৩৫ ফুট (১০.৭ মিটার), প্রস্থে ২৫ ফুট (৭.৬ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট (১২.২ মিটার)। পাশেই রয়েছে মদনমোহনের দালানরীতির মন্দির। পঙ্খের অলঙ্করণও রয়েছে সেখানে। প্রবেশদ্বারের উপর নিবদ্ধ পোড়ামাটির ফলকে একটি গরুড়মূর্তি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। মদনমোহন মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফুট ৭ ইঞ্চি (১২ মিটার), প্রস্থে ২৪ ফুট ৩ ইঞ্চি (৭.৪ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩ ফুট (১০.১ মিটার)। এটিও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত। মন্দির এখন ধ্বংসপ্রায়।

পাঁচরোলের অন্য বিখ্যাত মন্দিরটি হল 'ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ' মন্দির। মন্দিরটি পূর্বমুখী এবং দালানরীতির। মন্দিরে পঙ্খের কাজ আছে, আর আছে কিছু টেরাকোটার কাজ। পুরী-ভুবনেশ্বর মন্দিরের মতো এখানেও আছে মিথুনমূর্তি। মন্দিরের মূর্তিটি দারু-নির্মিত, কৃষ্ণ-বলরাম-গৌরাঙ্গ তথা চৈতন্যদেবের সম্মিলনে ষড়বাহুযুক্ত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৪২ ফুট ৯ ইঞ্চি (১৩ মিটার), প্রস্থে ২৭ ফুট ৩ ইঞ্চি (৮ মিটার) এবং উচ্চতায় ২৭ ফুট (৮.২ মিটার)। এটিও উনিশ শতকের মাঝামাঝি নির্মিত।

এগরায় ফিরে সেখান থেকে পটাশপুর-বাজকুল হয়ে কিংবা কাঁথি হয়ে হেঁড়িয়ায় আসা যায়। বাজকুলের দিক দিয়ে এগরা থেকে হেঁড়িয়া ৫৯ কিলোমিটার কিন্তু কাঁথি হয়ে হেঁড়িয়া ৫২ কিলোমিটার। হেঁড়িয়া-মাধাখালি বাসরাস্তায় কল্যাচক হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে আরও ৩ কিলোমিটার গেলে খারড় গ্রাম। হেঁড়িয়া থেকে মোট দূরত্ব ৪ কিলোমিটারের কিছু বেশি। একেবারে নিখাদ গ্রাম। তবে ট্যাক্সি চলার মতো মোরাম রাস্তা রয়েছে। এসেছে বিজলি বাতিও। এ গ্রামে 'মহারুদ্রেশ্বর শিব'-এর পশ্চিমমুখী জগমোহনযুক্ত শিখর দেউলটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরের জগমোহনটি প্রথাগতভাবে পীঢ়ারীতির বদলে মূল মন্দিরটির মতোই স্বল্প উচ্চতাসম্পন্ন শিখররীতির। মন্দিরটির এই স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য ছাড়া জগমোহনের প্রবেশপথের খিলানশীর্ষে শিবদুর্গা ও শিবলিঙ্গ এবং পূজারি-মোহন্ত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা সম্পর্কিত বেশ কিছু পোড়ামাটির অলঙ্করণ রয়েছে। মন্দিরের দক্ষিণ দেওয়ালে আছে পোড়ামাটির মিথুনমূর্তি। ওড়িয়া ভাষায় এক লাইন লিপি উৎকীর্ণ। মন্দিরে কোনও প্রতিষ্ঠা ফলক নেই। স্থাপত্যশৈলীর বিচারে আঠারো শতকের মাঝামাঝি কোনও এক সময়ে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ১৪ ফুট (৪.২ মিটার) করে এবং উচ্চতায় প্রায় ৫০ ফুট (১৫.২ মিটার)। জগমোহন দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১২ ফুট ৬ ইঞ্চি (৩.৮ মিটার), উচ্চতা প্রায় ৪৬ ফুট (১৪ মিটার)। দেবালয়টির ছাদ লহরাযুক্ত গম্বুজ-সমন্বিত।

খারড় গ্রাম হিসাবে খুবই অনগ্রসর হলেও মহারুদ্রেশ্বর শিবমন্দির তাকে অনেকটাই অনন্য করে তুলেছে। মন্দিরের দক্ষিণ দেওয়ালে রয়েছে কামবদ্ধ নরনারীর মূর্তি খোদিত এক ফলক। সেখানেই উৎকীর্ণ রয়েছে ওড়িয়া ভাষায় এবং হরফে লেখা একটা লাইন। কী লেখা তা অজানা। তবে এই মিথুনমূর্তির অলঙ্করণ বেশ ভাবিয়ে তোলে। কারণ অজগাঁয়ে মন্দিরের গায় মিথুনমূর্তির টেরাকোটা ফলক এ অঞ্চলের মানুষজনের মনের প্রসারতার কথাই বলে। খারড় গ্রাম হয়তো এককালে অগ্রসর গ্রাম ছিল আজ নেই। সম্পদে না হোক মনের দিক থেকে তার অনগ্রসরতার প্রমাণ এই মিথুনমূর্তি খোদিত পোড়ামাটির ফলক। আগেই বলেছি, এই মন্দিরের বয়স প্রায় ২৫০ বছর।

খারড় থেকে ফেরার পথে পড়ে কল্যাচকের শিবমন্দির। পিচরাস্তার উত্তরে বেশ বড়োসড়ো মন্দির। মন্দিরশীর্ষ গম্বুজাকৃতির। মন্দিরের নিচের দিকে টিন লাগিয়ে আটচালা বানানো। ঘেরা হয়েছে মন্দিরের প্রদক্ষিণপথ। মেঝে সুন্দর করে বাঁধানো। মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট। এই মন্দিরও যথেষ্ট প্রাচীন। এখন এর সংস্কার করা হয়েছে। লাগানো হয়েছে নতুন আটচালা। মন্দির দেখে পিচরাস্তা ধরে হেঁড়িয়ার দিকে এগোলে রাস্তার ডানদিকে পড়ে ছোট্ট একটা সুন্দর মসজিদ। এটি অবশ্য আধুনিককালের, তবে আকর্ষণীয়।

হেঁড়িয়া থেকে অটো বা ভ্যান রিকশা নিয়ে খারড় এবং কল্যাচক দেখে আবার হেঁড়িয়া ফিরে আসা যায় এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যেই। ভ্যান-রিকশায় অবশ্য সময়টা কিছুটা বেশি লাগবে। কল্যাচক থেকে হেঁড়িয়ার দিকে আসার সময় বাস কিংবা ট্রেকার ধরেও আসা যায়। তাতে সময় কিছুটা বাঁচতেও পারে। পরবর্তী গন্তব্য বাহিরী। প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। পুরাবস্তু তথা পুরাকীর্তি সমৃদ্ধ এই গ্রামটিতে না গেলে কাঁথি মহকুমা তথা মেদিনীপুর পর্যটন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সুতরাং আজকের পরিক্রমা শেষ করতে আমরা এখন বাহিরী যাই। বাহিরীর ঐতিহাসিকতা প্রায় হাজার দেড়েক বছরের পুরাতন। গুপ্ত আমল থেকেই সমৃদ্ধ জনপদ আজকের প্রায় অজানা-অখ্যাত এই বাহিরী।

হেঁড়িয়া থেকে বাসে মারিশদা ১৬ কিলোমিটার। সারাদিনই পাঁচ মিনিট অন্তর চলছে নানা বাস। মারিশদা থেকে কাঁথি শহরের দূরত্ব মাত্র ৯ কিমি। মারিশদা থেকে ৩ কিলোমিটার পূর্বে কাঁথি মহকুমার আরেক বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রাম বাহিরী। মারিশদা থেকে চওড়া মোরাম রাস্তা চলে গেছে বাহিরী। অটো, ট্যাক্সি, রিকশা, ভ্যানরিকশা সবই যাতায়াত করছে মারিশদা-বাহিরী।

বাহিরী আসলে তিন গ্রামের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটা অঞ্চল। গ্রাম তিনটি হল পাইকবাড়, দেউলবাড় ও ডিহি-বাহিরী। দেউলবাড় গ্রামে জগন্নাথের পূর্বমুখী জগমোহনসহ ইটের তৈরি শিখর দেউলটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। জগমোহন পীঢ়ারীতির হলেও গঠনশৈলী বেশ অভিনব। জগমোহনে প্রবেশপথের দুপাশে নিবদ্ধ পোড়ামাটির কয়েকটি ফোটা পদ্মফুল। মন্দির ও জগমোহনের মাথার চারদিকে চারটি লম্ফমান সিংহ। ওই জগমোহনেরই প্রবেশপথের দ্বারশীর্ষের কালো পাথরের উপর ওড়িয়া অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় কিছু লিপি খোদিত রয়েছে। এই লিপি থেকে জানা যায়, মন্দিরটি ১৫০৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। বৈশাখ মাসের ১৭ তারিখে বুধবার শুক্লপক্ষের যুগাদ্যদিনে শ্রীযুক্ত গদাধর নামক গুরুর হস্তে এই মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবগণকে সমর্পণ করা হয় এবং তাঁদের প্রীতিকামনায় উক্ত গুরুকে দেউলবাড় নামক গ্রামটিও দান করা হয়।

মন্দিরের জগমোহন ও গর্ভগৃহের সংযোগপথের উপর ওই রকম আরেকটি লিপি থেকে জানা যায়, কাশীদাসের কুলে পদ্মনাভ দাসের পুত্র বিভীষণ দাস নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি এই মন্দির নির্মাণ করে এখানে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় লিপিটিতে আছে, শ্রীযুক্ত অর্জুন মিশ্র নামক আচার্য চূড়ামণির পৌত্র ভগবান নামে কোনও এক ব্যক্তির পুত্র শ্রীধরণীসূত নামক এক ব্যক্তি এবং ওই আচার্য চূড়ামণির চক্রধর নামক এক পুত্র— এঁরা উভয়েই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-বিধি যথা-নিয়ম সম্পন্ন করে পরলোকগমন করেন। ঐতিহাসিকদের মতে 'রসিকমঙ্গল' কাব্যগ্রন্থে সেকালের হিজলী মন্ডলের বিভীষণ মহাপাত্রের যে উল্লেখ আছে, তিনি এবং এই শিলালিপিতে বর্ণিত বিভীষণ দাস একই ব্যক্তি। মন্দিরটিতে একালে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার কোনও মূর্তি নেই। পরিত্যক্ত মন্দিরটি এখন পুরাতত্ত্ব বিভাগ সংস্কার করেছে। সুতরাং বাহিরীর এই মন্দিরটি ষোড়শ শতকে নির্মিত। মূল দেউল শিখর দেউল। কিন্তু জগমোহন প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী লহরা পদ্ধতিতে বানানো। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ২৪ ফুট ৩ ইঞ্চি (৭.৩ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট (১২.১ মিটার)। মন্দিরের জগমোহনের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ১৬ ফুট ৯ ইঞ্চি (৫.১ মিটার) করে এবং উচ্চতা আনুমানিক ৩৫ ফুট (১০.৬ মিটার)।

এছাড়া ডিহি-বাহিরীতে রয়েছে নানা পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। এই গ্রামে বহুকাল ধরেই চারটি বিশাল বিশাল মাটির ঢিবি বিদ্যমান ছিল। এখনও আছে দুটি। এই মাটির স্তূপগুলির নাম 'পালটিকরি', 'শাপটিকরি', 'ধনটিকরি' ও 'গোধনটিকরি'। কেউ বলেন, এগুলি প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ, কেউ বলেন, এগুলি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসস্তূপ। বেশ কিছুদিন হল কলকাতায় আশুতোষ মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানো হয়। এতে গুপ্ত-পাল-সেন আমলের বহু পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে।

এগরা, খারড় এবং বাহিরী পরিক্রমা একদিনেই সারা যায়। কাঁথিকে কেন্দ্র করেই সেটা সম্ভব। ট্যাক্সি নিয়ে ঘুরলে সময় অনেকটাই বাঁচে। তবে বাসে গিয়ে অটো বা রিকশা ধরলে অর্থের সাশ্রয় হয়। কাঁথিতে মধ্যবিত্ত মানের কিছু হোটেলও আছে রাত্রিবাসের জন্য। এগুলির মধ্যে হিন্দুস্থান হোটেল, আগমনী, চৌধুরী লজ, আপনজন, সম্রাট লজ, ফুলেশ্বরী লজ ইত্যাদি মোটামুটি ভালো। উচ্চবিত্তেরা অবশ্য দীঘা চলে যেতে পারেন। কাঁথি থেকে দীঘা ৩২ কিলোমিটার। মেদিনীপুর পর্যটনের পরবর্তী পরিক্রমায় যেতে হবে 'হিজলির মসনদ-ই-আলা' এবং আশপাশে। সুতরাং বাহিরী দেখার পর কাঁথিতে রাত্রিবাসই যুক্তিযুক্ত হবে, কারণ দীঘা থেকে মসনদ-ই-আলা দেখতে যেতে হবে কাঁথির ওপর দিয়েই।

মসনদ-ই-আলা

খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দী। বিখ্যাত তাম্রলিপ্ত বন্দরের রমরমা তখন একেবারেই শেষ। হিজলি তখন ঘন অরণ্যে পরিপূর্ণ। ওড়িশার পিপলি বন্দর থেকে কিছু পোর্তুগিজ তখনকার হিজলি বর্তমানের কসবা হিজলিতে আসে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয়, কিন্তু হিজলি তখনও বসবাসের অনুপযুক্ত। তারপর হিজলি দ্রুত গড়ে ওঠে তাম্রলিপ্তের প্রতিকল্প বন্দর হিসাবে। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে হিজলি বন্দরের খ্যাতি সারা এশিয়া এবং ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। হিজলির তখন কত খ্যাতি, কত নাম, অনেকটা কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের মত। তখন হিজলি প্রচুর চাল, কার্পাস ও রেশমী বস্ত্রের মতো তৃণজাত এক ধরনের বস্ত্রের প্রধান রপ্তানি কেন্দ্র। এই তৃণজাত বস্ত্র সম্ভবত পাটের

কাপড়। এই কাপড় হিজলিবাসীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এবং ভারতের বাইরেও চালান দিত। হিজলি বন্দরে নাগাপট্টম, সুমাত্রা, মালাক্কা ও অন্যান্য স্থান থেকে বহু অর্ণবপোত যাতায়াত করে প্রচুর চাল, কার্পাস ও রেশম বস্ত্র, চিনি, লঙ্কা, মাখন ও অন্যান্য দ্রব্য নিয়ে যেত। পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি মায় ইংরেজ বণিকরা বাণিজ্য করতে আসত এই হিজলি বন্দরে। তাম্রলিপ্তের দিন শেষ হওয়ার পর দেড়শো বছর বা তারও কিছু বেশি সময় ধরে হিজলিই ছিল প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর এবং শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র।

১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দ। জব চার্নক তাঁর চাতুর্যে এই হিজলিতেই যুদ্ধ জয় করেন। ইংরেজ জয়ী হয়। মোঘল সেনাধ্যক্ষ আবদুস সামাদের বারো হাজার সৈন্য এই ঐতিহাসিক হিজলি, বর্তমানের কসবা হিজলিতেই পরাজয় স্বীকার করে নেয় মৃতপ্রায় শদুয়েক ইংরেজের কাছে। জব চার্নকের কেরামতিতে ১০ জুন, ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের গোড়াপত্তন হয়েছিল এই হিজলি বন্দরেই। হিজলি তখন বিশাল দুর্গ-সমন্বিত রাজধানী শহর—হিজলি রাজ্যের রাজধানী। সেই হিজলিকে এখনকার হিজলিতে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ঝড়-ঝঞ্ঝা, প্লাবন-বন্যায় ঐতিহাসিক হিজলি হারিয়ে গেছে মাটির তলায়। আজও এই অঞ্চলের মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায় প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ। এগুলিই মনে করিয়ে দেয় প্রাচীন হিজলি বন্দরের কথা। আর কালের করাল গ্রাস উপেক্ষা করে আজও অটুট মহিমায় অক্ষত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মসজিদ 'মসনদ-ই-আলা' সাক্ষ্য দেয় ঐতিহাসিক হিজলির অতীত রমরমার।

রসুলপুর নদী গঙ্গার শেষ উপনদী। একে বলা যায় কাঁথি মহকুমার নদী। মূলত এই মহকুমাতেই এর উৎপত্তি এবং এই মহকুমাতেই গঙ্গায় এর শেষ। রসুলপুর নদী যেখানে গঙ্গায় মিশেছে সেই সংযোগস্থলের উত্তরতীরে হিজলি এবং দক্ষিণতীরে দরিয়াপুর। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'-র সুবাদে দরিয়াপুর অমর হয়ে আছে। এই বিখ্যাত উপন্যাসের পটভূমিই হল রসুলপুর নদীর মোহনা এবং দরিয়াপুরের জঙ্গল। বঙ্কিমচন্দ্র এই অঞ্চল পরিক্রমা করেছিলেন প্রায় ১৩৮ বছর আগে। উত্তরতীরের মসনদ-ই-আলা তৈরি হয় ১৬৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দে। হিজলি বন্দরের চূড়ান্ত রমরমার কালে। নতুন তৈরি করা ঝাউবনের আড়ালে অক্ষত অবস্থায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা এই মসজিদটি একদিকে যেমন ৩৫০ বছরের স্মৃতি বহন করে চলেছে, তেমনই ডাক পাঠাচ্ছে ভ্রমণপিপাসুদের কাছে। এখানে বসে পূর্বে বা দক্ষিণে যে দিকেই তাকানো যায় সেদিকেই দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি। গঙ্গানদী এখানে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার চওড়া। এপার-ওপার দেখা যায় না। ওপারে সাগরদ্বীপ, গঙ্গাসাগরের দেশ। সোজা দক্ষিণে রসুলপুর নদী, জঙ্গলাকীর্ণ দরিয়াপুর গ্রাম।

মসনদ-ই-আলার স্থানীয় নাম 'বাবা সাহেবের কোর্টগড়া'। প্রতিদিনই হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে প্রায় পাঁচশো লোক এখানে আসে 'শিরনি' চড়াতে। এ অঞ্চলের লোকেরা 'মানত' করে, ইচ্ছাপূরণ হলে পূজা দেয়, শিরনি চড়ায়। শিরনি তৈরি হয় চালের গুঁড়ো, ময়দা এবং চিনি মিশিয়ে। চলতি নাম 'সিন্নি'। তৈরি করে স্থানীয় হিন্দু-ময়রারা। বহুকাল আগে থেকেই হিন্দু এবং মুসলমানদের জন্য করণীয় কাজ পৃথকভাবে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। মসজিদের বাইরের সব কাজ যেমন শিরনি বানানো, বাজনা বাজানো, মসজিদের বহিরঙ্গের পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি করে হিন্দুরা। আর মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে মসজিদের অন্তর্বিভাগের পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থাপনা, মাজারে সিন্নি চড়ানো, নমাজপড়া ইত্যাদি। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে মসনদ-ই-আলা সমান শ্রদ্ধাভাজন। উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এখানে আসে, ভক্তি-শ্রদ্ধা জানায়, পূজা দেয়, শিরনি চড়ায়, নমাজ পড়ে। এই মসজিদই এ অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের এক মিলনক্ষেত্র। এটি এক বিরল নজির। প্রায় ৩৫০ বছর ধরে এখানে ঘটে চলেছে ধর্ম-সমন্বয়। প্রতি বছর চৈত্র মাসে এখানে এক বিশাল মেলা বসে। মেলা চলে তিনদিন। কাঁথি ও তমলুক মহকুমার তো বটেই, মায় দক্ষিণ ২৪-পরগনার প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার হিন্দু-মুসলমান এই মেলায় জড়ো হয়। মসনদ-ই-আলার আরাধনা করে।

'মসনদ-ই-আলা' কথাটির অর্থ হল 'যাঁর আসন উচ্চ'। এই বিশেষণটি প্রয়োগ করা হত 'তাজ খাঁ' নামটির পাশে। বলা হত 'তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা'। লোকে তাজ খাঁ নামটি ভুলে গেছে। কিন্তু প্রায় অমর হয়ে গেছে 'মসনদ-ই-আলা' বিশেষণটি। হিজলি রাজ্য এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেন মনসুর ভুঁইয়া। তাঁর পুত্র রহমৎ ভুঁইয়া ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে হিজলির রাজা হন ইখ্‌তিয়ার খাঁ নাম নিয়ে। ওই বছরই তাঁর পুত্র দাউদ খাঁ রাজা হন বৃদ্ধ পিতা ইখ্‌তিয়ার খাঁর মৃত্যুর ফলে। দাউদ রাজত্ব করেন প্রায় একুশ বছর। এই দাউদ খাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র তাজ খাঁ হিজলিরাজ্যের রাজা হন ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে। মহিষী, ভাগিনেয় তথা জামাতা জৈন খাঁর এবং রাজকর্মচারীদের ষড়যন্ত্রে তাঁর প্রিয় ভাই সিকন্দর খাঁর মৃত্যু ঘটলে তিনি সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করেন। পুত্র বাহাদুর খাঁকে রাজ্যভার অর্পণ করেন ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে। সংসারত্যাগী রাজ-সন্ন্যাসী তাজ খাঁ পরিচিত হন 'তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা' নামে। তিনি এই মসজিদের সামনে 'হুজরা'র মধ্যে তপস্যামগ্ন অবস্থায় সমাধিপ্রাপ্ত হন। এই হুজরা এখন 'মাজার' নামে পরিচিত। লোকে বলে 'বাবা সাহেবের মাজার'। এটি মসজিদ প্রাঙ্গণেই। মসজিদের নাম হয় 'মসনদ-ই-আলা' মসজিদ বা 'বাবা সাহেবের কোর্টগড়া'।

গঙ্গা ও তার উপনদী রসুলপুরের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই মসজিদটি তিন গম্বুজওয়ালা এবং যথেষ্ট বড়োসড়ো। বছর দশেক আগে এর সংস্কার করা হয়েছে। এটি এখন তাই আকর্ষণীয়। এর পরিবেশও অত্যন্ত মনোরম। চারিদিকে ঝাউয়ের জঙ্গল, রসুলপুরের বিস্তীর্ণ মোহনা, পিছনের বালিয়াড়ি মসনদ-ই-আলাকে করেছে অনন্য। এটিকে মেদিনীপুরের

অন্যতম পর্যটনক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তোলা যায় একটু চেষ্টা করলেই। দীঘা থেকে কনডাকটেড ট্যুরের আয়োজন করেও ভ্রমণার্থীদের এটা দেখিয়ে আনা সম্ভব। এর সঙ্গে যোগ করা যায় দরিয়াপুর এবং তার লাইট হাউস। কাঁথি মহকুমার পর্যটনক্ষেত্রগুলির কথা শেষ করি দরিয়াপুরের কথা বলে।

মসনদ-ই-আলা দেখে কাঁথি ফেরার পথে দরিয়াপুরের 'বাতিঘর' [Light House] দেখে নেওয়া যায়। মসনদ-ই-আলার কাছে নৌকোয় নদীপার হলে পেটুয়াঘাট। এই খেয়াঘাট থেকে দরিয়াপুর লাইট হাউসের দূরত্ব মাত্র দু-কিলোমিটার যেতে হবে রিকশায়। সঙ্গে ট্যাক্সি থাকলে অবশ্য অসুবিধা নেই। এই লাইট হাউস তৈরি হয়েছে ১৯৬৮ সালে। এর উচ্চতা ৭৫ ফুট এবং ব্যাস [Diameter] ২১ ফুট। এর যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বক্তব্য হল : 'This equipment was originally installed at Dwaraka [দ্বারকা] Light House in 1881 with Oil Lamp illuminant and removed therefrom in 1964 and renovated at Calcutta Light House Workshop and installed at Dariapur Light House with Petroleum Vapour Burner in 1968.' এর মাথায় চড়তে টিকিট লাগে এক টাকা। সমস্ত ভ্রমণার্থীরই উচিত লাইট হাউসের ওপরে ওঠা। এতে যেমন অনেক নতুন তথ্য জানা যায় তেমনই দেখা যায় অপূর্ব দৃশ্য। ওপরে উঠলে এ অঞ্চলের দিগন্ত বিস্তৃত প্রাকৃতিক শোভা মন্ত্রমুগ্ধ করে। সামনে গঙ্গার একূল-ওকূল দেখা যায় না এমন চওড়া বিশাল জলরাশি। সাগরদ্বীপের অস্তিত্ব খুব ক্ষীণভাবেই নজরে আসে নদীর ওপারে। নদী এখানে প্রায় ২০ কিলোমিটার প্রশস্ত। বাঁয়ে রসুলপুর নদীর শীর্ণ ধারা। তার উত্তরতীরে ঝাউবনের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মসনদ-ই-আলা। ডাইনে ও নিচে জঙ্গলাকীর্ণ দরিয়াপুর গ্রাম—'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের যোগ্য পটভূমি। বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই অঞ্চল দেখেছিলেন তখন এখানে ছিল ঘোরতর জঙ্গল। দৌলতপুরের সেচ-বিভাগের বাংলোটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সে বাংলো এখন ভগ্নপ্রায়। সে সময় এখানে দিনের বেলাতেও বাঘের দেখা মিলত। তখন লাইট হাউস ছিল মসনদ-ই-আলার আরও উত্তরে হিজলির 'কাউখালি'-তে। লোকবসতি ছিল না তখন এই দরিয়াপুরে। ছিল কেবল জঙ্গল আর জঙ্গল। মাইলের পর মাইল জুড়ে বিস্তৃত স্বাভাবিক অরণ্য।

কীভাবে যাবেন

কলকাতা এবং হাওড়া থেকে সরাসরি বাস আসছে 'বোগা'। বোগা রসুল নদীর উত্তরতীরের ফেরিঘাট। কলকাতা থেকে ১৬৫ কিমি। বাসে সময় ৫½ ঘণ্টা। বাস যায় মেচেদা, নন্দকুমার, হেঁড়িয়া, বাজকুল, জনকা হয়ে বোগা। বোগা থেকে মসনদ-ই-আলার দূরত্ব পাঁচ কিলোমিটারের মতো। ভালো মোরাম রাস্তা। অটো, ট্যাক্সি, রিকশা সবই চলে। আবার কলকাতা বা হাওড়া থেকে কাঁথি হয়েও বোগা আসা যায়। প্রায় একই সময় লাগে। কলকাতা ও হাওড়া থেকে প্রায় পনেরো মিনিট অন্তর আসছে দীঘার বাস। সরকারি এবং বেসরকারি যে কোনও বাসে কাঁথি এসে বাস, অটো, ট্যাক্সিতে আসা যায় রসুলপুর। নদী পেরোলেই বোগা। আবার এসপ্লানেড থেকে তিনটে বাস সরাসরি আসছে রসুলপুর। তাতেও আসা যায় রসুলপুর এবং নদী পেরিয়ে বোগা। যেদিক দিয়ে আসা যাক না কেন কলকাতা থেকে মসনদ-ই-আলা সময় নেয় ঘণ্টা ছয়েক। তবে দীঘা ভ্রমণার্থীরা দীঘা থেকে কাঁথি হয়ে রসুলপুর দিয়ে মাত্র আড়াই ঘণ্টায় মসনদ-ই-আলা আসতে পারেন।

মসনদ-ই-আলা থেকে রসুলপুর নদী পেরিয়ে পেটুয়া ঘাট। পেটুয়া ঘাট থেকে দরিয়াপুর লাইট হাউস দু' কিলোমিটার। কাঁথি শহর থেকে দরিয়াপুর লাইট হাউস ১৪ কিলোমিটার। অটো, জিপ, রিকশা চলছে। মসনদ-ই-আলা দেখে লাইট হাউস হয়ে কাঁথিই ফিরে আসতে হবে। কারণ, রাত্রিবাসের ব্যবস্থা আজও তৈরি হয়নি মসনদ-ই-আলা কিংবা দরিয়াপুরে। মসজিদের এক যাত্রীনিবাস আছে, তাতে কোনও রকম মাথা গোঁজা যায় মাত্র। সুতরাং রাত্রিবাসের জন্য ফিরতে হবে কাঁথি কিংবা দীঘায়।

কাঁথি মহকুমায় পর্যটনক্ষেত্রগুলির পরিক্রমা শেষ। মেদিনীপুর পর্যটনের পরবর্তী পরিক্রমায় আমাদের গন্তব্য তমলুক মহকুমার পর্যটনক্ষেত্রগুলি। এবারে আসা যাক তমলুকের পরিক্রমায়। প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর তথা বর্তমানের তমলুক মেদিনীপুর জেলার অনন্য পর্যটনক্ষেত্র। চলুন, আমরা তমলুক যাই।

তাম্রলিপ্ত পরিক্রমা

খ্রিস্টের জন্মের প্রায় দু'হাজার বছর আগে থেকেই তমলুকের প্রসিদ্ধি। বহু প্রাচীনকাল থেকেই তমলুক নানা নামে পরিচিত, যেমন : তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্তি, তালুক্তি, তাল-উক্তি, তালীবন, বেলাকুল, তমালিকা, তমালিশী, দামলিপ্ত, তামালিপ্তি, তমোলিপ্ত, তামলিপ্ত, তমালিনী, বিষ্ণুগৃহ ইত্যাদি। চৈনিক পরিব্রাজকেরা একে বলেছেন 'তোমোলিতি' ও 'তম্মোলিতি'। ঐতিহাসিকদের মতে বহুকাল আগে বাংলাদেশে, দ্রাবিড় জাতির বিশেষ প্রাধান্য ছিল। প্রাচীন তমলুক ছিল তাঁদের প্রধান নগর-বন্দর। তাম্রলিপ্ত বা তমোলিপ্তি নামটা এসেছে তামিল জাতির থেকে। দ্রাবিড়, দামল বা তামল বা তামিল জাতির আবাসস্থল হিসাবে প্রাচীন তমলুকের নাম সম্ভবত দামলিপ্ত। অনার্য অধ্যুষিত এই অঞ্চলের রমরমায় ঈর্ষান্বিত আর্যরা এ নগরের নাম দেন 'তমোলিপ্ত'। পরে এই অঞ্চল আর্যদের অধিকারভুক্ত হলে তাঁরা নামের পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন নাম রাখেন 'তাম্রলিপ্ত'। তারপর নানা সময়ে নানা নাম হয়েছে তমলুকের।

মহাভারতে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্যের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তাম্রধ্বজ রাজার রাজধানী ছিল তাম্রলিপ্ত। পাণ্ডবদের

অশ্বমেধযজ্ঞের ঘোড়া আটকান তাম্রধ্বজ। ঘোরতর যুদ্ধ হয় অর্জুনের সঙ্গে। কৃষ্ণ ও অর্জুনের সঙ্গে তাম্রধ্বজের সখ্যতা হয় যুদ্ধশেষে। সেই সখ্যতার নিদর্শনস্বরূপ কৃষ্ণার্জুন আজও এখানে পূজা পাচ্ছেন 'জিষ্ণুহরি' মন্দিরে। 'জৈনকল্পসূত্র' থেকে জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পুণ্ড্র, রাঢ় ও তাম্রলিপ্তে চাতুর্যাম ধর্ম প্রচার করেন। বহু বৌদ্ধগ্রন্থে তাম্রলিপ্ত নানাভাবে উল্লিখিত। সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলে এর নাম 'বেলাকুল'। বেলাকুল তথা তাম্রলিপ্ত তখন বন্দর হিসাবে পৃথিবীখ্যাত। সে সময় এখানে জাহাজও তৈরি হত। কথিত আছে, বুদ্ধদেব যে বছর মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন সেই বছর বাংলার রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ তাম্রলিপ্তে তৈরি করা জাহাজ নিয়ে সিংহলদ্বীপ জয় করেন। বিজয়সিংহের নাম থেকেই সম্ভবত শ্রীলঙ্কার নাম হয় 'সিংহল'।

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবংশ' বলছে, খ্রিস্টপূর্ব ৩০৭ সালে তাম্রলিপ্ত ছিল বিখ্যাত সামুদ্রিক বন্দর। এই বন্দর-নগরী থেকে সিংহলে পাঠানো হয়েছিল পবিত্র 'বোধিবৃক্ষ'। সেই গাছ শ্রীলঙ্কার অনুপপুর বৌদ্ধ মঠে আজও জীবিত। বৌদ্ধ ভারতের প্রধান সঙ্ঘারাম ছিল তাম্রলিপ্ত নগরে। মহামতি অশোক এখানে স্থাপন করেছিলেন অনুশাসন-খোদিত এক প্রস্তর-স্তম্ভ। এই অশোক-স্তম্ভ বহুকাল পরে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে য়ুয়ান চুয়াং [Hiuen Tsiang] দেখেছিলেন তাম্রলিপ্তে। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রা এই তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়েই সিংহল তথা শ্রীলঙ্কায় যান খ্রিস্টপূর্ব ২৪৩ সালে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে। সে সময় চীন, জাপান, সুমাত্রা, বালি, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি যাওয়ার প্রধান বন্দরই ছিল তাম্রলিপ্ত।

ইতিহাস বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে এসেছিলেন গুপ্ত-সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের আমলে। এসেছেন তাম্রলিপ্ত হয়ে, ফিরেও গেছেন তাম্রলিপ্ত দিয়ে। এখানে ছিলেন তাঁর পরিক্রমা-কালের শেষ দুটি বছর। তাম্রলিপ্ত নগরে অবস্থান করে তিনি বহু বৌদ্ধগ্রন্থের প্রতিলিপি এবং দেবমূর্তির চিত্র গ্রহণ করেন। তাম্রলিপ্তে তিনি দেখেছিলেন ২৪টি সঙ্ঘারাম এবং বহু বৌদ্ধ-শ্রমণ। সময়টা হল ৪১১-৪১২ খ্রিস্টাব্দ। য়ুয়ান চুয়াং-ও এসেছিলেন আরও প্রায় ২০০ বছর পরে। তিনি সে সময় তাম্রলিপ্তের বাণিজ্য-সম্পদ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, সমতট অর্থাৎ বর্তমানের ঢাকা থেকে পশ্চিমদিকে নয়শো 'লি' অতিক্রম করে তিনি তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হন। তাম্রলিপ্ত তখন বঙ্গোপসাগরের উপকূলস্থ নিম্নভূমিতে অবস্থিত। এই রাজ্যের পরিধি তখন ১৪০০ লি এবং রাজধানী শহরের বিস্তার ১০লির চেয়েও বেশি ছিল। তাম্রলিপ্তে তখনও ছিল দশটি বৌদ্ধমঠ এবং এক হাজারের ওপর বৌদ্ধ ভিক্ষু। নগরের একপ্রান্তে প্রায় ১০০ ফুট উঁচু একটা অশোক-স্তম্ভ ছিল। য়ুয়ান চুয়াং তাম্রলিপ্তে ৫০টির মতো হিন্দু মন্দিরও দেখেছিলেন। তাঁর লেখায় পাওয়া যায়, তাম্রলিপ্তের অধিবাসীরা পরিশ্রমী, উদ্যোগী, সাহসী এবং সমৃদ্ধ। তিনি এও বলেছেন, ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে তাম্রলিপ্ত বন্দর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়েছিল। ই-চিং এসেছিলেন ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলের বন্দর তাম্রলিপ্তে আসেন। এখান থেকে যান নালন্দা মহাবিহারে। কয়েক বছর পর আবার এই তাম্রলিপ্ত হয়ে চলে যান দক্ষিণে। তিনি লিখেছেন, তাম্রলিপ্ত রাজ্য উত্তর-দক্ষিণে চারশো যোজন এবং পূর্ব-পশ্চিমে তিনশো যোজন। এক যোজন হল আট মাইল। ই-চিং বলেছেন, তাম্রলিপ্ত থেকে নালন্দার দূরত্ব ৬০ যোজন।

আচার্য বোধিধর্ম ৫৬২ খ্রিস্টাব্দে তাম্রলিপ্ত থেকে সমুদ্রপথে চীন যান চীন-সম্রাটের আমন্ত্রণে। তাঁর কাষায় পরিধেয় এবং ভিক্ষাভাণ্ড বহুকাল জাপানের 'ইকরুণ' মঠে সসম্মানে সংরক্ষিত ছিল। এখন আবিষ্কৃত হয়েছে। একাদশ শতাব্দীতে ওড়িশার রাজা চোড়গঙ্গদেব মেদিনীপুর জয় করেন। তাম্রলিপ্তও তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়। এই সময় থেকেই তাম্রলিপ্তের রমরমা কমতে থাকে। তবু দেখা যায়, বর্মার (মায়ানমার) পেগু জেলার কল্যাণী গ্রামের শিলালিপি বলছে, খ্রিস্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও তাম্রলিপ্ত থেকে বৌদ্ধভিক্ষুরা পেগুতে গিয়েছিলেন ধর্ম-প্রচার করতে। তারপর এই প্রাচীন বন্দর ঘিরে নামে ঘন অন্ধকার। 'পাণ্ডব-দিগ্বিজয়' বা 'দিগ্বিজয় প্রকাশ'-এর সেই ব্রাহ্মণ-অভিশাপ সত্য হল। তাম্রলিপ্তের সমুদ্রে পড়ল চড়া, ভূমি হল শস্যহীনা, উৎপন্ন হল না লবণ, রেশমি ও কার্পাসের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং পরিধেয় তৈরি হল না আর। 'পাণ্ডব দিগ্বিজয়' নামের সংস্কৃত গ্রন্থটি একটি কাহিনি বলেছে। সেটি এই রকম : পরশুধার নামের চিত্রগুপ্তবংশীয় এক অঙ্কশাস্ত্রবিদ কায়স্থ তখন তাম্রলিপ্তের রাজা। কন্যাদায়গ্রস্ত এক ব্রাহ্মণ এসে রাজার কাছে এক লক্ষ মুদ্রা প্রার্থনা করলেন। রাজা তাঁকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি কন্যা উৎপাদন করেছ, আমি তাদের বিয়েতে লক্ষ মুদ্রা দান করব কেন ?' ব্রাহ্মণ এরপরও অর্থদানের জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকলে রাজা তাকে গলাধাক্কা দিয়ে রাজ্য থেকে বের করে দেন। ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ অভিশাপ দেন, "আজ থেকে তাম্রলিপ্তের সমুদ্রে চড়া পড়বে, ভূমি শস্যহীনা হবে, লবণ উৎপন্ন হবে না, কলির ৪৫০০ বছর শেষ হলে এখানে ম্লেচ্ছের আধিপত্য হবে। পরশুধার নির্বংশ হবে, ভীমাদেবী নিজধামে গমন করবেন, অধিবাসীগণ বল এবং অর্থহীন হবে ইত্যাদি।" কলির ৪৫০০ বছর এখন থেকে [১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ] প্রায় ৫৯৯ বছর আগের কোনও সময় এবং তা মোটামুটি ১৩৯৯ বা ১৪০০ খ্রিস্টাব্দ। তাম্রলিপ্তও বিলুপ্ত হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে কিংবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। আজকের তমলুকে সেই প্রাচীন তাম্রলিপ্তকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবুও যা অবশিষ্ট আছে তা ভ্রমণার্থীদের কাছে আকর্ষণীয়।

তমলুক কম করে দুটি তীর্থক্ষেত্রের সমাহার। এর 'কপাল মোচন' তীর্থ যেমন বিখ্যাত, তেমনই তমলুক বিখ্যাত দেবীতীর্থ

হিসাবে। ব্রহ্ম, পদ্ম, মৎস্য ও মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি পুরাণে তাম্রলিপ্তের কথা আছে। ব্রহ্মপুরাণ বলছে, দক্ষযজ্ঞে মহাদেব প্রজাপতি দক্ষকে নিহত করেন। কিন্তু ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের জন্য দক্ষের কাটা মাথা থেকে মহাদেবের হাতে জুড়ে যায়। মহাদেব কোনও মতে ওই কাটা মাথা থেকে করতাল মুক্ত করতে না পেরে ওর থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় সারা পৃথিবীর বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমা করতে শুরু করেন। কিন্তু মাথা আর খসে পড়ে না হাত থেকে। মহাদেব তখন বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু বললেন, "ভারতবর্ষের দক্ষিণে তমোলিপ্ত নামে মহাপুরীতে গূঢ় তীর্থ আছে। সেখানে স্নান করলে লোকে বৈকুণ্ঠে গমন করে। আপনি সে তীর্থরাজের দর্শনের নিমিত্ত সেখানে যান।" মহাদেব তাম্রলিপ্তে এলেন। বিষ্ণু নির্দিষ্ট সেই সরোবরে স্নান করলেন। তাঁর হাত থেকে খসে গেল দক্ষের কাটা মাথা। সেই থেকে ওই সরোবর হল 'কপালমোচন তীর্থ'। তাম্রলিপ্ত হয়ে গেল মহাতীর্থ। অন্য এক কাহিনি বলছে, তাম্রধ্বজের সঙ্গে যুদ্ধে ক্লান্ত কৃষ্ণের কপালের ঘাম পড়ে তৈরি হয়েছিল এই সরোবর। তমলুকে সেই কপালমোচন সরোবর আজ আর নেই। কিন্তু এখনও প্রতিবছর পৌষ-সংক্রান্তির দিনে তমলুকে বারুণী স্নানের মেলার বসে। পুণ্যার্থীরা বর্গভীমা মন্দিরের পাশের রূপনারায়ণে স্নান করেন। আর মনে ভাবে কপালমোচন তীর্থে স্নান করছেন। তমলুকে প্রতিবছর মকর-সংক্রান্তি, মাঘী-পূর্ণিমা, চৈত্র-সংক্রান্তি এবং অক্ষয় তৃতীয়ার জমজমাট মেলা বসে।

তমলুক দেবীতীর্থ। ৫১টি মহাপীঠের এক পীঠ। দেবীর খণ্ড-বিখণ্ড দেহের 'বামগুলফ' এখানে পড়েছিল। তমলুকের অন্য নাম 'বিভাস'। এটি তাই 'বিভাসতীর্থ'। দেবী এখানে ভীমরূপা। তাই তিনি বর্গভীমা। তাঁর ভৈরব কপালী বা সর্বানন্দ। বর্গভীমাদেবীর মূর্তি একশিলা পাথরের। এই পাথরের সামনের দিকে মূর্তিটি খোদিত। উগ্রতারার মতো এই মূর্তি। বর্গভীমা খুবই জাগ্রতা দেবী। এঁর কাছে কালাপাহাড়ও নতজানু হয়েছে। বর্গী তথা মারাঠারা এই দেবীকে ষোড়শোপচারে পূজা করেছে। বহুকাল ধরে তমলুক শহরে অন্য কোনও দেবীপূজা নিষিদ্ধ ছিল। এখন অবশ্য এটা মানা হয় না।

বর্গভীমাদেবীর মন্দির এক প্রাচীন কীর্তি। এর শিল্প-নৈপুণ্যও অপূর্ব। তবে মন্দির গাত্রের শিল্প-অলঙ্করণ এখন সিমেন্টের আস্তরণে ঢাকা পড়ে গেছে। কবে এবং কে বা কারা এই মন্দিরটি বানিয়েছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। রূপনারায়ণের তীরে উঁচু মাটির টিবির উপর মন্দিরটি বানানো। উন্নত পাদপীঠের ওপর নির্মিত হওয়ায় এটিকে বহুদূর থেকে দেখা যায়। অনেকে মনে করেন, সম্রাট অশোক তাম্রলিপ্তে যে স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন, উত্তরকালে সেই স্তূপের ওপরই এই মন্দিরটি নির্মিত। এর বহির্ভাগ বাংলার স্থাপত্যরীতি মেনে বানানো হয়নি। কিছু ভিন্নরীতির। ভেতরের গঠনশৈলী বৌদ্ধরীতির। অনেকটা বুদ্ধগয়ার মন্দিরের মতো। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, কোনও পরিত্যক্ত বৌদ্ধ-বিহারের

বর্গভীমা মন্দির, তমলুক ছবি : লেখক

ওপরই এই মন্দিরটি নির্মিত। মাটি থেকে মন্দিরের ভিত্তি প্রায় ২০ ফুট উঁচুতে। রাস্তা থেকে ২২টি সোপান বেয়ে ওপরে উঠতে হয়। মন্দিরটির বর্তমান কাঠামো প্রায় ৪০০ বছরের। এটিতে ছাপ রয়েছে ওড়িশারীতির। মূল-মন্দির বা দেউল, জগমোহন এবং নাটমণ্ডপ—তিনটিই আছে এই মন্দিরে। তবে ভোগমণ্ডপ নেই। মন্দিরের ভেতরে ঢুকলে মনে হয় ছাদটি যেন একটি বড়ো পাথরের খণ্ড থেকে কুঁদে বের করা হয়েছে। কোথাও জোড় আছে বলে ধরা যায় না। প্রবেশপথে আছে তোরণ এবং নহবতখানা। এখন বাঁদিকে তৈরি হয়েছে নতুন যজ্ঞমণ্ডপ। মন্দিরে বলিদানের ব্যবস্থা আছে। নিয়মিত বলিও হয় দেবীর উদ্দেশে। মূল-মন্দির বা দেউলের উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট। মন্দিরের পাশ দিয়ে কিছুদিন আগেও রূপনারায়ণ বইত। এখন মন্দির থেকে নদী প্রায় এক কিলোমিটার।

বর্গভীমা মন্দির নিয়ে তিনটি কিংবদন্তি প্রচলিত। ধনপতি সওদাগর সিংহলে বাণিজ্য করতে যাওয়ার পথে তাম্রলিপ্তে আসেন। এখানে একজনের হাতে একটি সুবর্ণ-ভৃঙ্গার দেখে সেটি কীভাবে পাওয়া গেল তা জানতে চান। লোকটি তাঁকে নগরপ্রান্তের একটা কুণ্ড দেখিয়ে বলে যে, সেখানে পিতলের জিনিস ডোবালেই তা সোনা হয়ে যায়। ধনপতি তাঁর নৌকার সব পিতলের জিনিস ওই কুণ্ডে ডুবিয়ে সোনায় পরিণত করেন। তারপর সেগুলি সিংহলে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে প্রচুর লাভ

করেন। বাণিজ্য শেষে ঘরে ফেরার পথে তাম্রলিপ্তের সেই কুণ্ডের পাশে বর্গভীমাদেবীর প্রতিষ্ঠা এবং মন্দির নির্মাণ করেন। দ্বিতীয় প্রবাদ অনুসারে, এক ধীবর রমণী তমলুকের রাজবাড়িতে মাছের জোগান দিত। প্রতিদিনই জেলেনি প্রচুর পরিমাণে জ্যান্ত মাছ সরবরাহ করত। তার এই জ্যান্ত মাছ সরবরাহের রহস্য অনুসন্ধান করে জানা গেল, অরণ্যপথে আসার সময় সে একটা কুণ্ড থেকে জল নিয়ে মরা মাছের ওপর ছিটিয়ে দিলে সেগুলো ধীরে ধীরে জ্যান্ত হয়ে ওঠে। প্রতিদিনই এইভাবে মরা মাছ জ্যান্ত করে রাজবাড়িতে সরবরাহ করে সে। রাজা তাম্রধ্বজের কানে গেল সে কথা। তিনি ধীবর রমণীকে সঙ্গে নিয়ে এলেন অরণ্যবেষ্টিত সেই কুণ্ডের কাছে। সেখানে এসে দেখলেন, কুণ্ড নেই, তার জায়গায় রয়েছে একটি বেদী এবং তার উপর প্রস্তরময়ী দেবীমূর্তি। তাম্রধ্বজ সেখানে দেবীর মন্দির বানিয়ে পূজার ব্যবস্থা করেন। সেই থেকে বর্গভীমা পূজা পাচ্ছেন তমলুকে। তৃতীয় প্রবাদ অনুসারে, কৈবর্তরাজ কালু ভুঁইয়া বর্গভীমা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই কাহিনিগুলির ঐতিহাসিকতা বিচার বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

তমলুক শহরে আরেকটি দর্শনীয় পুরাকীর্তি হল 'জিষ্ণুহরি' মন্দির। এখানের বিখ্যাত খাটপুকুরের দক্ষিণতীরে এর অবস্থান। মহাভারতের কালে ময়ূরধ্বজ এবং তাম্রধ্বজ কৃষ্ণার্জুনের সখ্যতা লাভের পর যে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন সে মন্দির কবেই রূপনারায়ণ গ্রাস করেছে। প্রায় ৫০০ বছর আগে এক গোপাঙ্গনা বর্তমান জিষ্ণুহরির মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী, চারচালা, জগমোহনযুক্ত। শিখর-মন্দির, ইটের তৈরি। দেওয়ালে বরন্তের নীচে রামসীতা ও ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের মূর্তি টেরাকোটার ফলকে খোদিত। এর জগমোহন দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ১২½ ফুট [৩.৮ মিটার] এবং উচ্চতায় ১৭ ফুট। মূল মন্দির লম্বা-চওড়ায় ২০ ফুট [৬ মিটার] এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট [৯.১ মিটার] এর গর্ভগৃহে রয়েছে দুটি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি। এগুলি আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর।

জিষ্ণুহরি মন্দিরের কাছাকাছি রয়েছে পূর্বমুখী জগন্নাথ মন্দির। খাটপুকুরের দক্ষিণতীরে এই মন্দিরটি সম্ভবত নির্মিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। বয়স প্রায় ২৫০ বছর। মন্দিরের দেবতা জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৩৪ ফুট [১০.৩ মিটার], প্রস্থে ২৯ ফুট [৮.৮ মিটার] ও উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট [১২.১ মিটার]। 'খাটপুকুর' এক বিশাল জলাশয়। এটি প্রাচীন সরোবর। এর তীরে খনন করে বেশ কিছু পুরাবস্তু পাওয়া গেছে। কথিত আছে, এই সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন তাম্রধ্বজ। খাটপুকুরের অন্য তীরে রয়েছে পুরাতন রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। ইচ্ছা হলে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এখানে আছে চারচালা জগমোহনযুক্ত দক্ষিণমুখী জোড়া-শিখর দেউল। উত্তরের মন্দিরটি রাধামাধবের এবং দক্ষিণেরটি রাধারমণের। উভয় মন্দিরের জগমোহন দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ১০½ ফুট [৩.২ মিটার], উচ্চতায় প্রায় ১৭ ফুট [৫.১ মিটার]। দুটিরই মূল-মন্দির একই আয়তনে নির্মিত। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১৫½ ফুট [৪.৬ মিটার] এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭ ফুট [৮.২ মিটার]। মন্দির দুটি সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের অর্থাৎ এদের বয়স প্রায় ২৫০ বছর।

তমলুকের হরির বাজারে আছে তমলুক রাজাদের প্রতিষ্ঠিত 'রামজিউ মন্দির'। চারচালা, জগমোহনযুক্ত, দক্ষিণমুখী শিখর-দেউল। ইটের তৈরি এই মন্দিরটির বয়স প্রায় ২৫০ বছর। মন্দিরের জগমোহন দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১১১/২ ফুট [৩.৫ মিটার] ও উচ্চতায় প্রায় ১৭ ফুট [৫.১ মিটার]। মূল মন্দিরটি লম্বা-চওড়ায় ১৬ ফুট [৪.৮ মিটার] এবং উচ্চতায় ২৭ ফুট [৮.২ মিটার]। তমলুকে আরেকটি পুরাকীর্তি হল গৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু-মন্দির। চৈতন্যদেবের সহচর বাসুদেব ঘোষ এটি বানান। দালানরীতির মন্দির। রাসমঞ্চ নয়চূড়াবিশিষ্ট, আটকোনা। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর শোকাকুল বাসুদেব তমলুকে মহাপ্রভুর মূর্তি নির্মাণ করে শোক কিছুটা লাঘব করেন। পরে তিনি শিষ্য মাধব দাসের হাতে সেবাদির ভার দিয়ে তীর্থপর্যটনে বের হন।

তমলুক শহরের অন্যতম দর্শনীয় হল 'তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্র' বা তমলুক মিউজিয়াম। এখানে স্থান পেয়েছে নানা পুরাবস্তু যাদের পাওয়া গেছে তমলুক এবং তার আশপাশ থেকে। তমলুক থেকে ১৪-১৫ কিলোমিটার দূরে রূপনারায়ণের তীরবর্তী নাটশাল অঞ্চল থেকে প্রস্তরযুগের বহু গুরুত্বপূর্ণ পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলিও রাখা হয়েছে এই মিউজিয়ামে। ঠিকমতো গবেষণা হলে হয়তো দেখা যাবে তমলুকে নয় তাম্রলিপ্ত ছিল আরও দক্ষিণ-পূর্বে নাটশাল অঞ্চলে। নাটশাল অঞ্চল থেকে পাওয়া পুরাবস্তুগুলি সংখ্যায় অনেক। এগুলির মধ্যে আছে, আদি প্রস্তর যুগ থেকে মধ্য প্রস্তর যুগ অবধি আদিম মানুষের ব্যবহৃত প্রস্তরীভূত হাড়, পাথরের অস্ত্রশস্ত্র, হরিণের শিংয়ের ওপর খোদাই করা নকশাযুক্ত আসবাব, তামা ও হাড়ের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র, মৌর্য-সুঙ্গ যুগ থেকে পাল-সেন আমল অবধি প্রাপ্ত বহু পোড়ামাটির মূর্তি, ফলক ও নানাবিধ খেলনা-পুতুল, জাতকের কাহিনি সংবলিত পোড়ামাটির কয়েকটি ফলক, ব্রাহ্মীলিপি উৎকীর্ণ হাঁড়ি, প্রাচীন তাম্রপট্ট, ব্রোঞ্জের ক্ষুদ্রাকৃতি দেবীমূর্তি, প্রাচীন কিছু প্রস্তর ভাস্কর্য ইত্যাদি। বেশ কিছু প্রাচীন মুদ্রাও রয়েছে এই মিউজিয়ামে। এগুলি বিভিন্ন যুগের। মিউজিয়ামের প্রায় সব পুরাবস্তু তমলুক এবং তার আশপাশ থেকে পাওয়া এবং এগুলি প্রাচীন তাম্রলিপ্তেরই নিদর্শন।

এগুলি ছাড়া তমলুকে দর্শনীয় হল লেফটন্যান্ট ও'হারার সমাধি (১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ), মাতঙ্গিনী স্মৃতি-স্তম্ভ (১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ)। তমলুক স্বাধীনতা সংগ্রামেরও পীঠস্থান। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় সতীশচন্দ্র সামন্ত, অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে তমলুক স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় 'তাম্রলিপ্ত জাতীয়

সরকার'। প্রায় দুবছর ধরে স্বাধীন শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেছে এই সরকার তমলুককে কেন্দ্র করেই। তমলুকের কাছে (৫ কিমি) নিমতৌড়িতে গড়ে উঠেছে 'তাম্রলিপ্ত জাতীয়-সরকার-স্মারক ভবন'। ৪১নং জাতীয় সড়কের ধারে এই সৌধটিও ভ্রমণার্থীদের দর্শনীয়ের তালিকায় ধীরে ধীরে জায়গা করে নিচ্ছে। সদ্য জায়গা করে নিয়েছে তমলুকের 'রামকৃষ্ণ মন্দির'। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন বহুদিনের পুরানো। এঁরাই বানিয়েছেন এই আকর্ষণীয় রামকৃষ্ণ-মন্দির।

তমলুক থেকে দেখে নেওয়া যায় মহিষাদলের রাজবাড়ি (১৭ কিমি), রূপনারায়ণ-গঙ্গা সঙ্গমের গেঁওখালি (২৪ কিমি), হলদিয়া বন্দর (৫০ কিমি) এবং ময়নাগড় (১৮ কিমি)। তবে শিল্প-নগরী তথা বন্দর-নগরী হলদিয়ার জন্য পুরো একটা দিন বরাদ্দ করাই উচিত হবে। হলদিয়াতে থেকে হলদিয়া দর্শনই সুবিধাজনক। তমলুককে কেন্দ্র করে ময়নাগড়, মহিষাদল এবং গেঁওখালি দেখাই যুক্তিযুক্ত।

কী করে যাবেন

তমলুকের নিকটতম বিমানবন্দর দমদম। দূরত্ব প্রায় ৯৬ কিলোমিটার। কলকাতা থেকে বাসে বা ট্রেনে তমলুক আসা যায়। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে মেচেদা (৫৯ কিমি)। তারপর বাসে ১৬ কিমি এলে তমলুক। আবার হাওড়া থেকে হলদিয়াগামী ট্রেনে এসে সরাসরি তমলুক পৌঁছানো যায়। তবে সরাসরি ট্রেন কম। সড়কপথে কলকাতা-হলদিয়া ৮০ কিমি। এসপ্ল্যানেড থেকে হলদিয়াগামী বাসে, হাওড়া স্টেশনের চত্বর থেকে হলদিয়া, তেরপেখ্যা ও শ্রীরামপুরগামী (হুগলির নয়) বাসে তমলুক আসা যায়। কলকাতা থেকে বাসে সময় লাগে দুঘণ্টা। আধঘণ্টা অন্তর ওই সব বাস পাওয়া যায় হাওড়া থেকে। আবার খড়্গপুর কিংবা মেদিনীপুরের সঙ্গে সরাসরি বাস যোগাযোগ রয়েছে তমলুকের। বহু বাস যাতায়াত করে প্রতিদিন ভোর চারটে থেকে রাত দশটা অবধি। প্রচুর ট্যাক্সিও যাতায়াত করে কলকাতা-তমলুক। সব মিলিয়ে মহকুমা শহর তমলুক জেলা সদর মেদিনীপুর কিংবা রাজধানী শহর কলকাতার সঙ্গে বাসপথে এবং ট্রেনপথে নানাভাবে সংযুক্ত।

কীভাবে দেখবেন

তমলুকে এসে নামতে হবে মানিকতলায়। ট্রেনে সরাসরি এলে নামতে হবে 'মাতঙ্গিনী' স্টেশনে। এই স্টেশন মানিকতলার পাশেই। ঘণ্টা চারেকের জন্য একটা রিকশা ভাড়া নিয়ে তমলুকের সবকটি দর্শনীয় স্থান ভালভাবে দেখে নেওয়া যায়। মানিকতলা থেকে রিকশা নিয়ে তমলুক পরিক্রমা শুরু করাই বিধেয়। মিউজিয়াম দেখা উচিত সবার শেষে। এটা খোলে বিকাল তিনটায়। ভালো করে মিউজিয়াম দেখতে হলে মোট সময় বেড়ে ঘণ্টা পাঁচেক হতে পারে। মিউজিয়াম দেখলেই তমলুকের প্রাচীনত্ব উপলব্ধি করা যায়, অনুভব করা যায় তাম্রলিপ্তকে। যাঁরা ট্যাক্সি নিয়ে আসবেন তাঁরা ট্যাক্সিতেই তমলুক পরিক্রমা সারবেন। তমলুক থেকে যাঁরা ময়নাগড়, মহিষাদলের রাজবাড়ি এবং গেঁওখালি দেখে নিতে চান তাঁদের পুরো একটা দিন বরাদ্দ করতে হবে এই তিনটে জায়গার জন্য। সকালে ময়নাগড়, দুপুরে মহিষাদল এবং বিকেলে গেঁওখালি দেখে হলদিয়া চলে যেতে পারেন কিংবা ফিরে আসতে পারেন কলকাতায় নূরপুর হয়ে। গেঁওখালিতে গঙ্গা পেরিয়েই নূরপুর। আবার রূপনারায়ণ পেরিয়ে হাওড়া জেলার পর্যটন-ক্ষেত্র গাদিয়াড়া।

কোথায় থাকবেন

শুধু তমলুক দেখতে এসে রাত্রিবাসের দরকার হয় না। কিন্তু ময়নাগড় ইত্যাদি দেখতে হলে কম করে একটা রাত তমলুকে থাকতে হয়। তমলুকে রাত্রিবাসের ভালো হোটেল 'শ্রীনিকেতন' মধ্যবিত্তদের উপযোগী। উচ্চবিত্তরাও থাকতে পারেন। কোর্টের পাশে, পৌরভবনের কাছেই এই হোটেল। হাসপাতালের কাছাকাছি রাস্তার ধারে 'ক্লাসিক লজ'ও বেশ কিছুটা ভালো হোটেল। এছাড়াও তমলুকে রয়েছে আরও কিছু সাধারণ হোটেল।

তমলুক মহকুমার অপর পর্যটন কেন্দ্র হল ময়নাগড়। আমাদের পরিক্রমায় আমরা তমলুক থেকে যাব ময়নাগড়ের পরিক্রমায়। দূরত্ব ১৭ কিলোমিটার। শ্রীরামপুরের বাস যাচ্ছে কাঁসাই নদীর ধার অবধি। নদী পেরিয়ে এক কিলোমিটার গেলে ময়নাগড়। চলুন, তমলুক থেকে এখন ময়নাগড় যাই।

ময়নাগড়

কার্তিক পূর্ণিমা। রাত প্রায় দুটো। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় ঝলমলে রাত্রি। প্রশস্ত পরিখার ঘন নীল জল তখন কিছুটা কালচে। পরিখার দক্ষিণ তীরে বসে-দাঁড়িয়ে কয়েক হাজার মানুষ। নৌকায় চড়ে পরিখা দিয়ে 'শ্যামসুন্দর জিউ' আসবেন রাসমঞ্চে। তাঁর শোভাযাত্রা দেখতে উন্মুখ জনতা। রাত জেগে অধীর অপেক্ষা। এরই মধ্যে দেখা যায় আলো ঝলমল চার-পাঁচটি নৌকার শোভাযাত্রা। বাজনা-বাদ্যি সহযোগে বিশাল পরিখার জল বেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তীরের রাসমঞ্চের দিকে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। জনতার মধ্যে রব ওঠে 'শ্যামসুন্দর জিউ কি জয়'। ঠাকুর আসছেন রাসমঞ্চে অসংখ্য প্রদীপের আলোয় আগাগোড়া সুসজ্জিত নৌকায়। পরিখাগুলি যেন নদী। সেই নদীর মাঝখান দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে শোভাযাত্রা। যেন স্বর্গীয় আলোর রথ আকাশগঙ্গা দিয়ে ভেসে আসছে মর্ত্যের রাসমঞ্চে। উড়ানো হল রঙিন 'ফানুস-বাজী'। নানা রঙের ফানুস আকাশে উঠে উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে সুদূরে। মিলিয়ে যাচ্ছে দূর আকাশে। পূর্ণিমার চাঁদও যেন ম্লান হয়ে যাচ্ছে মাটির আলোর সমারোহে। স্মরণাতীত কাল থেকে এমনই বর্ণাঢ্য আলোর, আতসবাজীর সমারোহ নিয়ে রাস-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ময়নাগড়ে।

ময়নাগড় 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের নায়ক মহাবীর লাউসেনের স্মৃতিবিজড়িত। এই গড় বা পরিখা-দুর্গ আজও কিছুটা দুর্ভেদ্য।

এই কাব্যের প্রতিনায়ক ইছাই ঘোষের ঐতিহাসিকতা এখন প্রমাণিত। লাউসেনের ঐতিহাসিকতা আজও প্রমাণের অপেক্ষায়। তবে ঐতিহাসিকরা ইছাই ঘোষের সঙ্গে লাউসেনের ঐতিহাসিকতা কিছুটা মেনে নিয়েছেন। বৌদ্ধযুগে প্রাচীন তাম্রলিপ্তে বা বর্তমানের তমলুকে এক বিশাল সঙ্ঘারাম ছিল। তমলুক থেকে ষোলো কিলোমিটার দূরে ময়নাগড়েও একটি বৌদ্ধবিহার ছিল বলে অনুমান করা হয়। এই ময়নাগড় ছিল বৌদ্ধ নরপতি মহাবীর লাউসেনের রাজধানী। নবম শতাব্দীতে গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন ধর্মপাল। কেউ কেউ অবশ্য এই ধর্মপালকে দণ্ডভুক্তির রাজা বলে মনে করেন। এই ধর্মপালের সময় ময়নাগড়ের রাজা ছিলেন কর্ণসেন। বীরভূম জেলায় অজয় নদীর তীরবর্তী ঢেকুর-রাজ্যের সামন্ত গোপরাজ সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হন। অজয়গড়ে ছিল তাঁর রাজধানী। বিদ্রোহী ইছাই ঘোষ কর্ণসেনকে পরাজিত করে ময়নাগড় দখল করেন। কর্ণসেনের ছয় পুত্র যুদ্ধে নিহত হয়। পুত্রশোকে মারা যান তাঁর পত্নী। কর্ণসেন ওই ধর্মপালের আশ্রয় নেন। ইছাই ঘোষ ছিলেন মহাশক্তিশালী। দেবী ভবানীর বরপুত্র। কথিত আছে, ধর্মপাল তাঁর শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিয়ে দেন। রঞ্জাবতী ছিলেন ধর্ম-দেবের উপাসিকা। ধর্মঠাকুরের বরে রঞ্জাবতীর লাউসেন নামে এক পুত্র হয়। ধর্মের বরপুত্র তথা কর্ণসেনের পুত্র মহাবীর লাউসেন ইছাই ঘোষকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করে ময়নাগড়কেই তিনি তাঁর রাজ্যের রাজধানী করেন। লাউসেনের রাজ্য কামরূপ-কামাক্ষ্যা অবধি বিস্তৃত হয়। মানিক গাঙ্গুলী ও ঘনারাম চক্রবর্তীর 'ধর্ম-মঙ্গল' কাব্যে লাউসেনের বীরত্ব-কাহিনি সবিস্তারে বর্ণিত। আজও এ অঞ্চলের লোকবিশ্বাস হল, ময়নাগড়ের রঙ্কিণী কালী ও লোকেশ্বর শিব এবং ময়নার নিকটবর্তী বৃন্দাবনচকের ধর্মঠাকুর লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত। ময়নাগড় সেকালে ধর্মরাজ পূজার পীঠস্থান হিসাবেই চিহ্নিত ছিল। ঐতিহাসিকেরা বলেন, আমাদের দেশের ধর্মরাজ পূজা বুদ্ধের পূজার নামান্তর মাত্র। বুদ্ধদেবই বাংলায় ধর্মরাজ নামে পূজিত হচ্ছেন।

ময়নাগড় এখন যে গ্রামে অবস্থিত তার নাম 'গড়ময়না'। স্থানীয় লোকেরা বলে 'গড়-সাফাৎ'। গড়ময়না এখন আর গ্রাম নয়। বেশ বড়োসড়ো গঞ্জ। এখানে থানা আছে, ব্লক-অফিস আছে, স্কুল-কলেজ আছে, আর আছে প্রাচীন কাহিনির স্মৃতিবিজড়িত ময়নাগড় ও তার প্রাচীন ঐতিহ্য। ময়না একটি দ্বীপ। তাকে উত্তর ও পূর্বে ঘিরে রেখেছে কাঁসাই নদী। দক্ষিণে কেলেঘাই এবং পশ্চিমে চণ্ডিয়া নদী। পুরো ময়না দ্বীপটি ময়না-ব্লক। এরই পূর্ব-প্রান্তে কাঁসাইয়ের পশ্চিমতীরে ময়নাগড়। কেলেঘাই ও কাঁসাইয়ের সঙ্গমস্থল থেকে খানিকটা উত্তরে। কাঁসাই নদী পার হয়ে এক কিলোমিটার গেলেই গড়ময়না গঞ্জ এবং পাশেই প্রাচীন ময়নাগড়। ময়না দ্বীপটি পুরোটাই নদীর তলদেশের থেকেও অনেকটা নিচে। অনেকটা নেদারল্যান্ডের মতো। বিশাল বাঁধ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে দ্বীপটিকে আবহমানকাল ধরে।

গড় বা দুর্গ বলতে বোঝায় বিশাল প্রাচীর বা প্রাকার-বেষ্টিত রাজা-রাজড়াদের প্রাসাদ, মহল, সেনানিবাস ইত্যাদি। ময়নাগড়ের মধ্যে প্রাসাদ, মহল ইত্যাদি থাকলেও কোনও প্রাকার বা প্রাচীর নেই। ছিল না কোনও কালেই। তার বদলে রয়েছে বিশাল বিশাল পরিখা। ময়নাগড়ের কেন্দ্রে রয়েছে ৫,৬২,৫০০ বর্গফুটের বা ১২.৯১ একর আয়তনের একটি দ্বীপ। এর চারিদিক ঘিরে রয়েছে এক বিশাল পরিখা। এর পরিধি প্রায় ৩০০০ ফুট, এটি চওড়ায় ১৫০ ফুট এবং গভীরতায় ১২-১৪ ফুট। কেন্দ্রস্থলের এই দ্বীপটিকে বলা হয় 'ভিতরগড়'। এই গড়েই এককালে ছিল প্রাসাদ-মহল-মন্দির। আর ছিল পরিখার তীর জুড়ে ঘনবাঁশবন। দূর থেকে ছোঁড়া তির, গোলাগুলি সবই প্রতিহত হতে বাঁশের জঙ্গলে। রাজা সপরিবারে নিরাপদে বাস করতেন ভিতরগড়ে। পরিখায় ছাড়া থাকত অসংখ্য কুমির। আকাশপথে আক্রমণ ছাড়া ভিতরগড় ছিল দুর্ভেদ্য এবং প্রায় অজেয়। এই পরিখার বাইরের তীর থেকে প্রায় ২০০ মিটার পরে রয়েছে আরেকটি পরিখা। এই পরিখার পরিধি প্রায় ৬০০০ ফুট, প্রসার ১৫০ ফুট এবং গভীরতা প্রায় ৮-১০ ফুট। দুই পরিখার মধ্যবর্তী ২০০ মিটার চওড়া স্থলভূমি 'বাহিরগড়' নামে পরিচিত। বাহিরগড়ে বাস করত পাত্র-মিত্র, সেপাই-শাস্ত্রী, লোক-লস্কর। ভিতরগড় পুরোপুরি পরিখাবেষ্টিত দ্বীপ হলেও বাহিরগড় তেমন ছিল না। বাহিরগড়ে স্থলপথে প্রবেশ করা যেত। অগ্নিকোণে ছিল প্রবেশদ্বার। এখনও তাই আছে। অনেকে মনে করেন, অনুরূপ এবং তৃতীয় পরিখা ছিল বাহিরগড়ের পরে। সেটি পরিবেষ্টন করেছিল দ্বিতীয় পরিখাটিকে। তৃতীয় পরিখার অস্তিত এখন আর নেই। তবে অন্য দুটি পরিখা আগের মতোই আছে। অবশ্য কুমির নেই পরিখাতে। এইভাবে ময়নাগড় ছিল সমতল-দুর্গ। পরিখা খুঁড়ে তার মাটি দিয়ে বানানো হয় ভিতরগড় ও বাহিরগড়ের স্থলভূমি। দুটি পরিখারই বাইরের দিকে বানানো হয়েছিল উঁচু বাঁধ। এই বাঁধের ওপরে স্থানে স্থানে কামান বসানোর বন্দোবস্তও ছিল। ভিতরের গড়ের চারদিকে অতিরিক্ত হিসাবে ছিল কাঁটা বাঁশের ঘন বন। সব মিলিয়ে দুর্ভেদ্য ছিল ময়নাগড়।

প্রায় ৩৫০ বছর আগে ওড়িশার রাজার কাছ থেকে ময়না-রাজ্য শাসনের অধিকার পান তাঁর সামন্তরাজা। এ অঞ্চলের দস্যু-তস্করদের দমন করে শান্তি ফিরিয়ে আনেন তিনি। ওড়িশার রাজা প্রীত হয়ে তাঁকে ময়না-শাসনের ভার দেন। তাঁকে ভূষিত করেন 'বাহুবলীন্দ্র' উপাধিতে। সেই থেকে দশ-পুরুষ কেটে গেছে। বাহুবলীন্দ্র বংশ আজও ময়নার রাজা হিসাবে খ্যাত। যদিও রাজ্য এবং রাজত্ব দুই-ই গেছে, তবু ময়নাগড়ের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা পুণ্যার্থী ও ভ্রমণার্থী উভয়কেই সমানভাবে টানে।

রাসপূর্ণিমার সময় মেলা বসে ময়নাগড়ে। বিশাল গ্রামীণ মেলা। মেলা বসে গড়-সাফাৎ অঞ্চল জুড়ে রাসমঞ্চের সামনে। ভিতরগড়ে প্রাচীন মন্দিরে থাকেন শ্যামসুন্দর জিউ। রাসপূর্ণিমার আগের একাদশী থেকে প্রতিদিন রাত দুটো নাগাদ ভিতরগড়ের মন্দির থেকে শ্যামসুন্দরকে আলো ঝলমল নৌকায় পরিখা দিয়ে নিয়ে আসা হয় গড়-সাফাতের ওই রাসমঞ্চে। সেখানে মূর্তি রাখা হয় পরদিন বেলা দুটো অবধি। আবার ঠাকুর ফিরে যান ভিতরগড়ের মধ্যে তাঁর নিজের মন্দিরে। মেলা চলে ১৫ দিন। সারা সন্ধ্যায় মেলায় ঘোরাঘুরি, কেনাকাটা। তারপর ভোররাতে শ্যামসুন্দর জিউর শোভাযাত্রা দেখা। এই শোভাযাত্রা দেখা এক বিরল অভিজ্ঞতা। আগে নৌকাগুলি সাজানো হত প্রদীপ দিয়ে। এখন সাজানো হয় বিজলি বাতি দিয়ে। কমেছে গাম্ভীর্য, বেড়েছে কোলাহল। আজও 'ফানুস' ওড়ে। পুরানো দিনের মত রঙিন হয়েই ওড়ে।

ভিতরগড়ে রয়েছে বাহুবলীন্দ্রদের ঘরবাড়ি। প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের ওপর ঝোপঝাড়, ঘন জঙ্গল। ঘন বাঁশবন নেই। কিন্তু রয়েছে 'লোকেশ্বর শিবমন্দির' এবং প্রাচীন মন্দির শ্যামসুন্দর জিউর। ভিতরগড়ের পিছনে উত্তরদিকে প্রথম পরিখার অপর তীরে আছে এক মসজিদ। বাহিরগড়ের পরে গড়সাফাতে রয়েছে রাসমঞ্চ। এগুলি ভ্রমণার্থীদের দর্শনীয়। লোকেশ্বর শিবমন্দিরে রয়েছে কিছু সুন্দর টেরাকোটা। দক্ষিণ চংরাচকে অধুনা নির্মিত হয়েছে এক সুন্দর মন্দির শিব ও কৃষ্ণের। নাম 'শান্তিধাম'। ময়নাগড় থেকে বাসরাস্তায় ছয় কিলোমিটার পশ্চিমে এগিয়ে রাস্তায় দক্ষিণে পড়ে শান্তিধাম মন্দির। রাস্তা থেকেই মন্দির দেখা যায়। কিন্তু মন্দির চত্বর বাস-রাস্তা থেকে প্রায় এক কিলোমিটার। উৎকল এবং দক্ষিণ-ভারতীয় ভাস্কর্যের মিশ্রণে নির্মিত সুন্দর দর্শনীয় এক মন্দির। এটি আধুনিক মন্দির। স্থানীয় এক ধনী ব্যবসায়ী এর নির্মাতা।

রাসমেলা না থাকলেও ভ্রমণার্থীদের কাছে ময়নাগড় যথেষ্ট আকর্ষণীয়। গড়ের পরিখাতে নৌকাবিহারও যথেষ্ট রোমাঞ্চকর। রাসমেলার সময় গেলে শ্যামসুন্দরের শোভাযাত্রা এবং মেলা হবে উপরি পাওনা। এই মেলায় প্রতিদিন প্রায় ২৫-৩০ হাজার জনসমাগম ঘটে। লোক আসে তমলুক, পাঁশকুড়া, সবং, পিংলা, ভগবানপুর, নন্দীগ্রাম ইত্যাদি থানার গ্রামগুলি থেকে। মেলায় গৃহস্থালীর জিনিসপত্র, হাঁড়ি-কুড়ি, খেলনা, জুতা, বাসন-কোসন, কোদাল-ঝুড়ি ইত্যাদির প্রায় ১৫০-২০০ দোকান বসে। তাদের মধ্যে মিষ্টির দোকানই বেশি। এখানকার তৈরি বাতাসা এবং চিনির তৈরি 'কদমা' সারা মেদিনীপুর জেলায় বিখ্যাত।

কীভাবে যাবেন

ময়নাগড় সরাসরি সবং, বালিচক, ডেবরা হয়ে হাওড়া ও কলকাতার সঙ্গে বাসপথে সংযুক্ত। তবে এটা অনেক ঘুরপথ। কাঁসাইয়ের ব্রিজটা তৈরি হয়ে গেলে ময়না থেকে শ্রীরামপুর, তমলুক হয়ে বাস সরাসরি কলকাতা কিংবা হাওড়া যেতে পারবে অনেক সময়ে। এখন সহজ পথ হল হাওড়া-শ্রীরামপুর বাস ধরে শ্রীরামপুর আসা। এই শ্রীরামপুর কিন্তু হুগলি-শ্রীরামপুর নয় তমলুক-শ্রীরামপুর কিংবা মেদিনীপুর জেলার ময়না-শ্রীরামপুর। হাওড়া থেকে এই শ্রীরামপুর ৯২ কিলোমিটার। হাওড়া স্টেশন চত্বর থেকে সারাদিনই বাস পাওয়া যায় এই শ্রীরামপুরের। সময় নেয় প্রায় তিন ঘণ্টা। তমলুক থেকে মাত্র ১৬ কিলোমিটার শ্রীরামপুর। বহু বাস যাতায়াত করে। আবার হাওড়া থেকে ট্রেনে মেচেদা [৫৯ কিমি] হয়ে, সেখান থেকে বাসে শ্রীরামপুর হাইরোড হয়ে ২৭ কিমি এবং তমলুক হয়ে ৩২ কিলোমিটার। শ্রীরামপুর থেকে কাঁসাই নদী পেরিয়ে এক কিলোমিটার গেলেই ময়নাগড়। তমলুক থেকে সময় নেয় ঘণ্টাখানেক। হাওড়া থেকে মেচেদা হয়ে ময়নাগড় সময় লাগে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা। যাঁরা তমলুকে রাত্রিবাস করবেন তাঁরা ভোর ভোর বেরিয়ে পড়ুন ময়নাগড়ের পথে।

কী করে দেখবেন

দেশি নৌকায় পার হতে হবে ভিতরের পরিখা। অনুরোধে, রাজ পরিবারের নিজস্ব নৌকা ভিতরগড়ে নিয়ে যায়। ভিতরের গড়, মন্দির দেখতে সময় লাগে ঘণ্টাখানেক। আর পরিখায় নৌবিহারে লাগে আধঘণ্টার মতো। একটা যন্ত্রচালিত নৌকা ময়নাগড় ঘুরিয়ে দেখায়। তবে তার জন্য কম করে চল্লিশ জন যাত্রী হতে হবে। না হলে সে যায় না। এরপর দক্ষিণ চংরাচকের শান্তিধাম দেখতে বাসে ছয় কিলোমিটার পশ্চিমে যেতে হবে। তাতেও ঘণ্টাখানেক সময় লাগে। সব মিলিয়ে ঘণ্টা দু-আড়াই লাগবে ময়নাগড় ও শান্তিধাম দেখতে। সুতরাং কলকাতা থেকে সকালে বেরিয়ে রাতে আবার কলকাতা ফিরে আসা যায় ময়নাগড় এবং শান্তিধাম পরিক্রমার পর। যাঁরা তমলুকে থাকছেন তাঁরা অবশ্য ময়নাগড় পরিক্রমা সেরে চলে যাবেন মহিষাদল এবং গেঁওখালি দেখে হলদিয়া। সব মিলিয়ে সময় লাগবে দশ-বারো ঘণ্টা। একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলে অবশ্য সময় কম লাগবে।

কোথায় থাকবেন

শুধু ময়নাগড় দেখার জন্য কলকাতা থেকে আসা ভ্রমণার্থীদের রাত্রিবাসের প্রয়োজন হয় না। ময়নাগড়ে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা নেই। খাওয়ার হোটেল আছে কয়েকটি। তবে একযাত্রায় তমলুক, ময়নাগড়, মহিষাদল, গেঁওখালি ও হলদিয়া ভ্রমণ সারতে হলে ময়না দেখে তমলুকে এসে রাত্রিবাস করতে পারেন। তমলুকে কোর্টের কাছে শ্রীনিকেতন এবং হাসপাতালের পাশে ক্লাসিক-লজ রাত্রিবাসের উপযোগী সুন্দর হোটেল।

তমলুক পরিক্রমা সেরে পরদিন একটা ট্যাক্সি ভাড়া নিয়ে সারাদিনে ময়নাগড়, শান্তিধাম, মহিষাদল ও গেঁওখালি দেখে হলদিয়াতেও রাত্রিবাস করা যায়। সুতরাং ময়নাগড় পরিক্রমা শেষে চলুন আমরা মহিষাদল যাই।

মহিষাদল

তাম্রলিপ্তের রমরমার কালে মহিষাদল ছিল না। এ অঞ্চল তখন সমুদ্রের তলায়। তারপর খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী নাগাদ বঙ্গোপসাগরে চড়া পড়তে শুরু করল। ধীরে ধীরে চর জেগে উঠল তাম্রলিপ্তের সন্নিকটস্থ বঙ্গোপসাগরে। সদ্যজাগ্রত পলিজমা চরে মাথা তুলে দাঁড়াল গহন অরণ্য। মূল ভূ-ভাগ থেকে রাখাল বালকেরা আসত গোরু-মহিষ চরাতে। এখন যেমন অনেকেই আসে নয়াচরে বা মীনদ্বীপে মহিষ চরাতে। সে সময় মহিষের দল চরে বেড়ানো এই জায়গার নাম হয় 'মহিষাদল'। আবার অনেকে মনে করেন মাহিষ্য-জাতির রাজা এখানে রাজত্ব করতেন বলে এর নাম 'মহিষাদল'। এ ছাড়া এই অঞ্চল মূলত মাহিষ্য জাতি অধ্যুষিত বলে অনেকে এই জায়গার নাম মহিষাদল হয়েছে বলে মনে করেন।
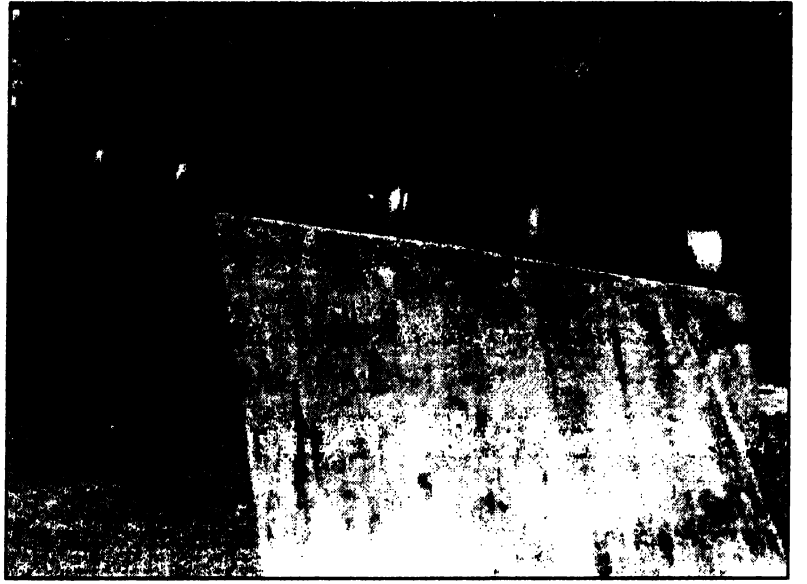
রাজবাড়ির কামান, মহিষাদল ছবি : লেখক
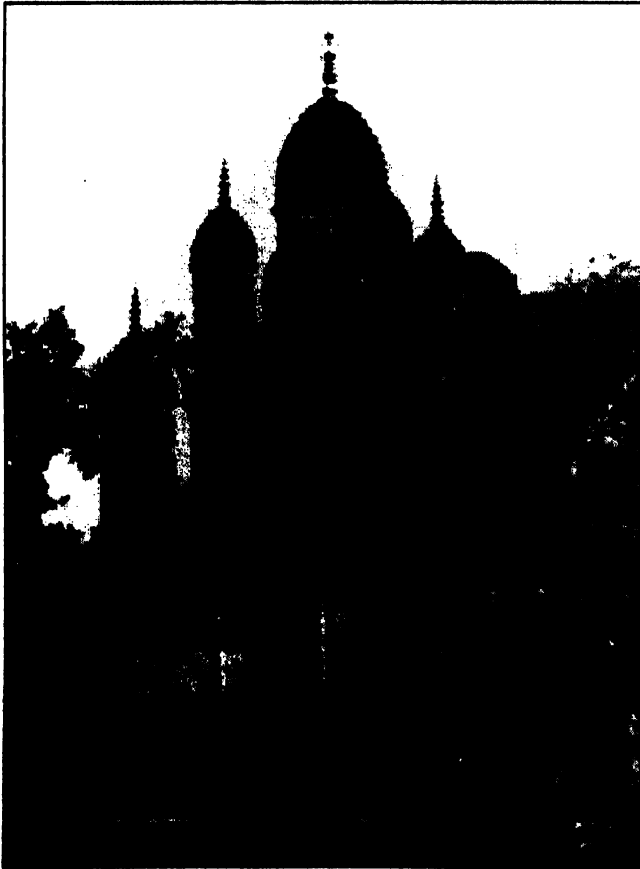
গোপালজীউ মন্দির, মহিষাদল ছবি : লেখক

মহিষাদলের বাসস্ট্যাণ্ড থেকে পাঁচ মিনিট পশ্চিমদিকে হাঁটলে পড়বে মহিষাদল রাজার গড়। মহিষাদল রাজবংশের আদিপুরুষ জনার্দন উপাধ্যায় ছিলেন উত্তরপ্রদেশের অধিবাসী। তিনি ব্যবসা করতে এসেছিলেন গেঁওখালি বা গেঁওয়াখালি। এই জনার্দনের প্রপৌত্র রাজারাম মুর্শিদকুলি খাঁর রাজত্বকালে ১৭০১ থেকে ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনও এক সময় রাজসনদ প্রাপ্ত হন। প্রায় ৩০০ বছর ধরে একই রাজবংশ মহিষাদলে রাজত্ব করেন। ১৯৫৩ সালে জমিদারি প্রথা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সে রাজত্বের অবসান ঘটে। রাজাদের বসবাসের জন্য তৈরি হয়েছিল পরিখাযুক্ত গড় বা দুর্গ এই মহিষাদলেই। এই গড় বা দুর্গ বানানো হয়েছিল প্রায় একশো একর জায়গা জুড়ে। এখন অবশ্য সব অবহেলায়, অযত্নে মলিন। তবু এটা আজও ভ্রমণার্থীদের আকর্ষণ করে। পিকনিক স্পট হিসাবে আজও এই গড় অনবদ্য। এককালে এই গড়ে বহু চলচ্চিত্রের দৃশ্যগ্রহণ করা হয়েছে। এখানে দর্শনীয় হল, নবরত্নবিশিষ্ট গোপাল জিউর মন্দির, পুরাতন রাজবাড়ি, নতুন রাজবাড়ি ও কামানপোতা। পুরাতন রাজবাড়ি তৈরি হয় ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে। নতুন রাজবাড়ি নির্মিত হয় ১৯৩৪ সালে। গোটা গড়টাই পরিখাবেষ্টিত। এই রাজপরিবারের শেষ রাজা কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ উচ্চাঙ্গ সংগীতের জগতে ভারত বিখ্যাত।

মহিষাদলের এই প্রাচীন দুর্গ বা গড়ের ভিতর সবচেয়ে পুরাতন সৌধ হল গোপাল জিউর মন্দির। মন্দিরটি পূর্বমুখী এবং নবরত্নবিশিষ্ট। এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রানি জানকী। মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে ৩৮ ফুট [১১.৬ মিটার] করে এবং উচ্চতায় প্রায় ৭০ ফুট [২১.৩ মিটার]। এ রকম বিরাটকায় মন্দির মেদিনীপুর জেলায় খুব কমই আছে। মহিষাদলের নতুন বাজার এলাকায় আছে আটকোনা সতেরো চূড়াবিশিষ্ট এক বিরাটাকার রাসমঞ্চ। এটি নির্মিত হয় ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে। নির্মাণ করেন রাজা জগন্নাথ গর্গের পত্নী ইন্দ্রাণী দেবী। রাসমঞ্চের প্রতিষ্ঠালিপি থেকে এগুলি জানা গেছে।

মহিষাদল রাজবাড়ির অস্ত্রাগারে আছে দুটি মূল্যবান প্রত্ন-নিদর্শন। একটি হল বৈরাম খাঁর নামাঙ্কিত একটি তরবারি এবং অপরটি হল কবি ফারদৌসী রচিত মোঘলযুগের চিত্রকলা সমন্বিত 'শাহনামা' গ্রন্থ।

তমলুক থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে মহিষাদল। বাসে সময় নেয় আধঘণ্টা। তমলুক থেকে দশ মিনিট অন্তর বাস যাচ্ছে মহিষাদলের। তবে এই সব বাসের গন্তব্য হল হলদিয়া কিংবা তেরপেখ্যা কিংবা গেঁওখালি। তমলুক ভ্রমণার্থীরা তমলুক দেখে তারপর ময়নাগড়, মহিষাদল এবং গেঁওখালি পরিক্রমা সেরে হলদিয়া যেতে পারেন।

গেঁওখালি

রূপনারায়ণ ও হুগলি তথা গঙ্গানদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত গেঁওখালি একালের ছোটোখাটো নদী-বন্দর। জব চার্নক যখন ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় নতুন করে জাঁকিয়ে বসছেন, গেঁওখালির তখন কৈশোর। এই সময় মহিষাদল রাজবংশের আদিপুরুষ জনার্দন উপাধ্যায় বাণিজ্যার্থে নাটশাল ও গেঁওখালী গ্রাম দুটির বন্দোবস্ত নেন। গেঁওয়া গাছের আধিক্য থাকায় এই জায়গার নাম হয় 'গেঁওখালি'। ১৯৫০ সাল অবধি গেঁওখালি গঞ্জের নামডাক ও ব্যবসা-বাণিজ্য ফলতা, কলকাতা, হাওড়া, ডায়মন্ডহারবার, সুন্দরবন, কাঁথি, কাকদ্বীপ, দীঘা, বালেশ্বর প্রভৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবেই জড়িত ছিল। সোমবার ও শুক্রবার বাজার বসত প্রতি সপ্তাহে। অসংখ্য পণ্যবাহী নৌকার ভিড় জমত নদীতে। এখন সে রমরমা আর নেই। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ঘাটতি হয়নি এতটুকুও। দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশি বয়ে চলেছে সাগরের পানে। কলকাতা থেকে সমুদ্রে যাতায়াত করছে আধুনিক জাহাজ। হুগলি নদীর ওপারে অর্থাৎ পূর্বতীরে নূরপুর। রূপনারায়ণের উত্তর তীরে ওপারে গাদিয়াড়া—সরকার-স্বীকৃত এক পর্যটন-কেন্দ্র। গাদিয়াড়ায় যা আছে গেঁওখালিতে আছে তার চেয়ে বেশি। দুই নদীর সঙ্গমস্থলে তিনটি জেলা মুখোমুখি—মেদিনীপুর [গেঁওখালি], হাওড়া [গাদিয়াড়া] ও দক্ষিণ ২৪-পরগনা [নূরপুর]। গেঁওখালির সৌন্দর্য এ তিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভ্রমণার্থীরা গেঁওখালিতে রাত্রিবাস করতেও পারেন। কিংবা গেঁওখালি দেখে চলে যেতে পারেন হলদিয়ায়।

গেঁওখালি বাসস্ট্যান্ড থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে রূপনারায়ণের তীরে সেচ দপ্তরের একটা সুন্দর বাংলো রয়েছে। মেদিনীপুরের একসিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অনুমতি নিয়ে এখানে রাত্রিবাস করা যায় নামমাত্র ভাড়ায়। আবার বাসস্ট্যান্ড থেকে প্রায় দু-কিলোমিটার দূরে হুগলি নদীর তীরে নির্মিত হয়েছে হলদিয়া জলসরবরাহ প্রকল্প। বিশাল আয়োজন। ওরই পাশে গঙ্গার ধারে 'হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' [Haldia Development Authority] বানিয়েছে 'ত্রিবেণীসঙ্গম ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স' ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে। এখানে থাকা-খাওয়া দুই-ই সুন্দর। রকমারি নামের ঘর রয়েছে ত্রিবেণীতে। এখানে থেকে সূর্যোদয় দেখুন হুগলির জলরাশির ওপরে। আর সূর্যাস্ত দেখুন মাঠের ওপারে এবং সে সময় নদীতে দেখুন অসংখ্য পালতোলা নৌকার আনাগোনা। পালের নাও তার রঙিন পালে মুছে নিচ্ছে সূর্যাস্তের রং, দিনশেষের রোদ। সব মিলিয়ে গেঁওখালি মাধুর্যময়।

গেঁওখালি থেকে লঞ্চে নদী পেরিয়ে নূরপুর হয়ে চলে যাওয়া যায় কলকাতা। কিন্তু আমাদের পরিক্রমায় এবার আমরা যাব হলদিয়া। মহিষাদল হয়েই যেতে হবে। গেঁওখালি থেকে মহিষাদল ৮ কিমি, হলদিয়া ৪২ কিমি এবং তমলুক ২৪ কিলোমিটার।

হলদিয়া

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বন্দরনগরী হলদিয়া। অদূর ভবিষ্যতে বাংলার শ্রেষ্ঠতম শিল্পনগরী হয়ে ওঠার আশা নিয়ে গড়ে উঠছে অতি দ্রুত লয়ে। ষাটের দশকে বন্দর হিসাবে নির্মিতি দিয়ে এর অগ্রগতির শুরু। হলদি ও হুগলি নদীর সংগমস্থলে এই বন্দর তথা শিল্পনগরী গড়ে তোলার মূল হোতা ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। প্রথমে গড়ে ওঠে বন্দর। কলকাতার পরিপূরক বন্দর হয়ে হলদিয়ার আরম্ভ। এখন কলকাতাকেও ছাড়িয়ে গেছে হলদিয়া বন্দর। এর উপর শিল্পায়নের জোয়ার লেগেছে হলদিয়ায়। ফলে, এই বন্দর-নগরীর দ্রুত রূপায়ণ ঘটছে শিল্পনগরীতে। হলদিয়া এখন ধীরে ধীরে তাই হয়ে উঠছে এক পর্যটন-ক্ষেত্র। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সেরা ভ্রমণ-ক্ষেত্র।

হলদিয়া বন্দরের আয়তন ১৪.৫ বর্গমাইল। এখানে রয়েছে নয়টি জেটি। প্রথম জেটির নাম 'সতীশ সামন্ত অয়েল জেটি'। আরও দুটি জেটি খুব শিগগির কাজ শুরু করবে। এখন সারা বছরে এই বন্দরে ৭৫০টি জাহাজ ভিড়তে পারে। এর মাল পরিবহন ক্ষমতা গড়ে ১.৫ কোটি টন প্রতি বছরে। বন্দরের নিজস্ব রেলপথ রয়েছে। এই রেলপথের পরিবহন ক্ষমতা ৭০ লক্ষ টন প্রতি বছরে। বন্দর অঞ্চলে নির্মিত হয়েছে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের তৈল শোধনাগার, হিন্দুস্থান লিভারের কারখানা, শ'ওয়ালেসের কারখানা, ফ্লোরাইড কারখানা, কনসোলিডেটেড ফাইবারস কারখানা ইত্যাদি। নতুন কারখানাগুলির মধ্যে আছে পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা, মিৎসুবিশি কারখানা, চ্যাটার্জি অয়েল রিফাইনারি ইত্যাদি। প্রায় দশ হাজার কোটি টাকার নতুন কারখানাগুলি গড়ে উঠছে। এগুলি সম্পূর্ণ হলে হলদিয়া পশ্চিমবঙ্গের তথা পূর্ব ভারতের সেরা বন্দর-নগরী তথা শিল্পনগরী হয়ে উঠবে।

এখানে দর্শনীয়গুলি হল : বন্দর, শিশু-উদ্যান, হুগলি নদীর দিগন্ত বিস্তার, সামনের মীনদ্বীপ বা নয়াচর এবং দু-একটি পছন্দমত কারখানা। বন্দর দেখার জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। কারখানার ক্ষেত্রেও তাই। এখানে রাত্রিবাসের নানা মানের হোটেল আছে। এদের মধ্যে ইস্টকোস্ট,
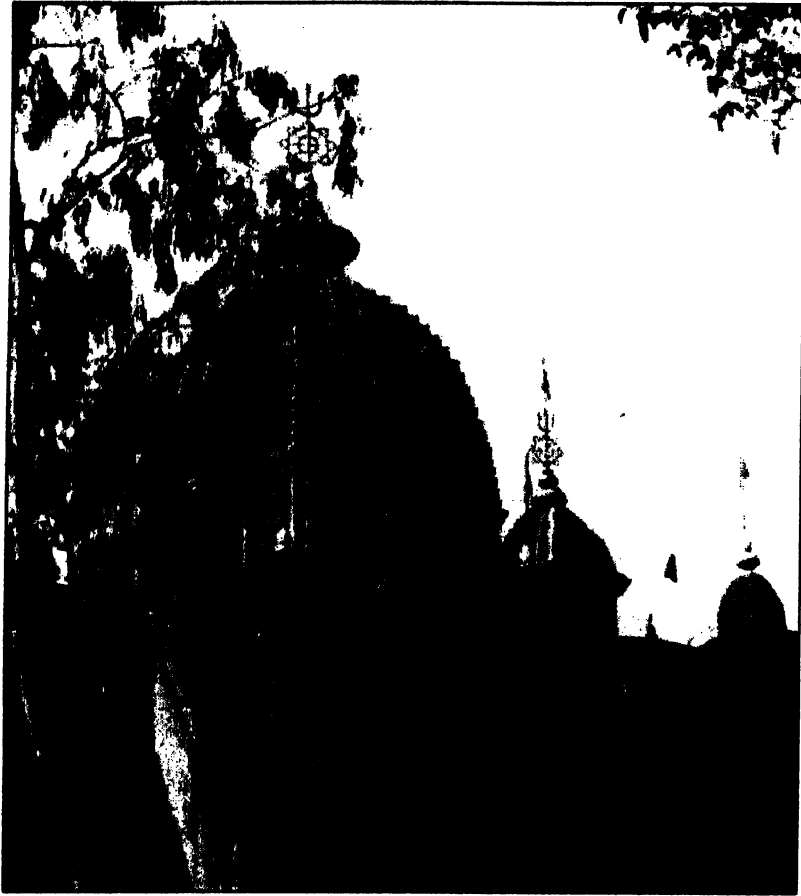
অষ্টাদশ শতাব্দীর পঞ্চরত্ন
মন্দির, উত্তমানন্দ আশ্রম,
ক্ষীরপাই ছবি : লেখক

শ্রীধর জীউর মন্দির
ঈশ্বরপুর থানা, ঘাটাল
ছবি : তারাপদ সাঁতরা

বালজি ইত্যাদি বিখ্যাত। হলদিয়া ভবন সরকারি ব্যবস্থাপনায় সুন্দর থাকার জায়গা। হুগলি নদীর তীরে এই ভবন ভ্রমণার্থীদের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয়।

কলকাতা থেকে সকালে এসে হলদিয়া দেখে রাত্রে কলকাতা ফেরা যায়। কলকাতা থেকে হলদিয়া ১৩৫ কিলোমিটার। সময় নেয় প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা একপিঠে। নিজেদের গাড়ি থাকলে ঘুরে দেখতে সুবিধা হয়। না থাকলে ধকল বেশি হয়, সময়ও বেশি লাগে। সারাদিন বাস যাতায়াত করছে হলদিয়া-কলকাতা বা হলদিয়া-হাওড়া। হলদিয়া রায়চক হয়ে আরেকটু কম সময়ে আসা যায়। তবে অনেকবার গাড়ি বদল করতে হয়। কলকাতা থেকে ক্যাটামারানে এসে হলদিয়া দেখে ক্যাটামারানেই আবার কলকাতা ফেরা যায় সেই দিনই। একপিঠে সময় নেয় ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। একপিঠের ভাড়াও ন্যূনতম ৫০০ টাকা যাত্রীপিছু। তমলুক পরিক্রমা করে যাঁরা হলদিয়া যাচ্ছেন তাঁরা হলদিয়ায় এক রাত্রি থেকে হলদিয়া দেখুন।

মেদিনীপুর পর্যটনে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য হল ঘাটাল মহকুমার ক্ষীরপাই। এবার চলুন আমরা ক্ষীরপাই যাই। হলদিয়া থেকে ক্ষীরপাই ১০৫ কিলোমিটার। সরাসরি বাস যায় ক্ষীরপাই হয়ে বর্ধমান, আসানসোল।

ক্ষীরপাই

ঘাটাল মহকুমার ক্ষীরপাই এখন একটা অখ্যাত গঞ্জ মাত্র। অথচ ক্ষীরপাই এককালে ছিল মহকুমা শহর। সে সময় চন্দ্রকোণা, ঘাটাল প্রভৃতি হুগলি জেলার অন্তর্গত ছিল। এই অংশ এবং হুগলি জেলার কিছুটা নিয়ে ক্ষীরপাই মহকুমা গঠিত হয়। পরে ক্ষীরপাই থেকে মহকুমা কার্যালয় জাহানাবাদে উঠে যায়। এই জাহানাবাদই বর্তমানে আরামবাগ। ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, ঘাটাল ইত্যাদি মেদিনীপুর জেলায় সংযুক্ত হয়। ক্ষীরপাইয়ে এই সময় জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় এখানে মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ক্ষীরপাই ব্যবসা-বাণিজ্যের বিখ্যাত ঘাঁটি ছিল। এখানের সুতিবস্ত্র ও অন্যান্য হস্তশিল্পজাত জিনিসপত্র বিদেশে রপ্তানি হত। ব্রিটিশ আমলে ক্ষীরপাই নীলচাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। নীলচাষের জন্য বাধ্য করায় সুতিবস্ত্র ইত্যাদি তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষীরপাই এরপর তার রমরমা হারিয়ে অখ্যাত গঞ্জে পরিণত হয়।

ক্ষীরপাইয়ের বর্তমান আয়তন ১২ বর্গকিলোমিটার। এখন এর জনসংখ্যা প্রায় এগারো হাজার। এর মালপাড়ায় ঘাটাল-ক্ষীরপাই রাস্তার ধারে রয়েছে 'রাধাদামোদর মন্দির'। বাসস্ট্যান্ড থেকে প্রায় দেড় কিমি। পঞ্চরত্ন মন্দির। মন্দিরের জীর্ণদশা, কিন্তু এর অনবদ্য টেরাকোটাগুলি প্রায় অটুট। খিলানশীর্ষে যেসব টেরাকোটা আজও মুগ্ধ করে তাতে রয়েছে, কৃষ্ণলীলা, দশাবতার এবং রাম-রাবণের যুদ্ধ দৃশ্য। শিকারদৃশ্য এবং ফুলের নকশাগুলিও দর্শনীয়। মন্দিরের নির্মাণকাল ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ। মন্দিরের সংরক্ষণ কেউ করছে কিনা জানি না। তবে এর সংরক্ষণ খুবই জরুরি।

এই মন্দিরের কিছুটা উত্তরে 'খড়্গেশ্বর শিবমন্দির'। দক্ষিণমুখী এবং আটচালারীতির এই মন্দিরে রয়েছে টেরাকোটা এবং পঙ্খের কাজ। মন্দিরটি সংস্কারের পর নতুন রূপ পেয়েছে। ১৮৬১ সালে এটি নির্মিত হয়। এখান থেকে প্রায় দেড় কিমি দূরে গঙ্গাদাসপুর গ্রামে রয়েছে একটা আটচালা শিবমন্দির। নাম 'উমাপতি শিবমন্দির'। মন্দিরটি উনবিংশ শতাব্দীর। এখানে পঙ্খের কাজ আছে, আছে টেরাকোটাও। মন্দিরে রক্ষিত আছে দশম-একাদশ শতাব্দীর কষ্টিপাথরের এক সূর্যমূর্তি।

রাধাদামোদর মন্দির দৈর্ঘ্যপ্রস্থে সাড়ে ১৫ ফুট (৪.৭ মিটার) ও উচ্চতায় ২৭ ফুট (৮.২ মিটার)। খড়্গেশ্বর শিবমন্দির দৈর্ঘ্যে ২৩ ফুট (৭.১ মিটার), প্রস্থে ২১ ফুট ৪ ইঞ্চি (৬.৫ মিটার) এবং উচ্চতায় ৩০ ফুট (৯.২ মিটার)। গঙ্গাদাসপুরের উমাপতি শিবমন্দির দৈর্ঘ্যে ২২ ফুট ৪ ইঞ্চি (৬.৮ মিটার), প্রস্থে ২০ ফুট ৫ ইঞ্চি (৬.২ মিটার) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭ ফুট (৮.২ মিটার)।

ক্ষীরপাইয়ের হাটতলায় আছে পানি পরিবারের শীতলানন্দ জিউর এক বড়োসড়ো মন্দির। এটি দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দির। কিছু পোড়ামাটির কাজও আছে এই মন্দিরে। মন্দিরটি ১৮৩৯ সালে নির্মিত। এটি দৈর্ঘ্যে ২১ ফুট (৬.৪ মিটার), প্রস্থে ১৮ ফুট ৮ ইঞ্চি (৫.৭ মিটার) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট (৯.২ মিটার)। আবার 'পাহাড়ি-পাড়া'-য় আছে 'দালান-মন্দির' সিংহবাহিনীর। মন্দিরটি ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দের। এটি সম্ভবত ক্ষীরপাইয়ের প্রাচীনতম মন্দির। ক্ষীরপাই-ঘাটাল রাস্তায় ধারে পড়ে 'উত্তমানন্দ আশ্রম'। এই আশ্রমে রয়েছে একটি পঞ্চরত্ন মন্দির। মন্দিরটি অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তৈরি। কিন্তু উত্তমানন্দ আশ্রম থেকে এটিকে এমনভাবে সারানো হয়েছে যে, এটি শ্রীমণ্ডিত হয়েছে। এর প্রাচীনত্বের মালিন্য আর নেই। শহরের দক্ষিণ-পূর্বে গায়েনপাড়ায় চৌধুরী পরিবারের 'লক্ষ্মী-জনার্দন' মন্দির। এতে রয়েছে বেশ কিছু টেরাকোটার অলঙ্করণ। টেরাকোটায় রয়েছে দশাবতার, কৃষ্ণলীলা এবং রাম ও হনুমান সম্পর্কিত রামায়ণ-কাহিনি। মন্দির দক্ষিণমুখী, দালানরীতির। ভিত্তিবেদিতে নিবদ্ধ আছে সাহেবের তামাকু সেবন এবং বন্দুকধারী সাহেবদের মিছিল ইত্যাদি দৃশ্যের পোড়ামাটির ফলক। মন্দিরের কাঠের দরজায় খোদিত রয়েছে রামসীতা, হনুমান, লক্ষ্মী, বিষ্ণু প্রভৃতির মূর্তি। এই মন্দির দৈর্ঘ্যে ১৬ ফুট (৪.৯ মিটার), প্রস্থে ১২ ফুট (৩.৭ মিটার) এবং উচ্চতায় ১৩ ফুট (৪ মিটার)। ভিত্তিবেদির উচ্চতা ৫ ফুট (১.৫ মিটার)।

ক্ষীরপাই শহরের দক্ষিণ-পূর্বে অনতিদূরে এক বিশাল দিঘি। এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আছে কিছু ঘরবাড়ির ভগ্নাবশেষ। এগুলি এককালে ছিল ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যকুঠি। আবার কাশীগঞ্জ অঞ্চলে আছে 'নীলডাঙ্গা'। সহজেই বোঝা যায়

পেলে বগড়ি, চন্দ্রকোণা ইত্যাদি ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠে। ষোড়শ শতাব্দীতে যে রাজবংশ চন্দ্রকোণায় আধিপত্য বিস্তার করে, তার শেষ রাজা ছিলেন চন্দ্রকেতু। এরপর বগড়ির চৌহান রাজারা চন্দ্রকোণায় আধিপত্য করেন। দ্বাদশ দ্বারী দুর্গটি চারিদিকে সুপ্রশস্ত ও সুগভীর পরিখাবেষ্টিত ছিল। এখন দুর্গের কিছু পাথর ছাড়া আর কিছুই নেই। দুর্গ বিশাল আয়তনের ছিল। লোকে এখানের একটা ঢিবি দেখিয়ে বলে 'কর্পূরতলা' অর্থাৎ 'কোষাগার'। কোনও এক সময় হয়তো এখানে সত্য-সত্যই কোষাগার ছিল।

চৌহানবংশীয় রাজাদের আমলে চন্দ্রকোণার পশ্চিম প্রান্তে রামগড় ও লালগড় নামে দুটি দুর্গ তৈরি হয়েছিল। ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে রামগড় দুর্গে রঘুনাথ জিউর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রাচীন দ্বাদশ-দ্বারী দুর্গ থেকে গিরিধারী জিউকে এনে লালগড় দুর্গে স্থাপন করা হয়। গিরিধারী জিউর নতুন এক নবরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। রামগড় দুর্গ ধ্বংস হলে রঘুনাথ জিউর মূর্তিকে তাঁর মন্দির থেকে নতুন মন্দিরে আনা হয়। নতুন সুদৃশ্য মন্দির তৈরি হয় ওই রামগড় দুর্গের কাছেই। পরবর্তীকালে লালগড় দুর্গের অভ্যন্তরস্থ নবরত্ন মন্দিরটি ভেঙে পড়লে গিরিধারী জিউর মূর্তি আবার স্থানান্তরিত হয়। রঘুনাথ জিউর নতুন মন্দিরের পাশে আর একটি নতুন মন্দির বানিয়ে গিরিধারীজিকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। লালগড় থেকে স্থানান্তরিত হওয়া গিরিধারীজি খ্যাত হন 'গিরিধারীজিউ-লালজিউ' নামে। লালজিউর এই মূর্তি এখন আবার স্থানান্তরিত হয়েছে বাজারের মধ্যে নতুনতর মন্দিরে। এর ঠিক আগের মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৩৭ ফুট (১১.২ মিটার), প্রস্থে ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চি (৭.২ মিটার) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট (১২.২ মিটার)। মন্দিরটি ঝামাপাথরের, আটচালা স্থাপত্যরীতির এবং মন্দির শীর্ষে প্রধান তিনটি আমলক ও কলসের সংস্থাপনা বেশ কিছুটা অভিনব। খুবই জীর্ণদশা মন্দিরের। মন্দিরের গায় পঙ্খরীতিতে দশাবতার ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি বিদ্যমান। এই লালজি মন্দির চত্বরে অবস্থিত ভোগমণ্ডপটি দালানরীতির হলেও এর চাল রত্ন-মন্দিরের মতো করে এক নতুন ধরনের রীতিতে বানানো। এই ভোগমণ্ডপও বেশ দর্শনীয়। এর দৈর্ঘ্য ২৯ ফুট (৮.৮ মিটার), প্রস্থ ২২ ফুট (৬.৭ মিটার) ও উচ্চতা প্রায় ২৩ ফুট (৭ মিটার)। লালগড় দুর্গের পুরাতন নবরত্ন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ফলক বলছে, ১৬৫৫ সালে রাজা হরিনারায়ণের পত্নী রানী লক্ষ্মণাবতী, যিনি বীর ভানের পুত্রবধূ হোলরায়ের কন্যা ও নারায়ণ মল্লরাজের ভগিনী এবং মিত্রসেনের মাতা, তিনি ওই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। সুতরাং মূর্তি বহু পুরনো। ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দের আগে গিরিধারীজিউ-লালজিউ মূর্তি স্থাপিত ছিল দ্বাদশ-দ্বারী দুর্গে। লালজির এই মন্দিরটি বিষ্ণুপুর ঘরানার অনুকরণে তৈরি। বঙ্গীয় শিল্পরীতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

রঘুনাথজিউ মন্দির পুরোপুরি উৎকল রীতি অনুসরণ করে নির্মিত। বিশাল দেউল এবং জগমোহন তো আছেই। আছে নাটমণ্ডপও। এই নাটমণ্ডপটিকে অবশ্য লালজি মন্দিরের ভোগমণ্ডপ বলা হয়েছে। মন্দির অঙ্গনের প্রবেশ তোরণটি বেশ সুন্দর অলঙ্করণসমৃদ্ধ। দেউল সপ্তরথ শিখর দেউল। জগমোহন পীঢ়ারীতির। মন্দির পূর্বমুখী। মূল মন্দিরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ১৫ ফুট ৬ ইঞ্চি (৪.৭ মিটার) এবং উচ্চতা ৮২ ফুট (২৫ মিটার)। এই মন্দিরের নির্মাণকাল ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দ বলে মনে করা হয়। রঘুনাথজির মূর্তি এই মন্দিরে আসার আগে ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে রামগড় দুর্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রবেশ তোরণের সামনের চত্বরে উত্তরমুখী ঝামাপাথরের এক পঞ্চরত্ন মন্দির। এটি 'রামেশ্বর শিব'মন্দির। নির্মাণকাল ওই ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দ। তবে প্রতিষ্ঠালিপিতে বলা হয়েছে ১৭৬৫ সালে বর্ধমানরাজ এটি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১৬ ফুট (৪.৯ মিটার) এবং উচ্চতায় ২৭ ফুট (৮.২ মিটার)। এরই কাছাকাছি আছে রাসমঞ্চ এবং দুটি কামান। এর পরেই বিশাল প্রাচীরবেষ্টিত রঘুনাথ জিউ ও লালজিউর মন্দির। সুতরাং রঘুনাথজি, লালজি, রামেশ্বর মহাদেব মন্দিরসমূহ এবং রাসমঞ্চ ইত্যাদি মিলে সৃষ্টি হল 'রঘুনাথগড় ঠাকুরবাড়ি' বা 'রঘুনাথ ঠাকুরবাড়ি' বা 'রঘুনাথবাড়ি'। যে গ্রামে এটি অবস্থিত তার নাম 'অযোধ্যা'। ১৮৩১ সালে তদানীন্তন বর্ধমানরাজ মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুর এই গড়, এইসব মন্দির সংস্কার করেন এবং তাদের পুরাতন রূপ ফিরিয়ে আনেন। এখন এগুলি ছন্নছাড়া এবং রক্ষণাবেক্ষণহীন।

রঘুনাথবাড়ির সামনে লালজি ও রঘুনাথজির কারুকার্যখচিত দুটি রথ আছে। দশহরায় এখানে রথযাত্রা হয়। বিশাল মেলা বসে। রঘুনাথজির পুষ্যা উৎসব উপলক্ষেও বিশাল মেলা বসে চন্দ্রকোণায়। এখানে বিশাল আকারের দিঘি রয়েছে বেশ কয়েকটি। এগুলির প্রত্যেকটিরই কোনও না কোনও ইতিহাস আছে। চন্দ্রকোণার রমরমাকালে বিশাল শহরের জলসমস্যা সমাধান করত এইসব দিঘি। এদের মধ্যে বিখ্যাত হল 'শিমসায়র' (শ্যামসাগর), 'রণসায়র' (রানীসাগর), জহরদিঘি, রাজার মার পুকুর, রামসায়র ইত্যাদি। রাজার মার পুকুর সম্ভবত রাজমাতা লক্ষ্মণাবতীর প্রতিষ্ঠিত।

রঘুনাথবাড়ির পাশে রঘুনাথপুর এলাকা। সেখানে আছে দক্ষিণমুখী ঝামাপাথরের দালান মন্দির 'রাধামদন-গোপালজিউ'-র। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি নির্মিত এই দৈর্ঘ্যে সাড়ে ১৯ ফুট (৫.৯ মিটার), প্রস্থে সাড়ে ১২ ফুট (৩.৯ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩ ফুট (৪ মিটার)। এই মন্দিরের পূর্বে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের দক্ষিণমুখী 'রাধাবল্লভ' মন্দির। চারচালা মন্দিরটি ঝামাপাথরের এবং প্রায় তিনশো বছরের পুরনো। উচ্চতা প্রায় ১৭ ফুট (৫.২ মিটার)।

রঘুনাথপুর এলাকায় 'পার্বতীনাথ' শিবের দক্ষিণমুখী মন্দির। এর সতেরটি চূড়া। এটি ইটের তৈরি। মন্দিরের প্রবেশপথের উপর পঙ্খসজ্জা। কার্নিসের নীচে ও খিলানের দুই পাশে প্রথাগত 'টেরাকোটা'-র অলঙ্করণ। পশ্চিম দেওয়ালে বহু

দেবদেবীর মূর্তি আঁকা হয়েছে পদ্মপদ্ধতিতে। এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ২১ ফুট ৮ ইঞ্চি (৬.৬ মিটার) এবং উচ্চতা প্রায় ৬৬ ফুট (২০ মিটার)। এটি কমপক্ষে ১৭৫ বছরের পুরনো মন্দির। এরপর রাধাকৃষ্ণপুর এলাকায় আছে রামচন্দ্র জীউর ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত মন্দির। কিছু টেরাকোটার কাজও আছে মন্দিরে। ঠাকুরবাড়ি বাজার এলাকায় ঝামাপাথরের ২৭ ফুট (৮.২ মিটার) উচ্চতাবিশিষ্ট পঞ্চরত্ন মন্দিরটি 'মাসির বাড়ি'। রঘুনাথবাড়ির সব বিগ্রহই এখানে রাখা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই মন্দিরটি নির্মিত।

এছাড়া গোবিন্দপুর এলাকায় আটচালা 'খলশা শিব' মন্দির (১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ), ইলামবাজার এলাকায় 'শান্তিনাথ শিব' মন্দির, চাবড়ি পরিবারের 'রাধাগোবিন্দ মন্দির' (১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ), গাজিপুরের 'রঘুনাথ মন্দির', মিত্রসেনপুরের ধর্মরাজের উত্তরমুখী পঞ্চরত্নবিশিষ্ট ইটের মন্দির (১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি দর্শনীয়। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হল 'শান্তিনাথ' শিবের দক্ষিণমুখী নবরত্ন মন্দির। এর দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ২০ ফুট (৬.১ মিটার) এবং উচ্চতা ৪০ ফুট (১২.২ মিটার)। লালবাজার এলাকায় 'রাধারসিক রায়' মন্দিরটি নবরত্ন। এটির গঠন এমনই যে একে পঁচিশ-চূড়া মন্দির বলে মনে হয়। বিশাল এই মন্দিরটি পদ্ম ও টেরাকোটার অলঙ্করণে সজ্জিত। এর রাসমঞ্চ এবং নহবতখানাটিও দর্শনীয়। আরও বহু মন্দির আছে মন্দিরময় চন্দ্রকোণায়।

মল্লেশ্বর ও উজন্নাথ শিবলিঙ্গের কথা বলে চন্দ্রকোণার মন্দির প্রসঙ্গ শেষ করা যাক। মুসলমান সেনাপতি কালাপাহাড়ের হাত থেকে বাঁচাতে মল্লেশ্বরকে পাথর দিয়ে ঢেকে দেন তখনকার ব্রাহ্মণেরা। আর উজন্নাথকে ওঁরা রেখে দেন বটগাছতলায়। কালাপাহাড় মন্দির দুটি ধ্বংস করে, কিন্তু মূর্তিদুটি রক্ষা পায়। মল্লেশ্বরের নতুন মন্দির বানানো হয় ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে। বানান বর্ধমানরাজ তেজচাঁদ। এটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ২৬ ফুট (৭.৯ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট (১২.১ মিটার)। এই পঞ্চরত্ন মন্দিরটির এখনই সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু উজন্নাথ শিবলিঙ্গ আজও গাছতলায় পড়ে আছেন, মল্লেশ্বর মন্দিরের খুব কাছেই। তাঁর মন্দির আর নতুন করে বানানো হয়নি।

চন্দ্রকোণা পরিক্রমায় প্রায় ৫-৬ ঘণ্টা সময় লাগে। একটা রিকশা ভাড়া করে ঘোরাই শ্রেয়। চন্দ্রকোণা পরিক্রমার পর মনে হয় এটাকে আজও পর্যটনক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তোলা যায়নি কেন? একটু নজর দিলে এবং উদ্যোগ নিলে চন্দ্রকোণা মুর্শিদাবাদ, গৌড়-পাণ্ডুয়া এবং বিষ্ণুপুরের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে নিতে পারে। চন্দ্রকোণাকে আকর্ষণীয় পর্যটনক্ষেত্র বানানো যায় খুব সহজেই।

মেদিনীপুর শহর থেকে উত্তর দিকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে চন্দ্রকোণা। সারাদিন বাস যাতায়াত করছে। আবার খড়্গাপুর-আদ্রা রেলপথে চন্দ্রকোণা রোড স্টেশন নেমে বাস ধরেও চন্দ্রকোণা শহরে আসা যায়। দূরত্ব প্রায় ১৮ কিমি। মেদিনীপুর থেকে সকালে বেরিয়ে চন্দ্রকোণা পরিক্রমা সেরে সন্ধ্যাবেলায় মেদিনীপুর ফিরে আসা যায়। উৎসাহী ভ্রমণার্থীরা অবশ্য চন্দ্রকোণায় একরাত কাটাতেও পারেন। একটা ভালো লজ আছে। চন্দ্রকোণা পরিক্রমা শেষে এবার আমরা যাব গড়বেতা—বগড়ি রাজ্যের এককালের রাজধানী।

গড়বেতা

প্রাচীনকালে গড়বেতা ছিল এক উন্নত জনপদ এবং নগরী। এখন অবশ্য একে শহর না বলে গঞ্জ বলাই ভাল। তবে বড়োসড়ো গঞ্জই বলা যায়। মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়া যাওয়ার রাজ্য সড়ক গড়বেতার উপর দিয়েই গেছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়্গাপুর-আদ্রা শাখায় গড়বেতা একটি স্টেশন। পুরনো পরগনা বিভাগ অনুসারে গড়বেতা বগড়ি পরগনায় অবস্থিত। 'বগড়ি' শব্দটি 'বকডিহি' শব্দের অপভ্রংশ। বকডিহি বহু প্রাচীন গ্রন্থে 'বকদ্বীপ' নামে অভিহিত। অর্থাৎ প্রাচীন 'বকদ্বীপ', পরবর্তীকালে 'বকডিহি' এবং একালে বগড়ি। মহাভারতের বক-রাক্ষসের কাহিনির সঙ্গে গড়বেতা তথা বগড়ির নিবিড় যোগাযোগ।

পাণ্ডবগণ জতুগৃহদাহের পর বিদুর প্রেরিত যন্ত্রচালিত নৌকাযোগে গঙ্গা পার হয়ে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয়ে এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করেন। সেখানে 'একচক্রা' গ্রামে কিছুদিন বাস করেন। এই প্রদেশ বক নামের এক রাক্ষসের অধিকারভুক্ত ছিল। বক-রাক্ষস প্রতিদিন এক-একটি মানুষ বধ করে আহার করত। ঘটনাচক্রে মধ্যম পাণ্ডব ভীমের সঙ্গে বকরাক্ষসের প্রবল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বকরাক্ষস নিহত হয়। বর্তমান গড়বেতার প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে কৃষ্ণনগরে বগড়ির প্রসিদ্ধ 'কৃষ্ণরায় জিউর মন্দির।' কৃষ্ণনগর গ্রামের পাশেই 'একচক্রা' গ্রাম, যার একালের নাম 'একারিয়া'। লোকে এখনও একারিয়া গ্রামের একটা জায়গা দেখিয়ে বলে যে, জননী কুন্তীর সঙ্গে পাণ্ডবেরা এখানে থাকতেন। একচক্রা বা একারিয়ার পাশেই 'ভিকনগর' গ্রাম। এই গ্রামেই নাকি পাণ্ডবেরা ভিক্ষা করতেন। আবার শিলাবতী নদীর দক্ষিণে গড়বেতার পথে পড়ে এক বিস্তীর্ণ মাঠ। এর নাম 'গনগনির ডাঙা'। জনশ্রুতি হল, এই মাঠেই ভীমের সঙ্গে বকরাক্ষসের যুদ্ধ হয়। এই মাঠে কিছু বিশাল বিশাল হাড়ের মতো দেখতে ফসিল (Fossil) রয়েছে। লোকে এগুলিকে বলে বকরাক্ষসের হাড়। আসলে এগুলি অশ্মীভূত বৃক্ষকাণ্ড (Fossilized Wood), যেগুলি সাদা রংবিশিষ্ট হওয়ায় সাধারণ মানুষের কাছে তা বকরাক্ষসের হাড় হয়ে গেছে। বকরাক্ষসের এই মহাভারতীয় কাহিনি আসলে আর্য ভীমসেনের হাতে এই অঞ্চলের অনার্য অধিবাসীদের রাজার পরাজয়ের কাহিনি। আর্যাবর্তের সেকালের মনীষী তথা ঋষিগণ বঙ্গের অধিবাসীদের পিশাচ, অসুর রাক্ষস ইত্যাদি বলেছেন সেই বৈদিক আমল থেকেই। অনার্য বকরাজ তাই তাঁদের কাহিনিতে বকরাক্ষস।

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই বকদ্বীপ বা বকডিহি প্রদেশে 'বগড়ি-রাজ্য' নামে এক প্রায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গজপতি সিংহ নামে এক রাজপুত অনার্য দলপতিদের জয় করে বগড়ি রাজ্য স্থাপন করেন। বগড়ি ও চন্দ্রকোণা এই দুই রাজ্যের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। বগড়ি রাজাদের রাজধানী ছিল এই গড়বেতা। পরবর্তীকালে রাজধানী গোয়ালতোড়ে স্থানান্তরিত হয়। গড়বেতা রাজবংশের উত্তরসুরিরা এখন মঙ্গলপোতা গ্রামে থাকেন। গড়বেতার প্রাচীন রমরমা আজ আর নেই। বগড়ির অন্যতম স্বাধীন রাজা তেজচন্দ্র 'রায়কোটা' দুর্গ বানিয়েছিলেন গড়বেতায়। এই দুর্গ এখন ইটের ঢিবি হয়ে গেছে। শিলাবতী নদীর পূর্বতীরে এই ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই দুর্গের কামানগুলি বিভিন্ন জায়গায় সংরক্ষিত। দুর্গ-প্রাকারে চারটি বিশাল দরজা। উত্তরে লালদরজা, পূর্বে রাউতা দরজা, দক্ষিণে পেশা দরজা ও পশ্চিমে হনুমান দরজা। এখন এগুলির ভগ্নাবশেষমাত্র রয়েছে। এই দুর্গে উত্তর দরজার সামনে জলটুঙ্গি, ইন্দ্র পুষ্করিণী, পাথুরিয়া, হাদুয়া, মঙ্গলা, কবেশদিঘি ও আম্রপুষ্করিণী নামে সাতটি পুষ্করিণী রয়েছে। প্রত্যেকটির মাঝখানে একটি করে জীর্ণ প্রস্তর নির্মিত মন্দির। এগুলি সম্ভবত চৌহানবংশীয় রাজাদের কীর্তি।

এই রায়কোট দুর্গের উত্তর প্রান্তে রয়েছে মহাশক্তিময়ী সর্বমঙ্গলা দেবীর প্রস্তর নির্মিত বিশাল মন্দির, যা গড়বেতার অন্যতম প্রাচীন কীর্তি এবং সেরা আকর্ষণ। মন্দিরটি কে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বা প্রথম কবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তা অজানা। কেউ কেউ বলেন, মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারাজ বিক্রমাদিত্য। রাজা দেবীর অলৌকিক শক্তির কথা শুনে এখানে এসে তপস্যায় বসেন এবং দেবীর কৃপায় তালবেতাল সিদ্ধিলাভ করেন। রাজা তালবেতালকে পরীক্ষা করতে গিয়ে মন্দিরের দ্বার পূর্বদিক থেকে উত্তরদিকে ঘুরিয়ে দিতে বলেন। তালবেতাল সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের প্রবেশদ্বার উত্তরমুখী করে দেয়। সেই থেকে নাকি সর্বমঙ্গলা মন্দিরের প্রবেশদ্বার উত্তরমুখী এবং দেবীও উত্তরমুখী। হিন্দু মন্দিরে সাধারণত উত্তরমুখী প্রবেশদ্বার বা উত্তরমুখী দেবদেবী দেখা যায় না।

এই কাহিনি থেকে দেখা যাচ্ছে, বিক্রমাদিত্যের সময়ও মন্দির ছিল। সর্বমঙ্গলা দেবীও ছিলেন। সুতরাং তিনিও এই মন্দিরের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা নন। তবে অনেকে মনে করেন, এই বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর সেই বিখ্যাত বিক্রমাদিত্য নন। ইনি সম্ভবত দাঁতনরাজ বিক্রমকেশরী অথবা এই অঞ্চলেরই বিক্রমাদিত্য নামের অন্য কোনও রাজা। সর্বমঙ্গলা মন্দিরের গঠনশৈলী বেশ অদ্ভুত। বেশ আশ্চর্যের। একে তো মন্দির উত্তরমুখী, তার উপর দেবীর কাছে পৌঁছতে প্রায় হাত তিরিশেক এক সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করতে হয়। আগে এই পথে ঘন অন্ধকার ছিল। এখন অবশ্য আলোকিত। মন্দিরও সংস্কার করা হয়েছে নতুন করে। দেবীর পাষাণমূর্তি তেজোময়ী। খুব জাগ্রতদেবী বলে এ অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস। দেবীমূর্তির পাশে পঞ্চমুণ্ডী আসন। কিংবদন্তি অনুসারে, রাজা বিক্রমাদিত্য, রাজা গজপতি প্রমুখ রাজা এই আসনে বসেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। মন্দির শিখর দেউল, জগমোহন পীঢ়া দেউল, নাটমন্দির চারচালারীতির। গর্ভগৃহ ও জগমোহনের ভিতরের ছাদ লহরাযুক্ত পদ্ধতি নির্মিত। মূল মন্দির দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১৬ ফুট (৪.৯ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৪৬ ফুট (১৪ মিটার)। আর জগমোহন দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ২৪ ফুট (৭.৩ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩ ফুট (৭ মিটার)। স্থাপত্যের বিচারে বর্তমান মন্দিরটি ষোড়শ শতকে নির্মিত বলে মনে করা হয়। সম্ভবত বগড়ির রাজা গজপতি সিংহ এর নির্মাতা। মন্দিরের মূল মূর্তি সর্বমঙ্গলা দেবীর। এটি কষ্টিপাথরে নির্মিত দ্বাদশভুজা সিংহবাহিনীর মূর্তি। মন্দিরে আরও দুটি পাথরের মূর্তি দেখা যায়। সেবাইতদের মতে এর একটি অন্নপূর্ণা এবং অন্যটি ভৈরব।

সর্বমঙ্গলার মন্দির ছাড়াও আরও দুটি দর্শনীয় মন্দির আছে গড়বেতায়। একটি কামেশ্বর বা কোঙরেশ্বর মহাদেব মন্দির ও অন্যটি রাধাবল্লভ জিউ মন্দির। কামেশ্বর মন্দির সর্বমঙ্গলা মন্দিরের আদলে তৈরি। দুটি মন্দিরই সমসাময়িক বলা হয়, কামেশ্বর সর্বমঙ্গলার ভৈরব। এই মন্দিরের নির্মাতাও গজপতি সিংহ। মন্দিরটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১৬ ফুট (৪.৯ মিটার) ও উচ্চতায় ১৭ ফুট (৫.২ মিটার)। মন্দিরের উপরের ছাদ তিনটি স্তরে বিভক্ত এবং এর গর্ভগৃহের ছাদ লহরা পদ্ধতিতে নির্মিত। রাধাবল্লভজিউর মন্দির দক্ষিণমুখী, মাকড়া পাথরের আটচালা মন্দির। এটি ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে বানান রাজা দুর্জন সিংহ মল্ল। এটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১৮ ফুট (৫.৫ মিটার), এর উচ্চতা প্রায় ২৩ ফুট (৭ মিটার)। বগড়ি রাজ্যের আরেকটি বিখ্যাত মন্দির গড়বেতা থেকে দশ কিলোমিটার দূরে কৃষ্ণনগর গ্রামে। মন্দিরটি কৃষ্ণরায় জিউর। দক্ষিণমুখী, পঞ্চরত্ন মন্দির। এটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ২৭ ফুট (৮.২ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট (১২.২ মিটার)। এর নির্মাণকাল ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ। নির্মাতা বিষ্ণুপুরের সনাতন মিস্ত্রি। শিলাবতীর ভাঙনে মন্দিরটি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। দোলের সময় এখানে বিশাল মেলা বসে। তখন রঙে রঙে রঙিন হয়ে ওঠে গড়বেতার আশপাশ।

মেদিনীপুর থেকে বাসপথে গড়বেতার দূরত্ব ৫২ কিলোমিটার। সারাদিনই সরকারি-বেসরকারি বহু বাস যাতায়াত করছে গড়বেতা। মেদিনীপুর থেকে একটু সকালে বের হয়ে ফেরার পথে কর্ণগড় দেখে সন্ধ্যায় মেদিনীপুর ফিরে আসা যায়। মেদিনীপুর থেকে গড়বেতার রাস্তায় মাত্র পাঁচ কিলোমিটার গেলে ভাদুতলা। এখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার কর্ণগড়। গড়বেতা ট্রেনেও যাওয়া যায়। মেদিনীপুর রেল স্টেশন কিংবা খড়্গপুর স্টেশন থেকে মেদিনীপুর, শালবনী ইত্যাদি হয়ে গড়বেতা যাওয়া যায়। তবে গড়বেতা স্টেশন থেকে শহর বেশ দূরে। তাই বাসে যাওয়াই সুবিধাজনক। গড়বেতার দর্শনীয়গুলি পায়ে হেঁটে কিংবা রিকশা করে দেখা যায়। কৃষ্ণনগরের কৃষ্ণরায় মন্দির দেখতে হলে গড়বেতা-হুমগড় বাসে সাত কিলোমিটার

গিয়ে নামতে হবে ফতেসিংপুরে এবং সেখান থেকে তিন কিলোমিটার মোরাম রাস্তায় হেঁটে বা রিকশায়। গড়বেতা পরিক্রমা সেরে আমরা যাব কর্ণগড় এবং সেখান থেকে মেদিনীপুর। এ যাত্রায় রাত্রিবাস মেদিনীপুরেই। তবে, ভ্রমণার্থীরা গড়বেতা দেখে বিষ্ণুপুরও চলে যেতে পারেন। গড়বেতা থেকে বিষ্ণুপুর বাসপথে মাত্র ২০ কিলোমিটার।

কর্ণগড়

মেদিনীপুর শহরের উত্তরে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে কর্ণগড়। এখানে 'কর্ণগড়' নামের এক প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আজও ভ্রমণার্থীদের আকর্ষণ করে। বহু পুরনো এই গড়টি মেদিনীপুর শহরের সাত কিলোমিটার উত্তরে শুরু হয়ে তিন কিলোমিটার বিস্তৃত ছিল। এখন ওই তিন কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে ভগ্ন প্রাকার, ভেঙেপড়া রাজবাড়ি, সেনানিবাস, দেবদেবীর মন্দির, মজে আসা বিশাল বিশাল দিঘি। প্রাচীন এই গড়ের দক্ষিণাংশে রয়েছে অনাদিলিঙ্গ 'দণ্ডেশ্বর' মহাদেব মন্দির ও তার পাশেই ভগবতী 'মহামায়া' মন্দির। মন্দির দুটি এখনও অক্ষত। মন্দির দুটি গঠনশৈলীতে অপূর্ব। এই মন্দিরদুটিই এখন কর্ণগড়ের ভ্রমণার্থীদের মুখ্য আকর্ষণ। দুটি মন্দির এবং তার প্রবেশ তোরণ সুন্দর করে সারানো হয়েছে। মন্দির প্রাঙ্গণে এখন বৃক্ষের সমারোহ। গত ৩৫-৩৬ বছর ধরে 'রঘুপতি' নামের এক সন্ন্যাসী এখানে নিয়মিত বসবাস করছেন। কর্ণগড় এখন এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সাধনক্ষেত্র। তাঁরই যত্নে এবং তত্ত্বাবধানে কর্ণগড় এখন ভ্রমণার্থী ও তীর্থযাত্রী উভয়ের কাছে সমান আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কর্ণগড়ের শান্ত পরিবেশ, গ্রাম্যতা, প্রাচীনত্ব, ইতিহাস একে ক্রমশই আকর্ষণীয় করে তুলছে সকলের কাছেই।

সাধারণের বিশ্বাস, মহাভারতের রাজা কর্ণ এই গড় বা দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। পঞ্জিকায় লিখিত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানসমূহের তালিকায়ও কর্ণগড় জায়গা করে নিয়েছে। বলা বাহুল্য, কর্ণগড়ের সঙ্গে মহাভারতের কর্ণের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কেউ কেউ মনে করেন, ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অবধি ওই গড়ের নাম অনুসারে কর্ণগড়-রাজবংশ নামে একটি রাজবংশ রাজত্ব করেছিল। এই সব গড়-মন্দিরাদি এদেরই নির্মিত বলে এই দলের অভিমত। আবার 'ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড' নামক এক সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে জানা যায়, খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও কর্ণগড় বা কর্ণদুর্গের অস্তিত্ব ছিল। মন্দিরগুলির গঠনশৈলীতে ওড়িশার মন্দির-স্থাপত্যের ঘরানার প্রভাব খুবই স্পষ্ট। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও মন্দির দুটিকে উৎকল-শিল্প বলে মত প্রকাশ করেছেন। ভুবনেশ্বরের অধিকাংশ মন্দিরই কেশরীবংশের রাজত্বকালে নির্মিত। এই বংশে শিল্পানুরাগ ও সৌধ-মন্দিরমালার নির্মাণ নিয়ে একপুরুষানুক্রমিক আগ্রহ ছিল। সম্ভবত এই কেশরী বংশীয় রাজা কর্ণকেশরী প্রাচীন কর্ণগড়ের নির্মাতা এবং এই

দণ্ডেশ্বর মহাদেব মন্দির, কর্ণগড় ছবি : লেখক

মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা। তবে বর্তমান মন্দির দুটির নির্মাণকাল সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বলে মনে করা হয়।

অনেকে মনে করেন, রাজা মহাবীর সিংহ কর্ণগড়ের এই দুর্গ, প্রাসাদ, দিঘি ইত্যাদির নির্মাতা। প্রায় ৫০০ বছর আগে কর্ণগড় নগর গড়ে ওঠে। মহাবীর সিংহের পৌত্র যশোবন্ত সিংহ। এই যশোবন্ত সিংহের চিতাভস্মের ওপর গড়ে ওঠে মন্দির। এখানে দণ্ডেশ্বর মহাদেব ও ভগবতী মহামায়ার মন্দির দুটি ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। দুর্গের যে ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায় তাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, কর্ণগড় প্রায় তিন কিলোমিটার বিস্তৃত ছিল। এর বহির্ভাগ 'সদরমহল' ও অন্তর্ভাগ 'অন্দরমহল' নামে দু ভাগে বিভক্ত ছিল। সদরমহল রাজকর্মচারী ও সৈন্যদের জন্য এবং অন্দরমহল কুলদেবতা ও অন্তঃপুরিকাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

মেদিনীপুরের পশ্চিম দিকের পাথুরে জায়গা যেখানে এসে চাষাবাদযোগ্য মৃত্তিকাভূমিতে পরিণত হয়েছে, তেমনই এক সন্ধিস্থলে নির্মিত হয়েছিল কর্ণগড় এবং তার রাজপ্রাসাদ। এই জন্য গড়ের তিনদিকে জঙ্গল—পূর্বদিকে আবাস ও কৃষিযোগ্য জমি। জঙ্গল থেকে জলস্রোত প্রবাহিত হয়ে নদীর আকার নিয়ে যে জায়গা দিয়ে বইছে সেইখানেই ছিল কর্ণগড়ের অন্দরমহল। এখন তা ভগ্নাবশেষ মাত্র। এই নদীর নাম 'পারাং'। পারাং

কর্ণগড়ের দুদিক দিয়ে দুভাগ হয়ে বয়ে গেছে। তারপর আবার একসঙ্গে মিলে গেছে। ফলে, নদীটাই হয়েছে কর্ণগড়ের স্বাভাবিক পরিখা। আজকের পারাং কর্ণগড়ের প্রাচীন ভগ্নাবশেষ পাহারা। জায়গাটাকে করেছে মনোরম ও আকর্ষণীয়। এই গড়ে বহু সৌধ এবং দেবমন্দির ছিল। তাদের ভগ্নাবশেষ জঙ্গলাকীর্ণ স্তূপাকারে আজও বিদ্যমান। পরিখার বাইরে আজও দেখা যায় ভগ্নপ্রায় এক পঞ্চরত্ন মন্দির। এটি রাজগুরুর কুলদেবতার মন্দির। মূর্তিহীন এই মন্দির আজ ইতিহাসের সাক্ষীমাত্র।

পশ্চিম তোরণ ও যোগীমণ্ডপ, কর্ণগড় ছবি : লেখক

কর্ণগড়ের দক্ষিণাংশে এই রাজ্যের অধিদেবতা অনাদিলিঙ্গ ভগবান দণ্ডেশ্বর ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভগবতী মহামায়ার মন্দির। দুটি মন্দিরই অক্ষত এবং এখন এদের ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করছেন সন্ন্যাসী 'রঘুবাবা' কিংবা 'রঘুপতি'। বড়ো বড়ো পাথর দিয়ে এই মন্দির দুটি এমন সুদৃঢ় করে নির্মিত যে, মনে হয় এগুলি চিরস্থায়ী। মন্দির দুটি ভগ্ন দুর্গ থেকে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে। পাশাপাশি অবস্থিত মন্দির দুটিই প্রাকারবেষ্টিত। প্রাকারের উচ্চতা প্রায় আট ফুট। প্রাকারের প্রবেশদ্বার তিনটি। পূর্বদিকের প্রবেশদ্বারই একসময় মুখ্য প্রবেশপথ ছিল। এখন মুখ্য প্রবেশপথ হল পশ্চিমের তোরণ। পূর্ব প্রবেশপথের ওপর ছিল নহবতখানা। পশ্চিম তোরণ কিন্তু বিশাল এবং বৈশিষ্ট্যে অনন্য। তিনতলা এই তোরণের উচ্চতা প্রায় ৭৫ ফুট। এই তোরণের ওপরে আছে 'যোগী-মণ্ডপ', যার স্থানীয় নাম 'যোগী-ঘোপা'। তপস্বীরা এখানে তপস্যা করতে পারেন। ব্যবস্থাদি তেমন করা হয়েছে। পশ্চিমের এই তোরণ দিয়ে প্রবেশ করলে প্রথমেই পড়ে দণ্ডেশ্বর মহাদেব মন্দির। মন্দিরটি একাদশ রথ শিখররীতির। মূল মন্দিরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ২০ ফুট ৬ ইঞ্চি [৬.২ মিটার] এবং উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট [১৮.৩ মিটার]। এর জগমোহন সপ্তরথ পীঢ়ারীতির ও তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ২৯ ফুট [৮.৮ মিটার] এবং উচ্চতা প্রায় ২৭ ফুট [৮.২ মিটার]। কিছু পঙ্খের কাজ আছে দণ্ডেশ্বর মন্দিরে। মন্দিরটি উৎকল-শৈলীতে নির্মিত। দেউল ও জগমোহন তো আছেই, আর আছে নাটমণ্ডপ। নাটমন্দির বা নাটমণ্ডপ প্রায় ৪ ফুট উঁচু প্রস্তর নির্মিত বিশাল চত্বর। জগমোহনের সামনেই এর অবস্থান। পশ্চিম তোরণ ও জগমোহনের মাঝখানে এই নাটমণ্ডপ—চত্বর। দণ্ডেশ্বরের মূল দেউলের মধ্যে কোনও শিবলিঙ্গ নেই। মূর্তির অবস্থানের জায়গায় রয়েছে এক গভীর গর্ত। এই গর্তের ব্যাস প্রায় ৩ ফুট, গভীরতা ৮ ফুট। এই গর্ত 'যোনিপীঠ' নামে খ্যাত। জগমোহনের ভিতর বাঁদিকে রয়েছে কালো পাথরের লিঙ্গ-মূর্তি। এঁর নাম 'খড়্গেশ্বর মহাদেব'।

দণ্ডেশ্বর মহাদেব মন্দিরের দক্ষিণে একেবারে লাগোয়া মন্দির হল 'মহামায়া' মন্দির। এটিও ওড়িশার মন্দিরশৈলীর অনুসরণে নির্মিত। এ মন্দিরের গর্ভগৃহ সপ্তরথ শিখর এবং জগমোহন সপ্তরথ পীঢ়ারীতির। মূল মহামায়া মন্দিরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ১০ ফুট ১০ ইঞ্চি [৩.৩ মিটার] ও উচ্চতা ৩৩ ফুট [১০.১ মিটার] এবং এর জগমোহনের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ১৭ ফুট ৯ ইঞ্চি [৫.৪ মিটার] ও উচ্চতায় প্রায় ২০ ফুট [৬.১ মিটার]। মহামায়া মূর্তিটি অপূর্ব সুন্দর। এক প্রস্তর-বেদি প্রস্ফুটিত পদ্মরূপে ভাস্করায়িত। দেবীর পরনে সুন্দর কারুকার্যের মসলিন। মহামায়ার এই মন্দিরে রয়েছে বিখ্যাত এক পঞ্চমুণ্ডি যোগাসন। কথিত আছে, 'শিবায়ণ' রচয়িতা কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য ও কর্ণগড়ের খ্যাতিমান রাজা যশোবন্ত সিংহ এই যোগাসনে বসে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। বহুকাল ধরে এই মন্দিরদুটি মায় পুরো কর্ণগড় অঞ্চল নাড়াজোল রাজাদের সম্পত্তি ছিল। এখন এগুলি সরকারি সম্পত্তি। তবে মন্দির দুটি এখন রঘুবাবার তত্ত্বাবধানে পুরাতন শ্রী ফিরে পেয়েছে। তীর্থযাত্রীদের ভিড় বাড়ছে যথেষ্ট পরিমাণে।

ইংরেজ আমলে কর্ণগড় ছিল বিদ্রোহের পীঠস্থান। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে জঙ্গল-মহালের চাষি-প্রজারা যে বিদ্রোহ করে ইংরেজদের কথায় তা 'চুয়াড় বিদ্রোহ'। 'চুয়াড়' শব্দের অর্থ হল 'গোঁয়ার', 'অসভ্য' ইত্যাদি। এর আগে ঘাটশিলা অঞ্চলে ১৭৬৭ সালেই শুরু হয়েছিল। মাঝে ইংরেজরা সে বিদ্রোহ কিছুটা দমন করে। ১৭৯৮ সালের এপ্রিল মাসে আবার চুয়াড়-বিদ্রোহ শুরু হয়। এবার নেতৃত্ব দেন কর্ণগড়ের রানি 'শিরোমণি'। কর্ণগড়ই তখন বিদ্রোহের পীঠস্থান। বিদ্রোহ চলে প্রায় এক বছর। ইংরেজ সেনারা বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হয়। বাইরের থেকে সেনাবাহিনী এনে

১৭৯৯ খিস্টাব্দে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। কর্ণগড় আক্রমণ করে চুয়াড়-বিদ্রোহের নেত্রী রানি শিরোমণিকে বন্দি করে মেদিনীপুরে নিয়ে আসা হয়। পরে তাঁকে হত্যা করা হয়। সেই বিদ্রোহই ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ। রানি শিরোমণি মেদিনীপুরের 'লক্ষ্মীবাঈ'। রানি শিরোমণির মৃত্যুর পর বিদ্রোহ দুর্বল হয়ে পড়ে। ইংরেজরা খাজনা আদায়ের জন্য কিছু নতুন নিয়ম চালু করে। ফলে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে চুয়াড়-বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে যায়। কর্ণগড় সেদিক দিয়েও ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

মেদিনীপুর থেকে গড়বেতা রাস্তায় ৫ কিলোমিটার উত্তরে এলে ভাদুতলা। ভাদুতলা থেকে ৫ কিলোমিটার পূর্বে মোরাম রাস্তায় গেলে পড়ে কর্ণগড়। এই ৫ কিলোমিটার অটো রিকশা যাওয়া যায়। মেদিনীপুর থেকেও ট্যাক্সি করে কর্ণগড় আসা যায়। কর্ণগড় দেখতে ঘণ্টা দুই-তিন সময় লাগে। রাত্রিবাসের প্রয়োজন হয় না এখানে। কর্ণগড়ে থাকবার জায়গাও নেই। অনেক তীর্থযাত্রী মন্দিরের লাগোয়া দোকানে রাত কাটান। কেউ কেউ 'হত্যে' দেন মন্দিরে। উপবাস করে মন্দিরে থাকেন দেবদেবীর প্রত্যাদেশের আশায়। কর্ণগড় পরিক্রমা সেরে মেদিনীপুর শহরে আসুন। ঐতিহাসিক শহর মেদিনীপুর দেখার জন্য কিছুটা সময় খরচ করুন।

মেদিনীপুর

মেদিনীপুর শহর এই নামের জেলার সদর শহর। এই ঐতিহাসিক শহরটির প্রতিষ্ঠাকাল অজানা। জনশ্রুতি বলে, মেদিনীপুর নগরীর প্রতিষ্ঠাতা রাজা মেদিনী। তাঁর নামেই এই শহরের নাম। তবে আইন-ই-আকবরি এটিকে সরকার জলেশ্বরের অধীন এক বৃহৎ নগরী বলে বর্ণনা করেছে। সেদিক থেকে বিচার করলে মেদিনীপুর অন্তত ৫০০ বছরের প্রাচীন শহর। ১৭৮৩ খিস্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর শহরটিই জেলার প্রধান কেন্দ্র বা সদর হিসাবে ঘোষিত হয়। ইতিহাস তাই মেদিনীপুর শহরের পরতে পরতে। একদল মনে করেন, ত্রয়োদশ শতকে এক সামন্তরাজা এবং 'মেদিনীকোষ' গ্রন্থের রচয়িতা মেদিনীকর এই নগরী প্রতিষ্ঠা করে নিজের নামের অনুসরণে এর নাম রাখেন 'মেদিনীপুর'। কিছু মত হল, মৌলানা মুস্তফা মদনী নামে এক ব্যক্তি আওরঙ্গজেবের আমলে এখানে এসে বসবাস করেন। ভূসম্পত্তি অর্জন করে বসতি স্থাপন করেন। ধর্ম-কর্ম-সদাচারে প্রভূত খ্যাতি অর্জনও করেন। তাঁর নাম অনুসারে এই শহরের নাম হয় 'মদনীপুর'। পরে তা রূপান্তরিত হয় 'মেদিনীপুর' নামে। আবার দ্বাদশ শতকের ওড়িশার চোড়গঙ্গ রাজাদের এক শিলালিপি বলছে, চোড়গঙ্গদের রাজ্যের সীমানা 'মিধুনপুর' অবধি বিস্তৃত হয়েছিল। এই মিধুনপুরই সম্ভবত মেদিনীকরের হাতে মেদিনীপুর হয়ে থাকবে। সুতরাং মেদিনীপুর প্রায় ৮০০ বছরের পুরাতন শহর। জনশ্রুতি বলে, শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে যে বিরাট পরিখা এবং প্রাচীন সৌধের ধ্বংসাবশেষ আছে, তা নাকি বিরাট রাজার প্রাসাদ। সুতরাং মহাভারতও জড়িয়ে গেছে মেদিনীপুর শহরের ইতিহাসে। এই শহরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মুঘল-পাঠান যুদ্ধ, বর্গী হাঙ্গামা, চুয়াড় বিদ্রোহ, পাইক বিদ্রোহ, লোধা বিদ্রোহ, নায়েক বিদ্রোহ, ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম, নকশাল আন্দোলন এবং একালের ঝাড়খণ্ড আন্দোলন প্রভৃতির ইতিহাস।

মেদিনীপুরে দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে রয়েছে : শহরের পূর্ব-দক্ষিণে কাঁসাই নদীর তীরবর্তী নতুনবাজার পল্লীতে পূর্বমুখী পঞ্চরত্ন এক কালীমন্দির, হজরত পীর লোহানী এক গম্বুজ-বিশিষ্ট সমাধি-মসজিদ, যেটি খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত। নতুনবাজারের একটু পশ্চিমে জগন্নাথ মন্দির। এটি দক্ষিণমুখী নবরথ শিখর দেউল। জগমোহন চারচালারীতির। পোড়ামাটির অলঙ্করণ রয়েছে মন্দিরে, রয়েছে পঙ্খের কাজও। ১৮৫১ সালে নির্মিত মন্দিরের দেউলের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ২১ ফুট [৬.৪ মিটার] ও উচ্চতা প্রায় ৭৩ ফুট [২২.২ মিটার]। বড়বাজার এলাকায় ৫০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট শীতলা মন্দিরটিও প্রায় ২০০ বছরের পুরানো দর্শনীয় মন্দির। শিববাজারে মল্লিক পরিবারের রাধাকান্ত জিউ নবরত্ন মন্দিরটিও দর্শনীয় এর টেরাকোটা অলঙ্করণের জন্য। মীরবাজারে আছে এক গম্বুজবিশিষ্ট সুন্দর টিকিয়া মসজিদ। অলিগঞ্জে রয়েছে পূর্বমুখী তিন গম্বুজ 'দেওয়ানখানা' মসজিদ। কথিত আছে, মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন আওরঙ্গজেবের দেওয়ান কেফায়ৎ-উল্লা। এই মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ৫৬ ফুট [১৭.১ মিটার], প্রস্থে ২৫ ফুট [৭.৬ মিটার] ও উচ্চতায় ৩০ ফুট [৯.১ মিটার]। এর বয়স প্রায় ৩০০ বছর।

শহরের খাপ্রেলবাজার এলাকায় পূর্বমুখী শিবের যে সপ্তরথ দেউলটি রয়েছে সেটি পোড়ামাটির অলঙ্করণসমৃদ্ধ। এটির বয়স প্রায় ১৫০ বছর। এরই সামান্য পশ্চিমে সিপাইবাজার এলাকায় সাধল বা চোল শাহ নামে পরিচিত পূর্বমুখী একগম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ রয়েছে। এটির নির্মাণকাল ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ। কর্নেল গোলা এলাকায় পাথরের তৈরি যে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় তা মেদিনীকরের বলে মনে করা হয়। এই দুর্গ মোঘল এবং মারাঠারা ব্যবহার করে। ইংরেজরা এটিকে এক সেনানিবাস এবং পরে জেলখানা হিসাবে ব্যবহার করে। এরই পূর্বদিকে একটি একগম্বুজবিশিষ্ট একটি মাজার। এটি হজরত শাহ মুস্তফা মদনী রহমতুল্লাহ আলায়হের। এই মাজারটি আওরঙ্গজেবের আমলে নির্মিত।

মেদিনীপুরের সেরা দর্শনীয় হল 'বিদ্যাসাগর মন্দির'। বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষায় এই সৌধটি নির্মিত। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে সর্বপল্লী ডঃ রাধাকৃষ্ণণ এই স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং এই মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করেন স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। এখানে রয়েছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা এবং বেশ কিছু সংগৃহীত পুরাবস্তু। যেমন : খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের রাজা শশাঙ্কের দুটি তাম্রশাসন, প্রাচীন জৈন ও বুদ্ধমূর্তি, মন্দির-টেরাকোটা, পোড়ামাটির শীলমোহর, মুদ্রা, পুঁথি ইত্যাদি। এছাড়া

জজকোর্টের কাছে আছে জন পিয়ার্স সাহেবের সমাধি, সেকপুরায় সেন্ট জনস্ চার্চ, কেরানীটোলায় রোমান ক্যাথলিক গির্জা, আবাসগড়ের কাছে আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন সম্প্রদায়ের গির্জা। এগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কিংবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্মিত। শহরের মীর্জা মহল্লা এলাকায় সপ্তদশ শতকে নির্মিত পূর্বমুখী জোড়া মসজিদ দর্শনীয়ের তালিকায় রাখা উচিত। দুটি মসজিদের পূর্বদিকের ইমারতটি অবশ্য খানকা শরীফ নামে পরিচিত মহম্মদ মৌলানা হুজরত সৈয়দ শাহ মেহের আলী আলকাজুরীর মাজার বা কবর। এরই কাছে মিঞাবাজার এলাকায় রয়েছে তিন-গম্বুজবিশিষ্ট চন্দন শহিদ রহমতুল্লার মসজিদ। এটিও সম্ভবত আওরঙ্গজেবের আমলে নির্মিত। কাছাকাছি মহাতাপপুরের ইয়াদগার শাহ সাহিবের মসজিদটিও দর্শনীয়। এই দুটি মসজিদই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে শ্রদ্ধার সৌধ।

শহর মেদিনীপুর দেখতে একটি অটো ভাড়া করে ঘুরলে ৫-৬ ঘণ্টার বেশি লাগে না। চাই কী এর সঙ্গে 'গোপগড়' বা 'গোপগৃহ', নতুন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরও দেখে নিতে পারেন। শহরে রাত্রিবাসের নানা মানের, নানা রকমের হোটেল রয়েছে। মেদিনীপুরকে কেন্দ্র করেই দেখে নেওয়া যায় ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, গড়বেতা, কর্ণগড়, পাথরা ও জিনশহর ও মালঞ্চ। পরবর্তী পরিক্রমায় চলুন, পাথরা ও জিনশহর দেখে আসি। কলকাতা থেকে ট্রেন এবং বাস দুই-ই সরাসরি আসছে মেদিনীপুরে। হাওড়া স্টেশন থেকে রেলপথে মেদিনীপুর ১২৮ কিলোমিটার। এসপ্লানেড থেকে বাসপথে মেদিনীপুর ১৩৫ কিলোমিটার।

পাথরা

মেদিনীপুর শহরের পাশ দিয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে ঋগ্বেদের কপিশা, বর্তমানের কাঁসাই। এর ধরন-ধারণ অনেকটা 'আমাদের ছোট নদী চলে এঁকে বেঁকে'-র মতো। এরই উত্তর তীরে পাথরা গ্রাম। ত্রিশটিরও বেশি ভগ্ন দেউল, প্রাসাদ, প্রাকার বুকে নিয়ে ছবির মতো এই গ্রামটির কথা আজ বহুল প্রচারিত। পর্যটন মানচিত্রে পাথরা হয়তো খুব শিগগির তার জায়গা করে নেবে। কাঁসাইয়ের উত্তর তীরস্থ এই গ্রামটি এখন থেকে প্রায় হাজার বছর আগে কেমন করে যেন হয়ে উঠেছিল হিন্দুধর্মের পীঠস্থান। সে ইতিহাস আজও অজ্ঞাত—গবেষণার বিষয়। কিছুদিন আগে পাথরা গ্রাম থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি লোকেশ্বর-বিষ্ণুমূর্তি। এটি এখন আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। পুরাতত্ত্ববিদরা বলছেন, মূর্তিটি তৈরি হয়েছে নবম শতাব্দীর শেষের দিকে। অর্থাৎ ওর বয়স ১১০০ বছর বা তারও বেশি। সুতরাং পাথরার বয়স হাজার বছরের অনেক বেশি। পাথরায় মোট বত্রিশটি মন্দির রয়েছে। কিছু ভগ্ন, কিছু অর্ধ-ভগ্ন, কিছু বা অভগ্ন, তবে জরাজীর্ণ। মন্দিরগুলি মূলত কৃষ্ণ, বিষ্ণু ও শিবের। কাঁসাই এখানে বাঁক নিয়ে কিছুটা পূর্বমুখী। স্বচ্ছ নীল জল তিরতিরিয়ে বয়ে চলেছে। এই কাঁসাই পাথরাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে, করেছে মনোরম চড়ুইভাতির স্থান। পুরনো সৌধ, মন্দির উজ্জ্বল করেছে পাথরার পর্যটনক্ষেত্র হয়ে ওঠার আশু সম্ভাবনা।

পাথরার মন্দির, পাথরা — ছবি : লেখক

রেশম শিল্পে ও নীলচাষে ধনবান ব্যক্তিদের নির্মিত পাথরার ওই সব দেবালয়-মন্দির আজ পুরাকীর্তি। এই সব ভগ্নপ্রায়, লুপ্তপ্রায় মন্দিরের কয়েকটি আজও টিকে আছে। গ্রামের পূর্ব-প্রান্তে শীতলার দক্ষিণমুখী শিখর মন্দিরটি তাদের অন্যতম। এটি উচ্চতায় ২৭ ফুট। [৮.২ মিটার], নির্মিত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। শীতলা মন্দিরের পশ্চিমে বেশ ক'টি পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন ও আটচালা মন্দির। কাঁসাইয়ের তীরে মজুমদার পরিবারের প্রতিষ্ঠিত বিশালাকার পশ্চিমমুখী নবরত্ন মন্দিরটি আজও দর্শনীয়। এর গায় খিলান শীর্ষে টেরাকোটার অলঙ্করণ ছিল, এখন নেই। মন্দিরটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১৯ ফুট [৫.৮ মিটার] ও উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট [১২.২ মিটার]। এটির বয়স প্রায় ২৫০ বছর।

পাথরার উত্তরপাড়ায় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের তিনটি পূর্বমুখী আটচালা শিবমন্দির এখনও ভালোই রয়েছে। এর দেওয়ালে আছে পোড়ামাটির কাজ। রয়েছে দশাবতার ও পৌরাণিক দেবদেবী। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দিরগুলি নির্মিত।

পাশেই আছে দর্শনীয় নয়চূড়া বিশিষ্ট আটকোনা রাসমঞ্চ, যা ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। গ্রামের হাটতলায় বিশাল দিঘি। তার তীরে দুটি পূর্বমুখী ও দুটি পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দির। এগুলির নির্মাণকাল উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনও সময়।

কলকাতা থেকে বাসপথে মেদিনীপুর এলে শহরে প্রবেশের মুখে পড়ে কাঁসাই নদীর ওপরে 'বীরেন্দ্র সেতু'। সেতু পেরিয়ে উত্তর প্রান্তে নেমে একটা রিকশা বা অটো নিয়ে পূর্বদিকে যেতে হবে। এখান থেকে পাথরা পুরোপুরি আট কিলোমিটার। চওড়া মোরাম রাস্তা, মাঝে মাঝে পিচ-ঢালা। ঘণ্টাখানেক সময় নেয় রিকশা। অটো আধ ঘণ্টা। পথে পড়ে নতুনবাজার, হাতিহোলকা। হাতিহোলকায় এক পীরবাবার সমাধিস্থল—বিশাল বটের ঘন ছায়ায় আচ্ছন্ন। পবিত্র এই স্থানের সমাহিত শান্তি মন ভরিয়ে দেয়। এর কিছুটা পরেই পাথরা। কতকগুলি মন্দির এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে। মূল স্থানটিতে প্রায় ১৭-১৮টি ছোটোবড়ো মন্দির ভগ্নদশায়। উচ্চতাও এদের বিভিন্ন। কোনওটা ৩০-৪০ ফুট, কোনওটা ১৫-২০ ফুট।

এইসব মন্দিরের ইতিহাস জানতে এবং এদের সংস্কার করতে প্রাণপণ উদ্যোগ নিয়েছেন হাতিহোলকার এক মুসলমান যুবক—নাম ইয়াসিন পাঠান। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের স্বীকৃতি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে 'কবীর পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এঁরই চেষ্টায় খড়গপুর আই আই টি এগিয়ে এসেছে মন্দিরগুলির সংস্কারে। স্থির হয়েছে, প্রথমে পনেরো ফুট উচ্চতার গোপালজিউর মন্দিরটি সারানো হবে। একটা কমিটিও গড়েছেন জেলাশাসক সভাধিপতিকে নিয়ে। রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশন কিছু টাকা দিচ্ছে এই সংস্কারকর্মে। আর সাংসদ ইন্দ্রজিৎ গুপ্তও আড়াই লাখ দিয়েছেন তাঁর তহবিল থেকে।

পাথরা খুঁটিয়ে দেখতে ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগে। বীরেন্দ্র সেতুতে ফিরে আসতে রিকশায় সময় নেয় ঘণ্টাখানেক। পাথরার বন্য সৌন্দর্যে অনন্য মাত্রা যোগ করেছে কাঁসাই। এখানের নির্জনতায় অনন্য শান্তি। পর্যটন-ক্ষেত্র হিসাবে পাথরা অদূর ভবিষ্যতে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। বীরেন্দ্র সেতুতে ফিরে এসে বাস ধরে সেতু পেরিয়ে চার কিলোমিটার গেলে আসে 'জিনশহর' যাওয়ার রাস্তা। বাসরাস্তা থেকে মোরাম রাস্তা চলে গেছে উত্তরে কাঁসাইয়ের কূলে। মাইলখানেক হাঁটলে আসে কাঁসাই। তার তীরে 'জিনশহর' গ্রাম। এখন পুরোপুরি গ্রাম। কে বলবে একসময় এটা ছিল একটা শহর। বর্তমানে অবশ্য গ্রামটির নাম 'বালিহাটি'। এটি খড়গপুর থানার অন্তর্গত। এটা খ্রিস্টীয় দশম শতকে ছিল জৈনতীর্থ। তারই স্মৃতি বহন করছে এক প্রাচীন জৈনমন্দিরের ভগ্নস্তূপ। মন্দিরটি ঝামাপাথরের। কাছেই আছে ভগ্নপ্রায় ছোট দুটি মন্দির। একটি শিবের ও অন্যটি বিষ্ণুর। বিষ্ণুমন্দিরের গায়ে এখনও কিছু টেরাকোটা অবশিষ্ট রয়ে গেছে। কাঁসাইয়ের দক্ষিণ তীরে জিনশহর। ওপারে উত্তর তীরে পাথরা। জিনশহরের কাঁসাই নদীর তীর থেকে দেখা যায় ওপারে পাথরার মন্দিরশৈলী—কিছুটা অস্পষ্ট, কিছুটা ম্লান।

পরবর্তী পরিক্রমায় আমরা যাব খড়গপুর শহরের 'মালঞ্চ'। মালঞ্চ মন্দিরময়। মেদিনীপুর থেকেই মালঞ্চ পরিক্রমা সারতে পারেন। একই দিনে পাথরা, জিনশহর ও মালঞ্চ দেখা যেতে পারে। এগুলি দেখে মেদিনীপুরে রাত্রিবাস করা যায়। চাই কী খড়গপুর থেকে কলকাতায়ও ফিরে আসা যায়।

মালঞ্চ

মালঞ্চ এখন খড়গপুর শহরেরই একটা অংশ। খড়গপুর শহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে এর অবস্থান। খড়গপুর রেলস্টেশন সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে মালঞ্চের দূরত্ব প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। প্রায় আধ ঘণ্টা অন্তর মিনিবাস যাচ্ছে নিমপুরা। এই বাসই মালঞ্চ হয়ে নিমপুরা যায়। স্টেশন থেকে রিকশা নিয়েও মালঞ্চ বেড়িয়ে আসা যায়। আবার মিনিবাসে গিয়ে মালঞ্চে নেমে পায়ে হেঁটেও মালঞ্চের মন্দিরগুলি দেখে নেওয়া যেতে পারে।

মালঞ্চের মন্দিরগুলির মধ্যে সেরা হল 'দক্ষিণা-কালীমন্দির'। ইটের তৈরি আটচালা মন্দির। অপূর্ব সূক্ষ্ম টেরাকোটার কারুকার্যমণ্ডিত এই মন্দির উচ্চতায় ৫০ ফুটেরও বেশি। টেরাকোটার মনোমুগ্ধকর ভাস্কর্যে বর্ণিত হয়েছে রামায়ণের কাহিনি। রাম, লক্ষ্মণ, রাবণ, বালী, সুগ্রীব সবাই আছেন টেরাকোটায়। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের ভাস্কর্যশৈলী টেরাকোটা ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। সম্প্রতি মন্দিরটি সংস্কার করা হয়েছে। পুরো মন্দিরটি রং করা হয়েছে মেটে লাল রং দিয়ে। ফলে, টেরাকোটার ভাস্কর্যশৈলী তার স্বাভাবিক সাবলীলতা হারিয়ে কিছুটা যেন ম্লান। মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে, [মতান্তরে ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে]। এর দৈর্ঘ্য ২৫½ ফুট [৭.৭ মিটার], প্রস্থ ২৩ ফুট [৭ মিটার] ও উচ্চতা প্রায় ৫০ ফুট [১৫.২ মিটার]। এই মন্দিরের নির্মাতা জকপুরের মহাশয়বংশীয় জমিদার গোবিন্দরাম রায়।

কালীমন্দিরের একটু দূরেই আছে বিরাট এক শিবমন্দির। এটি নন্দেশ্বর শিবের মাকড়া-পাথরের মন্দির। দক্ষিণমুখী মন্দির। এর জগমোহন পীঢ়ারীতির। মন্দিরের নির্মাণকাল ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দ। বর্তমানে সংস্কারের পর এটির সমস্ত কারুকার্য অন্তর্হিত। মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট [১২.১ মিটার]। কাছেই রয়েছে 'সিদ্ধেশ্বরী মন্দির'। বয়সে নবীন, তবে আয়তনে বিশাল। এখানেও নিত্য পূজাপাঠ হয়। মন্দিরটি সযত্নে রক্ষিত। মন্দিরটির বয়স নেই নেই করে ২০০ বছরের কাছাকাছি। ওখান থেকে বেরিয়ে খড়্গপুর স্টেশনের দিকে আসার পথে পড়ে 'বালাজি মন্দির'। এটির বয়স ৫০ বছরের কিছুটা বেশি। মন্দিরটি বানানো হয়েছে পুরোপুরি দ্রাবিড় স্থাপত্যরীতিতে। বানিয়েছেন খড়্গপুরের দক্ষিণ ভারতীয় অধিবাসীরা। এরই একটু পরে আছে এক শিবমন্দির। নাম 'ঝাড়েশ্বর শিব' মন্দির। এখানের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে শিবচতুর্দশী ও চৈত্রসংক্রান্তির গাজনের মেলা বসে। মন্দিরটি আকারে ছোটো, কিন্তু বয়সে প্রাচীন। খুবই জাগ্রত দেবতা বলে এ অঞ্চলের লোক বিশ্বাস করে। নিত্য পূজাপাঠ হয় এই মন্দিরে।

মালঞ্চ ভ্রমণার্থীরা মালঞ্চের মন্দিরগুলি দেখার পর খড়্গপুরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত 'খড়্গেশ্বর মহাদেব' মন্দিরটিও দেখে নিতে পারেন। একটা রিকশাই ঘুরিয়ে আনতে পারবে। মোট সময় লাগবে তিন-চার ঘণ্টা। ইন্দা এই শহরের উত্তরাংশ। এই ইন্দাতেই আছে খড়্গেশ্বর মহাদেব মন্দির। অনেকে মনে করেন, এই দেবতার নাম থেকে এ জায়গার তথা শহরের নাম খড়্গপুর। মন্দিরটি পূর্বমুখী, জগমোহনযুক্ত, সপ্তরথ শিখর দেউল। কেউ কেউ মনে করেন, মহারাজা খড়্গসিংহ এই মন্দিরের নির্মাতা। অন্য একদল মনে করেন, বিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয় রাজা খড়্গমল্ল এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরটি ২০০ বছরেরও বেশি পুরনো। তবে এখন অনেকটা সংস্কার করা হয়েছে। চারদিকে প্রাচীরবেষ্টিত এক প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে এর অবস্থান। মন্দিরটি মাঝারি উচ্চতার এবং উৎকল রীতিতে নির্মিত।

খড়্গেশ্বর মন্দিরের সামনের প্রান্তর 'হিড়িম্বডাঙা' নামে খ্যাত। জনশ্রুতি হল, মহাভারতের ভীম-হিড়িম্ব যুদ্ধ হয়েছিল এই প্রান্তরে। এই কাহিনি অনুসারে এই প্রদেশ তখন ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। বারনাবতের জতুগৃহ দাহের পর কুন্তীসহ পঞ্চ পাণ্ডব একসময় এখানে আসেন। এ অঞ্চলে তখন হিড়িম্ব রাক্ষসের রাজত্ব। হিড়িম্বের বোন হিড়িম্বা ভীমের প্রেমে পড়লেন। ক্রুদ্ধ হিড়িম্ব আক্রমণ করলেন ভীমকে। তাঁর সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ হল ভীমের। মল্লযুদ্ধে হিড়িম্ব পরাজিত ও নিহত হলেন। বহুকাল ধরে লোকে বিশ্বাস করে আসছে, এই হিড়িম্বডাঙাতেই ভীমের সঙ্গে হিড়িম্বের মল্লযুদ্ধ হয়েছিল। এরই সমসাময়িক অন্য একটি মহাভারতীয় কাহিনি নিয়ে এ অঞ্চলে অনেকদিন ধরে আর একটি বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। খড়্গপুর থেকে ৬৫ কিলোমিটার দূরে গড়বেতা শহর। ওরই সন্নিহিত একচক্রা গ্রাম, ভিকনগর ও গনগনির মাঠ এই বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এখানের মানুষ আজও বিশ্বাস করে, এই একচক্রা গ্রাম মহাভারতের সেই গ্রাম যেখানে হিড়িম্ব বধের পর পাণ্ডবেরা আশ্রয় নিয়ে বসবাস করছিলেন, ভিকনগর হল ওঁদের প্রতিদিনের ভিক্ষার গ্রাম। আর ওই গনগনিরডাঙা হল সেই মাঠ, যেখানে ভীম বকরাক্ষসকে বধ করেন।

খড়্গেশ্বর মহাদেবের মন্দির থেকে একটু দূরেই আছে 'পীর লোহানী সাহেব' নামের এক মুসলমান ফকিরের সমাধি। ফকিরের আসল নাম 'আমীর খাঁ'। তিনি সম্ভবত লোহানীবংশীয় ছিলেন। তাই তাঁর নামের বদলে তাঁকে বলা হত 'পীর লোহানী'। তাঁর অনেক অলৌকিক ক্ষমতার কথা আজও লোকমুখে ফেরে। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই তাঁকে সমানভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করত, আজও করে। উভয় সম্প্রদায়ই তাঁর সমাধিতে 'শিরনি' চড়ায় আপন মনস্কামনা পূরণের জন্য।

আমাদের পরিক্রমায় এবার আমরা যাব ঝাড়গ্রাম, চিলকিগড় এবং সব শেষে কাঁকড়াঝোর। ঝাড়গ্রাম মহকুমা শহর। বাসপথে মেদিনীপুর, খড়্গপুরের সঙ্গে যুক্ত সারা দিন-রাত্রি। খড়্গপুর থেকে টাটার দিকের সব ট্রেন ঝাড়গ্রাম হয়েই যায়। ট্রেনপথে খড়্গপুর থেকে ঝাড়গ্রাম ৩৯ কিলোমিটার। বাসপথে দূরত্ব ৫০ কিলোমিটার। মেদিনীপুর থেকেও তাই। চলুন, এবার ঝাড়গ্রাম যাই।

ঝাড়গ্রাম

শাল, সেগুন, মহুয়া, পিয়ালের জঙ্গল, মাঝে মাঝে পাহাড়ি টিলা, ছোটো ছোটো পাহাড়ি ঝোরা ও নদী ঝাড়গ্রামের প্রকৃতিকে দিয়েছে আরণ্যক সৌন্দর্য, দিয়েছে অনন্যতা। বিহারের মানভূম অঞ্চলের সব প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যই আছে ঝাড়গ্রামের প্রকৃতিতে, পরিবেশে। অরণ্যপ্রেমী ভ্রমণার্থীদের কাছে ঝাড়গ্রাম তাই অত্যন্ত আকর্ষণীয়। প্রকৃতি ছাড়াও ঝাড়গ্রাম শহরে দর্শনীয়ও আছে বেশ কয়টি। শহরের অন্যতম দর্শনীয় হল 'সাবিত্রী দেবীর' মন্দির। মন্দির পশ্চিমমুখী। চতুর্দিকে পাঁচখিলান সংবলিত প্রদক্ষিণপথ। দালান মন্দিরের মাঝখানে স্থাপিত, ক্রমশ উপরের দিকে সরু গোলাকার এক চূড়াযুক্ত দেউল। স্থাপত্যরীতি অভিনব। মন্দিরটি মাকড়া পাথরের। বাইরের চারপাশের অলিন্দের ছাদ অর্ধগোলাকৃতি। গর্ভগৃহের ছাদ গম্বুজাকৃতির। মন্দিরের দেবী বহু প্রাচীন হলেও বর্তমান মন্দিরটি তেমন প্রাচীন নয়। মন্দিরের বয়স একশো বছরের কিছুটা বেশি। মন্দিরে সাবিত্রী দেবীর কোনও মূর্তি নেই। কেবল একটি পেটিকার ওপর রাখা সিঁদুর মাখানো এক বিশাল খড়্গ এখানে পূজিত হয়। জনশ্রুতি হল, ওই পেটিকার মধ্যে রাখা আছে দেবী সাবিত্রীর একগুচ্ছ কেশ। মন্দিরটি তেমন প্রাচীন না হলেও এখানে রয়েছে পাথরের বেশ কয়েকটি প্রাচীন মূর্তি। এগুলি হল : চতুর্মুখ লিঙ্গ, লোকেশ্বর বিষ্ণু এবং একটি মনসা মূর্তি। এদের ভাস্কর্যশৈলী দেখে মনে হয় এগুলি দশম-একাদশ শতাব্দীর মূর্তি। এগুলি কেমন করে এই মন্দিরে এল তা অজানা।

সাবিত্রী দেবীকে নিয়ে যে লোককাহিনি প্রচলিত আছে তা থেকে জানা যায়, তিনি দেবী নন মানবী। পুরী যাওয়ার পথে ডাকাতদল তাঁকে অপহরণ করে খুব ছোটোবেলায়। জঙ্গলে দস্যুরাই তাঁর লালন-পালন করে। তিনি নিজেকে সবিতার দাসী সাবিত্রী বলেই পরিচয় দিতেন। যৌবনে তিনি অপরূপা হয়ে উঠলেন। দস্যুসর্দারের পুত্র তাঁকে পেতে চাইল। দৈব প্রেরিত এক বিশাল খড়্গের সাহায্যে তিনি সে যাত্রায় আত্মরক্ষা করলেন। এরপর ঝাড়গ্রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। রাজা দস্যুদের হাত থেকে ঝাড়গ্রাম কেড়ে নেন। রাজা বিয়ে করতে চাইলেন রূপবতী সাবিত্রীকে। সম্ভবত রাজা জোর করেই বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। সাবিত্রী বিয়ের দিন বিকালে সমস্ত গহনা খুলে রেখে খিড়কি দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলেন একাকিনী। রাজা খবর পেয়ে তাঁর পিছু পিছু দৌড়লেন। কিন্তু দেবী সাবিত্রী ততক্ষণে চোরাবালিতে পড়ে গেছেন। রাজা সাবিত্রীর কেশগুচ্ছ ধরলেন। কেশগুচ্ছ রাজার হাতে চলে এল, দেবী সাবিত্রী চোরাবালিতে তলিয়ে গেলেন। রাত্রে স্বপ্নাদেশ হল, ওই কেশদাম ও খড়্গ প্রতিষ্ঠা করে পূজা করার। রাজা তাই করলেন। সাবিত্রী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত

হল। সেখানে স্থাপিত হল তাঁর কেশগুচ্ছ এবং খড়্গ। ওগুলি পূজা পেতে থাকল। সাবিত্রী মন্দিরের পিছনে আছে সুন্দর এক বিশাল দিঘি। পাথরের বাঁধানো ঘাট। গ্রীষ্মকালেও এর জল কমে না। আশপাশের লোক এর জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করে।

ঝাড়গ্রামের রাজবাড়ি আর একটি দর্শনীয় স্থান। এর প্রবেশ তোরণটিও সুন্দর। ঢুকেই লাল মোরাম রাস্তা। দুপাশে ফুলবাগিচা। তিনটি গম্বুজবিশিষ্ট সুন্দর আকর্ষণীয় সৌধ। নীচের তলায় পাশাপাশি কয়েকটি ঘরে বসেছে সরকারি দপ্তর। এর আউট হাউসে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম বানিয়েছে ঝাড়গ্রাম প্যালেস ট্যুরিস্ট লজ। রাজবাড়ির অন্দরমহল দেখতে বিশেষ অনুমতি লাগে। রাজবাড়ির চত্বরে একটি মন্দির রয়েছে শিবলিঙ্গ আকৃতির। দূর থেকে মনে হয় একটি বিশাল শিবলিঙ্গ মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। এখানে একটি পঞ্চরত্ন মন্দিরও আছে রাধা-কৃষ্ণের। রাজবাড়ির চারদিকে পরিখা ছিল এককালে। এখন তার কিছু কিছু চিহ্ন দেখা যায়।

ঝাড়গ্রামের মৃগদাব বা ডিয়ার পার্কটিও বেশ সুন্দর। শালের বিস্তীর্ণ জঙ্গলে এই মৃগদাব। আয়তন ৩৪.৫ হেক্টর। বিশাল পার্ক বলা যেতে পারে। শীতের মরশুমি ফুলের সুন্দর বাগান করা হয় এখানে। ভেতরে আছে লেক ও পিকনিক স্পট। হরিণদের মধ্যে কৃষ্ণসারও আছে। বাঁদর, ভাল্লুক, শিয়াল ও সাপ রাখা হয়েছে। শিশুদের জন্য এটি পশ্চিম মেদিনীপুর বন বিভাগের পরিচালনাধীন। এটিকে ভ্রমণার্থীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করলে প্রচুর দর্শক সমাগম হতে পারে।

ঝাড়গ্রাম স্টেশন থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে আর একটি মনোরম জায়গা 'জঙ্গলমহল'। এটি একটি অনন্য উদ্যান। প্রবেশমূল্য ২ টাকা। কয়েকশো রকমের গোলাপ রয়েছে এখানে। শীতকালে অনবদ্য। আর রয়েছে মরশুমি ফুলের বাগান। বাগানবাড়িটিও অপূর্ব। ফলের বাগানও দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে।

চিলকিগড়

ঝাড়গ্রাম শহর থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে চিলকিগড়। গিধনি রেল স্টেশন থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার। তবে ঝাড়গ্রাম থেকে বাসে বা অটোতে চিলকিগড় যাওয়া সুবিধাজনক। চিলকিগড়ে আছে জামবনির রাজাদের প্রাসাদ, দুর্গ, ডুলুং নদী, কালাচাঁদের নবরত্ন মন্দির, শিবের একরত্ন মন্দির এবং চিলকিগড়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবী কনকদুর্গার সাবেক এবং হাল মন্দির। ডুলুং নদীর তীরে একসময় জামবনি রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে এই রাজারা ধলভূমগড়ে রাজত্ব করতেন। রাজবাড়ি ডুলুং নদীর পশ্চিম তীরে। পূর্ব তীরে জঙ্গলের মধ্যে কনকদুর্গার মন্দির। পাশাপাশি দুটি মন্দির। একটি পুরনো অন্যটি নতুন। ঝাড়গ্রাম শহর থেকে চিলকিগড় যাওয়ার রাস্তাটি বেশ মনোরম। মাঝে মাঝে রাস্তার দুপাশে শালের গভীর জঙ্গল। রোমাঞ্চকর ভ্রমণ। কিছুটা গিয়ে ডানহাতে রাস্তা চলে গেছে কনকদুর্গার মন্দিরের দিকে।

ডুলুং নদীর পশ্চিম তীরে রাজবাড়ি। বিশাল লোহার দরজা। ঢুকেই চত্বর। আগে বাগিচা ছিল, এখন নেই। বাঁয়ে একটি মন্দির, ডাইনে রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের গায়ে বাঁদিকে আর একটি মন্দির। জামবনির সামন্ত ভূস্বামী দেওধবলদেব পরিবারের এই দুটি মন্দিরের একটি শিবের, অন্যটি কৃষ্ণের। কালাচাঁদ মন্দিরটি পূর্বমুখী নবরত্ন মন্দির। শিবের মন্দির দক্ষিণমুখী একরত্ন। এদের স্থাপত্যশৈলী অভিনব। কারণ এই দুটিতে দালান মন্দিরের ওপর নবরত্ন এবং একরত্ন সংযোজিত হয়েছে। এটি প্রথাবহির্ভূত রীতির। রাজবাড়ির একাংশে ট্যুরিস্ট খোলা হয়েছে রাজ্য পর্যটন উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে।

চিলকিগড়ে ডুলুং নদীর পূর্ব তীরে কনকদুর্গা দেবীর মন্দির দুটি। একটি পুরনো বা সাবেক, অন্যটি হাল বা নতুন। দেবী কনকদুর্গা চিলকিগড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁর পুরনো মন্দির পূর্বমুখী পঞ্চরত্ন। মন্দিরটি ইটের তৈরি। ভিত্তি বেদি মাকড়া পাথরের। এটি দৈর্ঘ্যে ২৭ ফুট ৬ ইঞ্চি [৮.৩ মিটার], প্রস্থে ২১ ফুট [৬.৪ মিটার] ও উচ্চতায় ৪০ ফুট [১২.১ মিটার]। এটি অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত। অর্থাৎ এর বয়স প্রায় ৩০০ বছর। তবে মন্দিরটি জীর্ণ। তাই মূর্তিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে নতুন মন্দিরে। নতুন মন্দিরের চূড়া গির্জার মতো সূঁচালো। মার্বেল পাথরের লিপি ফলকে লেখা, "শ্রীশ্রীকনকদুর্গা। শিল্পী শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র দেওধবলদেব / ৯ পৌষ সন ১৩৪৪ সাল।" প্রতিষ্ঠাতা রাজা জগদীশচন্দ্র ধবলদেব। অর্থাৎ নতুন মন্দিরের বয়স ৬০ বছর মাত্র। দেবী কনকদুর্গা অশ্বারূঢ়া, ত্রিনয়না এবং চতুর্ভুজা। ওড়িশা থেকে স্থপতি আনিয়ে পুরনো কিংবা নতুন দুটো মন্দিরই বানানো হয়েছিল। মন্দিরের চারপাশে বহু শিবলিঙ্গ প্রোথিত দেখা যায়।

চিলকিগড় দেখে ঝাড়গ্রামে ফিরে এসে রাত কাটানো দরকার কারণ আমাদের পরবর্তী ও শেষ গন্তব্য কাঁকড়াঝোর। ঝাড়গ্রামে বেশ কয়েকটি লজ আছে রাত্রিবাসের জন্য অগ্রসেন ধর্মশালাতেও থাকা যায়। ব্যবস্থাদি ভালোই। ঘুরে দেখার জন্য অটো ভাড়া করা ভালো। সময় বাঁচবে এবং একদিনেই সব দেখে নেওয়া যাবে একটু সকাল সকাল বেরিয়ে। চিলকিগড়েও থাকা যেতে পারে। বেশ আকর্ষণীয় জায়গা। আমাদের পরিক্রমায় শেষ গন্তব্য কাঁকড়াঝোর। চলুন ঝাড়গ্রাম থেকে কাঁকড়াঝোর যাই।

কাঁকড়াঝোর

মেদিনীপুর জেলার পাহাড়সমৃদ্ধ, অরণ্য অধ্যুষিত, ঝরনা ঝংকৃত সবচেয়ে সুন্দর অঞ্চল হল ঝাড়গ্রাম মহকুমার উত্তর-পশ্চিমাংশ। এই দিকটার সুন্দরতম এলাকা হল কাঁকড়াঝোর বনাঞ্চল। শাল, সেগুন, মহুয়া, কেন্দু, আকাশমণি ইত্যাদির গভীর অরণ্য কাঁকড়াঝোরের চারপাশে। রয়েছে ঝোরা, ঝরনারাও। ময়ূর-ঝরনা তাদের অন্যতম এবং আকর্ষণীয়। এই জঙ্গলে ভালুক, বুনো শুয়োর, হরিণ, খরগোস আছে। কখনও-সখনও চিতাবাঘও আসে। এখানে স্থায়িভাবে বাস করে দুটি

হাতি। তবে বর্ষাকালে দলমা পাহাড়ের হাতি নেমে আসে দু-তিনটি দলে। তখন হাতির সংখ্যা বেড়ে পঞ্চাশও ছাড়িয়ে যায়। শীতকালে হাতিরা থাকে না। তখন অরণ্যের শ্যামলিমাও কমে। বেশ কিছু গাছের পাতা ঝরে। তবে শীতের চাঁদনি রাতে বনভূমি মায়াময় হয়। সন্ধ্যায় কাঁকড়াঝোরের বনবাংলোয় বসে অরণ্যের নিস্তব্ধতা অনুভব করা যায়। দূর থেকে ভেসে আসে মাদল-ধামসার আওয়াজ। আদিবাসী কোনও গ্রামে নাচের আসর বসেছে তা জানান দেয়। সব মিলিয়ে সে এক মোহময়ী আরণ্যক পরিবেশ। কাঁকড়াঝোর ভ্রমণ তাই এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। এই ভ্রমণ বহুকাল স্মৃতিতে জাগরূক থাকে।

ঝাড়গ্রাম থেকে বেলপাহাড়ি ৪০ কিলোমিটার। বেলপাহাড়ী থেকে তামাজুড়ির পথে পড়ে ভুলাভেদা [১০ কিমি]। বাঁশপাহাড়ি দুনম্বর রেঞ্জের অফিস ভুলাভেদায়।

বনবাংলো, কাঁকড়াঝোর ছবি : লেখক

এখান থেকে পারমিট নিতে হয় অরণ্য-প্রবেশের। ভুলাভেদার এই অফিসের পাশ দিয়েই কাঁকড়াঝোর অরণ্যের মাঝখানে অবস্থিত বনবাংলো যাওয়ার পথ। ভুলাভেদা থেকে ওই বনবাংলো ১০ কিলোমিটার। জঙ্গলাকীর্ণ এই পাহাড়ি পথ দিনে দিনেই অতিক্রম করতে হয়। না হলে, পথ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা। নিজেদের গাড়ি না থাকলে জিপ ভাড়া করতে হবে। ঝাড়গ্রাম কিংবা বেলপাহাড়ি থেকে জিপ ভাড়ায় পাওয়া যায়।

কাঁকড়াঝোর ভ্রমণের সঙ্গে একটা আদিবাসী গ্রামও ঘুরে নেওয়া যায়। জানা যায় তাদের জীবনচর্যা। এই জঙ্গলের নীচের দিকে বাস করে কিছু মুণ্ডা, সাঁওতাল এবং ভূমিজ। এরা মূলত কৃষিজীবী। চাষবাসই এদের জীবিকা। এদের বাস নদী বা ঝোরার ধারে। জীবনযাত্রার আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে এই সব উপজাতীয়দের। উৎসুক ভ্রমণার্থীরা সেগুলির হদিস পেতে পারেন কাঁকড়াঝোরের গ্রাম পরিক্রমায়। জঙ্গলে সাধারণত জুন থেকে অক্টোবর বেড়ানো যায় না। অনুমতিও দেওয়া হয় না ওই চার মাস জঙ্গলে প্রবেশের। কিন্তু কাঁকড়াঝোর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বছরের সারা সময়ই কাঁকড়াঝোরে আসা। অনুমতিও মেলে।

কীভাবে যাবেন

হাওড়া স্টেশন থেকে স্টিল এক্সপ্রেস, টাটা প্যাসেঞ্জার ইত্যাদির যে কোনও একটি ধরে ঝাড়গ্রাম। রেলপথে দূরত্ব ১৫৫ কিমি। হাওড়া বা এসপ্লানেড থেকে বাসে সরাসরি আসা যায় বেলপাহাড়ি। সেখান থেকে ২৬ কিমি দূরে কাঁকড়াঝোরের বনবাংলো। ঝাড়গ্রাম থেকে কাঁকড়াঝোর যাতায়াত ও একরাত্রি বনবাংলোয় থাকার জন্য জিপ ভাড়া নেয় ১৪০০-১৫০০ টাকা। আর বেলপাহাড়ি থেকে কেবল যাওয়া-আসা ৫০০ টাকা। বেলপাহাড়িতে জিপসংখ্যা কম, তাই এখান থেকে জিপ অনেক সময় নাও পেতে পারেন। তাই ঝাড়গ্রাম থেকে জিপ ভাড়া করাই সুবিধাজনক। বাসে ভুলাভেদা এসে পায়ে হেঁটেও অনেকে বনবাংলো আসেন।

কোথায় থাকবেন

কাঁকড়াঝোরের বনবাংলোটি সুন্দর। কিন্তু এখানে জায়গা পেতে হলে বহু আগে থেকেই বুকিং করতে হয়। বুকিং দেন : Divisional Forest Officer, West Midnapore Division, P.O. : Jhargram, Dist : Midnapore. এদের দূরভাষ : ০৩২২১-৫৫১৫০। পারমিট ভুলাভেদা অফিসই দেয়। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম একটা 'ট্যুরিস্ট হোস্টেল' বানিয়েছে বনবাংলোর পাশে। এগারো বেডের ডর্মিটরি। এর অগ্রিম বুকিং হয়, ৩/২ বিবাদী বাগ, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে। এদের দূরভাষ : ২২৪৮-৮২৭১ (০৩৩)। এটা ট্যুরিজমের অফিস।

আর আছে গোপীনাথ মাহাতোর 'মাহাতো লজ'। খুবই সাধারণ মানের কিন্তু কাঁকড়াঝোরে যথেষ্ট উপযোগী। বনবাংলো বা ট্যুরিস্ট হোস্টেল যেখানেই থাকুন না কেন খাবার রেশন বয়ে নিয়ে যেতে হবে। মাহাতো লজে সে ঝঞ্ঝাট নেই। তবে মাহাতো লজের খাবার খুবই সাধারণ মানের। মাহাতো লজে অগ্রিম বুকিংয়ের জন্য লেখা যায় এই ঠিকানায় : গোপীনাথ মাহাতো, মাহাতো লজ, কাঁকড়াঝোর পোঃ ভুলাভেদা, জেলা : মেদিনীপুর। মাহাতো লজ সময়ে-অসময়ে একশো জন ভ্রমণার্থীরও থাকা-খাওয়া বন্দোবস্ত করে দিতে পারে।

কাঁকড়াঝোর বেড়ানোর ভালো সময় বর্ষা থেকে বসন্ত। গরমকালটা বাদ দেওয়া ভালো। এ অঞ্চলে বেশ গরম পড়ে সে সময়। ঋতু পরিবর্তনে অরণ্য রূপ বদলায়। কাঁকড়াঝোর তার সৌন্দর্যে, বৈশিষ্ট্যে অনন্য হয়ে থাকে।

লেখক : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের যুগ্ম সচিব

মেদিনীপুরের দামাল বন্যহস্তী

মেদিনীপুরের বন ও বন্যপ্রাণী

কল্যাণ চক্রবর্তী

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মেদিনীপুরের বন মূলত তিনটি জমিদারের হাতে ন্যস্ত ছিল—এক, মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানি। দুই, ঝাড়গ্রাম, লালগড় ও রামগড়ের রাজা ও তিন, মুর্শিদাবাদের নবাব। মেদিনীপুর জেলার বন তখন বেশ সুবিন্যস্ত ও বড় বড় খণ্ডে বিভক্ত ছিল। জমিদারী আইনে ওই সব বনানী নিয়ন্ত্রিত ছিল। বলাবাহুল্য ওই সময়ে মেদিনীপুরের বন সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক প্রথায় ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। বনের পরিবেশগত ভূমিকা সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষিত হচ্ছিল। উপেক্ষিত ছিল বনের সমাজভিত্তিক ভূমিকাও। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মুনাফাই ছিল বন পরিচালনার উদ্দেশ্য। এর অবশ্যম্ভাবী ফল যা হওয়ার তা হল। বন হারাতে লাগল তার স্বাভাবিক ঘনত্ব। ভূমিসংরক্ষণ প্রচেষ্টার বদলে ভূমিক্ষয় ঘটতে লাগল সমগ্র মেদিনীপুর জেলার বনের পরিধিতে। গাছের বৃদ্ধিতে ঘটতে লাগল বিরাট অন্তরায়। ফলে গাছ ক্রমশই তার স্বাভাবিক মান বজায় রাখতে অপারগ হতে থাকল। প্রাকৃতিক পুনর্নবীকরণেও ভাঁটা পড়ল। বনের চেহারা হতে থাকল হতশ্রী। জমিদাররা বেছে বেছে ভাল ভাল গাছ কেটে নিতে থাকল বনের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করেই। শালবৃক্ষের কপিস পুনর্নবীকরণের জন্য ৫ থেকে ১০ বছর বাদে বাদে বন কাটা হতে থাকল। বনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যও এতে বিঘ্নিত হচ্ছিল। শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ শালবন ৬ বছরের কোটেশনে কাটা

পশ্চিম মেদিনীপুরে জামবনি গ্রামে পরিযায়ী সারস পাখির ঝাঁক

বদলে অন্যান্য গাছ বনে জন্মাতে লাগল। কোথাও কোথাও বন তার স্বাভাবিক ঘনত্ব হারাতে লাগল।

বনের অবস্থান

মেদিনীপুর জেলা ২১°৩৬´ ও ২২°৫৭´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৬°৩৩´ ও ৮৮°১১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত ও পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে অবস্থিত সর্ববৃহৎ জেলা। মোট ক্ষেত্রফল ১৩১৩২ বর্গকিলোমিটার। উত্তর সীমায় বাঁকুড়া ও হুগলি জেলা, পূর্বে হুগলি, হাওড়া ও ২৪-পরগনা, উত্তর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও ওড়িশা রাজ্য, পশ্চিমেও ওড়িশা, বিহার রাজ্য ও পুরুলিয়া জেলা রয়েছে।

হতে থাকল। নতুন শাল কপিস বনে এমনকি গরু চরানোও হচ্ছিল। যার ফলে নতুন কপিস চারাগাছগুলি বড় গাছে পরিণত হতে বাধা পাচ্ছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি অবৈজ্ঞানিক কাজ জমিদারী প্রথায় সম্মতি পেয়েছিল। ক্ষেত মজুররা তাদের ক্ষেতে ধাতব ছাই ও অন্য জৈব সারের জন্য বনভূমিতে আগুন লাগানোরও অনুমতি পেতেন জমিদারী প্রথায়। এর ফলে সাময়িকভাবে ক্ষেত মজুররা লাভবান হলেও বনের ক্ষতি হয় সর্বাধিক। বনে আগুন লেগে বনের আগাছা ও অন্য ছোট গাছ পুড়ে ছাই হয়ে যায় ও জৈবসার, হিউমাস প্রভৃতি বৃষ্টির জলে ধুয়ে কৃষিক্ষেত্রে চলে আসে ও এর ফলে বনের পরিবেশ ভারসাম্যহীনতায় অনুর্বর হতে থাকে। এ ছাড়া তো রয়েছে আদিবাসী মানুষের বার্ষিক শিকার। যার ফলে বন ও বন্যপ্রাণীদের নির্বিচারে হত্যালীলা চলতে থাকে। বনের সামগ্রিক পরিবেশ এতে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভারতীয় বন আইন, ১৯২৭ বলবৎ থাকলেও জমিদারদের বনসংরক্ষণের কোনও ক্ষমতা ওই আইনে ছিল না। যার ফলে তারা প্রধানত ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের উপরই নির্ভরশীল। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড বনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিবারণে অপারগ। জমিদারেরা অবশ্য নিজস্ব বনসংরক্ষক রাখতেন কিন্তু তাদের সংখ্যা সীমিত ও তাদের ক্ষমতা আরও সীমাবদ্ধ। তাই বনের ধ্বংস সমানে চলতে লাগল। ফলে জেলার মূল বৃক্ষ প্রজাতি শাল গাছের ধ্বংস হতে লাগল ও শাল গাছের

জলবায়ু

মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও দক্ষিণ অংশের জলবায়ু ভিন্ন ভিন্ন। উত্তরে প্রখর গ্রীষ্ম ও সহনীয় শীত যার ব্যাপ্তি স্বল্প সময়ের। দক্ষিণে আবহাওয়া উষ্ণ, আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে ও সেখানে শীতের প্রখরতা যথেষ্ট কম। বঙ্গোপসাগরের নৈকট্য জলবায়ুর উপরে এখানে প্রভাব ফেলেছে। গড় উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রা গ্রীষ্মে যথাক্রমে ১০০° ফারেনহাইট ও ৭৫° ফারেনহাইট ও শীতকালে অনুরূপ পরিসংখ্যান হচ্ছে ৮৪° ফারেনহাইট ও ৫৫° ফারেনহাইট।

বৃষ্টিপাত গড় বছরে ২.০৩ মিটার থেকে ১.১৫ মিটার যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তরে। বৃষ্টি হয় সাধারণত জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

বনসৃজনে অগ্রগতি

বনের গাছ

মেদিনীপুর জেলার প্রধান বৃক্ষ শাল। তার সঙ্গে রয়েছে কেঁদ, আসন, কুর্চি, পিয়াল, সিধা, নিম, মহুয়া, গলগলি, পিয়াশাল, রহড়া, কুসুম, পলাশ, চকলতা, গামার, ভেলা, পরাশি, বেল, আমলকি, হরিতকি প্রভৃতি।

ঘুমপাড়ানি গুলিতে বন্দী মত্ত হাতি

জনবসতির কাছে যে সব বন সেখানে ছোট ছোট কপিস শালের বিস্তার লক্ষণীয় যাকে 'ঝাটি জঙ্গল' বলা হয় সাধারণভাবে। এখানে শালগাছের সঙ্গে কুর্চি, কুসুম করঞ্জ প্রভৃতি গাছও দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকভাবে জেলার শাল জঙ্গলকে 'ড্রাই পেনিনসুলার শাল' নামে আখ্যা দেওয়া যায়। চ্যাম্পিয়ন ও মেঠের 4B–CZ বনের টাইপে মেদিনীপুরের বনকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়।

জমিদারী প্রথায় মেদিনীপুরের বনপরিচালনার অবশ্যম্ভাবী ফল হোল ভূমিক্ষয়। বনের ভেতরে, বন ও বসতির মধ্যে বিরাট বিরাট ফাঁকা জমির সৃষ্টি হতে থাকল। বনের মালিকেরা সে সময় বন-পরিচালনার জন্য আর্থিক ব্যয় করতেও অপ্রস্তুত ছিলেন। তাই বন ক্রমশই হতশ্রী হতে থাকল। ভূমিক্ষয়ের বিষময় ফল ক্রমশই মাটি ও জল সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করে প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতার কারণ হতে থাকল। ১৯৩৮ সালে তদানীন্তন বাংলা সরকার বন-ধ্বংসের কারণ অনুসন্ধানে ও তার সমাধানের পন্থা-পদ্ধতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। এই কমিটির সুপারিশমতো বেঙ্গল প্রাইভেট ফরেস্ট অ্যাক্ট ১৯৪৫ ও পরে ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইভেট ফরেস্ট অ্যাক্ট, ১৯৪৮ তৈরি হল সুষ্ঠু বনপরিচালনার উদ্দেশ্যে। এরপর থেকেই সুষ্ঠু বিজ্ঞানভিত্তিক বন পরিচালনা শুরু হল। শুরু হল কৃত্রিম বন সৃষ্টি পশ্চিমবঙ্গে লালমাটিতে। এই কৃত্রিম বা মনুষ্যসৃষ্ট বন ভূমিক্ষয় রোধে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি, শাল, শিরিষ, সেগুন, পিয়াল, পিয়াশাল প্রভৃতি বৃক্ষপ্রজাতির কৃত্রিম বন সৃষ্টি হতে লাগল। শালের কপিস বনও বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরিচালিত হতে লাগল।

ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বনগুলি বিজ্ঞানসম্মত কর্মপরিকল্পনা দ্বারা পরিচালিত হতে শুরু হল। পরবর্তীকালে ওয়েস্ট বেঙ্গল এস্টেট অ্যাকুইসিশন আইন, ১৯৫৩ এর বলে সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বন সরকারি মালিকানায় হস্তান্তরিত হল। এর ফলে মালিকানা বদলের সময়ে বেশ কিছু অসাধু ব্যক্তি বনের প্রচুর ক্ষতি সাধন করল ও বন-সংহার ত্বরান্বিত হল। যাই হোক হস্তান্তর পর্ব শেষে বিজ্ঞানভিত্তিক বন পরিচালনায় ও কৃত্রিম বন সৃষ্টির মাধ্যমে বনের হৃত স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার শুরু হল। এভাবে বিজ্ঞান ভিত্তিক ফরেস্ট্রির সূচনা হল পশ্চিমবঙ্গের লালমাটির বনে।

বনে আইনের শাসনও ভালভাবে বলবৎ হতে থাকল বিভিন্ন ভারতীয় বন আইন, ১৯২৭ ও অন্যান্য আইনের মাধ্যমে। অপরাধীদের সাজা হতে শুরু হল বন-আইনে।

●

কৃত্রিম বা মনুষ্যসৃষ্ট বন ভূমিক্ষয় রোধে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি, শাল, শিরিষ, সেগুন, পিয়াল, পিয়াশাল প্রভৃতি বৃক্ষপ্রজাতির কৃত্রিম বন সৃষ্টি হতে লাগল। শালের কপিস বনও বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরিচালিত হতে লাগল। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বনগুলি বিজ্ঞানসম্মত কর্মপরিকল্পনা দ্বারা পরিচালিত হতে শুরু হল।

●

শালের ঘন জঙ্গল

ধ্বংসপ্রাপ্ত না হোক প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যে সমস্ত জায়গায় শালের বড় জঙ্গল ছিল এই ৩০ বছরে তা শালের ছোট ছোট ঝোপঝাড়ে পরিণত হয়েছিল। আবার যে সমস্ত জঙ্গল শালের ছোট ঝোপঝাড়, তা হল আটাং-কুরচির ঝোপে পরিণত, আর যা ছিল আটাং-কুরচির বন তা ধীরে ধীরে বনহীন শূন্য প্রান্তরে পর্যবসিত হচ্ছিল। ৩০ বছরে এই পরিবর্তন, বড় থেকে ছোট বনে, ছোট বন থেকে ঝোপঝাড়ে এবং ছোট ঝোপ-ঝাড় থেকে বনহীন ক্ষয়িষ্ণু জমিতে এই পরিবর্তন শুধু মেদিনীপুরের বনের ইতিহাস নয় তা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম এবং প্রায় হিমালয় থেকে শুরু করে কেরল পর্যন্ত সমস্ত জায়গাতে বিস্তৃত।

এই অবস্থা থেকে হঠাৎ কেমন করে আজ মেদিনীপুরের বন পুনর্বাসিত হতে শুরু করছে। কে, কেন এবং কোথায় হঠাৎ কোন এক সোনার কাঠির স্পর্শে এই পরিবর্তন আনতে সাহায্য করল ?

এর উত্তর হচ্ছে—মেদিনীপুরের গ্রামের মানুষ বিশেষ করে যাঁরা বনাঞ্চলের ধারে থাকেন তাঁরাই এই পরিবর্তন এনেছেন। পরিবর্তনের একটা ছোট ইতিহাস বলা দরকার। এই ইতিহাসের শুরু আরাবাড়ি থেকে, যে কারণে আরাবাড়ি আজ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আলোচিত। ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭২ সালে বনবিভাগের অনুরোধে ১১টি গ্রাম প্রায় ১২৫৬ হেক্টর বনকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিতে রাজি হয়। তাদের সঙ্গে এই মতো একটি মৌখিক চুক্তি হয় যে তারা রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনমতো জ্বালানি কাঠ, গোরুর খাদ্য ঘাস বা কিছু কিছু চরানো, বনের অন্যান্য সামগ্রী যেমন পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি নিতে পারে। তারা যদি রক্ষণাবেক্ষণ সুষ্ঠুভাবে করে, তবে ওই ধ্বংসপ্রাপ্ত বন যখন বড় হবে তখন তারা এর ¼ ভাগ পাবে। অর্থাৎ যখনই পরিকল্পনা অনুযায়ী এই বন কাটা হবে তখন সেই গাছ বিক্রি করে যা পাওয়া যাবে, তার ¼ ভাগ বা শতকরা ২৫ ভাগ করে দেওয়া হবে এই ১১টি গ্রামের প্রায় ৬৫০টি পরিবারকে। দেখা গেল পরিবারেরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি রাখলেন, প্রয়োজনমতো জ্বালানি এবং অন্যান্য সামগ্রীও কাটলেন। অথচ প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত বন চোখের সামনে একটি পুনর্বাসিত বনে রূপান্তরিত হতে থাকল। হঠাৎ যে সমস্ত পরিবার বনের ধ্বংসের দিকে তাকিয়ে বোঝবার চেষ্টা করত আর কতদিন এই সবুজ দেখা যাবে, তারা দেখল যে সেই বনে আবার শাল, বহেরা, সন্দন, পিয়াশাল মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

যে আরাবাড়ি বন ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই একই বন ৩ বছরে, বিরাট মহীরুহ হয়ে

●

ইতিহাসের শুরু আরাবাড়ি থেকে,
যে কারণে আরাবাড়ি আজ
পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আলোচিত।
১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭২ সালে
বনবিভাগের অনুরোধে ১১টি গ্রাম
প্রায় ১২৫৬ হেক্টর বনকে রক্ষণাবেক্ষণের
ভার নিতে রাজি হয়।

●

রাস্তার দুপাশে পুনরুজ্জীবিত শাল অরণ্য—ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর

না হোক নিশ্চয় পুনর্বাসনের পথে। ১৯৮০ দশকের মাঝামাঝি যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমতি জারি করল যে আরাবাড়ির প্রায় ৬৫০টি পরিবার পরিকল্পনা অনুযায়ী বন বিক্রির শতকরা ২৫ ভাগ পাবে (যা পূর্বেই একটি মৌখিক শর্ত ছিল) তখন হঠাৎ মেদিনীপুরের বিভিন্ন দিকে দিকে সাড়া পড়ল। যদিও ১৯৮০তে প্রথমে কিছু গ্রাম কোনও কোনও বনের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিতে শুরু করেছিল, ১৯৮০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই রক্ষণাবেক্ষণ একটি বিরাট আন্দোলনের আকার নিল। বিভিন্ন গ্রামের লোকেরা তাদের নিকটের বনভূমি রক্ষণাবেক্ষণ করতে শুরু করল একই শর্তে যে শর্তে আরাবাড়ির শুরু। অবশ্য তার মানে এই নয় যে মেদিনীপুরের বনে কোনও সমস্যা নেই বা এখনও তা কোনও কোনও অঞ্চলে অন্যায়ভাবে কাটা হচ্ছে না। তবে সব জুড়ে ১৯৮০ সালে মেদিনীপুরের যে বীভৎস অবস্থা, তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

এবারে আসা যাক মেদিনীপুরের এই বনের অন্য কয়েকটি প্রসঙ্গে। এই সময়ে বনের ইতিহাস ও বনের গঠন সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। প্রায় ৩০০-৩৫০ বছর আগে মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে পর্যায়ক্রমে চাষ—SHIFTING CULTIVATION পদ্ধতি প্রচলন ছিল। এই পদ্ধতিতে তখনকার কৃষকরা জঙ্গল কেটে গাছের গুঁড়িগুলি আগুনে পুড়িয়ে সেই জমি চাষ করত। পোড়া জঙ্গলের ছাই সেই চাষের মাটিকে অনেকটা সারের মতো উর্বর করত। পরের বছর বা কয়েক বছর বাদে যখন মাটির উর্বরতা কমে যেত তখন কৃষকরা আবার অন্য একটি জায়গায় জঙ্গল কেটে এবং পুড়িয়ে আবার চাষের জমি তৈরি করত। এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় চাষ করতে করতে তারা প্রথম জায়গায় ফিরে আসত, যখন সেখানে আবার বন সৃষ্টি হয়েছে। এই পর্যায়ক্রমে চাষ বনের ক্ষতি করে, যদি কৃষকরা কয়েক বছরের পর পরই একই জায়গায় ফিরে ফিরে আসে। কিন্তু ৩০০-৩৫০ বছর আগে জনসংখ্যা ছিল অনেক কম। কৃষকের সংখ্যা আরও কম তাই তাদের কয়েক বছরের মধ্যে একই জায়গায় ঘুরে এসে চাষ করার প্রয়োজন পড়ত না। ১৯ শতকের ইংরেজ সরকার যখন 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' শুরু করল তখন এই সব বন যা পূর্বে গ্রামের লোকেরা ব্যবহার করতেন তা হঠাৎ জমিদারির মালিকানাতে এসে পড়ল। এই অবস্থায় অর্থাৎ জমিদারের মালিকানা আর গ্রামের লোকের জমির প্রয়োজনের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হল। ১৯৫৩ সাল

●

১৯৭০-১৯৭২ সালে আরাবাড়ি এবং ১৯৮০ সালের পর গ্রামের লোকদের সঙ্গে মিতালি করে— JOINT FOREST MANAGEMENT বন রক্ষণাবেক্ষণ করা শুরু হল, তা বলা যেতে পারে একটি বিপ্লব।

●

পর্যন্ত মেদিনীপুরের বন জমিদারের মালিকানাতে ছিল। জমিদারেরা ওই বনকে বিক্রি করতেন প্রয়োজনমতো এবং গ্রামের লোকেদের কিছু কিছু ছাড় দিতেন। কিন্তু বনকে ভালভাবে রাখার বা উন্নত করার কোনও চেষ্টা এই জমিদারেরা করেনি। তবু এ কথা আমরা বলতে বাধ্য ১৯৫৩ সালে বনের অবস্থা ১৯৮০-র বনের অবস্থা থেকে অনেক ভাল ছিল। ১৯৫৩ সাল নাগাদ স্বাধীন সরকার 'এস্টেট অ্যাকুইজেশন অ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে জমিদারির সমস্ত বন সরকারি বনে পরিণত করল। অর্থাৎ সরকার হল এই বনের মালিক। এই বনের পরিচালনার ভার পড়ল বনবিভাগের কাছে। ১৯৬০ সাল থেকে বৈজ্ঞানিক মতে বনবিভাগ এই বনকে পরিচালনা করতে শুরু করল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বনবিভাগের সঙ্গে গ্রামের মানুষের দ্বন্দ্ব ক্রমেই বেড়ে চলল। বনবিভাগ প্রতি বছর বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কতক পরিমাণ বন নিলামে বিক্রি করত। মেদিনীপুরের বিভিন্ন কাঠের ব্যবসায়ীরা এই কাঠ সংগ্রহ করে কলকাতা, বিহারে এবং অন্য শহরে বিক্রি করত। বৈজ্ঞানিক মত অনুযায়ী এই গাছ কাটার পরে অন্তত ৩-৪ বছর বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় রাখা উচিত। যদি তা করা হয়, গাছের মুড়ো থেকে আবার নতুন গাছ বেরিয়ে ১০-১৫ বছরে আবার একটি খুঁটির বনে পরিণত হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে প্রথম দু-তিন বছরের মধ্যে গ্রামের লোকেরা ছোট ছোট নতুন শাখা-প্রশাখা কেটে বা এই বনে গোরু চরিয়ে এই সব বনকে ক্ষয়িষ্ণু করতে সাহায্য করেছেন। এর কারণ বনবিভাগ বন থেকে গ্রামের লোকদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বনজাত জিনিসের সরবরাহের বন্দোবস্ত করতে পারেনি। যে কারণে গ্রামের লোকেরা প্রায়ই বিনা অনুমতিতে বনে আসতেন হয় জ্বালানির জন্য অথবা শালের খুঁটি বা জ্বালানি নিয়ে ছোট ছোট শহরে বিক্রি করে সংসার চালাতেন। অর্থাৎ বনবিভাগের বন পরিচালনা বিজ্ঞানসম্মত ছিল কিন্তু দুটি ফাঁক ছিল। প্রথমত, গ্রামের লোকদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী না দিয়ে ব্যবসায়ীদের বিক্রি করত। দ্বিতীয়ত, বনের বা অন্যান্য বিভাগ যথেষ্ট কাজের সৃষ্টি করতে পারেনি, ফলে গ্রামের লোকেরা বাধ্য হয়েছে বনের সামগ্রী বিনা অনুমতিতে নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে।

১৯৬০ সাল থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছায়। এই সময়ে বনবিভাগ চেষ্টা করছে কোনওমতে বনকে বাঁচাতে আর গ্রামের মানুষ চেয়েছে কোনওমতে বেঁচে থাকতে। এই অবস্থায় ১৯৭০-১৯৭২ সালে আরাবাড়ি এবং ১৯৮০ সালের পর গ্রামের লোকদের সঙ্গে মিতালি করে—JOINT FOREST MANAGEMENT বন রক্ষণাবেক্ষণ করা শুরু হল, তা বলা যেতে পারে একটি বিপ্লব।

আর একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন তা হল বনহীন ক্ষয়িষ্ণু জমিতে বনবিভাগের নতুন করে চাষ। ১৯৬০ সাল থেকে বনবিভাগ প্রথম ইউক্যালিপ্টাস চাষের প্রচলন করল মেদিনীপুরে। এ ছাড়া আকাশমণি এবং মিনিজিরি গাছও যথেষ্ট পরিমাণে লাগানো হতে থাকে। আজ মেদিনীপুরে বিভিন্ন স্থানে এই সব গাছের আবাদ দেখা যায়। ১৯৮০-তে আরও একটি বিরাট পরিবর্তন আনে বনবিভাগ। তারা সমাজভিত্তিক বনসৃজনের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ চারা দিতে থাকেন মানুষকে। গ্রামের মানুষ তাঁদের ক্ষেতের ধারে, পুকুরের পাড়ে, বাড়ির আঙিনায় নিজের ক্ষয়িষ্ণু জমিতে বেশ কিছু আয়ের বন্দোবস্ত করতে পেরেছেন।

বন প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তা হল বনের জন্তু-জানোয়ার, পাখি, কীটপতঙ্গের অবলুপ্তি। আমাদের অনেকেরই জানা আছে যে এককালে এমনকী ১৯৫০ সালে বা তারও কিছু পরে ভাল্লুক, চিতাবাঘ, হরিণ, পাহাড়ে হাতি ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব ছিল। পূর্বাঞ্চলের সমতল ভূমিতে নেকড়ে, বনবিড়াল, খরগোস ইত্যাদি প্রায়ই দেখা যেত। বন ক্ষতিগ্রস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই সব বন্যপ্রাণী অবলুপ্ত হতে চলেছে। ভাল্লুক, নেকড়ে বাঘ, হরিণ প্রায় এখন দেখা যায় না। হাতি আসা বা থাকাও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি নাগাদ। কিন্তু বনের সমৃদ্ধির যে শুরু হয়েছে গত ১০ বছরে তাতে কিছু কিছু বন্যপ্রাণী আবার দেখা যাচ্ছে। বিহারের ধ্বংসপ্রাপ্ত বন থেকে এখন অনেক হাতিও প্রায়ই মেদিনীপুরের বনে আসতে শুরু করেছে। হাতি আসার দরুন যদিও গ্রামের কিছু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তবুও তাদের প্রত্যাবর্তন একটি সুখের বিষয়। অর্থাৎ আমরা যে বলছি মেদিনীপুরের বন সমৃদ্ধির পথে তা আরও প্রমাণিত হচ্ছে এই হাতির দলের যাওয়া-আসাকে ঘিরে।

মেদিনীপুরের বন সমাজভিত্তিক বনসৃজনের পরিকল্পনায় এবং গ্রামের মানুষের কল্যাণে, পুনর্বাসনের পথে। তবুও এ কথা বলতে হবে যে আমাদের সবাইকে, বনবিভাগকে, পঞ্চায়েতকে, গ্রামের সকল মানুষকে সচেতন থাকতে হবে যাতে এই পুনর্বাসনের পথ রুদ্ধ না হয়। যেন তা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে চলে।

লেখক : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

মেদিনীপুরে বন্যা-বিপর্যয়

মেদিনীপুর জেলায় বন্যার পৌনঃপুনিকতা ও প্রশমন ব্যবস্থার গুরুত্ব

পুলিনবিহারী বাস্কে

সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় প্রতি বছরই জেলার কোনও না কোনও অংশে বন্যার প্রকোপ মানুষকে সহ্য করতে হচ্ছে। নব পর্যায়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ও বামফ্রন্ট সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও আশু উদ্যোগ গ্রহণ করার ফলে দুঃখ-দুর্দশা কমিয়ে আনা এবং ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে হচ্ছে, তাই আর্ত মানুষের কান্না, ট্রেনে বাসে শহর-গঞ্জে ভিক্ষাবৃত্তি, যত্রতত্র অগণিত পশুর শব মহামারী দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু বন্যা প্রশমনের ব্যাপারে কার্যত কোনও ফললাভ করা যাচ্ছে না। বরং দেখা যাচ্ছে, দশ বছর আগেও যে সব জায়গার মানুষ কখনও বন্যার কথা ভাবেননি, তাঁদেরও বন্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। অর্থাৎ নতুন নতুন জায়গা বন্যাপ্লাবিত হচ্ছে। আর আগে যেমন ৫-১০ দিনে বন্যার জল নেমে যেত এখন তা হচ্ছে না। কোথাও কোথাও জল জমে থাকছে ১৫ দিন হতে ১ মাস পর্যন্ত।

প্রথমেই আমাদের জেলার নদী-অবস্থা (River System) বন্যাপ্রবণ এলাকার চিত্র তুলে ধরি। চন্দ্রকোনা-২ পঞ্চায়েত সমিতির কিছু অংশ ব্যতীত গোটা ঘাটাল মহকুমা এবং খড়্গাপুর-১, খড়্গাপুর-২, নারায়ণগড় ও দাঁতন-১, দাঁতন-২ পঞ্চায়েত সমিতির কিছু অংশ ব্যতিরেকে খড়্গাপুর মহকুমার ব্যাপক অংশ বন্যাপ্রবণ এলাকার অন্তর্ভুক্ত। বন্যাপ্রবণ এলাকা বেষ্টিত হলেও পিংলা পঞ্চায়েত সমিতিকে প্রত্যক্ষ বন্যার প্রকোপে পড়তে হয় না। সাম্প্রতিক কালে মেদিনীপুর সদর

পশ্চিম মেদিনীপুরের চাউলকুড়ি গ্রাম জলমগ্ন। অতিবর্ষণে কমলেশ্বরী ও কাঁসাই নদীর বাঁধ ভেঙে এই অবস্থা সৌজন্যে : গণশক্তি

মহকুমার কেশপুর ও শালবনী পঞ্চায়েত সমিতির কিছু অংশ বন্যা কবলিত হতে দেখা যাচ্ছে।

আমাদের জেলায় যে নদীগুলি মুখ্যত বন্যা বিপর্যস্ততার কারণ সেগুলি হল, কংসাবতী, (পুরাতন ও নতুন কাঁসাইসহ) শিলাবতী, (কেঠিয়া, পারাং, তমাল ও কুবাই উপনদীগুলিসহ) কেলেঘাই (কপালেশ্বরী ও বাগুই উপনদী দুটি সহ)। কলাইচণ্ডী খাল, ক্ষীরাই-বকসী, কাটান, চণ্ডীয়া, ব্রহ্মচারী খাল এগুলি সিস্টেমের সঙ্গেই একীভূত তাই আলাদা করে চিহ্নিত করা হল না। এছাড়া সুবর্ণরেখা নদী প্রত্যক্ষভাবে কোনও প্রভাব বিস্তার না করলেও জলস্ফীতির বেশ কিছুটা প্রবাহ লক্ষ্মণনাথ রোড রেলস্টেশনের সন্নিকটস্থ অনেক ফুকারবিশিষ্ট কালভার্টের ভেতর দিয়ে বাগুই নদীকে স্ফীত করে—যেটা গিয়ে কেলেঘাইয়ের দক্ষিণতীরে গোকুলপুর-বুলাকাপুরের (বর্তমানে এগরা মহকুমা) নিকট মিলেছে।

এবারে এক একটি নদী-ব্যবস্থা ধরে দেখা যাক কিভাবে বন্যা সংঘটিত হচ্ছে। সাধারণভাবে বছরে ৬০"-৭০" (১৫০০-১৭৫০ মি.মি.) সুষম বারিপাত হলে বন্যার আশঙ্কা থাকে না। সময়টা ধরা হয় ১৫ জুন হতে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। কিন্তু মাটি ভিজে (সম্পৃক্ত) থাকার পর হঠাৎ একদিনে ৫"/৬" বা তিন-চার দিনে ১০"/১২" বৃষ্টি হলে নদীগুলির বর্তমান নাব্যতা তথা জলধারণ ক্ষমতায় জল নিষ্কাশনের ক্ষমতা থাকে না, বন্যা হবেই—যেমন ধরা যাক কংসাবতী জলাধারের উর্ধ্বপ্রবাহে প্রচুর বৃষ্টি হল। 'ড্যামে' জল রাখা গেল না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জল ছাড়ার নির্দেশ দিলেন। তার উপর নিম্নপ্রবাহে ৮০ কিমি অনিয়ন্ত্রিত এলাকাতেও ভারি বৃষ্টি হল। যেখান হতে জল ছাড়া হচ্ছে আর বন্যাপ্রবণ এলাকার যে এলাকায় জল এসে পৌছাচ্ছে ভূতলের বিরাট পার্থক্য থাকায় নিম্নাঞ্চল ডুবে যাচ্ছে। কংসাবতীতে জলবৃদ্ধির পর মেদিনীপুর এ্যানিকাট (ANICUT—তামিল ভাষায় ছোট ব্যারেজকে এই নামে অভিহিত করা হয়) এর নিম্নপ্রবাহে কাপাসটিকরির নিকট এটি দুভাগে বিভক্ত। এক ভাগ পুরাতন কাঁসাই নামে বামপাশে নাড়াজোল, দক্ষিণে ডেবরাকে রেখে রূপনারায়ণ নদীতে গিয়ে মিশেছে। আর একভাগ নতুন কাঁসাই নামে পাঁশকুড়ার পাশ দিয়ে গিয়ে ঢেউভাঙার কাছে কেলেঘাইয়ের সঙ্গে মিশে হলদী নদী নাম নিয়ে হুগলি নদীতে মিশেছে। নতুন কাঁসাইতে স্থানিক প্রবাহগুলি যেমন ক্ষীরাই-বাকসী, পেঁয়াজখালি প্রভৃতি পাঁশকুড়ার নিম্নাংশে দেহাটির কাছে গিয়ে মিশেছে।

আগে ব্যবস্থা ছিল—কাপাসটিকরির পর কংসাবতীর দুই প্রবাহ যে ভূখণ্ডকে ঘিরে বয়ে যাচ্ছে তাকে বলা হয় ভসরা বেসিন। ৩৫ বর্গ কিলোমিটারের মতো আয়তন। যখন নতুন কাঁসাইতে জলবৃদ্ধি ঘটতো তখন একটি নির্গমন পথ (B.N.R. ESCAPE—রেল কর্তৃপক্ষ নিজেদের রেলপথের নিরাপত্তার জন্য এটি নির্মাণ করেছিলেন) দিয়ে ওই বেসিন তথা অপেক্ষমাণ ক্ষেত্রে ঢুকে পড়ত। আবার যখন পুরাতন কাঁসাইতে জলবৃদ্ধি ঘটতো তখন দক্ষিণের বাঁধে ১ কিলোমিটার পরিমিত নদীবাঁধ যা দুর্বল করে রাখা হত, ভেঙে জল ঢুকে যেত ওই ভসরা

বেসিনে। স্থানীয় ভাবে এটি 'ভাঙার বাঁধ' নামে পরিচিত। পরে ওই জল মাঝভাঙার খাল হয়ে যশাড় খাল হয়ে রূপনারায়ণ নদীতে মিশে যেত।

কিন্তু পরবর্তী কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আধুনিক জীবন প্রণালীর তাগিদে ভসরা বেসিনে গোলগ্রাম-মালিহাটি এবং গোলগ্রাম-কাকদাঁড়ি পাকা রাস্তা তৈরি হয়েছে। যে সব জায়গায় আগে পশুচারণ কিংবা চাষজমি ছিল সেখানে বাড়িঘর নির্মিত হয়েছে, বিদ্যালয় নির্মিত হয়েছে। 'B.N.R. ESCAPE'—'সিল' করে দেওয়া হয়েছে। 'ভাঙার বাঁধ' অন্যান্য নদীবাঁধের ন্যায় দৃঢ় করা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে জলের কোনও প্রসারণ ক্ষেত্র তথা অপেক্ষমাণ ক্ষেত্র পাচ্ছে না। জলবৃদ্ধি হলে, বেশি বৃষ্টি

প্রবল বর্ষণে হলদী নদীর পাড় ভাঙছে। ভাঙন রোধে মেরামতের কাজ করছে পঞ্চায়েত ও সেচ দপ্তর।
ছবি : কমল বিষয়ী

হলে কোনও না কোনও অংশ বন্যাকবলিত হয়ে পড়ছে। মুম্বাই রোড (NH_6)-এর পাশে জল জমে যাওয়া বা ডুবে যাওয়া এ কারণেই ঘটে। নিজে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকেও বলছি—এ সমস্ত কাজগুলি করার আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ খানিকটা একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। বন্যার ব্যাপারটা ভালভাবে বিবেচিত হয়নি। তাছাড়াও পুরাতন কাঁসাই তথা পলাশপাই খালে ধারাবাহিক রুদ্ধতা এবং নতুন কাঁসাই, ক্ষীরাই বাকসী, পিঁয়াজখালি চণ্ডীয়াও একইভাবে আংশিক রুদ্ধস্রোতা।

শিলাবতী নদী (উপনদীগুলিসহ) এবং ঘাটাল মহকুমার বানভাসির ব্যাপার তো কোনও প্রতিবেদনের অপেক্ষা রাখে না।

ভেঙে গেছে এগরা-দীঘা রোড কুদি বাজারের কাছে
ছবি : শুভময় জানা

শিলাবতী মূল প্রবাহ এখন কেটিয়া খাল হয়ে ঘুরে গেছে। আবার কেটিয়াও ঘুরে গেছে কাটান খাল হয়ে, ফলে শিলাবতীর মূল অংশ এবং কেটিয়ার নিম্নপ্রবাহ পলি জমে স্রোতহীন ও নিষ্কাশনে অক্ষম হয়ে পড়েছে। যখন বৃষ্টি বেশি হয়, পারাং, তমাল, কুমাই প্রভৃতি পাহাড়ী এলাকা হতে উদ্ভূত নদীগুলির জল বহনে অসমর্থ হয় ও গোটা মহকুমা বন্যাপ্লাবিত হয়। মেদিনীপুর-হুগলি সীমানায় রামজীবনপুরের নিকট তারাজুলি খাল যা পরে ঝুমি নদী নামে আখ্যাত। তার জলের কিছু অংশের প্রসারণ ক্ষেত্র ছিল হুগলি জেলার সংলগ্ন অংশ। কিন্তু সেই জেলার প্রশাসন হতে নদী বাঁধ দৃঢ়ীকরণের ফলে পুরো জলটাই চন্দ্রকোনা-১ ও ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতির এলাকা ডুবিয়ে দেয়।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান যা গত শতাব্দীর আশির দশকে রচিত হয়েছিল—জমি-অধিগ্রহণ—কিছু এলাকার মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার আশঙ্কা সর্বোপরি কার্যকারিতার প্রশ্নে রূপায়িত হয়নি। পরিত্যক্ত হয়েছও বলা যায়। চন্দ্রেশ্বর খাল সংযুক্তিকরণের কাজও অর্ধপথে পরিত্যক্ত। তার উপর নতুন নতুন নগরায়ন, বাণিজ্য কেন্দ্র এবং সড়ক নির্মাণ প্রসারণ ক্ষেত্র কমিয়ে দিয়েছে অপেক্ষমাণ ক্ষেত্রের আংশিক অবলুপ্তি ঘটিয়ে বন্যার আক্রমণকে দীর্ঘস্থায়ী ও আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে বন্যার ভূমিকা, নিকাশী ব্যবস্থার গুরুত্ব অনেকটাই অগ্রাহ্য হয়ে গিয়েছে মানুষের আশু চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে।

এবারে আসি কেলেঘাই-কপালেশ্বরী-বাগুই সিসটেম-এর কথায়। ঝাড়গ্রাম এলাকার বনাঞ্চল দুধকুণ্ডী হতে নির্গত হয়ে

মেদিনীপুর দাঁতন-১ পঞ্চায়েত সমিতির রিলিফ ক্যাম্প

খাজরা পাশ দিয়ে বাখরাবাদ পোক্তাপোল হয়ে নারায়ণগড় সবং ব্লকের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পরে বামতীরে ময়না ব্লক ও দক্ষিণ তীরে পটাশপুর-ভগবানপুর ব্লকগুলিকে পাশে রেখে ঢেউভাঙার কাছে নতুন কাঁসাইয়ের সঙ্গে মিশে হলদী নাম নিয়েছে (পূর্বেই উল্লিখিত)। আগেই বলা হয়েছে বাগুই নদী এতে মিশেছে গোকুলপুর-কুলকীপুরের কাছে। বামতীরে কপালেশ্বরী নদী ডেবরা ব্লকে উদ্গত হয়ে নারায়ণগড় ব্লকের উপর দিয়ে এসে সবং ব্লককে বিভক্ত করে আমগাছিয়ার নিম্নাংশে শালমারার জলায় কেলেঘাইয়ের সঙ্গে মিশেছে। আরও নিম্নপ্রবাহে গনপত খাল, চণ্ডীয়া নদী এসে মিশেছে—নতুন কাঁসাইয়ের মোহনার আগে। ময়না ব্লক কেলেঘাই, কাঁসাই, এবং পাঁচথুপী নদী-বেষ্টিত। সমগ্র এলাকা নিচু, নদীখাত অগভীর হওয়ায় বর্ষাকালে প্রায়শই বৃষ্টি ও নদীর জলে সমগ্র ব্লক প্লাবিত হয়। নিচু এলাকা হওয়ায় চার থেকে ছ-মাস বন্যার জল জমে থাকে। কংসাবতী পাঁশকুড়া ১ নং ব্লকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় মাঝে মাঝে বন্যা দেখা দেয়। রূপনারায়ণ ও কাঁসাই পাঁশকুড়া ২ নং ব্লকের যথাক্রমে পূর্ব ও উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত। অতিবৃষ্টির ফলে নদীবাঁধগুলি প্লাবিত হয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। কাঁসাই, হলদী, রূপনারায়ণ এবং প্রতাপখালি খাল নন্দকুমার ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত। ডি.ভি.সি. জলাধার থেকে অত্যধিক জল ছাড়ার ফলে নদী বাঁধগুলি উপচে বন্যার সৃষ্টি করে। হলদী, রূপনারায়ণ, হুগলি নদী, নন্দীগ্রাম-১, নন্দীগ্রাম-২, নন্দীগ্রাম-৩, মহিষাদল, সুতাহাটা ব্লকগুলিকে মাঝে মাঝে প্লাবিত করে। কেলেঘাই নদীর উচ্চ অববাহিকা অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাত পটাশপুর-১, পটাশপুর-২, এগরা-১, এগরা-২ এলাকায় প্রায়শই বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সুবর্ণরেখার অতিরিক্ত জল কখনও কখনও রামনগর-১ এবং রামনগর-২ এলাকাকে প্লাবিত করে। এছাড়া সমুদ্র সংলগ্ন হওয়ায় রামনগর-১, রামনগর-২, খেজুরী-১, খেজুরী-২, কাঁথি-১ এবং কাঁথি-২ সমুদ্রের জলোচ্ছাসের ফলে প্লাবিত হয়। ভূমিক্ষয়, ফসলহানিসহ নানা ক্ষতির কারণ হয়।

বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগকে প্রতিহত করতে জলসম্পদ উন্নয়ন এবং সেচ ও জলপথ দপ্তর প্রতিবছরই বর্ষার প্রাক্কালে মোকাবিলার প্রশ্নে নিজ নিজ উদ্যোগে পরিকল্পনা করে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। প্রশাসনিক স্তরে বন্যা মোকাবিলার প্রাক প্রস্তুতি যেমন থাকে তেমনি প্রতিটি দপ্তর বন্যা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থাও করে থাকে। প্রাক্ প্রস্তুতি ও ত্রাণ সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিম্নরূপ :

(১) বন্যা প্রায়শই হয় এমন জায়গাগুলি চিহ্নিত করে বিশেষ নজর দেওয়া।

(২) বন্যার ঠিক পূর্বে ও বন্যার সময় তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা (কন্ট্রোল রুম খোলা)।

(৩) আর. টি. সেট দুরূহ এলাকার সংবাদ বিশেষ করে জলতল ও জলছাড়াসহ অন্যান্য তাৎক্ষণিক সংবাদের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া।

(৪) বন্যা বা জলে নিমগ্ন স্থানগুলিতে নৌকা ও অন্যান্য যানবাহনের সাহায্যে জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করা।

(৫) ত্রাণসামগ্রীর সংরক্ষণ—পলিথিন শিট, ধুতি, শাড়ি, লুঙ্গি, ছোট ছেলেমেয়েদের পোশাক, সেনমাল জি আর ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

(৬) রাস্তাঘাট, বাঁধ ও অন্যান্য জনসাধারণের সামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(৭) নিত্য প্রয়োজনীয় ১৪টি দ্রব্য যাতে সর্বদা জলমগ্ন বা বন্যার্ত এলাকায় যথেষ্ট মজুত থাকে তার ব্যবস্থা নেওয়া। ন্যায্য দামে যাতে বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয় সেদিকে নজর দেওয়া।

(৮) বন্যা ও বন্যাপরবর্তী সময়ে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বন্যাপ্রবণ এলাকার হাসপাতালগুলিতে আন্ত্রিক, সাপে কাটা
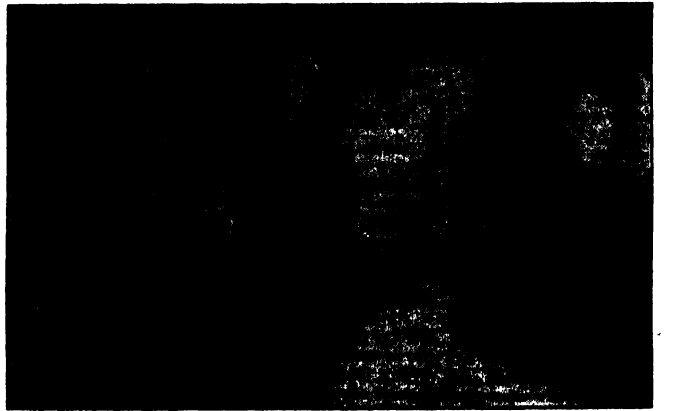
পটাশপুর ১ নং ব্লকের সিংদার একটি একটি ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ছবি : ঝন্টু গাঁতাইত
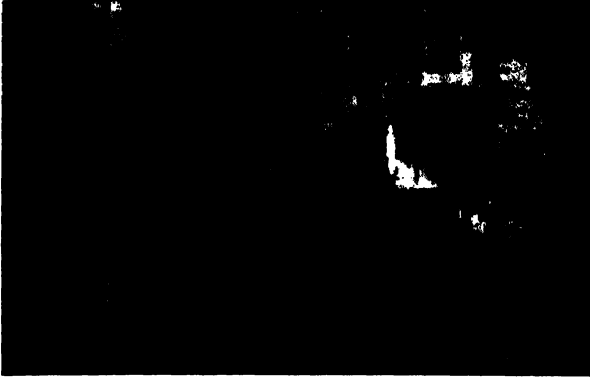
জলমগ্ন ঘাটাল শহরে মানুষের যাতায়াত নৌকায়

ছবি : সৌম্যেশ্বর মণ্ডল

রোগীর চিকিৎসার জন্য উপযোগী ওষুধ মজুত রাখার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। হ্যালোজেন, ব্লিচিংও যথেষ্ট পরিমাণে মজুত রাখা।

(৯) জল সরবরাহ দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর, যোগাযোগ ব্যবস্থা- সহ যোগাযোগের জন্য সড়ক দপ্তরগুলিকেও লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

(১০) বিকল্প কৃষিতে কৃষকদের উৎসাহিত করা হয়। এলাকা- ভিত্তিক চাষোপযোগী শস্যের মিনিকিট বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

(১১) প্রাণিসম্পদ দপ্তরকে প্রাণীদের রক্ষা করার জন্য সামগ্রিক ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

(১২) বন্যা প্রতিরোধ ও বন্যা মোকাবিলায় ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত সর্বদাই সজাগ এবং কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। গ্রাম সংসদ, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে আগাম পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। পঞ্চায়েত ও প্রশাসন মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বন্যা-কবলিত মানুষদের উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তরিত করেন, আশ্রয় শিবিরগুলিতে খাদ্যের সংস্থান করেন, পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

১৯৭৮ সালের পরবর্তী বন্যা মোকাবিলায় পঞ্চায়েতের ভূমিকা ক্রমশই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে।

সত্তর-এর দশকে কেলেঘাই-কপালেশ্বরীর পুনরুজ্জীবনের কাজ হলেও মোট প্রবাহের কিছু অংশ সরাসরি রসুলপুর নদীর দিকে নতুন খাত কেটে (মতান্তরে পানিনালা খালের গতিপথ ধরে) নির্গমনের কাজ না হওয়ায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই মজে যায়। তারপরও কয়েকবার বিচ্ছিন্নভাবে সংস্কারের কাজ হয়েছে। কিন্তু স্থায়ী ফললাভ হয়নি। আগে ব্যবস্থা ছিল Ex-জমিদারী বাঁধগুলি তালিকাভুক্ত বাঁধের তুলনায় তিনফুট নিচু থাকবে এবং জলস্ফীতি ঘটলে ওই সব বাঁধ ভেঙে গিয়ে বন্যাজলের প্রসারণ ক্ষেত্র তথা অপেক্ষমাণ ক্ষেত্র সৃষ্টি করবে। এবং ওই সব এলাকার মানুষ নিচু এলাকায় বাড়িঘর নির্মাণ করবেন না। কিন্তু সময় পালটেছে, মানুষের ধারণা পালটেছে। জীবন ধারণের প্যাটার্ন বদলেছে। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে Ex-জমিদারী বাঁধগুলি তালিকাভুক্ত বাঁধের ন্যায় শক্তিশালী করেছে। কিন্তু প্রকৃতির আঘাত এড়াতে পারেনি। এ ব্যাপারে মহান দার্শনিক ফ্রিডরিক অ্যাঙ্গেলসের একটি উক্তির মর্মার্থ গ্রহণ করতে পারি। "যতই প্রকৃতিকে পর্যুদস্ত করে মানুষ তাকে ব্যবহার করছে, ততই প্রকৃতিও নতুন নতুন কৌশলে প্রত্যাঘাত হানার চেষ্টা করছে।" প্লাবন ক্ষেত্র সংকুচিত করে নতুন করে নিজেরাই বিপদ ডেকে আনছি। সরকারি বিভিন্ন বিভাগের যে সমন্বিত কার্যসূচি আমরা চেয়েছিলাম তা এখনও অনেকখানি আয়ত্তের বাইরে রয়ে গিয়েছে। বামফ্রন্ট ও পঞ্চায়েতের সার্বিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কারিগরী বিভাগ বা সাধারণ প্রশাসনের মধ্যে বিভক্ত-কক্ষ মানসিকতার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেনি। তাই বর্তমানে বন্যা-প্রশমন (এখন মনে হয়, বন্যা নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ শব্দগুলি পালটানোই সমীচীন) ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা জোরদার করতে সর্বস্তরের মানুষের এগিয়ে আসা দরকার। মতামত বিনিময় করে আধুনিক কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক প্রকৌশলের সাহায্যে এই কর্মসূচি গঠন করা একটি প্রধান কর্তব্যরূপে গণ্য করা উচিত। দীর্ঘকাল অবিভক্ত বা বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার সুবাদে ও বিভিন্ন স্তরের মানুষ ও কারিগরী কর্মী-আধিকারিকদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ফলে এ ব্যাপারে কিছু প্রস্তাব পেশ করছি যা ভাবার জন্য ও সঠিক রূপ দেবার জন্য সকলের মতামত প্রদানে আবেদন জানাচ্ছি।

(ক) ভসরা বেসিনে মাজভাণ্ডার খাল সংস্কার করে যশাড় খালের সঙ্গে সংযুক্তি করণ ও B.N.R. Escape পুনরায় চালু করার বাস্তবতা।

(খ) পুরাতন কাঁসাই-তথা পলাশপাই খাল সংস্কার মোহনায় স্লুইস নির্মাণ।

(গ) "ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান" বা সার্বিক নিকাশী ব্যবস্থা সম্পর্কে নব আঙ্গিকে চিন্তা-ভাবনা (বর্তমান অবস্থাভিত্তিক) তৎসাপেক্ষে কেটিয়া খাল ও কাটান খালের উৎসে রেগুলেটর নির্মাণ ও শিলাবতী নদীর ঊর্ধ্বপ্রবাহে সংস্কারের কাজ। চন্দ্রেশ্বর খাল সংযুক্তিকরণের বাকি কাজ।

(ঘ) নতুন কাঁসাই পুনরুজ্জীবন (Resuscitation)-এর কাজ।

(ঙ) এগরা মহকুমার ভেতর দিয়ে কেলেঘাই-এর আংশিক বন্যাপ্রবাহ নিষ্কাশন।

(চ) সুবর্ণরেখা ব্যারেজ প্রজেক্টে প্রস্তাবিত দাঁতন-সোনাকনিয়ার অন্তর্বর্তী স্থানে "স্পিল্ চেকিং এমব্যাংকমেন্ট" নির্মাণ।

হয়তো আমার প্রস্তাব কিছুটা অসম্পূর্ণ বা কারিগরী অভিধাসম্মত নয়, তবুও মানুষের কষ্টলাঘব হবে এই আশায় অভিজ্ঞ ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে গণ্য করা হোক।

লেখক: সভাধিপতি, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ
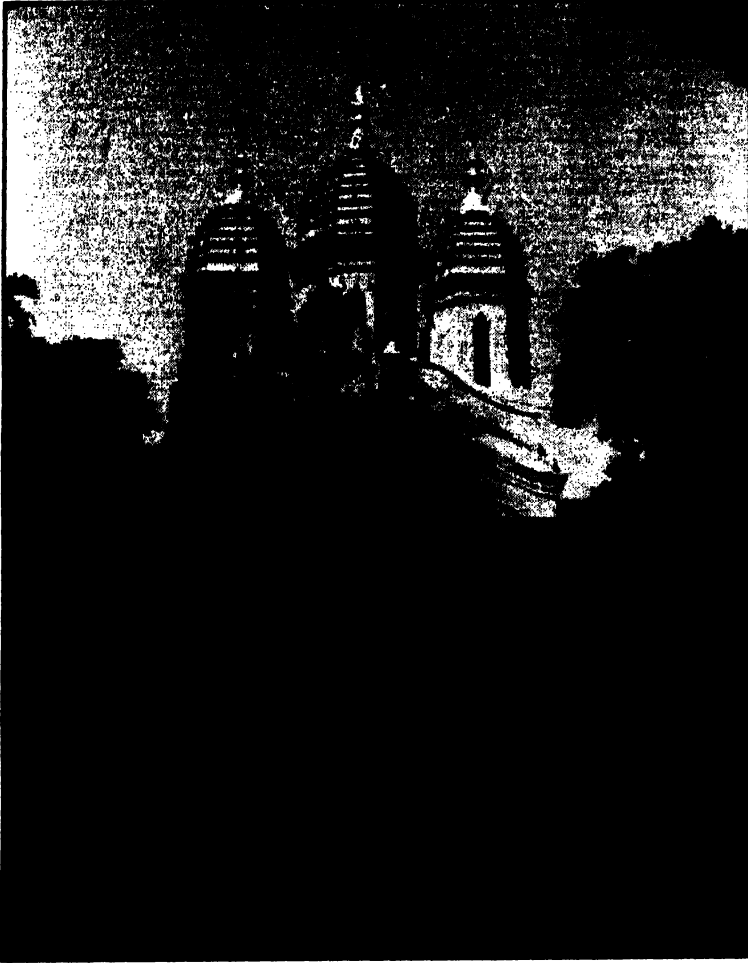
শ্যামসুন্দর জীউ মন্দির, ময়না, তমলুক
ছবি : প্রশান্ত প্রামাণিক
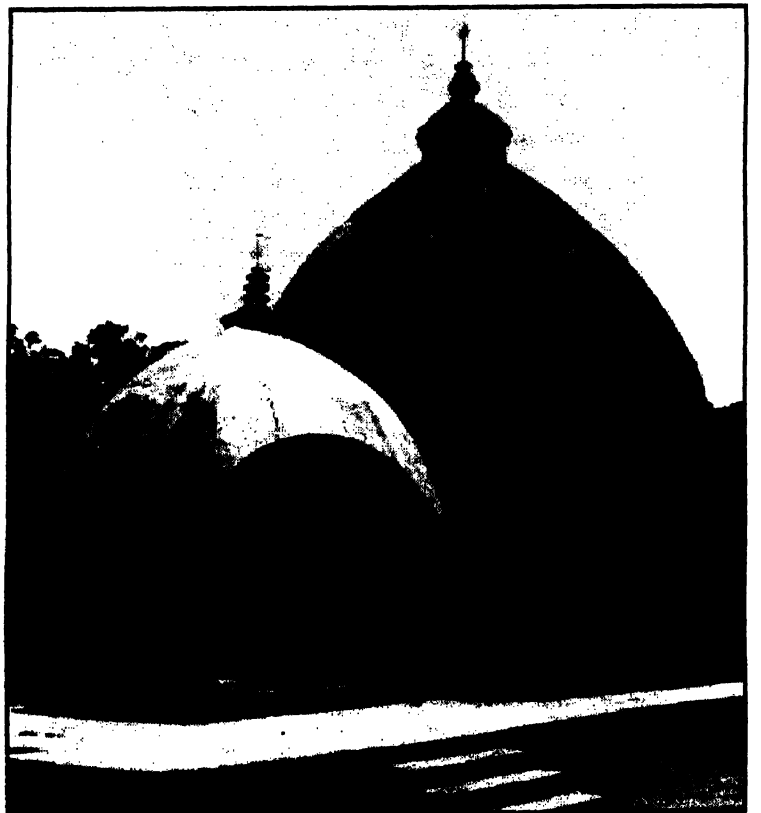
জিষ্ণুহরি মন্দির, তমলুক
ছবি : প্রশান্ত প্রামাণিক
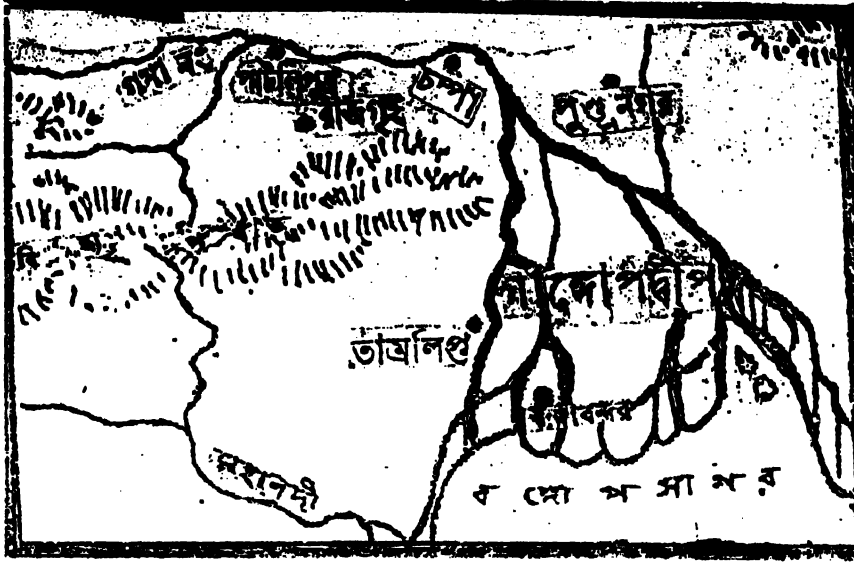
হিউয়েন সাঙ, ফা-হিয়েনের ঐতিহাসিক ভ্রমণ

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মেদিনীপুর : গ্রন্থপঞ্জি

সুবর্ণ দাস

দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক জেলা এবং বর্ধমান বিভাগের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত মেদিনীপুর। এই জেলার এবং প্রধান শহরের নাম মেদিনীপুর হয়েছে জনৈক প্রাক্তন নৃপতি মেদিনীকরের নাম অনুসারে। প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি-পুস্তকাদিতে এই জেলার নাম পাওয়া যায় না। বর্তমানকাল পর্যন্ত যে সমস্ত ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় যে, মুসলমান আমলের কোনও সময় হতে মেদিনীপুর জেলার উৎপত্তি হয়েছিল। কিন্তু যেমন ভারতবর্ষের প্রায় প্রতি প্রদেশেরই নাম ও সীমা কালক্রমে পরিবর্তিত হয়েছে মেদিনীপুর জেলাও তার ব্যতিক্রম নয়। এমনকী, ইংরেজদের ১৭৬০ সালে শাসনক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে জেলার সীমারেখা বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানকালে মেদিনীপুর জেলার যে আয়তন ও সীমারেখা আছে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে এর আয়তন অনেক বেশি ছিল। মেদিনীপুর জেলার ইতিহাস সারা বিশ্ব তথা এশিয়া খণ্ডের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের পটভূমিকায় লেখা হয়েছে। কারণ, বিচ্ছিন্নভাবে কোনও একটি বিশেষ অঞ্চলের ক্রমবিবর্তন লেখা সম্ভব নয়।

> 'সমুদ্রের দুঃসাহসী জাহাজ
> ভেড়ে না সেথা
> —তাম্রলিপ্ত সকরুণ স্মৃতি।'
>
> —প্রেমেন্দ্র মিত্র

সপ্তম শতকে ফরাসি পণ্ডিত জুলিয়েন শুনেছিলেন হিউয়েন সাঙ নামে একজন চৈনিক তীর্থযাত্রী পায়ে হেঁটে ভারতে এসেছিলেন।

মহারুদ্রেশ্বর মন্দির, কাঁথি ছবি : প্রশান্ত প্রামাণিক

তৎকালীন ভারতের জনজীবনের বিশদ বিবরণ রেখে গেছেন তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে। জুলিয়েন চীনা ভাষা আয়ত্ত করে মূল থেকে ফরাসিতে অনুবাদ করলেন সেই বৃত্তান্ত। প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বরূপ ফুটে উঠল তাঁর এই বিবরণে। সন্ধান পাওয়া গেল উত্তর-পূর্ব ভারতের তখনকার দিনের বিশিষ্ট বন্দর ও সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান তাম্রলিপ্ত। কোথায় তাম্রলিপ্ত এ নিয়ে বহুদিন ধরে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বাদানুবাদ চলে। শেষ পর্যন্ত রাজেন্দ্রলাল গুপ্ত সংশয়ের অবসান ঘটালেন। সারা মেদিনীপুর জেলাই ছিল তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্গত। বর্তমান তমলুক বা এর কাছাকাছি ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। ঐতিহাসিক, পণ্ডিত ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই মত সমর্থন করলেন। হিউয়েন সাঙের প্রায় ২০০ বছর আগে এসেছিলেন ফা-হিয়েন। দু-বছর তাম্রলিপ্ততে থেকে ফা-হিয়েন কয়েকখানা বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের অনুলিপি করেছিলেন। এখান থেকে ফা-হিয়েন বাণিজ্যজাহাজে চড়ে গিয়েছিলেন সিংহল। হিউয়েন সাঙের কয়েক বছর পরে এসেছিলেন ইৎসিঙ। তখন তাম্রলিপ্তে ছিল এক বিখ্যাত 'বরাহ' মন্দির। ইৎসিঙ এখানে তিন বছর ছিলেন। এরপর আসেন মহাযান শাখার তাঙ। তিনি বারো বছর এখানে ছিলেন।

মহাভারত, পুরাণ, জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে এবং গ্রিক পর্যটকদের বিবরণে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, আর্য প্রভাব পড়ার আগে থেকেই তাম্রলিপ্তর খুব জাঁকজমক ছিল। আর্যপ্রভাব মুক্ত হবার পর এই দেশ তাম্রলিপ্তি, তাম্রলিপ্ত, তামোলিপ্ত, দামলিপ্তি, বিষ্ণুগৃহ, বেলাকুল ইত্যাদি। জৈন কল্পসূত্র থেকে জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পুণ্ড্র, রাঢ় ও তাম্রলিপ্তে চতুর্যাম ধর্ম প্রচার করেন। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশে বলা হয়েছে, খ্রিস্টপূর্ব ৩০৭ অব্দে তাম্রলিপ্ত একটি প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর ছিল। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্মনন্দের অধিকারে ছিল তাম্রলিপ্ত ও মেদিনীপুরের সমগ্র অংশ। নন্দবংশের শেষ রাজা ধননন্দের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তাম্রলিপ্তর বন্দর—এ কথা অনেক ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন। ২৬৩ খ্রিস্টাব্দে অশোক কলিঙ্গ জয় করেন। তাম্রলিপ্ত তথা মেদিনীপুর তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। কথিত আছে, অশোক নিজে এখানে একটি স্তূপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সিংহল রাজার ভাগিনেয় যখন সিংহল যাত্রার উদ্দেশ্যে তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে জাহাজে ওঠেন, সম্রাট অশোক স্বয়ং বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তাকে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। মৌর্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করেন তাঁর সেনাপতি পুষ্যমিত্র। পুষ্যমিত্র সিংহাসন অধিকার করেন। পুষ্যমিত্রের আমলে মেদিনীপুরের কিছু অংশ কলিঙ্গ রাজ্যের কর্তৃত্বাধীনে আসে। সপ্তম শতকের আগে থেকেই মেদিনীপুর জেলার সমগ্র দক্ষিণাংশ একটি সামন্ত রাজ্য ছিল। নাম দণ্ডভুক্তি। সামন্ত মহারাজ সোমদত্ত ও মহাপ্রতীহার শুভকীর্তি ছিলেন এর শাসনকর্তা। অষ্টম শতকের পর থেকেই তাম্রলিপ্ত বন্দরের সমৃদ্ধির পতন ঘটতে থাকে।

'ছোট বড় গ্রামে যত লোক ছিল।
বরগির ভয়ে সব পালাইল॥'

(গঙ্গারাম / মহারাষ্ট্র পুরাণ)

যোগেশচন্দ্র বসুর 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে জানতে পারি, এখনকার তমলুক সীমান্ত থেকে শুরু করে
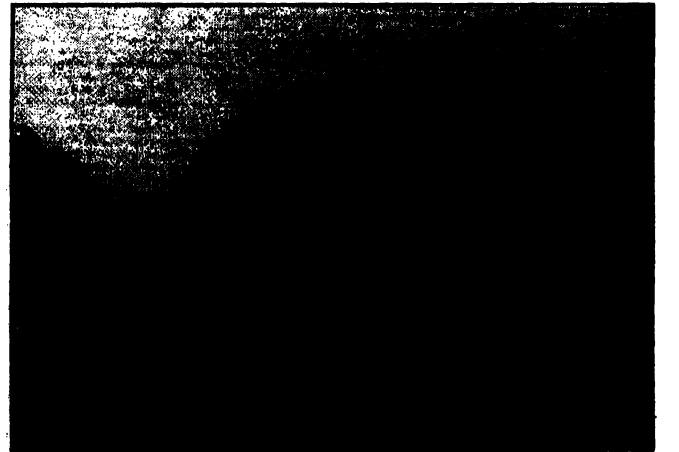
মখদুম সাহিবের মসজিদ, অমর্ষি ছবি : প্রশান্ত প্রামাণিক

দক্ষিণে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কলিঙ্গ রাজ্য। তখন বর্তমান মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও পূর্ব ভাগের কিছু অংশ ছিল তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্গত। রঘুবংশে কালিদাস কপিশা নদীর তীর থেকে উৎকলের সীমা নির্দেশ করেছেন। মেদিনীপুর জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত কাঁসাই বা কংসাবতী কপিশা নদীর নামান্তর। কালিদাসের বর্ণনা অনুযায়ী উৎকলের দক্ষিণেই কলিঙ্গ রাজ্য। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশ ও বালেশ্বর জেলা নিয়ে গঠিত ছিল উৎকল দেশ। প্রাচীনকালে উড়িষ্যা বা ওড়িশা ৩১টি দণ্ডপাঠ ও ১১০টি বিশিতে বিভক্ত ছিল। এদের ভেতর ৬টি দণ্ডপাঠ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্নিবিষ্ট হয়। যথা—টানিয়া, জেঠলিতি, নারায়ণপুর, নইগাঁ, মালঝিটা ও ভঞ্জভূম-বারিপদা। বর্তমান কাঁথি মহকুমার অনেকখানিই মালঝিটা দণ্ডপাঠের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমান মেদিনীপুরের শালবনী, কেশপুর, খড়গপুর, বিনপুর, ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর ও ময়ূরভঞ্জ জেলার অনেকখানি নিয়ে ভঞ্জভূম-বারিপদা দণ্ডপাঠ গঠিত ছিল। দ্বাদশ শতকের গোড়ার দিকে উৎকলরাজ অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গদেব মেদিনীপুর (মিধুনপুর) দুর্গ অধিকার করেন এবং এই সময় থেকে মেদিনীপুরের অধিকাংশ স্থান উৎকল রাজ্যের অন্তর্গত হয়। তেরো শতকের মাঝামাঝি জাজনগর বা উড়িষ্যার রাজা প্রথম নরসিংহদেব গৌড় আক্রমণ করেন। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার সমগ্র অংশ জাজনগর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

বাংলার শেষ আফগান শাসক দাউদ করবানীর মৃত্যুর পর তার সেনাপতি কতলু লোহানী ওড়িশায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মোঘলদের সঙ্গে এক চুক্তিতে তিনি মেদিনীপুরের অধিশ্বর হন। আফগান আমলে বর্তমান মেদিনীপুর জেলা দুটি সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকার দুটির নাম : জলেশ্বর ও মান্দারন। মোঘল বিজয়ের পর মেদিনীপুর সুবা ওড়িশার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৪০ সালে বাংলার নবাব আলিবর্দীর ওড়িশা যাত্রাকালে পথে পড়ল মেদিনীপুর। সেখানকার জমিদারেরা বিজিত হলেন। মারাঠা সৈন্য ভাস্কর পণ্ডিত মেদিনীপুরকে এই সময় মারাঠা শাসনাধীনে আনেন। ১৭৪৪ সালে ৩১ মার্চ মারাঠা নেতা ভাস্কর পণ্ডিতসহ মারাঠা সৈন্যদের আলিবর্দী বহরমপুরের মানকরায় আমন্ত্রণ জানিয়ে হত্যা করেন এবং আলিবর্দী মেদিনীপুরে স্থায়ীভাবে শিবির পাতলেন। কারণ, ওড়িশা হয়ে বাংলায় ঢোকার প্রবেশপথ ছিল মেদিনীপুর। ১৭৬০ সালে মারাঠা সেনানায়ক শিবভট্ট মেদিনীপুর অধিকার করেন। মীরকাশিম বাংলার নবাবের পদ অলঙ্কৃত করেন। এই সময় মেদিনীপুরের কৃষকরা বিদ্রোহ করেন। ১৭৬৫ সালে লর্ড ক্লাইভ দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন। এই সময়ের আগে থেকেই দুই-তৃতীয়াংশ জঙ্গলভরা মেদিনীপুরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন শুরু হয়েছিল। ১৭৬০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বাংলার নবাব মীরকাশিম ইংরেজদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য

সিংহবাহিনীর মন্দির, কোন্নগর, ঘাটাল

মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রাম—এই তিনটি চাকলার জমিদারি খাজনা দান করেন। এই সন্ধিতে বলা ছিল যে, মেদিনীপুর জেলাতে অবস্থিত জমিদার ও তালুকদারেরা যে যেখানে ছিলেন সেরকম থাকবেন। মেদিনীপুর জেলার সীমানাকে প্রভাবিত করার ঐতিহাসিক ঘটনা হল : ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট লর্ড ক্লাইভ দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট দেওয়ানি সনন্দ লাভ করেন সুবা বাংলা, বিহার ও ওড়িশার খাজনা আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে। সুতরাং সুবা বাংলার দেওয়ান ও মেদিনীপুরের চাকলার জমিদার হিসাবে মেদিনীপুরে তাঁরা শাসনকার্য কায়েম করেন। ইতিপূর্বে ১৭৫১ সালে নাগপুরের ভোঁসলে রাজা প্রথম রঘুজির সঙ্গে বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর যে সন্ধি হয়েছিল, সেই অনুসারে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সুবর্ণরেখা নদীর পাড়ে অবস্থিত পটাশপুর, কামর্দাচৌর, ভোগরাই প্রভৃতি লবণ উৎপাদক নিমকিমহালগুলি ওড়িশার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৮০৩ সালে ওড়িশার ইংরেজ কোম্পানির দখলে গেলে দেওগাঁওয়ের সন্ধি অনুসারে এই নিমকিমহাল পরগনাগুলি আবার মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। প্রাচীনকালে মেদিনীপুরের নাম ছিল—রাঢ়। এই

রাঢ়ের দক্ষিণে অবস্থিত তাম্রলিপ্ত নগর-বন্দর। দশম শতক থেকে ওড়িশার শৈলোদ্ভব, পূর্ব গঙ্গ ও গজপতি সম্রাটগণ মেদিনীপুর জেলার ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেন। শুধু তাই নয়, শশাঙ্ক, পাল ও সেনরাজাদের আমল থেকে তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতনদশা আরম্ভ হয়। পঞ্চদশ শতকে বাংলাদেশ মুসলমানদের অধীনতা স্বীকার করার পরে মেদিনীপুর জেলা ও তাম্রলিপ্ত বন্দরের ঐশ্বর্য আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হতে থাকে। শাহ সুজার আমলে তমলুক ১০৪টি পরগনা নিয়ে গঠিত হয়েছিল।

১৭৫১ সালে মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত আলিবর্দী তাঁর শাসক প্রতিনিধি হিসাবে মীর হাবিবকে ওড়িশাতে নিযুক্ত করেন। এই সময় মেদিনীপুরের ১২টি পরগনা মেদিনীপুরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। সুবর্ণরেখা নদী ওড়িশা ও মেদিনীপুরের মধ্যে সীমারেখা নির্দেশ করে। গোবিন্দ দাসের কড়চাতে জলেশ্বরের উল্লেখ আছে। আইন-ই-আকবরিতে বলা হয়েছে, জলেশ্বর ২৮টি মহালে বিভক্ত ছিল। এই মহালগুলির কিছু মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মেদিনীপুর একটি পরগনা শহর। গোবিন্দ দাসের কড়চা অনুসারে ১৫০৯ সালে শ্রীচৈতন্যদেব পুরী গমনকালে মেদিনীপুরে আগমন করেন। এই মেদিনীপুর শহরের দুটি দুর্গ—একটি ওড়িশা যাবার স্থলপথের ওপর অবস্থিত। অন্যটি কংসাবতী নদীর জলপথের ধারে অবস্থিত। সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মেদিনীপুর শহর বাংলা ও

শিবমন্দির, কল্যাচক, কাঁথি ছবি : প্রশান্ত প্রামাণিক

ওড়িশার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করত। তাই ওড়িশা থেকে যে কোনও আক্রমণ বাংলাদেশে হলে মেদিনীপুর শহরের মধ্যে দিয়ে যেত। ১৭৬০—১৮০৫ সালে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বহুবার মেদিনীপুর জেলার সীমারেখার পরিবর্তন ঘটেছে। ১৭৭২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য একটি রেভেনিউ কমিটি গঠন করেন। এই সময় ১৩টি কালেক্টরির অন্যতম হুগলি কালেক্টরির অন্তর্ভুক্ত হয় তমলুক, মহিষাদল ও হিজলি। ১৯৭২-৭৩ সালে বর্ধমান ও মেদিনীপুর কালেক্টরি গঠিত হয়। জলেশ্বর পরগনা এই সময় মেদিনীপুরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ১৭৭৩ সালের নভেম্বর মাসে কলিকাতা রাজস্ব কাউন্সিলে হুগলি, হিজলি, মহিষাদল ও তমলুক অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্ধমান কমিটিতে বর্ধমান, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, পাঞ্চেত, বীরভূম ও রামগড় অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৭৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ২৮টি জেলায় বিভক্ত ছিল। এমনকী, বড় বড় জেলাগুলিকে কখনও কখনও প্রদেশও বলা হত। 'মেদিনীপুর প্রদেশ' এই নামে রেভেনিউ রেকর্ডসে অভিহিত হয়েছে। ১৭৮০ সালে হিজলি ও তমলুক জেলা দুটিকে 'নিমক মহাল' নামে অভিহিত করা হত। ১৭৮৭ সালে ১৪টি কালেক্টরি তৈরি করা হয়। এই সময় জলেশ্বরকে মেদিনীপুরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৭৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি দুটি বড় রাজস্ব বিভাগ গঠিত হয়, তখন তমলুক ও মহিষাদল হুগলি থেকে কেটে নেওয়া হয় এবং মেদিনীপুরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৮০১ সালে বগড়ি পরগনার সমস্ত অংশই বর্ধমান জেলা থেকে টেনে নিয়ে মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ১৮০৩ সালে পটাশপুর ভোগরাই। কার্মদাচৌর—এই তিনটি পরগনা ওড়িশা থেকে নিয়ে মেদিনীপুরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ১৮০৫ সালে ১৮ নং রেগুলেশন অনুসারে একটি জঙ্গল মহল জেলা গঠিত হলে মেদিনীপুর জেলা থেকে ছাতনা, বরাহভূম, সুপুর, অম্বিকানগর, সিমলাপাল ও ভালিয়াডিহি জঙ্গলমহল জেলাতে স্থানান্তরিত হল। ১৮০৬ সালে মারাঠা পরগনাগুলি মেদিনীপুর জেলা থেকে নিয়ে হিজলির সল্ট এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত করা হল। সুতরাং ইংরেজ শাসনের প্রথমদিকে মেদিনীপুর জেলার কোনও নির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল না। ইতিহাসের কালচক্রে বহু রাজন্যবর্গের উত্থান ও পতন হয়েছে এবং শাসকবর্গের ইচ্ছানুসারে মেদিনীপুর জেলার সীমারেখার বিবর্তন ঘটেছে।

মেদিনীপুর : গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থ

১। অতুলকুমার বসু
মেদিনীপুরে বোমা পিস্তল
এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ
১০ টাকা

২। অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মধ্যযুগে বাঙলা ও বাঙালি
কে পি বাগচী, কলকাতা, ১৯৮৬

৩। অমলেশ ত্রিপাঠী
স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস
২য় সং, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯১,
৬১০ পৃ, ১০০ টাকা

৪। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
পশ্চিমবাংলার গ্রামের নাম
জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স,
১৯৯৪, ৩০ টাকা

৫। আজাহারউদ্দিন খান (সম্পাদিত)
বীক্ষণী
রামনারায়ণ পাঠাগার কর্তৃক প্রকাশিত,
মেদিনীপুর, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ,
(প্রকাশক : সত্যেন ষড়ঙ্গী)

৬। আলবেরুণী
ভারততত্ত্ব
বাংলা আকাদেমি, ঢাকা, ১৯৮২,
(আবু মহম্মদ হবিবুল্লাহ অনূদিত)

৭। আশুতোষ ভট্টাচার্য
বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস
৫ম সং, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৯৭০

৮। আবদুর রউফ
স্বাধীনতা-উত্তরপর্বে পশ্চিমবাংলার মুসলমান
প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯২,
১১২ পৃ, ২২ টাকা

৯। ইন্দুভূষণ অধিকারী (সম্পাদিত)
ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাম্রলিপ্ত
পূর্বাদ্রি প্রকাশন, তমলুক, মেদিনীপুর

১০। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ
মনসামঙ্গল
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯

১১। কাদের সিদ্দিকি
স্বাধীনতা
দে'জ, কলকাতা, ১৯৮৫, ১০০ টাকা

১২। কমলা দাশগুপ্ত
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী
জয়শ্রী প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৪, ৪০ টাকা

১৩। কৃষ্ণদাস কবিরাজ
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত
সম্পাদনা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ

১৪। কৃষ্ণানন্দ দে
লোককাণ্ড মেদিনীপুর
অমৃতলোক, মেদিনীপুর, ১৯৮৫, ৬ টাকা

১৫। গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য
স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম
২ খণ্ড, মেদিনীপুর, ১৯৭৭

১৬। গৌতম চট্টোপাধ্যায়
স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ছাত্রসমাজ
মনীষা পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪
৮ টাকা (বিষয় : প্রবন্ধ)

১৭। গোপীনন্দন গোস্বামী
তমলুকে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য
টাউন লাইব্রেরি, প্রজ্ঞানন্দ রক্ষা সমিতি
মহিষাদল, মেদিনীপুর, ১৯৮৬, ১০ টাকা

১৮। গোপীনন্দন গোস্বামী
তমলুক মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাপঞ্জি
আনন্দম, কলকাতা, ১৯৮৮

১৯। গোপীনাথ মহামহোপাধ্যায়
ভারতীয় সাধনার ধারা
সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৭৫

২০। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
বাংলার লৌকিক দেবতা
দে'জ, কলকাতা, ১৯৮৭

২১। গোবিন্দানন্দ
বর্ষক্রিয়া কৌমুদী
সম্পাদনা-কমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ
এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল, কলকাতা, ১৯০২

২২। গিরীন্দ্রনাথ দাস
বাংলা পীর সাহিত্যের কথা
সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৯৮, ১৮০ টাকা

২৩। চিত্তরঞ্জন দাস
মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাস
মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতি
মেদিনীপুর, ১৯৭০

২৪। চূড়ামণি দাস
গৌরাঙ্গ বিজয়
সম্পাদনা : সুকুমার সেন, এশিয়াটিক সোসাইটি
কলকাতা, ১৯৫৭

২৫। জগদীশনারায়ণ সরকার
বাংলায় হিন্দু-মুসলমান (মধ্যযুগ)
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ

২৬। জে সি প্রাইস
মেদিনীপুরে চুয়ার বিদ্রোহের ইতিহাস
অনুবাদ : নগেন্দ্রনাথ সাহু, অনন্য প্রকাশন
কলকাতা, ১৯৮৬, ৩০ টাকা

২৭। জ্যোতিভূষণ আচার্য
ছোটদের বিদ্যাসাগর
জ্যোতি প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০, ৫ টাকা

২৮। তরুণদেব ভট্টাচার্য
পশ্চিমবঙ্গ দর্শন
ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ,
কলকাতা, ১৯৭৯, ৩০ টাকা,
(বিষয় : মেদিনীপুরের আঞ্চলিক ইতিহাস)

২৯। তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস কমিটি
সংগ্রামী পুরুষ কুমার চন্দ্র
তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস কমিটি
মেদিনীপুর, ১৯৮৪, ৩০ টাকা

৩০। তারাপদ সাঁতরা
পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ : উত্তর মেদিনীপুর
জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, কলকাতা
১৯৮৬, ২২ টাকা

৩১। তারাপদ সাঁতরা
মেদিনীপুর : সংস্কৃতি ও মানবসমাজ
কৌশিকী প্রকাশন, হাওড়া, ১৯৮৭, ২৫ টাকা

৩২। তারাশংকর ভট্টাচার্য
স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর
মেদিনীপুর, ১৯৮৬

৩৩। তৃপ্তি ব্রহ্ম
লোকজীবনে বাংলার লৌকিক ধর্মসঙ্গীত ও
ধর্মীয় মেলা
ফার্মা কে এল এম, কলকাতা, ১৯৯২ বঙ্গাব্দ

৩৪। দক্ষিণারঞ্জন বসু
স্বাধীনতা বিপ্লবে বাঙালী
রঞ্জনা পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৯৪, ৬ টাকা

৩৫। দ্বিজরাম দেব
অভয়ামঙ্গল
সম্পাদনা : আশুতোষ দাস
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭

৩৬। দীনেশচন্দ্র সরকার
পাল ও সেন যুগের বংশানুচরিত
সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮২

৩৭। দীনেশচন্দ্র সরকার
সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ
সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ

৩৮। দীনেশচন্দ্র সেন
বৃহৎবঙ্গ
প্রথম খণ্ড, দে'জ, কলকাতা, ১৯৯৩

৩৯। দীনেশচন্দ্র সেন
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
৮ম সং, দাশগুপ্ত অ্যান্ড সন্স, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ

৪০। নরহরি কবিরাজ
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা
৪র্থ সং, মনীষা পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৬,
২৫ টাকা

৪১। নরহরি দাস
শ্রীশ্রীনরোত্তম বিলাস
৫ম সং, তারাপদ দাস অ্যান্ড সন্স
কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ

৪২। নলিনীকিশোর গুহ
বাংলায় বিপ্লববাদ
এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং কলকাতা
১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, ৩৬৮ পৃ

৪৩। নলিনীনাথ দাশগুপ্ত
বাংলায় বৌদ্ধধর্ম
এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ

৪৪। নীহাররঞ্জন রায়
বাঙালির ইতিহাস (আদি পর্ব)
২য় সং, দে'জ, কলকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ

৪৫। পঞ্চানন চক্রবর্তী (সম্পাদিত)
রামেশ্বর-রচনাবলী
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ

৪৬। পঞ্চানন রায়
দাসপুরের ইতিহাস
মেদিনীপুর, ১৯৭৭

৪৭। পঞ্চানন রায় ও প্রণব রায়
ঘাটালের কথা
ঘাটাল, ১৯৭৭

৪৮। পরিমলচন্দ্র মিত্র
সাঁওতাল ভাষা : ভিত্তি ও সম্ভাবনা
ফার্মা কে এল এম, কলকাতা, ১৯৮৫, ৪০ টাকা

৪৯। পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো
ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহ ও জীবন
সুজন পাবলিশার্স, ১৯৮২, ১২ টাকা

৫০। পুষ্প অধিকারী
মেদিনীপুরের কীর্তি ও কাহিনী
মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতি
মেদিনীপুর, ১৯৭৪

৫১। পুষ্প অধিকারী
স্মরণীয় যাঁরা
মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতি, ১৯৭৮

৫২। প্রদীপ রায়
বিদ্যাসাগর : সামাজিক ব্যক্তিত্ব
ক্যালকাটা বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৯৮৬, ২৫ টাকা
৫৩। প্রদ্যোৎকুমার মাইতি
তাম্রলিপ্ত-তমলুকের সমাজ ও সংস্কৃতি
পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৭, ২৪ টাকা
৫৪। প্রণব রায়
মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কলকাতা, ১৯৮৬, ২৪ টাকা
৫৫। প্রবোধচন্দ্র বসু
এই আমাদের কাঁথি
দে'জ, কলকাতা, ১৯৮৫, ৮ টাকা
৫৬। প্রবোধচন্দ্র বসু
ভগবানপুর থানার ইতিবৃত্ত
কোয়ালিটি পাবলিশার্স, মেদিনীপুর, ১৯৭৫
৫৭। প্রবোধকুমার ভৌমিক
মেদিনীপুর কাহিনী
বিদিশা প্রকাশন, (পরিবেশক : সুবর্ণরেখা)
কলকাতা, ১৯৮৫, ৭ টাকা
৫৮। প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর
ওরিয়েন্ট বুক কোং, ১৯৮৬, ১০ টাকা
৫৯। বঙ্কিম ব্রহ্মচারী
হলদিয়ার ইতিকথা
বাণী প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৬, ২৫ টাকা
৬০। বঙ্গভূষণ ভক্ত
নন্দীগ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রাম
গোপীনন্দন গোস্বামী দ্বারা সম্পাদিত
আনন্দম, গোপালপুর, ১৯৮৯, ৪৫ টাকা, (২৭৩ পৃ)
৬১। বসন্তকুমার দাস
স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর
দে বুক, কলকাতা, ১৯৯৪, ৩০ টাকা
৬২। বিক্রমাদিত্য
স্বাধীনতার অজানা কথা
দে'জ, কলকাতা, ১৯৮৭, ৪০ টাকা, ৩৩৬ পৃ
৬৩। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য
বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতি
আনন্দম পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৫
৬৪। বিনয় ঘোষ
বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ
ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ১৯৮৪
৭০ টাকা, ৫৯৭ পৃ
৬৫। বিনয় ঘোষ
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি
২য় খণ্ড, প্রকাশন ভবন, কলকাতা, ১৯৯২
৬৫ টাকা, ৪১৪ পৃ
৬৬। বিনয় মাহাতো
লোকায়ত ঝাড়খণ্ড
নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৪,
৩০ টাকা, ৩৬৮ পৃ
৬৭। বিনয়শঙ্কর দাস ও প্রণব রায়
মেদিনীপুর : ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন (১-২)
সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৮, ৩১০ টাকা,
৪৬৮ + ৪৮৮ পৃ
৬৮। বিনয়শঙ্কর দাস
জঙ্গলমহাল ও মেদিনীপুরের গণবিক্ষোভ
মেদিনীপুর, ১৯৭৮
৬৯। বিপ্লব তরফদার
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালি
৩য় সংস্করণ, ভোলানাথ পাবলিশার্স
কলকাতা, ১৯৯৩, ১৫ টাকা
৭০। বীরেন্দ্রনাথ ধর
স্বাধীনতা সংগ্রাম
ওরিয়েন্ট বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৯২
২৫ টাকা, ১৮৩ পৃ
৭১। বীরেশ্বর বসু
অগ্নিযুগের বিপ্লবী বাঙালি
বসু প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৮, ৮০ পৃ, ১৫ টাকা
৭২। বিশ্ব বিশ্বাস
স্বাধীন বাংলাদেশ ও ভারত
বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, কলকাতা
১৯৯৪, ৭ টাকা
৭৩। ভারত কোষ, ৫ম খণ্ড
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯৭৩
৭৪। মানিকরাম গাঙ্গুলী
ধর্মমঙ্গল
সম্পাদনা : বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দ দত্ত
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০
৭৫। মানিক দত্ত
চণ্ডীমঙ্গল
সম্পাদনা : সুনীলকুমার ওঝা
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি, ১৯৭৭
৭৬। মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতি
মেদিনীপুরের আইন-শৃঙ্খলা
মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতি
মেদিনীপুর, ১৯৭৮

৭৭। মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতি
শহীদ রক্তে সিক্ত মেদিনীপুর
মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতি
মেদিনীপুর, ১৯৭৮

৭৮। মেদিনীপুর জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি পরিষদ
মেদিনীপুর জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২ খণ্ড
মেদিনীপুর, ১৯৭৪

৭৯। মিহির কামিল্যা চৌধুরী
রাঢ়ের গ্রামদেবতা
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, বর্ধমান, ১৯৮৯

৮০। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
কবিকঙ্কণ চণ্ডী
বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

৮১। যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়
বিপ্লবীজীবনের স্মৃতি
২য় সংস্করণ, অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স
কলকাতা, ১৯৮২, ৫৯১ পৃ, ৪০ টাকা

৮২। যোগীনাথ হালদার
রামেশ্বরের শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৭

৮৩। রঞ্জন বাচস্পতি
পশ্চিমবাংলার ইতিহাস
(রাজনৈতিক পর্ব), ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৬

৮৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার
বাংলার ইতিহাস
জেনারেল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫২

৮৫। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙ্গালার ইতিহাস
নব-ভারত পাবলিশার্স, ১৯৭১

৮৬। রাধাকান্ত বারি
অবিভক্ত তমলুক মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রাম
তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস কমিটি
সুশীলকুমার ধাড়া কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০০,
২৫০ টাকা, ৪০০ পৃ

৮৭। রূপরাম চক্রবর্তী
ধর্মমঙ্গল
সম্পাদনা : সুকুমার সেন ও পঞ্চানন মণ্ডল
বর্ধমান সাহিত্য সভা, বর্ধমান, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ

৮৮। শিব বর্মা
শহীদ স্মৃতি
এন বি এ, কলকাতা, ১৯৮৩, ১৫ টাকা

৮৯। শৈলেশ দে
বিনয়-বাদল-দিনেশ
বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৮৩
১৫২ পৃ, ১০ টাকা

৯০। সতীশ পাকড়াশি
অগ্নিযুগের কথা
নবজাতক প্রকাশনা, কলকাতা, ১৯৮২
২০ টাকা, ২০৮ পৃ

৯১। সত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য
স্বাধীন তমলুক
তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস কমিটি
১৩৯২ বঙ্গাব্দ, ১২ টাকা, ১২০ পৃ

৯২। সনাতন গোস্বামী (সম্পাদিত)
গৌড়বঙ্গ-সংস্কৃতি ও শ্রীচৈতন্যদেব
ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা

৯৩। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রামবাংলার গড়ন ও ইতিহাস
অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৮২, ১৫ টাকা, ১৫৩ পৃ

৯৪। সুকুমার মাইতি
তাম্রলিপ্তিক উপভাগ ও জনগোষ্ঠী (১-২)
এ সি ই, কলকাতা

৯৫। সুকুমার সেন
বাংলা স্থান নাম
আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৯

৯৬। সুকুমার সেন
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১-২ খণ্ড,
আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ

৯৭। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাঙ্গালীর সংস্কৃতি
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯০

৯৮। সুপ্রকাশ রায়
ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম
কলকাতা, ১৯৮৩, ৪৫ টাকা, ৪৮৩ পৃ

৯৯। সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
লৌকিক ঐতিহ্য :
লোকায়ত মানস ও আধুনিক বাংলা কাব্য
সাগ্নিক প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৫

১০০। সুমিত সরকার
আধুনিক ভারত
কে পি বাগচী, কলকাতা, ১৯৯৭, ১০০ টাকা

১০১। সমীরণ মজুমদার
মেদিনীপুরের কবি ও কবিতা
অমৃতলোক, মেদিনীপুর, ১৯৮৫

১০২। সমীরণ মজুমদার
পাথরে রক্তের দাগ
অমৃতলোক, মেদিনীপুর, ১৯৮৫

১০৩। সরল চট্টোপাধ্যায়
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৫
৩০ টাকা

১০৪। **সুরেন্দ্রনাথ জানা**
বৃহত্তর ময়নার ইতিবৃত্ত
যজ্ঞেশ্বর লাইব্রেরি, মেদিনীপুর, ১৯৯০

১০৫। **সলিল মিত্র**
মেদিনীপুরের গৌরব কাহিনী
৩য় সং, কল্পনা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯০
১২ টাকা

১০৬। **সুশীলকুমার ধাড়া**
প্রবাহ
জনকল্যাণ ট্রাস্ট, মেদিনীপুর, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ
২৫ টাকা

১০৭। **সেবানন্দ ভারতী**
তমলুকের ইতিহাস
মেদিনীপুর, ১৯৭৪

১০৮। **সুশীল ধাড়া ও গোপীনন্দন গোস্বামী**
পট-চিত্র-গীতি
তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস কমিটি, ১৯৮৬
৫ টাকা

১০৯। **যোগেশচন্দ্র বসু**
মেদিনীপুরের ইতিহাস
মেদিনীপুর, ১৯৭৮

১১০। **হরিপদ মণ্ডল**
মেদিনীপুরে গান্ধীজী
ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ, ১৫ টাকা

১১১। **হরিপদ মাইতি**
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস
মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতি, ময়না, ১৯৮৮
৩৫ টাকা

১১২। **হরিসাধন সরকার**
তমলুক শহরের ইতিকথা
মেদিনীপুর, ১৯৮৬

ইংরেজি গ্রন্থ

1. Adam William
Report on the State of Education in
Bengali (1835-38)
Anath Nath Basu (ed.), Calcutta, 1941.
2. Agarwal, S. C.
The Salt Industry in India
Simla,. 1937
3. Aitchison C. U.
A collection of Treaties, Engagements and
Sunneeds Relating to India and
Neighbouring Countries, Vol.-1, Calcutta,
1892
4. Amalendu De
Roots of seperation in nineteenth century
Bengal, Calcutta, 1974
5. Ambhirajan, S.
Classical Political Economy and British
Policy in India, New delhi, 1978
6. Ascoli, F. D.
Early Revenue history of Bengal and
fifth Report, 1812
Oxford University Press, Oxford, 1917
7. Azad Moulana Abul Kalam
India Wins Freedom
Orient Longman, Calcutta, 1993.
8. Baden, Powell B. H.
The Land System of British India, 3 Vols.
Oxford University Press, Oxford, 1892
9. Bagal, J. C.
History of India Association, 1876-1951
Indian Institute of Advanced Studies
Simla, 1957
10. Bagchi Amiya Kumar
The Foreign Capital and Economic
Development.
Indian Institute of Advanced Studies
Simla, 1967.
11. Banerjee, A. C.
Agrarian System of Bengal, Vol.-2
Calcutta, 1981
12. Barder, W. J.
British Economic thought in India,
1600-1858, Oxford University Press
Oxford, 1975
13. Bayley, H. V.
Memoranda of Midnapore
Calcutta, Bengal Secretarial Press, 1902
155p.
14. Bengal District Gazetteers
Midnapore, By L. S. O'Malley
Calcutta, The Bengal Secretariat Book
Depot, 1911, 235p.
15. Bengal. Home Dept. Politica.
District Officer's Chronicles of events
disturbances consequent upon the
All India Congress Commitee's resolution
of the 8th August, 1942 and the arrest of
Congress leaders thereafter, Aug, 1942 to
middle of March, 1943, Alipore, Supdt.,
Govt. Printing, 1943. 162 p.

16. Bengal Legislative Assembly. 1937-1947
Assembly Proceedings : Official....1937,
Alipore, B. G. Press, 1937
17. Chakravarty, Tarini Sankar, ed.
India and Revolt, 1942. V.-1
Bengal and Assam
Calcutta : Hindusthan Books, 1946. 170 p.
18. Chaudhuri, K. N.
The Economic Development of India
Company, 1814-58. Cambridge University
Press, Cambridge, 1971
19. Chaudhuri, S. B.
Civil Disturbances during the British in
India (1765-1857). Calcutta, 1955
20. Chatterjee Asoke and others
Studies in the Agrarian Structure in
Bengal, 1850-1949,
Oxford University Press, Oxford, 1982
21. Chatterjee, Gouripada.
History of Bogri Rajya, Garbeta,
Midnapore, 1976
22. Chatterjee, Gouripada
1928, Midnapore
23. Chattopadhyaya, Goutam
Communism and Bengal Freedom
Movement. New Delhi, 1970
24. Chaudhuri, Binoy B.
Growth of Commercial Agriculture in
Bengal. Vol.-1, 1757-1900, Calcutta, 1964
25. Chopra, P. N. ed.
Quit India Movement
British Secret Report, Faridabad
Thomson Press (India), 1976, 407 p.
26. Coupland Reginald
Mr. Gandhi's Rebellion. London
New YOrk, 1943, P 287-307 p.
27. Cronin, R. P.
British Policy and Administration of
Bengal. Calcutta, 1977.
28. Darbara, Singh
Indian Struggle, 1942.
Lahore, Hero Pub., 1944, 140 p.
29. Das, B. S.
Changing Profile of the Frontier Bengal
Delhi, 1984
30. Das, B. S.
Civil Rebellion in Frontier Bengal
Calcutta, 1973.
31. Das, Narendra
Fight for Freedom in Midnapore
(1928-33), Midnapore : Midnapore Itihas
Rachana Samity [1980], 171 p.
32. Das Narendranath
History of Midnapore. Vol.-1,
(1760-1942). Midnapore, Gita Das
[1956]. 279 p.-V.
33. Das, Narendranath
History of Midnapore : Palitical
2nd ed., Midnapore, Medinipur,
Itihas Rachana Samity, 1972.-V.
(to be completed in 5V.)
34. Dutta, Bhupendra Kumar
The India Revolution and the Constructive
Programme, Calcutta,
Saraswati Liberary, 1946. 83 p.
35. De, Lal Bihari
Bengal Peasant Life, ed.,
by Mahadeb Prasad Saha, Calcutta, 1969
36. Desai, A. R.
Social Background of Indian Nationalism
Bombay, 1966
37. Dwibedy, S. N.
Untold Story of August Revolution
Ajanta Publications, New Delhi, 1993
38. Edward, Dalton
The Tribal History of Eastern India
New Delhi, 1973
39. Fazi, Abul
The Ain-I-Akbari, Vol.-1-2, Bengal
40. Firminger, Walter Kelly
The Fifth Report from the Select
Committee of the House of Commons on
the affairs of the East India Company
Calcutta, R. Cambray, 1917. 3V.
41. Firminger, Walter Kelly
Historical Introduction to the Bengal
partition of 'The Fifth Report', Calcutta,
R. Cambray, 1917
42. Firminger, Walter Kelly
Midnapore District Records,
1767-1770, 2V.
43. Flames of 1942
A Photo album with 100 photos of the
August Movement, Bombay
Azad Bhandar, 1949
44. Gandhi, M. K.
Quit India, Bombay : Padma Pub., 84 p.

45. Gholam, Hossein Khan
A translation of the Seir Mutaqherin ; or view of Modern times being a History of India, Calcutta, R. Cambray, 1926, 3V.
46. Ghosh A & Dutta K
Development of Capitalist relation in Agriculture, New Delhi, 1977
47. Ghosh, Binoy Jiban
Murder of British Magistrates
Calcutta : Basudhara, 1962, 104 p.
48. Ghosh, Sankar
The Naxalite Movement
Firma KLM (P) Ltd, Calcutta, 1970
49. Ghosal, H. R.
Economic Transition in Bengal Presidency 1600-1896, Patna, 1950
50. Ghulam Husain Salim Zaldpuri
The Riyazu-S-Salatin, a History of Bengal, tr. from the original persian by Abdus Salam, Calcutta, Siatic, 1902, 437 p.
51. A Glimpse of Bengal in the 16th Century
(In Calcutta Rev. V. 68. 92, 1891
P. 352-58)
52. Greenough, Paul
Prosperity and Misery in Modern Bengal : The Famine of 1943-44
Oxford University Press, 1982
53. Greenough, Paul R.
Political Mobilisation and Underground Literature of the Quit India Movement
—Modern Asian Studies,
Cambridge Uni. Press, Cambridge, 1983
54. Hamilton, Henry C.
Notes on the Manufacture of Salt in the Tamlook Agency, Midnapore, Tamlook Salt Office, 1852, 43 p.
55. Hamilton, Walter
Geographical, Statistical and Historical description of Hindostan and the adjacent Countries, London, John Murray, 1820
2v. Ref. : Midnapore, p. 147-153
56. Heimgath, Charles H.
Indian Nationalism and Hindu Social Reform, Oxford University Press
Oxford, 1964
57. (The) History of Bengal, ed.
by R. C. Majumder and Jadunath Sarkar
Dacca, Univ. of Dacca, 1943-48, 2v
58. Hunter, W. W.
A Statistical Account of Bengal
London, Trubner & Co., 1876
(Midnapore, 248 p.)
59. Hutchuis, F. G.
Spontaneous, Revolution, Monoher Books
Delhi, 1971
60. (The) Imperial Gazetteer of India
New ed., Oxford, Clarendon Press
(Ref. : to Midnapore, V. XVIII
1908, p. 327-341)
61. Jahnston, John
Midnapore and Jellasore
62. Jameson, A. K.
Find Report on the Survey and Settlement Operation in the Distric of Midnapore
63. Khan, Mahendralal
Raja of Midnapore
History of Midnapore Raj, 1889
64. Legge, J. A.
A Record of the Budhistic Kingdom
Oxford University Press, Oxford, 1886
65. Mahendra Lal Khan
Zemindar of Midnapore and Narajole,
The History of the Midnapore Raj
Calcutta, Thacer Thaeker Spink & Co.
1889, 99 p.
66. Maiti, Sachindra Kumar
Freedom Movement in Midnapore
Calcutta : Firma K. L. Mukhopadhyay
1975, –v.
67. Majumder, R. C.
History of Ancient Bengal,
G. Bharodwaj & Co., Calcutta, 1974
68. Majumder, R. C.
History of Freedom Movement in India,
Vol.- I + II + III, Firsma K. L. M. Pvt. Ltd, Calcutta, 1977
69. Majumder R. C. (ed.)
The History of Bengal (Hindu Period)
Vol.-1, Pub. by University of Dacca
Dacca, 1963
70. Majumder, R. C.
Advanced History of India
Macmillion, London, 1950
71. (The) Midnapore Ryop's Case, 1858
Narayan Prasad defendent
72. Mukherji *Rai Saheb* Bijoybehar
Midnapore, A Study

73. Nehru, Jawaharlal
An Autobiography, Allied Publishers
Delhi, 1962
74. Nehru, Jawaharlal
Discovery of India
Oxford University Press, Calcutta, 1989
75. Notes on the early Judicial Administration of the Districts of Midnapore, (By E. G. Drake Brockman), Midnapore, 1904
76. Price, J. C.
The Chuar Rebellion of 1799
(In Bengal, Past and Present,
V. 66, 1946-47, P. 47-57)
77. Price, J. C.
Notes on the History of Midnapore as contained in records extent in the Collector's Office, Calcutta,
Bengal Secretariate Press, 1876, —V
78. Recketts, Henry
Reports on the Districts of Midnapore
Calcutta : Calcutta Gazette Office, 1858
103 Fold, Maps
79. Salahuddin, Ahmed
Social Idea and Social Changes in Bengal (1818-35), London, 1965
80. Santra, Gangadhar, 1939
Temples of Midnapore, Calcutta
Firma K. L. Mukhopadhyay, 1980, 118 p.
81. Sanyal, Hitesranjan
Social Movement in Bengal, Calcutta, 1981
82. Sarkar, Jadunath (ed.)
The History of Bengal, (Muslim Period), Vol.- II, Published by University of Dacca
Dacca, 1962
83. Sarkar, Sumit
Bibliographical Survey of Social Reform Movements in the 18th and 19th Centuries, Indian Council of Historical Research, New Delhi, 1975
84. Sarkar, Susovan
The Bengal Renaissance and others Essays
New Delhi, 1970
85. Dasgupta, Soshi Bhusan
Obscure Religious Cults,
Firma KLM (P) Ltd. Calcutta, 1976
86. Seal, Anil
The Emergence of Indian Nationalism, Competition and Collaboration in the lats, 18th Century, Cambridge University Press, 1970
87. Sengupta, S.
Social Profiles of the Mahalis
Firma KLM (P) Ltd. Calcutta, 1970
88. Shínde, A. B.
The Parallel Govt. of Satara
Allied Publishers, New Delhi, 1990
89. Sinha, J. C.
Economic Annals of Bengal
Calcutta, 1927
90. Sinha, Narendrakrishna. ed.
Midnapore Salt Papers : Hijli and Tamluk, (1781-1807)
91. Sinha, N. K.
Economic History of Bengal
Vol. III, Calcutta, 1970
92. Sinha, Pradip
Nineteenth Century Bengal :
Aspects of Social Change
Calcutta, 1968
93. Tamralipta Swadhinata Sangram Itihas Committee, *Tamluk*
Freedom Struggle in Tamluk
Tamluk, 1982, —V.
94. Jhorner Danial & Alice
Land and Labour in India
London, 1962
95. Vera, Austey
The Economic Development in India,
4th edition, London
96. Verelst, H.
A view of the Rise Progress and Present State of English Government in Bengal
London, 1771
97. West Bengal Census 1951 : District handbook Midnapore, Alipore
West Bengal Government Press
1953, 441p.
98. Wavell
The Viceroy's Journal
Oxford University Press
Oxford, 1973
99. White Combe Elizabeth
Agrarian Condition in Northern India
Berkeley, 1972

লেখক : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য- বিজ্ঞানের অধ্যাপক।